ইতিহাস অনুসন্ধান ১০

সম্পাদনা

আবদুল ওয়াহাব মাহমুদ



ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড

কলিকাতা ☆ ☆ ☆ ১৯৯৫

ITIHAS ANUSANDHAN-10

প্রথম প্রকাশ: নভেম্বর, ১৯৯৫

প্রকাশক:

ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, ২৫৭ বি, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী
কলিকাতা-৭০০ ০১২

মুদ্রক:

র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন
৪৩, বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ

কার্যকরী সমিতি : ১৯৯৪-৯৫

মুখবন্ধ

১৯৯৪-র নভেম্বর মাসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের একাদশ বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সম্মেলনে মূল নিবন্ধকার, বিভাগীয় সভাপতিগণ এবং সংসদের সদস্য-সদস্যাদের পেশ করা গবেষণামূলক নিবন্ধগুলি নিয়ে 'ইতিহাস অনুসন্ধান-১০' প্রকাশিত হল।

বিগত সম্মেলনে ১২৫-টি নিবন্ধ পেশ করা হয়েছিল। কিন্তু সমস্ত নিবন্ধ আমাদের দপ্তরে সময় মতো পৌঁছায় নি। আবার অনেকে আদৌ লিখে পাঠাননি। ফলে সম্মেলনে পেশ করা সমস্ত প্রবন্ধের হদিশ এই বইতে মিলবে না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য: নিবন্ধকারেরা সম্পাদকীয় নির্দেশ না মানায় বইটিতে সমতা বক্ষা সব সময় সম্ভব হয় নি। এ বিষয়ে পরবর্তীকালে সকলে সহযোগিতা করবেন আশা করি।

মূল নিবন্ধকার অসম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক জয়ন্তভূষণ ভট্টাচার্য, প্রাচীন ভারত ইতিহাস বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়, মধ্যযুগের ভারত ইতিহাসের সভাপতি অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়, আধুনিক ভারতের ইতিহাস বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক রনজিৎ দাশগুপ্ত এবং ভাবত বহির্ভূত অন্যান্য দেশের ইতিহাসের সভাপতি অধ্যাপক ধ্রুব গুপ্ত ও অন্যান্য নিবন্ধকারদের সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানাই।

এবার এই গ্রন্থের প্রকাশক ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড। এই প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মীদের সহৃদয় সহযোগিতার জন্য সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাই। এই বইয়ের কাজটি দ্রুত নিষ্পন্ন করার জন্য র‍্যাডিকাল ইম্প্রেশনের কর্তৃপক্ষ ও কর্মীদের ধন্যবাদ জানাই।

বইটি ইতিহাসানুরাগীদের ভালো লাগলে এবং প্রয়োজন মেটালে পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের উদ্দেশ্য সার্থক হবে।

২ পাম প্লেস
কলকাতা-৭০০ ০১৯
১ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫

আবদুল ওয়াহাব মাহমুদ
সভাপতি
পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ

সূচিপত্র

আধুনিক ভারত ৩০৫—৬৩০

ভারত বহির্ভূত দেশ ৬৩১–৭২৪

আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চ্চা ঃ কয়েকটি সমস্যা

জয়ন্তভূষণ ভট্টাচার্য

পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ আমাকে এই একাদশ বার্ষিক সম্মেলনের মূল নিবন্ধ পেশ করার সুযোগ দিয়েছেন সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ। যদিও সংসদের এ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত কোনও অধিবেশনে আমি উপস্থিত থাকতে পারিনি, তবু এ সমাবেশে আমি অর্বাচীন নই। এর কাবণ দুটি—(১) সংসদের প্রায শুরুতেই আমি এর সদস্য হযেছিলাম। (২) পূর্বোত্তব ভারত ইতিহাস সংস্থা বা North-East India History Association ১৯৭৯ সালে সংগঠিত হবার সময থেকেই এর সাথে ঘনিষ্ঠ হবার সুবাদে আমি দেশের অন্যান্য ইতিহাস সংস্থাগুলোর কাজকর্মগুলো সম্পর্কে অবগত থাকার চেষ্টা করেছি। আমি লক্ষ্য করেছি বিগত দশক থেকে পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ অত্যন্ত সক্রিযভাবে কাজ করে যাচ্ছেন—প্রতি বছর অধিবেশন হচ্ছে, গ্রন্থাদিও প্রকাশিত হচ্ছে। সর্বভারতীয় ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রেও সংসদের সদস্যদের গবেষণা যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছে। এর মূল কারণ, এই সংস্থার সঙ্গে নবীন ও প্রবীন উভয় স্তরেই গবেষকরাই জড়িত রযেছেন। এদের মধ্যেই অনেকেই আঞ্চলিক ইতিহাসে উৎসাহী, আবার অনেক বিদগ্ধ গবেষকও রয়েছেন যারা সর্বভারতীয় ইতিহাস চর্চায় লব্ধ প্রতিষ্ঠিত। কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গে ইতিহাস চর্চার ঐতিহ্য অনেকদিনের, এমন কি কলকাতার ঐতিহাসিকেরা এক সময়ে ছিলেন ভারতের ইতিহাস চর্চার পথিকৃৎ। আমার ধারণা, দীর্ঘ দিনের এই ঐতিহ্য পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস সংসদকে ইতিহাস চর্চার গুণগত উৎকর্ষ সাধনের বলিষ্ঠ ভূমিকা নিতে সাহায্য করেছে।

আমার আজকের এই সংক্ষিপ্ত নিবন্ধে আমি উপস্থিত গবেষকদের কাছে আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চার কয়েকটি সমস্যা তুলে ধরবার চেষ্টা করব এবং অনুরোধ করব যদি এর মধ্যে আদৌ কোনো গুরুত্ব থাকে তবে এ নিয়ে আপনারা ভাবনা চিন্তা করুন ঃ—

এক ঃ ভারতের জাতীয় ইতিহাস বনাম আঞ্চলিক ইতিহাস;

দুই ঃ আঞ্চলিক ইতিহাসের ভৌগোলিক ও আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামো;

তিন ঃ বাংলার ইতিহাস বনাম পশ্চিমবঙ্গের আঞ্চলিক ইতিহাস।

"Unity in Diversity" কথাটা বোধহয় প্রথম ব্যবহার করেছিলেন অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায় তাঁর 'Fundamental Unity of India' বইয়ে। তবে

আমরা বাববার কথাটা ব্যবহাব করে আসছি। এর কারণ, কথাটা খুবই সত্যি। ভারতীয সংস্কৃতি বা ভারতীয ঐতিহ্যের মধ্যে 'Unity' ও 'Diversity' দুটোই বযেছে। এটা প্রায সবাই প্রত্যক্ষ করেছেন। কিন্তু এর কারণ যদি জানতে হয (অর্থাৎ কেন এই Unity এবং কেন এই Diversity) তাহলে খুঁজতে হবে ভারতের ইতিহাস, যে ইতিহাস মূলতঃ আঞ্চলিক ইতিহাস। আরও একটু পরিষ্কার করে বলতে গেলে, ভারতের প্রতিটি অঞ্চলের সমষ্টিগত ইতিহাসই হচ্ছে ভারতের জাতীয ইতিহাস। ভারত রাষ্ট্রটিতে যেমন বিভিন্ন অঞ্চল ও জনগোষ্ঠী বযেছে, তেমনি প্রতিটি অঞ্চলের নিজস্ব ঐতিহ্য ও বৈশিষ্ট্যও রযেছে। সমযে সমযে কিছু অঞ্চল আর্থ-সামাজিকভাবে স্বযং নির্ভর ও বাজনৈতিক ভাবে খণ্ডরাজ্য বা সার্বভৌম মর্যাদার অধিকারী ছিল। ঐতিহাসিক কারণে ঐসব অঞ্চলের নিজস্ব ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য বযেছে। অতএব ভারতবর্ষের প্রকৃত ও পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস যদি রচনা কবতে হয, তবে গবেষণার ভিত্তি হবে আঞ্চলিক ইতিহাস। তাছাড়া এমন কিছু অঞ্চলও রযেছে যা আজ ভারতের বাজনৈতিক মানচিত্রের অন্তর্ভূক্ত নয, কিন্তু কোন না কোন সময এগুলো ভাবতের কোন না কোন অঞ্চলের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল এবং এই দেশেব আর্থ-সামাজিক বিকাশের ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ ভূমিকা নিযেছিল। এসব অঞ্চলকে বাদ দিযে ভারতে ইতিহাসের প্রকৃত গতি ও প্রকৃতি কখনও পরিস্ফুট হবে না! অতএব ভারতবর্ষের প্রকৃত ও পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসের ভিত্তি হচ্ছে আঞ্চলিক ইতিহাস। এই ইতিহাসের দেশের প্রতিটি ইতিহাসের উপযুক্ত মর্যাদা দিতে হবে এবং জাতীয ইতিহাসে প্রতিটি অঞ্চলেব অবদান স্বীকৃত হতে হবে। কিন্তু সমস্যাটা আসছে দুদিক থেকে। একটি হচ্ছে, জাতীয মূলধারা বা National Mainstream-এর দৃষ্টিকোণ থেকে যারা ভারতের ইতিহাসকে দেখছেন তাদের গবেষণার কিছু অঞ্চলের প্রতি অবিচার হচ্ছে। আমরা যখন ভারতের ইতিহাস পড়ি তখন কিছু অঞ্চল বা রাজ্যের আদৌ কোন ইতিহাস বলেই মনে হয় না। অথচ একটি ভৌগোলিক অঞ্চল যেখানে মানুষ ছিলেন এবং রয়েছেন, এর কোন ইতিহাস নেই সেটা কখনো গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। অন্যদিকে কোনো কোনো আঞ্চলিক গবেষক নিজেদের অঞ্চলের ইতিহাস এমন ভাবে লিখছেন যা পড়ে মনে হয় সেই অঞ্চল এতই স্বয়ং সম্পূর্ণ ছিল যে প্রতিবেশী অঞ্চল সমূহের সঙ্গে সেখানকার মানুষের যোগাযোগ বা আদান-প্রদান মোটেই ছিল না। আমার ধারণা এই দুই গোষ্ঠীর উভয়েই চরমপন্থী এবং জাতীয় স্বার্থ ও সংহতির পরিপন্থী। কেননা, প্রতিবেশী অঞ্চলসমূহের মধ্যে বিনিময় ব্যবস্থা একটি ঐতিহাসিক সত্য। আর্থ-সামাজিক বিকাশের ক্ষেত্রে এই সত্য যুগযুগ ধরে অব্যাহত রয়েছে। তাছাড়া জাতীয় ইতিহাসে যদি দেশের

প্রতিটি অঞ্চল বা প্রতিটি জনগোষ্ঠীব মানুষ নিজেদের. খুঁজে না পান তাহলে সেই ইতিহাস জাতীয় সংহতির সহায়ক হবে না।

দ্বিতীয় সমস্যাটি হচ্ছে, আমরা অঞ্চল কাকে বলব? অথবা, একটি অঞ্চলের ভৌগোলিক ও আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট কি হবে? সমস্যাটি আসছে এই জন্য যে, ভারতবর্ষে পঁচিশটি রাজ্য ও সাতটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল রয়েছে। আঞ্চলিক উন্নয়ন পরিষদ রয়েছে পাঁচটি, রেলসংগঠন রয়েছে নটি, ক্রিকেট খেলা হয় চারটি বা পাঁচটি অঞ্চলের ভিত্তিতে। আমার ধারণা, ভারতবর্ষের আঞ্চলিক ইতিহাস নিয়ে যারা কাজ করছেন তারাও এই সমস্যাটি বিশ্লেষণ করেননি। বর্তমানে যে ক'টি আঞ্চলিক ইতিহাস সংস্থা রয়েছে সেগুলো মূলত এক একটি অঞ্চলের ঐতিহাসিকদের সংস্থা। সাংগঠনিক সুবিধার জন্যই এগুলো এক বা একাধিক রাজ্য নিয়ে তৈরী হয়েছে। যেমন, পশ্চিমবঙ্গে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, বিহারে বিহার ইতিহাস পরিসদ, দক্ষিণ ভারতে একদিকে রয়েছে Andhra Pradesh History Congress, Kerala History Congress ইত্যাদি আবার অন্যদিকে দক্ষিণ ভারতের সব ক'টি রাজ্য নিয়ে রয়েছে South Indian History Congress, পূর্বোত্তর অঞ্চলের সাতটি রাজ্য নিয়ে রয়েছে North East India History Association। কিন্তু এ সব রাজ্য বা প্রতিবেশী কয়েকটি রাজ্য নিয়ে যে ভৌগোলিক অঞ্চল সেই অঞ্চল একটি ঐতিহাসিক অঞ্চল নাও হতে পারে।

ভারতের বর্তমান রাজ্যগুলো মূলতঃ প্রশাসনিক সুবিধার জন্য বৃটিশ শাসন কালে তৈরী হয়েছিল। এতে কোন অঞ্চলের ভাষা, সংস্কৃতি বা ইতিহাসের প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়নি। একই ভাষাভাষী মানুষ বিভক্ত হয়েছেন বিভিন্ন রাজ্যে। শুধু তাই নয়, সাতচল্লিশের দেশ বিভাগের পর কোনো কোনো জনগোষ্ঠী বিভক্ত হয়ে পড়েছেন দু'টি সার্বভৌম রাষ্ট্রে। যেমন, পাঞ্জাবী ও কাশ্মিরী ভাষী অঞ্চল ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে এবং বাংলাভাষী অঞ্চল ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বিভক্ত হয়েছে। নেপালী ভাষীরা রয়েছেন ভারতে ও নেপালে। শুধু ভৌগোলিক প্রতিবেশী হিসাবে নয়, বাংলাদেশ, ভূটান, নেপাল বা পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের কোনো কোনো অঞ্চলের ঐতিহাসিক ও আর্থ সামাজিক বিবর্তন একই সূত্রে গাথা ছিল।

স্বাধীনতার পর ভারতবর্ষে ভাষা-বিভক্ত রাজ্য গঠনের উদ্দেশ্যে কয়েকটি রাজ্যকে পুনর্গঠন করে নতুন নতুন রাজ্যের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এখনো দেশের বিভিন্ন ভাগে অস্থিরতা ও সংঘাত অব্যাহত রয়েছে। মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটকের মধ্যে সীমানা বিরোধ রয়েছে। ঝাড়খণ্ড রাজ্যের দাবী শোনা যাচ্ছে। আসামকে ভেঙ্গে কয়েকটি নতুন রাজ্য হয়েছে, কিন্তু বাংলাভাষী বরাক উপত্যকা আসামেই রয়েছে। আসামের অবশিষ্ট দু'টি পার্বত্য জেলা ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বড়ো অধ্যুষিত অঞ্চলে

স্বায়ত্ব-শাসনের দাবীতে আন্দোলন চলছে। ওর মূল কারণ তদানিন্তন বৃটিশ সরকার ঔপনিবেশিক স্বার্থে কয়েকটি কয়েকটি কৃত্রিম প্রশাসনিক অঞ্চল তৈরী করেছিলেন এবং অনেক ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক অঞ্চলের সঙ্গে এদের কোন মিল নেই।

অতএব প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে— ঐতিহাসিক অঞ্চল আমরা কাকে বলবো। আমার ধারণা, দীর্ঘকালীন বিবর্তনেব মধ্যে দিয়ে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে গড়ে উঠা আর্থ-সামাজিক স্বনির্ভর একটি ভূখন্ডকেই আমরা ঐতিহাসিক অঞ্চল বলবো। কেন না, মানব সভ্যতার বিকাশের সূচনা পর্বে দেখা গেছে ভ্রাম্যমান এক একটি জনগোষ্ঠী তাদের জীবন ধারনের উপযোগী এক একটি ভূখন্ডকে বেছে নিয়েছেন এবং কালক্রমে স্থায়ী বসতি স্থাপন করেছেন। সেই অঞ্চলের নিজস্ব প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য রযেছে এবং সেই বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সংগতি রেখে মানুষের জীবিকা, অর্থাৎ কৃষিকর্ম্ম, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদির বুনিযাদ তৈরী হয়েছে। স্থাযী বসতিব জন্য গ্রাম ও অন্যান্য সামাজিক সংগঠন এবং কালক্রমে সমগ্র আঞ্চলটিকে নিয়ে একটি স্বযং সম্পূর্ণ রাজনৈতিক সংগঠন বা রাজ্য গড়ে উঠেছে। আর্থ-সামাজিক স্বনির্ভরতার সুবাদে ও এক দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্য দিযে এই সাংগঠনিক বিকাশ সম্ভব হয়েছে। গভীর বিশ্লেষণে দেখা যাবে এইসব প্রতিটি অঞ্চলের মানুষের নিজস্ব নৃতাত্বিক, সাংস্কৃতিক ও ভাষিক অস্তিত্বকে বর্তমান রয়েছে এবং সেই অস্তিত্বকে কেন্দ্র করে একটি জাতি সত্ত্বাও গড়ে উঠেছে। পরবর্তীকালেও আগন্তুকেরা যেসব অঞ্চলে নতুন বসতি স্থাপন করেছেন, কিন্তু দীর্ঘকাল সহাবস্থান ও সংমিশ্রণের ফলে তারাও আঞ্চলিক মূলধারায় সামিল হয়ে গেছেন। এরকম পরম্পরাগত ভাবে নিজস্ব ভাষা-সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী ও আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে সুসংহত ও স্বনির্ভর একটি ভূখন্ডকেই ঐতিহাসিক অঞ্চল বলা যেতে পারে।

ঐতিহাসিক অঞ্চলের এই পরিকাঠামো থেকেই আসছে আমার তৃতীয় সমস্যা— আমি যাকে বলছি বঙ্গদেশ বনাম পশ্চিমবঙ্গের আঞ্চলিক ইতিহাসের সমস্যা। স্বাধীনতা-উত্তর যুগে পশ্চিমবঙ্গের নিজস্ব আঞ্চলিক ইতিহাস অবশ্যই রয়েছে। কিন্তু প্রাগ-ঐতিহাসিক যুগ থেকে সাতচল্লিশের দেশ বিভাগের সময় পর্য্যন্ত যদি এই অঞ্চলের দীর্ঘ ইতিহাস অধ্যয়ন করতে হয় তাহলে অবশিষ্ট বঙ্গদেশ বা বাংলাভাষী অধ্যুষিত অঞ্চলকে বাদ দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস কতটুকু পূর্ণাঙ্গ বা প্রকৃত হবে সেই সংশয় নিশ্চয়ই অহেতুক নয়। আমরা অবিভক্ত সেই বঙ্গদেশকে দেখতে পেয়েছি দীনেশচন্দ্র সেনের "বৃহৎ বঙ্গ", নগেন্দ্রনাথ বসুর "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস", নীহাররঞ্জন রায়ের "বাঙ্গালীর ইতিহাস", রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বাঙ্গালার ইতিহাস", রমেশচন্দ্র মজুমদারের "বাংলাদেশের ইতিহাস" ইত্যাদি পুস্তকে।

বৃটিশ রাজত্বের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার তিনটি জেলা শ্রীহট্ট, কাছাড় ও গোয়ালপাড়াকে ফেলে দেওয়া হল আসামে। ১৯০৫ সালে অবশিষ্ট বঙ্গদেশকে পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গে বিভক্ত করা হল। আসামকে পূর্ববঙ্গের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে যে নতুন রাজ্যটি তৈরী হল তার নাম দেওয়া হল "পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ"। জাতিসত্তার ভিত্তিতে এর প্রতিবাদ হল, স্বদেশী আন্দোলন হল, প্রতিরোধ তখনকার মত সফলও হল। কিন্তু তারপরই ছোটনাগপুর গেল বিহারে এবং শ্রীহট্ট, কাছাড় ও গোয়ালপাড়া আবার আসামে। এখানেই শেষ নয়। সাতচল্লিশের বিভাজনের মধ্য দিয়ে বঙ্গদেশ দুটি ভিন্ন স্বাধীন রাষ্ট্রের অন্তর্গত হল, এবং শ্রীহট্টের অধিকাংশ অঞ্চল চলে গেল পূর্ব-পাকিস্তানে। এই বিভাজনকে কেন্দ্র করে সূচনা হল বাংলার প্রকৃত ও পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার সমস্যা। ইতিহাসের ধারার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নিজস্ব গতিতে গড়ে ওঠা সেই ঐতিহাসিক অঞ্চলটিকে আমরা যদি আজকের পরিকাঠামোয় খণ্ড বিখণ্ড করে এব অতীত ইতিহাস নিয়ে গবেষণার চেষ্টা করি তাহলে সেই গবেষণা অনৈতিহাসিক, কৃত্রিম ও বিকলাঙ্গ ইতিহাস হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতির কাছে গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে।

আমি এই তিনটি সমস্যাই শুধু তুলে ধরলাম, এর পদ্ধতিগত কোন সমাধান আমি এখনও খুঁজে পাইনি। এই অধিবেশনে সমস্যা কটি বিশেষভাবে তুলে ধরলাম এই কারণে যে আমার নিজের অঞ্চল, অর্থাৎ বর্তমান আসামের বরাক উপত্যকায় চলিত ১৪০১ বঙ্গাব্দ 'ইতিহাস অনুসন্ধান বর্ষ' হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। এই ইতিহাস অনুসন্ধান বর্ষে বরাকের গবেষকেরা সেই অঞ্চলের প্রকৃত ইতিহাস অনুসন্ধানের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন। শহরে-গ্রামে-গঞ্জে ঐতিহাসিক তথ্যের অনুসন্ধান চলছে, স্কুলে কলেজে আলোচনাচক্র, সেমিনার ইত্যাদি হচ্ছে, গ্রন্থ-প্রকাশনার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে, স্থানীয় পত্র-পত্রিকা বিশেষ সংখ্যা বা ক্রোড়পত্র প্রকাশ করছেন, আকাশবাণীর স্থানীয় কেন্দ্র বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন, নব প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি জাতীয় সেমিনারের উদ্যোগও নেয়া হয়েছে। এর কারণ, বরাকের গবেষকেরা মনে করেন সেখানকার প্রকৃত ও পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস এখনো লেখা হয়নি।

প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে, আজকের বরাক উপত্যকা কাছাড়, হাইলাকান্দি ও করিমগঞ্জ এই তিনটি জেলায় বিভক্ত। 'এপার বাংলা' ও 'ওপার বাংলা'র পরিপ্রেক্ষিতে আসামের এই অঞ্চলটিকে 'বাংলার তৃতীয় ভুবন' বলা হয়ে থাকে। বৃটিশ শাসনকালে সুরমা উপত্যকা নামে খ্যাত ও অবিভক্ত শ্রীহট্ট-কাছাড় নিয়ে গঠিত বাংলাভাষী এই অঞ্চলটিকে ১৮৭৪ সালে ঢাকা ডিভিশন থেকে সরিয়ে নবগঠিত আসাম প্রদেশের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। অনিবার্য কারণে তারপর যারা বাংলার প্রাদেশিক ইতিহাস রচনা করেছেন তারা এই অঞ্চলকে তাদের

গবেষণার অন্তর্ভুক্ত করেননি। অন্য দিকে আসামের ইতিহাস বলে যা লেখা হয়েছে তা মূলত ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার ইতিহাস। শুধু তাই নয়, কোনো কোনো লেখায় কিছু বিকৃত ও বিভ্রান্তিকর তথ্যও পরিবেশিত হয়েছে যার ফলে বরাকের মানুষের অস্তিত্ব নিয়েও অনেকের মনে সংশয় দেখা দিয়েছে।

অন্যদিকে, অবিভক্ত সেই উপত্যকার বৃহত্তর অংশ বাংলা সুবার অন্তর্গত ছিল সেই সুবাদে পলাশীর যুদ্ধের পর অবশিষ্ট বঙ্গ দেশের সঙ্গে বৃটিশ অধিকারভুক্ত হয়েছিল। অন্য একটি খণ্ড আমরা যাকে বলি সমতল কাছাড়-অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ডিমাসা রাজাদের শাসনাধীন ছিল এবং ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ অধিকারে আসে। ভৌগোলিক অবস্থান ও আঞ্চলিক ঐতিহ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে সমতল কাছাড়কেও শ্রীহট্টের মত ঢাকা ডিভিশনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে পেম্বারটন সাহেব এক প্রতিবেদনে বলেছিলেন, শ্রীহট্ট শহর থেকে মনিপুর সীমান্তে অবস্থিত জিরিঘাট পর্যন্ত এই অঞ্চলের ভূগোল এক, এখানকার মানুষ এক, তাদের ভাষা ও চেহারা-ছবিও এক। ভাষাতত্ত্ববিদ গ্রীয়ারসন সাহেব বলেছেন, এই অঞ্চলের কথ্য ভাষা পূর্ববঙ্গীয় উপভাষা। ঐতিহাসিক নীহররঞ্জন রায় বলেছেন, শ্রীহট্ট-কাছাড় বা বরাক-সুরমা যেমন উপত্যকারই এক অংশ এবং সেখানকার মানুষের ভাষা সংস্কৃতিও পূর্ববঙ্গ থেকে অভিন্ন।

খৃষ্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতকে এই শ্রীহট্ট-কাছাড় অঞ্চলে শ্রীহট্ট রাজ্য নামে একটি আঞ্চলিক রাজ্যের অবস্থিতির প্রমাণ রয়েছে ভাটেরা তাম্র শাসনে। পূর্ববঙ্গের রাজা শ্রীচন্দ্রের পশ্চিমভাগ তাম্র শাসনে শ্রীহট্ট মণ্ডলের কথা রয়েছে। বলা হয়েছে, শ্রীহট্ট ছিল পুণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির অন্তর্গত একটি মণ্ডল এবং সেই মণ্ডলে চন্দ্রপুর, গযনা ও পোগার নামে তিনটি বিষয় ছিল। শ্রীচন্দ্রের দশম শতাব্দীর এই তাম্র শাসন আবিষ্কৃত হয়েছে শ্রীহট্টের পশ্চিমভাগ গ্রামে। সপ্তম থেকে দশম শতাব্দীতে এই অঞ্চল হরিকেল রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল সেরকম তথ্যও পাওয়া গেছে। কামরূপের রাজা কুমার ভাস্কর বর্ম্মনের সপ্তম শতাব্দীর একখানা তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয়েছে শ্রীহট্টের নিধনপুর গ্রামে। এতেও সেই চন্দ্রপুর বিষয়ের কথা রয়েছে। উত্তরবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের রংপুর ও ময়মনসিংহ হয়ে কামরূপ রাজ্য ছড়িয়ে পড়েছিল শ্রীহট্ট-কাছাড় অঞ্চলে। আবার সমতটের রাজা লোকনাথের ত্রিপুরা তাম্রশাসনে সুবঙ্গ অঞ্চলে একটি মন্দির নির্মাণ ও ব্রাহ্মণদের ভূমিদানের কথা রয়েছে। লোকনাথের পরবর্তী রাজা মারুণ্ডনাথের একখানি তাম্রশাসন পাওয়া গেছে শ্রীহট্টর কালাপুর গ্রামে। এতেও মন্দির নির্মাণের কথা রয়েছে।

এসব প্রাচীন তাম্রশাসন থেকে ঐ অঞ্চলে নানা বর্ণ ও নানা পেশার লোকেদের বসবাসের কথা পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু আসামের কোনো ইতিহাস বা সরকারী গেজেটিয়ারে এসবের উল্লেখও নেই। সমতল কাছাড়ের কথা বলা হয়েছে শুধু

ডিমাসা রাজত্বের সময় থেকে এবং অবশিষ্ট বরাক উপত্যকার ইতিহাস সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত হয়েছে। বিলম্বে হলেও বরাক উপত্যকার বর্তমান গবেষকেরা আঞ্চলিক ইতিহাসের এই অপূর্ণতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন। ইতিহাস অনুসন্ধান বর্ষ পালিত হচ্ছে এই পরিপ্রেক্ষিতে। কিন্তু প্রাথমিক পরিক্রমায় যে সমস্যাগুলো দেখা গেছে আমি সেগুলো এখানে তুলে ধরেছি।

আমার ধারণা অন্যান্য অঞ্চলের গবেষকদেরও এসব সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছে। আমি ইতিমধ্যে বলেছি, আঞ্চলিক ইতিহাসের একজন গবেষক হিসেবে আমি শুধু সমস্যাগুলোই প্রত্যক্ষ করেছি, এর কোনো সমাধান খোঁজে যাইনি। অতএব সমবেত গবেষকদের কাছে আমার আবেদন— আপনারা আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষণার এই পদ্ধতিগত সমস্যাগুলোর বিশ্লেষণ করুন এবং অন্য গবেষকদের সুবিধার জন্য আপনারা সুচিন্তিত সমাধান তুলে ধরুন।

প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস শাখার সভাপতির অভিভাষণ

সুনীল চট্টোপাধ্যায়

ইতিহাস অনুরাগী সজ্জন মণ্ডলী, ৩৭ বছর কলেজে পড়াচ্ছি, কোনদিন বসে কিছু বলিনি। অর্নাস ক্লাসে ২/৩টি ছাত্র থাকলেও দাঁড়িয়ে বলেছি। কেন না, আমার ছাত্র এবং শিক্ষক জীবনে যাদের আমি আলোকস্তম্ভ বলে মনে করি কুরুভিল্লা জ্যাকারিয়া এবং সুশোভন সরকার—এরা কখনও বসে পড়াতেন না। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন ডঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী, ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক। তিনি সপ্তাহে একদিন আমাদের হিস্ট্রীর ক্লাস নিতেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছে, প্রায় রিটায়ারমেন্টের আগে. তিনি বসে পড়াতেন। তিনি কি ধরনের পণ্ডিত ছিলেন, আজকের যারা ইতিহাসের ছাত্র এবং অধ্যাপক তাদের ধারণা করা মুস্কিল। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস পড়াচ্ছেন আর সঙ্গে সঙ্গে সমান্তরালভাবে সমস্ত পৃথিবীর ইতিহাস আলোচনার ভেতরে নিয়ে আসছেন।

যাইহোক আমার সামনে আমার অধ্যাপক নাহলেও আমার পরম শ্রদ্ধেয় রথীন্দ্রনারায়ণ বসু আছেন, এখানে কোন ইতিহাস সম্পর্কে কিছু বলতে পারবো না, কেননা আমি সেইভাবে তৈরী হয়ে আসিনি। আমি মনে করি, আমার কাছে যারা গিয়েছিলেন গৌতমবাবু এবং রণধীর চক্রবর্তী, ওঁরা ভুল লোকের কাছে ভুল সময়ে গিয়েছিলেন। ৪/৫ মাস আগে তারা গিয়েছিলেন। কিন্তু আমার কাছে তারা না গেলেও ভাল করতেন। আমি তো এখন ইতিহাস চর্চা করিনা। ইতিহাস চর্চা কোনদিন যে খুব একটা করেছি তাও আমি দাবী করি না। আমি নিজেকে বিশ্লেষণ করে দেখেছি যে আমি প্রাচীন ভারতের ইতিহাস তো দূরের কথা, আমি ইতিহাসের পুরোপুরো ছাত্র নই। আমার মানসিক প্রবণতা সাহিত্যের দিকে। এবং আমি যখন প্রবেশিকা পরীক্ষা দিই ১৯৩৬ সালে, তখন আমার সঙ্গে পরীক্ষা দেন সহপাঠী অমলেশ ত্রিপাঠী, দিলীপ বিশ্বাস, প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র প্রমুখ। ১৯৩৬ সালে আমরা যখন পরীক্ষা দিই তখন ইতিহাস আবশ্যিক বিষয় হিসেবে ম্যাট্রিকুলেটে ছিল না, অবশ্য পাঠ্য বিষয় ছিল ইংরাজী, বাংলা, সংস্কৃত ও অঙ্ক। আর দুটো অপশনাল বিষয় নিতে হতো। যাঁরা খুব ভাল ছিল, পরীক্ষায় ফার্স্ট-সেকেণ্ড হতে চান, তারা ম্যাথামেটিকস

এবং মেকানিক্স নিতো। তারা ২০০-র মধ্যে প্রায় ২০০. পেয়ে যেতো। আর আমাদের মত যাঁরা সেকেণ্ড গ্রেড-এর ছাত্র তাঁরা ম্যাথামেটিকস নিতে পারতেন না। আমরা ঐসব ইতিহাস, ভূগোল বা অন্যান্য যেসব বিষয় ছিল সেইগুলি নিয়েছিলাম। কিন্তু ইতিহাস পড়িনি। ম্যাট্রিকুলেশানে ইতিহাস আমার ছিল না। ক্লাস এইট-এর পরে প্রথম সুযোগে আমি ইতিহাস বর্জন করেছিলাম। কেন করেছিলাম, পরে চিন্তা করে দেখেছি, বই যিনি পড়াতেন বা যেভাবে পড়াতেন, সেটা কোন ভাবেই আমাকে আকৃষ্ট করত না। সেইজন্য ইতিহাস আমি স্কুলে পড়িনি। ১৯৩৬ সালে যখন আমি হুগলী কলেজে ভর্তি হলাম তখন কলেজের অবস্থা খুব খারাপ। ১৯৩৬ সালে কলেজে তখন শতবার্ষিকী উৎসব পালিত হচ্ছে। কিন্তু কলেজের প্রযোজনীয় বিষয় নেই। প্রযোজনীয় অধ্যাপক নেই, কলেজের একমাত্র গৌরব ছিলেন প্রিন্সিপাল জ্যাকারিয়া। আমি যখন ইতিহাস সম্পর্কে কোন কিছু বলি, আমাকে মাফ করবেন, আমি জ্যাকারিয়ার সম্পর্কে কিছু না বললে, আমার আত্মার তৃপ্তি হয় না। কুরুভিল্লা জ্যাকারিয়া সম্পর্কে আমার বক্তব্য সংক্ষেপে বলি। তিনি ১৮৯০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। বি.এ.তে তার দুটো বিষয়ে অর্নাস ছিল। ইংরেজী এবং ইতিহাস মাদ্রাজ ইউনিভার্সিটিতে দুটো বিষয়ে তিনি ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হযেছিলেন একসঙ্গে। সেখান থেকে অক্সফোর্ড গিয়েছিলেন। ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিলেন। আজকের দিনে ফার্স্ট ক্লাস অনেক সুলভ হয়ে গেছে। এখানেও হয়েছে, বিদেশেও হয়েছে। কিন্তু জ্যাকারিয়ার সমযে তা ছিল না। তিনি ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিলেন অক্সফোর্ডে, তার চেয়েও বড় কথা, আমি শুনেছি ডঃ হীরেন চক্রবর্তী যিনি গবেষণা উপলক্ষে অক্সফোর্ডে গিয়েছিলেন, লণ্ডনে ছিলেন, তার কাছে শুনেছি যে জ্যাকারিয়ার যিনি টিউটর ছিলেন জনসন না কি নাম, তিনি জ্যাকারিয়ার সম্পর্কে লিখিত ভাবে নোট লিখে দিয়েছিলেন—হি ওয়াজ এ লেজেন্ড অ্যাট অক্সফোর্ড ফর মেনি ইয়ারস আফটার হি লেফ্ট ইট, এই ছিলেন জ্যাকারিয়া। কিন্তু আপনারা শুনলে আশ্চর্য হয়ে যাবেন, সেই য্যাকারিয়া ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষায় সংস্কৃতে ফেল করবার জন্য এক বছর নষ্ট করেছিলেন। আমাদের পরীক্ষা ব্যবস্থাটা হচ্ছে অমানবিক, আনসাইন্টিফিক, তার জাজ্বল্য প্রমাণ হচ্ছে জ্যাকারিয়ার এক বছর লোকসান। জ্যাকারিয়া জীবনে বেশী গবেষণা করেননি। দুইখানা মাত্র বই লিখেছিলেন, একটা হচ্ছে হিস্ট্রী অফ হুগলী কলেজ, শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে তিনি লিখেছিলেন। সেটা কিন্তু বাংলাদেশের শিক্ষার ইতিহাস সংক্রান্ত বিষয়ে ইনডিসপেনসিবল সোর্স মেটিরিয়াল। ১০০ বছর ধরে ১৮৩৬ থেকে ১৯৩৬ পর্যন্ত হুগলী কলেজে যে সমস্ত ছাত্ররা পড়াশুনা করেছিলেন তাদের একটা রেজিস্টার তিনি তৈরী করেছিলেন। আমি এক সময়ে একটা গবেষণার সঙ্গে

যুক্ত ছিলাম। বেঙ্গল .পাস্ট অ্যাণ্ড প্রেজেন্টের অনেক সংখ্যা আমাকে দেখতে. হয়েছিল। সেই সময়ে জ্যাকারিয়ার কিছু বিক্ষিপ্ত রচনা চোখে পড়েছিল। ১৯৯০ সালে তার শতবার্ষিকী উৎসব পালিত হয়েছিল। জণ্ডিসে ১৯৫৫ সালে ৬৫ বছর বয়সে মারা যান। ইউনেসকো একটা প্রোগ্রাম নিয়েছিলেন পৃথিবীর একটা ইতিহাস কয়েক খণ্ডে তারা প্রকাশ করবে। তার মধ্যে ৬ষ্ঠ ভলিউম প্রকাশনার দায়িত্ব ভাবতবর্ষ থেকে একজন লোককে দেওয়া হয়েছিল, তিনি হচ্ছেন জ্যাকারিয়া। ভারতবর্ষ থেকে আর কাউকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। তিনি সেই কাজ করার সময় মারা যান।

আমার কর্মজীবনে কখনো যে লেখাপড়া করে বিশেষ বিশেষ প্রবন্ধ রচনা করিনি তা নয়। আমার একটি ঘটনার কথা মনে আছে, ১৯৫৭ সালে তখন আমি এই ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র কলেজে পড়াই, সেটা হচ্ছে, সিপাহী বিদ্রোহের শতবর্ষ বছব। তখন গভর্ণমেন্ট থেকে বা ইউনিভার্সিটি থেকে একটা সার্কুলার দিয়েছিল কলেজে কলেজে, ঐ শতবার্ষিকী উৎসব পালন করা হবে। ওখানকার প্রিন্সিপাল আমাকে বলেছিলেন — এখানে একটা অনুষ্ঠান হবে। আপনাকে বলতে হবে বিশদভাবে। আমি সেই সুযোগ তখন গ্রহণ করেছিলাম। তখন যে সমস্ত বই হালে বেবিয়েছিল সুরেশ সেন এর লেখা ১৮৫৭, রমেশ মজুমদারের লেখা — সিপাহী মিউটিনি অ্যাণ্ড বিভোল্ট ১৮৫৭, শশীভূষণ চৌধুরীর সিভিল রেবেলিয়ন ডিউরিং দ্য মিউটিনি তাদের মধ্যে অন্যতম। এইসব বই পড়বার সুযোগ আমার হয়েছিল। তাছাড়া তখন আমার ন্যাশানাল লাইব্রেরীতে যাতায়াতও ছিল। হঠাৎ একদিন একটা বই পেয়ে গেলাম নোটস অন ইণ্ডিয়ান-এর উপর, ১০০ পৃষ্ঠার তো হবেই। বইটিতে লেখকের নাম ছিল না। সেই বই পড়তে পড়তে স্যার টমাস মনরো, যিনি মাদ্রাজের গভর্ণর ছিলেন তার মেমোরাণ্ডাম পড়তে হয়েছিল, এইসব বই পড়তে পড়তে সিপাহী বিদ্রোহের উপর একটা নতুন চিন্তা আমার মনের মধ্যে এসে গেল। সেটা আমি আমার বইতে উল্লেখ করেছিলাম। এবং আমার যারা কলিগ ছিলেন তাঁরা উৎসাহ দেখিয়েছিলেন। মনরো বলতেন, ফ্রী প্রেস এ্যাণ্ড এমপীয়ার ক্যান নট কো-এক্সিস্ট। সুতরাং সিপাহী বিদ্রোহের নেপথ্যে এই যে ফ্রী প্রেস, এটা একটা ফ্যাক্টর হিসাবে ছিল, আমার মনে হয়। এই ব্যাপারে বোধ হয় অনুসন্ধান এখনও হয়নি। অনুসন্ধানের সুযোগ একটা আছে। আরো একটা সময় পড়াশুনা করে আমি প্রবন্ধ রচনা করেছিলাম। সেটা যদুনাথ সরকারের শতবার্ষিকী উৎসবে। যদুনাথ সরকারের ঔরঙ্গজেবের উপর যে পাঁচ ভলিউম গ্রন্থ তা পড়া ছিল, শিবাজীর উপর পড়া ছিল, ডিক্লাইন অফ মোগল এমপায়ার পড়া ছিল, কিন্তু যেটা পড়া ছিল না, ন্যাশানাল লাইব্রেরীতে হাতড়াতে হাতড়াতে এসে গেল, সেটা হচ্ছে,

একটা করসপনডেন্স,. মারাঠা ঐতিহাসিক সরদেশাই এবং যদুনাথ সরকার উভয়ের মধ্যে ৬০০ চিঠি বিনিময় হযেছিল। সেইগুলি ন্যাশানাল লাইব্রেরীতে পাওয়া যায়। ঐগুলির উপর বেস করে আমার রচনাটা দাঁড় করিয়েছিলাম। আপনারা জানেন, মানুষের অন্তরঙ্গ পরিচয় পেতে গেলে চিঠি হচ্ছে, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তাছাড়া আরো একটা বই আছে, যেটা আমি ভুলতে পারিনি। সুযোগ পেলে তার উল্লেখ করি, ইণ্ডিযা থ্রু দি এজেস, সংক্ষিপ্ত ১১৫/১২৩ পৃষ্ঠা হবে। সেই বইটা যদুনাথ সরকারের ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনার যে মূল সূত্র সেটা ঐ বই এর মধ্যে পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ আমি পড়ি। আমি মনে করি ভারতের ইতিহাস, ধর্ম, দর্শন বা অন্যান্য ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথে পড়লে মূল কেন্দ্রে পৌঁছানো যায়। সম্প্রতি দুই দিন আগে 'কালান্তরে' পড়েছিলাম, রবীন্দ্রনাথ মুসলমানদের সম্পর্কে বলেছেন যে, হিন্দু এবং মুসলমান এদের মিলন সম্ভব হচ্ছে না কেন, রাজনৈতিক ঐক্য হতে পারে। কিন্তু রাজনৈতিক ঐক্য তো স্থাযী ঐক্য নয়। সেটা হযত সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন হয়। সামাজিক ঐক্য হচ্ছে আসল ব্যাপার, সেই সামাজিক ঐক্য হতে পারছে না কেন? উনি মূল কথাটা বলেছেন, মুসলমানদের ধর্মটা হচ্ছে অত্যন্ত কঠোর, কোর অফ ইসলাম। কিন্তু তার সামাজিক আচার আচরণ ঐগুলি অত্যন্ত উদার। হিন্দু ধর্মের ঠিক বিপরীত। হিন্দু ধর্মে যে কোর অফ হিন্দুইজম সেটা উদার। কিন্তু হিন্দুদের যে স্টাইল, আচার আচরণ, দৈনন্দিন জীবন-যাপন পদ্ধতি সেটা কিন্তু উদার নয়। সেটা অনুদার। রবীন্দ্রনাথ এই এনসেন্ট হিস্ট্রি অফ ইণ্ডিয়া যাকে আগেকার দিনে হিন্দুযুগ বলা হতো সেটাকে বলেছেন প্রতিক্রিয়ার যুগ। আমি তো বহুদিন প্রাচীন ইতিহাস পড়িয়েছি, কোনদিন তো সাহস করে বলতে পারি না, হিন্দু যুগ হচ্ছে প্রতিক্রিয়ার যুগ। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ১৯৩২ সালে পারিজাতকে লেখা একটা চিঠিতে, তিনি বলেছেন হিন্দু যুগ হচ্ছে প্রতিক্রিয়ার যুগ। কিসের প্রতিক্রিয়া, না তখন ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রবাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য রক্ষাব্যূহ তৈরী করা হয়েছিল। ডিফেন্স মেকানিজম, ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রবাদকে রক্ষা করার জন্য। এই যে কথাটা, এই যে মতটা, এটা কতখানি সত্যি, এটা আজকের ভারতবর্ষের দিকে তাকালে বোঝা যায়। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রবাদ হচ্ছে এখন ভারতবর্ষের সবচেয়ে টার্গেট অব এ্যাটাক, ভারতবর্ষের রাজনীতি নয় কি? রবীন্দ্রনাথ কিন্তু অনেক সময় অনেক কথা বলেছেন, তিনি ঐতিহাসিক ছিলেন না, কিন্তু ঐতিহাসিক প্রজ্ঞা যাকে বলে, সেই প্রজ্ঞার তুলনা পাওয়া যায় না। তিনি বলেছেন, ইংরেজ চলে গেলে ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে না। তিনি বলেছেন, কৃষককে জমি দিলে তার দারিদ্র্য ঘুচবে না। এইসব কথা তিনি বলেছেন এবং এইসব কথা কতখানি সত্য তা আমরা উপলব্ধি করছি।

যাইহোক যে কথাটা আমি আরম্ভ করেছিলাম, আমি তো ইতিহাসের ছাত্র নই, প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের তো নইই, কিন্তু দীর্ঘদিন পড়িয়েছি। দেখা গেল, ইতিহাসের ছাত্র না হয়েও, ইতিহাসের কৃতি অধ্যাপক হওয়া যায়। 'আমার জীবনে এটা দেখেছিলাম এবং প্রেসিডেন্সির মত কলেজে ১০ বছর সুনামের সঙ্গে অধ্যাপনাও করেছিলাম। কতটা সুনাম ছিল সেই সম্বন্ধে একটু বলি। আমি অবসর গ্রহণ করার পরে, ৪ বছর পরে, প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ৩টি ছাত্রী——রজতবাবু তখন হেড অফ দি ডিপার্টমেন্ট, তাঁর চিঠি নিয়ে আমার কাছে এসেছিলেন। রজতবাবু লিখেছিলেন বাংলায়। আপনি এখানে অনেকদিন পড়িয়েছেন সুনামের সঙ্গে, ছাত্রদের ইচ্ছা আমারও ইচ্ছা, আপনি যদি আপনার সুবিধা মত সপ্তাহে একদিন বা দুইদিন এদের সঙ্গে ক্লাস নেন তাহলে আমরা আনন্দিত এবং উপকৃত হবো। তারা বললেন স্যার, আপনাকে আমরা গাড়ী করে নিয়ে যাবো, গাড়ী করে পৌঁছে দেবো ইত্যাদি। আমি বললাম, সবই সত্যি, কিন্তু এর একটা এথিক্যাল দিক আছে। আমি যে পেপারগুলি পড়তাম দুটো পেপার ছিল, একটা হচ্ছে এনসিয়েন্ট ইণ্ডিয়া এবং আর হচ্ছে এথিক্স। আমি তাদেরকে বললাম, তোমরা যাদের কাছে পড়ছো, বোঝা যাচ্ছে তাদের কাছে তোমাদের পড়াটা যথেষ্ট হচ্ছে না। তোমরা সন্তুষ্ট হচ্ছো না। আমি বললাম, আমি তো আউটসাইডার, তাই নয় কি? আমাকে তোমরা যদি নিয়ে গেলে, সেই বিষয়গুলি পড়বার দায়িত্ব দাও তাহলে তাঁদের সম্পর্কে কার্য্যত অনাস্থা প্রকাশ পাচ্ছে। আমি একজন শিক্ষক, একজন শিক্ষক-এর বিরুদ্ধে অনাস্থাসূচক কোন কাজ তো করতে পারি না। কিন্তু আমি রাজী হইনি। এটা আমি যদি এই অবস্থায় থাকতাম, আমি যে পেপারগুলি পড়াচ্ছি, সেখানে বাইরে থেকে যদি একজন লোক নিয়ে এসে সেই দুটো পেপার পড়বার দায়িত্ব দেওয়া হতো তাহলে তো আমি সেখানে সম্মানের সঙ্গে কাজটা করতে পারতাম না। আমি তো সেখানে সরকারকে বলতাম আমাকে অন্য কাজে স্থানান্তরিত করে নাও। যাইহোক আমার এই প্যারাডকসটা আই ক্যান নট রেফার, ইতিহাসের ছাত্র না হয়েও ইতিহাসের মোটামুটি ফল ভাল করা যায়। ইতিহাস সম্পর্কে বই লেখা যায় এবং সেই বই বাজারে সুপরিচালিত হয়. অনেক প্রশংসা করে, এটা তো আমার কাছে প্যারাডকস মনে হয়। এর তো আমি কোন ব্যাখ্যা পাইনা। এটা কি করে সম্ভব।

এবারে আমি বৃত্তির কথা বলব। প্রফেশানের কথা। আমার মনে হয়, আমরা যারা অধ্যাপনা করি, তাদের বৃত্তি সম্বন্ধে শ্রদ্ধা থাকা উচিত। এবং যে কাজটা করছে, সেই কাজটার প্রতি ভালবাসা থাকা উচিত। আমার কাজ করবার সময় দেখেছি, দীর্ঘ ৩৭ বছরে দেখেছি, যে ভাবে কাজ করেছি, এই কাজটা অত্যন্ত

সম্মানের। এটা যে অত্যন্ত শ্রদ্ধার কাজ, সেই বোধ কারো কারো থাকে না। অন্য পাঁচটা কাজের মত অধ্যাপনাটা তারা দেখেছেন। আমি মনে করি অধ্যাপনাটা সবচাইতে শ্রেষ্ঠ বৃত্তি, মহত্তম বৃত্তি। এবং এ সম্বন্ধে আমাদের সচেতন থাকা উচিত। আমাদের উপনিষদে বোধ হয় আছে, শ্রদ্ধেয়া দেয়ং, অশ্রদ্ধেয়া অদেয়ং, সিয়া দেয়ং, রিয়া দেয়ং, সংবিদা দেয়ং। শ্রদ্ধার সঙ্গে দিতে হবে। অশ্রদ্ধার সঙ্গে দিলে চলবে না। অশ্রদ্ধা যা ক্যাটাগোরিকালি বলা আছে, স্থির সঙ্গে দিতে হবে। রিয়া দেয়ং অর্থাৎ লজ্জার সঙ্গে দিতে হবে। সংকোচ-এর সঙ্গে দিতে হবে, ছাত্রদের আমি দিচ্ছি। আমার যদি অহং বোধ না থাকে, আমার যদি অভাববোধ থাকে সব সময় তাদের যে প্রাপ্য দিতে পারছে না, এই সংকোচ যেন থাকে। এই লজ্জাবোধ যেন থাকে। সংবিদা দেয়ং— যা মনে আসছে বলে যাচ্ছি, যা মুখে আসছে বলে যাচ্ছি, এটা ঠিক নয়। কিন্তু এরা অনেক করেন। এটা অত্যন্ত মর্মান্তিক হলেও সত্য বলে আমি দেখেছি।

একজন শিক্ষক তিনি তার প্রাপ্য যা ক্লাসেই পান, মাসের শেষে যা পান সেটা নয়। একজন শিক্ষক যখন অনার্স ক্লাস থেকে ৪৫মিঃ পড়িয়ে মাথা উঁচু করে কৃতজ্ঞ ছাত্রদের সামনে থেকে বেরিয়ে আসেন তখন তিনি যা পান পুরস্কার হিসাবে তখন সেটাই তার আসল পুরস্কার। মাসের শেষে কলেজ থেকে যে টাকা তিনি পান সেটা তার প্রকৃত প্রাপ্য নয়, এটা আমি মনে করি।

যাইহোক ইতিহাস পড়ানো এই কাজটা আমি অন্তত কঠিন বলে মনে করি। কেননা যিনি সাহিত্য পড়ান তার সামনে টেক্সট বই আছে, ইতিহাসে হি ইজ টু ক্রিয়েট সামথিং আউট অফ নাথিং। কোন কিছু নেই, তার মধ্যে থেকে তাকে একটা দুটো ছবি কষতে হয়। একটা কল্পনার জগৎ খুঁজে পেতে হয়, কাজটা খুব সহজ নয়। কাজটা কঠিন। প্রাচীন ইতিহাস হলে কাজটা আরো কঠিন। ধরুন, আগের পিরিয়ডে একটি ছেলে ফরাসী বিপ্লবের উপর ক্লাস করেছে, পরের পিরিয়ডে হয়ত ইন্টারন্যাশানাল বিষয় নিয়ে ক্লাস করবে, মাঝখানে এনসেন্ট ইণ্ডিয়া নিয়ে হয়ত একটা ক্লাস করবে, এই যে গিয়ার চেঞ্জ করে ফরাসী বিপ্লব থেকে এসসেন্ট ইণ্ডিয়াতে নেমে আসা বা ইন্টারন্যাশানাল রিলেশান থেকে এনসেন্ট ইণ্ডিয়া, এনসেন্ট গ্রীসে নেমে আসা অত্যন্ত কঠিন কাজ। শিক্ষকদের পক্ষেও কঠিন, ছাত্রদের পক্ষেও কঠিন। অনেক সময় মনে হয়েছে, এই কাজটা এমনভাবে উপস্থাপিত করতে হবে মনে হবে, অতীত অতীত নয়। প্রায় কনটেমপোরারী বা নিয়ার কনটেমপোরারী— আমার যতদূর মনে হয়, আমি যখন পড়িয়েছি তখন প্রাচীন ভারতের ইতিহাস এইভাবে বুঝিয়েছি।

শিক্ষকদের যেটা দরকার, কিছু মনে করবেন না, পাওয়ার অফ কমিউনিকেশান, আমি যেটা বলব, সেটা যেন এফেকটিভলি বলতে পারি ছাত্রদের, সেটা গ্রহণ করতে যেন কোন অসুবিধা না হয়। [আজকে ইংরাজী থেকে বাংলা হয়ে গেছে, ইণ্ডিয়ানদের তাতে কমিউনিকেশান-এর অসুবিধা কিন্তু কমেনি। এফেকটিভ কমিউনিকেশান তো হওয়া চাই।] ক্লাসে আমি যে কথাটা বলছি, ছাত্রদের যদি পুরোপুরি সেটা গ্রহণ করাতে পারি, ছাত্র এবং শিক্ষকদের মধ্যে যে আদান-প্রদান, শিক্ষক যেটা দিচ্ছেন সেটা যেন যাতায়াতের পথে নষ্ট না হয়ে যায়। এই বিষয়ে আমার আদর্শ শিক্ষক হচ্ছেন সুশোভন সরকার। তিনি এম.এ. ক্লাসে আমাদের কনস্টিটিউশনাল হিস্ট্রী অফ ইংলণ্ড পড়িয়েছিলেন। ক্লাসে যদি মার্জিনাল স্টুডেন্ট থাকতো — কোনরকমে হয়ত সেকেণ্ড ক্লাস নিয়ে বেরবে — সেও পুরোপুরি লেকচারটা ফলো করতে পারতো এবং নোট করতে পারতো। এই হচ্ছে সুশোভনবাবুর পড়ানো। তিনি কখনো রাশিকৃত বই রেফার করতেন না। আমার মনে আমে কন্সটিটিউশনাল হিস্ট্রী অফ ইংল্যাণ্ড, ম্যাকনামারার টেক্সট বই ছিল, এ্যাডামসের এবং ম্যারিয়ট ল্যাঙ্গুয়েজ এই দুইটি বই-এর কথা মাঝে মাঝে বলতেন। এছাড়া চতুর্থ বই-এর নাম তিনি কখনো করতেন না। আর যেটা থাকা দরকার ছাত্রদের প্রতি শিক্ষকদের দরদ থাকা দরকার, সহানুভূতি থাকা দরকার। কিন্তু থাকে না। এই ব্যাপারে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে ৩টি দৃষ্টান্ত দেবো। আপনারা কিছু মনে করবেন না। আমি তখন ঝাড়গ্রামে রাজ কলেজে পড়াই, সেই বছর ১৯৬৪তে আমি সেখানে গিয়েছিলাম, সেই বছর অর্নাস ক্লাস আরম্ভ হয়। অর্নাস ক্লাসে ৪/৫টি ছাত্র পড়ে, তার ২/৩ মাস পরে, আমি ডিসেম্বর মাসে ট্রেনিং নিতে গিয়েছিলাম, একটা মেয়ে পড়তো, সেই মেয়েটি কয়েকদিন ধরে আসছিল না, আমি তাকে ক্লাসের বাইরে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম তুমি আসছো না কেন, সেই মেয়েটি বললো, আমি পারবো না। আমি ইতিমধ্যে মাঝে মাঝে টেস্ট নিয়েছিলাম, আমি তাকে বলেছিলাম, এই ক্লাস থেকে যদি একটা মেয়েও অনার্স পায় তাহলে তুমি পাবে। আমার কাছ থেকে আশ্বাস পেয়ে মেয়েটি ফিরে এল এবং ফিফটি পারসেন্ট নম্বর পেয়ে বেরিয়ে গেল। বড় কলেজ হলে পরে শিক্ষকরা যে উদাসীন হন তার কোন মানে নেই। পাস ক্লাসে পড়া একটা ছাত্র, ক্রুদ্ধ তার চোখমুখ, পেছনের দিকে বেঞ্চে বসে ক্লাস করছে। আমি তাকে বলেছিলাম, তুমি পাস কোর্সে কেন, তুমি অনার্স পড়লে পাস করতে। তারপর সেই ছাত্রটি অনার্স নিয়ে পাশ করেছে, এম.এ. পাস করেছে, ল্ পাস করেছে, এখন শুনছি সে গভর্ণমেন্ট কলেজে প্রফেসারি করছে। একটা ছাত্র সে সেকেণ্ড ইয়ারে টেস্ট পরীক্ষা দিয়েছিল এবং যা নম্বর পেয়েছিল তাতে আমি তাকে এ্যালাউ করিনি। সে তো খুব

কান্নাকাটি করছিল। আমি তাকে বলেছিলাম কান্নাকাটি করে লাভ নেই, যদি অনার্স পড়তে হয় তাহলে এক বছর থাকতে হবে, আর পাস কোর্সে পড়লে এই বছরই দিতে পার। যাই হোক সে অনার্স পড়ল এবং তার পরে সে হায়ার সেকেন্ডারী স্কুলের মাষ্টার হয়েছে। আমাকে খুব আপ্যায়ন করেছিল। শিক্ষকের দাযিত্বটা শুধু ক্লাসের মধ্যে থাকে না, তার বাইরেও কিছু দায়িত্ব থাকে।

আমি যে ইতিহাস পড়েছিলাম, আর এখন যে ইতিহাস পড়ি তা কিন্তু এক নয। আমাদের ইতিহাস ছিল খুব অন্যভাবে। এখন যে ইতিহাস পড়ানো হয় সেখানে কোন ব্যক্তি নেই, এখন সমস্ত ইতিহাস মুন্ডহীন হয়ে গেছে। ২০ বছর আগে আমাব মেয়ে যখন বি. এ. পরীক্ষা দিয়েছে, থার্ড পেপারে মর্ডাণ ইন্ডিয়াতে, ক্লাইভ থেকে কার্জন পর্যন্ত কোন ইংরেজ শাসকের নাম সেখানে নেই। আমরা মাইক্রো ইকনমিক্স ম্যাক্রো ইকনমিক্সের কথা জানি, কিন্তু এখন ইতিহাস ক্রমাগত মাইক্রো হিস্ট্রী হয়ে গেছে, ম্যাক্রো হিস্ট্রী আর থাকছে না।

আমি বিশ্বাস করি, হিস্টোরিকাল থিংকিং ইজ মোর ইমপর্টেন্ট দ্যান হিস্টোরিকাল ফ্যাক্টস। আর আধুনিক ইতিহাসের কাজ শুধু কম্পারিজন অফ ফ্যাকট নয়, জেনারেলাইজেশান। কম্পারিজন অফ ফ্যাকট স্মৃতিকে ভারাক্রান্ত করা। ইতিহাসের একটা কাজ মনকে ইল্যুমিনেট করে করে মনকে আলোকিত করে। এটা ইতিহাসের কাজ বলে অনেকে মনে করেছেন এবং আমিও তাই মনে করি। আমরা এখন ইতিহাসকে দেখছি ডি-হিউমানাইজড্ ডি-পার্সোনালাইজড্ হয়ে গেছে, আমি কিন্তু এটা অভিপ্রেত অবস্থা বলে মনে করিনা।

যার জন্য আজকে আমাকে এখানে আসতে হচ্ছে, খেসারত দিতে হচ্ছে। যার জন্য এখানে আসা সেই বইটার কথা বলি, এই বইটা আমি কোনদিন লিখব এটা ভাবিনি। যখন আমি প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াই, তখন আমাকে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক আমাকে একটা চিঠি দিয়েছিল। প্রেসিডেন্সী কলেজে চাকরী বলে এইসব বইপত্তর লেখা যায় না, তাই আমি চিঠির কোন উত্তরও লিখিনি। তারপর রিটায়ার করার পর আমি যখন ওখানে গেলাম, বললাম যে আপনাকে আমাকে চিঠি দিয়েছিলেন, আমি তখন উত্তর দিইনি। এখন আমি রিটায়ার করেছি। ওরা তারপর আমাকে চিঠি দিলেন, বই লিখতে থাকুন। আমি লিখতে গিয়ে দেখলাম একটা ভল্যুউমে বইটা লেখা সম্ভব নয়, দ্বিতীয় ভল্যুউম লাগবে। বইটা লিখতে আমার সময় লেগেছিল ২১ মাস এবং প্রত্যেকদিন আমি তিন পৃষ্ঠা করে এ্যাভারেজে লিখে ছিলাম। ইন সিজন, আউট অফ সিজন, বাড়ীতে কোন গেস্ট আসলেও আমার লেখা কোনদিন বন্ধ হয়নি। প্রতিদিন আমি

তিন পৃষ্ঠা করে লিখতাম এবং ২১ মাস সময় লেগেছিল, ম্যানুসক্রিপটের প্রত্যেকটি পৃষ্ঠার ৩২টা করে লাইন করে লিখতাম। এর জন্য এক কাপ চা কোন আমি বেশী খাইনি, একটা সিগারেট খাইনি। একটা আরামকেদারায় বসে আমি এই বইটা লিখেছিলাম। বইটা লিখতে গিয়ে, প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে আমার বিদ্যা-বুদ্ধি সব উজাড় করে দিয়েছিলাম, নিজের জন্য কিছুই রাখিনি। যা জেনেছিলাম, যা বুঝেছিলাম সব উজড করে দিয়েছিলাম। সর্বশেষে আমি রবীন্দ্রনাথের কথা বলি—দিয়েছি উজাড় করি, যাহা কিছু আছিল দিবাব, প্রতিদানে যদি কিছু পাই, কিন্তু স্নেহ, কিছু ক্ষমা তাই সঙ্গে নিয়ে যাই।

আমার যা বক্তব্য তার প্রথম অংশ হয়ে গিয়েছে। আপনাদের যদি ধৈর্য্য থাকে তাহলে আমি বলব এই লেখাটা সম্পর্কে, টীচিং অফ হিস্টোরি ইন আওয়ার স্কুল এন্ড কলেজেস। এই বিষয়ে আমি একটা প্রবন্ধ লিখেছিলাম ১৯৬১ সালে হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডে। আপনারা জানেন খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠা এবং শেষের পৃষ্ঠা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেই শেষের পৃষ্ঠায় কোন একটি রবিবার তৃতীয় কলমে হেড লাইন দিযে লেখাটা বেরিয়েছিল। সেটা বড় কথা নয়, এর সাথে আমাব একটা স্মৃতি জড়িত। অর্দ্ধেন্দু গাঙ্গুলি, যিনি একজন শিল্পরসিক মানুষ, যাকে সংক্ষেপে ও.সি. গাঙ্গুলী বলা হয়, তার লেখাটা এত ভালো লেগেছিল যে, হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড থেকে ঠিকানা সংগ্রহ করে—আমি তখন কৃষ্ণনগর কলেজে পড়াই— ফুলস্কেপ কাগজে টাইপ করে আমাকে চিঠি লিখেছিলেন, আপনি যেসব কথা বলেছেন তা কেউ বলে না। এর আগে কেউ বলেনি।

আমি ১৯৬১ সালে যেটা লিখেছিলাম তার বাংলা অনুবাদ পরে আনন্দবাজারে বেরোয়। ১৯৬১ সালে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ইতিহাসের ছাত্র-ছাত্রী ফেল করেছিল খুব বেশী, খুব কম নম্বর পেয়েছিল। কেন এইরকম হল এই চিন্তা করতে গিয়ে যেসব কথা বলেছিলাম, সেই কথাগুলো আমি নিবন্ধের মধ্যে লিখেছিলাম। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এই কথা লেখা হয়েছে, যারা এই বিষয় অনুসন্ধানের জন্য একটা কমিশন বসাতে বলে বিষয়টা ধামাচাপা দিতে চান, তাদের দলে এই লেখক নন। যদি কোন ইতিহাসের শিক্ষক তার স্মৃতিকে সামান্য নাড়া দেন স্কুল অথবা কলেজে তাকে ইতিহাস কিভাবে পড়ানো হয়েছিল, তাহলেই তিনি কয়েকটি স্পষ্ট কারণ সন্ধান দিতে পারবেন। স্কুলে ইতিহাস পড়ানোর অধিকার যে কোন শিক্ষকের ছিল। আর ইতিহাস পড়ানো বলতে নির্দিষ্ট একটি পাঠ্য বই থেকে কয়টি পৃষ্ঠা পড়ানো বোঝাত। বিষয়টা সম্পর্কে আগ্রহের চেষ্টা সেখানে ছিল না। কেউ কেউ বলবেন যে অধুনা অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটানো যে কখনো সম্ভব নয় এই কথা সকলেই স্বীকার

করবেন। ইতিহাসের অধ্যাপনা এখনো বেশ উপেক্ষিত। স্কুলে দিনের শেষে ছাত্র, শিক্ষক উভয়েই যখন ক্লান্ত, তখন ইতিহাসের ক্লাস থাকে। স্বাভাবিকভাবেই ছাত্রর স্মৃতিকে বেশীমাত্রায় পীড়িত করে। ইতিহাসের বিভিন্ন রূপ কদাচিৎ তুলে ধরা হয়। এই কথা হয়ত কেউ অস্বীকার করবেন না, স্কুল-কলেজের পাঠ্য বিষয়গুলির মধ্যে যে কয়েকটি বিষয় সহজেই নম্বর বাড়াতে পারবে ইতিহাস তাদের মধ্যে একটি। টমাস মনরো লিখেছেন, এই পর্যন্ত তথ্য সম্পর্কে যত বই প্রকাশিত হয়েছে, তার তুলনায় ইতিহাসের কয়েকটি মাত্র পৃষ্ঠা মানবমন সম্পর্কে অধিকতর অন্তর্দৃষ্টি, অধিকতর গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু গ্রহণযোগ্য ভাবে পড়ানো হয় না বলে ইতিহাসের মত মহৎ ও সঞ্জিবনী বস্তু ছাত্রগণকে ক্লান্ত করে। অধ্যাপনার একটা বিষয় হিসাবে কেউ ইতিহাস গ্রহণ করে। তার কারণ এই নয়, স্কুলে ইতিহাস পড়েছিল এবং সেটা তার ভালো লেগেছিল। তার কারণ ইতিহাসে সহজেই পাসের নম্বর পাওয়ার সম্ভাবনা। কলেজের ইতিহাসের ক্লাসে বসে সেই ছাত্রটা স্কুল থেকে যে বিষন্নতা সঞ্চয় করে এনেছিল তাই পীড়ন করে। ছাত্রটির সামনে প্রত্যহ যে নাটক অভিনীত হয়, ছাত্রটি তার নিস্পৃহ দর্শকের ভূমিকা নেয়। মাঝে মাঝে সে জড়তা কাটিয়ে উঠে শিক্ষকের সঙ্গে পরবর্ত্তী পরীক্ষা নিয়ে দর কষাকষি করে। কিন্তু ইতিহাসের উত্থান-পতন জনিত আনন্দতে অংশগ্রহণ করে সে, অথবা মহাকালের ধূসর ছায়া বীথির মধ্যে দিয়ে দৃষ্টি সম্প্রসারনে রোমাঞ্চ অনুভব করতে সে পারে না। এইভাবেই ইতিহাসের ক্লাসে একটা ছাত্রকে নিস্পৃহ দেখায়, শিক্ষককে অন্যরকম দেখায় না। সম্প্রতি স্কুলে কিছু যোগ্য শিক্ষক, কিছু যোগ্য অধ্যাপক ইতিহাসের আছে। স্কুলে ইতিহাসের যোগ্যতার মাপকাঠি দ্বিতীয় শ্রেণী, আর কলেজে দ্বিতীয় শ্রেণী মাস্টারডিগ্রী যোগ্যতা যথেষ্ট মনে হলেও প্রকৃত তা নয়। যারা জুতো ব্যবহার করেন, তার কাঁটা কোথায় তাঁর চেয়ে কেউ ভালো জানেন না। শিক্ষকের ত্রুটি কোথায় সেটা তাঁরাই বেশী জানেন। সম্প্রতি ইতিহাসের দিগন্ত প্রসারিত হয়েছে। ইতিহাস এখন আর রাষ্ট্র বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, বিভিন্ন মানব গোষ্ঠী, সমাজ অর্থনীতি, শিল্প, ধর্ম, দন্দ্ব, দর্শন, সাহিত্য, এই বিষয়গুলো ইতিহাসের দিকে ঝুঁকেছে। এই বিষয়গুলো ধীরে ধীরে ইতিহাসের গন্ডির মধ্যে আসছে এবং তার চেয়ে বড় কথা তার মধ্যে থাকবে। ইতিহাস এখন এক বিচিত্রবর্ণ মৃৎ পাত্রের মত। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, ইতিহাসের একজন শিক্ষককে সমাজ সম্পর্কে বলতে হয়, ভারতীয় দর্শনের ছাত্র না হয়েও বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম, দর্শন বিষয়ে বক্তৃতা করতে হয়, চারুশিল্পের সঙ্গে সম্পর্ক না থাকলেও, ভারতীয় ইতিহাসের বিভিন্ন জায়গায় উল্লেখযোগ্য শিল্পকর্মর নির্দশন হিসাবে বলতে হয়। যাঁরা ভারতের ইতিহাস পড়ান তাঁদেরই এই অনিশ্চয়তার

চোরাবালিতে পা দিতে হয় তা নয়, যাঁরা অন্য দেশের ইতিহাস পড়ান তাঁরাও একই কথা বলবেন।

এই কথা বললে বোধহয় অন্যায় হবে না, যে কম সংখ্যক শিক্ষকই অনুরূপ বিষয়গুলি আলোচনার সময় স্বস্তি অনুভব করে। কিন্তু তাদের বৎসরের অনেকগুলি দিনই এই আলোচনায় কাটতে হয়। এইকথা সত্যিই, ইতিহাসের বিভিন্ন দিকের জন্য বিভিন্ন শিক্ষক নিয়োগ কখনোই সম্ভব হবে না। এইকথা সত্যি যে ইচ্ছা থাকলেও ইতিহাসের কোন অধ্যাপক ভারতীয় দর্শন বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞান আয়ত্ত করতে পারবেন না। শিল্পের বিভিন্ন শাখা স্থাপত্য, ভাস্কর্য এবং চিত্র সম্পর্কে একই কথা। এই শিল্প রসগ্রহণের জন্য শিল্প কার্য্যগুলো নিদর্শন করা প্রয়োজন। সাধারণ ইতিহাসের একজন শিক্ষক যখন সারনাথের অশোকস্তম্ভ, দিল্লীর লৌহস্তম্ভ, নালন্দার ধ্বংসাবশেষ অথবা উপেক্ষিত নগরী ফতেপুর-সিক্রী সম্পর্কে বলেন, তখন তাঁর চোখ দুটি চকচক করে না। বস্তু সম্পর্কে তার জ্ঞান থাকলে কিন্তু অবস্থা অন্যরকম হত। তাহলে দেখা যায় যে ইতিহাস শিক্ষকতায় বাধা অনেক। ইতিহাসের ছাত্রের জন্য পালি, ফারসী এবং ইওরোপের ইতিহাসের ছাত্রের জন্য লাতিন ও ফারসী ভাষা শিক্ষা এম.এ. ক্লাশের ইতিহাস পাঠের অপরিহার্য্য অঙ্গ হওয়া উচিত বলে মনেকরি। ইতিহাসের সকল অধ্যাপকের জন্য চারুশিল্পে স্বল্পকালীন শিক্ষালাভ একান্ত প্রয়োজন। কেননা বিশেষ করে এই ক্ষেত্রে তাঁদের অজ্ঞতা পরিমাপ করতে তিনি নিজে ভয় পান। একটা মন্দির, মসজিদ বা গীর্জার সামনে তিনি একান্ত অসহায়ভাবে তাকিয়ে থাকেন। সিন্ধু উপত্যকায় প্রাপ্ত ব্রোঞ্জের মূর্ত্তি, অথবা হিউয়েন সাঙ আবিষ্কৃত নালন্দায় প্রাপ্ত ৮০ ফুট উঁচু বুদ্ধমূর্ত্তির যে ভাষা সেই ভাষা তিনি জানেন না। এই অজ্ঞতা শিক্ষক হিসাবে তাকে পঙ্গু করে। ইতিহাস পাঠক্রমে এইভাবে বৈচিত্র্য আনলে এই বিষয়ে একজন এম.এ. যতটা ইতিহাস জানেন বলে মনে করেন, তার চেয়ে কম জানবেন না। কিন্তু ভাষা আলোচনার সময় অধিকতর স্বাধীনতা ভোগ করবেন। যতদূর জানি, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ছাত্রের শিক্ষার সমাপ্তি ঘটানো নয়, উচ্চশিক্ষায় তাদের প্রতিষ্ঠা করা।

‘মধ্যযুগের ভারত’ শাখার সভাপতির অভিভাষণ

সুখময় মুখোপাধ্যায়

আপনারা আমাকে এই অধিবেশনের ‘মধ্যযুগের ভারত’ শাখার সভাপতি মনোনীত করে এক দুর্লভ সম্মানের অধিকারী করেছেন।

‘মধ্যযুগ’ শব্দটি সম্বন্ধে আমার কিছু আপত্তি আছে। ইউরোপীয় ঐতিহাসিকরা তাঁদের দেশের ইতিহাসের মধ্যযুগের সমাপ্তি পঞ্চদশ শতকের শেষ পাদে হয়েছিল বলে সিদ্ধান্ত করেছেন; কিন্তু তাঁরাই আবাব আমাদের ইতিহাসের মধ্যযুগের জের টেনেছেন অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্যন্ত। কিন্তু ষোড়শ-সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে আমাদের সভ্যতা যে ইউরোপীয়দের তুলনার সাংঘাতিক রকম পিছিয়ে ছিল, তা স্বীকার করা যায় না। আসলে এদেশের হিন্দু-বৌদ্ধ যুগ প্রাচীন যুগ, মুসলিম যুগ মধ্যযুগ এবং ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরবর্তী যুগ আধুনিক, এই স্থূল ও বৈষম্যমূলক যুগবিভাগ ইউরোপীযরা করে গিয়েছেন এবং আমরাও বিনা বাক্য ব্যয়ে তাকে অনুসরণ করছি।

যাহোক, এ সম্বন্ধে আর আলোচনা না করে এই বিশেষ যুগের ইতিহাসের দু’একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক সম্বন্ধে আলোচনা করব। আমি যেহেতু বাংলার ইতিহাসের চর্চা করি, তাই বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধেই বলব।

কিন্তু এ-যুগের বাংলার ইতিহাসের সব কথা কি জানা গিয়েছে? যায়নি। তার প্রধান কারণ সূত্র বা Source— এর অপ্রাচুর্য। মোগল (আমি ‘মুঘল’ শব্দ ব্যবহারের পক্ষপাতী নই; এ সম্বন্ধে ‘বাংলায় মুসলিম অধিকারের আদি পর্ব’ বই-এর ভূমিকায় আলোচনা করেছি) আমলের ইতিহাস রচনার কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ সূত্র অবশ্য পাওয়া যায়; তাও রাজনৈতিক ইতিহাস সংক্রান্ত সূত্র। কিন্তু তার আগেকার রাজনৈতিক ইতিহাস এবং গোটা “মধ্যযুগে”র সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনার সূত্র খুব কমই মেলে।

কিন্তু তা বলে হাল ছাড়লে তো চলবে না। যেখানে যেটুকু খুদকুঁড়ো পাওয়া যায়, তাকে খুঁটে খুঁটে সংগ্রহ করে তার থেকে তথ্য সংগ্রহ করার চেষ্টা করতে হবে।

সেই চেষ্টা ইতিপূর্বে করেছেন কোন কোন ঐতিহাসিক। তাঁদের প্রযাস শ্রদ্ধা পাবার যোগ্য। কিন্তু অল্পস্বল্প এই যে সব সূত্র পাওয়া গিয়েছে, তাদের বিশ্লেষণের বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি যথাযথভাবে অনুসৃত হয়েছে ও হচ্ছে কিনা, তা বিচার্য বিষয। এখন এ সম্বন্ধে আলোচনা করছি।

বখতিযাব খলজী থেকে সুরু করে ইজ্জুদ্দীন বলবন ইউজবকী পর্যন্ত বাংলার মুসলিম শাসকদের সম্বন্ধে বিবরণ মেলে মীনহাজ-ই-সিরাজের 'তবকাৎ-ই-নাসিরী'তে। কযেকজন শাসকের শিলালিপি ও মুদ্রাও পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এইসব শাসকদের, বিশেষত বখতিয়ার খলজী সম্বন্ধে কোন কোন ঐতিহাসিক এমন সব অভিমত ব্যক্ত করেছেন, যা মোটেই জোরালো নয।

এই সব মতের কযেকটি নীচে উল্লিখিত হল,

(ক) বখতিযাব যে 'বায লখমনিযা'কে পর্যুদস্ত করেছিলেন, তিনি লক্ষ্মণ সেন নন—লাক্ষ্মণেয—লক্ষ্মণ সেনের পুত্র।

(খ) বখতিয়াবের বিবরণে উল্লিখিত 'নওদীহ্' বা 'নোদীযহ্' নবদ্বীপ বা নদীয়ার সঙ্গে অভিন্ন, কিন্তু এটি লক্ষ্মণ সেনেব রাজধানী ছিল না, ছিল একটি শুল্ক আদায়ের ঘাঁটি এবং এখানে কেবল কাঁচা বাড়ি ও বাঁশের প্রাচীর ছিল।

(গ) বিহার জযের পরে বখতিয়ার বদাউনে কুৎবুদ্দীন আইবকের সঙ্গে দেখা করে হাতী, রত্ন ও অর্থ উপহার দেন বলে 'তবকাৎ-ই-নাসিরী' এবং প্রাচীনতব গ্রন্থ 'তাজ-উল-মাসির' থেকে জানা যায়। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে বখতিয়ার দুবার বদাউনে কুৎবুদ্দীনের সঙ্গে দেখা করেন ও হাতী প্রভৃতি উপহার দেন, একবার নদীয়া জয়ের (যা বিহার জয়ের পর বছর ঘটেছিল) আগে এবং দ্বিতীয়বার নদীয়া জয়ের পরে। এঁরা আরও বলেন যে, নদীয়া জয় করার পর বখতিয়ার তা বিনা যুদ্ধেই ছেড়ে দেন। পরে মুগীসুদ্দীন ইউজবক শাহ তা মুসলিম অধিকারের অন্তর্ভুক্ত করেন।

(ঘ) 'নওদীহ' বা 'নোদীয়হ্' আসলে নদীয়া নয়, উত্তরবঙ্গের 'নওদা' নামক একটি স্থান।

আমরা 'বাংলায় মুসলিম অধিকারের আদি পর্ব' বইয়ে এই সব মত নিয়ে আলোচনা করে এগুলি খন্ডনের চেষ্টা করেছি। এখানে আর একটি বিষয়ের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

মীনহাজ-ই-সিরাজের 'তবকাৎ-ই-নাসিরী'তে লেখা আছে যে বখতিয়ার যখন আকস্মিক আক্রমণ চালিয়ে রায় লখমনিয়া বা রাজা লক্ষ্মণ সেনের প্রাসাদে

ঢুকে পড়েন, তখন মধ্যাহ্নভোজনরত লক্ষ্মণ সেন "খালি পায়ে প্রাসাদের পিছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে গেলেন" এবং "সঙ্কনৎ ও বঙ্গ অভিমুখে গেলেন"। পালাবার সময়ে লক্ষ্মণ সেন কোন্ ধরনের যানবাহন ব্যবহার করেছিলেন—সে সম্বন্ধে মীনহাজ কিছু লেখেননি। অধিকাংশ লোকেই মনে করেন যে লক্ষ্মণ সেন নৌকায় চড়ে পালিয়েছিলেন। তাঁরা কি একবারও উপলব্ধি করেন যে তাঁরা এক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনার দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছেন? লক্ষ্মণ সেনের নৌকায় চড়ে পালাবার কথা বঙ্কিমচন্দ্র 'মৃণালিনী' বইয়ে লিখেছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে তাঁর কল্পনা অসঙ্গত ও প্রায় অসম্ভব। কারণ, নৌকা অত্যন্ত শ্লথগতি যান; বখতিয়ারের নিজস্ব নৌকা না থাকলেও তাঁর লোকেরা ভয় দেখিয়ে অন্য নৌকা সংগ্রহ করে গৌড়েশ্বরের অনুসরণ করতে পারত এবং বর্শা ছুঁড়ে লক্ষ্মণ সেন ও তাঁর লোকদের আঘাত করতে পারত। লক্ষ্মণ সেন ঘোড়ায় চড়ে পালিয়েছিলেন মনে করাই সঙ্গত, বৃদ্ধ হলেও তিনি নিশ্চয়ই ঘোড়ায় চড়তে পারতেন। প্রশ্ন উঠতে পারে, ঘোড়ায় চড়ে তিনি 'বঙ্গ' অর্থাৎ পূর্ববঙ্গে যাবেন কী করে? কিন্তু নদীয়া থেকে বখতিয়ার সরাসরি পূর্ববঙ্গে গিয়েছিলেন, একথা মীনহাজ লেখেননি— তিনি লিখেছেন যে, লক্ষ্মণ সেন 'সঙ্কনৎ' ও 'বঙ্গ' অভিমুখে গিয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর অনুবর্তীরা (যাঁদের মধ্যে কিছু ঐতিহাসিকও আছেন) 'সঙ্কনৎ' শব্দটিকে লক্ষ না করে কেবল 'বঙ্গ'কে লক্ষ করেছেন বলে ভ্রমে পতিত হয়েছেন। 'সঙ্কনৎ' নিঃসন্দেহে পশ্চিমবঙ্গেই অবস্থিত ছিল। অনেকের মতে এই স্থান নদীয়ার খানিকটা দক্ষিণে অবস্থিত ছিল এবং "সংকটে গ্রাম", "সাঁকটিগড়" (এখনকার নাম 'শক্তিগড়') প্রভৃতি স্থান তার স্মৃতি বহন করছে। লক্ষ্মণ সেন প্রথমে সঙ্কনতে যান এবং পরে ধীরে সুস্থে পূর্ববঙ্গে গমন করেন বলে মনে করা যেতে পারে।

ইজ্জুদ্দীন বলবন ইউজবকীর শাসন অবসানের পর কয়েক বছরের ঘটনা কোন ইতিহাসগ্রন্থে পাই না। তার পরবর্তী কয়েক দশকের ঘটনাবলীর বিবরণ খুব ছাড়া ছাড়া ভাবে পাই জিয়াউদ্দীন বারনির 'তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী' বইয়ে। কিন্তু বারনি এই পর্বের প্রথম দিকে নিতান্ত শিশু ছিলেন, তাছাড়া তিনি কোনদিন বাংলায় আসেননি। কাজেই মীনহাজ-ই-সিরাজের বিবরণের মত তাঁর বিবরণের স্বতঃসিদ্ধ প্রামাণিকতা নেই। তা সত্ত্বেও অধিকাংশ ঐতিহাসিক বারনির উক্তিকেই প্রায় সর্বত্র গ্রহণ করেছেন। তাঁদের উচিত ছিল বারনির বিবরণ এবং অন্যান্য বিবরণের তুলনামূলক বিচার করে সত্য নির্ধারণের চেষ্টা করা এবং কোন ঘটনার ক্ষেত্রে প্রামাণিক বিবরণ পাওয়া গেলে তাকেই গ্রহণ করা। কিন্তু এই নীতি যে পালিত হয়নি, তার দু'টি উদাহরণ দিচ্ছি।

(১) বলবনেব রাজত্বকালে বাংলার তুগরল খানের বিদ্রোহ ও তারা পরিণতি সম্বন্ধে বারনির 'তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী' এবং য়াহিআ বিন সিরহিন্দীর 'তারিখ-ই-মুবারক শাহী' উভয় গ্রন্থেই বিস্তৃত বিবরণ মেলে। 'তারিখ-ই-মুবারক শাহী' বারনির বইয়ের কয়েক দশক পরে রচিত হলেও তাব লেখক যে খুব সাবধানী লোক ছিলেন এবং অনেক দলিল-দস্তাবেজ ব্যবহার করেছিলেন, তার প্রমাণ মেলে। কোন কোন বিষয়ে তিনিই সঠিক সংবাদ দিযেছেন; যেমন তিনি লিখেছেন যে, স্বাধীনতা ঘোষণা করে তুগরল 'মুইজ্জুদ্দীন' নাম নেন—তুগরলের নবাবিষ্কৃত মুদ্রা থেকে তাঁর কথা সঠিক বলে প্রমাণিত হচ্ছে; বারনির মতে তুগরল 'মুগীসুদ্দীন' নাম নিযেছিলেন, এ কথা ভুল। যাহোক, আলোচ্য ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের উচিত ছিল বারনি ও য়াহিআ বিন সিরহিন্দীর বিবরণ পৃথকভাবে উদ্ধৃত করে তুলনামূলক বিচার ও সতর্ক বিশ্লেষণের মধ্য দিযে তথ্য নির্ধাবণ করা। কিন্তু অধিকাংশ ঐতিহাসিক বারনির বিবরণকেই যথার্থ বলে মনে করেছেন, কেউ কেউ আবার বারনি ও যাহিআ বিন সিরহিন্দীর বিবরণকে যথেচ্ছভাবে মিশিয়েছেন।

(২) বাংলার শাসনকর্তা—বলবনের পুত্র—বুগবা খান এবং তাঁর পুত্র দিল্লীর সম্রাট কায়কোবাদের সরযূ নদীর তীরে মিলন সম্বন্ধে প্রামাণিক বর্ণনা লিপিবদ্ধ কবেছেন ঐ মিলনের প্রত্যক্ষদর্শী আমীর খুসরু তাঁর 'কিরান ই-সদাইন' বইয়ে; তাঁর বিবরণের একটি সুন্দর সংক্ষিপ্তসার JASB, 1860, pp.225-39-এ প্রকাশিত হয়েছিল। সুতরাং এই ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের আমীর খুসরুর বিবরণের উপরই সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করা উচিত ছিল। কিন্তু তা না করে তাঁরা পরবর্তী বিবরণগুলিকেও (যেমন ইসমির 'ফতুহ-উস্-সলাতীন') অযথা ব্যবহার করেছেন। আমীর খুসরুর 'ফতেহনামা'তে প্রদত্ত বঙ্গাভিযান শেষ করে বলবনের দিল্লীতে ফেরার তারিখ (৫ শওয়াল, ৬৮০ হিঃ) সম্বন্ধেও তাঁরা অবহিত নন।

চতুর্দশ শতাব্দীর সপ্তম দশক থেকে বাংলার সঙ্গে দিল্লীর সংযোগ একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ফলে, এরপর প্রায় দেড়শো বছর দিল্লীর ঐতিহাসিকেরা (বেশির ভাগ ইতিহাসগ্রন্থ এঁদেরই লেখা) বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস সম্বন্ধে কোন আলোকপাত করেননি। এই পর্বের বাংলার ইতিহাস রচনার জন্য তাই আমাদের মুদ্রা, শিলালিপি, সমসাময়িক সাহিত্য ও অন্যান্য কিছু সূত্র থেকে খুঁটে খুঁটে তথ্য সংগ্রহ করে সতর্কভাবে তা বিশ্লেষণ করতে হয়। এই সতর্কতার পরিচয় অনেকেই দেননি। এরও কিছু নিদর্শন দিচ্ছি।

(১) বাংলার সুলতান গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ্ একটি গজলের প্রথম কলি লিখে ইরানে কবি হাফেজের কাছে পাঠান এবং হাফেজ গজলটি সম্পূর্ণ

করেন——এ কথা 'আইন-ই-আকবরী' ও 'রিয়াজ-উস্-সলাতীন'-এ পাওয়া যায়। গজলটি হাফিজের বন্ধু গুল-অন্দাম সংকলিত 'দিওয়ান-ই-হাফিজে' মেলে এবং তাতে গিয়াসুদ্দীনের ও বাঙ্গালের উল্লেখ রয়েছে। তা সত্ত্বেও কেউ কেউ এই গিয়াসুদ্দীনকে বাহমনীর সুলতান বলেছেন, কেউ কেউ আবার তাঁকে হিরাটের রাজপুত্র গিয়াসুদ্দীন পীর আলীর সঙ্গে অভিন্ন বলে ধরেছেন।

(২) ইলিয়াস শাহী বংশের চতুর্থ সুলতান সৈফুদ্দীন হমজা শাহের পর যিনি সুলতান হন, সেই শিহাবুদ্দীন বায়াজিদ শাহ সৈফুদ্দীনের ক্রীতদাস ছিলেন বলে সমসাময়িক গ্রন্থকার ইব্‌ন্-ই-হজরের লেখা থেকে প্রামাণিকভাবে জানা যায়; বুকাননের বিবরণেও একথা লেখা আছে। তা সত্ত্বেও শিহাবুদ্দীন বাযাজিদ শাহ ও তাঁর পুত্র আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহকে এখনও ইলিয়াস শাহী বংশের লোক বলা হচ্ছে।

(৩) রাজা গণেশ সম্বন্ধে 'রিয়াজ-উস্-সলাতীন' এর বিবরণ সমসাময়িক দরবেশ আশরক সিমনানী ও নূর কুৎব আলমের চিঠি, সমসাময়িক গ্রন্থ 'সঙ্গীতশিরোমণি' এবং মুদ্রার সাক্ষ্য দ্বারা সমর্থিত। তা সত্ত্বেও কেউ কেউ এখনও 'রিয়াজ'-এর বিবরণকে অপ্রামাণিক বলছেন।

(৪) রাজা গণেশের পৌত্রের হত্যাকারী নাসির খান এবং সুলতান নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মূদ শাহ অভিন্ন বলে বুকানন লিখেছেন; কিন্তু অন্য কয়েকটি গ্রন্থের মতে ঐ সুলতান ইলিয়াস শাহের বংশধর; শেষোক্ত মতের উপর নির্ভর করে নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মূদ শাহের বংশকে 'পরবর্তী ইলিয়াস শাহী বংশ' বলা হচ্ছে; যদিও বুকাননের ভিন্নমুখী উক্তির দরুন——সব দিক রক্ষা করে এই বংশকে 'মাহ্‌মূদ শাহী বংশ' বলা উচিত।

(৫) হোসেন শাহের রাজধানী একডালা গৌড় নগরের পাশে গঙ্গার তীরে অবস্থিত ছিল বলে 'রিয়াজ-উস্-সলাতীন'-এ লেখা আছে; সমসাময়িক চৈতন্যচরিতগ্রন্থ থেকে এই উক্তির যাথার্থ্য প্রমাণিত হয়। তা সত্ত্বেও কোন কোন লেখক এখনও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার একডালার সঙ্গে এই একডালার অভিন্নতা ঘোষণা করে যাচ্ছেন।

(৬) হিস্ট্রি অব বেঙ্গল ভল্যুম-২কে অনুসরণ করে বহু লেখক লিখে থাকেন যে পুরন্দর খান নামে হোসেন শাহের একজন উজীর ছিলেন। কিন্তু এই পুরন্দর খান কাল্পনিক ব্যক্তি। কোন প্রামাণিক সূত্রে তাঁর নাম মেলে না। প্রসঙ্গত বলা যায়, Historyl of Bengal, Vol. II-র সংশ্লিষ্ট অংশের লেখক এ.বি.এম. হবিবুল্লাহ্ বহু স্থানে অসতর্কতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর অসতর্কতার আর একটি নিদর্শন বিজয় গুপ্ত ও ছোট বিদ্যাপতিকে অভিন্ন বলা।

(৭) বাবর ও নসরৎ শাহের সংঘর্ষ সম্বন্ধে প্রায় সকলেই বাবরের নিজের কোলে ঝোল টানা উক্তিকে সম্পূর্ণ সত্য বলে মনে করছেন। নসরৎ শাহের স্বপক্ষে যে-সব কথা বলবার আছে, সেগুলি তাঁদের কাছে আমল পাচ্ছে না।

ইচ্ছা করলে এই দৃষ্টান্তের তালিকা আরও বাড়ানো যায়। কিন্তু তার প্রয়োজন নেই।

কেউ কেউ বলতে পারেন যে বিভিন্ন বিষয়ে মতভেদের অবকাশ আছে। হ্যাঁ, তা আছে। তবে কতকগুলি স্থূল সত্যও আছে। যেমন, মোটর গাড়ি গরুর গাড়ির চেয়ে জোরে যায়— এটা স্থূল সত্য, এখানে মতভেদের কোন স্থান নেই। উপরে যে দৃষ্টান্তগুলি দেওয়া হয়, তাদের মধ্যে এই জাতীয় স্থূল সত্যকে স্বেচ্ছায় বা অসাবধানতাবশত লঙ্ঘন করা হয়েছে।

এখন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের প্রসঙ্গে আসছি। এখানে আরও গণ্ডগোল। ইতিহাস রচনার উপকরণ প্রায় পাওয়াই যায় না। ১২০৪ থেকে ১৩৩৮ খ্রীঃ পর্যন্ত সময়টাকে তো প্রায় অন্ধকার যুগ বলা চলে। এই পর্বের বাংলা সম্বন্ধে যৎসামান্য বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন মার্কো পোলো, বসিদুদ্দীন এবং চীনা গ্রন্থকার হাও-জু-কুআ ('চু ফ্যান-চে'র লেখক)। এঁদের বিবরণ এতই সংক্ষিপ্ত যে তা খুব একটা কাজে লাগে না। তার উপর এঁরা কোনদিন এ দেশে আসেননি। বিহারের কয়েকজন সমসাময়িক দরবেশের আলাপ-আলোচনা ও চিঠিপত্র তাঁদের শিষ্যদের দ্বারা সংগৃহীত হয়েছে, তাদের মধ্য থেকে বিহার সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা গেলেও বাংলা সম্বন্ধে অল্পই তথ্য মেলে। এই পর্বের শিলালিপি সংখ্যায় কম: তাদের থেকে কিছু তথ্য পাওয়া যায়, তবে সে-সব তথ্যের বেশির ভাগই তৎকালীন শাসনব্যবস্থা ও সামরিক ব্যবস্থা সম্বন্ধীয়। ১৩৩৮ থেকে ১৫৩৮ খ্রীঃ পর্যন্ত একটানা দু'শো বছর এ দেশে ছিল স্বাধীন সুলতানদের আমল। এই পর্বে অনেক বিদেশী বাংলায় এসে এ দেশের বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। সেগুলি আমার 'বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর' বইয়ের একাদশ অধ্যায়ে সম্পূর্ণভাবে উদ্ধৃত করেছি। এগুলি খুবই মূল্যবান। কিন্তু এদের প্রতিটি উক্তিকে চোখ বুজে সত্য বলে গ্রহণ করলে আমরা ঠকব। যেমন ১৪১৫ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার রাজসভায় আগত চীনা রাজপ্রতিনিধি ফেই-শিনের 'শিং-ছা-শ্যং'-লান' গ্রন্থের এই উক্তিটি—

"এখানে এক সম্প্রদায়ের লোক আছে, তাদের নাম য়িন্-তু (হিন্দু)। তারা গরুর মাংস খায় না এবং তাদের পুরুষ এবং স্ত্রীলোকেরা এক জায়গায় বসে খাওয়াদাওয়া করে না। স্বামীর মৃত্যু হলে স্ত্রী আর দ্বিতীয়বার বিবাহ করে না, তেমনি স্ত্রীর মৃত্যু হলে স্বামীও আর দ্বিতীয়বার বিবাহ করে না।" (বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর, ৪র্থ সং, পৃ. ৫০৬)

এই উক্তির আর সব কথা সত্য হলেও, এর শেষাংশ, অর্থাৎ স্ত্রীর মৃত্যু হলে স্বামী অবিবাহিত থাকত— একথা সত্য হওয়া অসম্ভব। মনে হয়, ফেই-শিন তাঁর সংবাদ-সরবরাহকারীর ভাষা ভাল বুঝতে পারেননি বলে এরকম লিখেছেন।

এবার একটি অন্য ধরনের দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। পর্তুগীজ পর্যটক বারবোসা ১৫১৪ খ্রীঃ-র মত সময়ে এদেশে এসেছিলেন। তিনি এদেশের যে বিবরণ লিখেছেন, তার এক জায়গায় আছে,

"এই দেশে নানারকমের মদ তৈরী হয়, প্রধানত চিনি আর তালগাছ থেকেই তা তৈরী হয়, এছাড়া অন্য অনেক জিনিস থেকেও হয়। স্ত্রীলোকেরা এই সব মদ খুব ভালবাসে, এতেই তারা অভ্যস্ত।" (বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর, ৪র্থ সং, পৃ. ৫২২)

তা হলে কি ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এদেশের নারীরা ব্যাপকভাবে মদ্যপান করত? এ রকম হওয়া অসম্ভব বলে মনে হয়। বোধ হয় বারবোসা "স্ত্রীলোক" বলতে বারাঙ্গনাদের বুঝিয়েছেন। তাই বলছিলাম, এইসব বিদেশী লেখকের উক্তিকে আক্ষরিকভাবে সত্য বলে গ্রহণ করায় অসুবিধা আছে। গবেষকদের এ ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক হওয়া দরকার। এই পর্বের শিলালিপিও অনেক পাওয়া যায়। সেগুলিও সতর্কভাবে ব্যবহার করা উচিত।

এই পর্বের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনায় অনেকখানি সাহায্য করে সমসাময়িক সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্য। সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে প্রধান বৃহস্পতি মিশ্র, কবিকর্ণপূর, সনাতন গোস্বামী প্রভৃতির লেখা গ্রন্থাদি। এইসব গ্রন্থ থেকে যেসব তথ্য পাওয়া যায়, সেগুলি মূল্যবান হলেও পরিমাণে খুব বেশি নয়।

বা সাহিত্যের দু'টি শাখা থেকে আমরা অনেক তথ্য পাই। তারা হচ্ছে (১) চৈতন্যদেবের চরিতগ্রন্থসমূহ এবং (২) মঙ্গলকাব্য।

এদের মধ্যে চৈতন্যচরিতগ্রন্থগুলি মূল্যবান আকরগ্রন্থ। চৈতন্যদেব সম্বন্ধে এদের উক্তির মধ্যে অতিরঞ্জন, উক্তির উচ্ছ্বাস এবং অলৌকিক উপাদান থাকলেও সমসাময়িক সমাজ সম্বন্ধে এদের বিবরণ সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য; সে ক্ষেত্রে এদের লেখকদের মিথ্যা সংবাদ দেবার কোন কারণই ছিল না।

মঙ্গলকাব্যগুলি এতদিন এ দেশের সামাজিক ইতিহাসের দর্পণ বলে গণ্য হয়ে এসেছে। এদের মধ্যে এমন কিছু বর্ণনা পাই, যাকে তথ্য বলে মেনে নেওয়া যায়, যেমন মনসামঙ্গলে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের বর্ণনা কিংবা চণ্ডীমঙ্গলে কালকেতুর নগর-পত্তন সংক্রান্ত বিবরণে বিভিন্ন জাতির পেশার বর্ণনা। কিন্তু যে-কোন বিষয় সম্বন্ধে এদের উক্তিকে যথার্থ বলে গ্রহণ করা ঠিক হবে না। বহু-প্রশংসিত এবং ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল থেকেই এর প্রমাণ পাওয়া যায়। কবিকঙ্কণের অধিকাংশ বর্ণনাই conventional ধরনের এবং তার মধ্যে তৎকালীন সমাজের সঠিক চিত্র মেলে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ফুল্লরার বারমাস্যাকে

নেওয়া য়েতে পারে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, এর মধ্যে ব্যাধদের অপরিসীম দারিদ্র্যের যথাযথ প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। কিন্তু এই কাব্যেই ফুল্লরার শাশুড়ি নিদয়ার অন্তঃসত্ত্বা অবস্থার খাওয়া-দাওয়ার যে বিবরণ পাই, তার থেকে মনে হয়—সেযুগে ব্যাধদের জীবনযাত্রা ছিল বিলাসবহুল। আসলে উভয় বর্ণনাই অতিরঞ্জিত; ব্যাধদের জীবনে যেমন কেবল দুঃখ ও অভাব ছিল না, তেমনি ব্যাধ নারীরা অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় ধনী গৃহিণীদের মতো রাজভোগ খেত বলেও মনে করা যায় না। ব্যাধদের জীবনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের যেসব বর্ণনা কবিকঙ্কণ দিয়েছেন, তাকেও তথ্য বলে গ্রহণ কবা চলে না। যেমন, কালকেতুর বিবাহের যে বর্ণনা কবিকঙ্কণ দিয়েছেন, তা ব্রাহ্মণদের বিবাহের মতো; সে যুগে ব্যাধদের বিবাহ এইভাবে হত বলে মনে করা যায় না—"ব্রাহ্মণ বসিঞা পীঠে বেদমন্ত্র পড়ি ঘটে গণেশে করিল আবাহন।" তখন এ দেশের ব্রাহ্মণরা বেদ পাঠ প্রায কবতেন না, ব্যাধদের বিবাহ-অনুষ্ঠানে তা করার প্রশ্নই ওঠে না।

সুতরাং মঙ্গলকাব্যগুলি থেকে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের উপকরণ আহরণের সময়ে আমাদের সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, কোন্‌খানে অতিরঞ্জন আর কোথায় নিছক কল্পনা—তা বুঝে আমাদের আসল তথ্যগুলিকে ছেঁকে নিতে হবে। এ কাজ অত্যন্ত কঠিন।

বাংলার "মধ্য" যুগের ইতিহাস নিয়ে যাঁরা গবেষণা করতে চান, তাঁদের নিরুৎসাহ কবা এই ভাষণের উদ্দেশ্য নয়। তাঁদের কাছে আমার শুধুমাত্র এই আর্জি—সতর্ক হোন। আরও সতর্ক হোন।

ইতিহাস এই জীবনেই সৃষ্ট হয়। কিন্তু কালক্রমে তা বিস্মৃত হতে থাকে। তখন গবেষকরা নানা সূত্র বিশ্লেষণ করে তাকে পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করেন, সে চেষ্টায় সাফল্য লাভ করা সহজ নয়। এই কথাই একদিন বলেছিলাম এই কবিতায়,—

ইতিহাসের লক্ষ্মী ওঠেন
এই জীবনের সিন্ধু-তীরে,
বিস্মরণের সরণীতেই
তাঁর নিলয়ে চলেন ফিরে।
মিলিয়ে গেল রথখানা তাঁর
মহাকালের ঘোড়ায় টানা;
চাকার আঁকা দাগ দেখে আজ
মিলবে কি তাঁর ঠিক ঠিকানা?

কিন্তু আমাদের চাকার আঁকা দাগ অনুসরণ করেই তাঁর ঠিকানায় পৌঁছোবার চেষ্টা করতে হবে। এ জন্যে চাই সবিশেষ সতর্কতা। তা না থাকলে আমাদের সমস্ত গবেষণা-প্রচেষ্টা "আস্তাবলে বাঁধা ঘোড়ার ডিম" হয়ে দাঁড়াবে।

শ্রমিক ইতিহাস চর্চার বিভিন্ন ধারা

রণজিৎ দাশগুপ্ত

শ্রদ্ধেয় সভাপতি, অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় এবং উপস্থিত সুধীবৃন্দ ও বন্ধুগণ,

পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের একাদশ বার্ষিক অধিবেশনে আধুনিক ভারত শাখায় আমাকে সভাপতিত্ব করার আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আমি সংসদের সদস্যদের প্রতি আমার গভীর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

আমি কোন ইতিহাসবিদ নই। এক সময়ে উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার শ্রমিক, কৃষক ও শ্রমজীবীদের মধ্যে তাঁদেব সংগ্রাম ও তৎপরতার একজন সাধারণ কর্মী হিসেবে কিছু কাজ করার সুযোগ ঘটেছিল, পরবর্তী কালেও শ্রমিক ও শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলন ও তৎপরতার সঙ্গে সামান্য কিছু সম্পর্ক রয়ে গিয়েছে। অনেকাংশে এসবেরই সূত্র ধরে ইতিহাসেব একজন কৌতূহলী ছাত্র হিসেবে শ্রমিক ও শ্রমজীবী মানুষের জীবন ও সংগ্রামের নানা দিককে কিছুটা জানা ও বোঝার চেষ্টা করেছি। আর সে প্রয়াসেরই অঙ্গ হিসেবে আজ আমি আপনাদের সামনে ঔপনিবেশিক ভারতে শ্রমিক শ্রেণীর ইতিহাসের কয়েকটি দিক এবং সংশ্লিষ্ট কিছু প্রশ্ন ও সমস্যা সবিনয়ে নিবেদন করছি।

।। এক ।।

ভারতের শ্রমিক শ্রেণীর ইতিহাস নিয়ে আগ্রহ, অনুসন্ধান ও চর্চা কোন সাম্প্রতিক ব্যাপার নয়। বস্তুতপক্ষে শ্রমিক শ্রেণী ও শ্রমজীবী মানুষের কোন কোন দিক নিয়ে দ্বারকানাথ গাঙ্গুলির Slavery in British Dominion কিংবা রজনীকান্ত দাসের কুড়ির দশকে প্রকাশিত Plantation Labour in India বা The Labour Movement in India, অথবা সত্তরের দশকে প্রকাশিত সুকোমল সেনের Working Class of India (১৯৭৭) বা ডাঃ পঞ্চানন সাহার History of Working Class Movement in Bengal (১৯৭৮) সহ অনেক কাজই রয়েছে। সে সবের কোন তালিকা এখানে পেশ করা হচ্ছে না।

তবে রজনী পাম দত্তের India Today (প্রথম প্রকাশ ১৯৪০, প্রথম ভারতীয় সংস্করণ ১৯৪৭) বইটির শ্রমিক শ্রেণীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও সংগ্রাম সম্পর্কিত অধ্যায়গুলিই হল এ সম্পর্কে প্রথম বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ কাজ। কিন্তু ঐ অধ্যায়গুলি রাধাকমল মুখার্জির ১৯৪৫-এ প্রকাশিত The Indian

Working Class, Jurgen Kuczynsky র বিভিন্ন জায়গায় প্রকাশিত কিছু প্রবন্ধ (যেমন, ভি.বি. সিং কর্তৃক সম্পাদিত Indian Economic Histroy: 1857-1956 শীর্ষক সংকলন গ্রন্থটিতে অন্তর্ভুক্ত 'Condition of Workers 1880-1950)' কিংবা মরিস ডেভিড মরিসের The Emergence of an Industrial Labour Force in India: A Study of the Bombay Cotton Mills (১৯৬৫) বা আরও কোন কোন গবেষকের কিছু নিবন্ধ, পুস্তিকা ও বই-এর কথা বাদ দিলে পর বছর কুড়ি আগে পর্যন্ত ভারতের শ্রমিক শ্রেণীর ইতিহাসের বিষয়ে অধিকংশ লেখাই ছিল মূলত বিবরণধর্মী। মরিসের বই ও অন্যান্য লেখাতে বোম্বাই-এর বস্ত্র শিল্প বা জামসেদপুরের ইস্পাত শিল্প শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে মূল্যবান বিশ্লেষণ থাকলেও আলোচিত শ্রমিকরা, শ্রমিক শ্রেণীর নয়, শুধুমাত্র শ্রমিক বাহিনীর সদস্য এবং সে বিশ্লেষণ ঔপনিবেশিক ধনতন্ত্রের বৃহত্তর সামাজিক পটভূমি ও কাঠামোর থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন।

অন্যান্যদের লেখাগুলির মধ্যেও অধিকাংশের ঝোঁক ছিল মুখ্যত দুটি দিকের ওপরে। তাদের একটি হল প্রধানত শ্রমিক সঙ্ঘ বা ট্রেড ইউনিযনের প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে বিবর্তনের অন্য পর্যাযের কালানুক্রমিক বিবরণ। আর একটি দিক ছিল শ্রমিক আন্দোলন ও ধর্মঘটের ইতিবৃত্ত। ভি.বি. কার্নিকের Strikes in India এবং Indian Trade Unions: A Survey (প্রথম প্রকাশ ১৯৬০) এই দুই রকম বিষয় নিয়ে একজন সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী তথা ইতিহাস গবেষকের লেখার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। রাধাকমল মুখার্জির মত উদারপন্থী সমাজতাত্ত্বিক এবং রজনী পাম দত্তের মত সমাজ-অর্থনীতির সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর সাধনে বিশ্বাসী মার্কসীয়— এই দু'রকমের চর্চাতেই শ্রমিক শ্রেণীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে। তবে আমাদের দেশের মার্কসবাদীদেরও বেশির ভাগ গবেষণা ও আলোচনাতেই প্রধান মনোযোগ থেকেছে ট্রেড ইউনিয়ন এবং শ্রমিক প্রতিবাদ ও আন্দোলনের বৃত্তান্তের ওপরে। এর কোন ব্যতিক্রম নেই এমন নয়, তবে এখানে প্রধানত মূল ঝোঁকগুলির কথাই বলা হচ্ছে।

এই জাতীয় নিবন্ধ, বই ও গবেষণা কর্মের থেকে আমাদের দেশে শ্রমিক সঙ্ঘের উদ্ভব ও বিবর্তন এবং শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিরোধ ও সংগ্রামের বিষয়ে অনেক তথ্য জানা গিয়েছে, অনেক অজানা দিক উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, আবার অনেক কম জানা বিষয় সম্পর্কে আমাদের জানার গন্ডি প্রসারিত হয়েছে, বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণও হয়েছে। কিন্তু শ্রমিক শ্রেণীর ইতিহাস কি মুখ্যত শ্রমিক সঙ্ঘ ও আন্দোলনের বৃত্তান্ত?

শ্রমিক শ্রেণীর ইতিহাসের সঙ্গে ট্রেড ইউনিয়নের ইতিবৃত্তের প্রায় সমীকরণের পেছনে, অনেকাংশে কাজ করেছে ব্রিটিশ শ্রমিক ইতিহাস-চর্চার দুই পথিকৃৎ

বিখ্যাত ওয়েব দম্পতি, সিডনি ও বিয়াত্রিচে ওয়েবের A History of Trade Unionism-এর প্রভাব। আবার, শ্রমিক ইতিহাস যে শ্রমিক আন্দোলনের ইতিবৃত্তের সমার্থক— ঐ রকম ধারণার পেছনে থেকেছে জি.ডি. এইচ. কোল-এর A Short History of the British Working Class Movement, 1789-1947 বইটি।

॥ দুই ॥

ষাটের দশকের গোড়া থেকেই শ্রমিক শ্রেণীর ইতিহাস চর্চার আরও নানা dimension বা মাত্রা যুক্ত হয়, নতুন নতুন conception বা ধারণা উপস্থাপিত হয়, অনুসন্ধানেরও নতুন নতুন দিক উন্মোচিত হয়। এই পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান থেকেছে এরিক হবসবম ও ই.পি. টমসনের। দু জনেই গোঁড়ামি ও সরলীকরণ পরিহার করে মার্কসীয় ঐতিহ্যের ভেতর থেকেই বা অন্যভাবে বলতে গেলে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের দৃষ্টিকোণ থেকেই প্রধানত ইংরেজ শ্রমিক শ্রেণী ও শ্রমজীবীদের ইতিহাস (অবশ্য অন্য দেশের শ্রমজীবীদের কথাও তাঁদের, বিশেষত হবসবমের, চর্চায় খুবই গুরুত্বের সঙ্গে এসেছে।) জানা ও বোঝার পরিধিকে প্রসারিত করতে, উপলব্ধিকে গভীরতর করতে যে অতি মূল্যবান অবদান রেখেছেন তা সকলেরই জানা। এক্ষণে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বলতে বোঝাতে চাইছি উৎপাদন ব্যবস্থা ও উৎপাদন সম্পর্ক-ভিত্তিক এবং সেই সঙ্গে শ্রেণী, শ্রেণী সংগ্রাম ও শ্রেণী চৈতন্য-ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গী ও ধারণার কথা।

১৯৭৪-এ প্রকাশিত হ্যারি ব্রেভারসানের Labour and Monopoly Capital বইটি হয়তো প্রচলিত অর্থে ইতিহাস—শ্রমিক শ্রেণীর ইতিহাস সম্পর্কিত বই নয়। কিন্তু ব্রেভারসান ও ব্রেভারসান-পরবর্তী বহুসংখ্যক লেখা ও বিতর্ক ধনতন্ত্র ও তার আওতায় শ্রমিক শ্রেণীর ইতিহাস-চর্চায় অনেক নতুন মাত্রা এনে দিয়েছে। আবার, রিচার্ড প্রাইসের (যেমন, 'The labour process and labour history', সোস্যাল হিস্ট্রি, ভল্যুম ৮, নং ১, জানুয়ারি ১৯৮৩ বা প্যাট আনে, জি ক্রসিক ও আর ফ্লাউড সম্পাদিত The Powers of the Past: Essays for Eric Hobsbawm, কেম্ব্রিজ, ১৯৮৬, বইটিতে Structures of subordination in nineteenth century British industry শীর্ষক প্রবন্ধ) কিংবা জোনাথন জেইটলিনের (Jonathon Zeitlin) 'From labour history to the history of industrial relations', ইকনমিক হিস্ট্রি রিভিউ, ১৯৮৭, নং ২ বা শ্রমিক শ্রেণীর ইতিহাস সম্পর্কে তাঁদের মত আরও বেশ কয়েকজন সমাজবিজ্ঞানী সরাসরি মার্ক্সীয় তত্ত্বের কথা না বললেও দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রেণী-নির্ভর বিশ্লেষণের সাহায্য নিয়ে শ্রমিক শ্রেণীর ইতিহাস, শ্রম প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্বৃত্ত মূল্যের

সৃষ্টি ও পুঁজিবাদী শোষণ, শ্রমিক ও শ্রমের ওপরে পুঁজিপতিদের অধিপত্য এবং কর্মস্থল বা উৎপাদন স্থল, বসবাসের জায়গা বা শ্রম ক্ষমতার উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন স্থান ও শ্রম ক্ষমতার কেনা-বেচার বাজারে পুঁজিপতিদের অধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণ, পুঁজিবাদী শোষণ বা উদ্বৃত্ত মূল্য আত্মসাৎকরণ (appropriation) ও আধিপত্য ও পীড়নের বিরুদ্ধে নানা ঢঙ (form) ও নানা মাত্রায় শ্রমিক ও শ্রমিক শ্রেণীর দৈনন্দিন কাজ ও শ্রম প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে এবং তার বাইরে অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের বিশ্লেষণ করেছেন। আবার, মিখাইল বুরাভয় (Burawoy) আলোচনা করেছেন উৎপাদনের রাজনীতি বা Politics of Production নিয়ে ১৯৮৫-তে ঐ নামে প্রকাশিত বইতে। শ্রমিক শ্রেণীর ইতিহাস নিয়ে সাম্প্রতিক চর্চার কিছু নমুনা ও ঝোঁক নিয়ে এই আলোচনা আর দীর্ঘ না করে যে কথা জোর দিয়ে বলা দরকার তা হল যে, শ্রমিক শ্রেণী ও শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিবাদ ও সংগ্রাম নিয়ে অনুসন্ধান ও চিন্তা-ভাবনা যখন কিছু পন্ডিতের কাছে হালে একান্তই unfashionable বা কেতাবিরোধী হয়ে পড়েছে তখনও কিন্তু শ্রমিক শ্রেণী ও শ্রমজীবী মানুষের ইতিহাস নিয়ে নানা দিক থেকে জিজ্ঞাসা ও চর্চা চলছে। আর ই.এইচ. কার বহু বছর আগেই বলেছিলেন— ইতিহাস-চর্চা শুধুই অতীতের ঘটনা নিয়ে নয়, তার মধ্যে রয়েছে অতীত ও বর্তমানের মধ্যে পরিবর্তনশীল 'ডায়ালগ' বা কথোপকথন। শ্রমিক শ্রেণীর ইতিহাস-চর্চাতে তারই পরিচয় রয়েছে।

।। তিন ।।

এই প্রসঙ্গেই এসে পড়ে ইদানীং কেতা বিরুদ্ধ বা বেমানান হয়ে পড়া আর একটি বিষয়। সেটি হল চিন্তা ও কর্মের ক্ষেত্রে মার্ক্সীয় ঐতিহ্যের কথা। কার যেমন বলেছিলেন— ইতিহাস মানে অতীতের বিষয়ে তথ্যকে শুধু এক জায়গায় জড়ো করে পেশ করা নয়, ইতিহাস মানে তথ্যকে ঝাড়াই-বাছাই করে সাজানো, প্রামানিক তথ্যকে গুছিয়ে অর্থপূর্ণভাবে বিশ্লেষণ করা। আর এখানেই রয়েছে ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গী ও দৃষ্টিভঙ্গীর পেছনে তত্ত্বের কথা। যে কোন তত্ত্বের একটি প্রধান কাজ হল তথ্যকে সাজাতে, বিশ্লেষণ করতে এবং তথ্যকে বুঝতে ঐতিহাসিককে সাহায্য করা। ঐতিহাসিক বস্তুবাদ, মার্ক্সীয় শ্রেণীভিত্তিক তত্ত্বের অন্যতম প্রাসঙ্গিকতাও হল এই ক্ষেত্রে, ইতিহাসের গতি প্রকৃতি ও জটিল প্রক্রিয়া সম্পর্কে তথ্য অনুসন্ধান, বিশ্লেষণ ও তথ্যের অর্থ উদ্ধারে সামর্থ্য ও ক্ষমতার ক্ষেত্রে।

দীপেশ চক্রবর্তী তাঁর বহু আলোচিত Rethinking Working Class History: Bengal 1890-1940 বইটিতে (১৯৮৯) শ্রমিক শ্রেণীর ইতিহাস এবং সেই সঙ্গে দেশের বৃহত্তর সমাজ-অর্থনীতি-সংস্কৃতির ইতিহাস-চর্চার ক্ষেত্রে মার্ক্সীয় তত্ত্ব ও দৃষ্টিভঙ্গীর প্রাসঙ্গিকতা ও সামর্থ্য নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি তাঁর বই-এর

নামের মধ্যেই আমাদের দেশের শ্রমিক শ্রেণী ও শ্রমজীবীদের নিয়ে ইতিহাস-চর্চার ক্ষেত্রে Rethinking বা পুনর্ভাবনার কথা বলেছেন। কিন্তু কোন্ ধারায়, কোন্ অর্থে? আর ইতিহাস-চর্চার মানে কি তথ্যের অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণের পরিবর্তে শুধুমাত্র বা মুখ্যত ভাবনা ও পুনর্ভাবনা?

॥ চার ॥

প্রায় দুই দশক আগে পর্যন্ত আমাদের দেশে প্রচলিত শ্রমিক ইতিহাস, এমনকি শ্রমিক শ্রেণী ও শ্রমজীবীদের প্রতিবাদী আন্দোলনের বৃত্তান্তও অনেক সময়েই থেকেছে দেশের ঔপনিবেশিক আর্থ-সামাজিক কাঠামোর থেকে বিচ্ছিন্ন, সম্পর্কহীন। ঐ ইতিহাস চর্চায় উৎপাদন ব্যবস্থা ও উৎপাদন সম্পর্কের গতি-প্রকৃতি, ঔপনিবেশিক ধনতন্ত্রের পৃষ্ঠপাই শ্রেণী গঠন, শ্রেণী সংগ্রাম ও শ্রেণী চৈতন্যের পরিবর্তন প্রক্রিয়ার জটিলতা, শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে শ্রেণী নয় (non-class) এখন যৌথ বা সমষ্টিগত (collective) সামাজিক সত্তাব (identity) পারস্পরিক সম্পর্ক ও টানাপোড়েন আর শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে জাতীয়তাবাদী ও অন্যান্য সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের ঘাত-প্রতিঘাতের গভীর বিশ্লেষণের অভাব থেকেছে।

এখানে যে সব সমস্যা ও সীমাবদ্ধতার কথা বলা হল শ্রমিক শ্রেণী ও শ্রমজীবীদের সম্পর্কে আমাদের দেশের মার্ক্সীয় ইতিহাস-চর্চা যে সেসবের থেকে মুক্ত থাকেনি, তার ইঙ্গিত আগেই দেওয়া হয়েছে। বেশ কিছু মার্ক্সীয় আলোচনাতে ঔপনিবেশিক ধনতন্ত্রের আওতায় শ্রমিক শ্রেণী, শ্রেণী সংগ্রাম এবং শ্রেণী চৈতন্যের উদ্ভব বা উন্মেষ এবং পরিবর্তনের ক্ষেত্রে একটি একমুখীন, সরল-রৈখিক প্রক্রিয়া সক্রিয় থেকেছে বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। এই প্রক্রিয়ার মূল কথা বা অন্তর্বস্তু থেকেছে ধনতান্ত্রিক বিকাশের গতিপথে যাবতীয় প্রাক্-ধনতান্ত্রিক সম্পর্ক ও রূপের (forms) ক্রম-অবক্ষয় (erosion) ও পরিশেষে অবলুপ্তি, শ্রমজীবী মানুষের উৎপন্ন সব সামগ্রীর বাজারে কেনা-বেচার সামগ্রী বা পণ্যে (commodity) পর্যবসিত হওয়া এবং পরিণতিতে সমাজ শ্রেণী সম্পর্কের Polarisation বা মেরুকরণ অর্থাৎ সমাজ পুঁজির মালিক ও মজুরি শ্রমিকে বিভক্ত হয়ে যাওয়া। এই সঙ্গেই ধরে নেওয়া হয়েছে যে proletarianisation-এর বা শ্রমজীবীদের নির্বিত্ত সর্বহারা হয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়ার অঙ্গ হিসেবে নানা শিল্পে, নানা অঞ্চলে নানা পেশায় মজুরি-শ্রমে নিযুক্ত শ্রমিকশ্রেণী যাবতীয় আভ্যন্তরীণ ভেদাভেদ হারিয়ে সমজাতীয় বা সমপ্রকৃতির (homogenised) হয়ে উঠবে। এই প্রক্রিয়াতে জাতি (ethnic), বর্ণ বা জাত (caste), অঞ্চল, ধর্ম, ভাষা ইত্যাদিকে ভিত্তি করে নানাবিধ পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্যের হয় অবসান ঘটবে অথবা একেবারেই গৌণ হয়ে পড়বে। আর শ্রেণী সংগ্রাম এবং শ্রেণী চৈতন্য নিম্নতর স্তর থেকে উত্তোরত্তর উচ্চতর

স্তরে উন্নীত হতে হতে শেষ পর্যন্ত ধনতন্ত্রের উৎখাত ঘটিয়ে সমাজ-অর্থনীতির বৈপ্লবিক বা সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর সাধনের ভাবাবেশ ও চৈতন্যে আবিষ্ট হবে।

শ্রেণী ও শ্রেণী সংগ্রামের বিষয়ে মার্ক্সীয় চিন্তাকে এইভাবে দেখাটা অবশ্য সরলীকরণ ও তাই ভুল। মার্কসের নিজের লেখায় রয়েছে নানা পর্যায়ে সংগ্রাম ও চৈতন্যের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে শ্রমিক শ্রেণীর গঠন ও পুনর্বিন্যাসের জটিল প্রক্রিয়ার কথা। একটি দৃষ্টান্তের কথা উল্লেখ করা যায়। ১৮৪৭-এ প্রকাশিত The Poverty of Philosophy-তে মার্কস বলছেন: 'Economic conditions had first transformed the mass of the people of the country into workers.... The mass is thus already a class as against capital, but not yet for itself. In the struggle, of which we have noted only a few phases, this mass becomes united, and constitutes itself as a class for itself.'[২] কিন্তু উপরে উল্লিখিত সরলীকৃত ভ্রান্ত ধারণার ভিত্তিতে ঔপনিবেশিক ভারতে শ্রমিক ইতিহাস নিয়ে অনুসন্ধান ও অনুধাবনের ক্ষেত্রে অনেক গুরুত্বপূর্ণ দিক, অনেক তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য, অনেক জটিলতা উপেক্ষিত হয়েছে, এমনকি অনালোচিতও রয়ে গেছে। আমার নিজের লেখাগুলিও উপরে উল্লিখিত সীমাবদ্ধতার থেকে মুক্ত নয়।

।। পাঁচ ।।

আমাদের দেশে (এবং অন্য দেশেও) শ্রমিক শ্রেণী ও শ্রমজীবীদের ইতিহাস-চর্চার ক্ষেত্রে মার্কসীয় ঐতিহাসিকদের এই সব সীমাবদ্ধতা, যান্ত্রিকতা ও সরলীকরণের প্রতিক্রিয়ায় কিছু ঐতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানী ভারতের মত দেশে তো বটেই, ধনতন্ত্রের আদি পীঠস্থান ইংল্যান্ড ও অন্যান্য ধনতান্ত্রিক দেশেও ইতিহাস ও সমাজ বিজ্ঞান-চর্চার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ এবং শ্রেণীভিত্তিক বিশ্লেষণের প্রাসঙ্গিকতা ও গুরুত্ব রয়েছে কিনা, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। এঁদের মধ্যে দীপেশ চক্রবর্তীর কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর বিচারে ভারতে শ্রমিক শ্রেণীর ইতিহাসকে দেখা হয়েছে সব কিছুকেই, সব জটিলতাকেই ধরা যায় ও ব্যাখ্যা করা যায়, সব কিছুরই একেবারে তল পর্যন্ত দেখা যায় ইতিহাসের এমন একটি অধি-বৃত্তান্ত বা অধি-আখ্যানের (master narrative) অঙ্গ হিসাবে।[৩] আর এই অধি-আখ্যানের শিকড় নিহিত রয়েছে ইউরোপীয় এনলাইটেনমেন্ট বা আলোকপ্রাপ্তির ঐতিহ্যের মধ্যে, মার্কসবাদের সর্বজনীনতামূলক চিন্তার ঢং-এর (' "Universalist" mode of thinking') মধ্যে।[৪] তাঁর বিবেচনায় ই. পি. টমসনের কাজও একই সীমাবদ্ধতায় দুষ্ট।[৫]

দীপেশ চক্রবর্তীর বই-এ এমন অনেক কিছু রয়েছে যা প্রণিধানযোগ্য। অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও বিষয় তিনি তুলেছেন। তবে যেসব বিষয় তিনি তুলেছেন

সেসব নিয়ে বিশদ আলোচনা করা এখানে সম্ভবপর নয়, তা করার যোগ্যতাও আমার নেই। তবে বক্তব্যের মূল ঝোঁক সম্পর্কে গুরুতর প্রশ্ন রয়েছে।

সংক্ষেপে একথা বললে ভুল হবে না যে, তাঁর আলোচনায় আমাদের দেশের অর্থনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতির ওপরে ঔপনিবেশিকতা ও সাম্রাজ্যবাদের Distorting ও debilitating বা দোমড়ানো মোচড়ানো বিধ্বংসী প্রভাবকে জাতি উপেক্ষা ও অস্বীকার করা হয়েছে। তাঁর বক্তব্য অনুসারে আমাদের দেশের পশ্চাৎপদতার মূলে প্রাক্-ব্রিটিশ আমল থেকে চলে আসা আমাদের নিজেদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য। এই পশ্চাৎপদতার জন্য তিনি যাকে "fetished demon" বা বানিয়ে-তোলা ভূত বলে অভিহিত করেছেন সেই 'ঔপনিবেশিকতা' ও 'সাম্রাজ্যবাদ'-কে দায়ী করার বা দোষ দেওয়ার কোন কারণ নেই।[৬] আর তাঁর বিচার আমরা এই 'সত্য'টাকে স্বীকার করে নিয়েই মাকর্সবাদী অধি-আখ্যান ও অধি-বিদ্যা (metaphysics) তথা ইউরোপীয় চিন্তার বোঝা বয়ে বেড়ানোর থেকে মুক্ত হতে পারব।

শ্রমিক শ্রেণীর ইতিহাস-চর্চার ক্ষেত্রেও রয়েছে দীপেশ চক্রবর্তীর এই দৃষ্টিভঙ্গী। যে শ্রমিক শ্রেণীর জন্ম ঔপনিবেশিক পুঁজিবাদের গর্ভে বা তার উদ্ভবের সঙ্গে সেই শ্রমিক শ্রেণীরই ইতিহাস-চর্চার জন্য তাঁর মতে অগ্রাধিকার দিতে হবে ঔপনিবেশিকতা ও সাম্রাজ্যবাদ এবং পুঁজি ও শ্রমের সম্পর্কের থেকে আলাদা ও বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে 'সংস্কৃতি' ও 'চৈতন্য'-এর উপরে। এই বক্তব্য তাঁর বই ও অন্যান্য লেখায় বারে বারে এসেছে। ১৯৯০ এ প্রকাশিত এক আলোচনা-নিবন্ধে তিনি লিখেছেন: "much else would be gained if we studied [workers'] violence, including communal ones, as instances of cultural practices....".[৭] অর্থাৎ সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ঔপনিবেশিক বাস্তবতাকে অগ্রাহ্য করে শ্রমিক শ্রেণীর ইতিহাস-চর্চা করতে হবে শ্রমিকদের সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপকে ভিত্তি করে।

এই সঙ্গেই তাঁর লেখায় পরিবর্তনশীল অথচ আগের থেকে রয়ে যাওয়া (pre-existing) সামাজিক গোষ্ঠী ও চৈতন্য সম্পর্কে নেওয়া হয়েছে অনৈতিহাসিক (ahistorical) মনোভাব। শ্রেণী এবং শ্রেণী-নয় (non-class) এমন সমষ্টিগত সামাজিক সত্তা (collective social identity) বা গোষ্ঠী— এই দুইকে তাঁর কাজে mutually exclusive বা পারস্পরিক সম্পর্কবর্জিত 'ক্যাটিগরি' হিসেবে গণ্য করার ঝোঁক খুবই প্রকট। দীপেশ চক্রবর্তী ও তাঁর চিন্তার অংশীদার সাব অলটার্ন সমাজবিজ্ঞানীদের কারুর কারুর কোন কোন লেখায় শ্রেণীর বদলে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে 'কম্যুনিটি'র ওপরে। পার্থ চ্যাটার্জীর লেখা নিঃসন্দেহেই আমাদের দেশের সমাজ ও সংস্কৃতির অনেক দিক উদ্ভাসিত করেছে, আমাদের

চিন্তা-ভাবনাকে উদ্দীপিত করেছে। কিন্তু তাঁর বিশ্লেষণে আমাদের দেশে মূল বিরোধ ও সংঘাত পুঁজির সঙ্গে 'কম্যুনিটি'র—তাঁর মনোযোগ ও অনুধাবনের বিষয় হল "[the] unresolved struggle between the narratives of capital and community"।[৮] পুঁজির সঙ্গে সংঘাতের প্রশ্নে শ্রেণীর কোন উল্লেখ নেই। 'কম্যুনিটি'র অবশ্য কোন সংজ্ঞা পার্থ চ্যাটার্জি বা দীপেশ চক্রবর্তী দেননি। সে কী ব্যাপক অর্থে গ্রাম-সমাজ? দীপেশ চক্রবর্তীর শ্রমিক শ্রেণীর ইতিহাস নিয়ে পুনর্ভাবনায় প্রাধান্য পেয়েছে জন্মসূত্রে প্রাপ্ত (Primordial) জ্ঞাতি-বন্ধন (Kinship ties), আঞ্চলিক, ভাষাগত, ধর্মীয়, বর্ণ বা জাতি (Caste) সম্পর্কিত সম্প্রদায় বা সামাজিক গোষ্ঠী। পুঁজি ও শ্রমের সম্পর্কের বৃহত্তর পটভূমিতে শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রাম ও ইতিহাসকে স্থাপন করার পরিবর্তে তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন শ্রমিকদের মানস জগৎ ও সংস্কৃতিকে। তাঁর পুনর্ভাবনায় উপনিবেশিকতা ও ধনতন্ত্রের শোষণ ও নিপীড়ন প্রায় সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। তাঁর বিশ্লেষণ অনুসারে শ্রমিক সংগ্রাম ও ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের দুর্বলতার মূল কারণ শ্রমিকদেরই পরম্পরাগতভাবে প্রাপ্ত মানসিকতা ও সংস্কৃতি। আর তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শ্রমিকদের বাইরে থেকে আসা 'বাবু' নেতাদের সামন্ততান্ত্রিক ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি।[৯]

মার্কসীয় বিশ্লেষণ ও ইতিহাস চর্চাকে অনেক সময়ে অর্থনৈতিক নির্ধারণবাদ বা economic determinism-এর দায়ে অভিযুক্ত করা হয়। মার্কসীয় চিন্তার কোন কোন ভাষ্যে এরকম নির্ধারণবাদ দেখা গেলেও মার্কস বা এঙ্গেলসের লেখায় নেই, বরং তা খণ্ডন করা হয়েছে। তাঁরা ইতিহাসকে দেখেছেন সামাজিক সংগ্রামের জটিল প্রক্রিয়ার অঙ্গ হিসাবে 'অবজেকটিভ' ও 'সাবজেকটিভ' শক্তির মধ্যে দ্বান্দ্বিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হিসেবে। এটা তো মার্কসেরই বিখ্যাত উক্তি: "men make their own history, but they do not make it just as they please; they do not make it under circumstances chosen by themselves, but under circumstances directly encountered, given and transmitted from the past"।[১০]

দীপেশ চক্রবর্তী তো নিজেকে মার্কসীয় চিন্তার অনুগামী বলেও দাবি করছেন, তাঁর লেখায় কিন্তু এক ভিন্ন ধরণের নির্ধারণবাদ দেখা যাচ্ছে। তাঁর আলোচনা ও বিশ্লেষণে শ্রমিকের সংস্কৃতি ও চৈতন্য হচ্ছে প্রাক্-ব্রিটিশ, প্রাক্-ধনতান্ত্রিক অতীত ও সমাজ থেকে জন্মসূত্রে পাওয়া পরম্পরাগতভাবে চলে আসা মানসিকতা ও নানা রকমের গোষ্ঠীগত (যেমন, জাতি, বর্ণ, ধর্ম, ভাষা ইত্যাদি) আনুগত্য দিয়ে নির্ধারিত, ঐতিহ্যের অনুসারী ক্ষমতা ও আধিপত্যের কাঠামো দিয়ে নির্ধারিত। এই বিশ্লেষণে শ্রমিক শ্রেণী ও শ্রমজীবী মানুষের নিজস্ব বা স্বকীয় সক্রিয়তা

এবং subjectivity-র বা কর্তার (subject) ভূমিকা পালন করার প্রায় কোন পরিসরই নেই।

প্রসঙ্গত বলা উচিত যে, এই 'র‍্যাডিক্যাল' ঐতিহাসিকদের কারুর কারুর লেখা পড়লে মনে হয় যে—মার্কসীয় চিন্তায় শ্রেণী ভিন্ন অন্যান্য সামাজিক গোষ্ঠীর কোন স্থানই নেই। কিন্তু ইতিহাসের জটিল ধারা উপধারায় শ্রেণী এবং শ্রেণী নয়— এমন একাধিক সামাজিক সত্তা বা identity-র একই সঙ্গে overlapping ও interpenetrating, কখনো কখনো পরস্পবের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক, এমনকি বিরোধিতামূলক, আবার পরস্পরের সহায়ক ও পরিপূরক অবস্থান ঘটতে পারে এবং ঘটেও। কোন কোন ধারা বা উপধাবা ইতিহাসেব জটিল প্রক্রিয়াতে হারিয়েও যেতে পারে।[১১]

সমাজ ও ইতিহাসের এই বাস্তব জটিলতা সম্পর্কে মার্কস ও এঙ্গেলস তো বটেই, লেনিন, মাও বা গ্রামচি-ও যে অবহিত ছিলেন তার পরিচয় রয়েছে তাঁদের সারা জীবনব্যাপী বচনা ও কর্মকাণ্ডে। মার্কস তাঁর জীবনেব শেষ দশকে প্রায় পুরোটাই ব্যাপৃত ছিলেন রুশ দেশে এবং তার বাইরে বাংলা ও ভারতের তথা প্রাচ্যের প্রাক্-ধনতান্ত্রিক গ্রাম-সমাজ সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণে।[১২] সেই সঙ্গে তাঁর জিজ্ঞাসা ও চিন্তা-ভাবনার বিষয় ছিল প্রাক্-ধনতান্ত্রিক গোষ্ঠী সমাজের সঙ্গে ধনতন্ত্রের জটিল টানাপোড়েন। কিন্তু তাঁর চিন্তা ও কর্মে ধনতান্ত্রিক শোষণ, নিপীড়ন ও আধিপত্যের মোকাবিলা করার কথা এবং শ্রেণী সংগ্রাম, শ্রেণী শাসন ও শোষণ থেকে মুক্তি ও সমাজতন্ত্রের ভাবাদর্শ কখনও গৌণ হয়ে পড়েনি। কিন্তু দীপেশ চক্রবর্তী ও সাব-অলটার্ণ স্টাডিজ গোষ্ঠীর কারুর কারুর লেখা ও ভাবনায় ধনতান্ত্রিক শোষণ ও প্রভুত্বের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণী ও শ্রমজীবী মানুষের তৎপরতা ও সংগ্রামের যুক্তিটাই সম্পূর্ণ হারিয়ে যাচ্ছে।

দীপেশ চক্রবর্তীর মত ঐতিহাসিকদের একটি বড় সমস্যা হল যে, ইতিহাস-চর্চা তাঁদের কাছে তথ্যের অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ নয়, তা হল মূলত ও মুখ্যত চিন্তা ও ভাববার বিষয়। দীপেশ চক্রবর্তীর বহু আলোচিত বই-এর নাম এবং ঐ বইতে ও অন্যান্য লেখায় তথ্যের ব্যবহারের ধরন দেখে এটাই মনে হয় যে, শ্রমিক শ্রেণীরই হোক আর অন্য কোন বিষয়েই হোক ইতিহাসের চর্চা তাঁর কাছে আসলে ভাববার, ধারণা (conception), নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণের বিষয়। তথাকথিত মার্কসীয় অধি-আখ্যান ও অধি-চিন্তার বিরুদ্ধে তিনি অনেক যুক্তি দিয়েছেন। কিন্তু তিনি তথ্য ঝাড়াই-বাছাই করেছেন, আর সে তথ্যকে সাজিয়েছেন ও তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন একটি অধি-আখ্যান বা কাল্পনিক ছক অনুসারেই। তাঁর বিশ্লেষণ ও চর্চায় কলকাতার চটকল শ্রমিকদের সংস্কৃতি ও

ধারণা প্রাক্ ধনতান্ত্রিক সমাজ থেকে আসা কৃষকের. মানসিকতাতেই ভারাক্রান্ত, আপ্লুত। চটকলের 'টেকনলজি' ছিল তাদের জানা-বোঝার বাইরে। ফলে চটকলের যন্ত্রপাতি বা কলকব্জাকে তারা দেখেছে উত্তর ভারতের কৃষকের দৃষ্টিভঙ্গী ও ধারণার ("North Indian peasant's conception") থেকে, যন্ত্রের ওপরে আরোপ করেছে জাদুকরী ও ঐশী গুণাবলি বা "magical and godly qualities"। কৃষকের মানসিকতা ও সংস্কারে আচ্ছন্ন শ্রমিকের কাছে যন্ত্র ও কলকব্জা ছিল ভয়-ভীতি ও ভক্তির বিষয়। দুর্ঘটনা ও বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তুকতাক করে ও পুজো দিয়ে যন্ত্রকে শান্ত ও সন্তুষ্ট রাখতে হবে— এই ছিল বা এমনকী এখনও রয়েছে শ্রমিকদের মনোভাব। দীপেশ চক্রবর্তীর বিচারে বিশ্বকর্মা পুজোর রেওয়াজ এই মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গীরই পরিচায়ক।

শ্রমিকের সঙ্গে যন্ত্রের সম্পর্ক নিয়ে বিশদ আলোচনা এখানে সম্ভবপর নয়, এখানে তা উদ্দেশ্যও নয়। তবে এই প্রসঙ্গে দীপেশ চক্রবর্তীর বক্তব্যের দুটি গুরুতর ভ্রান্তি ও অসঙ্গতির কথা উল্লেখ করা যায়। সে ভ্রান্তি একই সঙ্গে তথ্যগত ও তত্ত্বগত। প্রথম কথা হল চটকল শ্রমিকের ও সেই সঙ্গে সাধারণভাবে আমাদের দেশের শ্রমিকদের সামাজিক পটভূমি বা উৎসের (Social Origin) বিষয়ে। শ্রমিকেরা সকলেই কৃষক সমাজ থেকে এসেছিল—তথ্যের দিক দিয়ে এটা আদপেই ঠিক না। চটকলের শ্রমিকই হোক আর জামসেদপুরের ইস্পাত কারখানার শ্রমিকই হোক আর কয়লা খনি বা চা বাগানের শ্রমিকই হোক — ভারতীয় শ্রমিকদের সকলেরই উৎপত্তি কৃষক সমাজে নয়। এদের একটা অতি বড় অংশই এসেছে কারিগর ও হস্তশিল্পী, জমি থেকে উৎখাত হয়ে যাওয়া কৃষক, প্রান্তিক চাষী, ভূমিহীন নিঃস্ব কৃষক, ক্ষেত মজুর, শহুরে রকমারি কাজে নিযুক্ত মজুর, বনাঞ্চল থেকে বিতাড়িত আদিবাসী বা 'ট্রাইবাল', সমাজ ও অর্থনীতিতে অবহেলিত ও প্রান্তিক হয়ে পড়া ইত্যাদি নানা স্তরের থেকে। এই নানা স্তরের থেকে আসা শ্রমজীবী মানুষ যোগ দিয়েছে শিল্প শ্রমিক বাহিনীতে। যে কৃষক সমাজের কথা দীপেশ চক্রবর্তী লিখেছেন সে সমাজও ভেদাভেদহীন বা undifferentiated ছিল না।[১৪]

দীপেশ চক্রবর্তীর দ্বিতীয় ভ্রান্তি হল যন্ত্র বা মেসিনের প্রতি শ্রমিকের দৃষ্টিভঙ্গী ও মনোভাবের ক্ষেত্রে। এই প্রসঙ্গেই তিনি বিশ্বকর্মা পুজোর কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে তাঁর তথ্যের উৎস মাত্র একটিই —১৯৩৪-এ প্রকাশিত ডি.এইচ.বুকাননের The Development of Capitalistic Enterprises in India বইটি। বইটি খুবই মূল্যবান। কিন্তু চটকল শ্রমিকদের মধ্যে ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানের বিষয়ে কতটা অনুসন্ধান করেছিলেন তা জানা নেই। তবে চট শিল্পের সঙ্গে যুক্ত নানা ধরনের মানুষের—অবসরপ্রাপ্ত ও এখনও কর্মরত ম্যানেজার ও সুপারভাইসর, শ্রমিক-কর্মচারী, ট্রেড ইউনিয়ন নেতা ও কর্মীদের

সঙ্গে সাক্ষাৎকারের থেকে জানা যায় যে, চটকলে বিশ্বকর্মা পুজোব রেওয়াজ ছিল শুধুমাত্র মিস্ত্রী-মেকানিক-ফিটারদের মধ্যে।[১৫] বুকাননও তাঁই বইতে শুধু মেকানিক্যাল ডিপার্টমেন্টেই বিশ্বকর্মা পুজোর উল্লেখ করেছেন।[১৬] আর এই ডিপার্টমেন্টের শ্রমিক-কর্মচারীরা প্রায় সকলেই ছিলেন বাঙালি। তাঁত বা স্পিনিং বা অন্যান্য ডিপার্টমেন্টে শ্রমিকদের (এঁদের বেশির ভাগই অবাঙালি) মধ্যে বিশ্বকর্মা পুজোর আদৌ কোনো রেওয়াজ ছিল বলে জানা নেই। এটাও উল্লেখ করা যায় যে, দুর্গা পুজো ও ঈদ ইত্যাদি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ছুটি থাকলেও বিশ্বকর্মা পুজোয় কোন ছুটি নেই বা ছুটির দাবিও কোনদিন ওঠেনি।

দীপেশ চক্রবর্তী মার্কসীয় ইতিহাস-চর্চার ঘোরতর সমালোচক, কারণ মার্কসবাদীরা একটি অধি-আখ্যানের মধ্যে সব কিছুকে *ঠেসেঠুসে* দেওয়াতে সচেষ্ট। কিন্তু তিনি নিজেই একটিমাত্র বই-এ উল্লিখিত একটি মাত্র ডিপার্টমেন্টের শ্রমিকদের একটি অনুষ্ঠানকে প্রসারিত করে চটকলের সব শ্রমিকদেরই মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে generalise করেছেন। এখানেও একটি মনগড়া ছক কাজ কবছে বললে তা কি খুব অসঙ্গত হবে?

॥ ছয় ॥

আমাদের দেশের শ্রমিক শ্রেণীর ইতিহাস চর্চা ও সে বিষযে 'র‍্যাডিকাল' ঐতিহাসিকদের সমালোচনা প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা জরুরি। প্রতিষ্ঠানিক ইতিহাস ও আন্দোলনের কালানুক্রমিক বৃত্তান্ত রচনার যে প্রধান ধারা বহুকাল ধরে চলে আসছিল, শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভব ও বিবর্তনের যে সরল-রৈখিক, এক-মাত্রিক ধারণা অনেকাংশে বিদ্যমান ছিল এবং যে ধারা ও ধারণার মধ্যে সংকীর্ণ অর্থনীতিবাদের ছাপও অনেকাংশে ছিল, সত্তরের দশকের শেষ ও আশির দশকের গোড়ার দিক থেকেই (এমনকী তার কিছু আগের থেকেই) ঐ ধারা ও ধারণার থেকে সরে এসে নানা মাত্রা সমন্বিত গভীর অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণের প্রবণতা বেশ সুস্পষ্টভাবেই দেখা গিয়েছে। এরকম প্রবণতা দেখা গিয়েছে গত কয়েক বছরে প্রকাশিত একাধিক বই ও নিবন্ধে। দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা যায় অমিয়কুমার বাগচির Private Investment in India: 1900–1939 (১৯৭২) বইটির শ্রমিক সম্পর্কিত পঞ্চম অধ্যায়; চিত্রা জোশীর Kanpur Textile Labour: Some Structural Features (ইকনমিক অ্যাণ্ড পলিটিক্যাল উইকলি, বিশেষ সংখ্যা, নভেম্বর, ১৯৮১); বা Bonds of Community, Ties of Religion: Kanpur Textile Workers in the Early Twenteeth Century (ইণ্ডিয়ান ইকনমিক অ্যাণ্ড সোস্যাল হিস্ট্রি রিভিউ, ১৯৮৫, ভল্যুম ২২, নং ৩); শশীভূষণ উপাধ্যায়ের Cotton mill workers in Bombay (ইকনমিক

অ্যাণ্ড পলিটিক্যাল উইকলি, ২৮ জুলাই, ১৯৯০); রাধা কুমারের City Lives: Worker's Housing and Rent in Bombay, ঐ, ২৫ জুলাই ১৯৮৭; জানকি নায়ারের Production regimes, cultural processes: Industrial Labour in Mysore, (ইণ্ডিয়া ইকনমিক অ্যাণ্ড সোস্যাল হিস্ট্রি রিভিউ, ১৯৯৩, ভল্যুম ৩০, নং ৩) কিংবা শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুরঞ্জন দাস সম্পাদিত Caste and Communal Politics in South Asia (কলকাতা, ১৯৯৩) বই-এ বরুণ দের Introduction—'A Mirror Cracked from Side to Side'— Colonialism, Class, Caste and Communalism বা ঐ বইতেই অন্তর্ভুক্ত পরিমল ঘোষের Colonialism, Communalism & Labour: A Belaboured Matter of Conciousness and Experience of the Calcutta Jute Mill Workers, 1880–1930 নিবন্ধগুলির বা সুমিত সরকারের Modern India 1885–1947 (১৯৮৩) বই-এর কিছু কিছু অংশ ও তাঁরই অন্যত্র প্রকাশিত একাধিক লেখার কিংবা রিচার্ড নিউম্যানের Workers and Unions in Bombay 1918–1929 (ক্যানবেরা, ১৯৮১) বা ইমন মারফির Unions in Conflict: A comparative Study of Four South Indian Textile Centres 1918–1939 (দিল্লি, ১৯৮১) বা এস.বি. দত্তর Capital Accumulation and Worker's Struggle in Indian Industrialisation: The Case of TISCO, 1910–1980 (কলকাতা/স্টকহোলম, ১৯৮৬) বা নির্বাণ বসুর The Working Class Movement (কলকাতা, ১৯৯৪) শীর্ষক বইগুলির। হালে প্রকাশিত রাজনারায়ণ চন্দ্রভারকারের The Origins of Industrial Capitalism in India: Business strategies and the working class in Bombay 1910–1940 (কেম্ব্রিজ/দিল্লি, ১৯৯৪) শ্রমিক শ্রেণীর ইতিহাস-চর্চার ক্ষেত্রে আর একটি মূল্যবান সংযোজন। ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসে ১৯৮২ ও ১৯৮৬-র অধিবেশনে যথাক্রমে সব্যসাচী ভট্টাচার্য্য ও গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের আধুনিক ভারত শাখার সভাপতির ভাষণেও নতুন dimension বা মাত্রার ওপরে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। মঞ্জু চট্টোপাধ্যায়ের শ্রমিকনেত্রী সন্তোষকুমারী (কলকাতা, ১৯৮৪) বইটিতে রয়েছে বাংলার সম্ভবত ভারতেরও শ্রমিক আন্দোলনে প্রথম নেত্রীর জীবন ও কর্মের কথা। ইতিহাস সংসদের বিভিন্ন বার্ষিক অধিবেশনে পেশ করা একাধিক প্রবন্ধেও বাংলা ভাষায় শ্রমিক শ্রেণীর ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে বেশ কিছু নতুন দিক তুলে ধরা হয়েছে।

নিবন্ধ ও বই-এর এই তালিকা পেশ করা বা পড়া কিছুটা ক্লান্তিকর। কিন্তু শুধুমাত্র প্রকাশিত কাজেরই এই অসম্পূর্ণ তালিকার থেকে এটা স্পষ্ট যে, শ্রমিক শ্রেণীর বিষয়ে সাম্প্রতিক ইতিহাস চর্চা রজনী পাম দত্তর মত সামান্য

কিছু ব্যতিক্রমের কথা বাদ দিলে পর অতীতের প্রধানত ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রমিক আন্দোলনের বিবরণধর্মী ইতিবৃত্ত রচনা এবং শ্রমিক শ্রেণীর গঠন ও পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সমজাতি বা সমগোত্রকারী অথাৎ homogenising প্রক্রিয়ার ধারণার থেকে অনেক সরে এসেছে। 'কম্যুনিটি'র নানা রূপ কিংবা ভাষা, বর্ণ, ধর্ম ইত্যাদিকে ভিত্তি করে শ্রমিক শ্রেণীর বিভিন্নভাবে খণ্ডিত সত্ত্বা-ও দীপেশ চক্রবর্তীর মত 'র‍্যাডিক্যাল' বা সাব-অলটার্ণ ঐতিহাসিকের কোন নতুন আবিষ্কার নয়। বরং ঔপনিবেশিকতা ও পুঁজিবাদী শোষণ ও নিপীড়নের সঙ্গে সম্পর্ক-বর্জিত 'সংস্কৃতি' ও 'চৈতন্য', ঐতিহ্য ও বিভিন্ন গোষ্ঠী সম্পর্কে ঐ ঐতিহাসিকদের কারুর কারুর কার্যত একপেশে আগ্রহ ও চর্চার পরিবর্তে ঔপনিবেশিক পুঁজিবাদ, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক, শ্রেণী গঠন ও শ্রেণী বিন্যাস, নানাবিধ সামূহিক সামাজিক সত্তা, সংস্কৃতি ও চৈতন্যের নানা স্তর এবং তাদের মধ্যে নানামুখীন জটিল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে প্রায় গত দুই দশক ধরে তাৎপর্যপূর্ণ কাজ হচ্ছে। এই সঙ্গেই ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এবং পুঁজিবাদী শোষণ ও জুলুমের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণী ও শ্রমজীবী মানুষের প্রতিবাদ-প্রতিরোধের বিভিন্ন ধারা-উপধারার—যা অনেক সময়ে ভিন্ন ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়েছে, আবার কখনো কখনো কাছাকাছি এসে পরস্পরকে ছুঁয়ে গিয়েছে অথবা কাছাকাছি এসেও দূরে চলে গিয়েছে—জটিল টানা-পোড়েনকে বুঝে নেওয়ার প্রয়াস রয়েছে একাধিক কাজের মধ্যে। আবার, শ্রমিক শ্রেণী ও শ্রমজীবী মানুষ, রাজনৈতিক দল ও শ্রমিক সংগঠনের মধ্যে সংযোগসাধনকারীদের (mediator) সম্পর্ককেও নানা দিক থেকে ভাল করে জানার প্রচেষ্টা দেখা যাচ্ছে।

॥ সাত ॥

এখনও অবশ্য অনেক দিক ও আযতন কম আলোচিত ও একেবারেই অনালোচিত। এরকমই কয়েকটি দিক হল : শ্রমের সামাজিক রূপ এবং তার বিভিন্নতা ও বৈশিষ্ট্য; উৎপাদন সংগঠন (production organisation), প্রযুক্তি ও উৎপাদনের ব্যবস্থাপনা; শ্রম প্রক্রিয়া এবং শ্রম প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে পুঁজি ও শ্রমের মধ্যে বিরোধ ও বিরোধের নানা প্রকাশ; উৎপাদন ও কর্মস্থলের (work place) অভ্যন্তরে এবং তার বাইরে শ্রমিকদের বা 'সাহেব' ও অন্যান্য মালিকের এমনকী মালিক নয় এরকম অনেকের ভাষাতেও, 'কুলি'দের মালিকপক্ষের তাঁবেতে রাখার নানা পদ্ধতি ও উপায় এবং সেসবের প্রকৃতি; 'কুলি' কথাটি ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে মালিক ও শ্রমিকের সম্পর্কের বিষয়ে প্রকাশিত ভাবাদর্শ, দৃষ্টিভঙ্গী ও আচরণ;[১৭] 'কুলি' বা শ্রমিকদের তাঁবেতে রাখার জন্য বাজারের শক্তি এবং বাজার-বহির্ভূত নানা রকম পদ্ধতি এবং জবরদস্তি (Force) ও

হিংসার (violence) বিভিন্ন রূপ; শ্রম-বাজারের কাঠামো ও সে কাঠামোতে পরিবর্তন-প্রক্রিয়া; proletarianisation / de-proletarianisation-এর প্রক্রিয়া ও তার নানা স্তর;[১৮] শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিবাদ-প্রতিরোধ-সংগ্রামের বিভিন্ন ও বিচিত্র রূপ (form) এবং সে সব রূপের মধ্যে সম্পর্ক বা সম্পর্কের অভাব; শ্রমিক সঙ্ঘ বা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সম্ভাবনা, সাফল্য ও সীমাবদ্ধতা এবং অনেক সময়ে শ্রমিক সঙ্ঘ ও রাজনৈতিক দলের থেকে আপেক্ষিক অর্থে স্বাধীন (autonomous) শ্রমিক প্রতিবাদ ও তৎপরতা ইত্যাদি।

আর একটি দিক হল নারী শ্রমিক। সামান্য কয়েকটি ব্যতিক্রমের কথা বাদ দিলে এখন পর্যন্ত শ্রমিক শ্রেণীর ইতিহাস-চর্চায় শ্রমিক শ্রেণীর বিন্যাস-পুনর্বিন্যাস বা গঠন-পুনর্গঠনে এবং প্রতিবাদ-প্রতিরোধে লিঙ্গ মাত্রা (Gender dimension) ও নারী শ্রমিকদের অবস্থান ও ভূমিকা প্রায় সম্পূর্ণ উপেক্ষিত। এই সব ব্যতিক্রমের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য দুটি অপ্রকাশিত পি.এইচ.ডি. থিসিস: শমিতা সেনের Women Workers in the Bengal Jute Industry, 1890–1940: Migration, Motherhood and Militancy, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯২ ও লীলা ফার্নাণ্ডেজ-এর The gendered world of class and community in India: The Politics of organised labour in the West Bengal jute mills, শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৪।

জাতিগোষ্ঠী (ethnic group), জ্ঞাতিসম্পর্ক (Kinship relationship), বর্ণ (caste), ধর্মীয় সম্প্রদায় ও ভাষাগোষ্ঠীর কেন্দ্র করে শ্রমিক শ্রেণী ও শ্রমজীবীদের বিষয়ে বেশ কিছু আলোচনা হলেও শ্রেণী হিসেবে শ্রমিকদের গঠন ও পুনর্গঠনে এই সব উপাদান বিশেষ গুরুত্ব পায়নি। অবশ্য হালের সাব-অলটার্ণ স্টাডিজ গ্রুপের বা কোন কোন র‍্যাডিক্যাল ঐতিহাসিকদের চর্চায় এই গোষ্ঠীগুলি গুরুত্ব পেয়েছে শ্রমিক বাহিনীর fragments বা টুকরো খণ্ড হিসেবে। বস্ত্র, চট, কয়লা, চা, রেল বা ইস্পাতের মত বৃহদায়তন শিল্প ও ক্ষেত্রের বাইরে রকমারি কাজে নিযুক্ত অসংগঠিত বা এখনকার ভাষায় informal ক্ষেত্রের লক্ষ লক্ষ শ্রমিকদের জীবনের শোচনীয় অবস্থা ও তাঁদের ওপরে জুলুম-শোষণ এবং তাঁদের প্রতিবাদ-প্রতিরোধ ও সেসবের বৈশিষ্ট্য ও বিভিন্নতা নিয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণ কমই হয়েছে।

প্রায় অনালোচিত বা কম আলোচিত আরও একটি দিকের কথা এখানে উল্লেখ করা যায়। তা হল শ্রমিকদের দৈনন্দিন জীবনের কথা—তাঁরা কী খেতেন, কী পোষাক পরতেন, কী ধরনের বাড়িতে বা মহল্লায় বাস করতেন, তাঁদের পারিবারিক জীবন কেমন ছিল, প্রতিবেশীদের সঙ্গে কী সম্পর্ক ছিল, অবসর-বিনোদন কীভাবে হত ইত্যাদি। এই প্রসঙ্গে আবার যে প্রশ্নটি এসে পড়ে তা হল

এসবের সঙ্গে শ্রমিকদের দৈনন্দিন জীবন সম্পর্কে শুধু কৌতূহল পূরণই নয়, শ্রমিকদের শ্রেণীগত বিন্যাস-পুনর্বিন্যাসেরও কী কোন সম্পর্ক ছিল?

এ সব নিয়েই অনেক কিছু জানা, বোঝা ও বিশ্লেষণের প্রয়োজন রয়েছে।

॥ আট ॥

ইতিমধ্যেই আমার বক্তব্য যথেষ্ট দীর্ঘ হয়ে পড়েছে। শেষ করার আগে সংক্ষেপে আর কয়েকটি কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

প্রথম কথা হল ভারতে শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভব ও গঠন-পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার পটভূমিটির বিষয়ে। সে পটভূমিটি হল ঔপনিবেশিক শাসন এবং ঔপনিবেশিক ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের। মনে রাখা ভাল যে, ঔপনিবেশিক শাসন এবং সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদ সমার্থক নয়। আর এখানেই লেনিনীয় বিশ্লেষণের প্রাসঙ্গিকতা ও তাৎপর্য। 'পোস্টমর্ডানিস্ট' র‍্যাডিক্যাল ঐতিহাসিকের বিচারে অবশ্য পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদ নেহাৎই figment of imagination, কাল্পনিক ছক বা অধি-আখ্যানের অঙ্গ। সেকথা আগেই বলা হয়েছে।

মনে রাখা ভাল যে, ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ধনতন্ত্র একই রকম ভাবে আসেনি, এসেছিল নানা ধরনে, শ্রেণী বিন্যাস ও শ্রেণী সংগ্রামের প্রকাশ ঘটেছে আলাদা আলাদা ধরনে। আশ্চর্যের নয় যে, ভারতবর্ষের মত বিশাল উপনিবেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ধনতন্ত্রের প্রবেশ ও প্রসার ঘটেছে আলাদা আলাদা ধরনে এবং অসমভাবে। অর্থনীতি ও সমাজের বৃহৎ অংশ রয়ে গিয়েছে প্রাক-ধনতান্ত্রিক। ফলস্বরূপ ভারতবর্ষে ঘটেছে ধনতান্ত্রিক ও প্রাক-ধনতান্ত্রিক শোষণ পদ্ধতি এবং সামাজিক বিধিব্যবস্থা ও রীতিনীতির বিচিত্র সংমিশ্রণ, ঔপনিবেশিক ধনতন্ত্র নিয়েছে একটি hybrid বা সংকর সামাজিক-অর্থনৈতিক রূপ। ভাবাদর্শের ক্ষেত্রেও থেকেছে জটিল সংমিশ্রণ।

এই পটভূমিতেই ঘটেছে ভারতের শ্রমিক শ্রেণী (বা এক অর্থে বলা ভাল শ্রমিক শ্রেণীগুলি) ও শ্রমজীবী গোষ্ঠীগুলির গঠন প্রক্রিয়া ও বিন্যাসে, ঔপনিবেশিক ও পুঁজিবাদী শোষণ ও আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও সংগ্রাম এবং শ্রেণী ও সামাজিক চেতনার উন্মেষ ও জটিল বিকাশ।

দ্বিতীয় কথা হল যে, Proletarianisation বা একটি নির্বিত্ত সর্বহারা শ্রেণী গড়ে ওঠার ক্ষেত্রেও থেকেছে অনেক অসমতা, জটিলতা এবং বৈচিত্র্য ও বৈপরীত্য। 'ক্যাপিটাল'-এর প্রথম ভল্যুমের বিশ্লেষণ ধরে প্রলেতারিয়েত বলতে অনেক সময়ে means of production বা উৎপাদন উপকরণের উপর মালিকানা অধিকার-বর্জিত ও means of subsistence বা জীবনধারণের উপকরণের সঙ্গে সম্পর্কহীন শুধুমাত্র মজুরির ওপর নির্ভরশীল শ্রমিক শ্রেণীর কথা ধরা

হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে কোন ধনতান্ত্রিক দেশেই এরকম বিশুদ্ধ প্রলেতারিয়েতের দেখা মেলেনি। আমাদের দেশে তার সাক্ষাৎ পাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। শ্রমজীবী মানুষের একটি প্রলেতারিয়েত শ্রমিক শ্রেণী হযে ওঠার প্রক্রিয়াতে নানা স্তর থেকেছে, আবার কখনও কখনও এক ধরনের বিপরীতমুখীনতা কাজ করছে, প্রাক্ ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যে আসা ও যাওয়া বা একটা labour circulation system চালু থেকেছে। এই পরিবর্তন ও ধারাবাহিকতার প্রক্রিযাব অঙ্গ হিসেবেই ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রমের সামাজিক রূপ wage labour বা মজুরি শ্রমের ক্ষেত্রেও থেকেছে বিভিন্ন রূপ। সে সবেরই কযেকটি দৃষ্টান্ত হল আসামের চা বাগানে শাস্তির বিধান সম্বলিত চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক, রাণীগঞ্জেব কযলাখনি অঞ্চলে 'নোকরানি' (nokarani) প্রজা মজুর, রকমারি নিযন্ত্রণে আবদ্ধ চটকল বা সুতাকলের মজুর, সামান্যতম আইনী অধিকারবিহীন 'কনট্রাক্ট' মজুর বা মালিকপক্ষের দেওয়া এক চিলতে জমিতে বসবাসকারী ও এমনকী সামান্য কিছু সব্জী ও খাদ্যশস্য প্রজা-মজুর। শ্রমিক শ্রেণী হযেছে ধনতান্ত্রিক বাজারের নিযম-বহির্ভূত নানারকমের জবরদস্তির শিকার।

সবশেষে উল্লেখ কবা যায পুঁজিবাদী শাসন ও শোষণ, প্রভুত্ব ও স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে শ্রমিক ও শ্রমজীবী মানুষের হরেকরকম প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ও সংগ্রামের কথা। বিভিন্ন শিল্পে, বিভিন্ন সময়ে নানারকমের ঢঙ বা রূপ (form) নিয়েছে এইসব প্রতিবাদী ও সংগ্রামী কর্মকান্ড। আর তার মধ্যে দিয়েই, শ্রেণী সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী, বিভিন্ন ভাষাভাষী, জাতি (caste) ও ধর্মের শ্রমজীবী মানুষ তাদের আলাদা আলাদা গোষ্ঠী সত্তাকে অতিক্রম করে হযে উঠেছে একটি শ্রমিক শ্রেণীতে। নানারকমের প্রতিবাদ ও সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে স্ফুরণ হয়েছে শ্রেণী ঐক্য ও চেতনার, নানা স্তরের মধ্যে দিয়ে সেই শ্রেণী চেতনার পরিবর্তন ঘটেছে। অনেক সময়েই এই প্রক্রিয়াটি হয়েছে দুর্বল ও ভঙ্গুর, নানাবিধ গোষ্ঠী সত্তা ও গোষ্ঠী আনুগত্যের পরিবর্তন ও ধারাবাহিকতার জটিল ক্রিয়া-প্রক্রিয়াতে শ্রেণী গঠন ও বিকাশমান শ্রেণী চৈতন্য ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। ঐতিহাসিক বস্তুবাদের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে শ্রমিক শ্রেণীর ইতিহাস-চর্চার এই ক্রিয়া-প্রক্রিয়াকে ভাল করে জানা ও বোঝা এবং ধনতন্ত্রের মোকাবিলা করে সমাজ বন্দোবস্তের সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের জন্য কর্মকান্ডের সঙ্গে যুক্ত করাটা গুরুত্বপূর্ণ।

অনেক কথাই এখানে বলা হল যা আরও আলোচনার, এমনকি বিতর্কেরও বিষয়। আশা করা যায় যে, এখানে যা পেশ করা, হল তাতে ঐ আলোচনা ও শ্রমিক শ্রেণীর ইতিহাস-চর্চায় কিছু সাহায্য হবে।

[এই প্রবন্ধটি পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ-এর একাদশ বার্ষিক সম্মেলন ১৯৯৪-এ প্রদত্ত ভাষণের সংশোধিত রূপ।]

সূত্র নির্দেশ

১. এখানে শ্রমিক শ্রেণী 'ক্যাটাগরি'টি ব্যবহার করা হয়েছে মার্কসীয় অর্থে। এর জন্য নীচে চতুর্থ অংশে মার্কসের The Poverty of Philosophy বইটির থেকে উদ্ধৃতিটি দ্রষ্টব্য।
২. মার্কস অ্যান্ড এঙ্গেলস কালেক্টেড ওয়ার্কস, ভল্যুম ৬, মস্কো, ১৯৭৬, পৃ. ১৯৪।
৩. Rethinking Working Class History: Bengal 1890 1940, পৃ. ২২২।
৪. ঐ।
৫. ঐ, পৃ. ২২২–৩।
৬. চক্রবর্তী, 'Discussion - Rethinking Working Class History', ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি, ২৭ এপ্রিল, ১৯৯১।
৭. চক্রবর্তী, Of 'communal' workers and 'secular' historians, সেমিনার ৩৭৪ — অক্টোবর ১৯৯০, পৃ. ২৩।
৮. পার্থ চ্যাটার্জি, The Nation and its Fragments: Colonial and Postcolonial Histories, দিল্লি, ১৯৯৪, পৃ. ২৩৯।
৯. চক্রবর্তী, Rethinking, পৃ. ১১৬–৫৪।
১০. মার্কস অ্যান্ড এঙ্গেলস সিলেক্টেড ওয়ার্কস, মস্কো, ১৯৬৯-এ অন্তর্ভুক্ত মার্কস, The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte, পৃ. ৩৯৮।
১১. এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য আমার Labour and Working Class in Eastern India: Studies in Colonial History, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ. xvii.
১২. লরেন্স ক্রেডার (সম্পাদনা), The Ethnological Notebooks of Karl Marx, Assen, The Netherlands, ১৯৭৪, বিশেষত পৃ. ৩১-৩; এবং থিওডর শানিন (সম্পাদক), Late Marx and the Russian Road, মান্থলি রিভিউ প্রেস, নিউইয়র্ক, ১৯৮৩, বিশেষত পৃ. ৯৭-১২৬। এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য অশোক সেন, কার্ল মার্কস: জীবনের শেষ দশক, বারোমাস, শারদীয় ১৯৮৪, পৃ. ২৯-৩১; এবং বাংলার গ্রাম-সমাজ প্রসঙ্গে কার্ল মার্কস, অনুবাদ পার্থ চট্টোপাধ্যায়, বারোমাস, শারদীয় ১৯৮৭, পৃ. ২-২২।
১২. চক্রবর্তী, Rethinking, পৃ. ৮৯।
১৪. এ নিয়ে অনেক কাজ হয়েছে — এখানে তার তালিকা দেওয়া হল না।
১৫. আমার নিজের অনুসন্ধান ও সাক্ষাৎকার।
১৬. 'বিশ্বকর্মা পূজা প্রসঙ্গে বুকানন লিখেছেন: "In some of the jute mills near Calcutta the mechanics often sacrifice goats at this time [the time of Viswakarma puja]..." The Development of Capitalistic Enterprises ..., পৃ. ৪০৯।
১৭. 'কুলি' সম্পর্কে মূল্যবান আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য Jan Breman and E. Valentine Daniel, The Making of a Coolie, জার্নাল অব পেজান্ট স্টাডিজ, ভল্যুম-১৯, সংখ্যা ৩ ও ৪, ১৯৯২।
১৮. এ প্রসঙ্গে অন্যান্য কাজের মধ্যে দ্রষ্টব্য Tom Brass and Henry Bernstein, Introduction: Proletarianisation and Deproletarianisation on the Colonial Plantation, দ্য জার্নাল অব পেজান্ট স্টাডিজ, ঐ।

"ভারত বহির্ভূত" দুনিয়ার ইতিহাস কিছু প্রশ্ন ও সমস্যা

ধ্রুব গুপ্ত

॥ এক ॥

ইতিহাস সম্মেলনে 'ভারত বহির্ভূত বিভাগ'-এর বিভাগীয় সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালনের আমন্ত্রণের জন্য পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদকে ধন্যবাদ জানিয়ে গোড়াতেই সম্মেলনে আলোচনাগুলিকে বা পঠিতব্য প্রবন্ধগুলিকে এই চারভাগে বিভক্ত করে নিয়ে কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করে নিই। প্রথম তিনটি বিভাগ করা হয়েছে ভারতবর্ষকে ক্ষেত্র ধরে নিয়ে সময়ানুসারে প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক। চতুর্থটিকে ভারত বহির্ভূত সমগ্র দুনিয়াকে কোনোরকম যুগ ভাগ না করে ন্যস্ত করা হয়েছে। সম্ভবত এ ধরনের বিভাজনের ক্ষেত্রে সক্রিয় থাকে প্রথা ও সুবিধা, কোনো তাত্ত্বিক বা বিষয়বস্তুগত চিন্তা নয়। কিন্তু অস্বীকার করা যায় না যে এতে একটা ভারতকেন্দ্রিকতা প্রকাশ পায়। শুধু তাই নয় তার সঙ্গে অন্য একটা প্রশ্নও জড়িয়ে যায় অবধারিত ভাবে— এ কোন্ ভারত? বর্তমান ভারত রাষ্ট্র, না প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বের ভারতবর্ষ। সম্মেলনের প্রধান ভাষণে বিশিষ্ট অতিথি অধ্যাপক জয়ন্ত ভট্টাচার্য "অঞ্চল" কথাটিকে ঐতিহাসিকদের জন্য একটি অন্যরকম সংজ্ঞা দেন যেটি বর্তমান রাজ্য সীমানাভিত্তিক নয়, বরং বলা যায় সংস্কৃতিকেন্দ্রিক। ভারতের ক্ষেত্রে আমরা এখানে কী করব? আমরা ইতিহাসের কারবারী, কাজেই আমরা প্রাক-১৯৪৭ ভারত নিয়ে ভাবব বললে সমস্যার কোনো সুরাহা হবে না— কারণ প্রথমত ১৯৪৭ সালের পর অনেককাল কেটে গেছে, এবং সে সময়ের অনেকটাই এখন শুধু অন্যান্য "সমাজ বিজ্ঞানের" এলাকাই নয়, ঐতিহাসিকদেরও আলোচনার ক্ষেত্র, দ্বিতীয়ত সেই প্রাক্-১৯৪৭ সালের ভারতে এককালে ব্রহ্মদেশও সে ভারতের ভিতরে ছিল কাজেই তা হলে কিন্তু মিয়ান্মারকে ভারতবহির্ভূত বিভাগে রাখা যাবে না, শুধু বাংলাদেশ বা পাকিস্তানই নয়!

সুবিধা বা প্রথাকে এ বিভাজনের উৎস বলে ধরে নিলেও 'ভারত বহির্ভূত বিভাগ' নিয়ে আলোচনা ক্ষেত্রেও আমাদের কয়েকটা প্রশ্ন পূর্বাহ্নে ভেবে নিতে হবে। এবং হয়ত সেখানেই প্রশ্ন পূর্বাহ্নে ভেবে নিতে হবে। এবং হয়ত সেখানেই আমি বোঝাতে পারব কেন এই 'ভারতকেন্দ্রিকতা'র প্রসঙ্গটাকে এত জোর দিচ্ছি।

প্রশ্নটা হল এই : এখানে আমরা কি 'ভারতবহির্ভূত' বিশ্বকে ভারতের চোখে দেখব? অর্থাৎ ইনডেন-এর যুগলবন্দীর ভাষাকে উলটে নিয়ে বলব যে এখানে আমাদের ভারতীয় "Self"-অভারতীয় "Other" কে বিশেষভাবে তার অতীতকে অর্থাৎ ভারতীয় সত্তা এক অভারতীয় স্মৃতিকে অবলোকন করবে, বা তার বিচার বিশ্লেষণও করবে? বা তাকে 'ইমাজিন' করবে?

এই 'ইমাজিন' করা কথাটা তাত্ত্বিকতার ক্ষেত্রে, ইতিহাসের দর্শনের ক্ষেত্রে একটা বিশেষ সমস্যার সৃষ্টি করেছে, অন্তত আমার আছে। কথাটার যথেচ্ছ ব্যবহারে, বিশেষ করে সাংবাদিকতার স্তরে, ওর এমন একটা বার্কলেইয়ান ভাববাদী বা আমাদের মায়াবাদী চেহারা দাঁড়াচ্ছে যা ভাবনার বিষয়। এই ধরনের তাত্ত্বিক কথাবার্তা শুনে মনে হবে যে আমার আপনার 'কল্পনা' বা আবিষ্কারের বাইরে এ দুনিয়ার (সেটা ভারত বা ভারত বহির্ভূত এলাকা যাই হোক) স্বতন্ত্র কোনো অস্তিত্ব নেই। তাই যদি হয় তবে সৃষ্টিধর্মী সাহিত্য ও 'ইতিহাস'-এ সত্যিই কোনো পার্থক্য থাকে না। অর্থাৎ, যেহেতু 'সত্য' আবিষ্কারের কোনো দায় তখন থাকে না, তখন কল্পনার রাজ্যে 'ইতিহাস' আর 'বোঝা' (Hayden White, "Burden of History" in Tropics of Discourse, Johns Hopkains University, 1978) হয়ে থাকে না। কিন্তু এমন লোক এখনও আছেন যারা মনে করেন—বিভিন্ন ইতিহাস রচয়িতার দৃষ্টিভঙ্গি, মতাদর্শ, মানসিকতার পার্থক্যহেতু তাদের অতীত চর্চায়, অতীতের ব্যাখ্যায় পার্থক্য থাকলেও, অতীতটার আমাদের অনুভব বা কল্পনার বাইরে একটা অস্তিত্ব আছে;— এবং ব্যর্থতা সম্ভাবনা বা নির্দিষ্ট ও সর্বজনগ্রাহ্য 'সত্যে' উপনীত হবার অপারগতা সত্ত্বেও নানাভাবে অতীতের অনুসন্ধান (শুধু 'কল্পনা' নয়)-কে তাকে বোঝবার চেষ্টাকে তারা একটি মানবিক কর্মপ্রবণতা বলে মনে করেন। সেই ধারণায় যারা এখনও স্থিত তারা আলাদা করে ইতিহাস চর্চ্চার আয়োজন করবেনই।

সেই চর্চ্চার ক্ষেত্রে এখন যে হাওয়াটা প্রবল সেটা হল "মডার্নিটি" নামক একটি যুগচরিত্র ("কল্পিত" কিনা জানিনা)-কে নানা দিক থেকে বাজিয়ে দেখা। এবং মোটের ওপর বলা হয় যে এই 'মডার্নিটি' বা 'আধুনিকত্ব পশ্চিম থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর 'আলোকন' এবং তৎসংলগ্ন যুক্তিবাদ এবং বিজ্ঞান চেতনার ঘাড়ে ভর করে ভারত ও ভারতবহির্ভূত দুনিয়াতে কমবেশি ব্যপ্ত হয়েছে। এখন এক্ষেত্রে ইতিহাসের ছাত্র হিসাবে একটা মোটের ওপর আগ্রহসূচক ব্যাপারের দিকে তাকাতে পারি সেটি একটি তুলনামূলকতার ক্ষেত্র। আমরা হয়ত দেখতে পারি পরাধীন ভারতের 'মডার্নিটি'র পদক্ষেপের কালে ভারত বহির্ভূত জাপানী 'মডার্নিটি'র দিকে আমরা কী চোখে তাকিয়ে ছিলাম। সরলা দেবী চৌধুরাণীর সম্পাদনাকালীন 'ভারতী' পত্রিকায়— শ্রীযদুনাথ সরকার (ইনি বিখ্যাত ইতিহাসবিদ

.না হয়ে, কিছুকাল জাপান নিবাসী অপর এক বাঙালী .হবার সম্ভাবনা, সঠিক তথ্য জানতে এখনও পারিনি) 'জাপানের শিল্প ও বাণিজ্য' বলে একটি বড় প্রবন্ধ লেখেন, ১৩১৩ বঙ্গাব্দের ভাদ্র সংখ্যায়। মানসিকতা, "উন্নতির" সংজ্ঞা, যাকে "ইকনমিজম" বলা হবে হয়ত তার চিহ্ন হিসাবে একটি সার্থক "আধুনিকতা" এর প্রতি একটি পরাজিত "আধুনিকত্বের" প্রতিক্রিয়াজ্ঞাপক প্রবন্ধটির প্রথম প্যারাগ্রাফ আমি সমস্তটাই উদ্বৃতি করছি : "শিল্প ও বাণিজ্যের প্রভাবেই দেশ উন্নত হইয়া থাকে। যে দেশ যে পরিমাণে শিল্পবাণিজ্যের উন্নতিসাধন করিতে পারিতেছে, সে দেশ তত বৈদেশিক অর্থে ধনবান হইয়া উঠিতেছে। দেশ অন্য দেশের সহিত ব্যবসায় প্রতিযোগিতায় ক্রমেই নানারূপ বৈজ্ঞানিক উপায়ে কত সহজে সুন্দর সুন্দর বস্তু প্রস্তুত করিয়া সমগ্র পৃথিবীর সমক্ষে উপস্থিত করিয়া আপন আপন কৃতিত্বের পরিচয় দিতে সফল হয়। যে দেশে বিজ্ঞানের চর্চ্চা নাই, বর্ত্তমান যুগে সে দেশের শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। যে দেশের অর্থ বিদেশে যাইবে ছাড়া আসিবে না। আজকাল যেমন ভারতের অবস্থা। জাপান অন্যান্য বিষয়ের চেয়েও অতি অল্পকাল মধ্যে শিল্পবাণিজ্য যেরূপ উন্নতি দেখাইয়াছে এরূপ পৃথিবীর কোন জাতি কোন বিষয়ে দেখাইতে পারে নাই। ইহাদের এই অভাবনীয় পরিবর্ত্তনে অনেকেই বলিয়া থাকেন যেন অলৌকিক দৈবশক্তির প্রভাবে জাপানীবা ভেল্কিবাজীর ন্যায় অসম্ভব কার্য সমুদয় অতি সহজে নীরবে সুসম্পন্ন করিয়া ফেলিতেছে। সামরিক কৌশলে ইহারা চীন ও রুশকে পরাস্ত করিয়াছে। কিন্তু শিল্পবাণিজ্য যুদ্ধে জাপানীদের অসাধারণ নৈপুণ্য অর্জনে শিল্পবীর ইংরাজ, ফরাসী, জার্ম্মান এবং মার্কিন জাতি পর্যন্ত স্তম্ভিত হইয়া উঠিয়াছে।" —চীন ও রুশকে পরাজিত করাকে একজন ভারতীয় সমদৃষ্টিতে দেখছেন এটাও লক্ষ্য করার মত —স্বাজাত্যাভিমান আহত হবার সঙ্গে বোধহয় তার যোগ আছে। ইয়োরোপের শিল্পবীরগণ ও আমেরিকান শিল্পবীরের জাপানের অভ্যুত্থানে নড়ে চড়ে বসার ব্যাপারে, বিংশ শতাব্দীর গোড়াতেই আমেরিকার একজন জনগণনা বিশারদ মিঃ রবার্ট পি. পোর্টারের জাপানের দ্রুত শিল্পোন্নয়ন বিষয়ক বিস্ময়োক্তি থেকে শ্রী সরকার উদ্বৃত করেছেন—"It is impossible for American manufacturecs to compete with their oriental rivals, who enjoy the advantage of a superabundant supply of intelligent and quickly adoptable workmen, willing and eager to work for wages which .could not be made to supply the barest necessitices of life to the poorest American workmen". ঠিক এর পরেই তিনি আমেরিকাকে ছেড়ে ইয়োরোপেরই এক শিল্পবীর—ইংল্যান্ডের প্রতিক্রিয়াকে একটি উদ্ধৃতিতে ধরেন, "আমরা তিন্‌পুরুষের চেষ্টায় বস্ত্র বয়নে যে নিপুণতা লাভ করিতে

পারিয়া ছিলাম জাপানীরা দশ বৎসরেই তাহা শিখিয়াছে।. তাহাদের সহিত আমরা কিরূপে প্রতিযোগিতা চালাইব?"

ঠিক এইখানেই, ভারতের হয়ে জাপানের দিকে তাকিয়ে তাকে আদর্শ করার অন্য একটা ছোট কৌতূহলোদ্দীপক উদাহরণ পাঠকদের সামনে উপস্থিত করি। এখানে ভারতীয় জাতীয়বাদের পক্ষ থেকে বক্তাটি হচ্ছেন শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'ভারতী' পত্রিকারই ঐ উল্লিখিত সংখ্যাতেই (ভাদ্র, ১৩১৩) "সমসাময়িক ভারত রাষ্ট্রনীতি" নামক প্রবন্ধের তৃতীয় কিস্তিতে তিনি আধুনিকত্বর পক্ষে জাতি গঠনের পক্ষে সংবাদপত্রের গুরুত্বের কথা অলোচনা করছেন—সেখানে Pioneers বা Times of India-র মত "ইঙ্গ ভারতীয়" সংবাদপত্রের "রাজপুরুষদেরই মতামতের প্রতিফলনের বিরুদ্ধে বঙ্গভাষায় জাতীয় সংবাদপত্রর দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে অবধারিত দুর্বলতার জন্য যখন আমাদের নিরক্ষরতাকে দাযী করছেন, তখন বিজেতা জাতীয়তাবাদী জাপান সেক্ষেত্রে কীভাবে সাফল্য লাভ করেছে তা এইভাবে ব্যক্ত করছেন : "এ বিষযে জাপান খুব উৎকর্ষ লাভ করিযাছে। তাহার কারণ, জাপানে প্রাথমিক শিক্ষার উৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত। আমি অবগত হইলাম জাপানের মুদ্রাযন্ত্রের অবস্থা খুব ভাল না হইলেও, অন্ততঃ সেখানকার জনসাধারণ এতটুকু শিক্ষা পাইয়াছে যে তাহারা সংবাদপত্রাদি অনায়াসে পাঠ করিতে পারে। আমি কতবার স্বচক্ষে দেখিয়াছি, ছাই-ভরা একটা সমকোণ বিশিষ্ট বাক্সের মধ্যে দুই তিনটা চ্যালাকাঠ রহিয়াছে— সেই বাক্সের নিকটে বসিযা ক্ষুদ্রকায় দাসীরা, মহা ঔৎসুক্যের সহিত কোনো একটা গল্পের বই পাঠ করিতেছে। হয়তো ইহা কোন য়ুরোপীয় সংবাদ পত্রে প্রকাশিত ছোট ছোট গল্পের অনুবাদ....." সাক্ষরতা, পড়বার আগ্রহ, সংবাদপত্র মাধ্যমে জাতীয় চেতনার সঞ্চার, তারই সাহায্যে "কর্তৃপুরুষদের মুদ্রাযন্ত্রের উন্নতিপথে বাধা দেবার প্রচেষ্টা ১৮৩৫ সাল পর্যন্ত"—এবং মালাকবির পরামর্শ অনুযায়ী "ব্রিটানিয়া গজরাজ"কে দেশীয় সংবাদপত্ররূপী মশকবৃন্দর আক্রমণের প্রস্তাব জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের এবংবিধ "মডার্নিটি" এবং এখন আমাদের অনেক "উত্তর আধুনিক" পণ্ডিতদের উপহাসের বিষয়!

পশ্চিমী ঔপনিবেশিকবাদের বিজিত ভারত ও পশ্চিমেরই অস্ত্রটি আদায় করে বিজেতা জাপান, এদের বৈপরীত্যের মধ্যে যে জিনিসটা এখানে বোধহয় নজর করার মত তা এই যে বিজিত এখানে বিজেতাকে আদর্শ করছে, তাকে দলে টানতে চাইছে সাধারণ শত্রু অর্থাৎ পরিশ্রমী আধিপত্যের বিরুদ্ধে। যদুনাথ সরকারের গোটা প্রবন্ধ ব্যস্ত জাপানের "কর্মমুখরতা অকর্মণ্যভাবে" ঘরে বসিয়া অন্নধ্বংস না করা অতি অল্পবেতনে সন্তুষ্ট থাকা "সময়ের মূল্য বোঝা" : এই সব সদ্‌গুণের প্রবল প্রশংসায়, এবং প্রস্তাব হল এই— "কারখানাতে কার্যশিক্ষার পক্ষে ভারতীয় ছাত্রবৃন্দের জাপানই উপযুক্ত স্থান।" আমার বলার কথা হল

এই যে জাপান বা ভিয়েৎনাম বা ভারতের আধুনিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে অপরাজিত ও বিজিতের পার্থক্য সত্ত্বেও এবং বিজিতদের মধ্যেও নানা ধরনের পার্থক্য সত্ত্বেও পশ্চিম বিরোধী জাতীয়তাবাদের ক্ষেত্রে এক জায়গায় দাঁড়াবার একটা মানসিকতা একসময় প্রবল হয়েছিল, যদিও প্যান-এশিয়ানিজমের ইতিহাস, ভারতে বা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতে বা পূর্ব এশিয়াতে আদৌ একচরিত্র নয়। এবং এক্ষেত্রে শুধু বিজিত পক্ষ থেকেই নয় অপরাজিত পক্ষ থেকে যে অন্তত গোড়ার দিকে প্রশ্রয় ছিল, মেইজি পর্বে সংহত হবার পর জাপান যে একটু নেতাগিরি করতে নিজেও প্রস্তুত ছিল সেটাও ভারত বহির্ভূত এলাকার ইতিহাসের ছাত্রদের দেখার কথা। আমি শুধু ডং ডু (Dong Du) আন্দোলন থেকে তার একটা উদাহরণ দিই। ১৯০৪ থেকে ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে যখন ভিয়েতনামের আধুনিক জাতীয়তাবাদ, অর্থাৎ ফরাসী উপনিবেশিক অধিকার বিরোধী জাতীয়তাবাদের অন্যতম প্রাথমিক নেতা ফান-বোই-চু (Phan Boi Chu) ভিয়েৎনাম থেকে পালিয়ে গিয়ে জাপানে সামরিক ও বেসামরিক শিক্ষাতে তার সঙ্গীসাথীদের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রস্তুতির উদ্যোগ নেন,—তখন সেখানে তার সঙ্গে অন্যান্য দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার জাতীয়তাবাদীরা এমনকি চীনের জাতীয়তাবাদীরাও ছিল—সেখানে জাপানের একটা নেতৃসুলভ প্রশ্রয় ছিল। ডং ডু বা "ইস্টার্নস্টাডি মুভমেন্ট" নামটির মধ্যেই একটা প্রতীচ্যের বিরুদ্ধে প্রাচ্য ঐক্যচেতনা কাজ করেছিল বোঝা যায়। ভিয়েতনাম থেকে ফান বোই-চু'র নেতৃত্বে শদুয়েক ভিয়েৎনামী ছাত্র জাপানে এই আন্দোলনের পক্ষছায়ে যে শিক্ষাসূচী অনুসরণ করছিল তার একটি বিশেষ দিক ছিল "জাপানের আধুনিকীকরণ" থেকে পাঠ গ্রহণ। হঠাৎ এখানে ভিয়েতনামের এই-চু'র অভীপ্সার সঙ্গে ভারতের যদুনাথ সরকারের অভীপ্সার মিল দেখছি। যেটা এখানে বলতে চাই তা হল—জাপান বা ভিয়েতনাম বা ভারতের ইতিহাসের বিভিন্নতা সত্ত্বেও আধুনিকত্ব অর্জনক্ষেত্রে একটা একক্ষেত্র রচনার অন্তত পক্ষে মানসিকতা ছিল।

এই মানসিকতার সঙ্গে ব্যাপক অর্থে পশ্চিমবিরোধী জাতীয়তাবাদের একটা বিশেষ সম্পর্ক আছে। সেখানে জাপান কখনও কলোনিয়াল নিয়ন্ত্রণের অধীন হয়নি। কিন্তু ভারত হয়েছে বা ভিয়েতনাম হয়েছে এই পার্থক্যটা বড় কথা নয়—অর্থাৎ ব্যাপারটা অনেক বেশি করে যাকে সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ বলা হয় তার সঙ্গে যুক্ত। পরাজিত না হলেও পশ্চিমের সামনে দাঁড়িয়ে জাপানকেও ঐতিহ্য ও আধুনিকত্ব বা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংঘাত এবং / অথবা সমন্বয় বিষয়ে ভাবতে হয়েছিল, ভারতের বা ভিয়েৎনামের মত করেই। তার কারণ মেইজি রাষ্ট্রকে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বিদেশী শক্তির অধীন না হবার জন্য এবং নিজস্ব শক্তিকে প্রবলতর করার জন্য 'ঐতিহ্য' ও 'আধুনিকতা' সঙ্গে বোঝাপড়া করে একটি জাতীয় মতাদর্শ তৈরি করা প্রয়োজন ছিল। আর ভিয়েতনাম

বা ভারতের ও প্রয়োজন ছিল একটি সর্বভারতীয় জাতীয় মতাদর্শর তৈরি করা ইংরেজ রাজশক্তির বা ফরাসি রাজশক্তির সঙ্গে নানা স্তরে নানাধরনের বোঝাপড়ার জন্য। দুই ক্ষেত্রে তাই পার্থক্য সত্ত্বেও জাতীয়তাবাদের আদর্শ প্রস্তুত করণের ক্ষেত্রে একধরনের সাধারণ ধর্মও ছিল। জাপানে তাই তোকুগাওয়া যুগের অন্তিম পর্বেই ওগিয়ু সোরাই (Ogyu sorai) নামক বুদ্ধিজীবীকে হ্যারি হারুটু নিয়ানের (Harry Harootunian; 'Ideology as Conflict' প্রবন্ধ। T. Najita ও J. V. Koschmann সম্পাদিত Conflict in Modern Japanee History, Princeton, 1982, পুস্তক থেকে) ভাষায় একটি 'metonymic strategy' নিতে হয় পরিবর্তিত অবস্থায় জাতির শক্তি বৃদ্ধি কল্পে, সেই 'Strategy' তে হারুটু নিয়ানের মতে কোকুগাকু (nativist political theology) এবং রাংগাকু (the new Dutch learning-এর মধ্যে বোঝাপড়ার ব্যাপার ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। তোকুগাওয়া শাসনের শেষ পর্বেই অর্থাৎ যাকে জাপানের Pre modern ইতিহাসের যুগ বলা হয়, সে সময়েই দেখা যাচ্ছে হারুটু নিয়ানের মতে, প্রাগাধুনিক নিও-কনফুৎসিয়ান জীবনদর্শনের নির্দ্বন্দ্ব একসত্তার বদলে দ্বান্দ্বিকতাকে —বিরোধ বা Conflict-কে স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে— যা ছাড়া পরিবর্তন সম্ভব নয় মনে করা হচ্ছে— একে হারুটু নিয়ান ব্যক্ত করেছেন এই ভাষায় : "The conscious promotion of conflict as a necessary step in the newly constructed series". এবই উত্তরাধিকার যখন বর্তালো মেইজি পর্বে, তখন শুধু ফুকুজাঁওয়া ইউকিচির মত পণ্ডিত পাশ্চাত্য বিদ্যা ভালভাবে আত্মস্যাৎ করার শিক্ষার সঙ্গে নিও-কনফুৎসীয় সংস্পর্শে নিঃশর্ত রাষ্ট্রানুগত্যের আদেশকে মেলাচ্ছিলেন তাই নয়, জাপানী ঐতিহাসিক ইরোকাওয়া দাইকিচি (Daikichi: The culture of the Meiji period, অনুবাদ ও সম্পাদনা এম. বি. জ্যানসেন, প্রিন্‌সটন্‌, ১৯৮৫) তার পুস্তকের একটি অধ্যায়ে, ১৮৭১-১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে রচিত সংসদ সদস্য কিডো টাকাইয়োশি (Takayoshi) র দিনপঞ্জী ভিত্তি করে দেখিয়েছেন, তার মতো আরো অনেকেই জাপানী আধুনিকত্ব এবং জাতীয়তাবাদকে শক্তিশালী করাবার জন্য কিভাবে ঐ দ্বন্দ্বের নিরসন করতে সচেষ্ট ছিলেন। কিডো নিজে ১৮৭১ থেকে ১৮৭২-এ আমেরিকা ও য়ুরোপ ভ্রমোণ করেন, এবং পরে মেইজী সরকারের বিদেশ মন্ত্রী ইওয়াকুরা তোমোমির (Iwakura Tomomi) নেতৃত্বে কিডো সহ ছেচল্লিশ জন জাপানী পশ্চিমে যাত্রা করেন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য। এর ফলে কিডোর যে জ্ঞানলব্ধ হয় তার মধ্যে রামমোহন রায়ের "আলোকন" অভ্যর্থনাবাচনের প্রতিধ্বনি শুনতে পাব— "The civilisation we have in our country today is not a true civilisation, and our enlightenment (kaika) is not true enlightenment. To

prevent trouble ten years from now, there is only one thing to do, and that is to establish schools worthy of the name. .....Our people are not different from the Americans or Europeans of today; it is all a matter of education or lack of education." কিন্তু "true civilisation" হোক বা না হোক, জাপানী ঐতিহ্যকে তো ফেলে দেওয়া যাবে না, সবাই ফেলে দিতে চাইবেন না। তাই দেখা যাবে যে শতাব্দীর আশির দশকে যখন পাশ্চাত্য বিদ্যার সঙ্গে শিন্টো-ধর্মী শিল্পকে নতুন 'জাতীয়' সংস্কৃতির অঙ্গ হিসাবে মিলানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়, তাকে 'আধুনিকতা' ও 'ঐতিহ্য'কে রাষ্ট্রের খাতিরে এক করার সংকল্প থাকে। সেই উদ্যোগ আরনেস্ট এফ ফেনোলোসা (Fenollosa)-র সঙ্গে দুজন জাপানী বুদ্ধিজীবীর মধ্যে কানো টেসাইয়ের সঙ্গে ছিলেন ওকাকুরা তেনশিন্ (প্রবন্ধ: Imaging History: Inscribing Belife in the Nation, লেখক মেটফাল টানাকা, দি জার্নাল অফ এশিয়ান স্টাডিস্, ৫৩, নং ১, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪)। এই দ্বন্দ্বর সম্মুখীন হওয়া পশ্চিমের মুখোমুখি হয়ে এবং তার সমঝোতা করা যে এশিয়ার বা আফ্রিকার পক্ষে একটা গরজের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল সেই করার স্বীকৃতি আছে দাইকিচির এই উক্তিতে :

"For men like Kido and Okubo the main concern was how to harmonize the contradictions between the liberal western system and a despotic emperor system, which they saw as Japan's 'national character', and how to work out a strategy for "civilization" that would not harm the 'national polity".

'National polity'-কে শক্ত করার কাজে Shintoism-কে কীভাবে জাপানী আধুনিকত্বে প্রয়োগ করা হয়েছিল তার ছাপ মেইজি-সংবিধান রচয়িতা প্রিন্স ইটোর Commentaries on the constitution (১৮৮৯) এ পাওয়া যাবে—"The Emperor is Heaven desended, divine and Sacred; ...He is preminent above all his subjects. He must be reverenced and is invincible." ইতিহাসের অধ্যাপক (টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়) কুনিতাকে কুমে পরে তার "নবজাগরণের পঞ্চাশ বছর" পুস্তকে এ কথারই প্রতিধ্বনি করে বিংশ শতাব্দীর জঙ্গী জাপানের মতাদর্শ তৈরি করেছিলেন। ফু কুজাওয়াও তার 'আলোকন'-এর মধ্যে "doubt generated from within"-এর আদর্শ ত্যাগ করে জনসাধারণকে "duty"র দিকেই বেশি মনোযোগ নিবিষ্ট করতে বলেছিলেন শেষদিকে আরেকজন আধুনিকত্বের নেতা মরিনরি (Morinori)র মধ্যেও এটা লক্ষণীয়।

।। দুই ।।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় অর্জিত শক্তি নিয়ে জাপান প্রথমে অন্য এশিয় জাতীয়তাবাদের নেতৃত্বরূপ হবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেও তা বেশিদিন টেঁকেনি, কারণ ততদিনে পশ্চিমের প্রতিদ্বন্দ্বী হবার বাসনা জেগেছে, তাই তার পূর্ব-দুনিয়াতেও আধিপত্য স্থাপন প্রয়োজন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্‌সের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করার ফলে আর জাপানে ডং ডু আন্দোলনেব কেন্দ্র থাকার উপায রইল না, ফলত ভিয়েৎনামী জাতীযতাবাদীরা জাপান থেকে বিতাড়িত হযে দক্ষিণ চীন অথবা বৃটিশ হংকং এ আশ্রয় নিলেন। বৃটিশদের হংকং-এ তাদের জাযগা দেবার একটি কাবণ সম্ভবত তাতে ফ্রান্‌স বেকাযদায পড়বে এই হিসাব। ভিযেৎনামী জাতীযতাবাদেরও আধুনিকত্বের জটিলতা ও তার প্রাগাধুনিক অস্তিত্ব প্রশ্ন নিযে আলোচনা করার আগে একটা কথা আবার বলে নেওযা ভাল। জাপান, ভারত ও ভিয়েৎনামের আধুনিক জাতীযতাবাদ ঐতিহ্য ও আধুনিকতাব দ্বন্দ্ব বা সমন্বযেব কয়েকটি সাধারণত্বর কথা উল্লেখ করে কিন্তু আমি এই তিন ভূখণ্ডেব ইতিহাসেব কোনো সমসত্তাকরণ করাণো, তাদের মধ্যে পার্থক্য, বিশিষ্টতা স্মরণ রেখেই, বিশেষ ও সামান্য দুই এরই সহাবস্থানের কথা বলছি, শুধু ভিযেৎনামে জাতীয়তাবাদ নিয়েই কোনো সমসত্তাকরণ সম্ভব নয। কেননা গোডা থেকেই দুই বিশিষ্ট নেতা ফান্-বোই-চু এবং ফান্-চু-ত্রিন (Phan Chu Trinh) এর বিশেষ রকম বিপরীতমুখী মতাদর্শেব মধ্যে সেই জটিলতার সেই 'সনাতনত্ব' ও 'আধুনিকত্ব'র দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের উৎস নিহিত ছিল। জাপান ও অন্যান্য অঞ্চলেব পার্থক্য ক্ষেত্রে সম্ভবত অন্য একটা কথা বলা যায়—হয়ত বিজেতা বলেই জাপান শেষ পর্যন্ত জঙ্গী জাতীয়তাবাদের দিকে ঝোঁকে আর বিজিত বলে সেটা অন্যত্র হলেও তেমন করে হয়নি; এক সুভাষ বসু কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার উদ্যোগে জাপানের জঙ্গী জাতীয়তাবাদের সাহায্য নিতে উদ্যোগী হযেছিলেন। আর ধর্ম বিশ্বাসকে অবলম্বন করে ভারতে বা অন্যত্র জঙ্গী জাতীয়তাবাদ, জাপানেব মত করে নয়, স্বক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত অব্যাপকস্তরে এখানে সেখানে মাথা তুলেছিল—ভিয়েৎনামেও কখনও কখনও ছোট স্তরে, তা ঘটেছে, যেমন জাপানী অধিকার পর্বে কাও দাই (Cao Dai) বা হোয়া হাও (Hoa Hao) আন্দোলন।

ভিয়েৎনাম শুনলেই আমাদের কম্যুনিজমের সঙ্গে মন্বন্তির কথাই শুধু মনে পড়ে, এমনকি ইতিহাসের ছাত্রেরও। এই বদভ্যাসটা ত্যাগ করা উচিত, যদি সত্যিই আমার উদ্দেশ্য হয় ভারত বহির্ভূত একটি দেশের সুদীর্ঘ অতীতের অনুসন্ধানের অন্তত আনন্দপ্রাপ্তি, 'জ্ঞানার্জন' না হলেও;—অর্থাৎ Mark Cousino যাকে বলছেন "Pleasure of investigation". সেদিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখতে

পাব সেখানে আমাদের একজন Keduric বা Anderson-এর তৈরি করা 'ন্যাশনালিজম' এর সংজ্ঞাকে পশ্চিম থেকে আগত যন্ত্রনির্ভর বিজ্ঞান-এর মত দুহাত পেতে গ্রহণ করার কোনো দরকার নেই। ভিয়েৎনামেরই অতীত অবগাহন করে, তাদের উচ্চ ও নীচ সমাজের দুই স্তরেরই মানুষের বোধ বা উপলব্ধিকে ভিত্তি করে দেখতে পাব যে জাতি চেতনা (dan toc) এবং তজ্জনিত 'জাতীয়তাবাদ'-এর বয়স সুপ্রাচীন, ভিয়েৎনামের আধুনিক পাশ্চাত্য দুনিয়া থেকে জাতীয়তাবাদকে আমদানী করতে হয়নি এবং আমাদেরও তাই অ্যাণ্ডারসনকৃত সংজ্ঞাকে (Anderson: Imagined comunitics, London, 1983) মাথা পেতে নেবার দরকার নেই, যে কথা পার্থ চট্টোপাধ্যায় তার 'The Nation and its Fragments (Princeton, 1993) বইতে গোড়াতেই বিশ্লেষণ করে বলে গিয়েছেন। প্রথমেই আমরা দেখতে পাব যে জাতীয়তাবাদের সঙ্গে কম্যুনিজমের অতি জরুরী সমন্বয়ে অম্বিষ্ট হো চি মিন স্বয়ং বলেছেন, "The Hung Kings (৩৩৩ খৃষ্টাব্দপূর্ব প্রাক-চৈনিক অধিকার পর্বেই) had the merit of creating our nation. You and I have to defend it". একে একজন 'আধুনিক' (হোর "মডার্নিটি" অবশ্য বেশ·গোলমেলে ব্যাপার!) রাষ্ট্রবিপ্লব নেতা ও রাষ্ট্র প্রধানদের 'ইনভেনশন' বা 'ইমাজিনেশন' বা 'কনস্ট্রাকশন' বলে পশ্চিমী পণ্ডিতদের তত্ত্বানুসারী হয়ে স্বস্নেহে হাসার বোধহয় তেমন সুযোগ নেই, কারণ টমাস হজকিন্ তার পুস্তকে ভিয়েৎনামের সুদীর্ঘ অতীতের সাহিত্য, ইতিকথা, লোকগাথা মন্থন করে, Nguyen Khac Vian এর মত ভিয়েৎনামী ভাষাবিদ্, সাহিত্যপণ্ডিত, ইতিহাসবেত্তার সাহায্যেই দেখিয়েছেন যে সেই জাতীয়তা চেতনা ভিয়েৎনামী চেতনায় চিরকালই কত গভীর ও ব্যাপক ছিল। কাজেই কলোনিয়ালিজম বিরোধী আধুনিক জাতীয়তাবাদকেই পৃথিবীর একমেবাদ্বিতীয়ম 'জাতীয়তাবাদ' এবং সেটা পূর্বকে পশ্চিমের দান বলে মনে করবার কোনো কারণ নেই এখানে 'বিশেষ'কে জগৎব্যাপী 'সামান্য' বলে মনে করা উচিত নয়।

শুধু Hodgkin নয়, আমরা দেখছি প্রধানত এ শতাব্দীর দীর্ঘকালীন পর্ব বিভক্ত "ইন্দো চাইনিজ যুদ্ধ", যা পৃথিবীর একটি কোণে প্রায় বিশ্বব্যাপী অভিঘাত জনক এক গভীর ক্ষত সৃষ্টি করেছিল, তারই তথ্যনিষ্ঠ বিশ্লেষণধর্মী ইতিহাস রচনায় এলেন হ্যামার (Hammar: The struggle for IndoChina, Stanford, 1954) তার পুস্তকের তৃতীয় অধ্যায়ের শিরোনামা দেন "We have fought a thousand years"— এ শতাব্দীর ত্রিশের দশকে রচিত একটি জনপ্রিয় কবিতার একটি পংক্তি। এর ইঙ্গিতটা হল ৯৩৯ খৃষ্টাব্দে চৈনিক সাম্রাজ্যবাদী অধিকার থেকে মুক্ত হবার পর, সেই স্বাধীন জাতীয় জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার্থে ভিয়েৎনামের মানুষকে সর্বস্তরেই নানা ধরনের সংগ্রাম করতে হয়েছে। এখন একে যদি

অর্থাৎ.এর পেছনে সক্রিয় মনোভঙ্গিকে যদি আমাদের হিন্দুজাতীয়তাবাদীর "আমাদের সাতশ বছরের পরাধীনতা" ধারণাকে সঙ্গে এক করে দেখা হয় তো ভিয়েৎনামের প্রতি প্রবল অন্যায় করা হয়, কারণ আগেই বলেছি হজ্‌কিনের মত বিদেশী এবং একাধিক ভিয়েৎনামী ঐতিহাসিক দেখিয়েছেন যে তাদের ঐ হাজার বছরের ইতিহাসে তৎকালীন জাতীয়চেতনার অগণিত উদাহরণ আছে যার পরিণতি ১৭৭২–১৮০২ খৃষ্টাব্দের গৌরবময় তে-সন্ (Tay-Son) বিপ্লব পর্বের মধ্যে, ঠিক যার অন্তে, এবার চীন নয়, ফ্রান্স ভিয়েৎনাম অনুপ্রবেশের উদ্যোগ নিল উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে। যদি বলা হয় 'ন্যাশনালিজম' সর্বদাই কোনো একটা বিরোধী শক্তির অস্তিত্বকে নির্ভর করে গড়ে ওঠে —প্রাগাধুনিক পর্বে সেটা ছিল চীন, চম্পা, পরে সেটা হল ফ্রান্‌স, তাহলে উত্তর হবে— কথাটা একেবারে ফেলে দেবার নয়— এক বিশিষ্ট ধরনের (অর্থাৎ সব রকমের জাতীয়চেতনা নয়) জাতীয়তাবাদের সঙ্গে তার সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য, কিন্তু তাকে সাধারণীকরণ করা উচিত নয়। তাছাড়া হজকিন তো দেখিয়েছেন প্রাক্-চৈনিক পর্বেও ভিয়েৎনামে জাতীয় চেতনার চিহ্ন মিলছে। তাকে উদ্ধৃত করি—"What seems of artical importance is that in the sense of a people with a common territory, culture, language and **a consciousness of** existing as a community, a **dan toc** was certainly emerging during the early mediaeval period after the liberation of the Chinese rule (অর্থাৎ 939 A.D) from the tenth to the fifteenth century" (T. Hodgkin: Vietnam: The Revolutionery Path, MacMillan, 1981, p.5) এবং তার সঙ্গে হজ্‌কিন যোগ করে দেন একটি কথা, "And of course this **dan toc** had its roots in the earlier pre-Chinese period" দ্বিতীয় কথাটা সত্যি হলে 'consciousness''এর জন্মের জন্য অবধারিতভাবে একটা 'Oppositional force' এর দরকার হয় না প্রতিপন্ন হবে।

বরং হয়ত বলা যায় বিজেতা জাতীয়তাবাদ, যেমন জাপান বা কোনো কোনো সময় ভিয়েৎনাম এখন ভারত বা পাকিস্তান (ঠিক বিজেতা না হলেও অর্জনকারী)—সেই জাতীয়তাবাদ তার শক্তির জন্য, দেশের ভিতরের বৈধতা বা সমর্থনের জন্য সর্বদা একটা বিরোধী শক্তিকে মনে মনে ভাবে, সে প্রতিযোগী একথাটা লোককে বোঝাবার তার একটা তাগিদ থাকে — ফলে ছোট বড় স্তরে যে জাতীয়তাবাদের একটা জঙ্গী চরিত্র বেরিয়ে আসে—আমাদের আধুনিক যুদ্ধগুলি যার সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু সে কারণে ভিয়েৎনামের সুদীর্ঘকালীন অন্য ধরনের জাতীয়বাদকে তাচ্ছিল্য করা কোনো ইতিহাসের ছাত্রের পক্ষে বিধেয় নয়।

॥ তিন ॥

শুধু হজকিন্ নয়, চৈনিক সাম্রাজ্যবাদী অধিকার স্থাপনের আগেই যে ভিয়েৎনামে জাতীয় চেতনার বিকাশ ঘটেছিল সে ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে কীথ ওয়েলার টেলরের একটি পুস্তকে (Keith Weller Tayler, UCLA, 1983)। তিনি বলেছেন—ভিয়েৎনামী পণ্ডিতগণ খৃষ্টপূর্ব সপ্তদশ শতাব্দীর হুং (Hung) রাজাদের আমলের সংস্কৃতিকে বলতেন ডং সন্ (Dong Son) সংস্কৃতি। এবং এই সংস্কৃতির চলমানতা রুদ্ধ হয়েছিল চৈনিক সাম্রাজ্যবাদী পর্বে অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ৩৩৩ থেকে খৃষ্টীয ৯৩৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। ফলে তারা চৈনিক পর্বকে "temporary intrusion into an already established national life" (Tayler, p.4) অর্থাৎ "সুদীর্ঘ জাতীয় জীবনে একটা সাময়িক বহিরাগত অচলতা" বলে মনে করেন এবং দশম শতাব্দীতে যা ঘটল তা "reappearence of a preexisting tradition" বা "পূর্বস্থিত ঐতিহ্যের পুনরাবির্ভাব" বলে তারা ব্যাখ্যা করছেন। টেলর বলেন সেদিক থেকে চৈনিক ও ফরাসি পণ্ডিতদের "ভিয়েৎনামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির উৎস কেবল বিশাল চীনের একটি প্রান্তিক প্রদেশে"— এই প্রচলিত ব্যাখ্যা সন্দেহের বিষয় হযে দাঁড়ায়। টেলর জোর দিযে বলছেন যে ভিয়েৎনামীদের এই 'জাতীয়ত্ব'র দাবী বিশেষভাবে প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান দিয়ে সমর্থন করার উপায় আছে, 'পাথুরে প্রমাণ' আছে, অর্থাৎ এ কে শুধুই সাম্প্রতিক 'ইন্‌ভেনশন্' 'ইমাজিনেশন' তত্ত্বের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা যাবেনা।

কিন্তু তা হলে কী হবে, Joseph Buttinger, যার ভিয়েৎনামের ওপর বইগুলি ভারতে ইতিহাসের ছাত্রদের প্রভূতভাবে ব্যবহার করতে বলা হয় তিনি বলছেন ওসব বাজে কথা। হজকিন্‌রা বা টেলররা পরে যতই দেখান যে তাদের উৎস হল 'Lich Su viet Nam' নামক ভিয়েৎনামের সুপ্রাচীন ধারাবাহিক ইতিহাসমালা, ভিয়েৎনামী কাব্য সাহিত্য, 'এলিট' এবং জনসাহিত্য দুই্ই বাটিংগার তবু বলবেন ফরাসী সাহেবরা আসবার আগে জাতীয় চেতনা ও আত্মপরিচয় রক্ষা সে শুধু—'feudal minority'-র ব্যাপার (J. Buttinger The smaller Dragon, NY, 1958, p.98) যারা চিরকালই চৈনিক হস্তক্ষেপের ফলে নিজেদের ক্ষমতা বিপন্ন হবার ভয়ে ভুগত, জনসাধারণের 'Patriotism' ইত্যাদি নিয়ে নাকি কোনো মাথাব্যাথা ছিলনা। বাটিংগার ন্যাশনালিজমের তত্ত্ব ধার করছেন C. J. H. Hayes এর কাছ থেকে, যিনি নাকি এ বিষয়ে অদ্বিতীয় চিন্তক এবং যার মতে ন্যাশনালিজম্ হল "modern emotional fusion and exeggaration of two phenomena, nationality and patriotism". লক্ষ করার মত এই

যে R. S. Chavan (Chavan: Vietnam, Trial and Triump, New Delhi, 1987, p.14) নামক এক ভারতীয়ই, বাটিংগারের এই পাশ্চাত্য কেন্দ্রিক সংজ্ঞা প্রয়োগকে প্রবলভাবে সন্দেহ করে বলেছেন, "Nationality need not be a political entity, but as soon as it acquires political unity and sovereign independence, it becomes a 'nation", এই 'নেশনের' স্বাধীনতা রক্ষার্থেই বদ্ধপরিকর ত্রুং ভগ্নীত্রয় ৪০ খ্রীষ্টাব্দেই যে প্রতিজ্ঞাবাক্য উচ্চারণ করেছিলেন—তার একটা নমুনা হজ্‌কিনের ইংরেজি অনুবাদে দেওয়া যাক : "I swear, first to avange the nation; second, to restore the Hung's former position; third, to have revenge for my husband; fourth; to carry to the end of our common task"— এই ধরনের বিদ্রোহ, কী জনস্তরে, কী উচ্চবর্গে তার সঙ্গে নারীপ্রসঙ্গ বা নারী নেতৃত্ব যুক্ত থাকুক বা না থাকুক সেটা ভিয়েতনাম বা আফ্রিকার কোনো অঞ্চলে, যে কোনো যুগেই ঘটে থাকুক —তাকে তাচ্ছিল্য করার প্রবণতা কখনও 'মুষ্টিমেয়র স্বার্থতুষ্টি' কখনও ধর্মীয় 'কুসংস্কারচ্ছন্নতার প্রতিক্রিয়া' কখনও 'সভ্যতা বিরোধিতা' বলে ব্যাখ্যা করার অজস্র নিদর্শন মিলবে কলোনিয়াল হিস্টোরিওগ্রাফিতে।

ঠিক এইখানেই আমি আবার ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী থেকে অভারতীয় অঞ্চলের ইতিহাস দর্শনের নিদারুণ আপত্তিকর দিকটার কথাও বলে নেব। এবং 'ইওরোসেন্ট্রিজম' এর মত 'ইন্দোসেন্ট্রিজম' এর বিরুদ্ধেও যে আমাদের সজাগ থাকা কর্তব্য এই কথাটা বলে নেব। বলা বাহুল্য এটা আমাদের 'গ্রেটার ইণ্ডিয়া' ধারণার আধারে বিশেষভাবে ধৃত। নইলে আর সত্যেন দত্ত মশাই সমগ্র ভারতীয়দের হয়ে নয় শুধু বাঙালীদের পক্ষ থেকে ('আমরা' কবিতা) কেন দাবী করবেন 'স্থপতি মোদের স্থাপন করেছে বরবদুরের কীর্তি। শ্যাম কম্বোজ ওঙ্কারধাম মোদেরই প্রাচীন কীর্তি'? ভিয়েতনামের বরাত ভাল বাঙালী কবিতার তালিকাতে পাম রং (Pham Rong) এর বিখ্যাত মন্দিরটির ('চম্পা' রাজ্যের)ও স্থান দেননি। রমেশ মজুমদার মহাশয় তার 'চম্পা' (১৯২৭ খ্রীঃ) নামক গ্রন্থের ভূমিকাতে বিলাপ করে গিয়েছেন এই বলে যে—প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস চর্চা বেশ এগিয়ে গেলেও কিন্তু ভারত সীমানার বাইরে পূর্বদিকে বা দক্ষিণপূর্ব দিকে আর্য-প্রথার বিষয়ে দৃষ্টিপাত করা হয়নি' (Majumdar, 1927, p.11, অনুবাদ—আমার)। তারপর তিনি স্বয়ং সেই দৃষ্টিপাত করার দাযিত্ব নিয়েছেন, যদিও তাকে স্বীকার করতে হয়েছে যে 'চাম'রা আদৌ 'আর্য' ছিল না—ছিল 'Austronesians'। তবে তারা 'আর্য ধর্ম' ত অবলম্বন করেছিল! কাজেই জাতে আর্য না হলেও, ধর্মে সংস্কৃতিতে আর্য অতএব তাদের গৌরবকে 'ভারতের সীমানার বাইরে' ভারতের প্রসারের

কীর্তি নিয়ে ব্রিটিশ বিরোধী ভারতের জাতীযতাবাদী তো নরম শ্লাঘাবোধ করবেনই, তাতে আব আশ্চর্য কি ? কিন্তু যেটা ভারতের লেজুড় হিসাবে না দেখে ভিয়েতনামের নিজস্ব ইতিহাসের দিক থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল, সেটাই যে বাইরে থাকা আসা কনফুৎসিযানিজম্ বা বৌদ্ধধর্মকে সমাজ নানাভাবে বিচার করে গ্রহণ বর্জন পরিবর্তন করেছে, কিন্তু চম্পার হিন্দুধর্মকে আরেকটি oppositional force হিসাবে দেখেছে তাদের জাতীয়তাবাদের দিক থেকে, যেমন বিরোধী শক্তি হিসেবে তাদের দেখেছিল—পরে ফরাসীদের নিয়ে আসা ক্যাথলিক ধর্মকে। শুধু নাকি সঙ্গীতে কিছুটা 'চাম' সঙ্গীতের উত্তরাধিকার বর্তেছে বলা যায়। সেটা আশ্চর্যের কিছু নয়, সঙ্গীতেব বাস্তবাতিক্রান্ত হবার অতুলনীয় ক্ষমতা যে শাসক-শাসিত, এলিট সাব অলটার্ন, প্রায় প্রতিটি শক্তিমান-শক্তিপদানত সম্পর্কেব সীমা অগ্রাহ্য করে চলাচল করে এ কথাটা বোধহয স্বীকার করে নেওয়াই ভাল, সংস্কৃতির সঙ্গে জাতীযতাবাদকে যান্ত্রিক ভাবে বেঁধে না দিয়ে।

এব পর ভিযেৎনামে ফরাসি অধিকার ক্রমে কায়েমী হবার আগে পর্যন্ত জাতীযতাবাদের ইতিহাসে, লী বা ত্রান (Tran) শাসন পর্বে (অর্থাৎ ১৪১৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত) দেখা যাবে--- ইতিহাস আর একরৈখিক থাকছে না। রাষ্ট্র থেকে যেমন জাতিকে শক্ত ভিত্তিতে দাঁড় করানো হচ্ছে, তেমনি অভ্যন্তর শাসনেব নিপীড়নে (শুধু চৈনিক নয়, দেশীয়ও) বিভিন্ন স্তরের কৃষক ও নারীর দুর্দশা বিষয়ক চেতনা গড়ে উঠছে, এবং কাব্যে-নাটকে সে চেতনা ক্রমেই সুনির্দ্দিষ্ট চেহারা পাচ্ছে। এমনকি সেই সুদূর অতীতে ত্রুং ভগ্নীত্রয়ের বিদ্রোহের সময়েই (৩৪ খৃঃ) জিয়াও চি প্রদেশের প্রশাসকের অত্যাচারে জনসাধারণের কী দশা হয়েছিল তার সাক্ষ্য মিলবে একটি তৎকালীন কবিতায়। পণ্ডিত, লোকগাথা সংকলক, ঐতিহাসিক ন্‌গুয়েন খাক্ ভিয়েন (Khac Vien) এর "Anthologic" থেকে প্যারিস নিবাসী প্রখ্যাত ভিয়েতনামী ঐতিহাসিক লী থান্ খোই (Li Than Khoi) তার ফরাসী ভাসায় রচিত Le Viet-Nam; Histoire et Civilization (1955) পুস্তকে উদ্ধৃত করেছেন। বাংলা অনুবাদ করে দিই : "অকথ্য অত্যাচার ক্রমবর্ধমান অতীতের দুষ্কৃতিও মানে পরাভব। অগণিত করভারে তার, (অর্থাৎ সু তিনের) জর্জরিত জনসাধারণ। যত নারী স্বদেশের বলি হয় নিঠুর নির্যাতনে।"

একদিকে জাতীয় চেতনার, অন্যদিকে "জাতীয়" সরকারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের এই "living tradition" অব্যাহত থাকল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে তে-সন (Tay-Son) বিদ্রোহ পর্যন্ত, ততোদিনে বণিকের মানদন্ড তেমন করে না হলেও পাদ্রীর ধর্মদণ্ড নিয়ে ফরাসীরা ঢুকে পড়েছে কিছুটা-এবং তে-সন পর্বর গৌরবময় অধ্যায়কে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করবে যে তাবেদার রাজা জিয়া

লং তার পিছনে সক্রিয় ফরাসী সাহায্য প্যারিস থেকে এনে দিয়েছিল পিনু (Pigneau) নামক এক সাম্রাজ্যবাদী ছদ্মপাদ্রী। তার আগেই ভিয়েতনামে নানা ছোট ছোট কৃষক ও নারী বিদ্রোহের মাধ্যমে গেরিলা যুদ্ধের সজীব ঐতিহ্যও তৈরী হয়ে গেছে, সেই ঐতিহ্যকে "Invent" করতে হয়নি।

হো-চি-মিন যে জাতীয়তাবাদ ও মার্ক্সবাদ মেলাতে পেরেছিলেন প্রয়োজনবোধে, তার পিছনে সক্রিয় ছিল তার মধ্যে ঐ Living Tradition-এর উত্তরাধিকার— শুধুই কমিনটার্নের নির্দেশাবলী নয়।

॥ চার ॥

ঠিক যে সময়ে ফ্রান্স বিপ্লবে টালমাটাল সে সময়ে তে-সন ভাতৃত্রয় উত্তরের অকর্মণ্য ত্রিন ও দক্ষিণের অপদার্থ ন্‌গুয়েন শাসনেব অবসান ঘটিযে, চৈনিক আধিপত্য নির্মূল করে (পরে স্বাধীন দেশ হিসাবে মিত্রতা স্থাপনের চেষ্টা করে) ভিয়েতনামে এক ধরনের "আধুনিকত্ব" আনবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলেন— প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভূস্বামী সম্প্রদায় ও মান্দারিণ আমলাতন্ত্রকে খর্ব করে নিম্নমধ্যবিত্ত ও কৃষক সহায়তায় নতুন জাতি গঠন। হো নাক্ (Ho Nhac) হো লু (Ho Lu) এবং হো হুয়ে (Ho Huc) এই তিন রবিনহুড সদৃশ ভ্রাতা এসেছিলেন অতি ছোট ব্যবসায়ী স্তর থেকে, যদিও ক্ষমতা লাভের পর এরা ন্‌গুয়েন শাসকদের উচ্ছেদ করেও ন্‌গুয়েন উপাধিই গ্রহণ করেন, এবং প্রশাসনিক ক্ষেত্রে কোন স্তরেরই "বুর্জোয়া গণতন্ত্র" প্রতিষ্ঠা করেন নি! Chesneaux লিখিত পুস্তকে (Contribution á l'histoire de la nation Vietnamienne, 1955, p. 59) ফাদার দিয়েগো দা হুমিলা নামক স্পেনীশ মিশনারীর তৎকালীন বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে তা থেকে একটু বাংলা অনুবাদ করে দিই— তাতে এই রবিনহুডের প্রকৃত চরিত্রের চিহ্ন হিসাবে— "ধনীর গৃহে প্রবেশ করে এরা তাদের ঝামেলায় ফেলতেন না, যদি তার অভিষ্ট দ্রব্য দান করত, কিন্তু বাধা দিলেই তাদের বিলাস দ্রব্য কেড়ে নিয়ে বেঁটে দিত দরিদ্রদের মধ্যে, তাদের জন্য শুধু কিছু চাল ও অন্য খাদ্যদ্রব্য রেখে..... লোকে তাদের বলত দরিদ্রের প্রতি দয়ালু পুণ্যবান দস্যুত্রয়.....।" অপর একজন স্পেনীয় মিশনারী প্রায় একই ভাবে বলেন, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ধাবিত হওয়ার পথে তারা ধাবিত হত গ্রামবাসীদের এই কথা বলতে বলতে, "শোন আমরা চোর নই, আমরা স্বর্গের প্রেরিত দূত মাত্র।" বলত, তাদের উদ্দেশ্য ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা এবং রাজা ও তার মান্দারিনদের অত্যাচার থেকে জনসাধারণের মুক্তিসাধন। সর্ববিষয়ে সাম্যের প্রচারক ছিল তারা।

"সাম্যের" প্রচারকরা যে ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে ব্যর্থ হলেন এবং সাম্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব হল না, তার জন্য তারা নিজেরা এবং অন্যরাও দায়ী সেটা এখানে

বড কথা নয়— কথা হল— একজন ইতিহাসের ছাত্রকে "জাতীয়তাবাদ কলোনিয়ালিজিমের দান" এই আপ্ত বাক্যকে অগ্রাহ্য করার জন্য তাদের ঐ জাতি গঠনের প্রচেষ্টার ইতিহাসকে যাকে হো-চি-মিন বারে বারে সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করতেন, তাকে মনোযোগ দিয়ে পড়তে হবে।

ব্যর্থতা কখনও উদ্যোগের স্মৃতিকে ম্লান করে না। গোটা উনিশ শতকী ফরাসি বিরোধী দ্বিস্তর (রাজকীয ও গণকৃষক) প্রতিরোধ আন্দোলনে তে-সন পর্বের স্মৃতির ভূমিকা সেকথা প্রমাণ করবে। রাজকীয় প্রতিরোধের প্রকৃতি ছিল বরাবরই দ্বিধাগ্রস্থ তা সে মিং ম্যাং (Ming Mang, 1820-1840), থিউ ত্রি (Thieu Tri, 1840-1847) বা শেষ স্বাধীন নৃপতি তু-দুক (Tu Duc, 1848-1883) যেই হোক। এবং সেক্ষেত্রে চীনের চাপ বা সাহায্য সক্রিয় হত, রাজাদের খামখেয়ালীপনারও স্থান ছিল বিশিষ্ট। সাজাহান সদৃশ তু-দুক তার প্রিয় স্ত্রীর জন্য নয়, নিজেরই জন্য জীবিত অবস্থাতেই তার ভাবী সমাধি নির্মাণে কি পরিমাণ অর্থ ব্যযে ও কৃষকদের বাধ্যতামূলক শ্রম ব্যয করেন তা জানা যাবে হজকিনের পুস্তক থেকে (Hodgkin; Vietnam. p. 141)

কিন্তু অন্যস্তরের বিদ্রোহ ও প্রতিরোধ গেরিলা যুদ্ধের পদ্ধতিতে সর্বদা সক্রিয় থাকে। দেখা যাবে গোড়ার দিকের সেরকম এক বিদ্রোহের (১৮২৬-১৮২৭ সালে) নেতৃত্ব দেন ন্ গুয়েন হান নামক একজন প্রাক্তন তে-সন নেতা—যিনি ছিলেন তে-সন শাসক কোয়াং ত্রুং (Quang Trung,— ভ্রাতা হয়ে বিদ্রোহ সফল হওয়ার পর ঐ নামে অখন্ড ভিযেতনামের শাসক হয়েছিলেন) এর বিশ্বস্ত নিকটতম সহচর। ১৮০২ সালে তিনি চীন দেশে পালিয়ে যান এবং সেখান থেকে প্রস্তুতিসহ এসে ঐ বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এই গেরিলা পদ্ধতির জনবিদ্রোহের যে ধারা অব্যাহত ছিল ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ ফরাসী অধিকার কাযেমী হওয়া পর্যন্ত— সাধারণ লভ্য ইতিহাসের বই গুলিতে তা নির্মম ভাবে অবহেলিত; শুধু হজকিনের পুস্তক এবং Mary Lamb রচিত, "Vietnam's will to live" (Monthly Review Press, New York, 1972) পুস্তকে ছাড়া। বিখ্যাত ফরাসী ঐতিহাসিক ফিলিপ দেভিইয়ার (Deviuers) এর এক প্রবন্ধর সাক্ষ্য নিয়ে দেখাচ্ছেন মাঝে মাঝে এইসব গেরিলা যুদ্ধে রাজশক্তি ও মান্দারিন সমর্থন ছিল না শুধু শক্তি ও সাহায্য ছিল। কিন্তু কখনও কখনও এই প্রতিরোধ রাজানুকুল্য ছাড়াই বা রাজানুদেশ অগ্রাহ্য করেও অব্যাহত থেকেছে। তু-দুকের বর্ণাঢ্য ব্যক্তিত্বের কথা আগেই উল্লেখ করেছি তার মধ্যে প্রকট আত্মপ্রেম জনিত প্রজাপীড়ন আবার ফরাসী বিরোধী স্বদেশ প্রেমের কখনো সামরিক কখনো কাব্যিক-ট্র্যাজিক অভিব্যক্তি ইতিহাস ও সাহিত্যের ছাত্রদের আগ্রহের বস্তু হতে পারে। নিজের ভবিষ্যৎ সমাধি রচনার জন্য শ্রমিক নিপীড়নের জন্য ঘটেছিল

বিখ্যাত "ইয়ার্ড অফ টেন থাউজেন্ড্ ইয়ার্স (১৮৬৬ খৃঃ) বিদ্রোহ, নেতৃত্ব দেন দোয়ান হু-উ ত্রুং (Doan Huu Trung) এবং তার দুই ভ্রাতা আই (Ai) এবং ত্রুক (Truc)। বিদ্রোহীদের গান ছিল— এই রকম ঃ "দশ সহস্র বৎসর, কী সেই বছর দশহাজার?/শ্রমিকের অস্থিতে গড়ে তোলা প্রাকার, জনসাধারণের রক্তে পূর্ণ করা পরিখা!" কবিতাটি হজকিনের বইতে সংগৃহীত আছে বিখ্যাত ভিয়েৎনামী ঐতিহাসিক ত্রুয়ং বুউ লামের Patterns of Vietnames Response to Foreign Intervention (New Haven, 1967, ps. 19-20) থেকে। জীবনসায়াহ্নে রাজা তু-দুক এই অত্যাচারের জন্য অনুতাপ করেছিলেন। আবার এদিকে দেখা যাবে একটি লোক-কবিতায় তু দুকের রাজত্বের জনপীড়ক প্রকৃতিকে কী ভাবে ধিক্কার দেওয়া হচ্ছে ঃ "জন্মেই দেখি, সর্বনাশ করেছে— রাজা তু-দুক—/ক্ষুধার্ত জনতা/আর্তনাদ তাদের কানে পৌঁছায় না রাজনের/টাকা বা চাল একই তার দশা,— দিনদিন কমে/হায় তু দুকের রাজ্যভার নবান্নের করে দফা রফা।" আবার এই রাজাই কখনও কবিতায় কখনও গদ্যে বিলাপ করেন— বিদেশীদের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার উদ্যোগের ব্যর্থতায়। বলেন "Our person is too weak to accomplish great achievements. That is why our teritory has been occupied and we have no way of regaining it. That is why, at this very moment, the borders of our kingdom are threatened by the enemy." ১৮৬৭ সালে কোচিন-চীন অঞ্চল হারিয়ে বলেন, "মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে আমি ব্যর্থতাবোধে বৃদ্ধ"— তারপর বিদেশী বিতাড়নের জন্য ডাক দেন, "Let the ten thousand families unite with a single will— that is the best way of ensuring success (Chesneux-র ফরাসি বই, Contribution a l'historie de la nation VietnamiCnne, paris, 1955 এর ১১৯-২০ পাতা থেকে হজকিন কর্তৃক সংগৃহীত ও ইংরেজিতে অনুবাদ করা)" অথচ বারে বারেই তিনি ফরাসিদের সঙ্গে চুক্তি করে দেশ স্বাধীন করার ঐ সর্বাত্মক আহ্বানকে অর্থহীন প্রতিপন্ন করেছেন, অবস্থার চাপে বা দ্বিধাগ্রস্থতা হেতু — এককথায় তার বিচার হবেনা।

বারে বারেই বলছি ভিয়েৎনামের সমষ্টিগত মানসিকতার রাজনৈতিক অভিপ্রকাশ ঘটেছে কাব্যে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে তে-সন বিদ্রোহের আগেকার অগণিত রাজদ্রোহিতার ইতিহাস ধরা আছে সেই সব কাব্যে। তার মধ্যে বিশিষ্ট নারী কবিরাও আছেন সেটাও উল্লেখ্য। অনেক লোক-প্রবাদের মধ্যে তা রূপ পেয়েছে ঃ যথা "জনগণ উত্থিত হলে, পরাজিত নৃপতি প্যাগোডার উঠোন ঝাড় দেয়" বা "ওরে বাছা মনে রাখিস রাতের ডাকাতরা 'দস্যু' বটে, কিন্তু দিনদুপুরে ডাকাতি করে (রাজপুষ্ট) মান্দারিন আমলা"। মহিলা কবিদের মধ্যে সবচেয়ে

বিশিষ্ট ছিলেন হো কুজুয়ান্ হুয়ং (Ho Xuan Huong)। এই অসাধারণ মহিলা কবি ব্যঙ্গ বিদ্রূপে জর্জরিত করেছেন সামাজিক অবিচার, শাসকশ্রেণীর অত্যাচার এবং বিশেষত নারীর অবমাননাকে, এবং তার কাব্যে বিশেষ করে কৃষিশ্রমরতা ও মজুর নারীর যন্ত্রণাকে ব্যক্ত করেছেন। দু একটি নমুনা ঃ "আহা, চামড়া বদলে যদি পুরুষ করতে পারতাম নিজেকে, বীর হওয়া হত ছেলেখেলা"। বহুবিবাহ প্রথা বিষয়ে লিখেছেন—"স্বামীর ভাগ দেওয়া সতীনকে— কী দুর্ভাগ্য! একজনের শয়ন মোটা কম্বলের গদি, অপরে কাঁপে শীতে।" কুমারী মাতৃত্বকে সমর্থন করা কবিতাও তার রচনাতে লভ্য (কবিতাংশগুলি, Lich Su তে এবং Khoc Vien-এর "Anthologic de la litterature Vietnamicnne, 3 vol, Hanoi, 1972-1975 সংগৃহীত। এগুলো Paris এ লভ্য)।

তেন-সন বিদ্রোহে (এদের অখণ্ড জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে উত্তরাঞ্চলের মন্, লাও প্রভৃতি পার্বত্য উপজাতিদের একাত্ম করার সিদ্ধান্ত গুরুত্বপূর্ণ— যা হো চি মিনের আমলে আবার গুরুত্ব পায়)-র জনপ্রিয় নেতা— শাসক কোয়ং ত্রুং এর অকাল মৃত্যুতে তার (১৭৯২ খৃঃ) তাব বিধবা পত্নী লি ন্ গক হান (Le Ngoc Han) তার 'আই তু ভান্' (দুঃখাশ্রু) নামক কবিতায় স্বামীকে নিযে এই ভাবে শোক প্রকাশ করেন "মোটাকাপড়ে আবৃত দেহ বীর লাল পতাকা উর্দ্ধে তোলেন। জনগণকে করেন ত্রাণ, গড়ে তোলেন রাষ্ট্র—কোন কাজ হত সুন্দরতর?" (Anthologie, vol-I, pp 161-2). এই ধারা ভিয়েৎনামের প্রতিরোধ আন্দোলনে গোটা ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর আমেরিকান পর্ব পর্যন্ত বজায় ছিল। এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রতিরোধ আন্দোলনের চরিত্রে যে সহজ সরল এক রৈখিকতা ছিল সেটা আমাদের মনে রাখবার মত।

এই "প্রতিরোধ" আন্দোলন যখন ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের পর "কান ভুয়ং" বা "রাজা বাঁচাও" আন্দোলন নামে স্বাধীনতা সংগ্রামে পরিণত হল— সেখানে নেতৃত্ব এসেছিল প্রধানত স্বদেশচেতনায় উদ্বুদ্ধ বিদ্বৎ-সমাজ, কিছু ভিন্নচিন্তার অধিকারী মান্দারিনদের থেকেও, এবং সদ্য আগত ফরাসি শিক্ষাপ্রাপ্ত কিছু বুদ্ধিজীবীও তাঁতে ছিলেন যথা, ডঃ ফুং (Phung)। রাজতন্ত্রের পুনরুদ্ধার অন্বিষ্ট ছিল এই আন্দোলনের, ফলে একে রক্ষণশীল 'রিভাইভালিষ্ট' বা প্রোটো ন্যাশনালিস্ট বলে অবজ্ঞা করাটা বাড়াবাড়ি— এ সশস্ত্র আন্দোলনেরও প্রকৃত যোদ্ধারা ছিলেন গেরিলা কৃষক। পর্যাপ্ত প্রস্তুতির অভাবে ব্যর্থ হতে তা বাধ্য ছিল ঠিকই কিন্তু তে-সন স্মৃতির মত এর স্মৃতিও বিংশ শতাব্দীতে মানসিক শক্তির উৎস ছিল এবং ফান্-বোই-চু'র গোড়ার দিকে রাজতন্ত্রপন্থী' (কৃষক সমর্থন সহজে পাওয়া যাবে বলে) আন্দোলন এরই "আধুনিক" উত্তরাধিকার।

১৯০০ থেকে ১৯২৫-২৬ সাল নাগাদ, কলোনিয়ালিজমের অভিঘাতে আধুনিক জাতীয়তাবাদের দুমুখী ধারা, অর্থাৎ ফান্-চু-ত্রিনের (Phan Chu Trinh) এর অষ্টাদশ শতকী "আলোকন" ভিত্তিক ফরাসীদের সাহায্যেই ভিয়েৎনামে আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজ গঠনের মতাদর্শ, যার মূলে ছিল ঔপনিবেশিক শাসকরা ও মোটের ওপর মঁতেস্কু, ভলতেয়ারেরই আধুনিক সংস্করণ এই সরল বিশ্বাস, পাকচক্রে তাঁর ১৯০৮ সালের 'সন্ত্রাসবাদী' আন্দোলনে জড়িয়ে পড়া ও বন্দিদশা; ফান বোই চু'র তীব্র ফরাসি বিরোধিতা ও প্যান এশিয়ানিজমে আস্থা দুই আন্দোলনেরই 'ব্যর্থতা' ইতিমধ্যে খামার ও খনি ভিত্তিক অর্থনীতির দায়ে শ্রমিক ও হ্যানয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে (১৯০৯, কার্যত ১৯১৯) ছাত্রদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার সঞ্চার, বিশের দশক একদিকে ফরাসিদের তাবেদার শ্রেণীর বুর্জোয়া 'ফ্রাংকোফিলিজম', অপর দিকে উগ্র জাতীযতাবাদীদের (দল ঃ ভিয়েৎনামে কুয়ং ডং ড্যাং) ব্যর্থ সৈন্যবিদ্রোহ (Yen Bay Revolt, 1927) এরই পটভূমিকায হো চি মিনের বাঁধা ধরণেব সক্রিয়তা ও ইন্দোচাইনিজ কম্যুনিস্ট পার্টি গঠন (১৯২৯ সাল)—এসব এবং অপেক্ষাকৃত পরিচিত 'ন্যারেটিভ'। তাবপর তো প্রথম কম্যুনিস্ট আন্দোলন নঘি-তিন-সোভিয়েৎ · (Nghi-Tin-Soviets, 1930 31) এবং তৎপরবর্তী স্টালিনিস্ট-ট্রস্‌টকাইট দ্বন্দ্ব ইত্যাদি আমাদের একেবারে সুপরিচিত পর্বে নিয়ে আসছে। কিন্তু ঐ কথা বলেই এখানে ভিয়েৎনামী প্রসঙ্গে ইতি টানি। তার পেছনের সুদীর্ঘ 'জাতীয' চেতনা ও তাকে রূপ দেবার ইতিহাস আমাদের মনোযোগের অপেক্ষাতে আছে— যার 'দাযভাগ' বর্তেছে হো চি মিনে। তা না করলে, যতই চোখ রাঙাই, আমরা কোন না কোন ভাবে কোন না কোন ধরনের 'ইয়োরোপ-কেন্দ্রিকতা'র মানসিকতার বশবর্তী হযে থাকব। আশা করি একথা বলার জন্য কেউ আমাকে 'নেটিভিস্ট' আখ্যা দেবেন না।**

।। পাঁচ ।।

আফ্রিকা মহাদেশের 'ইতিহাস' নিয়ে কথা বলতে গেলেই অবধারিতভাবে এই তথাকথিত "অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ" বিষয়ে, শুধু শ্বেতাঙ্গ শাসকদের অবজ্ঞা-অপমানের কথাই নয়, আমাদের ভারতের মানসিকতায় এখনও যে অজ্ঞতা প্রসূত অবজ্ঞা কায়েমী হয়ে বসে হয়েছে তার কথা উঠে পড়বেই। নানাস্তরে ব্যাপ্ত এই ধারণার বিচিত্রপ্রকৃতির একটা পরিচয় দিয়ে নিই। ১৯১০ থেকে

[১৮৮০ খৃঃ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত ভিয়েৎনামেব ইতিহাসের জন্য David Marr এর দুটি বই ইংরেজি পুস্তকের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ (১) Vietnamese Anticolonialism, 1885-1925, Bakley. L. A., 1971; (২) Vietnamese Tradition on Trial, 1920-1945, VCLA, 1981]

১৯৪০ সালের মধ্যেকার 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার বহু প্রবন্ধে আমাদের এই আপত্তিকর মনোবৃত্তির নিদর্শন আছে। আমি একটি কম পরিচিত উদাহরণ এখানে রাখছি। ১৩২০ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসের সংখ্যায় (পৃঃ ২৯২-৩০০) শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার ও শ্রীপ্রভাতীন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় "দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসী" নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন। তাতে ১৮০৬ খৃঃ নাগাদ কেন খনিতে এবং 'চাও আকে'র ক্ষেতে ভারতীয় মজুর নিয়ে যেতে হল মহামান্য ইংরাজ সরকারকে—তার ব্যাখ্যা দিচ্ছেন এইভাবে—ইয়োরোপীয় মজুররা কম মাইনায় বিপুল সংখ্যায় এসে ঐসব কাজ করে দেবেনা—"এইজন্য প্রথমতঃ আফ্রিকার আদিম অধিবাসী কাফ্রীদিগকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করা হয়; **কিন্তু কাফ্রীরা আশানুরূপ মিতাচারী ও সচ্চরিত্র নহে** এবং সময়ে সময়ে সামান্য কারণে তাহারা একজোট হইয়া এই সকল খনি ও ক্ষেত্রের মালিকগণের অশেষ ক্ষতি করে, এ কারণ মালিকগণের দৃষ্টি পরিশ্রমী, শান্ত ও সচ্চরিত্র ভারতীয় মজুরগণের দিকে পড়িল।" কৃষ্ণকায়দের অসহযোগকে এইভাবে অপমান করছেন যারা তারাই বেশ কিছুদিন বাদে ঐ "শান্ত ও সচ্চবিত্র" ভারতীয় মজুবগণের "অসহযোগ"কে (গান্ধীর নেতৃত্বে) পরমশ্রদ্ধায় স্মরণ করছেন দেখা যাবে! শুধু কি তাই, নাটাল অঞ্চলে তাদের ধর্মঘটকে (১৯১৩) "পৃথিবীর একটি প্রথম গুরুত্বপূর্ণ শ্রমিক বিপ্লব এবং গান্ধীকে তার বৈপ্লবিক নেতা রূপে প্রতিষ্ঠিত করলেন কলকাতায় একটি সাম্প্রতিক বক্তৃতায় প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইরফান হাবিব! এদিকে দুবছর আগে, অর্থাৎ ১৯১১ খৃষ্টাব্দেও গান্ধী স্মাট্‌স্‌কে অনুরোধ করেছিলেন ধর্মঘটিরা হিংসাত্মক হলে তাদের জেলে পুরতে কেন না তাতে তাঁর অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলনে মালিন্যযুক্ত হত। ৩ পাউণ্ড বাৎসরিক খাজনা-মকুবের অনুরোধটা শেষ পর্যন্ত গান্ধী তার ভারতীয়দের হয়ে দাবির তালিকা পেশ করেন তাতে ঢুকিয়ে নেন অন্য ভারতীয়দের পরামর্শে, কারণ তা না হলে সর্বভারতীয় নেতৃত্ব মূর্তিটি একটু নড়বড়ে হয়ে যাবে। আফ্রিকার দিকে অবলোকন করতে হলেও আমাদের সেখানে গান্ধী মাহাত্ম্যেই স্থিত থাকতে হবে? তাঁর তখনও প্রকৃত 'মহাত্মা' হতে একটু দেরী আছে, টলস্টয় ফার্ম খুললেও— এসব কথা স্বীকার করে নিতে যদি অসুবিধা হয় তবে ঐ অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশের দিকে প্রকৃত শ্রদ্ধা নিয়ে তাকানো সম্ভব হবে না। এরই সঙ্গে যদি আমরা ১৯২৪ সালে বেনিয়া সরোজিনী নাইডুর মুখনিঃসৃত দাবী শুনি পূর্ব-আফ্রিকাকে ভারতকে কলোনী বানাবার, কেননা "ভারতীয় ভুরু নিঃসৃত ঘামেই নাকি পূর্ব আফ্রিকা প্রগতি।" (দক্ষিণ আফ্রিকা বিষয়ে বুয়ররাও ঐরকম কথা বলত!) তাহলে ভারত থেকে ভারত বহির্ভূত এলাকার দিকে দৃষ্টিপাতের চেহারাটা খুব একটা সম্মানজনক প্রতীয়মান হবে না আফ্রিকার পক্ষে। এর সঙ্গে যদি বানারসীদাস চতুর্বেদীর 'পুরাকালের ঋষিদের মন্ত্রবলে আরো অধিকসংখ্যক

ভারতীয় এখুনি (১৯০৬—৭ নাগাদ) পূর্ব আফ্রিকাতে এনে ছড়িয়ে দেওয়া হোক পুষ্পক রথে ভরে'—জাতীয় আকাঙ্খাকে জুড়ে দেওয়া হয় তাহলে গুরুদেব বা কবিগুরু যাই বলুন "মান হারা মানবী"কে আরো মান হারা করার ব্যাপারে আমাদের ভারতবাসীরাও যে কম যান না, সেটা বেশ ভাল করে প্রতিপন্ন হবে। আমি 'ভারতবর্ষ' পত্রিকা (পৌষ ১৩২২, দ্বিতীয় খণ্ড প্রথম সংখ্যা পৃঃ ১৬৪—১৬৫) থেকে আরেকটা উদাহরণ দিই। লেখক: নলিনীমোহন রায়চৌধুরী। বর্তমান জাম্বিয়া রাষ্ট্রের উত্তরাঞ্চলের অধিবাসী প্রধান 'জাতি' বেম্বা (Bemba) দের বিষয়ে লেখক জানাচ্ছেন "ওয়াবেম্‌বাদিগকে অল্পদিন হইল বশে আনিতে পারা গিয়াছে (অর্থাৎ ইংরেজরা তাদের বশীভূত করেছেন)। .....ইহাদের প্রকৃতি অনেকটা মেয়ে মানুষের মত। ধর্ম্ম ইহাদের নাই বলিলেই হয়। কেবল সেই প্রাচীন কুসংস্কার—পূর্বপুরুষ ও ভূতপ্রেতের পূজা। ইহাতেই তাহাদের অগাধ বিশ্বাস।" ব্যক্তিগতভাবে আমার বেম্বাদের সঙ্গে ভালরকম সাক্ষাৎ পরিচয় আছে, তাদের মধ্যে অনেক অনেক মহিলা আছেন যারা সর্বদিক থেকেই পুরুষের সমকক্ষ, এবং নিশ্চয় কিছু পুরুষ মানুষ থাকবেন যারা হয়ত চলতি ধারণায় 'মেয়েলি'। প্রথম রাষ্ট্রপতি কেনেথ কাউণ্ডা বক্তৃতা দেবার সময় সর্বদা পকেট থেকে রুমাল বার করে তার দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ ভাইদের জন্য চোখের জল মুছতেন— এখন সেটা Political strategy না effeminacy-র চিহ্ন তা বিচার করুন রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং 'জেণ্ডারস্টাডিস' এর পণ্ডিতগণ কিন্তু জাতকে জাত 'মেয়েমানুষের মত' লেবেল আঁটার মধ্যে নারী অবমাননা তো আছেই, আর আপত্তিকর কলোনিয়াল এনথ্রপলজির অশুভ ছায়াপাত! এখানেই আফ্রিকার নিজস্ব ইতিহাস, তার "Inner dynamism" (Jean Laup Amselle, প্রবন্ধ : 'History and Anthropology,' পত্রিকা : History and Theory, Westleyan University, Vol 23, No. 1, 1994) বিষয়ে বেম্বাদের ঘিরে একটা ছোট ছবি রেখে দিই। বান্টু ভাষাভাষী এই জাতি মধ্য আফ্রিকার বিখ্যাত মোয়াতা ইয়াম্‌ভা রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে (যে অঞ্চল ছিল বর্তমান জাইরের ভিতরে) বর্তমান জাম্বিয়ার উত্তরাঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিল ১৬-১৭ শতাব্দী নাগাদ। এরা ছিল মাতৃকুলধারাবাহী (Matrilineal) সমাজ, কেবলি এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে চলে যাবার পিছনে সেই কারণ ও সক্রিয় অন্যান্য কারণ অর্থাৎ স্থানাভাব, খাদ্যাভাব, জলাভাব ইত্যাদির সঙ্গে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি, অর্থাৎ লিভিংস্টোন যখন ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত "আবিষ্কার" করে ফেলেছেন, সেই সময় চিটিমুকুলু উপাধীধারী বেম্বা রাজ্য বাংগুয়েলু (Banguwelu) হ্রদের মৎস্য সংগ্রহ মালভূমিতে প্রচুর ভুট্টা উৎপাদন করে যখন পার্শ্ববর্তী জাতিগুলির সঙ্গে বাণিজ্যের মাধ্যমে রাষ্ট্রকে সংহত করে নিল, তখন তারা দেখল যে

চিটিমুকুলুর পদ্ধতি এবং সেই সঙ্গে সম্পত্তির উত্তরাধিকার ক্ষেত্রে এবং পিতৃকুলানুসরণ (Patrilineality) অনেক বেশি সুবিধাজনক তাই বদলে নিল সামাজিক ব্যবস্থা। এই রাষ্ট্রটিকে ইংরেজদের নর্দান রোডেশিয়া নামে কলোনি (কেতাদুরস্ত ভাষায় অবশ্য "প্রোটকটরেট") বানাতে আফ্রিকা বিভাজনের সময় বেশ বেগ পেতে হয়েছিল ঠিকই। তাই বলে সুসভ্য বাঙ্গালী প্রবন্ধ লেখক যদি বলে এই মেয়ে মানুষের মত অসভ্যগুলোকে শেষ পর্যন্ত 'বশে আনা গেছে' তবে তাতে যে মৌল মনোভাব প্রকাশ পায়—দুঃখের বিষযে আজো সেই মনোভঙ্গি সমানভাবে ব্যাপক, সর্বস্তরে। কী নামী লেখকের জনপ্রিয় উপন্যাসে (যথা সমরেশ মজুমদারের 'কালবেলা' ও 'সাতকাহন') কি ছাত্র-শিক্ষকদেরও সাধারণ কথাবার্তায়। Refresher Course-এ আমার এক বক্তৃতার পর কোনো এক আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট কলেজের অধ্যাপিকা পরের দিন আমাকে এসে বলেন বাড়িতে গিয়ে "আজ আফ্রিকার ইতিহাস" বিষয়ে কিছু কথা শুনে এলাম। শুনে তার পুত্রসন্তান নাকি বলেন "ও, নবখাদকদের আবার ইতিহাস!' ১৯৯৩ সালে? দেখাই যাচ্ছে — শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় যে শিশু-কিশোর সাহিত্যের মাধ্যমে আমাদের মনে কৃষ্ণাঙ্গ আফ্রিকানদের প্রতি প্রবল প্রকট বা প্রচ্ছন্নভাবে অপমানকর মনোভাব তৈরি করে দেওয়া হয়েছে (পুস্তকঃ গোপাল রাখাল দ্বন্দ্ব সমাস ঃ উপনিবেশবাদ ও বাংলা শিশুসাহিত্য, প্যাপিরাস, কলকাতা ১৯৯১) তা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন তার কোন ফল শিশু বা শিশুর পিতা (মাতা)দের ওপর এখনও বর্তায়নি, কারণ এ ব্যাপারে এখনও "ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুদের অন্তরে!"

পূর্বপ্রসঙ্গে, অর্থাৎ বেস্বা প্রসঙ্গে ফিরে গিয়ে তাকে ঘিরে আরো দু'চার কথা বলে নিই। 'অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশের' সঙ্গেই কান টানলে মাথা চলে আসার মত করে উদয় হয় "আবিষ্কার"-পূজন। অর্থাৎ অমুকে এসে 'আবিষ্কার' করে আফ্রিকার যেন অস্তিত্বটাকেই তৈরি করে দিল—তার আগে তা ছিল না কোথাও! মোসি-ও-তুনিয়া (ধূমায়িত বজ্রগর্জন) নামে জাম্বেমি নদীর এই জলপ্রপাতের খবর বাইরে লোকের কাছে পৌঁছে দেবার ব্যাপারে লিভিংস্টোনের আকস্মিকভাবে লব্ধ জ্ঞান নিশ্চয় ফলপ্রসূ, কিন্তু "আবিষ্কার" বাচনের মধ্যে উদ্ধার কর্মের ব্যাপারটা লেগে থাকে। দ্বিতীয় কথার ব্যাপারে আমি আবার একটু জাপান প্রসঙ্গ টানছি। এখানে আমরা বেস্বা উপস্থাপনায় কৃষ্ণাঙ্গদের অপমান করেছি, অথচ পূর্ব নির্দিষ্ট রাজনৈতিক/ঐতিহাসিক কারণে জাপানকে কীভাবে বন্দনা করছি এর আর একটা উদাহরণ রাখি ঃ অন্তঃপুর পত্রিকার ১৯০৪ খৃষ্টাব্দর মে মাসের সংখ্যায় (খণ্ড-৭, সংখ্যা-১, পৃঃ ১৩১) 'জাপান' শীর্ষক এক প্রবন্ধে অজ্ঞাতনামা লেখক রুশ-জাপান যুদ্ধে জাপানী জাতীয়তাবাদের প্রেরণাকে আদর্শস্থল রূপে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতে গিয়ে এই কথা বলছেন,—"পৃথিবীর যেখানে

যত জাপান. নরনারী বাস করিতেছেন সকলেই যথাসাধ্য স্বদেশের রক্ষার্থে অর্থ সাহায্য করিতেছেন। এমন কি কলকাতার প্রবাসী বারবণিতাগণ ও কয়েক সহস্র মুদ্রা স্বদেশের জন্য প্রেরণ করিয়াছেন।" কলকাতায় জাপানী বারবণিতার বিষয়টি সামাজিক ইতিহাসের দিক থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, গবেষণার বিষয় হতে পারে তা, কিন্তু যেহেতু তা ঠিক ভারত বহির্ভূত বিষয় নয়, তাই সেটা আপাতত আমার আলোচনার এক্তিয়ারের বাইরে। জাপানী বন্দনার মানসিকতাই আমার কাছে এখানে গুরুত্বপূর্ণ আফ্রিকান অবমাননার প্রতিতুলনায়।

তৃতীয় কথাটি হল— এই বেম্বা প্রাক্-ইয়োরোপীয় পর্বের সংহত রাষ্ট্র হিসাবে মধ্য আফ্রিকার এ অঞ্চলে একক সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের মনে পড়বে এদের পশ্চিমবর্তী লুয়াপুলা নদী তীরবর্তী লুণ্ডা (Lunda) দের বিখ্যাত 'কাজেম্বে' রাজ্যের কথা, যাদের শক্তির অর্থনৈতিক উৎস ছিল লুয়াপুলার মৎস্য এবং বর্তমান কাটাদা প্রদেশ (জাইর) এর তাম্রখনি। এই খনির উপর কাজেম্বে (Kazembe) উপাধিকারী রাজাদের ছিল পূর্ণ কর্তৃত্ব — যা বাইরে থেকে আরব মোয়াহিনী বা পর্তুগীজরা এসে টলাতে পারেনি—দূর পাল্লার বাণিজ্যভিত্তিক এদের সমৃদ্ধির সাক্ষী হিসাবে এখনও বর্তমান সুবিশাল, সুবিন্যস্ত কাজেম্বে গ্রাম—সে রাজ্যের (সপ্তদশ শতাব্দী থেকে ১৯০২ খৃঃ পর্যন্ত বজায় ছিল যার গৌরবময় অস্তিত্ব) রাজধানী—যাকে গ্রাম না বলে শহর বলতে বাধা কী এই প্রশ্নকে ঘিরে কিছু পরে আমি প্রাক্-ইয়োরোপীয় আফ্রিকায় নগর ঘটন ও নগরত্ব প্রসঙ্গে দু-চার কথা বলব।

আরো দক্ষিণে জাম্বেসি নদীর ওপারে আমরা গ্রেট জিম্বাবোয়ের দুর্গসম্বলিত মুয়েনি মুটাপা রাজ্যের কথা বলতে পারে। যে রাজ্যের সঙ্গে ভারত মহাসাগরের তীরবর্তী বন্দর সোফালা (Sofala)র মাধ্যমে চীন ও ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যেরও প্রত্নতাত্ত্বিক (ফুকোর অর্থে নয়! 'বৈজ্ঞানিক' অর্থেই) সাক্ষ্য পাওয়া গেছে রাজধানী জিম্বাবোয়েতে, যাকে ১৮২৪ খৃষ্টাব্দ নাগাদ ধ্বংস করে ছিল দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে আগত ন্‌গোনি (Ngoni) জাতি জোয়ান্‌গেনডাবা (Zwangendaba)র নেতৃত্বে, তারা আবার তাড়া খেয়েছিলেন শাকা জুলুর। এই তাড়া খাওয়া এবং অন্যত্র গিয়ে বসে নতুন করে রাজ্য গঠন এ হল আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চলে ম্‌ফেকানে (Mfecane) নামক বিপুল ঘটনার অভিঘাত। কলোনিয়াল শিক্ষা ব্যবস্থার প্রভাবে আমরা বুয়রদের Great Trek এর কথা শুনেছি, কিন্তু Mfecane কথা এসে পৌঁছয়নি। পৌঁছলেও ঐ ধরনের লেখা যাতে হয়ত ন্‌ডেবেলেদের বলা হত 'মেয়েমানুষের মত', আর ন্‌গোনিদের বলা হত 'ডাকাতের মত', বা কোলোলোদের ভাষাকে বলা হত 'বানরের কচকচি' (নরেন দেব মহাশয় ভারতবর্ষ

পত্রিকায় এরকম একটি প্রবন্ধে পিগ্‌মিদের ভাষা সম্পর্কে ঐ বিশেষণ প্রয়োগ করেছেন।

এখন এই যে প্রাক ইয়োরোপীয় পর্বের আফ্রিকা মহাদেশের ইতিহাসের বিষয়বস্তুর কয়েকটা উদাহরণ এখানে আলগোছে রাখা হল— তাকে ঘিরে একটা বিরাট সমস্যা, সেই সমস্যার সমাধানকল্পেই নানাস্কুল-এর গবেষকদের যে দ্বারা সেই 'ইতিহাসের' উদ্ধার, আবার সেই উদ্ধার কর্মকে সাম্প্রতিক কালের সংশয় বা অবজ্ঞাপ্রকাশ— এইসব মিলে আফ্রিকান হিস্টোরিওগ্রাফির ক্ষেত্রটা বিশেষ রকম জটিল করে তুলেছে।

সমস্যাটির সূত্রে ছিল কলোনিয়াল নৃতত্ত্ববিদ্যা ও কলোনিয়াল অফিসারদের ইতিহাস পুস্তক রচনা যথা: Burns এর History of Nigeria বা Ward এর Histroy of Gold Coast ইত্যাদি, এবং সম্ভবত তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ১৯৬৩ সালে ট্রেভর-রোপারের(Trevor-Roper) সেই কুখ্যাত উক্তি! উক্তিটি দীঘ; তার অনেকটাই আমি ইতিহাসের ছাত্রদের জন্য উদ্ধৃত করব, কেননা এতে মানহারা মানবীকে অপমান করা ছাড়াও আছে 'ইতিহাস' ধারণাক্ষেত্রে নিকৃষ্ট স্তরের ইয়োরোপীয 'মডার্নিজম'-এর একটি প্রকট উদাহরণ। আমি কিছুটা মূল ইংরেজিতে রেখে বাকিটা বাংলা অনুবাদ করে দিই— "হয়ত ভবিষ্যতে (কযেক শতাব্দী পরে) আফ্রিকার ইতিহাস বলে কোনো বিষয়কে শিক্ষনীয় মনে করা যেতে পারে, কিন্তু বর্তমানে সে রকম বিষয় বলে কিছু নেই: যা আছে তা হল আফ্রিকাতে ইয়োরোপীদের ইতিহাস। বাকিটা অনেকটাই প্রি-কলম্বিয়ান আমেরিকার ইতিহাসের মত প্রকৃত পক্ষে তমসা। তমসা কখনও ইতিহাসের বিষয় হতে পারে না।" অর্থাৎ এই অভিমত অনুযায়ী শুধু আটলান্টিকের পূর্বপারে আফ্রিকাই নয়, পশ্চিমপারের মায়া, আজটেক, ইন্‌কাদেরও কোন ইতিহাস নেই। তারপর ট্রেভর-রোপার সাহেব একটু ক্ষ্যামাঘেন্না করে বলেছেন— "I do not deny that men existed even in dark countries and dark centuries, nor that they had political life and culture (অসভ্যদের পক্ষে যতটুকু 'রাজনৈতিক' ও 'সংস্কৃতি' সম্ভব ততটুকু যাকে ট্রেভর-রোপার একটু পরেই বলেছেন "Unrewarding gyrations of barbarous tribes in pictureque but irrelevant corners of the globe" যা নিয়ে তার নাকি মজা করার মত সময় নেই) interesting to sociologists and anthropologists, but history, I believe is eventually a form of movement, and purposive movement too." এই নিকৃষ্ট স্তরের ইয়োরো-কেন্দ্রিকতা ও 'অসভ্যদের' গতিবিহীন সমাজ বরং নৃতাত্ত্বিকদের ক্ষেত্র, ইতিহাসের নয়— এই অপমানকর মনোভঙ্গির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ থেকেই ৬০

থেকে ৮০'র দশকের মধ্যে নানা ঐতিহাসিকের (তাদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের মতভেদ সত্ত্বেও) গবেষণার, উদ্যমে আফ্রিকার প্রাক-ইয়োরোপীয় পর্বের "ইতিহাস" ও উদ্ধার ও রচনা করা সম্ভব হয়েছে। "নৃতত্ত্ব"ও এর মধ্যে অনেকটা বদলে গেছে তবে আর বেশি বদলালে ওটা আর আলাদা 'বিষয়' হিসাবে গণ্য হবার মানে থাকবে না, সোসিওলজির অন্তর্গত হবে বলে আমার ধারণা— কেননা "প্রিমিটিভিজম" থেকে মুক্ত হলে তা হতে বাধ্য।

এই উদ্ধারে যেটা সম্ভব হয়েছে সেটা এই— আফ্রিকাকে পিণ্ড পাকিয়ে একটা একসত্তা বিশিষ্ট কম্যুনিটি (সোসাইটি নয়) বানাবার এককালীন সুবিধাজনক সমসত্তাকরণ হার মেনেছে, অন্তত মানা উচিত। অর্থাৎ পশ্চিম আফ্রিকার সোংঘের মত সুগঠিত 'রাষ্ট্র'র সঙ্গে বর্তমান নাইজেরিয়াব ইবো (Ibo, বা Igbo) দের ছোট ছোট 'তথাকথিত' মাথাবিহীন (acephalous) সমাজকে এক করে দেখা আর সম্ভব নয়। তার মানে আবার এই নয় যে 'মাথাবিহীন সমাজ' ছিল একেবারে সমস্যা-শূন্য পূর্ণ-সাম্যাশ্রয়ী শান্তির নীড়, সেখানে 'মাথা' বা মোড়লদেব অর্থাৎ নাইজেরিযাব টিভ্ (Tiv) "উপজাতি"র টর্-টিভ্ উপাধিধারী 'সর্দার'-এর বা পূর্ব আফ্রিকার মাসাইদের আথিমাকি (Athimaki) উপাধিধারী দলপতিদের "Power" বলে বালাই ছিল না, শাসক-শাসিত সম্পর্ক সেখানে সম্পূর্ণ অবান্তর, এবং রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল যে সব সমাজে যেমন পশ্চিম আফ্রিকার ইয়োরুবাদের ওইয়ো (oyo) রাষ্ট্র, বা জিম্বাবোয়ের শোনাদের (Shona) জুয়েনিমুটাপা রাজ্য সেখানে শাসকদের ক্ষমতা ছিল সম্পূর্ণ নিরঙ্কুশ। এই সরলীকরণের বিরুদ্ধে যারা সাবধান করেন তাদের মধ্যে ফ্রান্সের 'ইতিহাস' চেতনাসম্পন্ন নৃতাত্ত্বিক জঁ-লু আমসেল্ (Jean-loup Amselle, প্রবন্ধ Anthropology and History, পত্রিকা, History and Theory, (Wesleyan University, vol 2 3, No 1, 1994) অন্যতম। তিনি বলছেন: "If the opposition between people of power and people of the earth is apparent in segmentary societies, the same is also true in societies with a central political power." (অর্থাৎ পুরাতন ওইয়োর আলফিন উপাধিধারী রাজা, বর্তমান ঘানাস্থিত এককালীন রাজ্য আশান্টের রাজা আশানটেহেনে, বুগাণ্ডা রাজ্যের অধিপতি কাবাকা ইত্যাদি)।

কাজেম্বের কথা আমাদের অন্য একটা প্রসঙ্গে নিয়ে যাবে— প্রাক্-ইয়োরোপীয় পর্বে আফ্রিকায় নগরীভবন ও নাগরিকতার প্রশ্ন। এ ব্যাপারে যেটা প্রাথমিক সমস্যা সেটা হল যাদের 'নগর' বলা হচ্ছে অর্থাৎ এই কাজেম্বে (একে অবশ্য সব সাহেব সমাজবিজ্ঞানী 'নগর' বলে স্বীকৃতি দেননি) বা পশ্চিম আফ্রিকার হাউসাদের কানো (Kano), কাটসিনা (Katsina), বা ইয়োরুবাদের ইফে (Ife),

ইবাদান, বা বিনিদের বেনিন (Benin), বা সোংঘেদের তিম্বুকতু (Timbuktu), জেনে (Djenne), গাও (Gao), এসব সত্যিই শহর ছিল, না বড় গ্রাম ছিল— এই প্রশ্নকে ঘিরে। একাডেমিক মহলে প্রধান চালু পদ্ধতি হল প্রধানত পশ্চিমী সোসিওলজিস্টদের (Wirth, Djobug, P C. Lloyd ইত্যাদি) দত্ত নগরত্ব লক্ষণ (সেখানেও অনেক মত পার্থক্য বিদ্যমান) গুলি প্রয়োগ করে দেখানো যে আফ্রিকান এই নামের অঞ্চলগুলিব 'আর্বানিটি'র দাবী ধোপে টেকে কিনা। তা ছাড়া আরেকটা পথ অনুসরণ করা হয় নগরত্ব নির্ধারণ— সমসাময়িক বাইরের পর্যটকরা কী বলে গেছেন তা দেখা। সেখানে দেখা যাবে— সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দিকের ওলন্দাজ পর্যটক ওলফের্ট ডাপের (Olfert Dapper) বেনিন শহরের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, তাঁর ছবি এঁকেছেন ওলন্দাজরা, বলেছেন এ শহরেব রাস্তাঘাট সুপরিকল্পিত এবং পরিচ্ছন্নতায় আমস্টারডামকে পরাজিত করে। তখনও শ্বেতাঙ্গদের কৃষ্ণাঙ্গ অবজ্ঞা উনিশ শতকী সংহত বর্ণ বিদ্বেষের মতাদর্শে পরিণত হয়নি তেমন করে। ঊনবিংশ শতাব্দীতেও 'নগরত্ব'-স্বীকৃতি মিলবে পশ্চিম আফ্রিকার অনেক শহরের বার্থ (Barth) নাখ্‌টিগাল (Nachtigal) বা রনে কাইয়ে (Rene caillie) র মত পর্যটক বা হিন্‌ডরের (Hinderer) এর মত ক্রীশ্চান মিশনারিদের কাছ থেকে। কিন্তু নগরবিন্যাস, পরিখা ও প্রাচীর নির্মাণ, বাজার, বাণিজ্য সংস্থা ইত্যাদির কিছুটা প্রত্নতাত্ত্বিক খতিয়ান ছাড়াও এখানে অন্য একটা বিষয়ের দিকে দৃষ্টিপাত বোধহয় খুব জরুরী। সেটা হল হাউসা, বা ইয়োরুবা বা সোংঘে বা তুয়ারেগ ভাষাতে গ্রাম ও শহর / নগর-এর পার্থক্য চেতনার কোন চিহ্ন আছে কিনা এবং সে চিহ্ন সাহেবরা আসার আগেই তৈরি হয়েছে কিনা। দেখা যাবে এখানে প্রশ্নের উত্তরটা সদর্থক, অর্থাৎ আছে। যেমন বর্তমান উত্তব নাইজেরিয়ার হাউসা ভাষায় গ্রাম = কাসা (Kasa), ছোট শহর = গারি (Gari), প্রাচীরবেষ্টিত বড় নগর = বিরনি (Birni); ইয়োরুবা ভাষায় ছোট পাড়াগাঁ = আবুলে (abule), বড়গ্রাম = ইলেটো (ileto), বাজার কেন্দ্রিক ছোট শহর = ওলোজা (oloja), বড় রাজধানী শহর = ইলু আলাডে (ilu alade), অধীনস্ত শহর = ইলু ক্রেকো (ilu creko) ইত্যাদি। এদিকটার মধ্যে আফ্রিকান মানসেই গ্রাম শহর পার্থক্য নির্দেশের স্পষ্ট চিহ্ন রয়েছে— এবং এই শব্দগুলি আরবরা বা সাহেবরা শিখিয়েছেন কারো সে কথা মনে করবার কারণ নেই কারণ সুপ্রাচীন মৌখিক সাহিত্যের ঐতিহ্যেই তার সাক্ষ্য আছে। শুধু সোংঘেদের দুচারটে শব্দ যেমন 'আব্রজা' (abradja) কথাটা আরবী ভাষা থেকে আমদানী, যার অর্থ 'গ্রামীণ'— কিন্তু একে অবধারিতভাবেই বহিরাগত ইসলাম সংস্কৃতির শিক্ষা মনে করবার কারণ নেই কারণ আফ্রিকার এই অঞ্চলের নাগরিক-সংস্কৃতিতে ইসলামের 'অবদান' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও, প্রত্নতাত্ত্বিক

ভাবেই দেখানো গেছে যে 'নগরগুলো' সেখানে নগর হয়ে উঠেছিল অনেক ক্ষেত্রেই ইসলাম এসে বসবার আগেই— পরবর্তীকালে ইসলামের অভিঘাত যে নগরত্বকে নানাভাবে পুষ্ট ও সমৃদ্ধ করলেও।

এবারে আমার আরেকটা সমস্যার কথা উল্লেখ করে আমি 'ইতিহাসের উপাদান' বিষয়ক অতি পরিচিত বিষয়টা সম্পর্কে আফ্রিকক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক দুচার কথা সংক্ষেপে সারব। দিল্লী থেকে আগত এক চীন বিষয়ক প্রখ্যাত পণ্ডিত আমি আফ্রিকার 'ইতিহাস' নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করি বলে চোখ কপালে তুলে সহানুভূতির সুরে বলেছিলেন— কিন্তু 'রেকর্ড' এর সমস্যা পূরণ করেন কী করে? অর্থাৎ যা 'রেকর্ডেড' হয়ে ভারতের, আফ্রিকান দেশের বা ইয়োরোপ আমেরিকার মহাফেজখানায় হলদেটে কাগজ হযে বসে নেই কোন গবেষকের আঙ্গুলি স্পর্শের অপেক্ষায় তা বা সেই অতীতটা ছিলই না! সর্বাধুনিক ইতিহাসচিন্তায় এজাতীয় মনোভাবকে বিশেষভাবে সন্দেহ করা হচ্ছে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে— 'History in Africa' নামক পত্রিকা (Atlanta University) র ১৯৯২ সালের ১৯তম খণ্ডে প্রকাশিত Thomas E. Turner লিখিত "Memory, Myth and Ethnicity" প্রবন্ধে। তাছাড়া মৌখিক, লিখিত বিভিন্ন ধরনের উপাদানের সঙ্গে প্রত্নতত্ত্ব (ফুকোর অর্থে নয়, প্রচলিত অর্থে!), সমাজততত্ত্ব, সাহিত্য, শিল্পকর্ম সব একত্রে নিয়ে যাকে 'interdisciplinary' প্রথা বলা হয় সেই পথে ইতিহাস চর্চ্চার অবকাশ এই মহাদেশের ক্ষেত্রেও আছে এবং সে ধরনের কাজ এগিয়েও গেছে। বিষয়টা স্বতন্ত্র প্রবন্ধের দাবী রাখে। একটা উদাহরণ শুধু রাখি এখানে— প্রাচীন ঘানা (বর্তমান ঘানার সঙ্গে তার কোন সাক্ষাৎ ভৌগোলিক বা অন্যরকম সম্পর্ক নেই)-র রাজধানী নগর কুম্বি সালে (Kumbi Salch)-র লিখিত বর্ণনা পাওয়া যায় স্পেনীয় মুসলমান আল-বকরীর রচনাতে (১০৬৭ খৃঃ)। তিনি তথ্য সংগ্রহ করেছেন সেখান থেকে আগত আরব-কাবার বণিকদের কাছে। তার বর্ণনায় সেখানকার প্রাক্-ইসলামিক নগরীকরণ ও ইসলামের শান্তিপূর্ণ (জিহাদের মাধ্যমে নয়, এবং প্রথম প্রবেশ নিম্নবর্গমাধ্যমে) ক্রমশ আগমনের সূত্রপাতের মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। তার সঙ্গে 'এথনিসিটি'র দিক থেকে যোনিংকে (Joninke) "উপজাতি"র লোকগাথা (মৌখিক) এবং খনন কার্য্যে কুম্বিসালের ধ্বংসাবশেষ আবিস্কার-আফ্রিকার এই অঞ্চলের 'ইতিহাস' বিশেষ আমার জ্ঞানলাভে বিশেষ সহায়ক হয়েছে— যে "জ্ঞানলাভ" কর্মটি 'ইতিহাস'এর ক্ষেত্রে এখন "পোস্ট স্ট্রাক্চারালিস্ট"দের অনেকের কাছে সন্দেহ এমনকি উপহাসের বস্তু 'তথ্য'ও তাই।

আমার এ কথায় যেন আবার কেউ মনে না করেন যে ইতিহাসের 'জ্ঞানদান' বিষয়ে আমার নিজের মনে কোন রকম সংশয় আদৌ নেই। এই যে রাষ্ট্র

বা গ্রাম বা যে কোন সংস্থার 'উৎস' কে ঘিরে যত রকম জনসঞ্চরণ, বা বহিরাগত স্থানীয "আদিবাসী"দের পরাজিত করে অধিপত্য স্থাপন ইত্যাদি বিষয়ে মৌখিক মিথ (যেমন হাউসাদের 'Bayazida legend' বা ইয়োরুবাদের 'Oduduwa legend') সেগুলি কতটা 'সত্য', কতটা ক্ষমতা স্থাপনকে বৈধকরণের পণ্য তৈরী করা কাহিনী এ সমস্যা তো থেকেই যাচ্ছে। যেটা বর্তমানে ইতিহাসের ছাত্রদের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হতে পারে তা হল এই ধরনের উৎস-কাহিনীর নির্মাণের পিছনের মানসিকতার অনুসন্ধান। তেমনি সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে শিল্পকর্মের ইতিহাস বচনা বা শিল্পকর্মকে ইতিহাসের উপাদান হিসাবে প্রয়োগ। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক, নাইজেরিয়া থেকে। উত্তর নাইজেরিয়ার 'নোক' গ্রামে এপর্যন্ত অনুসন্ধানে প্রাপ্ত জ্ঞান হল এই: এই গ্রামটি আফ্রিকার ঐ অঞ্চলের একটি আদিতম লৌহগলন কেন্দ্র এবং এখানকার টেরাকোটা মৃন্ময় মূর্তিগুলি আকৃতিতে ছোট, শিল্পগুণে অতুলনীয়। শিল্পকর্মের বিশেষজ্ঞদের অনেকের মতে এর সঙ্গে এর পাঁচ ছয় শতাব্দী পর (দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দী) উদ্ভূত ইফে (Ife) মূর্তি, এবং তার সঙ্গে আবার পঞ্চদশ-শতাব্দীর বেনিন ব্রোঞ্জ মূর্তির মধ্যে এমন একটি শিল্পরীতির ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করার মত যে এতে প্রমাণ হয় বেনিন সভ্যতার উৎস ইফেকেন্দ্রিক ইয়োরুবা সভ্যতা, আবার ইয়োরুবা সভ্যতায় নোক-এর উত্তরাধিকার বর্তেছে (Morton-Williams এর বিভিন্ন লেখায় আলোচিত)। এর সঙ্গে ইয়োরুবাদের 'মৌখিক ঐতিহ্যে' বেনিনের রাজবংশ উৎস কাহিনীতে যে কাহিনী আছে অর্থাৎ পুরাতন ওয়ো রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ওরানিইয়ান (Oranyan) নাকি এই বংশের এক রাজকন্যার গর্ভে পুত্র উৎপাদন করেন, তিনিই প্রথম ইওয়েকা (Eweka I) নামে নব পর্য্যায়ে বেনিন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন— Oba' রাজোপাধি সহ। (সম্ভবত পঞ্চদশ শতাব্দী)। এ মতের সমর্থন পাওয়া যায় বিওবাকু (Biobaku, Origin of The Yombas, Lagos, 1956) ও ওগানে (Oganc) নামক আফ্রিকান ঐতিহাসিকদের লেখাতেও। কিন্তু সম্প্রতি বেনিনের 'বিনি' ঐতিহাসিকের বেনিন রাজ্যের অতীতের এইরকম ব্যাখ্যাকে সত্যকারের 'ইমাজিনেশন' বলে ধিক্কার দিচ্ছেন— বলছেন এটা ইয়োরুবাদের বানানো কথা— তারাই এ অঞ্চলে সবাইকে সব শিখিয়েছেন বলার জন্য। রেঞ্জার (Terence Ranger, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্ট অ্যানটনিস্ কলেজের আফ্রিকান স্টাডিসের অধ্যাপক) যে বর্তমানে এই ধরনের মতাদর্শকে "subimperia-lism" বলছেন (আদৌ গালাহারের দিক থেকে নয়!) তার একটা সূত্র এখানে নিহিত। আবার অনেকে হয়ত বলবেন নাইজেরিয়াতে বর্তমান 'বিভিন্নতাবাদ' (দক্ষিণ আফ্রিকাতে বর্তমান জুলু— 'বিচ্ছিন্নতাবাদ' এর মত) এর একটা সূত্র

এতে আছে রিনিদের এর রকম স্বয়ম্ভূত্বের দাবীতে। সে যাই হোক ইতিহাসের ছাত্রদের এদিকটা অবহেলা করবার মত নয়, বিচলিত না হয়ে।

বিচলিত হবার কথা উঠেছে diffusionism এর বড়ক্ষেত্রে। এতকাল বলা হত কৃষ্ণাঙ্গ আফ্রিকায় যা কিছু 'ভাল' 'সভ্য' জিনিস হয়েছে (ইথিওপিয়া সমেত) সবই তা বাইরে থেকে আমদানী, হয় গ্রীস, নাহয় ফারাওনিক ঈজিপ্ট, নাহয় "মধ্যপ্রাচ্য" থেকে। অনেকটা আমাদের "বৃহত্তর ভারত" ধারণার সঙ্গে তুলনীয়— এখন একটা উলটো হাওয়া বইতে শুরু করেছে। কৃষ্ণাঙ্গরাও কাদের কী শিখিয়েছে তাই দেখাবার উদ্যোগ। উদাহরণ হিসাবে দুটো বই-এর কথা বলছি। (১) শেখ আন্‌তা দিয়প (Anta Diop) রচিত, 'The African Origin of Civilisation, Myth and Reality (1956) ফরাসি ভাষায় প্রকাশিত হয়েছিল আগে, ইংরেজী অনুবাদে লভ্য হয়েছে পরে, এবং প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। (২) মার্টিন বের্নেলের (Bernel) সাম্প্রতিক বই Black Athena, London, 1987.

এ ধরনের অতীত ব্যাখ্যাব মধ্যে যে আহত অভিমান সক্রিয তাকে কোন না কোন ভাবে 'inferiority complex' জাতীয ব্যাপার বললেও বলা যেতে পারে, কিন্তু ট্রেভর-রোপর কটূক্তির বিরুদ্ধে জবাব হিসাবে আফ্রিকাব ইতিহাসের উদ্ধারের সামগ্রিক উদ্যোগকেই [যে উদ্যোক্তাদের মধ্যে ফেজ বা অলিভারের মত সাহেব আবার আজাযি (Ajayi), আকিন্‌জোবিন (Akinjogbin)-এর মত আফ্রিকান বুদ্ধিজীবীও আছেন]। Inferiority complex-এর ফসল বলে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করছেন অস্‌লো বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিত ফিন্‌ ফুগ্‌লেস্টাড্‌ (Finn Fuglestad: The Trevor-Roper Trap or the Imperialism of History, an Essay, (History in Africa পত্রিকা। ঐ)। তার ভাবখানা এই যে Trevor-Roper-কে আঘাত করা মরা ঘোড়াকে চাবুক মারা। আর আমাদেরও (একথা অবশ্য ফেজ্‌ এর বেলা খাটেনা!) 'ইতিহাস' আছে বলাটাই ইম্পারেলিয়াজিমের শিক্ষার প্রতিধ্বনি, তাই inferiority complex, কিন্তু ঘোড়া যে এখনও মরেনি, অন্তত ভারতীযদের কাছে সে কথা যে কত নির্মম সত্য সে কথা তো বলেছি। আর "তোমরা এতকাল বলতে আমাদের ইতিহাস নেই, তাকতে পারেনা, শুধু থাকতে পারে নৃতত্ত্ব, এই দেখ আমাদেরও ইতিহাস আছে" বলা মানেই হীনমন্যতা নয়, ওর একটা বিশিষ্ট রাজনীতিকতা আছে— ইতিহাস না থাকলেই বা কি আসে যায়— একথাও সত্য হলেও। সেই রাজনীতিকতাকে অপমান করা মানহারা মানবীকে অন্যদিক থেকে অপমান করা। সেখানে হীনমন্যতা যে কারো কারো লেখায় উঁকি দেয়না তা নয়। উদাহরণ দিচ্ছি। কেনিয়ান ঐতিহাসিক G. Ogot

১৯৭২-এ এক প্রবন্ধে শাকাজুলুর রাজ্যগঠনকে প্রাক-ইয়োরোপীয় 'রাষ্ট্র'ও 'নেশন' গঠনের উদাহরণ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে খামোকা শাকাকে নেপোলিয়নের সঙ্গে তুলনা করে বসেন। কিন্তু সবাই ত তা করেন না। তাই "ইমাজিনিং" "ইনভেনটিং" ধারণাগুলিকে যথেষ্ট ব্যবহার করলে আবার আফ্রিকা মহাদেশকে নতুনভাবে ইতিহাস হারা করা হতে পারে। সেখানে কতিপয় আফ্রিকান পণ্ডিতও সাম্প্রতিক সুরে কীভাবে গলা মেলাচ্ছেন তারও একটা উদাহরণ রাখি। A. O. Adeoye (আডেওইয়ে) হলেন নাইজেরিয়ার বেনডেল (এখন ঐতিহাসিক বেনিন শহর, রাজধানী যে প্রদেশের) স্টেট ইউনিভার্সিটির একাডেমিক ঐতিহাসিক। তিনি প্রবন্ধ লিখেছেন 'Understanding the Crisis in Modern Nigerian Historiography' নামে 'History in Africa' পত্রিকার ঐ একই সংখ্যাতেই। একটু উদ্ধৃতি দিই— "The business of history advocacy, elaboration, and research was championied by professionals trained in imperial institutions and / or in western type schools located in Nigeria itself, hence practioners used the same concepts and methods as those already established in Western Science"— বেশ কথা। কিন্তু আডেওইয়ে নিজেও ঐ অবস্থারই ফসল এবং তিনি নিজেও এখনও ঐ ধরনের 'আকাডেমিক' কাজই করে চলেছেন একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশ্রয়ে এবং প্রাক্তন-ইম্পেরিয়াল বিশ্ববিদ্যালয় অঞ্চলে ঘোরাফেরা করছেন— তিনি কিন্তু সব ছেড়ে ছুড়ে, আলখাল্লা পরে Griot বা চারণকবি হয়ে রাস্তায় নেমে পড়ছেন না! আর এই যে 'সংকট' নিয়ে ইতিহাস-চেতনা নিয়ে তার দুর্ভাবনা এটাও তার মাটি থেকে ওঠেনি— এও প্রাক্তন ইম্পেরিয়াল দেশগুলিরই পোস্ট স্ট্রাকচারালিস্ট পণ্ডিতদের কাছ থেকেই, ধার করে আনা। আমার মনে হয় "মডার্নিটি"র সমালোচনার নামে অবধারিতকে অস্বীকার করে আফ্রিকার ইতিহাস চর্চাকে এই খোঁচা মারার খেলায় না মজে, সতর্ক থেকেই একজন ভারতীয় ছাত্রর পক্ষে আফ্রিকার ইতিহাস-সন্ধান ও তার 'নির্মাণ'কেও শ্রদ্ধার চোখে দেখা উচিত।

প্রাচীন ভারত

সাঁচী ও মথুরায় প্রাচীন ভারতীয় মহিলাদের দান (২০০ খৃঃ পূঃ থেকে ২৫০ খৃঃ) —একটি মূল্যায়ন

রাজশ্রী মুখোপাধ্যায়

প্রাচীন ভারতের সামাজিক চালচিত্রে দান একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক কাজ ছিল, যা শুধুমাত্র সামাজিক নয় অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় কারণে দাতার জীবনে একটি বিশেষ মাত্রা যোগ করতো।

সাধারণভাবে বললে 'দান' কথাটির অর্থ দাঁড়ায় স্থাবর-জঙ্গম, হস্তান্তরযোগ্য সমাপ্তির হাতবদল। কিন্তু ভারতীয় ধর্মের প্রেক্ষাপটে ইষ্টাপূর্ত কর্ম হিসাবে দান বিশেষ মহিমায় মহিমান্বিত হযেছে। যাগ-যজ্ঞ ও পুকুর, কুযো, উদ্যান, মন্দির নির্মাণ ইত্যাদি জনকল্যাণমূলক কর্ম করে যে মর্যাদা ও পুণ্য অর্জন হয়, তাই হল ইষ্টাপূর্ত কর্ম থেকে প্রাপ্ত মোক্ষ। কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের থেকে গার্হস্থ্যজীবনযাপনকারীর কাছে দান-ধ্যানের মাধ্যমে পুণ্য অর্জন তাই অনেক বেশি জনপ্রিয় হয়েছিল। বৈদিক[১] ও বৈদিকোত্তর যুগের ধর্মশাস্ত্রে ও অন্যান্য সাহিত্যে দানের উল্লেখ পাওয়া যায, যেখানে মহিলা দাতারা বাদ পড়েননি। ঋক্‌বেদ[২] ছাড়াও, ছান্দোগ্য, মুণ্ডক বিভিন্ন উপনিষদে ও পুরাণে, ইষ্টাপূর্ত তথা দানের উল্লেখ আছে।

দানসামগ্রী হিসাবে প্রধান ছিল মুদ্রা ও জমি। বৈদিক যুগে গবাদি পশু, দাস-দাসী আর মূল্যবান ধাতু যেমন সোনা, রূপা দান করা হত। পরে অর্থ ও জমি দানের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। তবে মহিলাদাতাদের দান অনেক সময়েই কিছু বৈশিষ্ট্যে ও বৈচিত্র্যে ভাস্বর থাকতো। 'যেমন মহার্ঘ রত্ন বা অলঙ্কার (যা স্বভাবতই তাঁদের স্ত্রীধনের অংশ) এবং অন্নদান, যা মহিলাদের দানের একদম নিজস্ব চরিত্র, এবং তাদের দানকে এক সম্পূর্ণ ভিন্ন মাত্রা দিত[৩]।

বৈদিক যুগে উল্লেখ থাকলেও মৌর্যোত্তর যুগে, বিশেষ করে শক-সাতবাহন-কুষাণ যুগে প্রাপ্ত দানলেখগুলি থেকে অনুমান করা যায়, দান অনেক ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রসারের ফলে দানের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। এই দু ধর্মেই দানের ওপর অপরিসীম গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

কুষাণ-সাতবাহন যুগ ছিল মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম প্রসারের যুগ। থেরবাদ (স্থবিরবাদ) বৌদ্ধধর্মে শীলের ওপর যে জোর দেওয়া হতো, মহাযান বৌদ্ধধর্মে সেই জোর দেওয়া হয়েছে দানের ওপর। মহাযানে উল্লিখিত ছয় পারমিতার মধ্যে প্রথমোক্ত স্থান দেওয়া হয়েছে দানকে[৪]। তাই মৌর্যোত্তর যুগে যে সময় মহাযানের প্রচার ও প্রসার ঘটছে, তখন স্বাভাবিকভাবে দাতার সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য গোষ্ঠী হল মহিলাদাতারা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মাবলম্বী মহিলারাই দান বেশি করেছেন।

বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রাণকেন্দ্র হল বিহার। বিহারকে ভিত্তি করেই ধর্মীয় জীবনের চক্র আবর্তিত হয়, সঙ্ঘকে কেন্দ্র করেই সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডের সমাধা হয়। তাই পুরুষদাতাদের মত, মহিলাদাতাদের দান নিবেদিত ছিল বিহারের সাহায্যার্থে ও ধর্মকে কেন্দ্র করে যে শিল্প বা স্থাপত্য গড়ে উঠেছিল, তার নির্মাণকার্যে। "চুল্লবগ্গ' থেকে জানতে পারি যে মীগরর মা, বিশাখা, সঙ্ঘের জন্য একটি প্রাসাদ নির্মাণ করতে উৎসুক ছিলেন[৫]।

কার্লে, কুদা, ভারহুত, সাঁচী, মথুরা ইত্যাদি বহু জায়গায় দানলেখতে মহিলাদাতার উল্লেখ পাওয়া গেছে। তবে সাঁচী ও মথুরায় মহিলাদাতারা সংখ্যায় প্রচুর। তাই তৎকালীন মহিলাদাতাদের আর্থসামাজিক অবস্থান আলোচনা করতে সাঁচী ও মথুরাকেই আলাদাভাবে বেছে নিয়েছি। দানলেখগুলিতে সাধারণভাবে দাতার নাম, সে কোথাকার বাসিন্দা, তার জীবিকা কী, সে কোন সামাজিক স্তর থেকে আসবে এবং কেন দান করছে তার উল্লেখ থাকে। মহিলাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তারা নিজেদের স্ত্রী, কন্যা, মাতা, ভগ্নী বা শিষ্যা, অথবা ভিক্ষুণী, আর্যা! হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। দানলেখগুলির থেকে প্রাপ্ত তথ্যে মিল থাকায়, তার ভিত্তিতে এই দুই উল্লেখযোগ্য স্থানের দাতাদের তুলনামূলক আলোচনা করা সম্ভবপর হয়েছে।

প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসে, বৌদ্ধ স্থাপত্য ও শিল্পকলার নিদর্শনরূপে সাঁচীর গুরুত্ব অবিসম্বাদী। সাঁচী স্তূপগুলি ও তাদের কেন্দ্র করে যে তোরণ ইত্যাদি আনুষঙ্গিক স্থাপত্য আছে। তাদের থেকে ৮০০-র বেশি দানলেখ পাওয়া গেছে, যাদের সময়সীমা হল আনুমানিক ২য় খৃঃ পূঃ থেকে ১ম খৃঃ পূঃ-র মধ্যে। এর মধ্যে ৬৭৮টি দানলেখ কোনও পুরুষ বা মহিলার ব্যক্তিগত দানের উল্লেখ করে[৬]। এগুলি চাতালের পাথরে, শরদলে, স্তূপের রেলিংয়ে, নিবেদিত মূর্তির গায়ে, তোরণে ফলকে খোদিত হয়েছে। এই ৬৭৮টি দানলেখর মধ্যে ৩৫১ জন দাতা পুরুষ, এবং ৩২৭ জন দাতা মহিলা। অতএব দেখা যাচ্ছে, সাঁচীতে মহিলারা প্রায় পুরুষদের সমানই দান করেছিলেন।

মথুরাতেও মহিলারা দাতা হিসাবে খুবই উল্লেখযোগ্য। এখানে বৌদ্ধ ও জৈন দুই ধরনের দানলেখই পাওয়া গেছে। কঙ্কালী তিল থেকে প্রাপ্ত জৈন দানলেখগুলিতে মহিলাদাতাদের একাধিপত্য চোখে পড়ে[৭]। মথুরা থেকে প্রাপ্ত কুষাণ আমলের বৌদ্ধমূর্তিতে উৎকীর্ণ দানলেখগুলির কাল ১ম থেকে ৩য় খৃঃ-র মধ্যে। জৈন দানলেখগুলি এবই সমসাময়িক[৮]।

মথুরা থেকে প্রাপ্ত ১৩৩ মৌর্যোত্তর দানলেখের মধ্যে ৪৫টি লেখতে সুস্পষ্টভাবে মহিলাদাতার নাম পাই[৯]। আরও থাকতে পারে, কারণ বহু জায়গায় দাতার নাম নেই, বা অসম্পূর্ণ থাকার ফলে দাতার লিঙ্গ নির্দেশ সম্ভব নয়। কিন্তু যদি ৪৫টি-ই ধরা যায়, তাহলেও দেখা যায় যে ১/৩-র বেশি দাতা মহিলা। সুতরাং, প্রমাণিত হচ্ছে যে মথুরাতেও সাঁচীর মতই মহিলারা উল্লেখযোগ্য দাতা-গোষ্ঠী ছিলেন।

সামাজিক বা পারিবারিক অবস্থান উল্লেখ ছাড়াও, ভৌগোলিক অঞ্চল উল্লেখের মাধ্যমে মহিলারা নিজেদের পরিচয ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু সাঁচীতে যে পরিমাণ মহিলা, নিজেদের ভৌগোলিক অবস্থিতি বা কোন অঞ্চল থেকে তারা আসছেন বলে উল্লেখ করেছেন, মথুরায় তাঁব তুলনায ভৌগোলিক উল্লেখ নেই বললেই চলে।

সারণি—১

	সাঁচী	মথুরা[১০]
মহিলাব সংখ্যা (ভিক্ষুণীবাদ)	২১৮	২৮
ভৌগোলিক অবস্থান উল্লেখ করেছে	১০২	২[১১]

আবার সাঁচীতে ভিক্ষুর সংখ্যা বাদ দিয়ে ২৪৫ জন পুরুষদাতার মধ্যে (যারা গৃহী বা উপাসক) ১৩৫ তাদের বাসস্থানের ভৌগোলিক অবস্থানে দিয়েছে। এর থেকে স্পষ্ট যে মহিলাদের তুলনায় পুরুষদের ক্ষেত্রে ভৌগোলিক স্থানের উল্লেখ অনেক বেশি গুরুত্ব পেত। মহিলারা পারিবারিক সম্পর্কের ভিত্তিতে নিজেদের পরিচয় দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। গৃহী উপাসক ও উপাসিকার মধ্যে ৪৬.৭৯% মহিলার তুলনায় ৫৪.২৮% পুরুষ তাদের ভৌগোলিক অবস্থান চিহ্নিত করেছেন[১২]।

সাঁচীতে ভিক্ষুণীদাতার সংখ্যা ভিক্ষুর চেয়ে সামান্য বেশি (১০৬ জন ভিক্ষু ও ১০৯ জন ভিক্ষুণী[১৩])। মথুরাতেও দেখতে পাই যে জৈন লেখগুলিতে বেশ কিছু মহিলা রয়েছেন যারা সঙ্ঘের উচ্চপদে আসীনা। যেমন আর্য সঙ্গমিকা ও আর্য বসুলার উল্লেখ আছে যথাক্রমে No. II, ও No. XII লেখতে[১৪]।

'গ্রহ্য.....' (পুরো নাম পাওয়া যায় না) No.V, আর্য কুমারমিতা No. VII, নন্দা ও অক্কা No. XI, আর্য শামা No. XIV, আর্য ধামঠার No XXVI, উল্লেখ থেকে বোঝা যায়, যে তাঁরা আর শিশীনি বা শিশিনি অর্থাৎ শিষ্যার স্তরে নেই। তারা 'আর্য' (যার ইংরাজী প্রতিশব্দ ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে বলা যেতে পারে 'The venerable') স্তরে উন্নীত হয়েছেন, তাদের নিজেদের শিষ্যা বা শিষ্য রয়েছে এবং তারা নিজেকেই যে কেবল দান করছেন এমন নয়, তাঁদের অনুরোধে তাঁদের শিষ্য/শিষ্যারা দান করছেন এমন প্রমাণও লেখগুলিতে পাওয়া যায়। যেমন মথুরায় কোট্টিয়গর, স্থানীয় কুল, বৈরা শাখা, ও শিরিক সম্ভোগের অন্তর্গত গন্ধদ্রব্য ব্যবসায়ী কুমারভট্টি তাঁর মা কুমারমিত্রার অনুরোধে মূর্তি দান করেছেন[১৫]। অনুমান করা যায় যে কুমারমিত্রা আর্য হওয়ার আগে, অর্থাৎ পুরোপুরি সঙ্ঘের ধর্মীয় জীবনে যোগদান করার আগে 'কুটুম্বিনী'র সাংসারিক জীবনযাপন করতেন[১৬]।

মথুরায় বৌদ্ধ মহিলাদের দানও উল্লেখযোগ্য ছিল, বিশেষ করে তাঁবা বহু মূর্তি দান করেছেন যা প্রাচীন ভারতীয় শিল্পের নিরিখেও গুরুত্বপূর্ণ। মথুরা থেকে প্রাপ্ত বিখ্যাত কাট্‌রা বুদ্ধ মূর্তি, অমোহ-অসি নাম্নী এক মহিলার দান। এই মূর্তিটিতে আদর্শ বুদ্ধ-বোধিসত্ত্ব মূর্তির সব বৈশিষ্ট্য রয়েছে[১৭]। এই মূর্তিলেখতে উৎকীর্ণ আছে :

> "বুধরখিতস্ (বুধরক্ষিতস্) মাতরে অমোহা আসিয়ে বিধি সচো পতিঠাপিতো (প্রতিষ্ঠাপিত) সহ মাতা-পিতা হি সাকে বিহারে সব সত্বানা হিতসুখায়ে"

অর্থাৎ বুধরক্ষিতের মা অমোহ অসি এই বোধিসত্ত্ব মূর্তি তাঁর মাতাপিতার সহযোগিতায়, তার বিহারে স্থাপন করলেন সর্ব জীবের হিত ও সুখের জন্য[১৭]।

মথুরা সংগ্রহশালায় রয়েছে এমন আর একটি বোধিসত্ত্ব মূর্তিতে (Mathura Museum No.— 10.121) ব্রাহ্মীলেখতে পাওয়া যায় যে সেটি পুশিকা নাগপেয়া' (পুশিকা নাগপ্রিয়া ?) নামে এক মহিলার দান যিনি নিজেকে ব্যবসায়ী ধর্মকস-র স্ত্রী বলে চিহ্নিত করেছেন।

মথুরা ও সাঁচীর মধ্যে কিছু ভিন্নতা বিশেষভাবে চোখে পড়ে, যেমন ভৌগোলিক অবস্থান সাঁচীর মহিলাদাতাদের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সাঁচীতে ৬৭ জায়গার নাম পাওয়া গেছে যেখান থেকে দাতারা এসে দান করেছেন। এর মধ্যে অবশ্য মহিলাদের ২৮টি বিভিন্ন জায়গা থেকে এসে দান করতে দেখা যায়, যা পুরুষদের থেকে (৫১ স্থান) কম। উজ্জয়িনী থেকে ২৭ জন, কুরাঘর থেকে ১৮ জন, নদীনগর (নন্দীনগর) থেকে ৭ জন, মাহিসতী (বর্তমান মান্ধাতা) থেকে ৬ জন, এবং বিদিশা থেকে ২ জন মহিলা সাঁচীতে দান করে ছিলেন। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে মূলত নগর থেকে মহিলাদাতারা আসতেন এবং বাণিজ্যিকভাবে সক্রিয় এমন নগর থেকে। কিছু মহিলা গ্রাম

থেকেও এসেছিলেন (যেমন কমদদিগাম, কাপাসিগাম, নবগাম ইত্যাদি)[১৮]। যদিও এই জায়গাগুলি সাঁচী থেকে খুব দূরে নয় (উজ্জয়িনী থেকে সাঁচীর দূরত্ব আনুমানিক ২০০ কিমি[১৯]) তবুও মহিলারা যে যাতায়াত করতেন এবং তৎকালীন সামাজিক-অর্থনৈতিক জীবনে ব্যক্তিগতভাবে যোগদান করে সক্রিয় ছিলেন এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

তুলনায় মথুরাতে মহিলারা ভৌগোলিক অবস্থানের উল্লেখ অনেক কম করেছেন। যেমন EI - VOl.I - র তালিকাভুক্ত ৩৫টি লেখর মধ্যে (২৮টি পুরোপুরি মহিলাদাতা, যা আগেই উল্লেখ করেছি) মাত্র দুজন মহিলা তাদের বাসস্থানের উল্লেখ করেছেন। এর থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে মথুরায় স্থানীয় মহিলারাই বেশি দান করেছিলেন এবং তাঁরা নিজেদের বাসস্থানের উল্লেখ করা অপ্রয়োজনীয় বোধ করেছিলেন যেহেতু তাঁরা স্থানীয়।

আবার পারিবারিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে সাঁচী ও মথুরার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। যেমন সাঁচীতে মাতৃত্বের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। আবার মথুরায় স্ত্রী ও কন্যা এই দুটি পরিচয় মাতৃত্বের পরিচয়ের থেকেও বেশি চোখে পড়ে। নিম্নলিখিত সারণী থেকে কোন পারিবারিক সম্পর্ক কোথায় বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তার একটি আন্দাজ পাওয়া যাবে।

সারণি—২

যে পারিবারিক সম্পর্কের উল্লেখ আছে	সাঁচী	মথুরা
কন্যা	৪	১১
ভগ্নী	৩	১
মাতা	৩৭	৩
পুত্রবধূ	৪	৮
স্ত্রী	২২	১৪
	৭১	৩৭

তবে দুটি জায়গাতেই দেখা যায় যে প্রথমা স্ত্রীরা বেশি ক্ষমতাশালিনী ছিলেন[২০]। কারণ, স্ত্রী হিসাবে যাঁরা নিজেদের উল্লেখ করেছেন, তাঁর মধ্যে অনেকেই প্রথমা স্ত্রী বলে পরিচয় দিয়েছেন।

যৌথ দানলেখর উল্লেখও পাই দুই জায়গাতেই। যদিও মহিলা ও পুরুষ যৌথভাবে দান কমই করেছেন। সাঁচীতে স্বামী-স্ত্রীর যৌথ দানের তিনটি উদাহরণ পাওয়া যায় এবং এক ব্যক্তি তাঁর বোনের সাথে দান করছেন এমন উদাহরণও

পাই। মথুরাতেও স্বল্প হলেও যৌথদানের উল্লেখ আছে। যেমন পূর্বোল্লিখিত কাট্রা বুদ্ধমূর্তির মহিলাদাতা অমোহ-অসি তার মাতাপিতার সঙ্গেই দান করেছিলেন।

যৌথ দানের স্বল্পতা থেকে আমরা অনুমান করতে পারি যে স্ত্রী ও পুরুষের পরস্পরের অর্থনৈতিক সম্পদ ব্যয় করার মত কিছু স্বাধীনতা ছিল। যেখানে মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার কিছু রেশ থেকে গিয়েছে, সেখানে যৌথদানের ক্ষেত্রে মহিলাদের হাতে কিছু বেশি সম্পদ থাকার সম্ভাবনা। যৌথদান থেকে অনুমান করা যায় যে গোষ্ঠী বা পরিবার যৌথভাবেই উৎপাদনের যোগান ও সম্পদ নিয়ন্ত্রণ করতো।

তবে মহিলারা যে সাধারণভাবে পুরুষদের ওপর অর্থনৈতিকভাবে নির্ভরশীল ছিলেন, তা পারিবারিক সম্পর্কের উল্লেখ থেকেই বোঝা যায়। সাঁচীতে একজন 'ঘরণী' বলে নিজের উল্লেখ করেছেন[২১]। বাকি সবাই স্ত্রী, কন্যা, মাতা, শিষ্যা ইত্যাদি বলে পরিচয় দিয়ে সন্তুষ্ট হয়েছেন বা বাধ্য হয়েছেন।

মহিলাদের মধ্যে ভিক্ষুণী বা গণিকা ছাড়া অন্যদের দানের উৎস ছিল স্ত্রী-ধন যেহেতু তারা অর্থনৈতিক পেশাদার গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না, বা উৎপাদনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন না।

সাঁচী বা মথুরায় উল্লেখযোগ্যভাবে রাজপরিবারের কোন মহিলাদাতার উল্লেখ নেই[২২]। যদিও রাজপরিবারভুক্ত মহিলারা প্রাচীন ভারতীয় মহিলাদাতা গোষ্ঠীর মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য দাতাগোষ্ঠী ছিলেন।

পরিশেষে বলা যেতে পারে যে শুধুমাত্র শাস্ত্রকারদের বর্ণনার ভিত্তিতে মহিলাদের অবস্থান নির্ণয় করা ঠিক হবে না। শাস্ত্র যেটা দেয় সেটা হল তত্ত্বগত অবস্থান, বা theoretical status । আবার দানলেখর ওপর ভিত্তি করে, দানের মাধ্যমে ঠিক কতটা সম্মানবৃদ্ধি হত মহিলাদের, বা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা কতটা ছিল, তার চুলচেরা বিচার সম্ভব নয়, কারণ তা এতটাই অনুভবেদ্য এবং তৎকালীন সমাজের বাস্তবতার সঙ্গে যুক্ত যে আজ দাঁড়িয়ে তার সম্পর্কে শেষ কথা বলা বাতুলতা। তবে এইটুকু বোধ হয় নির্দ্বিধায় বলা যায় যে তৎকালীন মহিলারা দানের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক অনুষ্ঠানে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে, তাদের 'দ্বিতীয় শ্রেণী'র নাগরিক সত্তার গ্লানি অনেকটাই ধুয়ে ফেলতে পেরেছিলেন।

সূত্র নির্দেশ

১. ঋকবেদ-এর পঞ্চম মণ্ডলে দানবতী মহিলাদের উল্লেখ আছে।

২. ঋকবেদ : ১:১৬২:১৫ ও ১০:২:২।

৩. উদান-এ পাই যে কোলিয়া রাজার কন্যা সুপ্পবাসা বুদ্ধ ও অন্যান্য শ্রমণদের সাতদিনের জন্য অন্নগ্রহণের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। থেরীগাথাতেও সেলা কর্তৃক অন্নদানের আয়োজনের উল্লেখ আছে। 'উদান', মুচলিন্দ, ২:৮:১৭। 'থেরীগাথা', ৩৫, সেলা।

৪. Janice D. Willis, 'Female Patronage in India Buddhism',[১] in Barbara Stoller Miller (ed.) **"The Powers of Art"**, 47.

৫. চুল্লবগ্গ, ৬:১৪:১।

৬. Sir John Marshall and Alfred Foucher, **The Monuments of Sanchi,** 3 Vols, Calcutta.1940. Also, H. Luders' List, **Epigraphia Indica,** Vol X, Appendix PP. 1-225.

৭. Vidya Dehejia, 'The collective and Popular Basis of Early Buddhist Patronage . Sacred Monuments, 100 BC–AD 250', in Barbara Stoller Miller (ed.) **"The Powers of Art"**, 42.

৮. ঐ, PP 42.

৯. R. C. Sharma, **Buddhist Art of Mathura,** Delhi, 1984, Ch.8, 'Chronology of the Buddhist Icons of the Mathura School.' PP. 171-236. Also, G. Buhler 'New Jaina Inscriptions from Mathura **Epigraphia Indica (EI)** I (1892) PP. 371-93 and G Buhler, 'Further Jaina Inscriptions from Mathura," **Epigraphia Indica II** (1894), PP. 195-212.

১০. Buhler কর্তৃক তালিকাভুক্ত ৩৫ লেখব মধ্যে (EI, I, 1892), ২৮টিতে মহিলাদেব উল্লেখ আছে।

১১. Buhler, EI,I 1892, No.V, VII.

১২. Kumkum Roy, 'Women and men donors at Sanchi : A study of the inscriptional evidence', in **Position and status of women in Ancient India,** Vol. I, (ed.) by Dr. L. K. Tripathi, Varanasi, 1988, PP 210.

১৩. ঐ।

১৪. G. Buhler, 'Jaina Inscriptions from Mathura' EI, Vol.I, 1892. এখানে যেসব লেখ নম্বর উল্লিখিত হয়েছে সব-ই এই গ্রন্থ থেকে নেওয়া নম্বব।

১৫. লেখ No.VII। EI Vol II র No. IV একই ধরনের তথ্য পাই।

১৬. কার্লে চৈত্যগৃহে ওই সময়ের এক দানলেখতে 'কোটি' বলে এক ভিক্ষুণীর নাম পাওয়া যায় যিনি নিজেকে 'ঘুনিক মাতু' মানে ঘুনিকের মা বলে পরিচয় দিয়েছেন। প্রাচীন ভারতে সাংসারিক জীবন যাপন করে পরে ভিক্ষুণী হয়েছেন এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

১৭. R. C. Sharma পূর্বোক্ত PP. 171

১৮. Kumkum Roy পূর্বোক্ত, PP. 215

১৯. ঐ, PP. 214

২০. Vijay Nath, D-ana: Gift System in Ancient India, Delhi, PP. 74-75.

২১. Kumkum Roy পূর্বোক্ত, PP. 219.

২২. Vidya Dehejia পূর্বোক্ত PP. 42.।

ইতিহাসের আলোকে জীবক কোমার বচ্ছ

শঙ্করী পুরকায়স্থ

খৃষ্ট পূর্ব ষষ্ঠ শতক ভারতীয় ইতিহাসের এক যুগান্তকারী অধ্যায়। দৈনন্দিন জীবনে লোহার ক্রমবর্ধমান ব্যবহার কৃষি ক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত উৎপাদন ঘটাতে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করার দরুণ মধ্য গাঙ্গেয় উপত্যকা জুড়ে অনেকগুলি বৃহৎ নগরীর প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছিল। গ্রামীণ এলাকা থেকে নিয়মিত নগরের অধিবাসীবৃন্দের পক্ষে ব্যবসা বাণিজ্যসহ বিবিধ পেশায় মনোনিবেশ করা সহজ হয়ে যায়, কিন্তু পূর্বতন যুগের রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ্য অনুশাসন নূতন যুগের এই আর্থ সামাজিক অগ্রগতির পক্ষে প্রতিবন্ধক স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনার্থে বিভিন্ন ধর্মীয় সামাজিক আন্দোলনের উদ্ভব ঘটে। বৌদ্ধ, জৈন, আজীবক লোকায়ত, যার মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল বৌদ্ধধর্ম। নবযুগের অভিঘাতে পূর্বতন যুগের প্রাচীনপন্থী অনুশাসনের অচলয়াতনকে চূর্ণ করে দেবার যে উদ্যম ইচ্ছা জনমানসে সঞ্চারিত হচ্ছিল, বৌদ্ধ ধর্ম সেই দায়িত্বই পালন করতে এগিয়ে আসে। বৌদ্ধ ধর্মের সামাজিক দৃষ্টি তাই ব্রাহ্মণ্য দৃষ্টি ভঙ্গীর সম্পূর্ণ বিপরীত। ফলে ব্রাহ্মণ্য ধর্মে যে সকল বৃত্তিকে হীনতর চোখে দেখা হত বৌদ্ধ ধর্মে সেগুলিকেই সম্মানের আসনে স্থান দেওয়া হয়। বৌদ্ধ যুগে সম্মানিত বৃত্তি সমূহের মধ্যে অন্যতম ছিল চিকিৎসকের বৃত্তি। আমাদের আলোচ্য বিষয় এই যুগের অন্যতম প্রসিদ্ধ চিকিৎসক জীবককে নিয়ে।

অঙ্গুত্তর নিকায়ের অন্তর্গত মহাবগ্গতে জীবকের জন্ম এবং চিকিৎসক হিসেবের কার্যাবলী নিয়ে একটি সমগ্র অধ্যায় রয়েছে। সেখানে তাঁকে রাজ গহের (রাজগৃহ) গণিকা সালবতীর পুত্র হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁর জন্মদাতা পিতার পরিচয় অজ্ঞাত। জন্মের পরই তিনি মাতা কর্তৃক পরিত্যক্ত হন। পথের ধারে শিশুটিকে পড়ে থাকতে দেখে রাজ কুমার অভয় শিশুটির প্রাণস্পন্দন আছে কিনা সে সম্পর্কে পথচারীদের জিজ্ঞাসা করেন। তারা জবাব দেয় শিশুটি জীবিত (জীবতি)। একথা শুনে রাজকুমার অভয় শিশুটিকে নিয়ে আসেন এবং নিজ পুত্ররূপে প্রতিপালন করতে থাকেন (কুমারেন পোসাপিত)। শিশুর নাম রাখা হয় জীবক (জীবতি → জীবক)। কোমার বচ্ছ (কুমার বৎস=কুমারের পুত্র)। বড় হবার পর নিজ জন্ম ইতিহাস শুনে তিনি পালক পিতা অভয়ের অজ্ঞাতসারে তক্ষশীলায় গমন করেন চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নের নিমিত্ত; সম্ভবতঃ মগধে চিকিৎসাশাস্ত্র পঠন

পাঠনের কোন সুযোগ সুবিধা না থাকার দরুণই, তাঁকে তক্ষশীলায় যেতে হয়েছিল। সেখানে সাত বছর চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নের পর তাঁর গুরু তাঁকে চিকিৎসকের বৃত্তি গ্রহণের উপযুক্ত বলে ঘোষণা করেন। এরপর তাঁর গৌরব উজ্জ্বল চিকিৎসক জীবনের সূচনা হয়।

তাঁর চিকিৎসক জীবনের প্রথম রোগী ছিলেন সাকেতের জনৈক সেটঠির স্ত্রী। জীবকের চিকিৎসায় সেট্‌ঠির পত্নী আরোগ্য লাভ করলে সেট্‌ঠি তাঁকে কৃতজ্ঞতার স্মারক স্বরূপ ১৬০০০ (ষোল হাজার) কহাপণ ও তৎসহ ভৃত্য, দামী ও অশ্ব প্রদান করেন। রাজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করার পর অসুস্থ রাজা বিম্বিসারকে চিকিৎসা করে তাঁর রোগ নিরাময় করে তুললে রাজা পুরস্কার স্বরূপ জীবককে তাঁর ৫০০ (পাঁচশত) পত্নীর যাবতীয় অলঙ্কার অর্পণ করেন। অতঃপর জীবক রাজবৈদ্য রূপে নিযুক্ত হন। এছাড়া রাজ পরিবারের সদস্য অন্যান্য সদস্যদেব চিকিৎসার ভারও তাঁর উপর অর্পিত হয়। তিনি রাজগহস্থিত জনৈক অসুস্থ সেট্‌ঠির মস্তিষ্ক অস্ত্রোপচার করে তাঁকে সুস্থ করে তুলেছিলেন। নানা জনের বিবিধ দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময় করার ফলে অতি-অল্পকালের মধ্যেই চিকিৎসক হিসেবে তাঁর সুনাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

চিকিৎসক হিসেবে অসাধারণ দক্ষতার দরুণ জীবক চিকিৎসা সূত্রে সমকালীন শাসক গোষ্ঠী ও বিত্তশালী মহলের দ্রুত অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেন। মগধ রাজ বিম্বিসারের যে তিনি কতটা আস্থাভাজন হয়ে উঠেছিলেন তা উপলব্ধি করা যায় বিম্বিসার কর্তৃক অবন্তীর রাজা (তিনি ন্যাবা রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন) চণ্ড পজ্জোতের (চণ্ড প্রদ্যোত) চিকিৎসার জন্য তাঁকে উজ্জয়িনীতে (অবন্তীর রাজধানী) পাঠানো থেকে। জীবকের চিকিৎসায় পজ্জোত আরোগ্য লাভ করে কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ জীবে য্যক বস্ত্র প্রদান করেন যা জীবক পরে বুদ্ধকে উপহার দিয়েছিলেন। পিতা বিম্বিসারকে হত্যা করে অজাতশত্রু মগধের সিংহাসনে আরোহণ করার পর তাঁর মস্তিষ্ক বিকৃতি দেখা দিলে জীবক তাঁর চিকিৎসা করে তাঁকে নিরাময় করে তুলেছিলেন। এরপর তিনি অজাতশত্রুর বিশ্বস্ত মিত্রে পরিণত হন।

জীবক তৎকালীন যুগে চিকিৎসক হিসেবে এক খ্যাতিমান হয়ে উঠেছিলেন যে তাঁর পারিশ্রমিক মেটাবার মত আর্থিক সঙ্গতি না থাকায় সাধারণ মানুষ তাঁর চিকিৎসা লাভের সুযোগ বড় একটা পেত না। মূলতঃ শাসক সম্প্রদায়, বিত্তশালী গোষ্ঠী ও বৌদ্ধ ভিক্ষুরাই তাঁর চিকিৎসার সুযোগ লাভ করতেন। তাই মহাবগ্গ থেকে জানা যায়। অগণিত অসুস্থ সাধারণ মানুষ শুধু জীবকের চিকিৎসায় রোগ নিরাময়ের আশায় বৌদ্ধ সঙ্ঘে যোগদান করত। জীবক তাঁর পেশাগত ক্রিয়া কার্যে এত বেশী ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন যে আর্থিক সঙ্গতি

সম্পন্ন ব্যক্তিদের কাছেও তিনি দুর্লভ হয়ে উঠেছিলেন। বিনয় পিটকের অন্তর্গত মহাবগ্গের একটি কাহিনীতে বলা হয়েছে জনৈক সেট্‌ঠি গহপতি অসুস্থ হয়ে পড়লে স্বয়ং রাজা সেট্‌ঠির চিকিৎসার ভার গ্রহণের জন্য জীবককে অনুরোধ জানানোর পর তিনি চিকিৎসা করতে সম্মত হন। জীবককে চিকিৎসার ভার গ্রহণে সম্মত করানোর জন্য বিত্তশালী গহপতির স্বয়ং রাজার দ্বারস্থ হওয়া থেকেই বোঝা যায় জীবক ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তিদেরও নাগালের বাইরে চলে গিয়েছিলেন।

পেশাগত সাফল্যের উচ্চ শিখরে আরোহণ করার দরুণ জীবকের খ্যাতি লাভের পাশাপাশি আর্থিক লাভও কিছু কম হয়নি। এক এক জনের চিকিৎসার পারিশ্রমিকের অঙ্ক থেকেই বোঝা যায় যে তিনি কি পরিমাণ অর্থোপার্জন করেছিলেন। বস্তুতঃ চিকিৎসার পারিশ্রমিক হিসেবে তিনি যে কতটা অর্থ উপার্জন করেছিলেন তা বোঝা যায় সংযুক্ত নিকায় ও অঙ্গুত্তর নিকায় থেকে। এই দুই পালি সাহিত্যে গহপতিদের যে তালিকা প্রদান করা হয়েছে তাতে জীবক কোমার বচ্চ নামও রয়েছে। অবশ্যই সঠিক অর্থে তাঁকে গহপতি বলা চলে না কিন্তু গহপতিদের তালিকায় তাঁর নামের অন্তর্ভুক্তি ইঙ্গিত দেয় যে নিজ পেশাতে তিনি এত বেশী অর্থোপার্জন করে বিত্তশালী হয়ে উঠেছিলেন যে জনসাধাবণ তাঁকে গহপতির তুল্য মর্যাদার আসনে বসিয়েছিলেন।

চিকিৎসক জীবনের পাশাপাশি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের পরিচয়ও পাওয়া যায় যে জীবনে তিনি ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মানুরাগী। লোহা যেমন চুম্বককে আকর্ষণ করে ঠিক তেমনি ভাবেই জীবক বুদ্ধের অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, অপর দিকে বুদ্ধও জীবককে সাগ্রহে নিজ শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। বুদ্ধের প্রিয় শিষ্যদের মধ্যে জীবক ছিলেন অন্যতম। বুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন যে, তাঁর সব ভিক্ষু অনুগামীদের (উপাসক) মধ্যে জীবক জন সাধারণের অন্যতম প্রিয়পাত্র (অগ্গং পুগ্গলপ্প সন্নানং—অঙ্গুত্তর নিকায় I p.26)। জীবক যাতে দিনে দুবার বুদ্ধকে দর্শন করতে পারেন তার জন্য নিজ অম্ববনে (আম্রবন) একটি বিহার নির্মাণ করে বুদ্ধ ও তাঁর সঙ্ঘকে দান করেছিলেন। বুদ্ধ সেখানে অনেক সময়ই গিয়ে থাকতেন। চিকিৎসক হিসেবে জীবক তাঁর চূড়ান্ত ব্যস্ততা সত্ত্বেও সঙ্ঘের প্রতি তাঁর কর্তব্য কখনো অবহেলা করেননি। সঙ্ঘের ব্যাপারে জীবকের অনেক পরামর্শ বুদ্ধ গ্রহণ করেছিলেন। একবার কার্যোপলক্ষে জীবক বেসালিতে (বৈশালী) গিয়ে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের হীন স্বাস্থ্য ও মলিন বদন লক্ষ্য করে বুদ্ধকে সঙ্ঘের ভিক্ষুদের শরীরচর্চার আদেশ দিতে অনুরোধ করেছিলেন। জীবকের অনুরোধে বুদ্ধ সঙ্ঘের ভিক্ষুদের শরীরচর্চার আদেশ দেন। অগণিত সাধারণ মানুষ কেবলমাত্র জীবকের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভের উদ্দেশ্যে বৌদ্ধসঙ্ঘে যোগদান করেন। এটা দৃষ্টি গোচরে আসার পর জীবক

বুদ্ধকে .অসুস্থ ব্যক্তিদের সঙ্ঘে যোগদান নিষিদ্ধ করে নিয়ম জারী করতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। বুদ্ধ তাঁর এই অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন কিনা তা জানা যায়নি, তবে এ থেকে এটুকু স্পষ্ট যে বুদ্ধের সঙ্গে তাঁর অতি নিকট সম্পর্ক না থাকলে তিনি কখনোই বুদ্ধকে এইরকম অনুরোধ করতেন না।

বুদ্ধ তথা বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি জীবকের আকর্ষণের কারণ নিহিত আছে বৌদ্ধ ধর্মের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেই। বৌদ্ধ ধর্মে স্বনিযুক্ত বৃত্তি যেমন কৃষি, বাণিজ্য ও চিকিৎসা ইত্যাদি বৃত্তিকে উচ্চ মর্যাদার স্থান দেওয়া হয়েছিল। চিকিৎসক হিসেবে জীবক নিজ যোগ্যতার বলেই জনসাধারণ্যে প্রভূত খ্যাতি লাভ করেছিলেন সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁর সামাজিক মর্যাদাকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার ভাবগত সমর্থনেরও প্রায়োজন ছিল, যে সমর্থন তিনি পেয়েছিলেন বৌদ্ধ ধর্মের ছত্রছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেই। তাঁর বৌদ্ধ ধর্মে অনুরাগী হবার পেছনে উক্ত ধর্মীয় মতবাদের প্রতি তাঁর সমর্থন প্রধান কারণ ছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই সঙ্গে নিজ সামাজিক মর্যাদা লাভের আকাঙ্খাও যে তাঁকে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল এমন অনুমানও একেবারে উড়িযে দেওয়া যায় না।

আমাদের এমত অনুমানের পেছনে রয়েছে চিকিৎসকদের প্রতি পূর্বতন যুগের (ব্রাহ্মণ্য ভাবাদর্শ মিশ্রিত বৈদিক যুগ) সামাজিক মনোভাব। বৈদিক সাহিত্যে দেবতা অশ্বিনীকুমার ভ্রাতৃদ্বয় দেব চিকিৎসকরূপে বর্ণিত হলেও সামগ্রিকভাবে চিকিৎসকদের সমাজে তেমন মর্যাদার আসনে স্থান দেওযা হয়নি। এর পেছনে দুটো কারণ কাজ করতে পারে (১) রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ্য সমাজে পবিত্র-অপবিত্রতাব ওপর অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হত। নানারকম সংক্রামক রোগীর চিকিৎসা করার দরুণ চিকিৎসকদের অপবিত্র বলে গণ্য করা হত যেহেতু চিকিৎসকরা রোগ জীবাণু বয়ে বেড়ায়, তাই তাদের সংস্পর্শে সুস্থ মানুষের আসা উচিত নয। এমত মনোভাব থেকে চিকিৎসকদের অস্পৃশ্য বলে জ্ঞান করা হতে থাকে। যখন অস্পৃশ্য ব্যক্তিদের সাধারণ সম্মানই দেওয়া হত না তখন তাদের সামাজিক মর্যাদা প্রদান করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। (২) তৎকালীন যুগে চিকিৎসাশাস্ত্র ছিল অনুন্নত। বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা করার চাইতে বৈদ্যরা ঝাড়ফুঁক, মন্ত্রতন্ত্র ইত্যাদির সাহায্য নিতেন। ফলে যা হবার তাই হত। বেশীর ভাগ সময়ই চিকিৎসকরা রোগীকে নিরাময় করে তুলতে— সক্ষম হতেন না, যার ফলে চিকিৎসকের প্রতি রোগীদের নির্ভরশীল ভাব গড়ে উঠতে পারেনি। সে কারণে সমাজে চিকিৎকের বৃত্তি তেমন মর্যাদা প্রাপ্ত হয়নি। এ অবস্থার ধীর পরিবর্তন সূচিতে বৈদিক আমলের একেবারে শেষ পর্যায়ে (অথর্ববেদীয় যুগে), যার চরম উন্নতি ঘটে খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতকে। এই আমলের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি বস্তুগত সংস্কৃতির যেসব ক্ষেত্রের মান উন্নয়নে সহায়তা করেছিল তার মধ্যে চিকিৎসাশাস্ত্র

অন্যতম। চিকিৎসা বিজ্ঞানের.অগ্রগতির ফলে অনেক ব্যাধিও চিকিৎসকের করায়ত্ত্ব হয়। ফলে সমাজে চিকিৎসার উপর লোকের নির্ভরশীলতা বাড়তে থাকে। সে কারণে জনসমাজে চিকিৎসকের মর্যাদাও বাড়ে। পালি গ্রন্থসমূহে তাই চিকিৎসকের বৃত্তিকে মর্যাদার আসনে বসানো হয়েছে। এই কারণেই জীবক বৌদ্ধধর্মের ছত্রছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। পিতৃ পরিচয়হীন হয়ে জন্মগ্রহণের দরুণ পেশাগত দিক থেকে তিনি যত সাফল্য অর্জন করুন না কেন রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ্য সমাজে কোনদিনই সামাজিক সম্মানেব আসন লাভ করতে পারতেন না। বৌদ্ধ ধর্ম কিন্তু তাঁর জন্ম পরিচয়কে বড় করে না দেখে তার গুণকে স্বীকৃতি জানিয়ে ছিল। তাঁকে সমাজে সবচেয়ে বড় গহপতির তালিকায় স্থান দেওয়া হয়েছিল যা বৌদ্ধ সামাজিক বিন্যাসের উককটঠ্ কুল (উচ্চকুল) বলে বিবেচিত। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বিরোধী প্রতিবাদী ধর্মীয় সামাজিক আন্দোলন হিসেবে বৌদ্ধ ধর্মের যে সময়ে উদ্ভব (খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতক) তার কাছাকাছি সময়ে ব্রাহ্মণ্য ভাবাদর্শাশ্রিত সূত্রসাহিত্য বচিত হয়। সূত্রসাহিত্যগুলোর মধ্যে সর্বপ্রাচীন তিনটি সূত্রসাহিত্য তা হল আপস্তম্ব, গৌতম ও বশিষ্ঠ ধর্মসূত্র। PV Kane এই তিন ধর্মসূত্রের রচনাকালকে খৃঃ পূঃ ৩০০০- খৃঃ পূঃ ৬০০ মধ্যে স্থান দিয়েছেন। এই তিনটি ধর্মসূত্রেই কিন্তু পূর্বতন যুগের চিকিৎসকদের প্রতি রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ্য দৃষ্টিভঙ্গীরই প্রতিফলন ঘটেছে। তিনটি ধর্মসূত্রেই চিকিৎসদের প্রতি ঐকান্তিক ঘৃণার মনোভাব পরিলক্ষিত হয়। এতে বলা হয়েছে চিকিৎসকরা অপবিত্র, তারা কোন স্থানে উপস্থিত হলে, তাদের উপস্থিতিতে সেই স্থান দূষিত হয়ে যায়। তাদের খাদ্য গ্রহণ করা উচিত নয় কারণ তা অপবিত্র, এমনকি অন্য কেউ চিকিৎসকদের খাদ্য প্রদান করলে চিকিৎসকরা স্পর্শ করা মাত্রই সেই খাদ্য অপবিত্র হয়ে যায়। ভাবতে অবাক লাগে বৌদ্ধ যুগে যে চিকিৎসকের বৃত্তিকে এত মর্যাদার আসনে স্থান দেওয়া হয়েছিল প্রায় সমকালীন যুগের রচনা হয়েও সূত্রসাহিত্যে কি তার কোনও প্রভাব পড়েনি? ব্যাপারটাকে উল্টো দিক থেকে বিচার করলে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যেতে পারে। আগেই বলা হয়েছে বৈদিকযুগে বিজ্ঞান ভিত্তিক চিকিৎসা শাস্ত্রের তেমন উন্নতি হয়নি (যদিও বৈদিক আমলের শেষদিকে বিশেষতঃ অথর্ববেদীয় যুগে খানিকটা হয়েছিল)। তাই তৎকালীন যুগের তথাকথিত চিকিৎসকগণ ঝাড়ফুঁক, মন্ত্রতন্ত্র ইত্যাদির সাহায্যে রোগ নিরাময়ের চেষ্টা করতেন। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তাঁদের সে প্রচেষ্টা সফল হত না। তবুও অগতির গতি হিসেবে এইসব চিকিৎসকদেরকে রোগীরা ডাকতে বাধ্য হত, যে কারণে তাদের পসার মার খায়নি। খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতক থেকে সমাজের অন্যান্য দিকের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা শাস্ত্রেরও অভাবনীয় উন্নতি হয়। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে চিকিৎসা শুরু হবার ফলে আরোগ্য লাভকারী রোগীর

সংখ্যাও আগের তুলনায় বৃদ্ধি পায়। নতুন যুগের চিকিৎসা বিদ্যার এই অগ্রগতি ব্রাহ্মণ্য সমাজের প্রাচীন পন্থী চিকিৎসকদের পসারের ওপর মারাত্মক আঘাত হানে। এটা সহজেই অনুমান করা চলে যে এইসব হাতুড়ে চিকিৎসকরা নতুন যুগের বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসাশাস্ত্র ও তার প্রতিনিধি চিকিৎসকদের উপর বিরূপ হয়ে পড়েছিল। ব্রাহ্মণ্য সমাজের চিকিৎসকদের এই বিপরীত প্রতিক্রিয়াই (Counter-reaction) সূত্রসাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছিল।

বর্তমান যুগে চিকিৎসকের বৃত্তি যে সমাজে মর্যাদা সম্পন্ন বৃত্তিগুলির অন্যতম তার সূচনা হয়েছিল বুদ্ধের সময় থেকে। সে যুগের বিখ্যাত চিকিৎসক জীবক তৎকালীন যুগে অসামান্য খ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন। তাঁর এই খ্যাতি ও জনপ্রিয়তার মূলে একদিকে যেমন ছিল তাঁর নিজ পেশাগত দক্ষতা তেমনি তৎকালীন যুগের সামাজিক পরিস্থিতিও তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধির সহায়ক হয়েছিল। নবযুগের মানুষের জীবনোপযোগী সে সব বিধি নিয়মকে সম্বল করে যে বৌদ্ধ ধর্মেব উদ্ভব সেই ধর্মের প্রধান বুদ্ধও এ গুণীকে সমাদর করতে মোটেই কার্পণ্য করেননি। এই ভাবে বুদ্ধ ও জীবক— খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতকের এই দুই বিখ্যাত ব্যক্তিত্বের সম্মিলনে ভারত ইতিহাসের চিকিৎসা বিজ্ঞানের উজ্জ্বলতম অধ্যায়ের সূচনা সম্ভব হয়েছিল।

সূত্র নির্দেশ

1. Richard Fick: The Social Organization in North East India in Buddha's time.
2. Narindra Wagle: Society at the time of the Buddha.
3. V. K Thakur: Urbanization in Ancient India.
4. Uma Chakravarti: Social Dimension of Early Buddhaism.
5. Malalasekara: Dictionary of Pali Proper Names.
6. Debiprasad Chattopadhyaya (Edited): History of Science and Technology in Ancient India. Vol II

আহারে পরিচ্ছদে ব্রাহ্মণ্য অনুশাসন

চিরকিশোর ভাদুড়ি

বৈদিক সাহিত্যে ভারতীয় আর্যদের আহার এবং পরিচ্ছদ সম্বন্ধে বিশেষ ধরনের আলোচনা করা হযেছে। ঋগবেদ সংহিতায় আর্থ-সামাজিক নানান ধরণের বৈশিষ্ট্যের উৎস সন্ধান করতে গিয়ে সেই যুগের পরিধেয় এবং আহারে ভারতীয় আর্যদের আগ্রহকে অবহেলার চোখে দেখা হযনি। বৈদিক সাহিত্য অনুশাসন গ্রন্থ, মহাকাব্য এবং পুরাণে ভারতীয়দের আহার এবং পোষাক সম্বন্ধে যে রূপরেখা নির্ণয় করা হয়েছে তার অনুসারী চেহারাটা আজকের দিনেব আর্থ সামাজিক পরিস্থিতিতেও লক্ষ্য করা যায।

ব্যাপারটা একটু পরিষ্কার করে ভেবে দেখা যেতে পারে। ঋগবেদ পড়ে আমরা জানতে পারি সেই যুগে বৈদিক আর্যরা সাধারণভাবে দুই প্রস্থ পোষাক পরিধান করতেন।[১] যেমন, এক প্রস্থ বর্হিবাস তাঁরা পরিধান করতেন যার নাম অধিবাস। বাস[২] নামে অন্য এক ধরনের অন্তর্বাস তাঁরা পরিধান করতেন। পরবর্তী যুগে নিবি[৩] নামে আর এক ধরনের অন্তর্বাসও তাঁদের পরিধেয় ছিল। ছাগচর্ম অথবা গাছের ছাল থেকে তাঁদের পরিধেয় বস্ত্র তৈরি করা হত বলে পণ্ডিতেরা অনুমান করে থাকেন। নর্তকীরা সূচের কাজ করা এক ধরনের পোষাক ব্যবহার করতেন। ঐ পোষাকের নাম ছিল পোসস্[৪]। অভিজাত বংশীয়রা সাধারণতঃ পশমের পোষাক এবং সোনা বসানো বহির্বাস ব্যবহার করতেন[৫]। বৈদিক আর্যরা সাজ-পোষাকে বিলাসী ছিলেন বলে পণ্ডিতেরা অনুমান করে থাকেন। সেই যুগে ভারতীয়রা চুলে তেল মেখে স্নান করতেন এবং চিরুণী দিয়ে চুল আঁচড়াতেন ঋগবেদে এ কথা বলা হয়েছে[৬]। বশিষ্ঠ বংশীয়রা তার ভাঁজে চুল আঁচড়াতেন, ঋগবেদ পড়ে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই। মহিলাদেরও যে ঐ একই ধরনের চুল আঁচড়ানোর অভ্যাস ছিল, ঋগবেদে[৭] এই কথাই বলা হয়েছে। ঋগবেদ[৮] পড়ে আরও জানা যায় যে সে যুগে আর্যরা ক্ষৌরকর্মে অভ্যস্ত ছিলেন। তাছাড়া তাঁদের মধ্যে চুল, দাড়ি, গোঁফ সযত্নে রাখবার বিলাসিতারও প্রচলন ছিল।[৯] সোনা দিয়ে তৈরি কণ্ঠহারের প্রচলনও সেই যুগে ছিল একথা ঋগবেদে[১০] বলা হয়েছে। খাদি নামে এক ধরনের অলংকারের কথা ঋগবেদে বলা হয়েছে। অবশ্য সায়ন ভাস্য অনুসারে ঋগবেদের (৫.৫৩.৪) ঐ অধ্যায়টিতে আসলে খাদি শব্দটিকে বলয়ের (কটক) বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। অলংকার

হিসেবে মালা, আঙটি এবং স্বর্ণশিকলির প্রচলন ছিল, ঋগবেদ[১১] পড়ে এই তথ্য পাওয়া যায়। বৈদিক যুগে নানা ধরনের রত্নালংকার ব্যবহার করতে ভারতীয়রা অভ্যস্ত ছিলেন বিভিন্ন সাক্ষ্য প্রমাণাদি থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই। বিভিন্ন উৎসবে আর্যরা মালা পরাতে বিশেষ ভাবে পছন্দ করতেন[১২]। রূপা, সীসা ইত্যাদি ধাতু দিয়ে তৈরি অলংকার ব্যবহারে সেই যুগের ভারতীয়রা অভ্যস্ত ছিলেন কিনা তার কোন প্রমাণ আমরা পাই না। ঐ যুগে সাধারণ মানুষেরা অলংকার ব্যবহারে সক্ষম কিংবা সমর্থ ছিলেন কিনা তার কোন নিশ্চিত প্রমাণ আমরা পাই না।

এতো গেল বৈদিক যুগে আর্যরা কি ধরনের পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান করতেন সে সম্বন্ধে দুচার কথার অবতারণা। এবারে আমরা ঐ যুগে ভারতীয়রা কি ধরনের আহারে অভ্যস্ত ছিলেন সে সম্বন্ধে পণ্ডিতদের[১৩] মত অনুসরণ করে আমরাও দুচার কথার অবতারণা করবার চেষ্টা করব। যবকে গুঁড়িয়ে দুধ কিংবা দই এর সঙ্গে মিশিয়ে পিঠে তৈরি করে আহার করতে বৈদিক আর্যরা সবিশেষ পছন্দ করতেন। তবে ঋগবেদে[১৪] উল্লিখিত এই যব পরবর্তী যুগের সাহিত্যে উল্লিখিত যবের বিকল্পে কিনা নাকি যেকোন খাদ্যশস্যকেই যব[১৫] বলে অভিহিত করা হত, আমরা তার নিশ্চিত কোন প্রমাণ পাই না। সেই যুগে বৈদিক আর্যরা গৃহে গৃহে গোপালন করতেন। সবে মাত্র দোহন করে আনা দুগ্ধ পান তাঁদের কাছে সবিশেষ আকর্ষণীয় ছিল। তাঁরা শাকসব্জী এবং ফলমূল প্রচুর পরিমাণে আহার করতেন বলে পণ্ডিতেরা অনুমান করে থাকেন। ঘৃতের ব্যবহারেও তাঁদের কাছে সমানভাবে আদরণীয় ছিল।

বৈদিক আর্যরা আমিষ আহারে অভ্যস্ত ছিলেন। পণ্ডিতেরা মনে করেন, যজ্ঞে উৎসর্গ করা ছাগ, মেষ ইত্যাদির মাংস তাঁরা সাধারণভাবে আহার করতেন। কোন কোন পণ্ডিত আবার মনে করেন, বৈদিক যুগে আর্যরা গোমাংস ভক্ষণে অভ্যস্ত ছিলেন। যেমন Vedic Index of Names and Subjects[১৬] এর মাননীয় সম্পাদকমণ্ডলীর মতে, অতিথি আপ্যায়ন এবং বিবাহ উৎসব কিংবা শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে গোমাংস ব্যবহার করা হত।[১৭] V. M. Apte মনে করেন, আহার্য হিসেবে মেষ, ছাগ এবং গরুর মাংস বেছে নেওয়া হত। P. L. Bhargava[১৮] এই বক্তব্য রেখেছেন যে অতিথি আপ্যায়নের জন্য বৈদিক আর্যরা ষাঁড় অথবা বন্ধ্যা গাভীর মাংস বিকল্প আহার্য হিসেবে বেছে নিতেন।

এঁদের এই যুক্তির বিরুদ্ধে বিভিন্ন বেদ থেকে আমরা গোজাতির গুণকীর্তন করে উদ্ধৃত করা বিভিন্ন মন্তব্যর উল্লেখ করছি—

যেমন, ঋগবেদে[১৯] অসহায় ও দুর্বল গোজাতির কোন রকম অনিষ্ট অথবা হনন করা উচিত নয় বলে মন্তব্য করা হয়েছে।

গোঘাতকের মৃত্যুদণ্ডই একমাত্র শাস্তি বলে যর্জুবেদে[২০] অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে।

অথর্ববেদে[২১] আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে মন্তব্য করেছেন গোঘাতকের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার জন্য কোন ভোঁতা সীসা নির্মিত অস্ত্রকে ব্যবহার করতে হবে।

বৈদিক আর্যরা গোমাংস ভক্ষণ করতেন এই যুক্তির সমর্থকরা এই কথাও বলে থাকেন যে ঋগবেদের[২২] একটি অধ্যায়ে আর্যঋষিদের বৃষ মাংস আহারের ধারণাকে উজ্জ্বল রূপ দেওয়া হয়েছে। এই অধ্যায়টির বাংলা ভাবার্থ এইভাবে করা যেতে পারে— "এই ব্যক্তি আমার জন্য প্রতিদিন ১৫টি বা ২০টি উকসান রন্ধন করে থাকে এবং আমি ঐ আহার্য গ্রহণ করে আমার শরীরকে বলশালী করে তুলি।"

এখানে আমাদের মনে রাখতে হবে উল্লিখিত অধ্যায়টির বঙ্গরূপ দেবার সময় 'উকসান' শব্দটিকে 'ষাঁড়' শব্দটির বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করে বিরুদ্ধবাদীরা নিজেদের মতকে শক্ত বনিয়াদের ওপরে খাড়া করতে চেয়েছেন। কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তি এইরকম কোন বক্তব্য মেনে নিতে পারেন না যে, একজন মানুষ একাই ১৫টি অথবা ২০টি ষাঁড়ের একত্রিত ওজনের মাংস আহার করবার ক্ষমতা রাখে। অতএব ঋগবেদের উল্লিখিত অধ্যায়টির এই ধরনের কোন ভাবানুবাদ দাঁড় করান একান্ত হাস্যকব বলে আমরা মনে করি। অধিকন্তু আমাদের বিনীত নিবেদন, এই যে, আসলে ঋগবেদের আলোচ্য অধ্যায়টিতে 'উকসান' শব্দটির দ্বারা আলু কিংবা ঐ ধবনের কোন পুষ্টিকর সবজীকে বোঝান হয়েছে। যে কোন ব্যক্তি ঐ ধরনের পুষ্টিকর ১৫টি বা ২০টি সবজী অতি সহজেই আহার এবং পরিপাক করতে পারে। অতএব ঋগবেদের আলোচ্য অধ্যায়টির বঙ্গরূপ বৈদিক যুগে আর্যদের গোমাংস ভক্ষণের পক্ষে কোনরকম জোরলো যুক্তি খাড়া কবতে পারে না বলে আমরা মনে করি।

বৈদিক আর্যরা গোমাংস ভক্ষণে অভ্যস্ত ছিলেন— এই যুক্তির সমর্থকেরা অধিকন্তু এই বক্তব্য পেশ করে থাকেন যে বৈদিক সাহিত্যে কখনও কখনও এমন এমন ইংগিতও করা হয়েছে যার ফলে আমাদের এই ধারণা হতে পারে যে 'বৃষ' আহারে আর্যরা অভ্যস্ত ছিলেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আমাদের বিনীত নিবেদন, আসলে 'বৃষ' শব্দটি কখনও কখনও ইন্দ্র, বরুণ অথবা অগ্নির মতো বলশালী দেবতার বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। আবার কখনও কখনও ফলমূল, দুধ অথবা ঘি-এর মতো পুষ্টিকর খাদ্যর বিকল্প উপমা হিসেবে 'বৃষ' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। ঋগবেদ কিংবা বৈদিক সাহিত্যের অন্যান্য গ্রন্থ পড়ে আমাদের এই ধারণাই পাকা হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং বৈদিক শাস্ত্রে বৃষ

আহার করা হত, এই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে বলে যে মত প্রতিষ্ঠা করবার জন্য অনেকে কোমর বেঁধে আসরে নেমে পড়েন, তাঁদের যুক্তি কিন্তু বাস্তব গ্রাহ্য বা যথাযথ বলে আমরা মনে করি না।

পরিশেষে, ঐ মতাবলম্বীরা বলে থাকেন যে 'গোধন' শব্দটি গোহত্যাকে বুঝিয়ে থাকে। বৈদিক সাহিত্যে এবং পাণিনি ভাষ্যে 'গোধন' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে যে বৈদিক যুগে অতিথি সৎকার করবার জন্যে গোমাংস আহার্য হিসেবে প্রদান করা হত।

এ বিষয়ে আমাদের বিনীত বক্তব্য, পাণিনি[২৩] ভাষ্য অনুসারে 'গোধন' শব্দটির প্রযোগ দ্বারা কোন ব্যক্তিকে গরু সম্প্রদান করার কথা বলতে চাওয়া হযেছে। এইখানে যদি পাণিনির মতামতকে বিকৃতভাবে প্রয়োগ করে 'গোধন সম্প্রদানে'— এই বাক্যটিকে গোহত্যার বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা হয়, তাহলে আমরাও সবিনয়ে এই বক্তব্য খাড়া করতে পারি যে 'কন্যা সম্প্রদানে'— এই শব্দগুলি ব্যবহার করা হযেছে স্বামীর সন্তুষ্টিবিধানের জন্যে নববধূকে হত্যা করা বোঝানোর জন্যে কিন্তু সংগে সংগে আমরা এও বুঝতে পারছি যে কন্যা সম্প্রদানে— বাক্যটির এই ধরণের ব্যাখ্যা কখনই করা যায না এবং ঐরকম কোন ব্যাখ্যা যদি বা খাড়া করা হয় তা হলে তা হবে পুরোপুরি অবাস্তব।

এতক্ষণ ধরে আমরা যে আলোচনা করলাম তা থেকে এই তত্ত্বই পরিষ্কারভাবে বোঝা গেল যে বৈদিক আর্যরা গোজাতির কোনরকম অনিষ্ট সাধন করা একদম পছন্দ করতেন না। বেদে যখন গোজাতির উপযোগিতা বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে মেনে নেওয়া হয়েছে তখন আবার কিভাবে যে সেই যুগে আর্যরা গোমাংস ভক্ষণ করতেন বলে অনেকে মত প্রকাশ করে থাকেন, তা আমরা ঠিক বুঝে উঠতে পারি না। আসলে গোহত্যার বৈদিক সাহিত্যে কোন ইতিবাচক স্বীকৃতি বাস্তব নির্ভর কিংবা যুক্তিগ্রাহ্য করে কেউ উপস্থিত করতে পারেননি। আমাদের বেদ পরবর্তী শাস্ত্রেও গোহত্যার কঠোরভাবে নিন্দা করা হয়েছে। বস্তুতঃপক্ষে প্রাচীন ভারতে গোমাংস ভক্ষণ প্রচলিত থাকার ইতিবাচক দিকটি তীব্র বিতর্কের বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

সোমরস বৈদিক ভারতে আর্য ঋষিরা যজ্ঞ এবং ধর্মীয় ক্রিয়াকর্মে দেবতা এবং পিতৃগণের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করতেন। এই রস সোমলতা থেকে আহরণ করা হত। এই লতা আবার মেজবত পর্বতে জন্মাত। এই রস সাধারণতঃ মধু, দুধ অথবা দই এর সঙ্গে মিশিয়ে ব্যবহার করা হত। ঋগবেদের সমগ্র নবম মণ্ডল জুড়ে সোমরস সম্বন্ধে ব্যাপক আলোচনা করা হয়েছে। V. M. Apte-র[২৪] মতে এই রস যজ্ঞীয় ব্যবহারে লাগত এবং দুগ্ধ মিশ্রিত মৃদু উত্তেজক যজ্ঞীয় পানীয় বলে স্বীকৃত ছিল। উত্তেজক পানীয় হিসেবে সুরার বর্ণনাও ঋগবেদে আছে। সুরা পানের অপকারিতা সম্বন্ধে ঋগবেদে[২৫] সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে।

এইবারে আমরা বেদ পরবর্ত্তী যুগে ভারতীয়দের পোষাক পরিচ্ছদের রূপরেখা সম্বন্ধে দু-চার কথা বলবার চেষ্টা করব। বৈদিক ভারতের পরিধেয় বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে পরবর্তীযুগে এসে যুক্ত হল শিরোপা (উষ্ণীষ)[২৬] ব্যবহারের অতিরিক্ত আকর্ষণ। বস্তুতঃপক্ষে বৈদিকযুগের শুরু থেকেই আর্যরা আহারে এবং পরিচ্ছদে পরিশীলিত এবং মার্জিতরুচি ছিলেন। তাঁদের এই আড়ম্বরমুখিনতা সেই আদি যুগ থেকেই তাঁদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হিসেবে কাজ করেছে।

যাইহোক, বেদ পরবর্তীযুগে আর্যদের আহার এবং পরিচ্ছদে আরও বৈচিত্র্যের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। তাঁরা যে পাট[২৭] থেকে তৈরি পোষাক পরিধান করতেন, তার প্রমাণ মহাভারতে পাওয়া যাচ্ছে। ক্ষত্রিয় মহিলারা খুবই সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করতেন, একথা মহাভারতে[২৮] বলা হয়েছে। অলংকারের আসক্তি মহাকাব্যের যুগে ভারতীয় নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সংক্রামিত হয়েছিল। রামায়ণে[২৯] বলা হয়েছে, সেই যুগে মহিলারা তিলক, কুন্তল, হার, বৈদূর্য্য, হেমসূত্র, নূপুর, বলয় এবং মালা পরতে ভালবাসতেন। মহাভারতে[৩০] আবার রত্নালংকারের উল্লেখ আছে। এছাড়া মহাভারতে[৩১] কুন্তল, মণি, শঙ্খবলয়, কেযূর, মালা ইত্যাদির উল্লেখ রয়েছে। স্বর্ণমাল্যের প্রচলন রামাযণ এবং মহাভারতের যুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। হীরে, সোনা, মুক্তা এবং অন্যান্য রত্ন দিয়ে তৈরি অলংকারের প্রচলন মহাভারতের যুগে লক্ষ্য করা শিখেছে। সুগন্ধি এবং মাল্য ব্যবহারে মহাভারতের[৩২] যুগে ভারতীযরা বিশেষভাবে পারদর্শী ছিলেন। এছাড়া সোনা দিয়ে তৈরি কণ্ঠহার, সোনার কুন্তল, বক্ষের অলংকার ইত্যাদির প্রচলন ও মহাভারতের[৩৩] যুগে ছিল। সেই যুগে শাড়ী কিংবা সোনার আংটি ব্যবহারে মহিলারা সবিশেষ পারদর্শী ছিলেন। মহাকাব্যের যুগে ভারতীয়দের আহারের অভ্যাস সম্বন্ধে এবার আমরা আলোচনা করব। সেই যুগে ভারতীয়রা প্রচুর পরিমাণে দুধ এবং দুধের তৈরি আহার্য বস্তু গ্রহণ করতেন। প্রায় প্রতিটি ভারতীয় গবাদি পশুপালন করতেন। মদ্যপানে ক্ষত্রিয় নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবিশেষ আসক্ত ছিলেন। মহাভারতে বলা হয়েছে, যদু, বৃষ্ণি এবং অন্ধক বংশীয়রা তাঁদের বার্ষিক পুর্ণমিলনের দিকে রৈবতক পর্বতের নিচে মিলিত হয়ে প্রচুর পরিমাণে মদ্যপান করেছিলেন[৩৪]। বিরাট রাজার রাণী সুদেষ্ণার সুরার প্রতি আসক্তির কথা মহাভারতে[৩৫] বলা হয়েছে। ক্ষত্রিয়রা বিশেষ ভাবে আমিষে আসক্ত ছিলেন। সাধারণতঃ মেষ, ছাগ, হরিণ, শূকর ইত্যাদিকে বধ করে তাদের মাংস আহার করা হত[৩৬]। কিন্তু গোমাংস তখন কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল[৩৭]। বৈদিক যুগের মতোই পরবর্তীকালেও যজ্ঞে উৎসর্গ করা পশুর মাংসও আর্যরা আহার করতেন।

অনুশাসন পর্বে গোহত্যার বিশেষ ভাবে নিন্দা করা হয়েছে এবং গোঘাতকের কঠোরতম শাস্তির সুপারিশ করা হয়েছে। গোজাতির অশেষ গুণকীর্তন করে

এই অধ্যায়ে[৩৯] আরও বলা হয়েছে, যে গোঘাতক মৃত্যুর পরে অনন্তকাল অপরিসীম নরক যন্ত্রণা ভোগ করবে।

রাজা রন্তিদেব যজ্ঞানুষ্ঠানে গোবধ করেছিলেন বলে যে ধারণা প্রচলিত আছে তা ঠিক নয়। মহাভারতে বলা হয়েছে ঐ রাজা গ্রাম থেকে সংগৃহীত পশু (গ্রাম্য) এবং বন থেকে সংগৃহীত পশু (বন্য) তাঁর যজ্ঞে উৎসর্গ করেছিলেন। এর ফলে তিনি তাঁব যজ্ঞে গোহত্যা করেছিলেন বলে কোন যুক্তি খাড়া করা যায়না।

মহাভারতে[৪০] তিন উচ্চবর্ণের আর্যদেব একত্র আহার অনুমোদন করা হয়েছে। কিন্তু কোন দ্বিজ শূদ্রর সঙ্গে একত্র আহার করতে পারবেন না এই সুপারিশও[৪১] করা হয়েছে। মহাভারতে[৪২] বলা হযেছে যে কোন কোন দ্বিজ শূদ্রের বৃত্তি অবলম্বন করতে পারবেন না। যদি করেন তাহলে তাঁর সঙ্গে কেউ একত্র আহার করবেন না। মহাভারতে গোঘাতক, ব্রহ্মহত্যাকাবী, মাতাল[৪৩] অথবা গুরুপত্নীর সম্ভ্রম নাশক যে কোন ব্যক্তির সংগে ব্রাহ্মণদের একত্র আহার থেকে বিরত থাকতে বলেছে। চিকিৎসক, অসতী অথবা শিল্পীব সঙ্গে যে কোন শুভবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিকে একত্র আহার থেকে নিবৃত্ত থাকতে মহাভারত[৪৪] সুপারিশ করেছে।

পরিশেষে মহাভারত[৪৫] এই বিধান দিযেছে যে ব্রাহ্মণেরা পেশাদাব চিকিৎসক, যোদ্ধা, শিক্ষক, ঈশ্বর, উপাসক কিংবা জ্যোতিষীর বৃত্তি গ্রহণ করবেন না। কোন শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ যাতে কোন পেশাদার শিক্ষকের সঙ্গে একত্র আহার না করেন মহাভারতে[৪৬] সেই বিধানও দেওয়া হয়েছে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে মহাকাব্যের যুগে ভারতীয় আর্যরা পোষাকে এবং আহারে আরও বেশি আড়ম্বরমুখিন হযে উঠেছিলাম। আর্যদের এই বিলাসী এবং আয়াসী মনোভাব পৃথিবীর অন্যান্য দেশে তাঁদের ভ্রাতৃপ্রতিম প্রশাখাগুলিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল।

পুরাণে ভারতীয়দের আহার পরিচ্ছদ সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে যে সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে আমাদের এই আলোচনায় ইতি টানব। পুরাণ[৪৭] পড়ে আমরা জানতে পারছি ঐ যুগে ভারতীয় আর্যরা সাধারণতঃ চাল, গম, দুধ, মধু, মাংস, ফলমূল ইত্যাদি আহার্য বস্তু হিসাবে ব্যবহার করতেন। পুরাণে[৪৮] পশুপক্ষীর মাংস আহার করা সম্বন্ধে নানারকম সুপারিশ করা হয়েছে। মনুর অনুশাসনে যেভাবে পশু এবং পাখীর মাংস আহারের রূপরেখা সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে, পুরাণে আবার সেই পদ্ধতিকেই মোটামুটিভাবে অনুসরণ করা হয়েছে। বিষ্ণুপুরাণে[৪৯] ঘৃতমিশ্রিত অন্ন, নানাধরনের মাছ, খরগোস, ভেড়া, ছাগল, হরিণ এবং বন্যবরাহের মাংস, দুধ এবং দুগ্ধজাত খাদ্য, যব, গম, চাল, মুগ, মাস, তিল ইত্যাদি ডাল (মসুর ডাল কিন্তু নিষিদ্ধ), পিঁয়াজ বাদে

অন্যান্য সবুজ তরকারী ইত্যাদি আহার্য হিসেবে সুপারিশ করা হয়েছে। মহাকাব্যে এবং পুরাণে কিন্তু সোমরস সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নেই। সুরার অপকারিতা সম্বন্ধে পুরাণে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। মৎস্যপুরাণে[৫০] ব্রাহ্মণদের মদ্যপান নিষেধ করা হয়েছে।

ব্রহ্মপুরাণে[৫১] গোজাতির কোনরকম অনিষ্ট যাতে কেউ না করতে পারে, সেই ব্যাপারে সকলকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে।

পৌরাণিক যুগে গো হিংসা যে কঠোরভাবে নিন্দিত হত, তার উৎকৃষ্টতম প্রমাণ হচ্ছে, রাজা মনুর পুত্র পৃষধ্র গুরুর আশ্রমধেনু অনিচ্ছা সত্ত্বেও দৈবাৎ নিহত করার অপরাধে শূদ্র বর্ণে অবনমিত হন।

আহার্য বস্তু কোন শূদ্র স্পর্শ করলে পরিত্যাগ করতে হবে গরুড়[৫৩] এবং অন্যান্য পুরাণে এই বিধান দেওয়া হয়েছে। এই উদাহরণ থেকে আমরা বুঝতে পারি, শূদ্ররা সমাজে অস্পৃশ্য হিসেবে বিবেচিত হত। তবে কিছু কিছু শূদ্র, যারা শাস্ত্রীয় অনুশাসন মেনে চলত এবং ব্রাহ্মণদের সংগে সহযোগিতা করে চলত, তারা (যেমন, দাস, ধোপা, নাপিত ইত্যাদি) অস্পৃশ্য হিসেবে বিবেচিত হত না[৫৪]। আমরা ওপরে যে খাদ্য তালিকা উপস্থিত করেছি তা ছাড়াও, পায়েস, পিষ্টক এবং চাল ও ডাল এক সঙ্গে মিশিয়ে রান্না করার (সুপন্ন) উল্লেখও পুরাণে আছে। গোমাংস ভক্ষণও যে পুরাণের যুগে নিষিদ্ধ ছিল, তার প্রমাণ হিসেবে আমরা তথ্যাদি ইতিপূর্বেই উপস্থিত করেছি।

আমাদের ওপরের আলোচনা থেকে ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রে ভারতীয় আর্যরা কি ধরনের আহার এবং পোষাকের অনুসারী ছিলেন, তার একটা পরিষ্কার ছবি দেখতে পাওয়া গেল। ঋগবেদ, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ এবং উপপুরাণে এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে বিশদে আলোচনা করা হয়েছে। মনু সংহিতার আর্থ সামাজিক অনুশাসনগুলি পুরাণ শাস্ত্রকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। পোষাক পরিচ্ছদ আদিকাল থেকে ভারতীয়রা পরিশীলন এবং বিলাসিতার অনুসারী ছিলেন, তার প্রমাণ ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রে বিশেষভাবে পাওয়া গিয়েছে। গোজাতিকে বিশেষভাবে শ্রদ্ধা করার প্রবণতা ভারতীয় আর্যদের মধ্যে যুগে যুগে ধারাবাহিকতা রক্ষা করে এসেছে, তার প্রমাণও ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রে যথেষ্টই মেলে। সুরা পানে ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রে বরাবরই বিরূপ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। শূদ্ররা সমাজে অস্পৃশ্য বিবেচিত হতেন মহাকাব্যে এবং পুরাণে সে বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশ আছে। রামায়ণে বলা হয়েছে শৃঙ্গবর পুরের নিষাদ রাজা গুহক রাজা দশরথের মৃত্যুর পর স্বেচ্ছা বনবাসী দশরথ নন্দন রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ এবং রামচন্দ্র জায়া সীতাকে নানাবিধ সুখাদ্য দ্বারা আপ্যায়িত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা কেউই শূদ্ররাজ গুহকের আহার্য এবং পানীয় গ্রহণ করেননি। রামের অনুসন্ধানে শৃঙ্গবরপুরে এসে রামানুজ ভারত ঐ একইভাবে

গুহকের আতিথ্য প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। একই সঙ্গে,. সহযোগী নিম্নবর্ণের মানুষদের উষ্ণ আতিথেয়তায় সামাজিক স্বীকৃতি প্রদানের নিদর্শনও পুরাণে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি কিভাবে পরিমার্জিত এবং বিলাসী চেহারায় বিকশিত হয়ে উঠেছিল রামায়ণ এবং মহাভারতে তার ভাস্বর প্রতিচ্ছবি দেখতে পাওয়া যায়। সে তুলনায় পুরাণগুলি ততটা তথ্যবাহী নয়।

সূত্র নির্দেশ :

১. Majumdar R C (Dr) Ed The Vedic Age—(Bombay 1969) p 397
Apte V M Social and Religious Life in the Gihya Sutras—(Bombay 1964) p 64
২. তদেব।
৩. তদেব।
৪. Rg Veda—I 92 4 5, II 3 6 etc
৫. The Vedic Age—p 397
৬. Rg Veda—VII 33 1
৭. Rg Veda—X 114 3
৮. Rg Veda—X 142 4
৯. Rg Veda—VII. 56 13
১০ Rg Veda—IV 386, V. 53 4 etc
১১. ১০ নং টিকার অনুরূপ।
১২. ১০ নং টিকার অনুরূপ।
১৩. বৈদিক আর্যদের আহার এবং পানীয় সম্বন্ধে বিভিন্ন মনস্বী তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেছেন। ঐরকম তিনখানি বই এর বিস্তৃত পরিচয় নিচে দেওয়া হল—
(ক) Majumdar R C (Dr) The Vedic Age (Bombay 1969) (পৃঃ ৩৯৬-৩৯৭)
(খ) Apte V M Social and Religious Life in the Gihya Sutras (Bombay 1964) (পৃঃ ৯৫-৯৬)
(গ) Bhargava P. L. (Dr)—India in the Vedic Age (Lucknow 1971) (পৃঃ ৩৪৭-৩৪৮)
১৪. Apte V. M.—Social and religious rites in the Gihya Sutras—p.96
১৫. Bhargava P. L. (Dr) –India in the Vedic age.—p 248
১৬. Mackdonnell & Keith (Ed)—Vedic Index of Nums & Subjects—V-2 (London 1912) pp. 146-147
১৭. Apte V. M –Social and Religious rites in the Gihya Sutras—p.95
১৮. Bhargava P. L. (Dr)—India in the Vedic Age—p.248
১৯. Rg Veda—VIII. 101.15.
২০. Yajur Veda—XXX. 18.
২১. Atharva Veda—I. 16.4.

২২. Rg Veda—VIII 86 14
২৩. Panini III 4 73
২৪. Apte V M- Social and religious life in the Gihya Sutras—p.96.
২৫. Rg Veda—VII 86 6
২৬. মহাভারত (হরিদাস সিদ্ধান্ত বাগীশ সংস্করণ, কলকাতা) —বিরাট পর্ব, পঞ্চদশ অধ্যায়।
২৭. মহাভারত —বিরাট পর্ব, পঞ্চদশ অধ্যায়।
২৮. মহাভারত —আদি পর্ব, ১১৯তম অধ্যায়।
২৯. রামায়ণ —(গৌড়ীয় সংস্করণ, কলকাতা) সুন্দরকাণ্ড—চতুর্দশ সর্গ।
৩০. মহাভারত —বিরাট পর্ব, ১৫.২।
৩১. মহাভারত —বিরাট পর্ব, ২০.২০।
৩২. মহাভারত —বিরাট পর্ব, ২০.২০।
৩৩. মহাভারত —১.৮৭.২-৩।
৩৪. মহাভারত —১.২১২.৭-৯।
৩৫. মহাভারত —বিরাট পর্ব, চতুর্দশ অধ্যায়।
৩৬. মহাভারত —বিরাট পর্ব, চতুর্দশ অধ্যায়।
৩৭. মহাভারত —অনুশাসন পর্ব—৫৯তম অধ্যায়।
৩৮. মহাভারত —অনুশাসন পর্ব—৫৯তম অধ্যায়।
৩৯. মহাভারত —অনুশাসন পর্ব—৫৯তম অধ্যায়।
৪০. মহাভারত —অনুশাসন পর্ব— ১১৩.২-৪।
৪১. মহাভারত —অনুশাসন পর্ব— ১১৩.৫-৭।
৪২. মহাভারত —অনুশাসন পর্ব— ১১৩.১০।
৪৩. মহাভারত —অনুশাসন পর্ব— ১১৩.১৮।
৪৪. মহাভারত —অনুশাসন পর্ব— ১১৩.১৪।
৪৫. মহাভারত —অনুশাসন পর্ব— ১১৩.১১-১২।
৪৬. মহাভারত —অনুশাসন পর্ব— ১১৩.১৫।
৪৭. বিষ্ণুপুরাণ —(বরদা বসাক সম্পাদিত, ১২৭৭ বঙ্গাব্দ, কলকাতা)—তৃতীয় খণ্ড, ষোড়শ অধ্যায়।
৪৮. বিষ্ণুপুরাণ —(বরদা বসাক সম্পাদিত, ১২৭৭ বঙ্গাব্দ, কলকাতা)—তৃতীয় খণ্ড, ষোড়শ অধ্যায়।
৪৮. বিষ্ণুপুরাণ —(বরদা বসাক সম্পাদিত, ১২৭৭ বঙ্গাব্দ, কলকাতা)—তৃতীয় খণ্ড, ষোড়শ অধ্যায়।
৫০. মৎস্যপুরাণ —(পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, ১৩১৬ বঙ্গাব্দ, কলকাতা)—২৫.৬২-৬৩।
৫১. ব্রহ্মপুরাণ —(পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, ১৩১৬ বঙ্গাব্দ, কলকাতা)—২২১.২৬।
৫২. "পৃষধ্রস্তু গুরুগোবধনাৎ শূদ্রত্বমগমৎ"—বিষ্ণুপুরাণ —(মার্কণ্ডেয় ও ভাগবত পুরাণেও এই তথ্য ৪, ১.১৩ সন্নিবেশিত হয়েছে)।
৫৩. গরুড়পুরাণ —(পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, ১৩১৪ বঙ্গাব্দ, কলকাতা)—৯৬.৬৫-৬৬।
৫৪. গরুড়পুরাণ —(পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, ১৩১৪ বঙ্গাব্দ, কলকাতা)—৯৬.৬৫-৬৬।

আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণকালে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে গণতান্ত্রিক চেতনা

রঞ্জনা বিশ্বাস

প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ভারতীয় সভ্যতার ক্রমবিকাশের প্রথম পর্যায়ে 'রাজতন্ত্র' ছিল সর্বাপেক্ষা প্রচলিত এবং শক্তিশালী শাসনতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান। রাজতন্ত্রে সাধারণভাবে শাসনের চরম ক্ষমতা উত্তরাধিকার সূত্রে কোন ব্যক্তিবিশেষ অর্থাৎ রাজার হাতে ন্যস্ত ছিল। কিন্তু শুধুমাত্র রাজতান্ত্রিক রাজ্য নয়, জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণে সংগঠিত শাসনব্যবস্থার দ্বারা পরিচালিত 'গণ-রাজ্য' বা রিপাবলিকের উল্লেখও প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের বিভিন্ন উপাদানে দেখতে পাওয়া যায়। গ্রীক দূত মেগাস্থেনিস ভারতীয় শাসন ব্যবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছিলেন যে রাজতন্ত্রের অবসানের পর ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে গণ-রাজ্যের সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।[১] এ থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে যে রাজতান্ত্রিক রাজ্যের উৎপত্তির পরে গণ-রাজ্যের উৎপত্তি হয়েছিল। কিন্তু ঠিক কোন সময়ে এবং কি কারণে গণ-রাজ্যের উৎপত্তি হয়েছিল তার কোন নির্দিষ্ট ব্যাখ্যা ইতিহাসে পাওয়া যায়নি। তবে এ কথা বলা যেতে পারে যে সম্ভবত রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার ছত্রছায়ায় মানুষ একদিন নিরাপত্তার অভাব বোধ করেছিল; অথবা শাসনব্যবস্থায় নিজেদের সক্রিয় অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিল— মানুষের এই উপলব্ধিই গণতান্ত্রিক চেতনা— যে চেতনার সাহায্যে প্রাচীন ভারতের মানুষ একদিন গণ-রাজ্যের উদ্ভব ঘটিয়েছিল।

প্রাচীন বৈদিক যুগে অ-রাজতান্ত্রিক রাজ্যের অস্তিত্বের অভিমত সর্বজনস্বীকৃত হয়নি। মহাভারত বা পাণিনির রচনা, জৈন বা বৌদ্ধ সাহিত্যে উল্লিখিত গণ-রাজ্যের অস্তিত্বের নিদর্শনের ওপর ভিত্তি করে বলা যেতে পারে যে প্রকৃত পক্ষে পরবর্তী বৈদিক যুগে বা প্রাক্-মৌর্য যুগে গণ-রাজ্যের পত্তন হয়।[২] তবে ৩২৬ খৃষ্ট পূর্বাব্দে আলেকজাণ্ডার যখন ভারত আক্রমণ করেন তখন উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে বহুসংখ্যক গণ-রাজ্যের বিকাশ বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার বিষয়। গ্রীক লেখকগণের রচনায় বর্ণিত এই সমস্ত গণ-রাজ্যে সংগঠিত সরকারের বৈশিষ্ট্যসমূহ

বিশেষভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গ্রীক লেখকগণ তাঁদের বিবরণীতে গণ-রাজ্য সমূহের সরকার বলতে নির্দেশ করেছিলেন সেই সরকারকে যার চূড়ান্ত ক্ষমতা ন্যস্ত ছিল সম্মিলিত ভাবে বহুসংখ্যক ব্যক্তির হাতে, রাজতন্ত্রের মতো কোন স্বতন্ত্র ব্যাক্তিবিশেষের উপর নয়। উদাহরণ স্বরূপ আমরা সংক্ষেপে তার পর্যালোচনা করতে পারি।

(ক) এরিয়ানের বিবরণানুযায়ী সিন্ধু এবং কাবুল নদীর অন্তবর্তী স্থানে অবস্থিত 'নিসা' নামক পর্বতনগরীর সরকার অভিজাত সম্প্রদায়ের দ্বারা গঠিত হয়েছিল।[৩] একজন সভাপতি এবং তিনশ ব্যক্তির সম্মেলনে গঠিত একটি কার্যনির্বাহক সমিতির দ্বারা নগরীটি শাসিত হত।[৪] আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের সময় 'নিসা' নগরীর সভাপতি ছিলেন অ্যাকোউফিস।[৫]

(খ) রাভী নদীর পূর্বে বর্তমান লাহোর ও অমৃতসর অঞ্চলে একটি অতি শক্তিশালী সম্প্রদায় কাথাইযানদের গণ-রাজ্য ছিল।[৬] স্ট্র্যাবো বলেছিলেন যে, এদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দর ব্যক্তিকে রাজা হিসাবে মনোনীত কবা হত।[৭] ডাইওডোরাস বিবরণ দিয়েছিলেন যে এদের নির্বাচিত রাজা ছিল। শিশুরা জন্মগ্রহণ করত প্রথমে নাগরিক হিসাবে, তারপর ব্যক্তিবিশেষ হিসাবে।[৮]

(গ) কাথাইয়ানদের রাজ্যের সংলগ্ন অঞ্চলে সোফিতদের রাজ্য ছিল।[৯] গণ-রাজ্যের পরিমণ্ডলে গণ-রাজ্যের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের দ্বারা রাজ্যটি ভূষিত ছিল। ডাইওডোরাস বলেছিলেন যে, সোফিতরা ব্যাপক নিরাপত্তামূলক আইনকানুনের দ্বারা শাসিত হত এবং এদের রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনা ছিল অত্যন্ত প্রশংসনীয়।[১০] এরা ছিল বাস্তবিকভাবেই রাজনৈতিক জীব; ব্যক্তিবিশেষের অস্তিত্ব ছিল শুধুমাত্র তার দেশ বা রাজ্যের জন্য।[১১]

(ঘ) এরিয়ান বিবরণ দিয়েছিলেন যে বিপাশা নদীর তীরে অভিজাত সম্প্রদায়ের দ্বারা একটি গণ-রাজ্য সুষ্ঠু এবং সুসংহত রূপে শাসিত হত। অভিজাত সম্প্রদায় যথাযোগ্য বিচার এবং সালিসির মাধ্যমে তাদের কর্তৃত্ব প্রয়োগ করত।[১২] দুর্ভাগ্যের বিষয় রাজ্যটির কোন সঠিক নাম জানা যায়নি।[১৩] স্ট্র্যাবোর বিবরণানুযায়ী জানা যায় যে, এই রাজ্যটির ব্যবস্থাপক সভা পাঁচ হাজার প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত ছিল এবং এই সভার প্রত্যেক প্রতিনিধি রাজ্যের সৈন্যদলে একটি করে হাতি যোগান দিতেন।[১৪]

(ঙ) সিন্ধু নদীর নিম্নবর্তী অঞ্চলে ক্ষুদ্রক এবং মালব নামক দুই শক্তিশালী গণ-রাজ্যের অবস্থান ছিল। এগুলি গ্রীক লেখকগণের দ্বারা যথাক্রমে 'অক্সিড্রাকাই' ও 'মালোই' নামে উচ্চারিত হত। দুই রাজ্য পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে একটি সংঘ গঠন করেছিল।[১৫] কার্টিয়াস লিখেছিলেন যে, ঐক্যবদ্ধ সৈন্যদলকে পরিচালিত করবার জন্য ক্ষুদ্রক সম্প্রদায় একজন সাহসী এবং অভিজ্ঞ সেনাপতিকে

মনোনয়ন করত।[১৬] এরিয়ানের বিবরণানুযায়ী এই দুই গণ-রাজ্য থেকে বহুসংখ্যক দূতেরা শান্তি সংস্থাপনের জন্য আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে সন্ধি করতে গিয়েছিলেন। মালব রাজ্যের প্রতিনিধিরা বিবরণ পেশ করেছিলেন যে তারা অন্যান্যদের তুলনায় অনেক বেশীমাত্রায় স্বাধীনতা এবং স্বাযত্তশাসনের সঙ্গে সংযুক্ত।[১৭]

(চ) কার্টিয়াসের মতানুযায়ী মালোই (মালব)-এর নিকটবর্তী অঞ্চলে শিবোই নামক আর একটি গণ-রাজ্য ছিল।[১৮] ডাইওডোরাস বলেছিলেন যে, এই গণ-রাজ্যটির কোন রাজা ছিল না; উচ্চতম কার্যালয়গুলি রাজ্যের নাগরিকগণের দ্বারা পরিচালিত হত।[১৯]

(ছ) কার্টিয়াসের বিবরণ অনুযায়ী 'অম্বাসথ', গণ-রাজ্যের অধিকারী একটি শক্তিশালী জাতি ছিল।[২০] এরা চিনার এবং সিন্ধু নদীর সঙ্গমস্থলে বসবাস করত।[২১] সাহসিকতা ও যুদ্ধ দক্ষতার জন্য তিনজন সেনাপতিকে নির্বাচিত করা হত।[২২] আলেকজাণ্ডার এদের পঞ্চাশজন উচ্চপদস্থ নাগরিকের সঙ্গে সন্ধি সংস্থাপন করেছিলেন।[২৩] সম্ভবত এদের প্রধান বা বয়ঃজ্যেষ্ঠদের দ্বারা গঠিত একটি পরিষদ ছিল।[২৪]

•(জ) সিন্ধু নদীর ব-দ্বীপের উপর অবিস্থিত একটি রাজ্যের নাম ছিল পাটলো।[২৫] ডাইওডোরাস এই রাজ্যটিকে উল্লেখযোগ্য শহর হিসাবে অভিহিত করেন এবং রাজ্যের শাসনতন্ত্রকে স্পার্টাদের সমতুল্য বলে উল্লেখ করেন। তাঁর মতে এই রাজ্যটির যুদ্ধ পরিচালনার ক্ষমতা ন্যস্ত থাকত ভিন্ন দুই বংশের দুই রাজার উপর; কিন্তু রাজ্যের সর্বোচ্চ বা প্রধান ক্ষমতা রাজ্যের প্রবীণ বা বয়ঃজ্যেষ্ঠদের দ্বারা গঠিত একটি পরিষদের উপর ন্যস্ত ছিল।[২৬]

উল্লিখিত রাজ্যগুলি ছাড়াও গ্রীক লেখকগণের বিবরণীতে মাউসিকানে বা মুসিকানে, আদরিসতাই, গ্লাউগেনিকাই, আগলাসোই, জ্যাথ্রোই, ওসাডিওই, সোদরাই, ব্রাচমানোই ইত্যাদি আরও অনেকগুলি সম্প্রদায়ে উল্লেখ পাওয়া যায় যারা স্বায়ত্তশাসনের অধিকারী ছিল। তবে সকল সম্প্রদায়গুলির শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতির পূর্ণাঙ্গ বিবরণ গ্রীক লেখকগণের বিবরণীতে পাওয়া যায় না।

যাই হোক না কেন, আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণকালে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের গণ-রাজ্যগুলিতে যে ধরনের শাসন পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, গ্রীক লেখকগণ তাকে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। গ্রীক লেখকগণ নির্দিষ্ট সংখ্যক ব্যক্তি দ্বারা রাজ্য শাসন, অভিজাত সম্প্রদায়ের দ্বারা রাজ্যশাসন, নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা রাজ্য শাসন, রাজা এবং জনগণের প্রতিনিধি উভয় দ্বারা রাজ্য শাসন এই সমস্ত ধরনের শাসন প্রণালীকেই গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার নামে অভিহিত করেছিলেন। উক্ত শাসন প্রণালীগুলিতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সুসংহত এবং পরিণত রূপ আমরা হয়তো দেখতে পেলাম না। কিন্তু আমরা দেখলাম

গতানুগতিক বাজাধিপত্য থেকে বেরিয়ে এসে এক নতুন. ধরনের শাসন প্রণালীর ব্যাপক প্রচলন যাতে জনগণেব অংশগ্রহণ আছে। এ ছিল মানুষের গণতান্ত্রিক চেতনার স্ফূরণ। বিভিন্ন কারণে পরবর্তীকালে গণ-রাজ্যগুলির পতন ঘটেছিল, ফিবে এসেছিল আবার রাজতন্ত্রের যুগ। কিন্তু চতুর্থ খৃষ্ট পূর্বাব্দে গণ-রাজ্যগুলির শাসন প্রণালী পববর্তীকালে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে পথ দেখিয়েছে বললে হয়তো ভুল বলা হয না।

সূত্রনির্দেশ

১. এপিটোম অফ মেগাসথেনিস; ডাইওডোবাস, বই ৯, অধ্যায় ৩৮; জে. ডব্লু. ম্যাক্রিণ্ডল (অনুবাদক): এনসিযেন্ট ইণ্ডিযা এজ্ ডেসক্রাইণ্ড বাই মেগাসথেনিস এণ্ড এরিয়ান, কলকাতা ১৯২৬ ও নিউ দিল্লী ১৯৭২, পৃষ্ঠা ৩৮ ও ৪০।

২. মহাভাবত, পাণিনিব অষ্টাধ্যাযী, আযাবঙ্গ সূত্র, কল্পসূত্র, জাতক, অবদান শতক, মহাবস্তু, ললিত বিস্তব ইত্যাদি গ্রন্থে অ-বাজতান্ত্রিক বাজ্যেব অস্তিত্বেব কথা স্পষ্ট উল্লিখিত আছে।

৩. জে. ডব্লু. ম্যাক্রিণ্ডল (অনুবাদক): দা ইনভেশন অফ ইণ্ডিয়া বাই আলেকজাণ্ডাব দা গ্রেট, নিউইয়র্ক ও লণ্ডন ১৯৬৯, পৃঃ ৮১।

৪. এবিযান, বঃ ৫, অঃ ২।

৫ ঐ

৬. কে. পি. জযস্য়োল; হিন্দু পলিটি, ১৯২৪, পৃঃ ৬৪

৭. স্ট্র্যাবো, বঃ ১৫, অঃ ৩০।

৮. ডাইও, বঃ ১৭, অঃ ৯১।

৯. জার্নাল এশিয়াটিক, খণ্ড ৮, পৃঃ ২৩৭।

১০. ডাইও, পূর্বোক্ত ৮নং সূত্র।

১১. এরি, বঃ ৯, অঃ ১ (ধাবাবাহিক)।

১২. ঐ, বঃ ৫, অঃ ২৫; ৩নং সূত্র পৃঃ ১২১।

১৩. বিপাশা নদীব তীববর্তী অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত সৌধেয়দের মুদ্রার উপব ভিত্তি করে ডঃ কে.পি. জয়সোয়াল অভিমত প্রকাশ করেন যে এই নামহীন গণ-রাজ্যটি সম্ভবত সৌধেয়দেব ছিল। তিনি আবাব এ কথাও বলেন যে, বহুসংখ্যক প্রতিনিধিদেব দ্বারা সংগঠিত ব্যবস্থাপক সভা লিচ্ছবি সম্প্রদায়েব ব্যবস্থাপক সভার সঙ্গে তুলনামূলক।

১৪. স্ট্র্যা, বঃ ১৫, অঃ ৩৭; জে.ডব্লু. ম্যাক্রিণ্ডল (অনুবাদক) : এনসিয়েন্ট ইণ্ডিয়া এজ্ ডেসক্রাইব্ড ইন ক্ল্যাসিক্যাল লিটেরেচার, নিউ দিল্লী, ১৯৭৯, পৃঃ ৪৫।

১৫. জয়সোয়াল, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৮।

১৬. কার্টিয়াস, বঃ ৯, অঃ ৪।
১৭. এরি, বঃ ৬, অঃ ১৪।
১৮. কার্টি, পূর্বোক্ত ১৬নং সূত্র।
১৯. ডাইও, বঃ ১৭, অঃ ৯৬।
২০. কার্টি, বঃ ৯, অঃ ৮।
২১. ৩নং সূত্র, পৃঃ ১৫৫।
২২. কার্টি, পূর্বোক্ত ২০ নং সূত্র।
২৩. ডাইও, বঃ ১৭, অঃ ১০২।
২৪. জয়সোয়াল, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭৩।
২৫. স্ট্রা, বঃ ১৫, অঃ ৩৪।
২৬. ডাইও, বঃ ১৭, অঃ ১০৪।

প্রাচীন বাংলার কয়েকটি সামাজিক গোষ্ঠী
(পঞ্চম + ষষ্ঠ শতক)

রঞ্জুশ্রী ঘোষ

প্রাচীন বাংলার সামাজিক সংগঠনের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গোষ্ঠী এই প্রবন্ধের আলোচ্য। এখানে বাংলা বলতে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের অন্তর্গত ভূ-ভাগকে ধরা হয়েছে। আলোচনার কেন্দ্রে গ্রামীণ সমাজ পরিকাঠামোকে রাখা হয়েছে। গ্রামীণ সমাজচিত্র জানার অন্যতম ঐতিহাসিক উপাদান হল লেখমালা। কিন্তু সর্বপ্রাচীন যেসব লেখ পাওয়া গেছে তাতে সমাজ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ কোন তথ্য নেই। পরোক্ষভাবে গ্রামীণ সমাজের আংশিক উপস্থিতি ঘটেছে ভূমি লেনদেন সংক্রান্ত রাজকীয় দলিলে। এইরকম সর্বপ্রাচীন দলিলটির কাল ৪৩২ খ্রী.[১]। বর্তমান প্রবন্ধের আলোচনা শুরু তাই পঞ্চম শতকে প্রথমার্ধ থেকে এবং এর বিস্তৃত ষষ্ঠ শতকের প্রায় শেষ পর্যন্ত।

ভূমি হস্তান্তর সম্পর্কিত দলিলগুলিতে দেখা যাচ্ছে ধর্মীয় উদ্দেশ্যে এক বা একাধিক ব্যক্তি রাজার সত্ত্বাধীন ভূমি তাঁকে বা তাঁদেরকে দানের বা বিক্রয়ের জন্য আবেদন জানিয়েছেন। গ্রামাঞ্চলের ক্ষেত্রে আবেদন সাধারণত প্রশাসনের 'বিষয়' বা 'বীথি'র অধিকরণে রাখা হয়েছে। বিষয় বলতে বর্তমান জেলা এবং বীথি বলতে মহকুমার সমতুল প্রশাসনিক বিভাগকে ধরা যেতে পারে। কিন্তু গ্রামাঞ্চলের ক্ষেত্রে আকর্ষণীয় ব্যাপারটি হল এই আবেদন ও তা মঞ্জুরের ব্যাপারটি যে গ্রামের পরিসীমায় ভূমি হস্তান্তরিত হবে সেই গ্রামের কয়েকটি বিশিষ্ট সামাজিক গোষ্ঠীকে তা অবগত করানো হয়েছে রাজপ্রশাসনের তরফ থেকে। শুধু তাই নয় হস্তান্তর সম্পর্কিত আনুপূর্বিক প্রক্রিয়াটি তাঁদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হচ্ছে এমন প্রমাণও দলিলে পাওয়া যাচ্ছে[২]। এমনকি একটি ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে আবেদনকারী গ্রামের বিশিষ্ট গোষ্ঠীগুলির কাছেই আবেদন রেখেছেন[৩]। গুপ্তযুগে সুসংহত প্রশাসনিক কাঠামোর সক্রিয় উপস্থিতি সত্ত্বেও গ্রামীণ সামাজিক গোষ্ঠীগুলির এরকম উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিঃসন্দেহে উল্লেখের দাবী রাখে।

এই গ্রামীণ গোষ্ঠীগুলির ভূমিকা মর্যাদা এবং ক্ষমতা কিরকম ছিল তা জানার জন্য লেখর বর্ণনা থেকেই সাহায্য পাওয়া যায়। এ সম্পর্কিত প্রথম লেখখানি গুপ্তসম্রাট প্রথম কুমারগুপ্তের রাজত্বকালে উৎকীর্ণ উপরে উল্লিখিত ৪৩২ খ্রী.-এর ধনাইদহ লেখ। ধনাইদহ গ্রামটি বর্তমান বাংলাদেশে রাজশাহী জেলায় অবস্থিত। লেখর প্রথমে গুপ্তাব্দ ১৩ পরমদৈবত পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ প্রথম কুমারগুপ্তের

নাম উৎকীর্ণ হয়েছে। এর পরের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে কুটুম্বী[৪] অর্থাৎ সম্পন্ন কৃষক (যার ভূমির মালিকানা আছে) এবং মহত্তরগণসহ গ্রামাষ্টকুলাধিকরণকে জানানো হয়েছে যে খাদাপার বিষয়ের প্রচলিত নীবীধর্ম অনুযায়ী এক কুল্যবাপ পরিমাণ কৃষিজমি (ক্ষেত্র) দানে আবেদন জানিয়েছিলেন আয়ুক্তক পদাধিকাবী এক ব্যক্তি। দানগ্রহিতা আবার সেই ভূমি কন্টকনিবাসী সামবেদী এক ব্রাহ্মণকে তা দান করেন। তাঁর আবেদন বিচার বিবেচনার পব মঞ্জুর করা হয এবং ভূমি হস্তান্তর পর্বটি সুষ্ঠুভাবে সমাধা করার দায়িত্ব দেওয়া হয় কুটুম্বী, ক্ষেত্রকব প্রভৃতিকে — সমেত্যাভিহিতে সর্ব্বমেব (ক্ষেত্র) কর প্রতিবেশী কুটুম্বিভিরবস্থাপক[৫] — এখানে বিশেষ কতকগুলি শব্দ ব্যবহৃত হযেছে যার ব্যাখ্যা প্রযোজন। বিষয-এব অর্থ পূর্বেই দেওয়া হযেছে। নীবীধর্ম কথাটি এক বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত। যে মূলধন স্থাযীভাবে লগ্নী কবা হতো তাই নীবী নামে অভিহিত হতো। নীবীধর্ম অনুযাযী যে ভূমি দান কবা হয় তা চিবকালীন। দানগ্রহিতা এব থেকে উৎপন্ন ফসল ভোগ কবতে পাবতেন এবং এই ভূমির জন্য বাজাকে কোনোবকম কর প্রদান কবতে হতো না। কিন্তু তিনি এই ভূমি বিক্রয বা অন্য কোনো ভাবে হস্তান্তব কবতে পারতেন না। কুল্যবাপ আখ্যাটি ভূমির মাপকে বোঝাত[৬]। আযুক্তক ছিলেন বীথির পরিচালক। তিনি বেতনভুক বাজকর্মচারীসহ অধিকরণ ও বিশিষ্ট সামাজিক গোষ্ঠীব সহায়তায শাসন পরিচালনা করতেন।

এই লেখায় কুটুম্বীর তালিকার দুজন ব্রাহ্মণের নাম উল্লিখিত শিবশর্ম্ম এবং নাগশর্ম্ম। শর্ম্ম অন্তনামটি বর্তমানে ব্রাহ্মণ জাতিভুক্ত ব্যক্তির সুপবিচিত একটি পদবী। দেখা যাচ্ছে পঞ্চম শতকের প্রথম অর্ধে ব্রাহ্মণেরা বাংলার কৃষিভূমির মালিক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। কুটুম্বী কথাটির অর্থ অভিধানে এখনও কৃষক লেখা হলেও তা প্রচলিত নয। অপরদিকে কুটুম্ব বলতে বাংলায় এখনও জ্ঞাতি বা আত্মীয়কে বোঝানো হয়।

মহত্তর আখ্যাটির ব্যাখ্যা নিযে মতদ্বৈধতা আছে। তাঁরা স্থানীয বিশিষ্ট ব্যক্তি তাতে কোনো সন্দেহ নেই। লেখায গ্রামাষ্টকুলাধি করণ বলে যে প্রতিষ্ঠানটির কথা উল্লিখিত হয়েছে তার সাথে অবশ্যই মহত্তরগণ যুক্ত ছিলেন। গ্রামাষ্টকুলাধি করণকে কখনও শুধু অষ্টাকুলাধিকরণ বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। এর আক্ষরিক অর্থ করলে দাঁড়ায় গ্রামের আটটি কুলের অধিকরণ। আটটি কুল নিয়ে গঠিত এক প্রাচীন প্রতিষ্ঠানের কথা জানা যায় বৌদ্ধ সূত্র থেকে। মহাপরিনির্ব্বান সুত্তন্ত-র টীকাকার বুদ্ধঘোষ বজ্জিরাজ্যের বিচার বিভাগের আলোচনায় এক অট্ঠকুলকার কথা বলেছেন। বজ্জিরাজ্যটি ছিল অ-রাজতন্ত্রী যেখানে শাসন পরিচালনার ভার বিশেষ বিশেষ কয়েকটি কুলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত। কুলের প্রতিনিধিরাই বিচার বিভাগের দায়িত্বে থাকতেন। বজ্জিরাজ্যের বিচারসভার একটি

অংশ ছিল অট্টহ-কুলকা (বা অষ্টকুলক অর্থাৎ অষ্টকুল)। বোঝা যায় এখানে আটটি কুলের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা প্রতিনিধিত্ব করতেন। মনে হয় বিশেষ বিশেষ পরিবার থেকে প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত একটি প্রতিষ্ঠান বাংলার কোনো কোনো অঞ্চলেও প্রাচীনকালে স্থানীয় ব্যাপারগুলি পরিচালনা করত। লেখয় মহত্তরগণের উল্লেখ যেভাবে ঘটেছে তাতে মনে হয় তাঁরা অষ্টকুলাধিকরণের অগ্রগণ্য অংশ ছিলেন। তাঁরা হয়তো একসময় কুলের প্রতিনিধি হিসাবেই অষ্টকুলাধিকরণে অংশ নিতেন। বুধ গুপ্তের রাজত্বকালে উৎকীর্ণ ৪৮২ খ্রী-এর দামোদরপুর লেখয় আছে, মহত্তরাদ্যষ্টকুলাধিকরণা নাং গ্রামিক কুটুম্বিনশ্চ। এই লেখরই অন্যত্র আছে মহত্তরাদ্যধিকরণ (অর্থাৎ মহত্তরাদি নিয়ে যে অধিকরণ গঠিত যা অবশ্যই অষ্টকুলাধিকবণকেই নির্দেশ করেছে)। ধনাইদহ লেখটি স্থানে স্থানে ক্ষতিগ্রস্থ হলেও দেখা গেছে মহত্তরদের নামোল্লেখের পর গ্রামাষ্টকুলাধিকরণের কথা এসেছে।

মনে হয় অষ্টকুলেব অধিকরণটি উল্লেখযোগ্য কোনো গ্রামে থাকত এবং তাব আওতায থাকত বেশ কয়েকটি গ্রাম। এর সপক্ষে লেখর বর্ণনার সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। বাংলাদেশের দিনাজপুর জেলার দামোদরপুর গ্রামে গুপ্তযুগের পাঁচখানি লেখ পাওয়া গেছে[৭]। এর মধ্যে বুধগুপ্তের রাজত্বকালের উপরে উল্লিখিত লেখখানিতে পুনরায অষ্টকুলাধিকরণের কথা এসেছে। এখানে বলা হয়েছে কোটি বর্ষ বিষয়ের অন্তর্গত পলাশবৃন্দক থেকে মহত্তরাদি অষ্টকুলাধিকরণ, গ্রামিক ও কুটুম্বিগণ ভূমি হস্তান্তরের ব্যাপারে চন্ডগ্রামের ব্রাহ্মণাদি ক্ষুদ্র প্রকৃতি কুটুম্বিগণকে জানাচ্ছেন যে সেই গ্রামের নভক নামে গ্রামিক তাঁদের কাছে ভূমি বিক্রয়ের জন্য আবেদন জানিয়ে ছিলেন এবং দলিল রক্ষক পুস্তপালের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় অনুমতি পাওয়ার পর তাঁরা তা সম্রাটের নামে মঞ্জুর করেন। নীহাররঞ্জন রায় দেখিয়েছেন যে পলাশবৃন্দক এইরকম এক উল্লেখযোগ্য গ্রাম এবং এর বৃন্দক অংশটি কয়েকটি গ্রামের সমটিকে নির্দেশ করে[৮]। ৪৪০ খ্রী-এর এবং ৪৪৮ খ্রী-এর যথাক্রমে কলাইকুড়ি-সুলতানপুর এবং জগদীশপুর লেখ দুটিতে উল্লিখিত শৃঙ্গবেরবীথির পূর্ণ কৌশিকা এরকম আর একটি গ্রাম[৯]।

উক্ত দামোদরপুর লেখর বর্ণনা থেকে কয়েকটি জিনিস ধরা পড়ে। প্রথমত কোটিবর্ষ বিষয়ের এই অষ্টকুলাধিকরণটি অধিক স্বায়ত্তশাসন ভোগ করছিল যার সমান্তরাল চিত্র ধনাইদহ লেখতে উল্লিখিত খাদাপার বিষয়ের অন্তর্গত গ্রামাষ্টকুলাধিকরণের ক্ষেত্রে পাওয়া যায়নি। এখানে দেখা যাচ্ছে আবেদনকারী অধিকরণ, মহত্তর গ্রামিক ও কুটুম্বীদের কাছেই আবেদন রেখেছিলেন বলে তাঁরা তা ঘোষণা করছেন এবং সম্রাটের পক্ষে তাঁরাই তা মঞ্জুর করে চণ্ডগ্রামের কুটুম্বীদের কাছে সেই তথ্য জ্ঞাপন করেন। দ্বিতীয়ত, পলাশবৃন্দকে একটি অষ্টকুলাধিকরণ থাকলেও চণ্ডগ্রামে কোনো অষ্টকুলাধিকরণ ছিল না। তৃতীয়ত,

এর থেকেই বোঝা যায় যে একই সময়ে গ্রামবাংলার বিভিন্ন স্থানেব সমাজ সংগঠন অভিন্ন ছিল না[১০]। এব কারণ বোধহয সম্পন্ন ও বিশিষ্ট সামাজিক গোষ্ঠীগুলি সর্বত্র সমানভাবে বসবাস করত না। গ্রামষ্টকুলাধিকরণ উচ্চকুলের প্রতিনিধি দ্বারাই গঠিত হতো তাব উপস্থিতি সর্বত্র না থাকাই সম্ভব। আজকের দিনেও বর্ধিষ্ণু গ্রামের উপস্থিতি সর্বত্র নেই। গ্রামগুলির মধ্যে যে তারতম্য ছিল তা চন্ডগ্রামের কুটম্বীগণের উল্লেখ থেকেও পরিষ্কার বোঝা যায়। সেই গ্রামে গ্রামাষ্টকুলাধিকরণ থাকার মত সুসংহত সামাজিক সংগঠনের অভাব তো ছিলই, এমনকি সেখানকার কুটুম্বীদেব সম্পর্কে ক্ষুদ্রপ্রকৃতি বিশেষণটি যুক্ত হয়েছে — ব্রাহ্মণাদ্যান্[১১] ক্ষুদ্রপ্রকৃতি কুটুম্বিনঃ। পলাশবৃন্দকেব অষ্টকুলাধিকবণ, মহত্তর ও অন্য সামাজিক গোষ্ঠীগুলির যে বিস্তৃত ভূমিকা তা কিন্তু অন্যত্র আর পাওযা যাযনি। সম্ভবত এব কারণ স্থান বৈশিষ্ট্য। কোটি বর্ষ বিষযটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং সমৃদ্ধ থাকায এই যুগেব নগর ও গ্রামকেন্দ্রিক প্রশাসন ব্যবস্থা সরকারী ও বেসবকাবী উভযস্তরেই অনেক বেশী সুসংহত ছিল।[১২]

গুপ্তযুগেব অন্যান্য দলিলে ভূমি লেনদেন ব্যাপাবটি বীথি বা বিষযাধিকরণেব মাধ্যমে নির্বাহ হতে দেখা যায়। গ্রামাষ্টকুলাধিকবণ অপেক্ষা বীথিব অধিকাবের সীমা অবশ্যই অধিক ছিল। কলাইকুড়ি-সুলতানপুব (৪৪০খ্রী.) এবং জগদীশপুব (৪৪৮ খ্রী.) লেখ দুটিতেই বীথি অধিকরণের সাথে সহযোগী হিসাবে মহত্তর ও কুটুম্বীরা উপস্থিত আছেন। দুটি ক্ষেত্রেই কুটুম্বীর সংখ্যা অপেক্ষা মহত্তরের সংখ্যা যথেষ্ট কম।[১৩] এ পর্যন্ত আলোচিত সমস্ত লেখর বর্ণনা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায যে এই দুই গোষ্ঠী বেতনভুক রাজকর্মচারী ছিলেন না। গ্রামাষ্টকুলাধিকরণটি রাজ প্রশাসনিক কাঠামো নিরপেক্ষ একটি স্থানীয় প্রতিষ্ঠান। খুব সঙ্গতভাবে অনুমান করা যেতে পারে যে প্রথাগত রাজপ্রশাসনের কর্তৃত্ব সুদূর গ্রামাঞ্চলের অভ্যন্তর স্পর্শ কবার পূর্বে গ্রামশাসন পরিচালনায় এই বিশেষ গোষ্ঠীগুলির উল্লেখযোগ্য স্থান ছিল। গুপ্তপ্রশাসন গ্রামীণ স্তরে এর উপযোগিতা গ্রহণ করেছিল — এইটি এই প্রশাসনের বৈশিষ্ট্য। এই দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে মহত্তরের মর্যাদা কুটুম্বীর তুলনায় বেশী ছিল বলে অনুমান করা যায়। ধনাইদহ লেখ ব্যতিরেকে সর্বত্রই কুটুম্বীর তুলনায় মহত্তরের সংখ্যা অনেক কম। বৈগ্রাম লেখয়[১৪] (৪৪৮ খ্রী.) শুধু কুটুম্বীরাই উপস্থিত মহত্তরের কোনো উল্লেখ সেখানে নেই। সংখ্যাল্পতা গোষ্ঠীটির গুরুত্বের ইঙ্গিতবাহী মনে করা যেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে গ্রামের সমস্ত রকম ভূমি হস্তান্তরে ক্ষেত্রে কুটুম্বী গোষ্ঠীটি অপরিবর্তনীয়ভাবে উপস্থিত। এর থেকে বোঝা যায় যে মহত্তরগণ শুধু ভূমির মালিকানা আছে এমন কৃষক ছিলেন তা নয়। সম্পূর্ণ গ্রাম বা বিশেষ একটি অংশের প্রতিনিধিত্ব করতে

পারতেন এমন এক ব্যক্তিই মহত্তর বলে বিবেচিত হতেন। বাংলায় প্রচলিত মাতব্বর কথাটির সাথে মহত্তরের যোগ থাকা সম্ভব।

পঞ্চম শতকের অন্তুতপক্ষে তিনখানি[১৫] লেখয় মহত্তরগণের নামের তালিকা পাওয়া গেছে, তাতে ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণ উভয় সম্প্রদায়ের ব্যক্তির উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। দুখানি লেখর[১৬] কুটুম্বীর তালিকাতেও একই চিত্র পাওয়া গেছে। এর থেকে বোঝা যায এই যুগে বাংলার কৃষিভূমির মালিকানায় ব্রাহ্মণদের উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল। এছাড়া কৃষক হিসাবেও তাদের স্বতন্ত্র মর্যাদা বিশেষভাবে পরিগণিত হতো। কারণ কুটুম্বী হিসাবে ব্রাহ্মণ কুটুম্বীর উল্লেখ বিশেষভাবে ঘটেছে[১৭]। বিভিন্ন ধর্ম শাস্ত্রে ব্রাহ্মণদের কায়িক শ্রমনির্ভর জীবিকার প্রতি অনীহা প্রকাশ পেলেও গ্রামবাংলার অন্যতম কৃষিজীবী হিসাবে তাঁরা উপস্থিত। আবার এর পাশাপাশি মর্যাদার দিক থেকে অব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ও যে উপেক্ষণীয় ছিলেন না সেটিও লক্ষ্যনীয় কারণ কুটুম্বী ও মহত্তরের তালিকায় তাঁদের নামও আছে। কাযিক শ্রমেব জন্য সম্ভবত সমস্ত সম্পন্ন কৃষক মজুরীর বিনিময়ে কৃষিশ্রমিক নিযোগ কবতেন। দীনেশচন্দ্র সরকারের পাঠ অনুসারে ধনাইদহ লেখতে ক্ষেত্রকর বলে একটি গোষ্ঠীর সাক্ষাৎ পাওযা গেছে[১৮]। এই গোষ্ঠীটি সম্ভবত অন্যের কৃষিভূমিতে ফসল উৎপাদন সম্পর্কিত বিভিন্ন কাজের বিনিময়ে উপার্জন করতেন।

পঞ্চম শতকের পরে কিন্তু বাংলার গ্রামীণ সমাজে এক বিশেষ পরিবর্তন দেখা যায়। ষষ্ঠশতকের প্রারম্ভ থেকে ভূমি হস্তান্তর সম্পর্কে যে সমস্ত লেখ পাওয়া গেছে তাতে কুটুম্বী গোষ্ঠীটির আর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। অন্যদিকে এই শতকের লেখগুলিতে মহত্তরগণ অধিক মর্যাদার অধিকারী হয়েছেন। এই পরিবর্তনকে প্রশাসনিক এক বিশেষ প্রবণতার সাথে যুক্ত করে বিচার করলে চিত্রটি পরিষ্কার হবে। ব্রাহ্মণ অথবা দেবমন্দিরে নিষ্কর ভূমিদানের লিখিত প্রমাণ পঞ্চম শতকের প্রথমার্ধ থেকেই পাওয়া যাচ্ছে। এপর্যন্ত আলোচিত সবকটি দলিলই পাওয়া গেছে বর্তমান বগুড়া, রাজশাহী ও অবিভক্ত দিনাজপুর জেলার ভূখণ্ডে যা সেই সময় পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি নামে পরিচিত ছিল— কালানুক্রমিকভাবে এরপরের লেখটি পাওয়া গেছে সমতট অঞ্চলে। কুমিল্লা জেলায় প্রাপ্ত গুণাইঘর লেখয়[১৯] (৫০৭ খ্রী.) অগ্রহার বলে উল্লিখিত নিষ্কর এগার পাটক[২০] ভূমি বৌদ্ধ বিহারে দানের কথা এতে উৎকীর্ণ হয়েছে। এখানে পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির সুপরিচিত প্রশাসনিক কাঠামোটি অনুপস্থিত। তবে দূতক বলে যে বিজয়সেনের কথা এখানে স্থান পেয়েছে সম্ভবত এই বিজয়সেনের নামই বর্ধমানে প্রাপ্ত মল্লসারুল[২১] লেখয় বলা হয়েছে বলে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন। এই লেখর ভূমি হস্তান্তর প্রক্রিয়ার সাথে পঞ্চম শতকের গুপ্তযুগের লেখগুলির প্রক্রিয়ার অনেকাংশেই মিল আছে। কিন্তু ভুক্তি ও বীথির অধিকরণে অংশগ্রহণকারী রাজকর্মচারী ও বেসরকারী সহযোগী প্রতিনিধিস্থানীয় সামাজিক গোষ্ঠীতে চরিত্রগত পরিবর্তন ধরা পড়ে। বর্ধমানভুক্তির

অন্তর্গত বক্কট্টক বীথির বেত্রগর্ত্তগ্রামের একখণ্ডভূমি দানের কথা এতে উৎকীর্ণ হয়েছে। বর্ধমান ভুক্তিস্ব অধিকরণে রাজকর্মচারী ব্যতীত বেসরকারী ক্ষেত্রটির প্রতিনিধি হিসাবে এখানে একমাত্র অগ্রহারিক উপস্থিত। অগ্রহারিক অবশ্যই সম্পূর্ণ অগ্রহারভোগী ব্রাহ্মণ ভূম্যধিকারীর প্রতিনিধি হিসাবে এখানে উপস্থিত হয়েছেন। অর্থাৎ বিগত প্রায় একশত বৎসর ধরে অগ্রহারভূমির স্বত্বাধিকারী অগ্রহারিণগণ সমাজে এক বিশেষ গোষ্ঠী হিসাবে চিহ্নিত হয়েছেন এবং ভুক্তির অধিকরণে সমগ্র অগ্রহারিণ গোষ্ঠীর তরফ থেকে মুখপাত্র হিসাবে অগ্রহারিক বলে একজন বিবেচিত হয়েছেন। উল্লেখ্য যে বক্কট্টক বীথির অধিকরণের সাথে যুক্ত বেসরকারী সহকারী ব্যক্তির তালিকায় সবচেয়ে বেশী সংখ্যায় আছেন অগ্রহারিণগণ। তাঁদের মধ্যে থেকে সম্ভবত সর্বাগ্রগণ্য একজন অগ্রহারিক বলে ভুক্তির অধিকরণে স্থান পেয়েছেন। দেখা যাচ্ছে রাজপ্রশাসনের বিভিন্ন বিভাগে এ পর্যন্ত সহযোগী বেসরকারী ক্ষেত্রটির যে চিত্র আমরা পেয়েছি তাতে বিশেষ পরিবর্তন ঘটে গেছে। এখানে লক্ষ্যনীয়ভাবে ভূমিকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রটির গুরুত্বই সর্বাধিক। অবশ্যই ৫৪৩ খ্রী. এর (২২৪ গুপ্তাব্দ) দামোদরপুর লেখটির চিত্রে এই পরিবর্তন দেখা যায় না। তবে তার কারণ কোটিবর্ষের নাগরিক বৈশিষ্ট্য যা সেই যুগের অন্যান্য অঞ্চলের থেকে সমাজ বিন্যাসে পার্থক্য রচনা করেছিল। এছাড়া ধর্মাদিত্যে (৫৩০-৪০ খ্রী.) এবং গোপচন্দ্রের (৫৪০-৮০ খ্রী.)[২২] দুটি ফরিদপুর তাম্রশাসনে জ্যেষ্ঠ কায়স্থ (প্রধান করণিক) বলে একজনকে অধিকরণের বেসরকারী ক্ষেত্রের প্রতিনিধিত্ব করতে দেখা যাচ্ছে, তবু সংখ্যাগত বিচারে এযুগে ভূম্যধিকারীর গুরুত্বই সর্বাধিক স্বীকৃতি পেয়েছে। বিগত একশত বৎসর ধরে রাজকীয় দানের প্রসাদে ব্রাহ্মণদের একটি অংশ অবশ্যই সমৃদ্ধ ভূস্বামীতে পরিণত হয়েছিলেন। মল্লসারুল লেখর বীথির অধিকরণে দেখা যাচ্ছে অধিকরণে দেখা যাচ্ছে অগ্রহারিণ বলে উল্লিখিত ব্রাহ্মণদের অনেকেই মহত্তর হিসাবে মর্যাদা লাভ করেছেন।

গ্রাম সমাজের অভ্যন্তরীন পরিকাঠামোর এই পরিবর্তনকে অবশ্যই রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মের সাথে যুক্ত করা যায়। রাষ্ট্রীয় আনুগত্য নির্ভর এক বিশেষ ভূম্যধিকারী সমাজে বিশেষ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। স্মরণ করা যেতে পারে যে বিগত শতকের লেখয় ব্রাহ্মণদের সামাজিক গোষ্ঠী হিসাবে বিশেষ উল্লেখ (বিভিন্ন লেখয় উল্লিখিত ব্রাহ্মণ কুটুম্বী শব্দবন্ধ) থাকলেও অব্রাহ্মণ মহত্তর ও কুটুম্বীদের নামও তালিকায় আমরা পেয়েছি। তাই সঙ্গতভাবেই অনুমান করা যেতে পারে যে সমাজে অব্রাহ্মণভূমির মালিকেরাও মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। অর্থাৎ শুধু জাতি নয় অর্থনৈতিক দিকটিরও প্রাধান্য ছিল। সমাজের স্বাভাবিক ভারসাম্য এইভাবে রাজকীয় দাক্ষিণ্যে অন্তত পক্ষে বাংলার কোনো কোনো[২৩] অংশে এক নূতন মাত্রা লাভ করে এবং এতকাল যেসব সামাজিক গোষ্ঠী সমাজ পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছিলেন তাঁরা অবলুপ্ত

হয়ে যান। ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় অবশ্য মল্লসারুল, ফরিদপুর, গুখরাহাটি লেখয়. উল্লিখিত ভূমি পরিমাপের কাজে কুলবারের প্রসঙ্গ এনে এইসময় অষ্টকুল সমন্বিত প্রতিষ্ঠানটির উপস্থিতির কথা বলেছেন[২৪]। কিন্তু এই ধারণা যদি সঠিক বলে মেনেও নেওয়া যায় তবু বলা যায় যে পূর্বের গ্রাম সংগঠন তার সমস্ত কার্যকারিতা ও গুরুত্ব নিয়ে এই শতকে অনুপস্থিত। অপরদিকে কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট অপর এক ভূম্যধিকারী গোষ্ঠীর আবির্ভাব এই শতকের অবদান।

এ পর্যন্ত সামাজিক গোষ্ঠীব আলোচনায় মূলত দুটি গোষ্ঠীর কুটুম্বী ও মহত্তরের কথা আলোচিত হলেও লেখগুলিতে অন্য কয়েকটি গোষ্ঠীর কথাও পাওযা যায়। গ্রাম সমাজে তাঁদের অবস্থানের ব্যাপ্তি ও গভীরতা উল্লিখিত দুটি গোষ্ঠীর মত অবশ্যই ছিল না এবং অনেকেই ছিলেন মূলত নগরের বাসিন্দা। তবে মর্যাদায় তাঁরা কেউই নগন্য ছিলেন না। ১২৪, ১২৮, বুধগুপ্তের তারিখবিহীন ও ২২৪ গুপ্তাব্দের দামোদবপুর লেখয় কোটিবর্ষ বিষয়ের শাসনকর্তার সহায়ক সমিতিতে চাবটি পেশার প্রতিনিধিব উল্লেখ পাওযা গেছে, তাঁরা হলেন নগরশ্রেষ্ঠী, সার্থবাহ, প্রথম কুলিক এবং প্রথম কায়স্থ। কোটিবর্ষ অধিষ্ঠানাধিকরণে অর্থাৎ নগরে অধিকরণে তাঁরা কেউই রাজার বেতনভুক কর্মচারী ছিলেন না। তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন কোটিবর্ষ নগবের বিশিষ্ট কতকগুলির সামাজিক গোষ্ঠীব প্রতিনিধি। গুপ্তযুগে বাসার[২৫] (প্রাচীন বৈশালী, উত্তর বিহাব) থেকে পাওযা কতকগুলি শীলমোহর থেকে এইসব পেশাদারী গোষ্ঠীর কারবারী সংগঠনের কথা পাওযা গেছে। এই যুগে উত্তরভারতে সংগঠিত ও সুসংহত গিল্ডের পরিচয লেখমালা থেকেও সুবিদিত। বৌদ্ধ যুগ থেকেই শ্রেষ্ঠী ও সার্থবাহ এই দুটি গোষ্ঠী সমাজে বিশেষ স্থান অধিকার করে ছিলেন তার বহু প্রমাণ পালি ও জাতক গ্রন্থগুলিতে পাওয়া যায়। শ্রেষ্ঠী বলতে ধনী সম্ভ্রান্ত বণিক এবং সার্থবাহ বলতে পণ্যসামগ্রী নিয়ে দলবদ্ধভাবে যাঁরা দূর-দূরান্তে বাণিজ্য করতে যেতেন সেই শ্রেণীর বণিককে বোঝাত। নগরশ্রেষ্ঠীকে বহু পণ্ডিত নগরের পেশাদারী সংগঠনের (গিল্ড) সভাপতি হিসাবে গ্রহণ করলেও রণবীর চক্রবর্তী দেখিয়েছেন যে প্রাচীন বাংলায় এইরকম উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর অস্তিত্ব আশা করা যায় না[২৬]। এখানে তাই নগরশ্রেষ্ঠী বলতে কোটিবর্ষ নগরের অগ্রগণ্য শ্রেষ্ঠী অর্থটি গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত। কুলিক নির্দেশ করে কারিগরকে। প্রথম কুলিক শব্দবন্ধটি কোটিবর্ষ নগরে প্রধান কারিগরকে বুঝিয়েছে। কায়স্থ বলতে করণিককে বোঝাত এবং প্রথম কায়স্থ নিশ্চিতভাবেই প্রধান করণিককে নির্দেশ করেছে। দেখা যাচ্ছে গ্রাম ও শহরে প্রশাসনিক কাঠামোর সাথে যুক্ত যে স্থানীয় সহায়ক সমিতিটির স্থান গুপ্ত শাসনব্যবস্থায় রাখা হয়েছিল তাতে স্থানীয় চরিত্র অনুযায়ী বিশেষ ভেদ ছিল। কোটিবর্ষের নাগরিক চরিত্রের সাথে সাযুজ্য রেখে কারবারী সামাজিক

গোষ্ঠীগুলির প্রাধান্য তেমনি গ্রামীণ প্রশাসনিক অধিকরণে ব্যবসায়ী ও কারিগরদের অনুপস্থিত নগর ও গ্রামের সমাজ কাঠামোর ভিন্নতার পরিচায়ক।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকেব ভূমি হস্তান্তরের দলিলগুলি থেকে আরও কয়েকটি সামাজিক গোষ্ঠীর পরিচয় পাওয়া যায়। এসমস্ত লেখয় দাতা হিসাবে সমাজের বিশেষ কিছু লোকের কথা স্থান পেয়েছে। প্রায় সমস্ত লেনদেনই স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে সংঘটিত হয়েছে। সুতরাং দাতারা সম্পন্ন তো অবশ্যই ছিলেন— দান কর্মের জন্য স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করার সংস্থানও তাঁদের ছিল, সেই কালের বিচারে যা সমাজের ধনী ব্যক্তিদের আয়ত্তেই থাকা সম্ভব। ভূমিদানের জন্য আবেদনকারীর তালিকায আছেন গ্রামিক, বৈদিক ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠী, অযোধ্যা থেকে আগত কুলপুত্রক অর্থাৎ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি (২২৪ গুপ্তাব্দের দামোদরপুর লেখ), সাধনিক অর্থাৎ সৈন্য বিভাগেব কর্মচারী (ধর্মাদিত্যের তৃতীয রাজ্যবর্ষের ফরিদপুর লেখ) এবং মহাসামন্ত মহাবাজ বিজয়সেন। এঁরা প্রত্যেকেই সমাজের একটি বিশেষ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। সমাজে তাঁদের প্রত্যেকেরই একটি বিশেষ পরিচয আছে এবং মর্যাদাও অবশ্যই আছে। দানের মত পুণ্যকর্মেব মাধ্যমে সেই মর্যাদা আরও বৃদ্ধির চেষ্টাও ছিল।

এ পর্যন্ত আলোচনায় গ্রাম ও নগর সমাজ পবিকাঠামোব বিশেষ কিছু গোষ্ঠীর যে পরিচয় পাওয়া গেল তার থেকে পঞ্চম থেকে ষষ্ঠ শতকের পথে গ্রামীণ কাঠামোয একটি পরিবর্তনের ধারা চোখে পড়ে। নিম্নলিখিত ভাবে আমরা তা বিন্যস্ত করতে পারি।

১। প্রাচীনকাল থেকে গ্রামগুলির নিজস্ব গোষ্ঠীর পরিচালনায় একটি সাংগঠনিক কাঠামো ছিল।

২। পরাক্রান্ত গুপ্তসম্রাটদের রাজত্বকাল পর্যন্ত গ্রামের স্বাভাবিক কাঠামো প্রায় অটুট ছিল।

৩। রাজকীয় দানে বলীয়ান ভূসম্পদের অধিকারী ব্রাহ্মণদের মধ্যে একটি গোষ্ঠীর (অগ্রহারিণ) আবির্ভাবের ফলে পূর্বের স্বাভাবিক গোষ্ঠীগুলির ক্ষমতা হ্রাস হয় এবং তারা শেষপর্যন্ত অন্তরালে চলে যায়।

৪। অন্ততপক্ষে কুটুম্বীদের মধ্যে ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য স্বীকৃত হলেও অব্রাহ্মণ ব্যক্তিরাও পূর্বে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন কিন্তু পরে ব্রাহ্মণ গোষ্ঠীর গুরুত্বই সর্বাধিক স্বীকৃত হয়।

৫। ভূমিকেন্দ্রিক মর্যাদার ব্যাপারটি প্রথমে শুধু গ্রামাঞ্চলের সাথে যুক্ত থাকলেও ষষ্ঠশতকে তা বীথি ও বিষয় স্তরেও বিস্তৃত হয়।

সূত্র নির্দেশ

১। রাধাগোবিন্দ বসাক, ধনাইদহ কপার প্লেট ইনস্‌ক্রিপশনস্ অভ দা টাইম অভ কুমারগুপ্ত ফার্স্ট: দা ইয়ার ১১৩, এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা (এরপর এ.ই. বলে চিহ্নিত) ১৭৩ দিল্লী (১৯২৩-২৪), ৩৪৫–৪৮।

২। বুধগুপ্তের রাজত্বকালীন ৪৮২ খ্রী-এর দামোদরপুর লেখয় উল্লিখিত 'প্রত্যবেক্ষ' শব্দটি দ্রষ্টব্য, রাধাগোবিন্দ বসাক, দা ফাইভ দামোদরপুর কপার প্লেট ইন্‌স্‌ক্রিপশনস্ অভ দা গুপ্ত পিরিয়ড, এ.ই. ১৫ দিল্লী (১৯১৯–২০), ১৩৬, পঙক্তি ১০।

৩। ৪৮২ খ্রী-এর দামোদরপুর লেখ, পূর্বোক্ত, ১৩৪-৩৭।

৪। মহারাষ্ট্রের একটি লেখয় এক হলকীয় বা কৃষককে বলা হয়েছে কুটুম্বী, লুডার্স লিস্ট, ১১২১।

৫। দীনেশচন্দ্র সরকার, সিলেক্ট ইন্‌স্‌ক্রিপশনস্ বিয়ারিং অন ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি অ্যাণ্ড সিভিলাইজেশন, ১, কলকাতা, ১৯৬৫, ২৮৭–৮৯, পঙক্তি ৯।

৬। প্রাচীন ভারতে ভূমির বিভিন্ন মাপ সম্পর্কে আলোচনার জন্য রণবীর চক্রবর্তী, প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে, কলকাতা, ১৩৯৮, ১৫৮–৫৯।

৭। রাধাগোবিন্দ বসাক (২ নং টীকা)

৮। নীহাররঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, কলকাতা, ১৩৫৬, অষ্টম অধ্যায়, ৩৬২–৬৩।

৯। কলাইকুড়ি-সুলতানপুর এবং জগদীশপুর লেখর জন্য যথাক্রমে দীনেশচন্দ্র সরকার, কলাইকুড়ি কপার প্লেট ইন্‌স্‌ক্রিপশনস্ অভ দা গুপ্ত ইয়ার ১২০, দা ইণ্ডিয়ান হিস্টোরিক্যাল কোয়ার্টারলি, ১৯ (১৯৪৩), ১২–২৬ এবং দীনেশচন্দ্র সরকার, এপিগ্রাফিক ডিসকভারিজ ইন পাকিস্তান, কলকাতা, ১৯৭৩, ৮–১৪, ৬১–৬৩।
গুপ্ত যুগে উত্তরবঙ্গের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রামের আলোচনা আছে ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়, অ্যাসপেক্টস্ অভ রুরাল সেট্‌লমেন্টস্ অ্যাণ্ড রুরাল সোসাইটি ইন মেডিয়েভাল ইণ্ডিয়া, কলকাতা, ১৯৯০, ৪১।

১০। ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় অবশ্য কালের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তনের কথাও বলেছেন, —These variations were not necessarily local since they were present in same locality at different points of time; পূর্বোক্ত, ৪১।

১১। ব্রাহ্মণাধ্যক্ষ, বি ছাবড়া ও জি, এস. গাই কৃত সম্পাদনা, জে.এফ. ফ্লীট, করপাস ইনসক্রিপশনম্ ইণ্ডিকেরাম, ৩, দিল্লী, ১৯৮১, ৩৩৫-৩৯, পঙক্তি ৩।

১২। প্রাচীন কোটিবর্ষের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে পুনর্ভবা নদীর পূর্বতীরে অবস্থিত বাণগড়ে (বর্তমান দক্ষিণ দিনাজপুরের অন্তর্গত)। হেমচন্দ্রের অভিধানচিন্তামণি, পুরুষোত্তমের ত্রিকাণ্ডশেষ, বায়ুপুরাণ ইত্যাদি গ্রন্থে কোটিবর্ষ নগরের উল্লেখ আছে। অনেক প্রাচীন রচনায় কোটিবর্ষের প্রশস্তি আছে। প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে এখানে খ্রী. পূ.

তৃতীয় শতক থেকে মধ্যযুগ পর্যন্ত পাঁচটি বসতির স্তর পাওয়া গেছে। গুপ্তযুগে এখানে নগর বসতির চিহ্ন সুস্পষ্ট।

১৩। এই দুটি লেখয় উল্লিখিত মহত্তর ও কুটুম্বীর তালিকার জন্য ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, ৬৪-৬৬।

১৪। রাধাগোবিন্দ বসাক, 'বৈগ্রাম কপারপ্লেট ইন্স্‌ক্রিপশনস্‌ অভ দ্য গুপ্ত ইয়ার ১২৮,' এ.ই. ২১ (১৯৩১-৩২), ৭৮-৮৩।

১৫। (ক) ধনাইদহ (টীকা ১), (খ) কলাইকুড়ি-সুলতানপুর ও (গ) জগদীশপুর (উভয়ের জন্য টীকা ৯)।

১৬। (ক) কলাইকুড়ি-সুলতানপুর ও (খ) জগদীশপুর (টীকা ৯)।

১৭। (ক) ব্রাহ্মণাদিন গ্রাম কুটুম্বিনঃ কলাইকুড়ি-সুলতানপুর।
(খ) ব্রাহ্মণাদিন প্রধান কুটুম্বিনঃ জগদীশপুর, ইত্যাদি।

১৮। দীনেশচন্দ্র সরকার, সিলেক্ট ইন্স্‌ক্রিপশনস, ১, ১৯৬৫, ২৮৭ ৮৯, পঙক্তি ৯, পাদটীকা ১।

১৯। দীনেশচন্দ্র সরকার, পূর্বোক্ত, ৩৪০-৪৫।

২০। ভূমির পরিমাপের আলোচনার জন্য রণবীর চক্রবর্তী (৬ নং টীকা)।

২১। ননীগোপাল মজুমদার, 'মল্লসারুল কপার প্লেট অভ বিজয়সেন', এ. ই. ২৩, (১৯৩৫-৩৬), ১৫৫-৬১।

২২। এফ. ই. পারগিটার, থ্রী. কপার প্লেট গ্রান্টস্‌ ফ্রম ইস্টবেঙ্গল, দ্য ইণ্ডিয়ান অ্যান্টিকোয়্যারি, ৩৯, (১৮৭২-১৯৩৩) দিল্লী, ২০০, পঙক্তি ৭, এবং ২০৪, পঙক্তি ৬।

২৩। বাংলার সব অংশে যে চিত্র একরূপ ছিল না তার প্রমাণ স্বরূপ ধর্মাদিত্যের তৃতীয় রাজ্যবর্ষের ফরিদপুর লেখর কথা উল্লেখ করা যায়। এখানে আঠারজন মহত্তরের নাম পাওয়া গেছে যাঁরা কেউই অগ্রহারিণ নন। কিন্তু তাঁরা বিষয় অধিকরণের সাথে যুক্ত অর্থাৎ পঞ্চম শতকের মহত্তরের তুলনায় তাঁরা অধিক মর্যাদার অধিকারী এবং এখানে কুটুম্বীর উপস্থিতি নেই। এফ. ই. পারগিটার, পূর্বোক্ত, ১৯৫, পঙক্তি ৪-৬।

২৪। ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, ৫০-৫১।

২৫। 'অ্যানুয়াল রিপোর্ট অভ দ্য আরকিওলজিক্যাল সার্ভে অভ এনশেন্ট ইণ্ডিয়া', ১৯০৩-৪, ১০৭;
১৯১১—১২, ৫৬; ১৯১৩ —১৪, ১৩৮।

২৬। রণবীর চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত, ১৭০।

শিল্পকলার ইতিহাসে তাম্রলিপ্ত জনপদ : একটি সমীক্ষা

প্রদ্যোত কুমার মাইতি

ভারতের বন্দর-নগরী তাম্রলিপ্তের কথা প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে ও বিদেশী পর্যটকদের বিবরণ থেকে জানা যায়। আবার পূর্ব ভারতের অন্যতম জনপদরূপে তাম্রলিপ্তের কথা মহাভারত ও বিভিন্ন পুরাণে উল্লিখিত রয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা বাংলা তথা ভারতের শিল্পকলার ইতিহাসে তাম্রলিপ্ত জনপদের শিল্পসম্ভারের স্থান নির্ণয়ের চেষ্টা করব। এই মূল্যায়ন করতে হলে তাম্রলিপ্ত জনপদের ভৌগোলিক পরিধি থেকে প্রাপ্ত শিল্পবস্তুগুলির কালানুক্রমিক পরিচয় জানা দরকার এবং সেগুলির বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক শৈল্পিক দিকগুলি বর্তমান নিবন্ধে তুলে ধরে শিল্পকলার ইতিহাসে তাম্রলিপ্ত জনপদের শিল্পীদের কলাকুশলতার প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করা হল।

আলোচনার সুবিধার জন্য তাম্রলিপ্ত জনপদে প্রাপ্ত শিল্পবস্তুকে আমরা প্রধানতঃ দুটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করছি যথা (১) প্রাগ-ঐতিহাসিক (প্রটো-হিস্টারিক) ও আদি ঐতিহাসিক[১] (প্রি-হিস্টারিক) শিল্পবস্তু এবং (২) ঐতিহাসিক যুগের শিল্পবস্তু।

১. প্রাগ-ঐতিহাসিক ও আদি-ঐতিহাসিক যুগের শিল্পবস্তু

ক. প্রস্তরীভূত ও প্রায় প্রস্তরীভূত হাড় ও হরিণের শিঙের অসংখ্য অস্ত্রশস্ত্র।

খ. হাড় ও হরিণ শিঙের উপর শিল্পকর্মের অসংখ্য নিদর্শন।

গ. ক্ষুদ্রাশ্মীয় ও নবাশ্মীয় অস্ত্র ও হাতিয়ার।

ঘ. নবাশ্মীয় ও তাম্রাশ্মীয় যুগের বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক হাড় ও পাথরের মসৃণ অস্ত্রশস্ত্র।

ঙ. পোড়ামাটির শিল্প নিদর্শন; যেমন চিহ্নিত মৃৎপাত্র বা তার ভগ্নাংশ।

২. ঐতিহাসিক যুগে শিল্পবস্তু

ক. পোড়ামাটির দেবদেবী ও মনুষ্য মূর্তি।

খ. পোড়ামাটির হাঁড়িকুড়ি, প্রদীপ, ধূপদানী ইত্যাদি।

গ. পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ কাহিনী-কিংবদন্তী ও দেবদেবীর মূর্তি ইত্যাদি।

ঘ. পোড়ামাটি, হাড, ধাতু এবং সাধারণ ও মূল্যবান পাথরের তৈরী পুঁতি।
ঙ. পাথর ও ধাতুর তৈরী ভাস্কর্য নিদর্শন।

প্রাগ-ঐতিহাসিক ও আদি ঐতিহাসিক শিল্প নিদর্শন ও তাদের বিশ্লেষণ

প্রাগ-ঐতিহাসিক ও আদি ঐতিহাসিক যুগে তাম্রলিপ্ত যে ভারত সভ্যতার অন্যতম কেন্দ্রস্থল ছিল তা প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখনন, অনুসন্ধান ও গবেষণার দ্বারা স্বীকৃত।[২] বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের প্রাক্তন অধিকর্তা পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত মন্তব্য করেন যে, আজ থেকে প্রায় চার হাজার বছর বা আরও কিছু পূর্বে বন্দর-নগর তাম্রলিপ্তের অভ্যুদয় ঘটেছিল।[৩] প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধিকর্তা দাশগুপ্তের অনুমানের স্বপক্ষে বহু প্রাগ-ঐতিহাসিক ও আদি, ঐতিহাসিক প্রত্নবস্তু বর্তমানে তাম্রলিপ্ত সংগ্রহশালা ও গবেষণা কেন্দ্রে (তমলুক, মেদিনীপুর) এবং ঐ সংগ্রহশালার অনারারী কিউরেটর শ্রী প্রশান্ত কুমার মন্ডলের ব্যক্তিগত সংগ্রহে রয়েছে। সম্প্রতি তাম্রলিপ্ত সংগ্রহশালা শ্রী মন্ডলের রচিত "আর্ট অ্যাণ্ড আর্টিফ্যাক্টস অভ বোন অ্যাণ্ড অ্যান্টলার ইন দি লোয়ার গ্যাঞ্জেস ভ্যালি" শিরোনামে একটি পুস্তক প্রকাশ করেছে। সেই পুস্তকে আলোচিত শিল্পবস্তুগুলির সময়সীমা আরও সুদূর অতীতে সম্প্রসারিত করা হয়েছে।

তাম্রলিপ্ত জনপদ থেকে প্রাপ্ত ও তাম্রলিপ্ত সংগ্রহশালায় রক্ষিত ঐ যুগের প্রাপ্তবস্তুগুলির উল্লেখ এবং সেগুলির মধ্যে শিল্পগুণে সমৃদ্ধ নিদর্শনগুলির বিশ্লেষন কেবল করা হবে। তাম্রলিপ্ত সংগ্রহশালায় রক্ষিত এ যুগের প্রত্নবস্তুগুলি হল ক্ষুদ্রাশ্মীয় হাতিয়ার, হারপুন, হাড়ের বঁড়শি, শলাকা, বহু প্রকার প্রসাধন সামগ্রী, তামার কুঠার, সীল (মুদ্রা) ও অসংখ্য ভগ্ন মৃৎপাত্র। ক্ষুদ্রাশ্মীয় হাতিয়ারের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল দ্বিমুখ বিশিষ্ট ফলা ও শঙ্কায়ুধ।[৪] সুমসৃণ নবাশ্মীয় হাতিয়ারের মধ্যে কুঠারগুলি প্রধান। হাড়ের প্রত্নবস্তুর মধ্যে দুটি হারপুন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ. সাধারণত এর আবিষ্কার ভারতবর্ষে বিরল। বিশেষজ্ঞদের মতে, এর বয়সকাল চার হাজার বছরেরও বেশী[৫]। হারপুন ছাড়াও হাড়ের তৈরী বঁড়শি এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা চলে[৬]।[৬] হারপুন ও বঁড়শি যথাক্রমে পশু শিকার ও মৎস্য শিকারের কাজে যে ব্যবহৃত হত তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। এগুলির প্রাপ্তি এতদ অঞ্চলে শিকারজীবী ও মৎস্যজীবী মানুষের পাশাপাশি দক্ষ কারিগরদের অধিবসতির ইঙ্গিত দেয়। কারণ হারপুন ও বঁড়শির কারিগরী দক্ষতা সেই কথাই বলে। কুঠারটির কারিগরী দক্ষতাও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

বিচিত্র ধরনের বর্ণ মৃৎপাত্রের আকার, বর্ণ চিত্রণ ও নির্মাণ পদ্ধতি শিল্পগত দিক থেকে বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে। চিত্র শিল্পে যে এ অঞ্চলের কারিগররা দক্ষ ছিলেন তার পরিচয় মৃৎপাত্রগুলির উপর বর্ণ চিত্রণ থেকে বোঝা যায়। প্রত্নতত্ত্ববিদ টি.এন. রামচন্দ্রন তমলুক থেকে আবিষ্কৃত দুটি বৈশিষ্ট্য জ্ঞাপক মৃৎপাত্রের নির্মাণ সৌষ্ঠবের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন[৭]। বর্তমানে এ দুটি নিদর্শন গুরুসদয় দত্ত সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে। "অজ্ঞাত যুগের এই কলসদুটির গঠনভঙ্গি এবং তাদের সুসমঞ্জস অবয়বে রূপায়িত একক ও পরস্পরচ্ছেদী শুঁয়াপোকার আকৃতি পত্রশ্রেণী, স্বস্তিকা চিহ্ন, পুষ্পচিত্র এবং বিনুনি করা বেত ও তৃণদণ্ড প্রাচীন মিশর, ক্রীট দ্বীপ ও গ্রীস দেশের মূল ভূখণ্ডে অবস্থিত মাইসেনির কৌলাল রীতিকে যে স্মরণ করিয়ে দেয় এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন প্রত্নতত্ত্ববিদ টি.এন রামচন্দ্রন[৮]"। এই গুরুত্বপূর্ণ সাদৃশ্য আবিসংবাদিতভাবে তাম্রলিপ্তের ইতিহাসকে এক বৃহত্তর পরিসর দানে সক্ষম হয়েছে। একথা বর্তমানে নিঃসংশয়ে বলা চলে যে প্রাগ-ঐতিহাসিক ও আদি-ঐতিহাসিক তাম্রলিপ্তে বিকশিত সভ্যতায় তাম্রাশ্মীয় রীতি সম্মত "লাল-কালো" (ব্ল্যাক অ্যাণ্ড রেড ওয়ার) মৃৎপাত্রগুলির এক সুস্পষ্ট পরিচয় জ্ঞাপক স্থান ছিল। জীবজন্তু, গাছপালা, সরলরেখা, বক্ররেখা, বৃত্ত, অর্ধবৃত্ত বিন্দু ইত্যাদি উৎকীর্ণ মৃৎপাত্রগুলি একদিকে যেমন প্রাগ-ঐতিহাসিক যুগের শিল্পরীতির ইঙ্গিত দেয় তেমনি ক্রীটীয় মৃৎপাত্রগুলির সঙ্গে এক যোগসূত্রও খুঁজে পেতে অসুবিধা হয় না। এমনকি তমলুকে আবিষ্কৃত আদিমযুগের সমুদ্রগামী জাহাজের চিত্র খোদিত ভগ্ন মৃৎপাত্রগুলিও প্রাগ-ঐতিহাসিক যুগের স্বাক্ষর বহন করছে। তাছাড়া তমলুকে তাম্রযুগের নিদর্শনাবলীর যেমন কৃষ্ণ লোহিত কৌলালের ভাণ্ড, ফুলদানির আকৃতি কলস, সস্তম্ভ থাল (ডিস অন স্ট্যান্ড) ইত্যাদির আবিষ্কার লক্ষ্য করে পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত মন্তব্য করেছেন যে, এক সময় রূপ নারায়ণের নদীতটে এক বিশাল অধিবসতির অবস্থান ছিল[৯]। এই অধিবসতির এক বড় অংশ যে শিল্পকর্মে রত ছিলেন তা আমাদের আলোচ্য বিভিন্ন শিল্পকর্ম থেকে বোঝা যায়।

তাম্রলিপ্ত জনপদের শিল্পীরা কেবল দেশজ শিল্পরীতির অনুশীলনে নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখেননি, তাঁরা বৈদেশিক রীতিকেও তাঁদের শিল্পকর্মের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিলেন তার প্রমাণও মেলে। এই ধারার সূত্রপাত হয় প্রাগ-ঐতিহাসিক যুগে এবং তা প্রায় প্রাক-গুপ্ত যুগ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে তাম্রলিপ্ত সংগ্রহশালায় রক্ষিত প্রাগ-ঐতিহাসিক যুগের লাল কর্ণেলিয়ান পাথরে খোদিত বোতাম আকৃতির তিনটি মুদ্রা বা সীলের শিল্পরীতিতে বিদেশী প্রভাবের ছাপ যে সুস্পষ্ট তা অনুমান করা হয়েছে।[১০]

এ যুগের বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক পোড়ামাটির 'মা ও ছেলে'-র ২টি মূর্তি (তাম্রলিপ্ত সংগ্রহশালায় রক্ষিত) এবং একটি রহস্যময় মূর্তিও (সম্ভত লৌকিক কোন দেব মূর্তি যা আশুতোষ সংগ্রহশালায রক্ষিত) আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এগুলিব নির্মাণ শৈলীর মধ্যে বাস্তবতার ছাপ সুস্পষ্ট।

এবার আমরা ব্যক্তিগত সংগ্রহশালায় রক্ষিত প্রস্তবীভূত ও প্রায় প্রস্তরীভূত হাড় ও হরিণ শিঙ-এর অস্ত্রশস্ত্র ও শিল্পবস্তু নিযে আলোচনায় আসছি। এ বিষয়ের উপর পূবোক্ত শ্রীমন্ডলেব "আর্ট অ্যাণ্ড আর্টিফ্যাক্টস অভ বোন অ্যাণ্ড অ্যান্টলার ইন দি লোয়ার গ্যাঞ্জেস ভ্যালি" পুস্তকটি একটি প্রামাণ্য আলোচনা গ্রন্থ। এই পুস্তকে হাড় ও হরিণ শিঙের অস্ত্রশস্ত্র ও শিল্প বস্তুগুলির বযঃসীমা, শিল্প নৈপুন্য ইত্যাদিব কথা বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। আলোচনা করতে গিয়ে লেখক ভারতীয তথা বিশ্বের প্রেক্ষাপটে বিষয়গুলিব উপস্থাপনা করেছেন। আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে সাধারণভাবে লক্ষ্য করলে হাড় ও হবিনের শিঙ-এর অস্ত্রগুলি নেহাৎ ভাঙা হাডের টুকরো বলে মনে হবে কিন্তু একটু অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি দিলে বোঝা যায এগুলির কার্যকবী প্রান্ত বের করতে যথেষ্ট শ্রম দিতে হযেছে। জন্তু-জানোযারের হাড়গুলিকে লম্বালম্বিভাবে চেরাই করে এরূপ ছোট বড করা হয়েছে। আর সেটা করা হত সূচালো কোন অস্ত্রের সাহায্যে মোটামুটি নির্দিষ্ট রেখাব উপর অসংখ্যবার আঘাত করে। এরপর প্রয়োজন অনুযায়ী এগুলোকে আবার আড়াআড়ি ভাবে ভেঙে ভেঙে এবং পরে প্রয়োজনে ছিল্কা তুলে অভিপ্রেত আকার দেওযা হত।... লম্বা আকৃতিব ছুঁচলো বা চওড়া আকৃতির ধারালো হাড়ের টুকরো টুকরো অংশগুলিই অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হযেছে।[১১] এই অস্ত্রগুলি তৈরীর পশ্চাতে যে কারিগবী দক্ষতার প্রয়োজন তা এখানকার শিল্পীদের ছিল। এ জাতীয অস্ত্রগুলির আকাব ভেদও চোখে পড়ে। সাধারণতঃ বড়, মাঝারি ও ছোট এই তিন ভাগে ফেলা যায এবং ব্যবহারে ক্ষেত্রেও এদের পার্থক্য ছিল বলে অনুমান করা হয়েছে।[১২]

হাড় ও হরিণ শিঙ-এব অস্ত্রশস্ত্রের পাশাপাশি এগুলির উপর খোদিত অসংখ্য শিল্প নিদর্শন শ্রীমণ্ডলের ব্যক্তিগত সংগ্রহে রযেছে এবং তার বেশ কিছু আলোচ্য পুস্তকে স্থান পেয়েছে। লক্ষনীয় এই যে ভারতবর্ষে হাড় ও হরিণ শিঙকে শিল্পের মাধ্যমে হিসেবে ব্যবহারের এত প্রচুর নিদর্শন কোন প্রত্নস্থল থেকে পাওয়া গিয়েছে এমন খবর আমাদের জানা নেই। এ জাতীয় নিদর্শন প্রধানত স্পেন, ফ্রান্স থেকে শুরু করে পূর্বে রাশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের বহু প্রাগ-ঐতিহাসিক প্রত্নস্থল থেকে পাওয়া গেছে এবং এদের উদ্ভবকাল মোটামুটি খ্রীষ্টপূর্ব ত্রিশ হাজার থেকে খ্রীষ্টপূর্ব দশ হাজার বছর অব্দের মধ্যে বলা হয়েছে অর্থাৎ অন্ত্যপুরাতন প্রস্তর যুগের অন্তর্গত।[১৩] এই প্রেক্ষাপটে বিচার করলে আমাদের আলোচ্য হাড় ও হরিণ শিঙের শিল্প সামগ্রীর বয়সকাল কমপক্ষে

বার হাজার বছর দাঁড়ায়। "কিন্তু উৎখনন, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং সর্বোপরি প্রত্নস্থলের ভূস্তর সম্পর্কিত জ্ঞানের অভাবে এদের বাকি বয়সকাল নির্ধারণ দুরূহ হয়ে পড়েছে। তবে একই সঙ্গে পাওয়া বড় থেকে অতি ক্ষুদ্র প্রস্তরীভূত অস্থি বা হাড়ে নির্মিত অস্ত্রাদি ও মানুষের প্রস্তরীভূত কঙ্কালের অবশেষ থেকে অনুমিত হয় যে আলোচ্য শিল্প নিদর্শনগুলির বয়সকাল অন্ততপক্ষে নবাশ্মীয়-তাম্রাশ্মীয় সভ্যতার পূর্ববর্তী"[১৪]।

হাড় ও হরিণ শিঙের উপরিভাগ বা এর সরু দিকটিতে খোদাই করে অভিপ্রেত মুখমণ্ডল বা অবয়ব ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। সাধারণত মানুষ বা জীবজন্তুর মুখমণ্ডল বা এদের দেহাংশের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় (মণ্ডল, আর্ট অ্যাণ্ড আর্টিক্যাক্টস... চিত্র-৮৯)। আবার হাড়ের উপর নামমাত্র কাদার সাহায্যে মানুষ বা জীবজন্তুর মূর্তির উপস্থাপনাও করা হয়েছে (মণ্ডল, তদেব, চিত্র—৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮)। এমনকি হাড়ের উপর বা হাড়ের গোলাকার চাকতির উপর লাল, কালো বা ক্রীম রঙের সাহায্যে জীবজন্তুর অবয়বও আঁকার রীতি সুপ্রচলিত ছিল (মণ্ডল, তদেব, চিত্র—৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৬, ৮৭)।

লক্ষনীয় এই যে, "হাড়ের উপর রঙ বা কাদা ব্যবহার করার পূর্বে এগুলি চেঁছে নেওয়া হত। কখনো কখনো গভীর বা অগভীর রেখার উপস্থিতিও লক্ষ্য করা যায়"। (মণ্ডল, তদেব, চিত্র—৮৬) "চিত্রিত চাকতিগুলি খুবই মসৃণ মনে হয়, চর্বিজাতীয় কোন জিনিস দিয়ে এগুলিকে পালিশ করা হয়েছে।" (মণ্ডল, তদেব, চিত্র—৮২) হাড়া বা হরিণ শিঙ-এর উপর অগভীর রেখার সাহায্যে জীবজন্তুর মুখমণ্ডলের পার্শ্বচিত্রগুলিও (মণ্ডল, তদেব, চিত্র—৬০, ৬১, ৬২) কারিগরী দক্ষতার নিদর্শন।

হাড় ও হরিণ শিঙের উপর শিল্পকর্মের নিম্নলিখিত কতকগুলি বৈশিষ্ট্যও চোখে পড়ে।

(১) মানুষের প্রতিকৃতি রূপায়নের ক্ষেত্রে মুখমণ্ডল (মণ্ডল, তদেব, চিত্র—২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ৩০, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৪০, ৪১, ৪৯) বা দেহের কিছু অংশ রূপায়নের (মণ্ডল, তদেব, চিত্র—৪৪) চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। কোন ক্ষেত্রেই মানুষের শরীরের নিম্নভাগের বা হাড়ের উপস্থাপনা চোখে পড়ে না।

(২) প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই অভিপ্রেত বিষয়ের উপস্থাপনার ক্ষেত্রে পার্শ্বচিত্রের অঙ্কন দেখা যায়। ব্যতিক্রম খুব সামান্যই (মণ্ডল, তদেব, চিত্র—২৭, ৩৩, ৫৯)।

(৩) জীবজন্তুর শিল্পকর্মের মধ্যে পাখি ও জলজ প্রাণীর উপস্থাপনাও লক্ষিত হয়।

(৪) হাড়ের উপর লিঙ্গ প্রতীকের উপস্থাপনাও (মণ্ডল, তদেব, চিত্র—৭৬, ৭৭) চোখে পড়ে। এই ধারা যে এতদ অঞ্চলে অব্যাহত ছিল তার নিদর্শন

হল পোড়ামাটির লিঙ্গের আবিষ্কার (তাম্রলিপ্ত সংগ্রহশালা, তমলুক, এ্যাকসেশন নম্বর—৮৬৮)।

(৫) দেহ সজ্জার উপাদান হিসেবে হাড়কে ছোট বড় নানা আকারে যে ব্যবহার করা হত তা পরিষ্কার বোঝা যায়।

ঐতিহাসিক যুগের শিল্পকর্ম ও তার বিশ্লেষণ

ভারতবর্ষে লোকায়ত শিল্পরূপে পোড়ামাটির মূর্তি নির্মাণ শিল্প সুদূর সিন্ধু সভ্যতার যুগ থেকে যে প্রবহমান তা আমাদের সুবিদিত। প্রাচীন বাংলার এক লোকাশ্রিত শিল্প রীতির অন্যতম কেন্দ্রস্থল যে ঐ সময় থেকে তাম্রলিপ্তে ছিল তার পরিচয় প্রাগ-ঐতিহাসিক ও আদি ঐতিহাসিক সভ্যতায় তাম্রলিপ্তের শিল্পকর্মের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে আমরা উল্লেখ করেছি। ঐতিহাসিক যুগে এই শিল্প রীতির নিদর্শন মৌর্য যুগ থেকে শুরু করে গুপ্তযুগ পর্যন্ত পাওয়া গেলেও শুঙ্গ ও কুষান যুগের শিল্প নিদর্শনের সংখ্যা সর্বাধিক। আধুনিক কালের কোন গবেষক মন্তব্য করেছেন: "আমাদের মনে রাখতে হবে মৌর্য পরবর্তীকালে উদ্ভূত রাজকীয় ও দরবারী শিল্পের সম্পূর্ণ বিপরীত সেই লোকলালিত টেরাকোটা শিল্পের মূলপ্রেরণা এসেছিল শাস্ত্রীয় ধর্মবিরোধী লোকায়ত ধর্মচিন্তা থেকে। লোকায়ত শিল্পে স্বাভাবিকভাবেই লোকায়ত বিশ্বাস, বিশেষতঃ ধর্মবিশ্বাস গভীরভাবে প্রতিফলিত হয়। তাম্রলিপ্তির পোড়ামাটি শিল্পে সেই লোকাশ্রিত ধর্মচর্চার নীরব পদচারনা শোনা যায়"।[১৫] টেরাকোটা শিল্পের মূল প্রেরণা শাস্ত্রীয় ধর্ম বিরোধী লোকায়ত ধর্ম চিন্তা থেকে এসেছিল লেখকের এই অনুমানকে মেনে নেওয়া যায় না। কারণ তাম্রলিপ্তের পোড়ামাটি শিল্পে কেবল লোকাশ্রিত ধর্ম চর্চা নয় সামগ্রিকভাবে জীবনযাত্রার নানাদিক প্রতিফলিত হয়েছে। ধর্মীয় এবং ধর্ম নিরপেক্ষ উভয় বিষয়ই টেরাকোটা শিল্পে স্থান পেয়েছে। ধর্মীয় টেরাকোটায় জৈন, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র অনুমোদিত দেবদেবীর মূর্তি ও কাহিনীর পাশাপাশি লৌকিক দেব-দেবীরও স্থান ছিল।[১৬] এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে ধর্মীয় টেরাকোটার তুলনায় তমলুকে ধর্ম নিরপেক্ষ টেরাকোটা অধিক পরিমাণে পাওয়া গিয়েছে।

এখন আমরা ঐতিহাসিক যুগের পোড়ামাটির শিল্পবস্তুগুলির মধ্যে যেগুলি শিল্প নৈপুণ্যের দিক থেকে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কেবল সেই নিদর্শনগুলি সম্পর্কে আলোচনা করব।

মৌর্য যুগ (খ্রীঃ পূর্ব ৩২০—খ্রীঃ পূর্ব ১৮৭ অব্দ)

তাম্রলিপ্ত সংগ্রহশালায় রক্ষিত ঐ যুগের দুটি বালকের মুখমণ্ডল (রায়, নীহাররঞ্জন, বাঙালীর ইতিহাস (আদি পর্ব), নীঃ সং চিত্র—১ ও ৪) এবং একটি পুরুষের

মুখমণ্ডলে (রায়, তদেব, চিত্র-ত) এত বাস্তবতা ফুটে উঠেছে যা স্থানীয় শিল্পীদের কারিগরী দক্ষতারই ইঙ্গিত দেয়। আবার আলোচ্য দুটি বালকের মুখমণ্ডলের অবয়বের সঙ্গে সমসাময়িককালের পাটলিপুত্রে আবিষ্কৃত অনুরূপ নিদর্শনের ঘনিষ্ঠ মিল চোখে পড়ে। এর থেকে উভয় স্থানের শিল্পরীতির ঘনিষ্ঠতার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তাম্রলিপ্ত সংগ্রহশালায় রক্ষিত পোড়ামাটির ফলকের ভগ্নাবশেষ রূপে একটি বিদেশী মুকুট পরিহিতা ও বিচিত্র কেশবিন্যাসযুক্তা নারীর মুখমণ্ডলও [বিশ্বাস, এস. এস., টেরাকোটা আর্ট অভ বেঙ্গল, চিত্র—২২(এ)] শিল্প নিদর্শনের দিক থেকে স্মরণ করা যায়। গ্রেকো-রোমান প্রভাব যুক্ত বলে অনুমিত।[১৭] এছাড়া এই সংগ্রহশালায় রক্ষিত এ যুগের পোড়ামাটির একটি অপ্সরা মূর্তিও (এ্যাকসেশন নম্বর—১২৯) শিল্প নৈপুণ্যের জন্য স্মরণীয়।

শুঙ্গযুগ (খ্রীঃ পূর্ব ১৮৭—খ্রীঃ পূর্ব ৭৫ অব্দ)

এ যুগের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক পোড়ামাটির শিল্প নিদর্শনটি হল ইতিহাসখ্যাত 'অক্সফোর্ড যক্ষিনী' (মাইতি, ঠাকুর ও নারায়ণ (সম্পাদিত), স্টাডিজ ইন ওরিয়েন্টোলজি, চিত্র—৬)। তমলুক থেকে সংগৃহীত আনুমানিক খ্রীঃ পূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ এই বিশিষ্ট যক্ষিনী মূর্তিটি বহু হাত ফেরতা হয়ে বর্তমানে অক্সফোর্ডের এ্যাসমেলিয়ন সংগ্রহশালায় রয়েছে। এই যক্ষিনী মূর্তিটির আভরণ ও অলংকরণের বৈচিত্র্য একে ভারত শিল্পে নজিরবিহীন শিল্প সৃষ্টি রূপে চিহ্নিত করেছে। "তমলুক থেকে প্রাপ্ত অন্যান্য যক্ষিনী মূর্তির মত এটিও বিশেষ ভঙ্গিতে পায়ের পাতার উপর ভারসাম্য রেখে দণ্ডায়মান; একটি হাত ঝুলন্ত এবং অন্যটি নিতম্বে স্থাপিত; অঙ্গের আভরণ হয়ে শোভা বর্ধণ করছে কঙ্কণ, কর্ণাভরণ, রত্নখোচিত গলবন্ধনী, বনমালা ইত্যাদি। মূর্তিটির মাথার কেশদামে বিন্যস্ত যাদুকাঁটাগুলি (magical hairpins) সম্ভবতঃ তার অতিলৌকিক ক্ষমতার প্রতি অঙ্গুলী নির্দেশ করছে। মূর্তিটির শারীরিক বৈশিষ্ট্যের....মাতৃত্বসূচক চিহ্নগুলি অত্যন্ত প্রকট এবং তাৎপর্যবাহী।... অক্সফোর্ডের Indian Institute এর কিউরেটর T. Bumow এটিকে তমলুকের টেরাকোটা শিল্পের একটি অনবদ্য উৎপাদন বলে মনে করেছেন ও সিদ্ধান্তে এসেছেন, 'It is now definitely known to have originally belonged to Bengal, and all scholars agree that it represents the most valuable record of Indian terracotta art."[18]।

'অক্সফোর্ড যক্ষিনী' ছাড়াও অন্যান্য যক্ষিনী ও যক্ষ মূর্তি শিল্পগত বিচারে আমাদের আলোচনার দাবী রাখে। তমলুক থেকে সংগৃহীত আশুতোষ সংগ্রহশালায় (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) রক্ষিত এ যুগের তিনটি যক্ষিনী মূর্তির মস্তক দেহাংশ উল্লেখ করছি।

একটি ভগ্ন যক্ষিনী মূর্তির মস্তক (টি. ২০৯২) যার আড়ম্বরপূর্ণ কেশবন্ধন ও শিরোভূষণ 'অক্সফোর্ড যক্ষিনী'র কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।[১৯]

আবার অপর একটি যক্ষিনী মূর্তির নিম্নাংশ (টি.২০৩৯) থেকে মূর্তির বিচিত্র মেখলা, হার এবং স্বচ্ছ ঘাঘরা নারী দেহের লাবণ্যকে এক কোমল সৌন্দর্যানুভূতিতে প্রকাশ করেছে। এই মূর্তিটিকে মৃন্ময় ভাস্কর্যের এক সার্থক সৃষ্টি বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।[২০]

আর একটি ভগ্ন যক্ষিনী মূর্তির মুখ (টি. ২২৩৬)-এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। মূর্তির মুখশ্রী কমনীয় এবং ঠোঁটের প্রান্তে মৃদু হাস্যরেখা সুস্পষ্ট। যক্ষিনীর শিরোভূষণ রত্নময় এবং কপালে গোলাকৃত ললাট-ভূষণ টিকলি অনুপম সৌন্দর্য সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে। এ ধরনের ভাবব্যাঞ্জক এবং লাবণ্যময়ী যক্ষিনী মূর্তি ভারতে দুর্লভ বলে মন্তব্য করা হয়েছে।[২১]

'অক্সফোর্ড যক্ষিনী'র শিল্প বৈশিষ্ট্যের ন্যায় পক্ষবিশিষ্ট একটি দণ্ডায়মান যক্ষমূর্তির মৃন্ময় ছাঁচ [আশুতোষ মিউজিয়াম, বিশ্বাস, এস.এস, প্রাগুক্ত গ্রন্থ, চিত্র-৫০ (এ)] শিল্প সৃষ্টির দিক থেকে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যক্ষের দুটি পা সমভাবে ভূমির উপর স্থাপিত। তার দু-পাশে প্রকুটিত কমলযুক্ত মৃণাল লতার অবস্থিতি। যক্ষের শিরোভূষণ ও কানের অলংকার এক বিচিত্র শোভার সৃষ্টি করেছে। তাম্রলিপ্তে আবিষ্কৃত এই যক্ষমূর্তির ছাঁচটি সমগ্র ভারতে একক।[২২]

কয়েকটি নারী মূর্তির মুখাবয়ব [আর্কোলজিক্যাল সার্ভে অভ ইণ্ডিযা, ইষ্টান সার্কেল, বিশ্বাস, তদেব, চিত্র-৩৪ (এ) এবং তাম্রলিপ্ত সংগ্রহশালা, বিশ্বাস, তদেব, চিত্র-৩৪ (বি)] থেকে ও একটি অপ্সরা মস্তক (আশুতোষ মিউজিয়াম, বিশ্বাস, চিত্র-২৩) থেকে নারীদের অপূর্ব কেশবন্ধন রীতি, দুল ও পুঁতির ব্যবহার এবং রত্নমালা ও মণিখচিত ফিতার সাহায্যে খোঁপার বন্ধন ইত্যাদির উপস্থাপনা অপূর্ব কারিগরী দক্ষতার পরিচয় দেয়।

গ্রাম্যদৃশ্য (তাম্রলিপ্ত সংগ্রহশালা, মণ্ডল, ইণ্টারপ্রিটেশন অভ টেরাকোটাজ অভ তাম্রলিপ্ত, চিত্র-১২, ১৩), চাষের দৃশ্য (তদেব, চিত্র-১৪), স্যাণ্ডেলের ব্যবহার [আশুতোষ মিউজিয়াম, বিশ্বাস, চিত্র-২৯ (এ)] ইত্যাদি পোড়ামাটির শিল্প নিদর্শনের মধ্য দিয়েও শিল্প নৈপুণ্য ফুটে উঠেছে।

এ যুগের একটি পোড়ামাটির ভগ্ন মৃৎফলকে (টি. ৩৮৭৬) ছদন্ত জাতকের কাহিনীর প্রতিফলনও এ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। ফলকে চারটি হাতিকে একটি বিশাল গাছের সামনে ক্রীড়ারত অবস্থায় দেখা যায়। গাছটিতে দুটি বানর দৃশ্যমান। আলোচ্য ফলকটিতে ছদন্ত হাতিকে তার সঙ্গীদের সঙ্গে ক্রীড়ারত অবস্থায় দেখা যাচ্ছে। ফলকের সবচেয়ে নীচে প্রদর্শিত বিশাল হাতিটি সম্ভবতঃ বোধিসত্ত্ব। হাতিগুলিকে দেখান হয়েছে এক অপূর্ব বাস্তবতাপূর্ণ শিল্প ছন্দে। বনানীর জীবন

স্পন্দিত বন্যভাবকে জীবন্ত করে ফুটিয়ে তোলাব জন্য গাছটিতে দুটি বানরকে দেখান হয়েছে। হাতিদের দেহের সঙ্কুচিত ও প্রসারিত ভাবকেও ফোটাবার সার্থক প্রচেষ্টা হয়েছে এবং তাদের ত্বকের ভাঁজসমূহেও অতিশয় শিল্প চাতুর্যের সঙ্গে প্রদর্শিত হয়েছে। শুঙ্গ যুগের "ভারতীয় মৃন্ময় শিল্পে এই ধরনের সূক্ষ্মতাব্যঞ্জক এবং প্রাণবন্ত দৃষ্টান্ত প্রকৃতই দুর্লভ।" প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে সাঁচীর স্তূপ বেষ্টনীতে ছদ্দন্ত জাতকের কাহিনীব এক অপূর্ব শিল্প শোভা সম্পন্ন চিত্র প্রদর্শিত রযেছে। সেই ভাস্কর্য নিদর্শনের সঙ্গে আলোচ্য পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ চিত্রটির আঙ্গিকগত সাদৃশ্য অত্যন্ত স্পষ্ট।[২৩]

পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ এ যুগের দুটি লক্ষ্মী মূর্তির (তা.মি.এ্যাকসেশন নম্বর ৪৭৮ ও ৫৩৬) শিল্পগত বৈশিষ্ট্যও উপেক্ষনীয নয়।

কুষাণ যুগ (খ্রীঃ পূঃ ১৫ অব্দ থেকে ১৭৬ খ্রীষ্টাব্দ)

বিদেশী প্রভাব যুক্ত এ যুগের একটি উপবিষ্ট বালক মূর্তি (আ. মি., বিশ্বাস, প্রাগুক্ত গ্রন্থ, চিত্র—৫৯ ডি) প্রথমেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মূর্তিটির দৈর্ঘ্য ২$\frac{১}{২}$ ইঞ্চি এবং মসৃন প্রলেপযুক্ত ও ফাঁপা ধরনের। চকলেট রং-এর উপরিভাগ বিশিষ্ট মূর্তির দেহের গঠন, ললাট ভূষণ এবং অঙ্গাবরণী অবিকল হেলেনীয় ধরনের। এর নির্মানকাল খ্রীষ্টীয় ১ম-২য় শতকে নির্ধারিত করা হয়েছে।[২৪]

তাম্রলিপ্ত সংগ্রহশালায় রক্ষিত এ যুগের ক্ষুদ্রাকৃতি একটি মুখমণ্ডল (বিশ্বাস, তদেব, চিত্র—৩৩ ডি) শৈল্পিক গুণে সমৃদ্ধ। এর মস্তকে রয়েছে বিদেশী খুব সম্ভবতঃ স্কাইথিয়ান শিরস্ত্রান। মাংসল গাল, পুরু ঠোঁট, টিকালো নাক ও স্বপ্নালু দৃষ্টি এই ক্ষুদ্রাকৃতি মুখমণ্ডলের বৈশিষ্ট্য। ডঃ এস.এস. বিশ্বাস মন্তব্য করেছেন যে, এ ধরনের মূর্তির সঙ্গে কুষান যুগের মথুরায় প্রাপ্ত কয়েকটি প্রতিকৃতির সাদৃশ্য রয়েছে।[২৫] বাংলার অন্য কোথাও আজ পর্যন্ত এরূপ মূর্তির আবিষ্কারে কথা শোনা যায় না।

এ যুগের পোড়ামাটির আবক্ষ একটি নারীমূর্তির (টি. ২২১৮) দক্ষ রীতি যেমন উৎকৃষ্ট তেমনি এর প্রশস্ত ললাট, আয়ত দুটি চোখ, উন্নত নাসিকা, দীর্ঘ চিবুক এবং পীন স্তনযুগল শৈল্পিক গুণে সমৃদ্ধ। এসব বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করলে মূর্তিটি যে বৈদেশিক ভাবপুষ্ট তা সহজে মনে হয়। মূর্তির ঠোঁটে এক স্নিগ্ধ কোমল ও আবেগপূর্ণ মৃদু হাস্যরেখা বিশেষ দর্শনীয়। মূর্তির শিল্প বিন্যাস প্রাচীন 'গ্রেকো-রোমান' অথবা 'গ্রেকো মিশরীয়' শিল্পকে স্মরণ করিয়ে দেয়। অতীত মিশরের 'সায়েত' (Saitc) যুগের কোন কোন নারীমূর্তির সঙ্গে কতকটা ভাবগত সাদৃশ্য রয়েছে বলে কোন বিশেষজ্ঞ মনে করেন।[২৬]

তমলুকে পোড়ামাটির একটি দ্বিমুখ বিশিষ্ট মূর্তির আবিষ্কার শুধু শিল্প নৈপুণ্যের দিক থেকে নয় বৈদেশিক প্রভাবের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই মূর্তিটি যে সমগ্র ভারতে একক একথা অত্যন্ত প্রত্যয়ের সঙ্গে বলেছেন প্রত্নতত্ত্ববিদ পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত। মূর্তিটি (টি. ২১৬৭ এবং বিশ্বাস, পূর্বোক্ত, চিত্র—৫৯-সি) গলদেশ পর্যন্ত নির্মিত এবং দু-দিকেই রোমান আকৃতির শিরস্ত্রান পরা ও মাথায় তিলক। মাথার উপরিভাগে গোলাকৃতি ফাঁপা ধবনেব আংটা রয়েছে। মুখ দুটির মাছের আকৃতি চোখ, লম্বা ভ্রূ, সুস্পষ্ট ধারাল নাক ও চিবুকের গঠনে শিল্প নৈপুণ্য বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে। মাছেব আকৃতি চোখ ও তিলকের ব্যবহার ভারতীয় রীতি সম্ভূত হলেও অন্যান্য দৈহিক বিবরণে বৈদেশিক প্রভাব সুস্পষ্ট থাকায় প্রত্নতত্ত্ববিদ পি.সি. দাশগুপ্ত এই মূর্তিটির সঙ্গে রোমানদের যুদ্ধের দেবতা জানুসের (Janus) সাদৃশ্যের কথা উল্লেখ করেছেন।[২৮]

কুষাণ যুগের ডানা বিশিষ্ট একটি ভগ্ন যক্ষিনী মূর্তিও (টি. ২২২০) আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যক্ষিনীর একটি জানা ও বুকের নিম্নাংশ ভগ্ন। কেশ বন্ধন, কণ্ঠহার ও কর্ণভূষণে শুঙ্গ যুগের শিল্প রীতির প্রভাব থাকলেও মূর্তির মসৃণ প্রলেপ, সুকোমল ও লাবণ্যপূর্ণ মুখভাব, মুক্ত ডানাটির মাধুর্য ও স্বল্পস্ফীত বক্ষদ্বয় এবং কিছু পরিমাণ সুডোল গঠন রীতি কুষাণ যুগের শিল্প রীতিকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। এই মূর্তিটিকে তাই খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের শিল্প নিদর্শন বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[২৯]

পোড়ামাটির ফলকের ভগ্নাবশেষে চিত্রিত আক্রমণোদ্যত একটি পুরুষ মূর্তির উত্তরাঙ্গ শিল্প শৈলীর দিক থেকে বিশেষ উল্লেখযোগ্য (রায়, পূর্বোক্তা, চিত্র—১৮, তা. মি.)। বাম হাতের মুঠোয় ধরা এক নর/নারীর চুলের গুচ্ছ ধরে আক্রমণের ভঙ্গিটি শিল্পী সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। মূর্তিটির দেহের গড়নে, রূপে ও রীতিতে গ্রেকো-রোমান প্রভাব রয়েছে বলে অনুমান করা হয়।[৩০]

এ যুগের একটি নৃত্যরত যক্ষ মূর্তি (তা.মি, বিশ্বাস, চিত্র—৩৫-ডি.) এবং বহু অলংকার ভূষিতা একটি যক্ষিনী মূর্তির (তা. মি., বিশ্বাস, চিত্র-১২-বি) শিল্পগত বৈশিষ্ট্য কম তাৎপর্য পূর্ণ নয়।

এ যুগের একটি ভগ্ন মৃৎফলকে রূপায়িত রথচালক যুক্ত বৃষবাহী রথ শিল্পগত বৈশিষ্ট্যের দিকে থেকে উল্লেখের দাবী রাখে (টি.৩২৪১ এবং বিশ্বাস, পূর্বোক্ত, চিত্র—৫২-এ)। কুষাণ যুগের রথযুক্ত মৃৎফলক প্রাচীন বাংলার শিল্পে এই দ্বিতীয়। ইতিপূর্বে মহাস্থানগড়ে একটি রথযুক্ত পোড়ামাটির ফলক আবিষ্কৃত হয়েছিল। তমলুকে প্রাপ্ত ফলকে রূপায়িত রথটি দুই চক্র বিশিষ্ট এবং এ ধরনের রথ সাঁচীর স্তূপ বেষ্টনীতে দেখা যায়।[৩১]

গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর যুগের টেরাকোটা শিল্প নিদর্শন

গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর যুগের টেরাকোটা শিল্প নিদর্শনের উল্লেখযোগ্য শৈল্পিক বৈশিষ্ট্য তেমন চোখে পড়ে না। তবে গুপ্ত যুগের একটি ভগ্ন দণ্ডায়মান দিগম্বর জৈন মূর্তি (আ. মি, বিশ্বাস, তদেব, চিত্র—৬১ সি) এবং তিনটি বৌদ্ধ মূর্তি (আ.মি, বিশ্বাস, তদেব, চিত্র—৬০-এ এবং তা. মি, মাইতি ও ঠাকুর (সম্পাদিত), ইন্দোলজিক্যাল স্টাডিজ, প্রবন্ধ "বুদ্ধিজম্ অ্যাট তাম্রলিপ্ত" পৃ. ১৩৫—১৩৯, চিত্র ৫ ও ৬) শিল্পগত দিক থেকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

গুপ্ত যুগের দগ্ধ মৃত্তিকার কয়েকটি মূর্তিকে অতীত তাম্রলিপ্ত জনপদ তথা বাংলার শিল্প গৌরবের উৎকৃষ্ট নিদর্শন রূপে চিহ্নিত করা চলে। এগুলি হল একটি ভগ্ন পুরুষ মূর্তির মুখ (টি. ৩৭৬৯), একটি ভগ্ন নারী মূর্তির নিম্নাংশ (টি. ৩৭৬৭), একটি ভগ্ন নারী মূর্তির (সম্ভবতঃ কোন বাম্পী) নুপুর পরিহিত চরণ (টি. ৩৭৬৬) এবং একটি নারী মূর্তির মুখ (টি. ৩৭৬৭। এর মধ্যে শেষোক্ত নিদর্শনটি বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে "মুখটি রূপা ধবনের এবং এর আকার খুবই বড়। এক অপরূপ কোমলতা ও সৌন্দর্যের স্নিগ্ধালোক মূর্তিটিকে পরিবৃত করে রেখেছে এক বিচিত্র ও রহস্যপূর্ণ ভাব লাবণ্য। নিঃশয়ে এটি সমগ্র ভারতের শিল্প সংগ্রহে একক।"[৬২] ঘাটালের অন্তর্গত পান্না গ্রাম থেকে প্রাপ্ত এসব নিদর্শনগুলি বর্তমানে আশুতোষ সংগ্রহশালায় রয়েছে।[৬৩] তাম্রলিপ্ত সংগ্রহশালায় রক্ষিত মংস্যের উপর গজলক্ষ্মীর মূর্তিটির (এ্যাকশেসন নম্বর পট্যারি- ৪৪) শিল্পগত বৈশিষ্ট্যও লক্ষণীয়।

তাম্রলিপ্ত জনপদের অন্তর্গত রঘুনাথবাড়ীতে পাল যুগের পদ্মাসীনা দেবীমূর্তি এবং একটি পোড়ামাটির গোলাকৃতি ফলক (টি. ৩৫৫৪) পাওয়া গিয়েছে। এই মূর্তিটিকে তারাদেবীর মূর্তি বলে চিহ্নিত করা হয়েছে, এটি এক অতি অনুভূতি প্রবণ শিল্পের পরিচায়ক। বৌদ্ধ সাহিত্যে তারাদেবীর রূপ কল্পনায় যে কাব্যিক এক অভিব্যক্তির প্রকাশ ঘটেছে তা এই মূর্তির সঙ্গে যুক্ত প্রস্ফুটিত পদ্মটির লীলায়িত মৃণালের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে। আলোচ্য ফলকখানি সমসাময়িক কালের নালন্দায় প্রাপ্ত অনুরূপ মূর্তি পটসমূহকে স্মরণ করিয়ে দেয়।[৬৪]

নারী মূর্তি সমূহের শৈল্পিক বৈশিষ্ট্য

তমলুকে আবিষ্কৃত পোড়ামাটির নারী মূর্তি বিশেষ করে যক্ষিনী মূর্তি সমূহের অলংকারের প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রাচুর্য এবং কটিবন্ধ, ঘাঘরা, ওড়না, মেখলা ইত্যাদির ব্যাপক প্রয়োগ একত্রিতভাবে এক বিচিত্র ও মনমুগ্ধকর সৌন্দর্য সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে। বিশেষত এখানকার যক্ষিনীদের ঘাঘরার ভাঁজ সমূহ এবং স্বচ্ছতা

শিল্পীর দক্ষতারই পরিচয় দেয়। তমলুকে আবিষ্কৃত নারীমূর্তি সমূহের পরিধেয় মেখলা বস্ত্রের সূক্ষ্মতা হেতু তাদের অঙ্গ লাবণ্য অধিক পরিস্ফুট হয়েছে। এখানকার যক্ষিনী তথা নারী মূর্তি সমূহের এই রূপলাবণ্য ফুটিয়ে তোলার চেষ্টাকে প্রত্যক্ষ করে প্রত্নতাত্ত্বিক পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত মন্তব্য করেছেন: "এই ধরনের শিল্পরীতিকে তুলনা করা যায় প্রাচীন মিশরের শিল্পরীতির সঙ্গে। সেখানেও ভাস্কর্য ও চিত্র শিল্পে বার বার নারীদেহের লাবণ্যকে প্রকাশ করা হয়েছে। এই ভীরুতা বর্জিত শিল্প প্রয়াস থেকে 'ফারাও'দের অতি সম্মানিতা রূপসী কন্যারাও বাদ পড়েননি। অতি সূক্ষ্ম আঁট-সাঁট পোষাক পবিহিতা মেম্ফিসের প্রায় নগ্ন সুন্দরী কন্যাদের প্রায়শই দেখা যায় মিশরীয় মূর্তি এবং চিত্র শিল্পে। ... সুপ্রাচীন মিশর এবং ভারতবর্ষের শিল্পীগণের এই ধরনের শিল্প সৃষ্টি যেন বারবার ইঙ্গিত করে এই পার্থিব জগতের চিরন্তন রূপবহনের প্রতি। তাম্রলিপ্তের বিলাসিনী যক্ষিনীগণের অর্দ্ধনগ্ন রূপ যেন কেবলই স্মরণ করিয়ে দেয় সুদূর নীল উপত্যকার সুন্দরীগণের দ্বিধাহীন দৃষ্টিভঙ্গিকে"।[৩৫]

প্রস্তর মূর্তি, ফলক

পাল-সেন যুগের পূর্বে তাম্রলিপ্তে প্রাপ্ত প্রস্তরমূর্তি খুব সামান্যই আজ পর্যন্ত আমাদের নজরে এসেছে। তবে প্রস্তর নির্মিত মূর্তিগুলির বেশ কয়েকটি যে শিল্পগত বিচারে যথেষ্ট মূল্যবান তা জানা যায়।

পাল-পূর্ব যুগের প্রস্তরমূর্তি

গুপ্ত যুগের প্রস্তর নির্মিত মূর্তির মধ্যে তাম্রলিপ্ত সংগ্রহশালায় রক্ষিত একটি বৌদ্ধ মূর্তি (এ্যাকসেশন নম্বর- ৩০৪) এবং একটি শ্লেট পাথরে ফলকে উৎকীর্ণ অসুরমর্দিনী দুর্গা মূর্তি (টি. ৩৭৭১) এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায়। শেষোক্ত মূর্তিটির "স্কন্ধোপরি আলুলায়িত কুঞ্চিত কেশরাশি এবং দৈহিক গঠনে শক্তি ও কোমলতাপূর্ণ লাবণ্যের মিশ্রণ. মূর্তিটিকে এক অপূর্ব সৌন্দর্য দান করেছে।"[৩৬]

আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের চুনা পাথর নির্মিত একটি ক্ষুদ্র দুর্গামূর্তির উর্দ্ধাংশ (ব্যক্তিগত সংগ্রহে রক্ষিত) "এক বলিষ্ঠ শিল্পরীতির পরিচায়ক। মূর্তির মুখাবয়ব এক অপরূপ ভাব দীপ্তিতে উদ্ভাসিত এবং বিভিন্ন হস্তের আয়ুধশ্রেণী এক সুস্পষ্ট আকার প্রাপ্ত।"[৩৭]

আনুমানিক সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীর প্রস্তর ফলকে নির্মিত এক শ্রেণীর মূর্তি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। তিলদা থেকে শ্লেট পাথরের দুটি বিষ্ণু ফলাক (টি. ৩৬৮৮ এবং টি. ৩০৭৯) সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় পাওয়া গেছে। মূর্তি দুটির "প্রসারিত

বক্ষ, সুডোল স্কন্ধ, সমগ্র দেহের বিচিত্র নমনীয়তা এবং সুন্দর প্রভামণ্ডল নিঃসংশয়ে প্রকাশিত করছে উর্দ্ধলোকের এক অপূর্ব সৌরদেব কান্তিকে। এই ধরনের বিষ্ণু ফলক বর্দ্ধমান এবং চব্বিশ পরগণার কয়েকটি স্থানে ইতিপূর্বে আবিষ্কৃত হয়েছিল। তবে গঠন নৈপুণ্য এবং ভাব-সমৃদ্ধিতে তিলদার মূর্তিদ্বয় এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে।"[৩৮]

একই ধরনেব ফলকে রূপায়িত ঐ যুগের লক্ষ্মীমূর্তি (টি. ৩৪২৮), দুর্গামূর্তি (টি. ৩৬৬৬) এবং গণেশ মূর্তি (টি. ৩৬৯০) তিলদায় পাওয়া গেছে। এছাড়া তমলুক থেকে প্রাপ্ত এ সময়ের স্টিয়াটাইট পাথরে তৈরী ছোট বটুক ভৈরবের মূর্তিটির (টি. ৩৪৮০) গঠন শৈলী খুবই বাস্তবতা পূর্ণ। তবে দণ্ডাযমান লক্ষ্মী মূর্তিটির "সুডৌল অঙ্গ সৌষ্ঠব এক অতি বিচিত্র অনুভূতিপরায়ণ শিল্পরীতির পরিচায়ক বাঙলায় আবিষ্কৃত প্রাচীনতম লক্ষ্মীমূর্তি সমূহের মধ্যে এটি নিসংশযে অন্যতম। দুর্ভাগ্যবশত মূর্তির মস্তকের অংশটি ভগ্ন।"[৩৯]

পাল যুগের প্রস্তর শিল্প নিদর্শন

তমলুক শহরে বিষ্ণুহরির মন্দিরে অবস্থিত দুটি চতুর্ভূজ বিষ্ণুমূর্তি, একটি ভগ্ন মস্তক চতুর্ভূজ বিষ্ণুমূর্তি (টি. ২০৫৯), একটি ব্রহ্মানী দেবী মূর্তি (টি. ২০৪৭), একটি উপবিষ্ট বৌদ্ধ মূর্তি (ব্যক্তিগত সংগ্রহে রক্ষিত), দেবী বর্গভীমার মূর্তি (মূর্তিটি উগ্রতারার বলে অনুমিত) ইত্যাদি শিল্পগত বিচারে কিছুটা মূল্যবান।

সেন যুগের একটি দেবীমূর্তি তাম্রলিপ্ত সংগ্রহশালায় রয়েছে যার শিল্প নৈপুণ্য উপেক্ষনীয় নয়।

উপসংহার

তাম্রলিপ্ত জনপদের উপরোক্ত শিল্প নিদর্শনগুলির আলোচনা থেকে এখানকার শিল্পীদের সৃষ্টিধর্মী দক্ষতার যেমন পরিচয় পাওয়া যায় তেমনি বাঙালীর গৌরবগাথা রচনাতে এগুলি যে বিশেষ সহায়ক তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। প্রত্নতাত্ত্বিক ও গবেষকদের অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলে তাম্রলিপ্ত জনপদের ভূগর্ভে ছড়িয়ে ছিটিযে থাকা শিল্পগুণে সমৃদ্ধ বহুধরনের প্রত্নবস্তু উদ্ধারের ফলে এবং সেগুলি বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে বর্তমানে আমরা বহু অজ্ঞাত ও স্বল্পজ্ঞাত ইতিহাস বিস্তৃতভাবে জানার সুযোগ পেয়ে চলেছি। অদূর ভবিষ্যতে বসুন্ধরার অঞ্চলগর্ভ থেকে আরও বহু শিল্পনৈপুণ্যে ভরা প্রত্ন সামগ্রী বাংলার এই সুপ্রাচীন প্রত্নস্থল থেকে উদ্ধার হবে এ প্রত্যাশা করা যায়। কারণ বিগত তিন-চার দশকের মধ্যে তাম্রলিপ্ত জনপদে বিশেষ করে তমলুক শহরের ৪/৫ কিলোমিটারের মধ্যে শিল্পগুণে

সমৃদ্ধ বহু উল্লেখযোগ্য প্রত্নবস্তুর আবিষ্কার এক নতুন দিগন্তের উন্মেষ ঘটিয়েছে যা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে অতীত বাংলার অন্যতম সভ্যতার পীঠস্থান তাম্রলিপ্ত জনপদ এক বিচিত্র ও অনুভূতিপ্রবণ নন্দন সাধনার ও তপস্যার কেন্দ্রস্থল ছিল যার ফলে আমরা বহু যুগন্ধর শিল্পীর সৃষ্টির আস্বাদ লাভ করে যেমন ধন্য হচ্ছি তেমনি অতীত ইতিহাস রচনার উপাদান হিসেবেও সাহায্য করবে। পলিমাটির দেশ বাংলা, তাই এ দেশের শিল্পীরা এঁটেল মাটিকে শিল্প সৃষ্টির মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। তারও বহু পূর্বে হাড় ও হরিণের শিং-কে শিল্প সৃষ্টির মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। অবিভক্ত বাংলার প্রাচীন তাম্রলিপ্ত সহ অন্যান্য স্থানের যথা পাহাড়পুর, বানগড়, চন্দ্রকেতুগড় ইত্যাদি পোড়ামাটির শিল্প নিদর্শনগুলি সমগ্র ভারতীয় শিল্পে আজও এক স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট স্থান অধিকারের দাবী করতে পারে। অনুরূপভাবে হাড় ও হরিণের শিং-কে শিল্প সৃষ্টির মাধ্যম হিসেবে ব্যবহারের এমন ব্যাপক নজির এখনও পর্যন্ত ভারতবর্ষের অন্যত্র শোনা যায় না। তাই বলি প্রাচীন তাম্রলিপ্ত জনপদের মাটি ও মানুষ ভারত জননীর অধিক স্নেহপুষ্ট। সেই অধিক স্নেহের ঋণ তমলুক মহকুমার মানুষ পরাধীন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় আত্মবলিদানের মধ্য দিয়ে পরিশোধ করেন।

সূত্র নির্দেশ

১. মানব সমাজের ইতিহাস আজ পর্যন্ত যা জানা গিয়েছে তা তাদের অজানা ইতিহাসের এক অতি ভগ্নাংশ মাত্র, তাই প্রাগ্-ঐতিহাসিক ও আদি-ঐতিহাসিক এই কথাগুলি প্রয়োগের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অধ্যাপক এম.সি. বারকিট। তাহলেও আমরা আলোচনার সুবিধার জন্য বর্তমান নিবন্ধে উল্লেখ করলাম।

২. মাইতি, পি. কে., "প্রোটো-ইস্টরিক সিভিলিজেশন অভ তাম্রলিপ্ত" অক্ষয়নীভী (সম্পাদনায়) ভট্টাচার্য, গৌরীশ্বর, দিল্লী, ১৯৯১, পৃ. ৩৭-৪০ (চিত্র সহ)

৩. দাশগুপ্ত, পি. সি., দি আর্কিয়লজিক্যাল ট্রেজারস্ অভ তাম্রলিপ্ত, তাম্রলিপ্ত সংগ্রহশালা, তমলুক, ১৯৭৫, পৃ. ৩

৪. মণ্ডল, প্রশান্ত কুমার, "তাম্রলিপ্তের প্রত্নসম্ভার", সূর্যদেশ, ষষ্ঠ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, বাং-সন ১৩৮২, পৃ. ২২

৫. তদেব; চিত্রের জন্য দ্রষ্টব্য অক্ষয়নীভী সম্পাদনায় ভট্টাচার্য, গৌরীশ্বর, প্রবন্ধ মাইতি, পি. কে. পৃ. ৩৭-৪০

৬. তদেব; চিত্রের জন্য দ্রষ্টব্য অক্ষয়নীভী, সম্পাদনায়, ভট্টাচার্য, পৃ. ৩৭-৪০

৭. রামচন্দ্রন, টি. এন., 'তাম্রলিপ্তি' (তমলুক), আর্টিবাস এশিয়েই, ভলিউম—১৪, ১৯৫১, এ্যাসকোনা, সুইজারল্যাণ্ড, পৃ. ২৩৪-২৩৫ (চিত্র সহ)

৮. দাশগুপ্ত, পরেশচন্দ্র, "প্রত্নতত্ত্বের আলোকে তাম্রলিপ্ত," স্মারক গ্রন্থ, নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন, ৪৬তম অধিবেশন, তমলুক, মেদিনীপুর, জানুয়ারী, ১৯৭৪, পৃ. ৭

৯. দাশগুপ্ত, পরেশচন্দ্র, "রূপনারায়ণের বাঁক," রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকা, ৫ই নভেম্বর, ১৯৭৭; তুলনীয় দাসগুপ্ত, পরেশচন্দ্র, প্রাগৈতিহাসিক বাঙলা পৃ. ৮২-৮৪

১০ মণ্ডল, প্রশান্ত কুমার, "তমলুকের পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন" তাম্রলিপ্ত, শারদ সংখ্যা, বাং সন ১৩৯৬ পৃ. ১৭

১১. মণ্ডল, প্রশান্ত কুমার, "নিম্নগাঙ্গেয় উপত্যকায় আবিষ্কৃত কিছু প্রত্নসামগ্রী: একটি প্রতিবেদন" তাম্রলিপ্ত, শারদ সংখ্যা, ১৪০০, পৃ. ১২: হাড় ও হরিণ শিঙের অস্ত্রশস্ত্র এবং এদের উপর শিল্প নিদর্শনগুলি অবিভক্ত তমলুক মহকুমার অন্তর্গত নাটশাল (যেখানে রূপনারায়ণ নদ ভাগীরথীর সঙ্গে মিলেছে সেই গেঁয়োখালির প্রায় দেড় কিলোমিটার উত্তরে রূপনারায়ণের ডান তীরে এই গ্রামটি অবস্থিত) থেকে পাওয়া গিয়েছে। এখানকার প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার সম্পর্কে প্রশান্তকুমার মণ্ডলের "আর্ট অ্যাণ্ড আর্টিফ্যাক্টস্ অভ বোন অ্যাণ্ড অ্যান্টলার ইন দি লোয়ার গ্যাঞ্জেস ভ্যালি" এবং ডঃ কমলকুমার কুণ্ডুর প্রবন্ধ "অ্যান অ্যামেজিং আর্কিযলজিক্যাল ডিসকভারি ইন নাটশাল, ইন ওয়েস্টবেঙ্গল" ইন মিসেলেনি, দি সানডে স্টেটসম্যান রিভিউ, মে ১, ১৯৯৪ প. ৪-১০ চিত্রসহ দ্রষ্টব্য।

১২. তদেব

১৩. তদেব, মণ্ডল, আর্ট অ্যাণ্ড আর্টিফ্যাক্টস ...প. ১৮

১৪. তদেব, প. ১৩; মণ্ডল, আর্ট অ্যাণ্ড আর্টিফ্যাক্টস. ..পৃ. ১৬

১৫. বন্দোপাধ্যায, গৌরীশঙ্কর, "তাম্রলিপ্তের টেরাকোটা শিল্পে লোকায়ত ধর্মচিন্তার প্রভাব", ইতিহাস অনুসন্ধান—৭ (পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের অষ্টম বার্ষিক সম্মেলনে পঠিত প্রবন্ধাবলীর সংকলন)। সম্পাদনায় মাহমুদ, আবদুল ওয়াহাব, কলিকাতা, ১৯৯৩, পৃ. ১০৪

১৬. মণ্ডল, পি. কে., ইন্টারপ্রিটেশন অভ টেরাকোটাজ অভ তাম্রলিপ্ত, তাম্রলিপ্ত সংগ্রহশালা ও গবেষণা কেন্দ্র, ১৯৮৭; মাইতি, প্রদ্যোত কুমার "টেরাকোটা শিল্পে তাম্রলিপ্ত জনপদের ধর্মজীবন", প্রসঙ্গঃ তাম্রলিপ্ত (তাম্রলিপ্ত সংগ্রহশালা কর্তৃক প্রকাশিত প্রবন্ধ সংকলন)। তমলুক, মেদিনীপুর, ১৯৯৩, পৃ. ৬৩-৭৫

১৭. ভৌমিক, মনোরঞ্জন, হিস্টরি, কালচার অ্যান্ড অ্যান্টিকুয়িটিজ অভ তাম্রলিপ্ত, প্রকাশিতব্য গবেষণা পুস্তক, পৃ. ৪৯

১৮. ইতিহাস অনুসন্ধান— ৭, পৃ. ১০৫

১৯. দাশগুপ্ত, পরেশচন্দ্র, "বৃহত্তর তাম্রলিপ্তে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান", মেদিনী সংস্কৃতি, প্রথম বর্ষ, ১৩৬৩, পৃ. ৮

২০. তদেব

২১. তদেব, পৃ. ৯

২২. তদেব, পৃ. ৫

২৩. তদেব, পৃ. ১২-১৩

২৪. দাশগুপ্ত, পি.সি., "দ্য আর্লি টেবাকোটাজ ফ্রম তাম্রলিপ্ত', ইণ্ডিয়ান ফোকলোব, ভলিউম—১, নম্বব—১, জানুয়াবী মার্চ, ১৯৫৮ পৃ. ২৭

২৫. বিশ্বাস, এস. এস., টেবাকোটা আর্ট অব বেঙ্গল, দিল্লী, ১৯৮১, পৃ. ১৭১

২৬. মেদিনী সংস্কৃতি, ১৩৬৩, পৃ. ৭

২৭. তদেব, পৃ. ৬

২৮. ইণ্ডিয়ান ফোক লোব, ভলিউম - ১ নম্বব —১, ১৯৫৮, পৃ. ৩১ ৩২

২৯. মেদিনী সংস্কৃতি, ১৩৬৩, পৃ. ৭

৩০. বায, নীহাববঞ্জন, বাঙালীব ইতিহাস (আদিপর্ব), দ্বীঃ সং. ১৯৮০, পৃ. ১০৫৫ ও চিত্র—১৮

৩১. মেদিনী সংস্কৃতি, ১৩৬৩, পৃ. ৭

৩২. তদেব, পৃ. ১২

৩৩. মেদিনীপুব জেলাব ঘাটাল মহকুমাব অন্তর্গত ঘাটাল শহব থেকে ৪ কিলোমিটাব দূবে শিলাবতী (শিলাই) নদীব পশ্চিম তীবে পান্না গ্রামটি অবস্থিত। তমলুক থেকে এব সোজা দূবত্ব আনুমানিক ৫০ কিলোমিটাব।

৩৪. মেদিনী সংস্কৃতি, ১৩৬৩, পৃ. ১৮,

৩৫. তদেব, পৃ. ৬-৭

৩৬. তদেব, পৃ. ২১;

৩৭. তদেব, পৃ. ২০

৩৮. তদেব;

৩৯. তদেব

সংকেত সূত্র

১. চিত্র সংখ্যাব সঙ্গে 'টি' যুক্ত থাকলে বুঝতে হবে প্রত্নবস্তুটি আশুতোষ মিউজিয়ামে বক্ষিত।

২. আশুতোষ মিউজিয়াম সংক্ষেপে— আ. মি.

৩. তাম্রলিপ্ত মিউজিযাম সংক্ষেপে— তা. মি.

বঙ্গজন ও সংস্কৃতির উৎসে নিষাদ জনগোষ্ঠী

অন্নপূর্ণা চট্টোপাধ্যায়

প্রাচীন বঙ্গের বহুবিধ সুপ্রাচীন আদিম অধিবাসী ও উপজাতিগোষ্ঠীভুক্ত নরগোষ্ঠীর মধ্যে সমগোষ্ঠীভুক্ত নিষাদ, শবর ও পুলিন্দের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বঙ্গজন ও সংস্কৃতির রূপায়ণে রয়েছে বহুজনগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক ও সংস্কৃতির সংমিশ্রণ। তন্মধ্যে এই নিবন্ধের আলোচ্য বিষয় কেবলমাত্র নিষাদগোষ্ঠী।

এ প্রসঙ্গে প্রথমেই 'নিষাদ' কারা কোন ভাষাভাষী, কোথায় তাদের আদিম নিবাস ও জীবনযাত্রা প্রণালীই বা কিরকম ছিল তার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি প্রয়োজন। এই পরিচিতির মধ্যেই বঙ্গজনে ও সংস্কৃতিতে নিষাদগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক মিশ্রণের সন্ধান পাওয়া যাবে।

'নিষাদ' শব্দটি 'নিষিদ' এই মূল শব্দ থেকে উদ্ভূত। 'নিষিদ' শব্দের অর্থ বসা বা ইংরেজীতে sit down আবার এই শব্দের অর্থ হয় বসতি settle down। 'নি' মানে নীচে ও সদ্ মানে বসতি[১]। 'নিষাদ' এই শব্দটির আর একটি অর্থও করা যায়। তা হল পুঞ্জীভূত পাপ অর্থাৎ (repository sins or vices)[২] ওয়েবার (Weber) বলেন নিষাদগোষ্ঠীগণ aborigines অর্থাৎ তারা আদিম ও প্রাচীন অধিবাসী। প্রাথমিক পর্যায়ে তারাই বসতি স্থাপন করেছিল, তারা যাযাবর ছিল না[৩]। 'নিষাদ' কথাটি সমগোত্রীয় অন্যগোষ্ঠীর সঙ্গে প্রায়ই ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। ভারতের লিখিত উপাদানে নিষাদগণের বহুল উল্লেখ পাওয়া যায়। বেদে নিষাদ ও তার দলপতিদের নাম পাওয়া যায়। যজুর্বেদে রুদ্রাধ্যায়তে সর্বপ্রথম ব্রাত্য বা যাযাবরদের সঙ্গে নিষাদদের নামোল্লেখ দেখা যায়[৪]। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে তারা 'চোর', 'ডাকাত' বলে বর্ণিত[৫]। তৈত্তিরীয় সংহিতা, সাংখ্যায়ণ ব্রাহ্মণ, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, যাজ্ঞবল্ক্য, নারদ, মনুসংহিতা, অর্থশাস্ত্র ইত্যাদিতে নিষাদ গোষ্ঠীর নাম পাওয়া যায়[৬]। যাস্ক নিরুক্ততে নিষাদগণ আর্যভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর চতুর্বর্ণের বা চারিটি বর্ণের অথবা জাতির (caste) বাহিরে অর্থাৎ পঞ্চম জাতি (caste) বলে বর্ণিত।[৭]

নিষাদগণকে সমগোত্রীয় অন্যগোষ্ঠীভুক্ত জনের সঙ্গেও উল্লেখ করতে দেখা যায়। পদ্মপুরাণে নিষাদ, কিরাত, ভীল্ল, নাহলক, পুলিন্দ ও অন্যান্য ম্লেচ্ছগণ নানারকম পাপকর্মে (vices) অনুরক্ত ও অভ্যস্ত ছিল বলে বর্ণিত আছে[৮]। বৌধায়ন, যাজ্ঞবল্ক্য, মনু ও কৌটিল্য প্রমুখের লেখায় নিষাদদের 'পারশব' বলে অভিহিত করা হয়েছে।[৯]

মনু বলেছেন 'পারশব' শব্দটির উৎপত্তি 'পারয়' (Pāray) শব্দ থেকে। পারয় মানে পেরিয়ে যাওয়া (to go across) আর 'শব' মানে মৃতদেহ অর্থাৎ যে মৃত (i.e. one who is dead— though living a Pāraśava is like one dead)[১০]। বাজসনেয় সংহিতায় নিষাদগণ 'ভীল্ল' বা ভিল্ বলে পরিচিত।[১১] আবার 'শবর' ও পুলিন্দের সঙ্গেও তাদের নাম প্রায়শই পাওয়া যায়। কখনো তাদেরকে ভীল্ল-কোল্লগোষ্ঠীও বলা হয়েছে। রামায়ণে পাই নিষাদগণ আর্যসংস্কৃতির বর্হিভূত আদিম অধিবাসী[১২] (aborigines)। মহাভারতের আদিপর্বে বিদুরকে 'পারশব' বলা হযেছে। বিদুর পারশবীকে বিবাহ করেছিলেন। পাবশবী বাজা দেবকের কন্যা[১৩]। পরবর্তীকালে বাণের হর্ষচরিতে পাওযা যায হর্ষবর্দ্ধন তাঁব ভ্রমণকালে দুই পাবশব ভাইকে সঙ্গে নিযেছিলেন। তাঁদের নাম চন্দ্রসেন ও মাতৃসেন[১৪]। এতদ্ব্যতীত এ প্রসঙ্গে সপ্তম শতাব্দীর বঙ্গের একটি লেখব নাম করা যেতে পারে। লোকনাথেব ত্রিপুরা তাম্রশাসন থেকে জানা যায় লোকনাথের মাতামহ কেশব ছিলেন জাতিতে পারশব অর্থাৎ নিষাদগোষ্ঠীভুক্ত[১৫]। পূর্বভারতে বিশেষ করে বঙ্গে নিষাদগণ পারশব, ব্যাধ, চণ্ডাল বা কিরাতগণের সমগোত্রীয় রূপে অভিহিত হতো। বাংলায় ব্যাধ বলতে যারা শিকার করে ও শিকারই য. জীবিকা তাদের সকলকে বোঝায়। চণ্ডালগণও নিষাদ নামে পরিচিত।

নিষাদ, চণ্ডাল ও পারশব নামে পরিচিত জনগোষ্ঠীর জন্মবৃত্তান্তের বহুবিধ বিবরণী থেকে সমাজে তাদের স্থান ও বঙ্গজনে নৃতাত্ত্বিক অবদানের কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। ধর্মশাস্ত্রে চণ্ডালগণ শূদ্র পুরুষ রূপে বর্ণিত। ধর্মসূত্রে পারশবদের নিষাদদের থেকে পৃথক করে দেখা হয়েছে[১৬]। উভয়ের উৎপত্তি সম্বন্ধেও নানাভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ গৌতমের ব্যাখ্যা উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁর মতে ব্রাহ্মণ পুরুষ ও বৈশ্য স্ত্রীলোকের মিলনে 'নিষাদ' নামধারী পুত্রের জন্ম হয়। আর পারশবদের জন্ম ব্রাহ্মণ পুরুষ ও শূদ্র স্ত্রীলোকের সঙ্গমে[১৭]। নারদ বলেছেন, নিষাদগণ ক্ষত্রিয় পুরুষ ও শূদ্র স্ত্রীলোকের মিলনের ফলশ্রুতি[১৮]। মহাভারতেও এর সমর্থন পাওয়া যায়[১৯]। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে নিষাদগণ ব্রাহ্মণ পুরুষ ও শূদ্র স্ত্রীলোকের সঙ্গমে জন্মলাভ করেছে[২০]। মনুর (১০.৮) অভিমত হচ্ছে ব্রাহ্মণ পুরুষ ও শূদ্র স্ত্রীলোকের সঙ্গমে নিষাদের জন্ম[২১]। আবার নিষাদ পুরুষ ও শূদ্র স্ত্রীলোকের সঙ্গমে পুক্কুসের জন্ম। নিষাদ স্ত্রী ও শূদ্র স্বামীর মিলনে কুক্কুটের উৎপত্তি[২২]। এই সকল বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে নিষাদ পারশবগণ ব্রাহ্মণ ও নিম্নবর্গের স্ত্রীলোকের মিলনে উদ্ভূত। অতএব মনে হয় নিষাদ, পারশব, ভীল্ল-কোল্লগোষ্ঠীভুক্ত জনগোষ্ঠী বৃহত্তর অর্থে আর্যেতর বা অনার্যগোষ্ঠীভুক্ত জনগোষ্ঠী।

নিষাদদের উৎপত্তি সম্বন্ধে মহাকাব্যে, পুরাণে বিশেষ করে বায়ু, ব্রহ্মাণ্ড, ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণে অনেক গল্প বা কাহিনী লিপিবদ্ধ রয়েছে[২৩]। পুরাণের কাহিনী থেকে জানা যায় যে, রাজা বেণ বৈদিক যাগ-যজ্ঞের বিরোধী ছিলেন। এর পরিণতিতে দেখা যায় আর্যভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর সঙ্গে বেণের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত রাজা বেণ পরাজিত ও নিহত হলেন। কিন্তু মৃত রাজার বাম উরু থেকে একটি ছোটখাট কৃষ্ণকায় প্রশস্ত ভোঁতা নাসিকা বিশিষ্ট কুৎসিত মানুষের জন্ম হয়। তাকে আদেশ করা হল 'নিষিদ' অর্থাৎ বস এবং তার বংশধরগণ নিষাদ নামে পরিচিত[২৪]। গরুড় পুরাণেও এইরকম কাহিনীই বর্ণিত আছে[২৫]। হরিবংশ, মহাভারতেও নিষাদের নিম্নমার্গের জন্মবৃত্তান্তের অনুরূপ কাহিনীই পাওয়া যায়[২৬]। মহাভারতের গল্প অবলম্বনে জানা যায় ঋষিকুল মন্ত্র উচ্চারণে বেণেব দক্ষিণ উরু ছেদন করলেন। তাবপর সেই খণ্ডিত উরু থেকে হ্রস্ব বাহু সমন্বিত কৃষ্ণবর্ণের রক্তচক্ষু যুক্ত ও কালো কেশশোভিত মানুষের আবির্ভাব হয়। ব্রহ্মা তখন তাকে বললেন নিষিদ অর্থাৎ এখানে বস। তার থেকে তার বংশধবগণ নিষাদ নামে পবিচয় লাভ করে[২৭]। ঐ নরগোষ্ঠী সেই থেকে পর্বতে, অরণ্যে বসবাস কবতে আরম্ভ কবে। এই সব কাহিনীর ঐতিহাসিক সত্যতা ও গুরুত্ব খুবই স্বল্প, তথাপি এই সকল কাহিনী কিংবদন্তী থেকে প্রতিফলিত হয় যে নিষাদগণ নিঃসন্দেহে অব্রাহ্মণ গোষ্ঠীভুক্ত ছিল। এও লক্ষনীয় যে নিষাদ ও পারশবদের উৎপত্তি হচ্ছে যখন ব্রাহ্মণ্যবাদ ও আর্যাকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। ব্রাহ্মণগণ অনার্যদেশে অনার্যগোষ্ঠীভুক্ত নাবীকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করতে শুরু করেছিল। ব্রাহ্মণ্য সামাজিক কাঠামোতে নিষাদগণের স্থান যে সর্বনিম্নে ছিল সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নেই। বৌদ্ধগ্রন্থে তারা হীনজাতির অন্তর্ভুক্ত। সুত্তবিভাঙ্গতে নিষাদগণ চণ্ডাল, পুক্কুস ও রথকারদের সঙ্গে হীননাম জাতির অন্তর্ভুক্ত বলে অভিহিত হয়েছে।[২৮]

নিষাদগোষ্ঠী যারা চণ্ডাল ও ব্যাধের সমগোত্রীয় স্বভাবতই ধর্মশাস্ত্রে তারা শিকারী ও মৎস্যজীবিরূপে বর্ণিত।

নিষাদগোষ্ঠীর বাসস্থান সম্বন্ধে বলা যেতে পারে যে তারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে বসবাস করতো। পুরাণে বিশেষ করে ভাগবত, পদ্ম, বায়ু ও গরুড় পুরাণে ও মহাকাব্যে নিষাদগণের বসতির বিস্তৃত বিবরণী পাওয়া যায়[২৯]। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে গরুড় পুরাণ ভারতবর্ষের পশ্চিমাঞ্চলে নিষাদদের বসতির কথা উল্লেখ করেছে[৩০]। আবার হরিবংশে পশ্চিম ও পূর্ব উভয় অঞ্চলেই নিষাদ বসতি ছিল বলে বর্ণনা করেছে[৩১]। অন্যান্য অঞ্চলেও যে তাদের বসবাস ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় রামায়ণে বর্ণিত নিষাদ রাজা গুহকের কাহিনীতে[৩২]। এই কাহিনী থেকে জানা যায় নিষাদ রাজা গুহক রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাকে

দণ্ডকারণ্যে যাওয়ার পথে নদী পার করেন ও আন্তরিক সখ্য প্রদর্শন কবেন।[৩৩] রামায়ণে বর্ণিত নিষাদরাজ্য 'শৃঙ্গবেরপুর' অঞ্চলের সঙ্গে সনাক্ত করা হয়েছে। এই রাজ্যের রাজধানী ছিল গঙ্গার তীরে অবস্থিত শৃঙ্গবের নগরী[৩৪]। মহাভারতে শুষ্ক সরস্বতী নদী উপত্যকায নিষাদ রাজ্যের উল্লেখ আছে[৩৫]। মহাকাব্য ও পুরাণ ছাড়াও বরাহমিহির বৃহৎসংহিতায় মধ্যপ্রদেশের দক্ষিণ-পূর্বে নিষাদরাষ্ট্রের (নিষাদরাষ্ট্রানি) কথা বলেছেন[৩৬]। উপরন্তু 'নিষাদসঙ্খ্যাঃ' শব্দটিও পাওয়া যায়[৩৭]। রঘুবংশে (১৮.১) কালিদাস বলছেন মধ্যপ্রদেশে বেরারের উত্তর-পশ্চিমে নিষাদ রাজ্য ছিল[৩৮]। এই সময লিখিত উপাদান ছাড়াও খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয শতকে মহাক্ষত্রপ রুদ্রদামনের জুনাগড পর্বতগাত্রে খোদিত লেখ থেকে জানা যায রুদ্রদামন পশ্চিম ও পূর্ব মালব, দ্বারকা ও নিষাদরাজ্য অধিকার করেছিলেন[৩৯]। লেখতে উল্লিখিত নিষাদ রাজ্য সম্ভবত সিন্ধু ও পারিযাত্র অর্থাৎ পশ্চিম বিন্ধ্যের মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত ছিল[৪০]। অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সরকার পশ্চিম বিন্ধ্য ও আরাবল্লী পর্বতেব মধ্যবর্তী অঞ্চলকে লেখতে উল্লিখিত নিষাদ রাজ্য বলে মনে করেন[৪১]। অতএব এই সকল উপাদান থেকে এই প্রতিভাত হচ্ছে যে ভারতবর্ষের পশ্চিমাঞ্চলে বিশেষ করে বিন্ধ্য পর্বতেব পশ্চিম দিকে, উত্তর অর্থাৎ আর্যাবর্তে ও মধ্যপ্রদেশে নিষাদগণের বসবাস ছিল। কিন্তু পূর্বাঞ্চলে বিশেষ করে বঙ্গদেশে নিষাদগণের বসতি সম্পর্কে আমাদের উপাদান খুবই সীমিত। যাই হোক নিষাদগণ আর্যবসতির বাইরে বসবাস করেছে সেইদিক থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, বঙ্গদেশে বিভিন্ন স্থানে তারা বসবাস করতো। এ প্রসঙ্গে সপ্তম শতাব্দীর ত্রিপুরা তাম্রশাসনের উল্লেখ করা যেতে পারে। এই তাম্রশাসন থেকে জানা যায় রাজার মাতামহ কেশব ছিলেন জাতিতে পারশব অর্থাৎ নিষাদ[৪২]। বঙ্গের প্রাচীন অধিবাসীদের মধ্যে ব্যাধ, চণ্ডাল, পারশব ও নিষাদগোষ্ঠীর নামোল্লেখ করা যেতে পারে।

ধর্মশাস্ত্রে চণ্ডালদের শিকারী ও মৎস্যজীবিরূপে বর্ণনা করা হয়েছে[৪৩]। বঙ্গের আদিম জনগোষ্ঠী, যারা বনে জঙ্গলে খাদ্য অনুসন্ধানে শিকার করতো, মাছ ধরতো তারা ব্যাধ, চণ্ডাল ও নিষাদগোষ্ঠীভুক্ত ছিল বলে অনুমিত হয়। তারা বন্য জন্তু বধ করতো। পালি গ্রন্থে নিষাদগণ বন্যশিকারী ও মৎস্যঘাতকরূপে[৪৪], জাতকে শিকারীরূপে বর্ণিত[৪৫]। জাতকে বিশেষ করে ময়ূর ও হরিণ শিকারের বর্ণনা পাওয়া যায়। ছন্দত জাতকে শিকারীরূপে নিষাদদের একটি চিত্র খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ছিল[৪৬]। এ প্রসঙ্গে রামায়ণের বালকাণ্ডের প্রথম শ্লোকটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়—

'মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ। যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্'[৪৭]।

রামায়ণ থেকে এই প্রতিভাত হয়, যে তারা তীর ধনুক ব্যবহারের কৌশলে অসাধারণত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিল[৪৮]। শুধু তাই নয় তারা যোদ্ধারূপেও পারদর্শিতা ও যশ লাভ করেছিল। মহাভারত থেকে জানা যায় যে, তারা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে পাণ্ডবদের পক্ষে যুদ্ধ করে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। কর্ণের কাছে অবশ্য তারা পরাজিত হয়েছিল[৪৯]। মহাভারতের একলব্যের কাহিনীও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। গুরু দ্রোণাচার্যের মূর্তির কাছে ধনুর্বাণ শিক্ষা লাভ করে একলব্য অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন। এমন কি অর্জুনকেও তার কাছে হার মানতে হত। ব্রাহ্মণ গুরু ক্ষাত্রিয়কে অস্ত্রশিক্ষা দান করবে। সমাজের নিম্নস্তরের অনার্য ব্যাধ বা নিষাদকে শিষ্য বলে গ্রহণ করেন নি। এমন কি গুরুদক্ষিণা স্বরূপ একলব্যের ডান হস্তের বৃদ্ধ আঙ্গুলটি নিতেও কুণ্ঠাবোধ করলেন না। এই কাহিনীও প্রমাণ করে ধনুর্বাণ বিদ্যায় নিষাদগণ অপরাজেয় ছিল। তাদের সমকক্ষ কেউ ছিল না। মেগাস্থিনিস ভারতের জনগণকে সাতটি জাতিতে ভাগ করেছিলেন। তার মধ্যে ষষ্ঠ জাতির অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন পশুচারণকারী ও শিকারী জনগণকে। এদেরই সম্ভবত সমীকরণ করা যেতে পারে নিষাদগোষ্ঠীর সঙ্গে।

নিষাদগোষ্ঠীর মাছ ধরা ও মাছ সরবরাহ করার উল্লেখ বহু গ্রন্থে পাওয়া যায়। এ প্রেক্ষিতে কথাসরিৎসাগর ও মনুসংহিতায় নিষাদগোষ্ঠীর মাছ ধরার বর্ণনা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য[৫০]। মনুসংহিতায় পাওয়া যায় 'মৎস্যঘাতোনিষাদনামং'। কথাসরিৎসাগর নিষাদদের জেলে বলে উল্লেখ করেছে। এতদ্ব্যতীত তাদের শিল্পদক্ষতা ও নিপুণতার পরিচয়ও বিভিন্ন গ্রন্থে পাওয়া যায়। রামায়ণে পাওয়া যায় নিষাদ দলপতি গুহক রাম লক্ষ্মণ ও সীতাকে নদী পার করার জন্য উপযুক্ত বিশেষ নৌকা তৈরী করতে বলেছিলেন। এও জানা যায় এরকম পাঁচশত নৌকা ছিল ও প্রতি নৌকায় একশত দাঁড়বাহী ছিল[৫১]। জলের সঙ্গে তাদের অন্তরঙ্গতা ছিল। তারা নৌকা তৈরীতেও দক্ষ ছিল। জনগণকে নদী পারাপারের কাজ করাও তাদের আর এক জীবিকা ছিল। কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্রে 'নিষাদস্থপতির' উল্লেখ আছে।[৫২] মনুসংহিতায় নিষাদগণের নৌকা তৈরীর শিল্পকর্মে যুক্ত থাকার উল্লেখ আছে। যথা— 'নিষাদ মার্গোবং সূতে দাসং নৌকর্মজীবিনং'[৫৩]। হরিবংশে নিষাদগণের নদীবক্ষ থেকে মূল্যবান প্রস্তর ও রত্নরাজি আহরণের চিত্র পাওয়া যায়[৫৪]। কাত্যায়ন থেকে আরো অবগত হওয়া যায় যে, নিষাদগণ জল খাওয়ার জন্য মাটির পাত্র ব্যবহার করতো। এক্ষেত্রে উক্ত গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি করা যেতে পারে—

'গ্রাম্যভোজনং নিষাদনং মৃন্ময়াপানং'[৫৫]।

এর থেকে স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, নিষাদগণ মাটির পাত্র তৈরী করতে পারতো। উপরন্তু আরো জানা যায় তারা সুখাদ্য খেত না, অখাদ্য-কুখাদ্য ভোজন করতো। এককথায় বলা যেতে পারে যে তাদের খাদ্যতালিকা খুব নিম্নমানের ছিল। তারা নানারকম বাদ্যযন্ত্রে পারদর্শী ছিল। উসন উল্লেখ করেছেন, তারা

বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে, গান গেয়ে অর্থ উপার্জন করতো[৬]। এর থেকে তাদের সঙ্গীতের ও বাদ্যযন্ত্রের প্রতি অনুরাগ ও প্রবণতা পরিস্ফুট হয়। তারা রথচালকও ছিল, অশ্বকুলের স্বভাবচরিত্র সম্বন্ধে তারা বিশেষ অভিজ্ঞ ছিল। মহাভারতে নিষাদ রাজা নলের কাহিনী স্মরণ করা যেতে পারে। নল রথচালক ছিলেন[৭]। এইভাবে নিষাদগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা প্রণালীর পর্যালোচনা থেকে তাদের সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়।

অনার্যগোষ্ঠীভুক্ত নিষাদগণ আর্যবসতি ও সংস্কৃতির বাইরে বসবাস করতো। আর্যবসতির বাইরে একসঙ্গে একটি গ্রামেও তারা বসবাস করতো। সে গ্রাম নিষাদ গ্রাম নামে পরিচিত ছিল। লাট্যায়ন শ্রৌতসূত্রে এরকম গ্রামের উল্লেখ আছে[৮]। তারা আর্য সমাজ ব্যবস্থার চতুর্বর্ণের বহির্ভূত জাতি বা বর্ণ অর্থাৎ পঞ্চম বর্ণভুক্ত ও হীনজাতি বলে অভিহিত হতো। সেজন্য তারা আর্যবসতির নগর বা শহরে বসবাস করার অনুমতিই পেত না। বৌদ্ধগ্রন্থে শহর বা নগরে বাহিরে এরকম নিষাদ গ্রামের উল্লেখ পাওয়া যায়। মোর জাতক থেকে বেনারস বা কাশ্মীর সন্নিকটে নেসাদ গ্রামের অবস্থিতির কথা জানতে পারি[৯]।

উপরিউক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, নিষাদগোষ্ঠী আর্যভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর কাছে ঘৃণ্য, পাপকর্মে নিযুক্ত জনগোষ্ঠী ছিল। সমাজে তাদের স্থান ছিল অত্যন্ত নিম্নপর্যায়ে। কিন্তু আর্যভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর অভিযান ও অগ্রগতির ফলে অনার্যগোষ্ঠীভুক্ত নিষাদগণ ক্রমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তাদের সংস্পর্শে আসতে লাগলো। ফলে তাদের সংমিশ্রণ ও সংস্কৃতির মিলন শুরু হ'তে লাগলো। ধীরে ধীরে আর্য ভাষাভাষী জনগণ এইসব জঙ্গলের অধিবাসীদের স্পর্শ করতেও আপত্তি করলো না, তাদের তৈরী খাদ্য গ্রহণ করতেও দ্বিধাগ্রস্ত হ'ল না।

নিষাদজনগোষ্ঠীর ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠান সম্বন্ধে আমাদের তথ্য অতীব স্বল্প। যাই হোক তারা আদি প্রাচীন দেবতার উপাসক ছিল। পারশবগণ (নিষাদগণ) ভদ্রকালী দেবীর পূজার্চ্চনা করতো[৬০]। ধর্মীয় পরিমণ্ডলেও ধীরে ধীরে সমন্বয় ও সংমিশ্রণ চলতে থাকে।

বঙ্গজনে নিষাদগোষ্ঠীর অবদানের অনুসন্ধান করতে গেলে নিষাদগণের শারীরিক বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করা একান্ত প্রয়োজন। মহাভারতের শান্তিপর্বে, বিষ্ণু ও মার্কণ্ডেয় পুরাণে নিষাদগোষ্ঠী 'মহাহনু' (হনু অর্থ চিন বা চিবুক) বলে বর্ণিত হয়েছে[৬১]। অর্থাৎ তাদের চিবুক সম্মুখ ভাগে প্রসারিত ছিল (i.e. projecting)। মহাভারতের ঐ পর্বের বর্ণনায় পাওয়া যায় তারা ক্ষুদ্র আকৃতির (short stature) মানুষ, চক্ষু তাদের রক্তবর্ণ ও চুল কৃষ্ণবর্ণের অর্থাৎ কালো[৬২]। ছন্দত জাতকে নিষাদগণের শরীরের গঠন বা চেহারার বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। বলা হচ্ছে নিষাদগণের পদযুগল চওড়া, জঙ্ঘা বা উরু ছিল ফোলা ফোলা ও পুরু, কজ্বি ছিল বেশ মোটা ও চওড়া, ঘন দাড়িযুক্ত, চক্ষু ছিল রক্তবর্ণের, তাম্রবর্ণের দাঁত সমন্বিত

ও চেহারা ছিল সৌষ্ঠববিহীন[৬৩]। পুরাণে নিষাদদের শরীরের নিখুঁত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। বায়ু পুরাণে নিষাদগণকে কালো ও এতো বেঁটে যে বামনাকৃতির বলে অভিহিত করা হয়েছে[৬৪]। ঐ পুরাণে ও মহাভারতে নিষাদগণকে লম্বকর্ণযুক্ত (লম্বা কান) বলা হয়েছে[৬৫]। কানের বর্ণনায় বলা হয়েছে তাদের কান গাধা বা ছাগলের মতো লম্বা। গরুড় পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে তারা ক্ষুদ্র, ছোটখাট বামনাকৃতির ও কৃষ্ণবর্ণের মানুষ[৬৬]। ভাগবত পুরাণে বর্ণিত হয়েছে নিষাদগণ কাকের মত কালো, ক্ষুদ্রাকৃতির, ছোট অর্থাৎ ক্ষুদ্রাকৃতি বাহুযুক্ত, ভোঁতা নাসিকা সমম্বিত (snubbed-ni-mnanasagra i.e. depressed nose), উচ্চ চোয়াল, রক্তবর্ণের চক্ষু ও তাম্রবর্ণের কেশযুক্ত (tamramurdhaja) মানবগোষ্ঠী[৬৭]। মহাভারতের শান্তিপর্বে পাওয়া যায় নিষাদগণের চুল কালো বা কৃষ্ণবর্ণের[৬৮]। নিষাদদের গায়ের রং সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণ বলছে--- 'দগ্ধস্তন প্রতিকসো' অর্থাৎ গায়ের রং কালো[৬৯]। তারা বামনাকৃতির ও ভোঁতা ভোঁতা চেহারার মানবগোষ্ঠী[৭০]। যাই হোক দেখা যাচ্ছে মহাকাব্য ও পুরাণে নিষাদগণের শারীরিক বৈশিষ্ট্যের যে বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে তাতে কিছু বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যেমন উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় মহাভারতে নিষাদদের চুলের রং বলা হয়েছে কালো, •আবার ভাগবত পুরাণে আছে তাম্র বর্ণ। যাই হোক উপরিউক্ত বর্ণনা থেকে যানা যায নিষাদগণ ক্ষুদ্রাকৃতির, কৃষ্ণবর্ণের, কৃষ্ণ বা তাম্রবর্ণেব কেশযুক্ত, চওড়া ও ভোঁতা নাসিকা, লম্বা কান ও প্রসারিত চিবুক সমম্বিত মানবগোষ্ঠী। গ্রীক লেখক টেসিয়াস (Ctesias) ভারতের এক নরগোষ্ঠীর কথা বলেছেন যাদের আকৃতি ছিল ছোটখাট, গায়ের রং কালো ও ভোঁতা নাক।[৭১] সংস্কৃত সাহিত্যে এইরকম নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যযুক্ত নরগোষ্ঠীকে দস্যু বা নিষাদের সঙ্গে শনাক্ত করা হয়েছে[৭২]।

এখন দেখা যাচ্ছে নিযাদগণের শারীরিক বৈশিষ্ট্য অস্ট্রালয়েডগোষ্ঠীভুক্ত মানবগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মিলে যায়। অস্ট্রালয়েডগোষ্ঠীভুক্ত মানুষেরা ছিল ছোটখাট আকৃতির, কৃষ্ণবর্ণের গায়ের রং অর্থাৎ কালো, লম্বা করোটিযুক্ত মস্তক (dolichocephalic head), চ্যাপ্টা নাক (platyrrhine nose), কোঁকড়ানো ও ঢেউ খেলানো চুল সমম্বিত নরগোষ্ঠী। কোন্ কোন পণ্ডিতের মধ্যে শূদ্র ও নিষাদগণই বৈদিক গ্রন্থে বর্ণিত দাস[৭৩]। দাসগণ ভূমধ্যসাগরীয় দ্রাবিড়ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী। নৃতত্ত্ববিদ রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় মধ্যপ্রদেশ ও বিন্ধ্য পর্বত অঞ্চলের ভিল ও গন্দদের শারীরিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে নিষাদদের সাদৃশ্য লক্ষ্য করে তাদের নিষাদগোষ্ঠীভুক্ত বলছেন[৭৪]। হাবার্ট রিজলী তাঁর 'পিপল্ অব ইণ্ডিয়া' গ্রন্থে ভারতের আদিম অধিবাসীদের ৭টি জাতিতে ভাগ করেছিলেন। তারমধ্যে কৃষ্ণবর্ণের ছোট খাট প্রশস্ত বা ভোঁতা নাসিকাযুক্ত মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের আদিম অধিবাসীদের দ্রাবিড়গোষ্ঠীভুক্ত বলে অভিহিত করেছেন[৭৫]। অন্যেরা আবার প্রাক্-দ্রাবিড়গোষ্ঠীও বলেছেন। পণ্ডিতপ্রবর চন্দ মহাশয়

উপরিউক্ত শারীরিক বৈশিষ্ট্যযুক্ত নরগোষ্ঠীকে নিষাদ জাতি বলে আভিহিত করেছেন[১১]। চন্দের নিষাদ জাতিই অস্ট্রালয়েড জাতি।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখনীয় যে অস্ট্রালয়েড জনগোষ্ঠী অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষায় কথা বলতো বলে অনুমান করা হয়। বঙ্গের সংলগ্ন ছোটনাগপুর অঞ্চলে মুণ্ডা, সাঁওতাল, হো, বীরহোর, খাড়িয়া, ভূমিজ প্রভৃতি জনগোষ্ঠী বসবাস করতো। এরা যথাক্রমে মুণ্ডা, সাঁওতাল ইত্যাদি নিজ নিজ ভাষায় কথা বলতো। এই সব ভাষা মূল অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষার শাখা বিশেষ অর্থাৎ অস্ট্রো এশিয়াটিক ভাষা থেকে উদ্ভূত। পণ্ডিতপ্রবর রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় অনুমান করেন নিষাদগণ মুণ্ডা ভাষায় কথা বলতো। পরে ইন্দো-আর্য ও দ্রাবিড় ভাষাভাষী নরগোষ্ঠীর সংস্পর্শে এসে তাদের ভাষার প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে ঐ সকল ভাষায় কথা বলতো। ভাষাতত্ত্ববিদ আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় অস্ট্রিক ভাষার নামকরণ করেছেন মুণ্ডা ভাষা বলে। নিষাদগণ মুণ্ডাভাষাভাষী মুণ্ডা জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। মুণ্ডাভাষাভাষী জনগোষ্ঠী অস্ট্রালয়েড জাতিভুক্ত। অতএব বলা যেতে পারে নিষাদগণ অস্ট্রিক ভাষাভাষী অস্ট্রালয়েড জনগোষ্ঠীভুক্ত আদিম মানবগোষ্ঠী। বাংলা ভাষার উৎসে অস্ট্রিক ভাষা বা মুণ্ডা ভাষার প্রতিবিম্ব দেখা যায়। এমনকি আজও অস্ট্রো-এশিয়াটিক বা মুণ্ডা ভাষার বহু শব্দ আধুনিক বাংলা ভাষায় পাওয়া যায়।

নিষাদগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা প্রণালীর পর্যালোচনায় বঙ্গসংস্কৃতিতে তাদের প্রতিচ্ছবি খুঁজে পাওয়া যায়। বনে জঙ্গলে যে সকল আদিবাসী আজও বিচরণ করে তারা শিকারে পারদর্শী। তাদের অস্ত্র ধনুক ও বাণ। ধনুর্বাণে তারা অসাধারণ দক্ষ। নিষাদদের জলের সংস্পর্শে থাকা, মাছ ও মাছধরা বঙ্গের প্রাচীন অধিবাসীদের জীবনচর্চ্চার অন্যতম অঙ্গ। আজও মাছ বাঙালীদের অত্যন্ত প্রিয় খাদ্য। নদীবহুল বঙ্গদেশে চলাচলের একমাত্র যান ডিঙ্গি ও নৌকা। এই নৌকা তৈরী করতে নিষাদগণ নিপুণতা অর্জন করেছিল। নদীবক্ষ থেকে তারা মণি ও মূল্যবান পাথর ও সোনা আহরণ করতো। আজও আদিবাসীদের মধ্যে নদীব জল বালি থেকে সোনা ইত্যাদি সংগ্রহ করতে দেখা যায়। নিষাদগোষ্ঠীর বাদ্যযন্ত্রে ও সঙ্গীতে নিপুণতাও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

বঙ্গসংস্কৃতির ও বঙ্গজনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়েছিল অস্ট্রিক ভাষাভাষী অস্ট্রালয়েড জাতিভুক্ত নরগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক অবদানে। নিষাদগোষ্ঠীও অস্ট্রিক ভাষাভাষী অস্ট্রালয়েড জাতিভুক্ত ছিল। সুতরাং বঙ্গজনের ও সংস্কৃতির উৎসে বহুবিধ ভাষাভাষী ও নরগোষ্ঠী যথা মোঙ্গলয়েড, দ্রাবিড়ভাষাভাষী ও ইন্দো-আর্যভাষীর মধ্যে অস্ট্রিকভাষী নিষাদগোষ্ঠী অন্যতম। আর্যভাষাভাষী মানবগোষ্ঠীর ক্রমবিস্তারে নিষাদগোষ্ঠী ক্রমে এঁদের সংস্পর্শে আসায় নৃতাত্ত্বিক সংমিশ্রণ ঘটে। ধীরে ধীরে শুরু হয় সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় আদান প্রদান। এইভাবে দেখা যায় বহুবিধ সংস্কৃতির সমন্বয় ও মিলনের ফলশ্রুতিই বঙ্গসংস্কৃতি।

সূত্র নির্দেশ

১। ম্যাকডোনেল, এ.এ. এ্যাণ্ড কীথ, এ.বি., বেদিক ইনডেক্স অব নেমস্ এ্যাণ্ড সাবজেক্টস, ভল্যুম ওয়ান, পৃষ্ঠা ৪৫৪, পুনর্মুদ্রিত, দিল্লী, ১৯৫৮।
২। ঋগবেদ, ১০, ৫৩, ৪; যাস্ক নিরুক্ত, ৩, ৪।
৩। ম্যাকডোনেল.... পূর্বোক্ত, সূত্র ১এর ন্যায়।
৪। তৈত্তিরীয় সংহিতা, ৪, ৫, ৪,২; চন্দ রমাপ্রসাদ, দি ইন্দো এ্যারিয়ান রেসেস, পৃঃ ৪, পুনর্মুদ্রিত, কলিকাতা, ১৯৫৯।
৫। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৩৭, ৭।
৬। সাংখ্যায়ন ব্রাহ্মণ, ২১,১২, বায়ুপুরাণ, ২, ১, ৬২, পদ্মপুরাণ, ২,২৭, ৪২ ৪৩; গরুড় পুরাণ ৬, ৫, ৪৫, ১৫, অর্থশাস্ত্র ৩, ৭; মনুসংহিতা, ১০, ৮, ১২, ১৮; ৯, ১৭৮ রামায়ণ, আদিকাণ্ড, অযোধ্যাকাণ্ড; মহাভারত, বনপর্ব, শান্তিপর্ব, দ্রোণপর্ব, কর্ণপর্ব ইত্যাদি।
৭। যাস্ক নিরুক্ত, ৩, ৪।
৮। পদ্মপুরাণ, ২, ২৭—৪৩; চন্দ, সাহিত্য, (১৩২০ বঙ্গাব্দ) পৃঃ ১৪৩।
৯। পূর্বোক্ত সূত্র ৬ এর ন্যায়।
১০। শ্যামাকান্ত বিদ্যাভূষণ, মনুসংহিতা (বাংলা) ৯, ১৭৮, পৃঃ ২৭০, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা।
১১। বাজসনেয় সংহিতা, ১৭.২৭; ৩০, ৪; ম্যাকডোনেল এ্যাণ্ড কীথ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৫৩—৪৫৪।
১২। চৌধুরী শশীভূষণ, এথনিক সেটেলমেন্ট ইন এ্যানসিয়েন্ট ইণ্ডিয়া, পৃঃ ৪৫, কলিকাতা, ১৯৫৫।
১৩। পঞ্চানন তর্করত্ন, মহাভারত, ভল্যুম ওয়ান, আদিপর্ব, চ্যাপটার ১০৯, ২৫, পৃঃ ১১৭, (কলিকাতা ১৮৩০ শকাব্দ) চ্যাপটার ১১৪, ১২, পৃঃ ১২০।
১৪। কাওয়েল, ঈ, বি. এ্যাণ্ড টমাস. এফ. ডবলু. (অনুবাদক), হর্ষচরিত অব বাণভট্ট, দিল্লী, ১৯৬১।
১৫। এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা, ভল্যুম ১৫, পৃঃ ৩০৭।
১৬। গৌতমধর্মশাস্ত্র, ৪, ১৪।
১৭। ঐ।
১৮। নারদ, স্ত্রীপুংস, ৫, ১০৮।
১৯। পঞ্চানন তর্করত্ন, পূর্বোক্ত, ভল্যুম দ্বিতীয়, অনুশাসনপর্ব, চ্যাপ্টার ৪৮, ১২, পৃঃ ১৯১৫।
২০। শামশাস্ত্রী, আর (অনুবাদক ইংরাজী) অর্থশাস্ত্র, বুক তৃতীয়, চ্যাপ্টার ৭, পৃঃ ১৮৯—৯১ মহীশূর, ১৯৬৭।
২১। শ্যামাকান্ত পূর্বোক্ত, ১০, ৮, পৃঃ ২৯২।
২২। শামশাস্ত্রী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২০।
২৩। বায়ুপুরাণ, ২, ১, ৬২, ১৩৭-১৪৮; ল, বি, সি, এ্যানসিয়েন্ট ইণ্ডিয়ান ট্রাইবস্, (লণ্ডন, ১৯৩৪) ভল্যুম দ্বিতীয়, পৃঃ ৬৩; চন্দ, ইন্দো এ্যারিয়ান রেসেস, পৃঃ ৪।
২৪। ঐ।

২৫। পঞ্চানন তর্কবত্ন, পূর্বোক্ত, ভল্যুম দ্বিতীয়, শান্তিপর্ব, চ্যাপ্টাব, ৫৯, ৯৪–৯৭, পৃঃ ১৪৩৪।

২৬। ঐ; স্যালেটোব; দি ওয়াইল্ড ট্রাইবস্ ইন্ ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি, পৃঃ ১০১, লাহোব, ১৯৩৫।

২৭। মহাভাবত, পূর্বোক্ত, (সূত্র ২৫)।

২৮। ফিক আব, (অনুবাদক মৈত্র), দি সোস্যাল অবগ্যানিজেসন ইন নর্থ-ইষ্ট ইণ্ডিয়া ইন বুদ্ধজ টাইম, পৃঃ ৩২৩।

২৯। পদ্মপুবাণ, ২, ২৭, ৪২–৪৩; বায়ুপুবাণ, ৬২, ১২৩–১২৪; গরুড়পুবাণ, ৬, ৫, ৪৫, ১৫।

৩০। স্যালেটোব, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০০–১০৩।

৩১। হবিবংশ, ১৫, ৫, ৩৯।

৩২। বামাযণ, আদিকাণ্ড, ক্যান্টো ১, অযোধ্যাকাণ্ড, ক্যান্টো, ১৫১।

৩৩। বামায়ণ, ২, ৪৯, ৩৫।

৩৪। চৌধুবী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯৯।

৩৫। পঞ্চানন তর্কবত্ন, পূর্বোক্ত, ভল্যুম ওয়ান, বনপর্ব, চ্যাপ্টাব ১৩০, পৃঃ ৩৯৫; চৌধুবী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৩।

৩৬। ববাহমিহিব, বৃহৎসংহিতা, ১৫, ১০।

৩৭। ঐ।

৩৮। বঘুবংশ, ১৮, ১; ল, প্রবন্ধমালা, পৃঃ ৫৯।

৩৯। এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা, ৮, পৃঃ ৪০–৪৪, ১৩০–১৩১।

৪০। বায়চৌধুবী হেমচন্দ্র, পলিটিক্যাল হিস্ট্রি অব এ্যানসিয়ান্ট ইণ্ডিয়া, পৃঃ ৪২৪–৪২৫, কলিকাতা, ১৯৫৩; দে.এন.এল, দি জিওগ্রাফিক্যাল ডিক্সেনাবি অব এ্যানসিয়ান্ট এ্যাণ্ড মিডাইভ্যাল ইণ্ডিয়া, পৃঃ ১০৬, লণ্ডন, ১৯২৭।

৪১। সম্পাদক মজুমদাব, পুশলকাব এ্যাণ্ড আদার্স, হিস্ট্রি এ্যাণ্ড কালচাব অব ইণ্ডিয়ান পিপল, ভল্যুম দ্বিতীয়, পৃঃ ১৮৪, বোম্বাই ১৯৫৪–৬০; সবকাব দীনেশচন্দ্র, ষ্টাডিজ ইন দি বেলিজিয়াস লাইফ অব এ্যানাসিয়ান্ট এ্যাণ্ড মিডাইভ্যাল ইণ্ডিয়া, পৃঃ ১৩৪, দিল্লী, ১৯৭১।

৪২। দে.এন.এল, পূর্বোক্ত, ১০, ১২–১৬।

৪৩। শ্যামাকান্ত, পূর্বোক্ত, ১০, ১২–১৬, পৃঃ ২৯৩।

৪৪। ম্যুব, ওবিজিন্যাল সান্‌স্ক্রিট টেক্সট্ অন দি ওবিজিন অব দি পিপল অব ইণ্ডিয়া- দেয়াব বিলিজিন এ্যাণ্ড ইনষ্টিটিউসন, লণ্ডন, ১৮৬৩।

৪৫। স্যালেটোব, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০২–১০৩; ল, এ্যানসিয়ান্ট ইণ্ডিয়ান ট্রাইবস্, ভল্যুম দ্বিতীয়, পৃঃ ৬২।

৪৬। স্যালেটোব, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০২।

৪৭। রামায়ণ, বালকাণ্ড, সর্গ ২, ১৪।

৪৮। ঐ ২, ৫২, ৬।

৪৯। মহাভাবত, পূর্বোক্ত, ভল্যুম দ্বিতীয়, কর্ণপর্ব, চ্যাপ্টাব ৮, ১৯, পৃঃ ১১৭১; দ্রোণপর্ব, চ্যাপ্টার ৪, ৮–৯, পৃঃ ৯৯০।

৫০। শ্যামাকান্ত, মনুসংহিতা, ১০, ৪৮, পৃঃ ২৯৮; চৌধুবী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৪–৪৫।

৫১। বামায়ণ, ২, ৫২, ৬; ম্যান ইন ইণ্ডিয়া, ১৯২৫, ভল্যুম ৫, পৃঃ ৩৮–৩৯।

৫২। ওয়েবার, কথাসরিৎসাগব, ১, ১, ১২।

৫৩। মনুসংহিতা, ১০, ৩৪।
৫৪। হরিবংশ, ১, ৩২—৩৮।
৫৫। চন্দ, সাহিত্য, ১৩২০ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ১৩৯—১৪৬।
৫৬। উসনস্ ৩৬—৩৮।
৫৭। ল.বি.সি, প্রবন্ধমালা, পৃঃ ৫৯।
৫৮। লাট্যায়ন শ্রৌতসূত্র, ২—৪।
৫৯। ফিক, আর, (অনুবাদক মৈত্র), দি সোস্যাল অরগ্যানিজেসন ইন নর্থ-ইস্ট ইণ্ডিয়া ইন বুদ্ধজ টাইম, পৃঃ ৩২৩—৩২৪, কলিকাতা, ১৯২০।
৬০। উসনস্, ৩৬—৩৮।
৬১। সিদ্ধান্ত বাগীশ হরিদাস, মহাভারত, শান্তিপর্ব, চ্যাপ্টার CXXXIX, ১১, কলিকাতা, ১৯৪৯ বঙ্গাব্দ।
৬২। ঐ; পঞ্চানন তর্কবত্ন, মহাভারত, ভল্যুম দ্বিতীয়, শান্তিপর্ব, চ্যাপ্টার, ৫৯, ৯৬—৯৭, পৃঃ ১৪৩৪।
৬৩। স্যালেটোর, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০১—১০৩।
৬৪। ঐ, পৃঃ ১২০—১২১।
৬৫। ঐ, পৃঃ ৫৪—৬৪; পঞ্চানন তর্করত্ন, মহাভাবত, ভল্যুম ওয়ান, সভাপর্ব, চ্যাপ্টাব ৩১, ৬৬—৬৭, পৃঃ ২৪১।
৬৬। স্যালোটার, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০০—১০৩।
৬৭। তর্করত্ন, মহাভারত, ভল্যুম দ্বিতীয়, শান্তিপর্ব, পৃঃ ১৪৩৪; দত্ত, অ্যারিযানাইজেসন অব ইণ্ডিয়া, পৃঃ ৭৭।
৬৮। তর্করত্ন, মহাভারত, পূর্বোক্ত ৬৭ সূত্রের ন্যায়।
৬৯। চন্দ, পূর্বোক্ত (ইন্দো....), পৃঃ ৪।
৭০। ঐ, পৃঃ ৪—৫।
৭১। রিজলে, এইচ. এইচ, দি পিপল্ অব ইণ্ডিয়া, পৃঃ ১৭, কলিকাতা ১৯০৮, লণ্ডন, ১৯১৫।
৭২। ঐ।
৭৩। ঘুরে, সি.এস, কাস্ট এ্যাণ্ড রেসেস্ ইন ইণ্ডিয়া, পৃঃ ৪৮, বোম্বাই ১৯৫৭; মিত্র: এ.কে, দি ট্রাইব্স্ এ্যাণ্ড কাস্টস্ অব ওয়েস্ট বেঙ্গল, (সেন্সাস, ১৯৫১, ওয়েস্ট বেঙ্গল) পৃঃ ২২, পশ্চিমবঙ্গ, ১৯৫৩।
৭৪। চন্দ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫।
৭৫। রিজলে, পূর্বোক্ত (অ্যাপেনডিক্স, ৪) পৃঃ CXIII-CXIV।
৭৬। চন্দ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬।
৭৭। ঐ, পৃঃ ৬—৭।

চন্দ্রকেতুগড়ের ঘোড়া

গৌরীশংকর দে

জীব-বিজ্ঞানীর অভিমত, পৃথিবীতে ঘোড়ার আবির্ভাব উত্তর আমেরিকায় ইয়োসিন যুগে[১]। শৃগালের মতো ক্ষুদ্রাকৃতির এই প্রাণীটির নাম ছিল ইয়োহিপ্পাস[২]। বিবর্তনের মাধ্যমে তার বিস্ময়কর রূপান্তর[৩]।

বিশ্ব-শিল্পের ইতিহাসে ঘোড়ার ছবি প্রথম দেখা যায় ফরাসী দেশের লা ইজির নিকট দর্দোতে প্রাগৈতিহাসিক গুহাবাসীদের চিত্রকলায়[৪]। ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে যেখানেই ঘোড়া মানুষের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে, সেখানেই মানুষ তাকে দিয়েছে সম্মান, স্মরণীয় করে রেখেছে ভাস্কর্য, চিত্রকলা, পুরাণ ও মহাকাব্যে। ভারতের প্রাচীন সাহিত্য ও ভাস্কর্যে ঘোড়া একটি সুপরিচিত বিষয়[৫]। বাংলায় বিভিন্ন প্রত্নমূল থেকেও প্রাচীন অশ্ব মূর্তি ও অশ্বমূর্তির ফলক আবিষ্কৃত হয়েছে। এই প্রত্নমূলগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তাম্রলিপ্ত (মেদিনীপুর জেলা) এবং দক্ষিণ ২৪-পরগণা জেলার বোড়াল ও উত্তর ২৪-পরগণা জেলার চন্দ্রকেতুগড়।

চন্দ্রকেতুগড় থেকে আবিষ্কৃত অশ্বমূর্তিগুলি বিভিন্ন প্রত্ন-বস্তুর উপরে প্রকাশিত : মুদ্রা, শীলমোহর, মৃন্ময় ফলক, শিশুদের মৃন্ময় শকট ইত্যাদি। পাওয়া গেছে বহু অশ্বমূর্তি ও অশ্বারোহী মূর্তি। যেমন :

১। গোলাকৃতি মৃন্ময় ফলক—দণ্ডায়মান ঘোটক-মূর্তি।

২। চতুষ্কোণ ফলক। এক পুরুষ-মূর্তি একটি ঘোড়াকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। পুরুষ-মূর্তি ও ঘোড়া দুই-ই স্বাস্থ্যবান। ঘোড়ার লেজটি উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত। মনে হয় পুরুষ মূর্তিটি অশ্ববণিক বা অশ্বরক্ষক।

৩। গোলাকৃতি ফলক —জোর কদমে একটি ঘোড়া দৌড়াচ্ছে।

৪। ভগ্ন ফলক—যুদ্ধাশ্ব।

৫। যূথবদ্ধ যুদ্ধাশ্ব— এক ছন্দে, এক গতিতে অনেকগুলি ঘোড়ার সামনের পা উর্দ্ধে উত্থিত।

৬। ভগ্ন সুসজ্জিত অশ্বমুণ্ড।

৭। চতুষ্কোণ ফলক—উদ্ধত গ্রীবা দুরন্ত অশ্ব। জাতকে বর্ণিত কূটাশ্ব।

৮। পক্ষযুক্ত অশ্ব। অসাধারণ গতির প্রতীক, কল্পলোকের প্রাণী।

৯। ভগ্ন ফলক—অশ্বমুখ ও এক যাযাবর নারী। মনে হয় ঘোড়াটিকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ঘোড়া বাইরে থেকে সারা ভারতে নিয়ে আসত আলোচ্য ফলকে সম্ভবত তাদের চাক্ষুষ আকৃতি বিধৃত। তাছাড়া, পুরুষদের সঙ্গে-সঙ্গে নারীও যে অশ্বরক্ষকের কাজ করতো তা বর্তমান ফলক থেকে জানা যাচ্ছে। ঐতিহাসিক দলিল রূপে ফলকটি বিশেষ মূল্যবান।

১০। অপেক্ষাকৃত বড়ো আকারের চতুষ্কোণ ফলক—অশ্বারোহী মূর্তির ঢোলা পোশাক। মনে হয় বিদেশী। ঘোড়ার মুখে লাগাম পরানো।

১১। অশ্বারোহী মূর্তি। অতি বেগবান অশ্ব। মূর্তিটির উপস্থাপন অত্যন্ত বাস্তব।

১২। টেরাকোটা মেডেলিয়ন— অশ্বারোহী মূর্তি। পোশাক-পরিচ্ছদ থেকে মনে হয় আরোহী শক-কুষাণ জাতীয়। মেডেলিয়নটি হাতল যুক্ত আয়নার আকৃতির। শিল্পোৎকর্ষ সন্দেহাতীত।

১৩। ভগ্ন ফলক—ধাবমান অশ্ব—রেকাবের ব্যবহার দেখা যাচ্ছে।

১৪। চতুষ্কোণ ফলক—শিকারের দৃশ্য—অশ্বারোহী মূর্তির পাশে একটি ধাবমান কুকুর। শিকারের কাজে যে ঘোড়া ব্যবহৃত হতো তার বাস্তব চিত্র।

১৫। চতুষ্কোণ ফলক—রথারূঢ় তিনজন রাজপুরুষ। বাঁদিকে একটি চাকা দেখা যাচ্ছে। দুটি ঘোড়া রথ টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

১৬। চতুষ্কোণ ফলক—চতুরাশ্ব বাহিত রথে সূর্য দেবতা।

১৭। খেলনা গাড়ি—উর্দ্ধভাগে আবিষ্কৃত অশ্বমুণ্ড। সম্ভবত বৈদিক দেবতা ইন্দ্রের প্রতীক।

১৮। চতুষ্কোণ ফলক—দণ্ডায়মান পুষ্প পরিবৃত দেবঅশ্ব।

১৯। চতুষ্কোণ স্তম্ভ শীর্ষ (টেরাকোটা) উৎকীর্ণ অশ্বমূর্তি। স্থাপত্য পরিকল্পনায় অলংকরণ রূপে ব্যবহৃত।

২০। আয়তাকার ফলক—অলঙ্কৃত অশ্বমূর্তি—গৃহসজ্জার উপকরণ।

২১। অশ্বমুখী যক্ষিনী—পদকুশল মানব জাতকের চরিত্র।

২২। অশ্বারোহী কিন্নর মিথুন।

২৩। অশ্বারোহী অভিজাত নর-নারী— পাগড়ি, পোশাক ও অলংকার আভিজাত্যের সুস্পষ্ট চিহ্ন।

২৪। গোলাকৃতি ফলক—অশ্বারোহী অভিজাত নারী। ঘোড়ার মুখে লাগাম। নারীর মস্তকে পাগড়ি।

চন্দ্রকেতুগড়ের মৃৎফলকে অসংখ্য ও বিচিত্র আকারের ঘোড়ার উপস্থিতির কারণ কী এই প্রশ্ন খুবই স্বাভাবিক। দেবপ্রসাদ ঘোষ, পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত প্রমুখ পুরাতাত্ত্বিকগণ ধর্মীয় ব্যাখ্যা দিয়েছেন। দেবপ্রসাদ ঘোষের মতে মৃন্ময় শকটের অশ্ব বৈদিক দেবতা ইন্দ্রের প্রতীক[৬]। কিন্তু চন্দ্রকেতুগড়ে আবিষ্কৃত অশ্বমূর্তি

বা মূর্তি সম্বলিত ফলকের একটি বিশাল অংশ ধর্ম-নিরপেক্ষ এবং বাস্তবানুগ। এই ফলকগুলি অতীতের ভারত-ইতিহাসের কয়েকটি পর্বের বিশেষত শুঙ্গ-কুষাণ যুগের, সমাজ-জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আবিষ্কৃত নিদর্শনগুলি প্রাচীন বাংলার অর্থনৈতিক জীবনে যে নতুন আলোকপাত করেছে তা অভূতপূর্ব। ১৯৮৯ সালে বর্তমান লেখক চন্দ্রকেতুগড় থেকে খরোষ্ঠী ও ব্রাহ্মী-খরোষ্ঠী মিশ্রলিপি সম্বলিত যে-সব মৃৎপাত্র, সীলমোহর ইত্যাদি আবিষ্কার ও সংগ্রহ করেন তার আলোকে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস নতুন করে লেখা শুরু হয়েছে[৭]। এই বিষয়ে প্রধান ভূমিকা নিয়েছেন অধ্যাপক ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়[৮]। নতুন আবিষ্কৃত নিদর্শনগুলি থেকে জানা গেছে ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিমাংশ থেকে আগত একটি এক বা একাধিক সম্প্রদায় চন্দ্রকেতুগড় অঞ্চলে এসে বসবাস শুরু করে। এরা ছিল শক-কুষাণ রাজ্যের লোক। খ্রীস্টীয় প্রথম কয়েক-শ বছর ধরে এরা তৎপর ছিল। এই সম্প্রদায়ের অনেকে বড় বড় কৃষি-জমির মালিক হন; শস্য, মৃৎপাত্র ও ঘোড়ার ব্যবসায়ে লিপ্ত হন ও স্থানীয় রাজশক্তি অধিকার করেন। ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল থেকে ঘোড়া নিম্ন গাঙ্গেয় বঙ্গে আমদানী করে ও শিক্ষিত করে জাহাজে করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশ ও চীনে তারা ঘোড়া রপ্তানী করতো। যুদ্ধ, রাজকীয় শোভাযাত্রা বা বাহন রূপে ব্যবহার করার জন্য উচ্চ মূল্যে বিদেশীরা এইসব ঘোড়া ক্রয় করতো। চন্দ্রকেতুগড়ের অসাধারণ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির একটি প্রধান উৎস ছিল এই অশ্ব-বাণিজ্য। অর্থনৈতিক জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল বলেই এই প্রত্ন-স্থলের মৃৎ ফলকে ঘোড়ার ব্যাপক ও বিচিত্র প্রদর্শনী।

চন্দ্রকেতুগড়ের অশ্ব-বণিকদের কার্য-কলাপ বিষয়ে যে-সব মূল্যবান নিদর্শন পাওয়া গেছে তার একটি হলো বর্তমান লেখক কর্তৃক আবিষ্কৃত একটি নাম-মুদ্রা[৯]। এই মুদ্রার এক দিকে একটি বেড়ার উপর দিয়ে দুটি ঘোড়াকে লাফাতে দেখা যায়। একটি ঘোড়ার উপরে কোট ও পাজামা পরিহিত একজন লোক লাগাম ধরে বসে আছে। পাশে খরোষ্ঠী হরফে লেখা "ধেসিদে" (<দেশিত-শিক্ষাপ্রাপ্ত)। বিভিন্ন শীলমোহরে লেখা থেকে প্রাপ্ত তথ্যকে দৃঢ়ভাবে সম্পর্ক করে চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত অসংখ্য মৃৎ ফলক ও অশ্ব মূর্তি।

যাযাবর জাতিগুলির, সমাজ ও সংস্কৃতিতে নারীর স্থান ছিল অতি উচ্চে[১০]। শক-কুষাণদের জীবন-যাত্রার পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে তার আভাস পাওয়া যায়। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল থেকে যে-সব মানুষ চন্দ্রকেতুগড় অঞ্চলে স্থায়ী বসতি স্থাপন করেছিল তাদের মধ্যে যাযাবর জাতি সুলভ নারী স্বাধীনতা ও নারীর মর্যাদার পরিচয় পাওয়া যায়। এর অন্যতম পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন, হস্তী, ব্যাঘ্র বা অশ্বারোহী নারী-পুরুষের যুগল মূর্তি বা অশ্বারোহী একক নারী মূর্তি।

অশ্বমূর্তি রচনায় চন্দ্রকেতুগড়ের মৃৎ শিল্পী যে দক্ষতা ও বাস্তবতাবোধের স্বাক্ষর রেখে গেছেন তার তুলনা বিরল।

অশ্বধারা, অশ্বগতি বা ঘোড়ার চলন কয়েক রকমের। ইংরেজীতে এদের বলা হয় : স্লো, ট্রট, ক্যান্টার ও গ্যালপ। বাংলা কয়েকটি শব্দ—ধৌরিতক, রেচিত, বল্গিত, প্লুত ইত্যাদি। অশ্বগতির প্রায় প্রতিটিই চন্দ্রকেতুগড়ের ফলকে উপস্থিত।

চন্দ্রকেতুগড়ের মৃৎফলকে পাওয়া যাচ্ছে সহিস, অশ্বপাল, অশ্বপালক, অশ্বরক্ষক বা অশ্বাধ্যক্ষের মূর্তি। অশ্ব ব্যবহার ও অশ্ব-ব্যবসাকে ঘিরে যে প্রযুক্তিবিদ্যা গড়ে উঠেছিল তার বিশ্বস্ত পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে ফলকগুলি থেকে। যেমন জিন ও রেকাব।

ঘোড়ার কেশর, ঘোড়ার লেজ বা বালামচি চিত্রিত হয়েছে নানা ছাঁদে নানা ভঙ্গিতে। কোনো ফলকে লেজ নমিত, কোনোটিতে ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত। লেজের অবস্থান দিয়ে অতি নিপুণভাবে প্রকাশিত হয়েছে ঘোড়ার বিভিন্ন গতি ও মেজাজ। বাস্তবিকই শিল্পীর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ও শিল্পগত দক্ষতার তুলনা নেই।

ধর্ম, পুরাণ, শিল্প, সমাজ, অর্থনীতি—সমস্ত ক্ষেত্রে ঘোড়ার উপস্থিতি প্রমাণ করে প্রাচীন নিম্নগাঙ্গেয় বঙ্গে এই প্রাণীটি কত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। অ্যানা সিউয়েল ঘোটক জীবন নিয়ে গদ্যে 'মহাকাব্য' রচনা করেছেন "ব্ল্যাক বিউটি'। ১৮৭৭ সালে রচিত উপন্যাসটির প্রতিছত্রে প্রকাশ পেয়েছে লেখিকার ঘোটক-জীবন সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অন্তরঙ্গ অভিজ্ঞতা, অসাধারণ মমতা, ঘোটক-কল্যাণ সম্পর্কে স্পর্শকাতরতা ও ঘোটকদের উপরে মানুষের নির্মম আচরণ ও শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ। চন্দ্রকেতুগড়ের শিল্পীদের মাধ্যম ছিল ভিন্ন। তথাপি মৃত্তিকার মাধ্যমে তাঁরাও চিরস্থায়ী করে রেখেছেন ঘোটক-জগতের অতি মূল্যবান আলেখ্য।

সূত্র নির্দেশ

১। রবার্টস, এম.বি.ভি.: বায়োলজি অ্যা ফাংশনাল এপ্রোচ, লণ্ডন, ১৯৮২, পৃঃ ৫৮৪-৫৮৫
২। স্ট্রিকবার্জার, এম.ডব্লু: এভুলিউসান, দিল্লী, ১৯৯০, পৃঃ ৪৬
৩। তদেব
৪। ভূমিকা—স্গরবি, ডি: দি হিস্ট্রী অব আর্ট, নিউইয়র্ক, ১৯৮৯, পৃঃ ১১
৫। বিশ্বাস, টি.কে.: হর্স ইন আর্লি ইণ্ডিয়ান আর্ট, নিউ দিল্লী, ১৯৮৭;
দেলচ জাঁ: হর্সেস অ্যাণ্ড রাইডিং ইকুইপমেন্ট ইন ইণ্ডিয়া আর্ট, মাদ্রাজ, ১৯৯০
৬। ঘোষ দেবপ্রসাদ: ভারতীয় শিল্পধারা, কলকাতা, ১৯৮৬, পৃঃ ১৪
৭। দে গৌরীশংকর: খরোষ্ঠী লিপির আলোকে চন্দ্রকেতুগড়, ইতিহাস অনুসন্ধান— ৫, কলকাতা, ১৯৯০, পৃঃ ৯৯—১০৫
৮। ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম বুলেটিন, ১৯৯০
৯। প্রাগুক্ত, প্লেট XIX ৮এ
১০। সারিয়ানিডি, ভি. আই: দি গোল্ডেন হোর্ড অব ব্যাকট্রিয়া, ন্যাশনাল জিয়োগ্রাফিক, মার্চ, ১৯৯০, পৃঃ ৫৩

ভারত-রোম বাণিজ্যের প্রধান প্রধান বন্দরসমূহ

বর্ণালী রুজ

শিল্পের অগ্রগতির সঙ্গে আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের উন্নতি ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত হওয়ার জন্য প্রাচীন ভারতীয়রা দেশের গন্ডি ছাড়িয়ে স্থল ও জলপথে রোম তথা পশ্চিম বিশ্বের সঙ্গে এক দীর্ঘকালীন বৈদেশিক বাণিজ্যে লিপ্ত হয়েছিল।

এই বৈদেশিক বাণিজ্য কতদিন চলেছিল সে সম্পর্কে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও পণ্ডিতদের মধ্যে মতানৈক্য আছে। তাই সে মতানৈক্যে না গিয়ে মোটামুটি বলা হয় খৃঃপূ প্রথম শতাব্দী থেকে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতক পর্যন্ত এই ভারত-রোমান বৈদেশিক বাণিজ্য চলেছিল।

এই বাণিজ্যের বিবরণ আমরা পেয়ে থাকি রোমান সম্রাট অগাস্টাসের আমলে Strabo (Geography), Arian (Indica খ্রীঃ পূঃ 150 A.D.), Pliny (Natural History, 73–77 A.D.) এবং প্লিনির সময়েই রচিত আর একটি গ্রন্থ যার লেখক একজন অজ্ঞাতনামা গ্রীক নাবিক অথবা রোমান সাম্রাজ্যের নাগরিক। নাম Periplus Erythrea Mari অথবা ইংরেজিতে The Periplus of the Erythrean Sea। লেখকের নাম ও লেখকের রচনার সময় জানা না থাকলেও এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে গ্রন্থটি খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে রচিত হয়েছিল। পেরিপ্লাস ছাড়া অন্যান্য উল্লেখিত গ্রন্থের তথ্যাদি পরোক্ষভাবে সংগৃহীত হয়েছিল। ফলে ঐতিহাসিকেরা পেরিপ্লাসের বিরবণকে অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন।

ভারত-রোম বাণিজ্যে ভারতের সমুদ্র উপকূলের যে বন্দরগুলি বা দেশের অভ্যন্তরে যে নগরগুলি অংশগ্রহণ করেছিল সেগুলিকে কচ্ছ, কোঙ্কন, মালাবার, করমণ্ডল, বঙ্গ প্রভৃতি উপকূল অঞ্চল ধরে আলোচনা না করে ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করছি। তবুও ভাষাগতভাবে ভাগ করলেও উপকূল ভাগগুলিকে চিহ্নিত করা যায়। যথা— সিন্ধু এবং গুজরাটী ভাষাভাষী বন্দরগুলি কোঙ্কন উপকূলের। সেরকম মালায়ালম ভাষাভাষী বন্দরগুলি মালাবার উপকূলের; করমণ্ডল উপকূলে ছিল তামিল ভাষাভাষী বন্দরগুলি। অনুরূপভাবে বঙ্গ উপকূলে ছিল ওড়িয়া এবং বাংলা ভাষাভাষী বন্দরগুলি।

সিন্ধীভাষী অঞ্চল—
ডেমেট্রিয়াস পটল—

প্লিনির বিবরণ থেকে জানা যায় পশ্চিম থেকে আগত বাণিজ্যতরীর লক্ষ্য ছিল এই বন্দরে পৌঁছান। একটি পথ ছিল সমুদ্রের তীর ধরে এই বন্দরে পৌঁছান এবং অপর পথটি আরবের কোন একটি অঞ্চল থেকে সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে ডেমেট্রিয়াম পটলে পৌঁছাত। খ্রীস্টের জন্মের দুই শতাব্দী পূর্বেও এই বন্দরটির যথেষ্ট আর্থিক সমৃদ্ধি ছিল। Tarn-র মতে গ্রীক রাজত্বে গোলমরিচ এই বন্দরের মাধ্যমে ভারত থেকে রপ্তানী হত।

গুজরাঠী ভাষাভাষী অঞ্চল—
বারুগাজা—

বারুগাজা বা ভারতীয় ভাষায় ভৃগুকচ্ছ বর্তমানকালের ভারুচ। পশ্চিমের সঙ্গে বাণিজ্যে এটি ছিল একটি বিখ্যাত বন্দর। নর্মদা নদীতীরে অবস্থিত এই বন্দরকে পশ্চিম ভারতের প্রধান বিতরণ কেন্দ্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কেন না বিদেশ থেকে আমদানীকৃত শস্য সেখান থেকে সমগ্র ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে যেত। বিভিন্ন লেখ এবং জাতমালায় এই বন্দরের উল্লেখ থাকলেও পেরিপ্লাসের উপর ভিত্তি করে এই বন্দরের বাণিজ্যিক গুরুত্ব আলোচনা করা অযৌক্তিক হবে না। এই বাণিজ্য বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায় রোম সম্রাট অগাস্টাস থেকে নিরোর রাজত্বকালের মধ্যবর্তী সময়ে। যে সমস্ত শস্য এই বন্দরের মাধ্যমে রপ্তানী হত সেগুলি হল হস্তিদন্ত, ভারতীয় মসলিন, Mallow cloth, রেশম সুতো, কাঁচা রেশম, রেশম বস্ত্র, Spikenard, Costus, Bolelliun (উত্তর-পশ্চিম ভারতে জন্মান এক ধরনের ক্ষুদ্র গাছের সৌরভযুক্ত আঠা) Lycium, তিলতেল, চাল, গম, Sacchari (এক ধরনের কাষ্ঠ মধু যা এক ধরনের গাছের কাণ্ড থেকে সংগৃহীত), ইক্ষু, সূতীবস্ত্র, আবলুস ও অন্যান্য কাঠ, Black wood (পাঞ্জাব এবং পশ্চিম ভারতে এক ধরনের শক্ত কাঠ যা কৃষি যন্ত্রপাতি, গোযানের চাকা, নৌকা, আসবাবপত্র তৈরীতে ব্যবহৃত হয়), চন্দনকাঠ, অ্যাগেট, কারনেলিয়ান, তামা ইত্যাদি। আমদানীকৃত পণ্যদ্রব্যগুলি হল ক্রীতদাস, মদ (ইটালীয়, লাওডিসিও), ফ্রাঙ্কিনসেনস, পীচফল ও গাছ, কুল জাতীয় ফল বিশেষ, সোনা, রূপার মুদ্রা। বারুগাজা ছিল সোনা আমদানীর মূল কেন্দ্র। পোখরাজ কাঁচা কাচ, লাল প্রবাল ইত্যাদি খনিজ পদার্থও আমদানী হত এই বন্দরের মাধ্যমে।

মারাঠী ভাষাভাষী অঞ্চল—

বারুগাজার দক্ষিণে পেরিপ্লাসের বর্ণনা অনুযায়ী দক্ষিণাপথ অঞ্চলে নিম্নলিখিত বন্দরগুলি অবস্থিত ছিল—

১. সুপ্পারা— বর্তমান সোপারা (১৯.২৫° উঃ) (৭২.৪৪° পূঃ)
২. ক্যালিয়েনা— আধুনিক কল্যাণ (১৯.১৪° উঃ) (৭৩.১০° পূঃ)
৩. সিমুল্লা— আধুনিক চউল (১৮.৩৪° উঃ) (৭৭.৫৫° পূঃ)
৪. ম্যাণ্ডাগোরা— আধুনিক বানকোট (১৭.৫৯° উঃ) (৭৩.৩° পূঃ)
৫. প্যালিপাটমে— আধুনিক দাভোল (১৭.৩৫° উঃ) (৭৩.১০° পূঃ)
৬. মেলিজিগারা— বর্তমান জয়গড় (১৬.৩৪° উঃ) (৭৩.৩১° পূঃ)
৭. বাইজ্যান্টিয়াম— আধুনিক ভিজাদ্রোগ (১৬.৩৩° উঃ) (৭৩.২০° পূঃ)
৮. তুরান্নাবোযাস— বর্তমান মালভান (১৬.৩° উঃ) (৭৩.২৮° পূঃ)

এই বন্দরগুলির মধ্যে ক্যালিযেনা বন্দবকে আলোচনা করব।

ক্যালিয়েনা—

বিভিন্ন মতানুযায়ী এই বন্দরের পতন ঘনিয়ে আসে কোঙ্কন অঞ্চলে শকদের অভিযানের ফলে এবং এটি ছিল সাতবাহন রাজ্যের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বন্দর। কিন্তু হরিপদ চক্রবর্তী মনে করেন যে, ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে কল্যাণ বা ক্যালিয়েনা এমন একটি স্থানে অবস্থিত ছিল যে, এটি ছিল সমগ্র উপকূলের বাণিজ্যের স্বাভাবিক কেন্দ্র, যেখান থেকে পশ্চিমের দেশগুলিতে পণ্যদ্রব্য রপ্তানী হত। কাজেই এই বন্দরটিকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে যে কোন রাজ্যই সমৃদ্ধ হতে পারত। কসমসের প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে Black wood ধরনের কাঠের রপ্তানীতে এই বন্দর গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করেছিল।

কন্নড় ভাষাভাষী অঞ্চল—

বাইজ্যানটিয়াম—

বিভিন্ন উপাদানে বাইজ্যানটিয়াম বন্দরের উল্লেখ থাকলেও এর বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়নি। তবে এ বিষয়ে বিশদ গবেষণার সুযোগ রয়েছে।

মালায়ালাম ভাষাভাষী অঞ্চল—

এই অঞ্চলের মধ্যে নিত্রা, নৌরা, টিনডিস, ব্যারাকে, মুজিরিস প্রভৃতি বিভিন্ন বন্দরের উল্লেখ থাকলেও মুজিরিস বন্দরের কথাই আলোচনা করব এখানে—

মুজিরিস—

টিনডিস বন্দরের দক্ষিণে ভারতের পশ্চিম উপকূলে বন্দরটি ছিল চেরবোথরা রাজ্যের অন্তর্গত মুজিরিস। পেরিপ্লাস রচনাকালে এই বন্দর ছিল গুরুত্বের দিক থেকে সামনের সারিতে। একটি নদী তীরে অবস্থিত মুজিরিসের দূরত্ব ছিল টিনডিস থেকে নদী ও সমুদ্র পথে ৫০০ স্টেডিয়া। এর ভিত্তিতে পণ্ডিতেরা মুজিরিসকে বর্তমান ক্র্যাঙ্গানোর বা কোন্নর বলে সনাক্ত করেছেন। এই বন্দরের সঙ্গে আরবের উপকূলের সরাসরি যোগাযোগ থাকার জন্য মুজিরিসের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই বন্দরটি তার গোলমরিচ ব্যবসায় বণিকদের চোখে এতটাই বিখ্যাত হয়ে ওঠে যে, সেখানে খ্রীস্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে অগাস্টাসের একটি মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। গোলমরিচ ব্যবসার গুরুত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় এই অঞ্চলে আবিষ্কৃত প্রচুর সংখ্যক রোমান মুদ্রার সাক্ষ্যের ভিত্তিতে। অলঙ্কৃত সূতীবস্ত্র, Realgar, হরিতাল, (Orpiment), পোখরাজ, লাল প্রবাল, তামা ইত্যাদি দ্রব্যাদি আমদানী হত এই বন্দরে মাধ্যমে। রপ্তানীকৃত পণ্যদ্রব্যগুলি হল হস্তিদন্ত, গোলমরিচ, Malabathrum, স্বচ্ছ পাথর, হীরক, নীলকান্তমণি, বৈদুর্য্য, Garnets ইত্যাদি।

তামিল ভাষাভাষী অঞ্চল—

এই অঞ্চলের বন্দরগুলির মধ্যে কোমারি, কাবেরীপট্টি নম পডুকা, আরিকামেডু, সোপাটমা, মাসালিয়া এবং কন্টকসিল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য হলেও কাবেরীপট্টিনম ও আরিকামেডু বন্দরের কথাই উল্লেখ করছি। অবশ্য একথা অনস্বীকার্য যে কাবেরীপট্টিনম এবং আরিকামেডু পশ্চিমী বিশ্বের সঙ্গে বাণিজ্যিক লেনদেনের ক্ষেত্রে নিজেদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বন্দর হিসাবে প্রমাণ করতে পেরেছিল।

কাবেরীপট্টিনম—

কাবেরী নদীর মোহনায় খাবেরীস নামক বন্দরটিকে বিভিন্ন পন্ডিতেরা কাবেরীপট্টিনম বলে সনাক্ত করেছেন। এখানে বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তি বসবাস করত এবং এই বন্দর দিয়ে দূরে দেশ থেকে গোলমরিচ, স্বর্ণ, মূল্যবান পাথর, চন্দন, মুক্তা, প্রবাল আনা হত। রেশম ও রেশমজাত দ্রব্যাদি রপ্তানী হত এই বন্দরে মাধ্যমে।

আরিকামেডু—

একথা বলা অযৌক্তিক হবে না যে পেরিপ্লাস বর্ণিত পডুকা এবং টলেমী বর্ণিত পডৌকে হল বর্তমান পণ্ডিচেরী, পরবর্তীকালে পডুকার নাম হয় আরিকামেডু। বর্তমান পণ্ডিচেরীর সন্নিকটে আরিকামেডুর অবস্থান ছিল। ১৯৪৫ সালে

আরিকামেডুতে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের দ্বারা খ্রীস্টীয় প্রথম এবং দ্বিতীয় শতাব্দীর যে নির্দশনগুলি আবিষ্কৃত হয়েছে তা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বন্দরটি উত্তর ও দক্ষিণ দুটি অংশে বিভক্ত ছিল এবং সেই সময়কার গুদাম (Warehouse) জাতীয় স্থাপত্যকীর্তির নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। আরিকামেডুতেই মসলিন তৈরীর কারখানার নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। মসলিন ছাড়াও এই বন্দর শহরটির অন্যান্য উৎপাদিত পণ্যদ্রব্যের মধ্যে গুটি (Bead) উল্লেখযোগ্য। এই শিল্পের জন্য সোনা, আধা মূল্যবান পাথর এবং কাঁচ ব্যবহৃত হত। তাছাড়া গ্রেকোকা রোমান মণিকারদের শিল্পকর্মের আবিষ্কার প্রমাণ করে যে, এই অঞ্চলে পশ্চিমের কারিগররা এসে বসতি স্থাপন করে, খ্রীস্টের জন্মের পূর্বের ও পরবর্তী শতাব্দীতে ইটালীতে প্রস্তুত Red-glazed pottery, ভূমধ্যসাগরীয় মদ্য ব্যবসার বৈশিষ্ট্য সমন্বিত আমফোরে (Amphorae), রোমান আলোকধার এবং কাঁচের পাত্রের আবিষ্কার প্রমাণ করে যে, আরিকামেডু ছিল একটি 'যবন' অথবা পশ্চিমীদের বসতিপূর্ণ বাণিজ্য কেন্দ্র যার উল্লেখ গ্রেকো রোমান এবং প্রাচীন তামিল সাহিত্যকারেরা করেছেন।

এই অঞ্চলের ভারতীয় শাসকদের অনুমতিক্রমে পশ্চিমী বণিকরা এ বন্দর শহরে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেছিল। এছাড়া সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চল থেকে দূরে দেশের অভ্যন্তরে রোমান মুদ্রার আবিষ্কার প্রমাণ করে যে, দালালদের এড়ানোর জন্য পশ্চিমের বণিকরা দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করত। প্রত্নতত্ত্বের নিরিখে বলা যেতে পারে যে ৩০ খ্রীস্টাব্দ থেকেই এবং সম্ভবতঃ অগাস্টাসের মৃত্যুর পূর্ব থেকেই মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে নিয়মিতভাবে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল এবং ভারতের পশ্চিম উপকূলের মধ্যে বাণিজ্য শুরু হয়ে যায়।

ওড়িয়া ভাষাভাষী অঞ্চল—

প্যালৌরা—দন্তপুর—

গাঙ্গেয় উপসাগরে (বঙ্গোপসাগর) যেখানে শুরু সেখানে প্যালৌরা নামে একটি শহর ছিল। মনে হয় এটিই প্রাচীন কলিঙ্গের রাজধানী দন্তপুর। তবে এর উল্লেখ অন্য কোন বিবরণে পাওয়া যায় না। পেরিপ্লাসে যে Dosarene-র উল্লেখ আছে সেখান থেকে হস্তিদন্ত সংগৃহিত হত। সুতরাং মনে হয় যে প্যালৌরা নিঃসন্দেহে Dosareneঅঞ্চলের অন্তর্গত ছিল।

বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চল—

এই অঞ্চলের তাম্রলিপ্ত বন্দর বহু প্রচারিত বলে এই বন্দরে কথা না আলোচনা করে এই অঞ্চলের এক বন্দর গ্যাঙ্গে বা গঙ্গা বন্দরের সম্বন্ধে আলোচনা করা হোল।

গঙ্গা— টলেমী এবং পেরিপ্লাসের বর্ণনায় গঙ্গা বন্দরের উল্লেখ প্রমাণ করে যে, এটি একটি বড় বন্দর ছিল। পূর্ব সীমান্তের বাণিজ্যবন্দর ছিল তাম্রলিপ্তী এবং তারও আগে— এক পুরস্থল (বা পূর্বস্থল)। এই বাণিজ্য বন্দরটির নাম পাওয়া গিয়েছে রোমান ঐতিহাসিক প্লিনির বর্ণনায় Portalis (পোর্তলিস্) রূপে। প্লিনির সময় থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় দুই হাজার বছর কেটে গিয়েছে। প্রধান বন্দর রূপে পোর্তলিস স্থানচ্যুত হয়েছে বারবার। বন্দরের নাম পালটেছে কখনো তাম্রলিপ্তী, কখনো সাঁতগাও। কিন্তু পূর্বের নামটি এখনো বিলুপ্ত ও স্থলচ্যুত হয়নি। নবদ্বীপের উজানে 'পুরথল' বা 'পুরস্থল' মুকুন্দরামের বর্ণনায়ও নৌবন্দর বলে উল্লিখিত হয়েছে। বর্তমান নাম পূর্বস্থলী আচার্য সুকুমার সেনের মতে। এস স্থানই হয়ত বা টলেমির গঙ্গা। ১৯৪৮ এবং ১৯৫০ সালে ২৪ পরগণার বেড়াচাঁপাতে খননকার্য চালিযে মৌর্যোত্তর এবং প্রাক গুপ্তযুগের ভগ্নাবশেষ একটি প্রাচীন দুর্গ এবং তার প্রাকার ১০০টি কীলকাঙ্কিত রৌপ্য মুদ্রা। খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দী এবং খ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দীর বৈশিষ্ট্যযুক্ত ব্রাহ্মী লিপিতে উৎকীর্ণ পোড়ামাটির সিল আবিষ্কৃত হয়েছে। রোমান শৈলীযুক্ত ব্যবহার্য জিনিসপত্র দেখে মনে হয় •যে এই অঞ্চলেব সঙ্গে রোমান জগতের যোগাযোগ ছিল। পেরিপ্লাসের বর্ণনা থেকে জানা যায যে গঙ্গে বন্দর দিয়ে রপ্তানী হত ম্যালাব্যাথরাম, স্পাইকনার্ড, মুক্তা, মসলিন, ইক্ষু প্রভৃতি দ্রব্যাদি।

ভৃগুকচ্ছ, সোপারা, কল্যাণ, কাবেরিপট্টনাম, আরিকামেডু, তাম্রলিপ্তী প্রভৃতি কয়েকটি বন্দর ছাড়া গ্রীক ও রোমান সাহিত্যে উল্লিখিত অন্যান্য নানা বন্দরের সঠিক অবস্থান অথবা ভারতীয় নাম নির্দেশ করা কষ্টসাধ্য। আধুনিকযুগে যেমন ব্রিটিশ শাসনের কল্যাণে কলিকাতা হয়েছে ক্যালকাটা, বারানসী বেনারস, পলাশী প্লাসী, গুযাহাটী গৌহাটী, সুরথ হয়েছে সুরাট প্রভৃতি সেইরূপ বিকৃতি ঘটেছিল রোমান লেখকদের বর্ণনায়। এর প্রধান দৃষ্টান্ত, ভৃগুকচ্ছ, বারুগাজা বা ক্যালিয়েনা প্রভৃতি। সুতরাং এই বিকৃত নাম অনুসন্ধান করে প্রায় দুই হাজার বছর পরে বর্তমানে সেই বন্দরগুলির সঠিক অবস্থান নির্ণয় করা বেশ কঠিন। বহু বন্দরই ছিল নদীর মোহনায়। অনেক সময় নদী গতি পরিবর্তন করেছে বা শুষ্ক হয়ে হারিয়ে গিয়েছে—যেমন প্রাচীন যুগের সমগ্র পূর্ব ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বন্দর তাম্রলিপ্তী, অনুরূপভাবেই খ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দীর আর একটি বিখ্যাত বন্দর গ্যাঙ্গে বা গঙ্গার কথা বলা যায়। সহজেই অনুমান করা যায়, বন্দরটি অতি অবশ্যই গঙ্গানদীর তীরে অবস্থিত ছিল। কিন্তু বর্তমানে কোন লোকালয় বা লোকালয়ের সন্নিকটে এর অবস্থান ছিল তা আবিষ্কার করা দুঃসাধ্য। মোটামুটি বলা যায় তিনদিকে সমুদ্র বেষ্টিত ভারতের দক্ষিণের ত্রিভূজাকৃতি উপদ্বীপের সমগ্র উপকূল ভাগ ধরেই বহু বন্দর ছিল, যে বন্দরগুলির মাধ্যমে প্রাচীন বিশ্বের সভ্য এবং

সমৃদ্ধশালী অঞ্চলের সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরে বাণিজ্যিক আদান-প্রদান চলত। রোমান উপাদানের উপর নির্ভর করে বোম-ভাবত বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত যে বন্দরগুলি আলোচনা করা হল সেগুলি যে শুধুমাত্র উত্তর-পূর্ব আফ্রিকার এবং পশ্চিম এশিয়াময় বিস্তৃত রোমান সাম্রাজ্যের সঙ্গেই বাণিজ্যে লিপ্ত ছিল তা নয়, বহু বন্দর, বিশেষত পূর্ব উপকূলেব বন্দবগুলির, সঙ্গে চীন, দঃপূঃ এশিয়া, মালয উপদ্বীপ এবং পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জেরও ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। এ বিষয়ে বিস্তৃত এবং ব্যাপক গবেষণাব সুযোগ রযেছে। বর্তমান প্রবন্ধ সামান্য একটি আভাস মাত্র।

সূত্র নির্দেশ

১. এ্যাবিয়ান— ইণ্ডিকা
২. বাবনেট, এল. ডি.—ইণ্ডিয়ান অ্যান্টিকোযাবী
৩. চক্রবর্তী হবিপদ— ট্রেড অ্যাণ্ড কর্মাস অব এনশেন্ট ইণ্ডিয়া
৪. চন্দ্র মতি — ট্রেড অ্যাণ্ড ট্রেড রুটস্ ইন এনশেন্ট ইণ্ডিয়া,
৫. এলিয়ন— কয়েনস অভ সাউথ ইণ্ডিয়া,
৬. মজুমদাব, আব. সি.—হিস্ট্রী অভ বেঙ্গল, ২য় খণ্ড, দ্য ক্লাসিক্যাল অ্যাকাউন্টস অভ ইণ্ডিয়া দ্য এজ অভ ইম্পিবিয়াল ইউনিটি
৭. মেয়ক, সি (অনু)— ন্যাচাবালিস হিস্টোবিয়া ১৮৯২-১৯০৯
৮. মেইনেকে —জিওগ্রাফিকা, লিপজিগ ১৮৬৬-৬৭
৯. মজুমদাব শাস্ত্রী, এস. এন.—এনশেন্ট ইণ্ডিয়া অ্যাজ ডেসক্রাইবড্ বাই টলেমী,
১০. বলিনসন, এইচ. জি.—ইন্টাবকোর্স বিটুইন ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড দ্য ওয়েস্টার্ণ ওয়ার্ল্ড।
১১. বোতোবৎএথ্—সোশ্যাল অ্যাণ্ড ইকনমিক হিস্ট্রী অভ দ্য হেলেনিস্টিক ওয়াল্ড, নবম খণ্ড
১২. স্কফ, ডব্লু. এইচ.—দি পেবিপ্লাস অভ দ্য ইবি থ্রিয়ান সী।
১৩. সেন, বি. সি—সাম হিস্টোবিক্যাল অ্যাসপেকটস্ অভ দ্য ইনসক্রিপশনস অভ বেঙ্গল।
১৪. সেন, সুকুমাব—বঙ্গভূমিকা।
১৫. ওয়াসিংটন, ই. এইচ.—কমার্স বিটুইন দ্য বোমান এম্পায়াব অ্যাণ্ড ইণ্ডিয়া।
১৬. ওয়াট, জর্জ.— কর্মাশিয়াল প্রোডাক্টস অভ ইণ্ডিয়া।

পত্রপত্রিকা

এনশেন্ট ইণ্ডিয়া— ২য় খণ্ড।
এনশেন্ট ইণ্ডিয়ান বুলেটিন অভ আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অভ ইণ্ডিয়া, সংখ্যা– ২, ১৯৪৬।
আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অভ ইণ্ডিয়া, অ্যানুয়েল বির্পোট, ১৯১১–১২।
জার্নাল অভ দ্য রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি—১৯০৪।
জার্নাল এশিয়াটিক—১৯৩৬।
জার্নাল অভ নিউমিস্মেটিক সোসাইটি অভ ইণ্ডিয়া—৩য় খণ্ড।

সপ্তাশ্বঃ রথ — একটি সমীক্ষা

সোমা বন্দ্যোপাধ্যায়

বহু প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষে সূর্য উপাসনা প্রচলিত। প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে তাঁব বিভিন্ন রূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। তাঁর বিভিন্ন রূপ যেমন সাবিত্রী, পুষাণ, ভাগ, মিত্র এবং বিষ্ণু। উত্তব বৈদিক-কালে পুরাণগুলিতে বিস্তারিত ভাবে সূর্য দেবতা এবং তার উপাসনার কথা পাওয়া যায়।

ঋক বৈদিক যুগ থেকে উত্তর বৈদিক যুগে ধীরে ধীরে উত্তরণ ঘটে এবং সূর্য এক অপ্রধান দেবতা থেকে প্রধান দেবতা স্তরে উন্নীত হন। প্রথমে তাকে সুন্দর পাখা যুক্ত দৈব পক্ষী হিসেবে কল্পনা করা হতো। তার থেকেই পরে বিষ্ণুর বাহন হিসেবে গরুড় পক্ষীর আত্মপ্রকাশ ঘটে। এবং ঘোড়ার পৃষ্ঠে আরোহণকারী সূর্যের প্রকাশ ঘটে। উত্তর বৈদিক কালেব রচনা সমূহে সপ্তঅশ্বারূঢ় হিসেবে তাকে বর্ণনা করা হয়েছে। পুরাণগুলিতে এবং দুইটি মহাকাব্যেও সূর্যের উল্লেখ আমরা পাই। মহাভারতের একটি অংশে তাকে দেবেশ্বর বা সকল দেবতার দেবতা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

খ্রীস্টিয় শতকের প্রথম দিকে উত্তর ভারতে সূর্যের উপাসনা রীতির প্রচলন হয়। তা পূর্ব ইরানীয় রীতির দ্বারা প্রভাবিত ছিল। ভবিষ্য, বরাহ, শাম্ব, প্রভৃতি পুরাণে এই প্রথার পূজা রীতির উল্লেখ আমরা পাই। কৃষ্ণপুত্র 'শাম্বর' কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত হওয়া এবং সূর্য উপাসনার দ্বারা আরোগ্য লাভের কাহিনী বহুল প্রচলিত। বিভিন্ন সাহিত্যগত এবং প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ দ্বারা এখন এটা পরিস্কার যে প্রাচীন উত্তর ভারতীয় সূর্য উপাসনা ছিল পূর্ব ইরানীয় রীতি দ্বারা প্রভাবিত। যদিও গায়ত্রী মন্ত্রের মাধ্যমে সূর্য উপাসনা হিন্দুদের অন্যতম নিত্য কর্ম তবুও সূর্য হিন্দু শাস্ত্রে এক প্রধান দেবতা নন। সপ্তম শতকে "সাসানীয়" রাজবংশের পতনের ফলে পূর্ব দেশে এই রীতির উপাসনা তার আশ্রয় খুঁজে পায়। ত্রয়োদশ শতকে কাশ্মীরের সূর্যমূর্তির তার আদিরূপ। "আল-বিরুনীর" লেখাতে পাওয়া যায় যে পারসীক পুরোহিতরা এদেশে এসেছিলেন তারা 'মগ' ব্রাহ্মণ হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

পূর্বে সূর্য মূর্তি নির্মাণের আগে তাকে উল্লেখ করা হত চক্র, সোনালী থালা বা পদ্মফুলের মাধ্যমে। ভারতীয় শিল্প জগতে তাঁর মনুষ্য মূর্তি প্রথম দেখা যায় বোধগয়ায় একটি প্রস্তর প্রাকার শিলায়। তার পাশে এক নারী মূর্তিও দেখা যায়, অনুমান করা হয় তারা উষা এবং প্রত্যুষ এর রূপ।

পশ্চিম-পাঞ্জাব-এর চন্দ্রভাগা নদীতীরে মূলতান বা প্রাচীন মূলস্থান পূরায় প্রথম সূর্য মন্দির স্থাপনার কথা জানা যায়। চৈনিক পরিব্রাজক 'হিউয়েন-সাঙ" এবং আরব পরিভ্রমণকারী যথা "আল ইদ্রিসি আবু ইসাক আল ইস্তাখরী" এবং অন্যান্যদের লেখায় তার উল্লেখ পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষে বিশেষত উত্তর ভারতে নানা স্থানে সূর্য মন্দিব ও উপাসনার বিভিন্ন নিদর্শন থাকা সত্ত্বেও ত্রয়োদশ শতকে নির্মিত উড়িষ্যার "কোণার্ক" সূর্য মন্দিরটি এক বিশেষ স্থান দাবী করে। উড়িষ্যায় প্রায় একাদশ শতক পর্যন্ত বৌদ্ধ ধর্ম জনসমাজে এক প্রধান ধর্ম বিশ্বাস হিসেবে ছিল। গঙ্গ রাজবংশের রাজা মদনমহাদেব-এর রাজত্ব কালে বৌদ্ধধর্ম কিভাবে বিলুপ্তির সম্মুখীন হয় তা জানা যায় পৌরাণক গল্প ও 'মাদলা পঞ্জী' থেকে। মাদলা পঞ্জীর হিসেবে কোণার্কের নির্মাতা ছিলেন কেশরী রাজবংশের "পুরন্দব কেশবী"। তারপর গঙ্গ রাজবংশের সূচনা হয় এবং রাজা নরসিংহ দেব (১২৩৮-১২৬৪ খ্রীঃ) কোণার্কেব নির্মাণ সম্পূর্ণ করেন বা তিনি পুরন্দব কেশবী নির্মিত মন্দিরে নিকটেই অপর একটি মন্দির নির্মাণ করেন (১২৪৫ ৫৬ খ্রীঃ) যার আয়তন ছিল গগনচুম্বী এবং যার শোভা ছিল 'আরো রাজকীয়।

মন্দিরটি একটি উঁচু বেদীর (plinth) ওপর স্থাপিত এবং আকৃতি একটি রথের মত। যার ২৪টি বড় বড় দৈত্যাকৃতি চাকা এবং ৭টি ঘোড়া নির্মিত। বেদীটি অলংকৃত। হাতী, যুদ্ধ দৃশ্য প্রভৃতির অঙ্কন দৃষ্ট হয়। অলংকৃত চাকাগুলি ৭-৪ ব্যাস যুক্ত এবং ৮টি মোটা ও ৮টি সরু স্পোক এব দ্বারা নির্মিত। বেদীটির অলংকরণের মধ্যে নানা রকম নৃত্যরতা বাদক হাতে দাঁড়ানো নানা নারী ও পুরুষ মূর্তি দেখা যায়। গজসিংহ স্তম্ভ, নাগ কলাম, এবং জালির কাজ উল্লেখনীয়। একটি উঁচু বেদীর (plinth) উপরে বিমান এবং জগমোহন উভয়েই স্থাপিত বিমানটির মস্তক ধ্বংসপ্রাপ্ত। মন্দির গাত্রে দক্ষিণ, পশ্চিম এবং উত্তরে ক্লোরাইট পাথরে নির্মিত সূর্য মূর্তি দণ্ডায়মান। মন্দিরে ভেতরের অংশ বা গাত্র মসৃণ। ভিতরে মূর্তি রাখার বেদীটিও সুদৃশ্য ও অলংকৃত। বিমানটিব উচ্চতা হল ২২৮ ফুট, জগমোহনটি অটুট আছে যার নকশা হল পঞ্চরথ। কতকগুলি পিড়া নিয়ে পিরামিডাকৃতি এই জগমোহনটি অতি সুন্দর ভাবে অলংকৃত। দ্বারগুলিও সুন্দর ও অলংকৃত। জগমোহন এর সামনে ধ্বংসপ্রাপ্ত নাট মন্দিরটি পাওয়া যায় যার পূর্ব দিকে প্রকাণ্ড আকৃতির গজসিংহ মূর্তি পাওয়া যায়। চারিদিকের বেদী গাত্রে সুন্দর বাদ্য হাতে অথবা নৃত্যরতা রমণীর মূর্তি লক্ষিত হয় এবং প্রচুর অলংকৃত স্তম্ভ পাওয়া যায়। ছাদটি চারটি স্তম্ভ দ্বারা রক্ষিত ছিল। বর্তমানে তার কোন অস্তিত্ব নেই। মোটামুটি এইরকম ছিল কোণার্কের এই রাজকীয় সুন্দর মন্দিরটির আশ্চর্য গঠন শৈলী।

কিন্তু এক প্রধান প্রশ্ন আমাদের সামনে এসে আজ উপস্থিত যে শিব এবং বিষ্ণুর উপাসনা. স্থল উড়িষ্যা তার চিরাচরিত ঐতিহ্যের মধ্যে এক বিরাট গগন চুম্বী সূর্য মন্দির এর সাক্ষ্য বহন করছে কেন? সমগ্র ভুবনেশ্বর শহরে এবং উড়িষ্যাতে অন্য কোথাও আর সূর্য মন্দির এর নিদর্শন পাওয়া যায় না। তবে কেন "রাজা নরসিংহদেব" হঠাৎ সূর্যমন্দির নির্মাণে ব্যাপৃত হলেন? এর কি কোন গভীর তাৎপর্য ছিল? তবে কি তিনি চেয়েছিলেন সমুদ্র কিনারে অবস্থিত দৃষ্টিগ্রাহ্য এই সুউচ্চ মন্দিরটিকে ঘিরে কোন নবতম বাণিজ্য স্থল গড়ে উঠুক? নাকি তার রাজকীর্তির মহিমা প্রদর্শনের যন্ত্র হিসেবে মন্দিরটির সৃষ্টি?

কোণার্কের মন্দিরটির গঠনগত শৈলী লক্ষ্য করলে দেখা যায় তা একটি রথের আকৃতি। তবে কি তা 'রাজা নরসিংহদেব"-এর রথের আকৃতি অনুযায়ী নির্মিত? উদাহবণ স্বরূপ বলা যেতে পারে দ্বাদশ শতকে নির্মিত কম্পুচিয়াতে "আঙ্কোর ভাট" এব যে বিষ্ণু মন্দির তাতে একটি রথারূঢ় সূর্যমূর্তি দেখা যায়। এবং তা রাজা "সূর্যবর্মনের" রথ।

এখন এখানে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষিত হয় একটি চির পুরাতন বিষয়ের ওপব তা হল God King concept বা রাজার ওপর দেবত্ব আরোপের প্রথা। এর প্রাচীনতম ইতিহাস অনুসন্ধান করলে দেখা যায় ঐতিহাসিক যুগের "সম্রাট অশোকের" লিপি সমূহে তাকে "দেবানম প্রিয়" হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ সাধারণ প্রজাদের কাছে তিনি দেবতা নির্বাচিত এক প্রিয় পুরুষ হিসেবে প্রতিভাত।

তার পরে কুষাণ যুগে কুষাণ রাজাগণ নিজেদের "দেবপুত্র" হিসেবে অভিহিত করতেন। অথাৎ এখানে সরাসরি রাজাগণ নিজেদের দেবতার পুত্র বা প্রতিনিধি রূপে প্রকাশ কবেছেন। আবার গুপ্ত যুগে আমরা দেখি যে তারা নিজেদের দেবতার সঙ্গে তুলনা করছেন অথবা তারা নিজেদের দেবতা নামেই অভিহিত করছেন। এখানে রাজার ওপর সরাসরি দেবত্ব আরোপ করা হচ্ছে।

দক্ষিণ ভারতে চোল রাজত্বের ইতহাসে তাদের বিভিন্ন সাহিত্যে মহাকাব্য প্রভৃতিতে প্রায়শঃই পাওয়া যায় "চোল রাজ রাজরাজ"র 'সঙ্গে ভগবান রামের এক তুলনা। প্রায়শঃই উল্লিখিত হয় যে লঙ্কা জয় করতে ভগবান রামকে বানর সেনাদের সাহায্য নিতে হয়েছিল। তারা সেতুবন্ধ করেছিল বা সমুদ্রের ওপর রাস্তা তৈরীতে সাহায্য করেছিল রামকে। কিন্তু চোল রাজা রাজরাজর নৌ শক্তি এতই অপরিমিত ছিল যে তা দিয়ে তিনি অনায়াসে লঙ্কার সাথে যোগাযোগ গড়ে তুলতে পারতেন। সুতরাং তিনি ভগবান রামের থেকেও ছিলেন আরো মহান ও প্রভূত শক্তিশালী।

এদিকে পূর্ব ভারতে উড়িষ্যাতে দশম শতকে গঙ্গ রাজবংশ রাজত্ব করতেন। তারা নিজেদের প্রভু জগন্নাথের ভৃত্য বলে অভিহিত করতেন। এবং তাঁরাই প্রজাসাধারণ ও দেবতার মধ্যে একমাত্র সংযোগ রক্ষাকারী হিসেবে চিহ্নিত হতেন।

এইভাবে দেখা যায় রাজার ওপর দেবত্ব আরোপের এক সুদীর্ঘ ইতিহাস। তার সঙ্গে আর একটি প্রথার জন্ম হয় তা হল কোন মন্দিরকে সেই নৃপতির নামে নামকরণ করা যিনি তা তৈরী করেছেন। যেমন সপ্তম-অষ্টম শতকে পল্লব রাজবংশের "নরসিংহ বর্মন" "ধর্মরাজ রথ"টি তৈরী করে ছিলেন যা পরে "রাজসিংহেশ্বরম" হিসেবে পরিচিত হয়। ক্রমশ এই ধারণার সৃষ্টি হয় রাজাই দেবতার প্রতিভূ। যদি তুমি দেবতাকে প্রত্যক্ষ করতে চাও তবে রাজ দর্শনই যথেষ্ট। ভগবানের প্রাথমিক প্রতিনিধি হচ্ছেন রাজা।

খ্রীঃ পূর্ব তিন শতক থেকে চর্তুদশ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনজন দেবতার স্থানের উত্থান পতন লক্ষ্য করা যায়। কখনো বিষ্ণু এবং শিব, কখনো বিষ্ণু এবং সূর্য, আবার কখনো সূর্য নারায়ণ-এর প্রকাশ ঘটেছে। সূর্য কখনোই প্রধান দেবতা ছিলেন না। তবে সূর্য, বিষ্ণু এবং নারায়ণ এদের মধ্যে কোথাও একটি মিল বা সংযোগ লক্ষ্য করা যায়। সূর্য বা বিষ্ণু জীবনের দেবতা, সমৃদ্ধি, আলো ও উত্তাপের দেবতা হিসেবে সরাসরি জীবনের সাথে যুক্ত। আলো বা উত্তাপ যেমন প্রাণী জগতের পক্ষে অনস্বীকার্য সত্য তেমনি সত্যরূপেই এই দুই দেবতা মানব জীবনের সাথে যুক্ত। সেই হেতু রাজগণ এই সব দেবতার উপাসক হিসেবে প্রজাকুলের কাছে জীবনদাতা বা সমৃদ্ধির উৎস হিসেবে চিহ্নিত হতেন। তাদের ওপর আরোপিত দেবত্ব তাদের করে তুলত মহান।

এই ধারণার শীর্ষ সময় ছিল একাদশ এবং দ্বাদশ শতাব্দী। তখন পশ্চিম ভারতে সোলাঙ্কি রাজবংশ, দক্ষিণে চোলগণ এবং পূর্বে বাংলার সেনদেব রাজত্ব কাল। এই রাজাগণের ওপর দেবত্ব আরোপের ধারণাটি আরো সমৃদ্ধ হয়ে উঠত, সভাকবি কর্তৃক লিখিত কাব্য-পদ্যসমূহে চারণকবিদের দ্বারা এবং বিভিন্ন বিশেষণ যুক্ত সুললিত ভাষায় উৎকীর্ণ সরকারী লিপিগুলিতে ও আত্মচরিত মূলক কাব্যরাশিতে।

এখন এই ধারণারই ফলশ্রুতি স্বরূপ উড়িষ্যার কোণার্ক মন্দিরটি নির্মিত কিনা তা আমাদের আলোচ্য বিষয়।

প্রাচীন নথিপত্র আমাদের বলে যে দক্ষিণ ভারতে কিছু কিছু মন্দির পাওয়া যায় যা রাজকীয় মন্দির (Royal temple) হিসেবে নির্দেশিত। এদের কোন পৌরাণিক বা লোককথার ইতিহাস পাওয়া যায় না। কোন এক নৃপতি তা তৈরী করেন, এবং সেই নৃপতির নামেই মন্দিরটির নামকরণ ঘটে। যেমন "তাঞ্জাভূর মন্দির" চোলরাজ রাজরাজ" কর্তৃক নির্মিত হয় 1010-1014 A.D.)।

"চোলরাজ রাজরাজ" কর্তৃক নির্মিত "গঙ্গৈইকোণ্ড. চোলপুরম্", "রাজাধিরাজ" এবং "দ্বিতীয় রাজেন্দ্র" কর্তৃক নির্মিত "দারাসুরম মন্দির" প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই মন্দিরগুলি নির্মিত হয়েছিল রাজার মহিমা প্রচার করার উদ্দেশ্যে। তাঁর কীর্তি, তাঁর যশ এবং মাহাত্ম্য প্রচারই ছিল উদ্দেশ্য। সেখানে দেবতার থেকে রাজাব মহিমা রাজমাহাত্ম্য হয়ে ওঠে অনেক বড়। সেই কারণে দেখা যায় কালের গর্ভে সেই সব মন্দির একদিন বিলীন হয়ে যায়। তার মাহাত্ম্য বজায় থাকত যতদিন সেই রাজার বাজত্ব বজায় থাকত। তারপর ক্রমশ লোকে ভুলে যেত। বা মন্দিরটি তার আকর্ষণী শক্তি হারাত। যার ফল স্বরূপ মন্দিরটি পরিত্যক্ত হতে হতে একদিন ধ্বংসপ্রাপ্ত হত। একই ঘটনা কোণার্কের ক্ষেত্রেও হয়েছে বলে আমাব অনুমান। এটি ছিল একটি Royal •temple যা সেই রাজার মহিমা প্রচারের জন্য বা তিনিই দেবতার প্রতিভূ এই ধারণা প্রচারে জন্য গগনচুম্বী আকৃতি নিযে গড়ে উঠেছিল এবং তা প্রজাসাধারণের কাছে গৃহীত হয়নি। ফল স্বরূপ পবিত্যক্ত মন্দিরটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

আবার নথিগত প্রমাণাদি এই সাক্ষ্য বহন করে যে আগে কোনার্ক ক্ষেত্রটিতে একটি বৌদ্ধ মন্দির ছিল। দশম শতকে "মায়া দেবীর" মন্দির। বৌদ্ধ ধর্ম তখন উডিষ্যাতে ক্রমশ তার গুরুত্ব হাবাচ্ছিল। অনুমান করা যেতে পারে গৌতমমাতা মায়াদেবীর নামে ছিল এই মন্দির। কারণ মায়াদেবী নামক কোন হিন্দু দেবীর অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। সুতরাং সহজ কল্পনা এই বলে যে কোণার্ক আগে বৌদ্ধ ধর্মস্থল ছিল যেখানে পরবর্তীকালে একটি সূর্যমন্দির স্থাপন করা হয়েছিল। পৌত্তলিকতা বিরোধী, বৌদ্ধ ধর্মের উড়িষ্যা থেকে সম্পূর্ণ রূপে অপসারণ এবং গ্রহাচার্য সূর্যের মন্দির নির্মাণের দ্বারা হিন্দু ধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করাই কি "রাজা ঃ রসিংহ দেবের" উদ্দেশ্য ছিল ?

যে কোন অজ্ঞাত কারণ তা যাই হোক, এই মন্দির নির্মাণের পিছনে, একথা অনস্বীকার্য যে কোণার্কের সপ্তাশ্বঃ-রথ বা সূর্য মন্দিরটি তার শিল্পকলা এবং স্বীয় মহিমায় ভারতবর্ষে এক উজ্জ্বল স্থান অধিকার করে আছে।

সাতবাহন যুগের কেশ-বিন্যাস রীতি

সুচরিতা মিত্র

ভারতবর্ষের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য আমাদের তদানীন্তন ভারতবর্ষের চলিষ্ণু জীবনের এক জীবন্ত সাক্ষ্য। সাতবাহন যুগে নির্মিত অমরাবতী ও নাগার্জুনকোণ্ডার ভাস্কর্য আমাদের দৈনন্দিন সামাজিক ইতিহাসের উপাদান যোগায়।

অমরাবতী ও নাগার্জুনকোণ্ডার বিভিন্ন ভাস্কর্যে স্ত্রী-পুরুষ উভযেরই কেশ বিন্যাসের এক বিচিত্র সম্ভার আমরা দেখতে পাই। স্পষ্টতই বোঝা যায যে অত্যন্ত দক্ষতা সহকারে পুরুষ এবং বিশেষত স্ত্রীরা কেশসজ্জা করতেন।

অমরাবতী ও নাগার্জুনকোণ্ডার ভাস্কর্যে প্রাপ্ত পুরুষ মূর্তিগুলির কেশরাজি কুঞ্চিত ও হ্রস্ব দৈর্ঘ্যের; এবং এমন ঢেউ খেলান যে মনে হয পরচুলা[১]। অনেক সময়ে কেশরাশি মাথার উপরে এক ধরনের চুড়ো করে বাঁধা হত। কিছুক্ষেত্রে শোভাবর্দ্ধনের জন্য ডিম্বাকার চুড়োর প্রচলন ও দেখা যায। এর নাম ছিল শিখণ্ড[২]। অনেক সময় কুঞ্চিত কেশ ঘাড় পর্যন্ত আলম্বিত থাকত[৩]। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে হেলেনেস্টিক গ্রীক ও রোমানদের মধ্যেই সাধারণত কোঁকড়ান চুল রাখার প্রচলন ছিল। এই ধরনের কেশসজ্জা সাতবাহন যুগে ও তারপরে ইক্ষাকু যুগেও প্রচলিত ছিল। তাই এর থেকে অনুমিত হয় যে রোমান প্রভাবেই এই কেশবিন্যাস রীতির উদ্ভব হয়েছিল। খ্রীষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয শতকে হাল-সংকলিত কোষগ্রন্থ গাথাসপ্তশতীতে-ও উল্লেখ আছে যে প্রবাসাগত প্রিযতমকে এক নারী পুনরায় প্রবাস যাত্রায় নিষেধ করছেন, কেন না পরিচর্যার অভাবে তার কোমল কুঞ্চিত কেশদাম শক্ত ও সরল হয়ে গিয়েছে[৪]। সাতবাহন যুগের ভাস্কররা তাঁদের কীর্তির মাধ্যমে কুঞ্চিত কেশদামকে অবিস্মরণীয় করে রেখে গেছেন।

অমরাবতীর ভাস্কর্যে আরেক ধরনের কেশবিন্যাস দেখা যায় যেখানে কোঁকড়ান চুল মাথার উপরে অর্দ্ধচক্রাকারে ছড়িয়ে রয়েছে[৫]। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে 'গাথাসপ্তশতী'তেও এই ধরনের কেশসজ্জার উল্লেখ আমরা পাই[৬]। পুরুষদের আরেক ধরনের কেশ বিন্যাসে আমরা দেখি যে সীমন্তবিহীন কেশ উল্টিয়ে আঁচড়ানো এবং পিছনের দিকে ফিতে দিয়ে বাঁধা[৭]।

অমরাবতী ও নাগার্জুনকোণ্ডার ভাস্কর্যে বৌদ্ধভিক্ষুর মুণ্ডিত মস্তক চিত্রও পাওয়া যায়। নাগার্জুন কোণ্ডায় এক পরিচারকের চিত্র আমরা পাই যার তিনটি স্তবকে বিভক্ত কেশরাশি একটি শঙ্কু আকৃতির বিন্যাসে শেষ হয়েছে[৮]।

মহিলাদের. কেশ সজ্জার রীতি প্রসঙ্গে একটি বিশেষ ধরনের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে চুল পিছনদিকে আঁচড়ে টেনে গ্রীবাদেশে খোঁপা করা হয়েছে[৯]। কেশ পরিপাটি করে রাখার জন্য একটি ফিতাও ব্যবহার করা হয়েছে। আরেকটি ক্ষেত্রে সিঁথি ছাড়াই কেশ দৃঢ়ভাবে বদ্ধ করে একটি খোঁপা করা হয়েছে[১০]। আরেকটি চিত্রে খোঁপাটি বাঁ দিকে আলম্বিত হযে পড়েছে[১১]। অনুমান করে নিতে অসুবিধা নেই কেশ চর্চায় খোঁপার প্রচলন ঘটেছিল বিদেশী প্রভাবে[১২]।

অমরাবতীর ভাস্কর্যে আরেক ধরনের কেশ বিন্যাসে আমরা দেখি যে কেশরাজি আঁচড়িয়ে একটি আলগা ফাঁসের মতো গ্রন্থিতে পরিণত হয়েছে[১৩]। আরেকটি চিত্রে পিছনের দিকে চুল আঁচড়িয়ে একটি ফাঁসে পরিণত করা হয়েছে এবং প্রান্তভাগে একটি শিথিল গ্রন্থি করা হয়েছে। কপালের সামনের দিকে টিক্‌লী ব্যবহার করা হয়েছে[১৪]। নাগার্জুনকোণ্ডার ভাস্কর্যেও আমরা এই ধরনের কেশবিন্যাস রীতি দেখতে পাই[১৫]। কিন্তু আরেকটি চিত্রে কেশরাজি পিছনের দিকে শিথিল ভাবে কয়েকটি স্তবকে বিন্যস্ত করা হযেছে; অবশিষ্টাংশ ঘাড়ের কাছে আলম্বিত[১৬]। আরেকটি ক্ষেত্রে দেখা যায় একটি গোলাকার খোঁপার তলদেশে কেশদাম একটি লম্বাকৃতি ফাঁসের সৃষ্টি করেছে। কেশগুচ্ছের অপরপ্রান্তটি কপালের উপরে ও সীমন্তদেশে বিনুনি করে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে[১৭]। নাগার্জুনকোণ্ডাতে ও আমরা অনুরূপ উদাহরণ পেয়েছি।

অমরাবতীর আরেকটি বিশিষ্ট কেশবিন্যাস রীতি হল প্রলম্বিত বেণী, যার শেষাংশ গুচ্ছাকৃতি। গুচ্ছটি অলঙ্কারে সুশোভিত[১৮]। আরেকটি চিত্রেও আমরা দুইটি বিনুনি দেখতে পাই কিন্তু এর প্রান্তভাগ আগের মতো গুচ্ছাকৃতি নয়[১৯]। এই ধরনের পিঠের উপর আলম্বিত কেশসজ্জার নাম 'প্রবেণী রীতি'। এই ধরনের বিন্যাস নাগার্জুনকোণ্ডাতেও বর্তমান।

আরেক ধরনের কেশ সজ্জায় দেখা যায় বিনুনি করা অথবা উন্মুক্ত কেশ সীমন্তরেখার শেষ প্রান্ত থেকে পিছনের দিকে ছড়িয়ে পড়েছে[২০]। বর্তমান মহিলাদের মধ্যেও এই ধরনের অশ্বপুচ্ছাকৃতি ঝুঁটি ব্যবহারে প্রচলন আছে। নাগার্জুনকোণ্ডার ভাস্কর্যেও আমরা এই ধরনের নমুনা দেখতে পাই।

অমরাবতীর ভাস্কর্যে আমরা দেখি যে পিছন দিকে কেশ টান করে বেঁধে প্রান্তভাগ বল্লরী করা হত এবং কাঁধের দুই পার্শ্বে অল্প কিছু কেশ অনাবদ্ধ থাকত।

শিখণ্ড ধরনের কেশসজ্জা অমরাবতী ও নাগার্জুনকোণ্ডায় দেখা যায়। অমরাবতীতে অনেক সময় খোঁপায় পুষ্পমাল্যও শোভা পেত।

অমরাবতীর ভাস্করেবা 'ধমিল্ল' প্রণালীর কেশবিন্যাস তাঁদেব ভাস্কর্যে চিরস্মরণীয় করে রেখে গেছেন[২১]। সাতবাহন যুগে এই ধরনের কেশসজ্জা অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। 'গাথাসপ্তশতী' অনুসারে এই ধরনের কেশ সজ্জা প্রেমিকের হৃদয়ে প্রেম সঞ্চার করতো[২২]।

সাতবাহন যুগের কেশবিন্যাস পদ্ধতি সম্পর্কে স্বল্প তথ্যই পাওয়া যায়। সেই জন্য অমরাবতী ও নাগার্জুনকোণ্ডার ভাস্কর্য থেকেই যথাসম্ভব তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। সমকালীন সাহিত্য 'গাথাসপ্তশতী' থেকে সংগ্রহীত তথ্যও পুরাতাত্ত্বিক সাক্ষ্যের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। সমকালীন ভাবতীয় ভাস্কর্যে কেশবিন্যাসের যে বৈচিত্র্য নিবদ্ধ রয়েছে তা আমাদেব সামাজিক ইতিহাসের একটি দিকে আলোকপাত করে। ফলে জনজীবনেব দৈনন্দিন জীবনচর্যার দলিল হিসাবে এই কেশ বিন্যাস বীতি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

সূত্র নির্দেশ

১. ডগলাস ব্যাবেট: স্কাল্পচার্স্ ফ্রম অমবাবতী ইন দ্য ব্রিটিশ মিউজিয়াম, ২৯ নং চিত্র
২. তদেব, ৩৫ নং চিত্র
৩. তদেব, ৩৫ নং চিত্র
৪. গাথাসপ্তশতী, বাধাগোবিন্দ বসাক, ১৯৭১, কলকাতা, পৃঃ ৬১
৫. ব্যাবেট, পূর্বোদ্ধৃত, ৩৫ নং চিত্র
৬. গাথাসপ্তশতী, পূর্বোদ্ধৃত, পৃঃ ১২৬
৭. সি. শিববামমূর্থি, অমবাবতী স্কাল্পচার্স ইন দ্য মাড্রাস গভর্ণমেন্ট মিউজিয়াম, ৯ নং চিত্র
৮. লঙ্হার্ষ্ট, দ্য বুদ্ধিস্ট এ্যান্টিকুইটিস অভ্ নাগার্জুনকোণ্ডা, মাড্রাস প্রেসিডেন্সি, ভাবতীয় পুবাতাত্ত্বিক সংবক্ষণ, মেমোয়ার্স, নং ৫৪, ১১(ক) নং চিত্র
৯. শিববামমূর্থি, পূর্বোদ্ধৃত, ৬নং চিত্র
১০. ব্যারেট, পূর্বোদ্ধৃত, ৩২ নং চিত্র
১১. তদেব, ৩৬ নং চিত্র
১২. অস্কাব সের্ফার্ট্: ডিকসনারি অব্ ক্লাসিকাল এ্যান্টিক্যুইটিস্ (লণ্ডন), ১৯৫৭, পৃঃ ২৬৭
১৩. ব্যাবেট পূর্বোদ্ধৃত ৩৪ নং চিত্র
১৪. তদেব, ৩৬নং চিত্র
১৫. কে, কৃষ্ণমূর্থি, নাগার্জুনকোণ্ডা-এ কালচারাল স্টাডি, দিল্লি, ১৯৭৭, পৃঃ ৬২.
১৬. ব্যাবেট, পূর্বোদ্ধৃত, ৭ নং চিত্র
১৭. তদেব, ৩৬ নং চিত্র
১৮. তদেব, ২৭ নং চিত্র
১৯. তদেব, ৩৬ নং চিত্র
২০. তদেব, ১১ নং চিত্র
২১. শিবরামমূর্থি পূর্বোদ্ধৃত, ৮ নং চিত্র
২২. গাথাসপ্তশতী, পূর্বোদ্ধৃত, পৃঃ ৬৪

PLATE-I



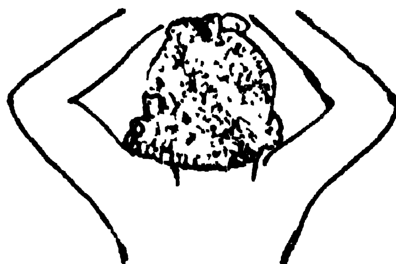
6



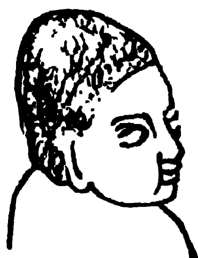
4



3



5



1

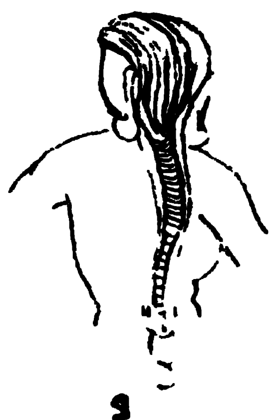


7



2

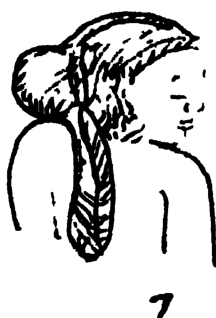
PLATE—II



9



1



7



3



10

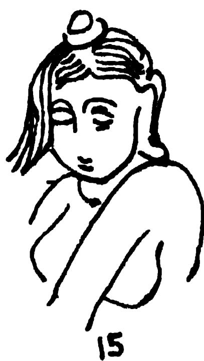


16

PLATE–III



4



15



6



5



14



17



‘কোষার’ — প্রসঙ্গে

অমর্ত্য ঘোষ

সঙ্গম সাহিত্যে যেসব জনগোষ্ঠীর উল্লেখ আছে, কোষার তাদের অন্যতম। ‘কোষার’ শব্দটি বহুবচন, একবচনে এটি হবে ‘কোষাণ’। সঙ্গম সাহিত্যে অবশ্য ‘কোষার’ শব্দটিই ব্যবহৃত।

এদের সম্পর্কে সঙ্গম-সাহিত্যে যে ধবনের বর্ণনা রয়েছে, তা থেকে এদের গোষ্ঠীগত পেশা, রীতি-নীতি, ইত্যাদি সম্পর্কে একটা ধারণা করা যায়। যেমন, এরা দক্ষ ধনুর্ধর[১]। এটা কেবল তাদেব পেশাই নয, অবসর বিনোদনের উপায়ও বটে: দলবদ্ধভাবে তারা লক্ষ্যভেদেব প্রতিযোগিতা করতো[২]। রথ-চালনাতেও তারা দক্ষ[৩]। যুদ্ধে তাদের বীবত্ব বারংবার প্রশংসিত[৪]। তারা সম্ভবত একটি সমধর্মী গোষ্ঠী (হোমোজিনিয়াস গ্রুপ), কারণ অহনানুরু-তে[৫] তাদের গোষ্ঠীবদ্ধতার কথা পাই এবং কুরুন্টোগাই[৬] থেকে জানা যায় যে কোন বিষয়ে বিচার বা পরামর্শর জন্য তারা সকলে মিলে সভার আয়োজন করতো। তাদের একটি প্রথা ছিল— যুদ্ধে আঘাতপ্রাপ্তি-জনিত শারীরিক ক্ষতগুলি তারা বীরত্বের স্মারক বলে গণ্য করতো[৭]। এই বিবরণগুলি থেকে এ ধারণা করা যায় যে ‘কোষাণ’-রা পেশাদারী যোদ্ধা[৮]। সঙ্গম সাহিত্যে তাদের বাসভূমির প্রসঙ্গে তুলুনাড়ু,[৯] চেল্লুর, পাণ্ড্যরাজ্য[১১] এবং কোঙ্গুদেশের[১২] নাম রয়েছে। সম্ভবত তারা একটি ভ্রাম্যমান জনগোষ্ঠী। অহনানুরুতে[১৩] তাদের ‘ভাডুগা’-দের সঙ্গে সনাক্ত করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, ‘ভাডুগা’ শব্দটি এসেছে তামিল ‘ভাড’ থেকে যার অর্থ উত্তর-দিক। সেক্ষেত্রে ‘কোষাণ’দের উত্তরদেশাগত বলে ধরতে হবে। অর্থাৎ, তারা সম্ভবত তামিলভূমির আদি বাসিন্দা নয়, একটি পরিযায়ী গোষ্ঠী, উত্তরের কোন দেশ থেকে তামিলদেশে যাদের প্রবেশ ঘটেছিল।

ঐতিহাসিকদের একাংশের[১৪] মতে ‘কোষাণ’-রা জাতিগতভাবে বিদেশী। এই ধারনার পক্ষে একটি যুক্তি দেওয়া যায়। তাদের রীতি-নীতি, যেমন-তীরন্দাজির প্রতিযোগিতা, রথ-চালনা (যা সম্ভবত তামিলভূমির নিজস্ব নয়),[১৫] সর্বোপরি, অস্ত্রাঘাতের ক্ষত স্মারকচিহ্নের মতো ব্যবহারের প্রবণতা— এই অভ্যাসটি অঙ্গুলি নির্দেশ করে উত্তর-পশ্চিম ভারত তথা মধ্য-এশিয়ার দিকে।

‘কোষাণ’-রা কি কুষাণদের এক শাখা? অন্যভাবে বলতে গেলে, ‘কুষাণ’ শব্দটি কি তামিলে ‘কোষাণ’ হয়েছে? এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারেন কোন ভাষাতত্ত্ববিদ অথবা কুষাণ সম্পর্কে কোন বিশেষজ্ঞ। প্রবন্ধকার কোন

দলেই পড়ছে না। তাই আপাতত এটুকু বলা যাক যে 'কোষাণ'রা সম্ভবত একটি পরিযায়ী গোষ্ঠী, যাদের আদি বাসভূমি মধ্য-এশিয়া থেকে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত কোন স্থানে এবং পরবর্তীকালে যারা তামিলভূমিতে প্রবেশ করে এবং পেশাদারী যোদ্ধার জীবিকাটি বজায় রাখে।

আর যদিইবা তারা কুষাণদের একটি শাখাই হয়, তাতে আপত্তি কি ? ইতিহাসের গতি আমাদের মনে বদ্ধমূল কোন ধারণার ওপর নির্ভর করেনা। উদাহরণ হিসাবে বলতে পারি, পূর্ব ভারতে খরোষ্ঠী লিপির অস্তিত্বের তত্ত্ব আজ থেকে দশবছর আগেও গ্রাহ্য হতো না। আজ তা সংশয়াতীত রূপে প্রমাণিত[১৬]। হয় তো সেভাবেই আগামীদিনে 'কোষার' প্রসঙ্গে নতুনভাবে আলোকপাত হবে। আজ যা অপরিজ্ঞাত, কাল তার পক্ষে সত্যের স্বীকৃতি পেতে বাধা নেই। কারণ, ইতিহাস-চর্চার ক্ষেত্রে শেষকথা বলার সময় কখনও আসেনা।

সূত্র নির্দেশ

১। অহ্নানুরু, ৯০ এবং ১১৩।
২। পুবনানুরু, ১৬৯।
৩। অহ্নানুরু, ২৫১।
৪। মাদুবাইক্কাঞ্জি, ৭৭২-৭৩; অহ্নানুরু, ৯০ এবং ১১৩।
৫। ১৯৬।
৬। ১৫।
৭। অহ্নানুরু, ৯০।
৮। এম.এ.ডোবাইবঙ্গস্বামী — 'দা সাবনেম্স্ অভ্ দ্য সঙ্গম এজ্: লিটাবারি অ্যাণ্ড ক্লাসিকাল', মাদ্রাজ, ১৯৬৮, পৃঃ ১৩২।
৯। অহ্নানুরু, ১৫।
১০। ঐ, ৯০।
১১। ডোরাইরঙ্গস্বামী, পৃঃ ১৩৪।
১২। পূর্বোক্ত।
১৩। ২৫১ এবং ২৮১।
১৪। ডোরাইরঙ্গস্বামী, পৃঃ ১৩৩।
১৫। রথ (তামিলে 'তের') ব্যাপারটাই যে তামিলভূমিতে অজানা ছিল, তা নয়। কিন্তু যুদ্ধে রথের ব্যবহাব সম্ভবত কোষাণরাই সেখানে শুরু করে। অহ্নানুরুতে (২৫১ এবং ২৮১) মোহুব নামধারী এক (দেশজ) জনগোষ্ঠীর সঙ্গে কোষাণদের যুদ্ধের বিবরণ আছে। সেখানে বথের উল্লেখ কেবলমাত্র কোষাণদের প্রসঙ্গেই: মোহুরদের বেলায় হিরণ্ময় নৈঃশব্দ।
১৬। ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়— "খরোষ্ঠী অ্যাণ্ড খরোষ্ঠী—ব্রাহ্মী ইন্স্ক্রিপ্সান্স ইন্ ওয়েস্টবেঙ্গল (ইণ্ডিয়া)", 'ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম বুলেটিন', ২৫ (১৯৯০) কলকাতা।

আদি মধ্যকালীন বাংলায় নল দ্বারা জমি মাপের ব্যবস্থা

রীতা ঘোষ রায়

প্রাচীন ভারতীয় অর্থনীতি মূলত কৃষিভিত্তিক। স্বাভাবিকভাবেই কৃষি সংক্রান্ত বিষয়টি ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি বারংবার আকর্ষণ করেছে এবং এই বিষয়টিকে তারা বিভিন্নভাবে এবং বিভিন্ন দিক থেকে পর্যালোচনা করেছেন। কৃষি অর্থনীতির এক মুখ্য বিষয় হল ভূমি পরিমাপ ব্যবস্থা। নল শব্দটির অর্থ একটি মাপক দণ্ড[১] যা জমির রৈখিক মাপ নেওয়ার একক হিসেবেই ব্যবহৃত।

আদি মধ্যযুগে (আঃ ৬০০—১২০০ খ্রীঃ) নল দ্বারা জমি মাপেব বিষযটি এই প্রবন্ধের মুখ্য উপজীব্য। আদি মধ্যকালীন অর্থনৈতিক জীবনযাত্রা বুঝবাব পক্ষে সবচেয়ে অপবিহার্য ও সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান লেখমালা তাম্রশাসন।।

রৈখিক মাপের জন্য নলের ব্যবহার গুপ্তকালীন পুণ্ড্রবর্ধনে পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকের শুরু হয়। গুপ্তসাম্রাজ্যের বাংলায় আধিপত্য শেষ হবার অব্যবহিত পরই বঙ্গ অঞ্চলে ধর্মাদিত্য, সমাচারদেব ও গোপচন্দ্র নামে যে তিন স্বাধীন রাজা রাজত্ব করতেন, তাদের লেখমালায নল দ্বারা জমি মাপের উল্লেখ সহজেই নজরে পড়ে। এর পরে দীর্ঘদিন নলের উল্লেখ লেখমালায অনুপস্থিত থাকলেও সেন আমলের লেখমালায় এই নলের দ্বারা জমি মাপের ব্যবস্থা পুনঃ প্রবর্তিত হয়।

নলের ব্যবহার সম্পর্কে নিশ্চিত উল্লেখ পাওয়া যায় সেন রাজা বিজযসেনেব (১০৯৫—১১৬৯ খ্রীঃ) ব্যারাকপুর তাম্রশাসন থেকে। ব্যারাকপুর তাম্রশাসন অনুযাযী পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তবর্তী খাড়ি বিষয়ের (পূর্ব খাটিকা) অন্তর্গত খাসসম্ভোগ-ভট্টবড়া গ্রামে চার পাটক জমি একটি ব্রাহ্মণের উদ্দেশে দান করা হয়। সমতটের নল দ্বারা পরিমিত প্রদত্ত জমিটি থেকে বাৎসরিক আয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় দুশো কপর্দক পুরাণ।

বল্লালসেনের (১১৫৯—১১৭৯ খ্রীঃ) নৈহাটী তাম্রশাসন[৩] থেকে জানা যায় যে বর্ধমান ভুক্তির অন্তর্গত বল্লহিট্ঠা গ্রামে সাত ভূপাটক, নয় দ্রোণবাপ, চৌত্রিশ উন্মান এবং তিন কাক মাপের একটি ভূখণ্ড একটি ব্রাহ্মণকে প্রদান করা

হয়। প্রদত্ত ভূখণ্ডটির বৃষভশঙ্কর নলের দ্বারা পরিমাপ করা হয় এবং এই ভূখণ্ড থেকে আয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় পাঁচশত কপর্দ্দক পুরাণ। বৃষভশঙ্কর বল্লালসেনের একটি বহুল প্রচারিত উপাধি হওয়ায়, বৃষভশঙ্কর নল রাজনামাঙ্কিত এক বিশেষ ধরনের মাপ ব্যবস্থা হিসেবে চিহ্নিত হয়।

লক্ষ্মণসেনের (১১৭৯–১২০৫ খ্রীঃ) গোবিন্দপুর তাম্রশাসনে[৪] ছাপান্ন হস্তের একটি নল দ্বারা জমি পবিমাপের উল্লেখ পাওয়া যায়। উল্লিখিত তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে তিনি সতেরো উন্মান ও ষাট ভূদ্রোণ পরিমাপক একটি ভূখণ্ড এক ব্রাহ্মণের উদ্দেশে প্রদান করেন। প্রদত্ত ভূখণ্ডটির অবস্থান ছিল বর্ধমান ভুক্তির অন্তর্গত বিড্ডার শাসন গ্রামে। এই জমিটি থেকে বার্ষিক উদ্ভূত আয়ের পরিমাণ প্রতি দ্রোণের হিসেবে ১৫ পুরাণ অর্থাৎ (৬০ X ১৫) = ৯০০ কপর্দ্দক পুরাণ।

লক্ষ্মণ সেনের তর্পণদীঘি তাম্রশাসন[৫] (১১৮০ খ্রীঃ), নলের দ্বারা পরিমিত জমি দানের সাক্ষ্য বহন কবে। উল্লিখিত তাম্রশাসনে ভূখণ্ডের পরিমাণ পাঁচ উন্মান, একশোকুড়ি আঢ়বাপ যা পুণ্ডবর্ধনভুক্তির অন্তবর্তী বরেন্দ্রীর অন্তর্গত বেলহিষ্টি গ্রামে অবস্থিত। প্রদত্ত এলাকা থেকে বাৎসরিক আয়ের পরিমাণ ছিল একশত পঞ্চাশ কপর্দ্দক পুরাণ।

লক্ষ্মণসেনের আনুলিযা তাম্রশাসন[৬] থেকে আমরা জানতে পারি যে তিনি সাত ভূপাটক, নয় দ্রোণবাপ, এক আঢ়বাপ, সাইত্রিশ উন্মান, এক কাকনিক পরিমাপক একটি ভূখণ্ড এক ব্রাহ্মণের উদ্দেশে প্রদান করেন। প্রদত্ত ভূখণ্ডটির অবস্থান ছিল পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তবর্তী ব্যাঘ্রতটী মণ্ডলের শাসনাধীন মাথরণ্ডিয়া নামক একটি গ্রামে। এই ভূখণ্ডটি বৃষভশঙ্কর নল দ্বারা পরিমিত এবং এর থেকে বাৎসরিক আয় একশত কপর্দ্দক পুরাণ।

সেন রাজাদের লেখমালায জমি মাপের বিভিন্ন ধরনের প্রকার ভেদের উল্লেখ আছে। সমতটীয় নল দ্বারা জমি মাপের পদ্ধতিটি প্রাথমিকভাবে সমতট এলাকায় প্রচলিত ছিল। তবে বিজয়সেনের ব্যারাকপুর তাম্রশাসন থেকে আমরা জানতে পারি যে জমি মাপের ব্যবস্থা হিসেবে সমতটীয় নল তার ভৌগোলিক সীমানা অতিক্রম করে অন্যান্য এলাকা বিশেষত পূর্বখাটিকা পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। নৈহাটী তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে বৃষভশঙ্কর নল দ্বারা জমি মাপার পদ্ধতিটি বল্লালসেনের আমলে প্রচলিত ছিল। অবশ্য অন্যান্য কয়েকটি জমিদানের ঘটনায় জমি পরিমাপের মানদণ্ড হিসেবে কোন বিশেষ পদ্ধতির উল্লেখ না থাকলেও আমরা অনুমান করতে পারি যে নল দ্বারা জমি মাপের পদ্ধতিটি এক একটি বিশেষ এলাকার জমি মাপের এককের উপর ভিত্তি করে পরিচিতি লাভ করে।

অবশ্য জমি মাপের একক হিসেবে একটি অনুমোদিত আদর্শ হস্ত অথবা এক হস্ত পরিমিত মাপকেই ব্যবহার করা হত। বিনয়চন্দ্র সেনের মতে, বৃষভশঙ্কর নল নামটি থেকেই দেখা যায় যে রাজা বল্লালসেনের হাতকেই জমি মাপের একক হিসেবে মানদণ্ড করা হয়েছিল। অন্যথায় যেখানে এই ধরনের কোন নিশ্চিত উল্লেখ পাওয়া যায় না সেখানে অনুমান করতে পারি যে কোন বিশেষ স্থায়ী মানদণ্ডের ব্যবহার করা হয়েছে।[৭]

নল দ্বারা জমি পরিমাপের ব্যবস্থা আদিমধ্যকালীন বাংলার বিভিন্ন এলাকায় প্রচলিত ছিল যেমন পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তর্গত বরেন্দ্র। ব্যাঘ্রতটীমণ্ডল এবং বর্ধমান ভুক্তির বিভিন্ন এলাকায়। এই জমি মাপের ব্যবস্থাটি নিশ্চিত ভাবে বঙ্গ অঞ্চলে প্রচলিত ছিল কারণ সেন রাজাদের অধিকাংশ তাম্রশাসনই বিক্রমপুর অঞ্চল থেকে প্রবর্তিত হয়েছিল। তাই নল দ্বারা জমি মাপের পদ্ধতিটি সেন রাজাদের আমলে শুধুমাত্র বাংলার কোন একটি বিশেষ এলাকায় সীমাবদ্ধ না থেকে সরকারীভাবে সেনরাজ্যের বেশীরভাগ অঞ্চলে প্রচলিত ছিল।

মনে রাখার মত বিষয় হল যে বৃষভশঙ্কর নল ব্যবস্থা যা প্রথম বল্লালসেনের আমলে বর্ধমানভুক্তিতে পরিচিতি লাভ করে কালক্রমে তা পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তিতে বিস্তৃতি লাভ করে। এখন প্রশ্ন হল এই যে বৃষভশঙ্কর নলের দ্বারা পরিমাপের ব্যবস্থা সামগ্রিকভাবে জমি পরিমাপের ব্যবস্থার উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণের ইঙ্গিত বহন করে কিনা, অর্থাৎ শাসনাধীন রাজার নামাঙ্কিত কোন পরিমাপ ব্যবস্থা আদর্শ পরিমাপ ব্যবস্থার ইঙ্গিত বহন করে কিনা যা অন্যথায় আঞ্চলিকভাবে পরিবর্তনশীল ছিল। যদি তা হয়, তাহলে কি এই আদর্শ পরিমাপক ব্যবস্থার উপর রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ইঙ্গিতবাহী যা পরবর্তীকালে রাজস্ব নির্ণয়ে সহায়ক হয়েছিল।

উপরিউক্ত আলোচনা যুক্তিসঙ্গতভাবে ইঙ্গিত করে যে সেনরাজারা তাঁদের রাজত্বকালে সামগ্রিকভাবে জমি-পরিমাপ ব্যবস্থার কিছু সংগতি আনার প্রয়াস করেছিলেন। তবে একথা অনস্বীকার্য যে আদি মধ্যযুগীয় বাংলার বিভিন্ন এলাকায় নলের মান বিভিন্নরূপ ছিল। জমি পরিমাপের এই ব্যবস্থার অন্য একটি বৈশিষ্ট্য হল যে সেনদের আমলে প্রদত্ত জমি থেকে ধার্য রাজস্বের মূল্যের পরিমাণ নির্দ্ধারণের সঙ্গে এই ব্যবস্থার যোগ ছিল। উপরিউক্ত আলোচনার মাধ্যমে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে সেন রাজারা তাদের বাৎসরিক রাজস্ব নির্ণয়ের প্রসঙ্গে রাজস্ব উৎপাদনকারী জমিগুলিকে চিহ্নিত করতে এক সচেতন প্রয়াস চালিয়েছিলেন। 'সামবাৎসরিক হিরণ্য' শব্দটির নিয়মিত উল্লেখ থেকে বোঝা যায় যে রাজস্বের অন্তত কিছু অংশ নগদ টাকায় সংগ্রহ করা হত। নগদ মুদ্রায় প্রদত্ত এই কর ধাতুনির্মিত বিনিময় মাধ্যম অথবা কড়ির মাধ্যমে

.দেয ছিল। জমি থেকে রাজস্ব নির্দ্ধাবণ এবং এই রাজস্বের কিছু অংশ নগদ মুদ্রায সংগ্রহ কবাব প্রচেষ্টা সম্ভব হযেছিল সেন রাজাদের দ্বারা জমি মাপের নির্দিষ্ট নীতি ও পদ্ধতি নেওযার ফলে।

সূত্র নির্দেশ

১. দীনেশচন্দ্র সবকাব, ইণ্ডিয়ান এপিগ্রাফিকাল গ্লসাবি, কলকাতা, ১৯৬৬, পৃঃ ২১০
২. ননীগোপাল মজুমদাব, দ্য ব্যাবাকপুব কপাব প্লেট অব বিজয়সেন, ইনস্ক্রিপসনস্ অব বেঙ্গল,৩, কলকাতা, ১৯৪২, পৃঃ ৫১৯-২০
৩. ননীগোপাল মজুমদাব, 'দ্য নৈহাটী কপাব প্লেট অব বল্লালসেন', পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৮-৮০
৪. ননীগোপাল মজুমদাব, 'দ্য গোবিন্দপুব কপাব প্লেট অব লক্ষ্মণসেন', পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯২-৯৪
৫. ননীগোপাল মজুমদাব, 'দ্য তর্পণদীঘি কপাব প্লেট অব লক্ষ্মণসেন' পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯৯-১০৫
৬. ননীগোপাল মজুমদাব, 'দ্য আনুলিয়া কপাব প্লেট অব লক্ষ্মণসেন' পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮১-৯১
৭. বিনযচন্দ্র সেন, সাম হিস্টবিকাল আসপেকটস অব দ্য ইনস্ক্রিপসনস্ অব বেঙ্গল, কলকাতা, ১৯৪২, পৃঃ ৫১৯-২০

প্রাচীন উত্তর-পশ্চিম ভারতে পুঁথি পূজা

সরিতা ক্ষেত্রী

পূজা ধর্মাচরণের এক প্রধান লৌকিক অঙ্গ। অনেক ধর্ম বিশ্বাসে এই পূজা অর্পণ করা হয় নির্দিষ্ট দেব-দেবীর এবং মহাপুরুষের মূর্তিতে। বৌদ্ধ ধর্মেও বুদ্ধ ও পবে নানা দেব-দেবীর মূর্তি পূজাব প্রচলন হযেছিল খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের মধ্যে। সাধারণতঃ দেব-দেবীই পূজাব মূল উদ্দিষ্ট হলেও কোথাও-কোথাও ঐ সমস্ত দেবদেবীর বা ধর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত কোনো বস্তুকে স্মারক হিসাবে পূজা করা হত। এখানে আমবা বৃক্ষ পূজাব উল্লেখ করতে পারি। এই প্রবন্ধটিতে বৌদ্ধ ধর্মে অনুরূপ একটি প্রবণতাই আলোচ্য বিষয। সাধাবণত পুঁথি অর্থাৎ কোন বইযের প্রাথমিক বা প্রারম্ভিক পাণ্ডুলিপি পড়বাব জন্য লেখা, বইটি পূজা করবার জন্য নয়। কিঁন্তু বৌদ্ধ সমাজে বিশেষত মহাযানীদেব মধ্যে প্রাচীনকাল থেকে খুব পবিত্র ধর্মীয গ্রন্থেব পূজার ইঙ্গিত পাওযা যায় বিভিন্ন সূত্রে। ১৯৩৮ সালে এম,এস, কৌল শাস্ত্রীর[1] নেতৃত্বে ভারতীয় উপমহাদেশেব উত্তর-পশ্চিমে কাশ্মীরের অন্তর্গত গিলগিট (এখন পাকিস্তানে অবস্থিত) থেকে ৩ মাইল দুরে নবপুর বা নৌপুরে খননের কাজ আরম্ভ হয। এই খননের ফলস্বরূপ নবপুর অঞ্চলে তিনটি স্তূপ পাওয়া গেছে। একটি স্তূপের মধ্যে পাওযা কাঠের বাক্সের মধ্যে রাখা বহু প্রাচীন পুঁথি এবং অন্যান্য সামগ্রী যেমন বহু ছোট আকারের স্তূপ, ফলক প্রভৃতি পাওয়া গেছে। পুঁথিগুলির মধ্যে চারটি সম্পূর্ণ পুঁথি রয়েছে যথা (১) ভৈষজ্যগুরু সূত্র (২) একাদশমুখম্ (৩) হযগ্রীববিদ্যা এবং (৪) সর্বতথাগতাধিষ্ঠান = সত্ত্বাবলোকন = বুদ্ধ = ক্ষেত্র = সন্দর্শন = ব্যূহম্[2] এবং বাকি গুলির অবস্থা অত্যন্ত জীর্ণ। লিপিতাত্ত্বিক সমীক্ষার ভিত্তিতে অধ্যাপক ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়[3] প্রমাণ করেছেন যে এই পুঁথিগুলির আনুমানিক সময়সীমা খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শতকের মধ্যে। বেশীরভাগ পুঁথিগুলি ভূর্জ পত্রের উপরে লেখা।

বর্তমান প্রবন্ধে এই পুঁথিগুলি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আমরা জানি সাধারণত পুঁথিগুলি পড়বার জন্যই লেখা হত এবং জীর্ণ হয়ে গেলে ফেলে দেওয়া হত। কিন্তু মহাযানী বৌদ্ধরা পুঁথিগুলিকে ধর্মীয় গ্রন্থ হিসেবেও ব্যবহার করতেন। তাঁরা এই জাতীয় পবিত্র গ্রন্থকে ধর্মরত্ন, ভট্টারিকা এবং ভগবতী ইত্যাদি বলতেন। স্তূপের মধ্যে পুঁথিগুলির অবস্থান দেখে আমরা অনুমান করতে পারি যে পূজনীয় বস্তু হিসেবেই সেগুলি ব্যবহৃত হত। পুঁথিকে (ধর্মীয় গ্রন্থ) পূজা করা তাঁরা

পুণ্য কর্ম বলে মনে করতেন। এইসব ধর্মীয় পুঁথিগুলির দান পুণ্য অর্জনকারী ধর্মদেয় বা ধর্মীয় দান বলে মনে করা হত। তাই জীর্ণ পুঁথিগুলি ফেলে না দিয়ে পবিত্র ধর্মীয় স্মারক মনে করে স্তূপের মধ্যে রেখে দেওয়ার প্রথাও ছিল। এর স্পষ্ট প্রমাণ হচ্ছে নবপুরের স্তূপ থেকে প্রাপ্ত পুঁথিগুলি। এই প্রসঙ্গে মধ্য এশীয় সংগ্রহশালায় রক্ষিত মহাযান শাখার সংঘাত সূত্র নামক পুঁথিটির উল্লেখ করতে পারি। গ্রন্থটিতে বৌদ্ধমতবাদ গ্রহণের প্রশস্তি এবং মহাযান শাখার গ্রন্থের শ্রবণ, আবৃত্তি, পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন এবং তার সংরক্ষণের গুণকীর্তন করা হয়েছে। মধ্যএশীয় এবং চীনের বহু বৌদ্ধ স্তূপে এই রকম পুঁথি সংরক্ষণ করে পূজার প্রচলনও আমরা লক্ষ্য করতে পারি[৪]। এম, এস, স্টেইন কর্তৃক আবিষ্কৃত তুংহুয়াং বা দুংহুয়াং এ চিনাংশুক বস্ত্রের উপর চিত্রের মাধ্যমে পুঁথি পূজার প্রমাণ পাই।[৫]

উপরিউক্ত প্রমাণ থেকে এটা বোঝা যাচ্ছে যে খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শতক নাগাদ মহাযানীদের মধ্যে পুঁথি বা বই (ধর্মীয় গ্রন্থ) পূজার প্রচলন ছিল। এই বই আবার যদি কোন দেব বা দেবী সংক্রান্ত হত তাহলে বইটিকেই দেব বা দেবী মনে করে পূজা করা হত। উদাহরণ স্বরূপ আমরা অষ্টাদশ সাহস্রিকা-প্রজ্ঞাপারমিতা এবং শতসাহস্রিকা-প্রজ্ঞাপারমিতা প্রভৃতি গ্রন্থগুলি উল্লেখ করতে পারি। গ্রন্থদ্বয় দেবী প্রজ্ঞাপারমিতার মহিমা কীর্তন করে। উল্লেখ করতে পারি যে এই বইয়ের মধ্যে দেবী প্রজ্ঞাপারমিতার চিত্রও থাকত। ফলে এখানে আমরা পুঁথি বা বই পূজা সংক্রান্ত ধর্মবিশ্বাসের এক কৌতূহলোদ্দীপক প্রমাণ পাই। তাই ভারতীয় উপমহাদেশে এবং বহির্ভারতে এই পুঁথি পূজার উল্লেখগুলি আমাদের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করে।

সূত্র নির্দেশ

১। দা কোয়াটার্লি জার্নাল অভ দা মিথিক সোসাইটি, ত্রিংশ খণ্ড, ১৯৩৯ পৃঃ ৫; এন, কে, দত্ত, গিলগিট ম্যানুস্ক্রিপ্ট, ১ম খণ্ড, শ্রীনগর, ১৯৩০, পৃঃ ৪১; বি, এন, মুখোপাধ্যায়, দা আর্লিয়েস্ট, ইণ্ডিয়ান মিনিয়েচার, কলকাতা, ১৯৯২, পৃঃ ২১।

২। এন, কে, দত্ত, গিলগিট ম্যানুস্ক্রিপ্ট, ১ম খণ্ড, শ্রীনগর, ১৯৩০, পৃঃ ৪৭, ৩৯–৪০, ৪৩,৬৩,

৩। জার্নাল অভ্ সেন্ট্রাল এশিয়া, দশম খণ্ড, সংখ্যা ২, ডিসেম্বর, ১৯৮৭, পৃঃ ২৩-৩৭; বি, এন. মুখোপাধ্যায়, দা আর্লিয়েস্ট ইণ্ডিয়ান মিনিয়েচার, কলকাতা, ১৯৯২, পৃঃ ২৩।

৪। জার্নাল অভ্ দা রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৩১, পৃঃ ৮৬৪।

৫। এম, এ, স্টেইন, সেরইণ্ডিয়া, ২য় খণ্ড, পুনর্মুদ্রণ দিল্লি, ১৯৮০, পৃঃ ৮৯০ এবং ১০৪২; ৪র্থ খণ্ড পুনর্মুদ্রণ দিল্লি, ১৯৮১ চিত্র নং ৪৮।

প্রাচীন বাংলার একটি গণরাজ্য

সত্যসৌরভ জানা

খ্রীঃ পূঃ ৬০০-র পূর্ববর্তী প্রাচীন ভারতেব বাজনৈতিক ইতিহাস, ঘটনাপঞ্জী ও রাজনৈতিক সংগঠন সম্পর্কে আমাদের ধারণা অত্যন্ত সীমিত ও অস্পষ্ট। প্রাক-খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ পর্বের বাজনৈতিক ইতিহাসের ব্যাপাবে আমাদেব প্রধানত ঋগ্বেদ ও তৎপববর্তী বৈদিক গ্রন্থগুলিব উপর নির্ভব ক'বতে হয। এগুলি থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে এ যুগে রাজনৈতিক সংগঠনেব প্রধান পুরুষ ছিলেন রাজা। কিন্তু তিনি বিভিন্ন কৌম বা গোষ্ঠীব দলপতিব চেযে অধিকতর ক্ষমতাভোগী ছিলেন না। কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ড দখল ও সেখানে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা কিংবা শাসনব্যবস্থা চালু করার ব্যাপাবে ঋগ্বেদ নীরব। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে বাজকীয প্রতাপ বৃদ্ধির লক্ষণ চিহ্নিত হলেও, কৌম গোষ্ঠীব রাজনৈতিক প্রভাবের স্বীকৃতি স্পষ্ট। তাই অনুমান কবা যেতে পাবে যে বাজতন্ত্রেব মাধ্যমে সংগঠিত রাষ্ট্রশক্তির উদ্ভব ও বিকাশের উপযুক্ত ক্ষেত্র এ সময প্রস্তুত হযনি।

তবে খ্রীঃ পূঃ ৬০০ নাগাদ অন্তত ১৬টি প্রধান রাজনৈতিক শক্তিব অস্তিত্ব যে ছিল তার প্রমাণ মেলে বৌদ্ধ 'অঙ্গুত্তব নিকায' ও জৈন 'ভগবতী সূত্রে'র সমন্বযী সাক্ষ্যে। এই জনপদগুলি ক্রমে আযতন ও ক্ষমতা বৃদ্ধিব ফলে এক-একটি 'মহাজনপদ'-এ পরিণত হয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে এই 'জনপদ' শব্দটি লোকালয় বোঝাতে ব্যবহৃত হয়নি, শব্দটি জনবসতি সম্পন্ন কৃষিপ্রধান এলাকাকেই বুঝিয়েছে। খ্রীঃ পূঃ ৬০০-র রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে এ সময় ভারতে কোন রাজনৈতিক ঐক্য ছিল না। এক অখণ্ড রাষ্ট্রের পরিবর্তে এখানে কতগুলি খণ্ড, ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল। এই ক্ষুদ্র রাষ্ট্র বা জনপদগুলি পারস্পরিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে মত্ত ছিল। এ যুগের শাসনব্যবস্থার যে চিত্র আমরা পাই তাতে দেখা যায় প্রচলিত শাসনব্যবস্থার যে চিত্র আমরা পাই তাতে দেখা যায় যে, প্রচলিত শাসনব্যবস্থা রাজতান্ত্রিক হলেও, পাশাপাশি অরাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার নিদর্শনও বর্তমান। এ সময় উত্তর-পূর্ব ভারতে গড়ে উঠেছিল বেশ কয়েকটি গণরাজ্য। বৌদ্ধগ্রন্থ থেকে জানা যায় যে বজ্জি ও মল্ল ছাড়াও কপিলাবস্তুর শাক্য, রামগামের কলিয়, সুমসুমার গিরির ভাগগ, অল্লকপপার বুলি, কেলপুত্তর কালামা এবং পিপ্পলি বনের মোরিয় প্রভৃতি

সূত্র নির্দেশ

১. এ. ভট্টাচার্য, হিস্টোরিক্যাল জিওগ্রাফি অব এনসেন্ট এ্যাণ্ড আর্লি মিডিভ্যাল বেঙ্গল, কলি, ১৯৭৭, পৃঃ ৫৯—৬০।
২. প্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, "প্রাচীন বঙ্গের সীমানা ও ইতিহাস," প্রবন্ধ সংকলন: প্রসঙ্গ তাম্রলিপ্ত, কমলকুমার কুণ্ডু সম্পাদিত, তমলুক, ১৯৯৩, পৃঃ ৩—৪।
৩. বি.এন.মুখার্জী, খরোষ্ঠী এণ্ড খরোষ্ঠী ব্রাহ্মী ইনস্ক্রিপশনস্ ইন ওয়েষ্ট বেঙ্গল (ইণ্ডিয়া), ইণ্ডিয়ান মুসিয়ম, কলি, ১৯৯০ পৃঃ ৪৮ (নং ১২, চিত্র নং-১২)। সীলটি সংগ্রহ করেছিলেন হারভার এন. নাথ।
৪. প্রাগুক্ত।
৫. প্রাগুক্ত, সীল নং ১৩ (চিত্র নং-১৩) পৃঃ ৪৮।
(সীলটি সংগ্রহ করেছিলেন অধ্যাপক গৌরীশংকর দে)।
৬. প্রাগুক্ত, সীল নং ১৪ (চিত্র নং-১৪) পৃঃ ৪৮।
৭. প্রাগুক্ত সীল নং-৯ (চিত্র নং-৯) পৃঃ ৪৬।
দ্রষ্টব্য— ইতিহাস অনুসন্ধান ৬, পৃঃ ৫২-৫৩।
৮. অমিতাভ ভট্টাচার্য— "লিপি পাঠ ও ইতিহাস উদ্ভাসন" 'দেশ' কলি, ৭ই নভেম্বর, ১৯৯২, পৃঃ ১২৪—১২৬।

বাংলা বর্ণমালায় 'শ' অক্ষরের ক্রমবিবর্তন

শ্রাবণী দত্ত

ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গে ও ত্রিপুরা রাজ্যে ও বাংলাদেশ রাষ্ট্রে বর্তমানে যে বাংলা লিপি প্রচলিত তার উদ্ভব ব্রাহ্মী লিপি থেকে। যদিও ব্রাহ্মী লিপির উল্লেখ কিছু প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায় (যার মধ্যে অন্যতম ললিত বিস্তর)। ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রাহ্মীলিপির প্রাচীনতম নমুনা দেখা যায় মৌর্য সম্রাট অশোকের প্রস্তর লেখগুলিতে। সম্রাট অশোকের (খ্রীষ্টপূর্ব ২৬৯–২৩২) শিলাস্তম্ভে তালব্য 'শ' অক্ষরটি দ্বিখণ্ডিত ওল্টানো ইংরাজী 'V' অক্ষরের সদৃশ[১]। গিরনার শিলাস্তম্ভে ওল্টানো 'V' অক্ষরের মধ্য দিয়ে যেমন দ্বিখণ্ডন করা হয়েছে, তেমন ধৌলী শিলাস্তম্ভে পাশের দিক দিয়ে দ্বিখণ্ডন করা হয়েছে (ᐱ)। মৌর্যোত্তর যুগে দেখা যায় এই ওল্টানো 'V'-এর উপরের অংশটি কৌণিক থেকে বক্রাকারে পরিণত হয়েছে এবং বাঁদিকের রেখার শেষ অংশে একটি ছোট মাত্রা চিহ্ন যুক্ত হযেছে (ᘐ)।

খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে সম্রাট অশোকের অনুশাসনে ব্রাহ্মী লিপির যে আকার দেখা যায়, শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিক্রম করে বহু বিবর্তনের ধারার মধ্য দিয়ে অধুনা প্রচলিত বাংলা অক্ষরমালায় রূপান্তরিত হয়েছে। মৌর্য ব্রাহ্মী অক্ষরের সঙ্গে এখনকার পরিবর্তিত রূপের সাদৃশ্য অবশ্য নেই। এই বিবর্তনের ধারার মধ্য দিয়ে বাংলা লিপিতে প্রচলিত তালব্য 'শ' অক্ষরটির বর্তমান রূপ কীভাবে এল, তার ক্রমবিকাশ অনুসন্ধান করা এই প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য।

বাংলাদেশে (অবিভক্ত পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ রাষ্ট্র) লিপির প্রাচীনতম উদাহরণ দেখা যায় বাংলাদেশের (রাষ্ট্রের) বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়[২]-এ আবিষ্কৃত শিলাফলকে। লেখটির সময়কাল খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয়-দ্বিতীয় শতক। এই ফলকে ব্যবহৃত অক্ষরগুলি সম্রাট অশোকের অনুশাসনে ব্যবহৃত ব্রাহ্মী অক্ষরগুলির মত। কয়েক বৎসর আগে পশ্চিমবঙ্গের নিম্নগাঙ্গেয় উপত্যকায় চন্দ্রকেতুগড় ও তৎসন্নিহিত অঞ্চল ও তাম্রলিপ্ত অঞ্চল থেকে বহু মৃৎফলক ও মৃন্ময় পাত্র[৩] সংগ্রহ করা হয়েছে। এই প্রত্নবস্তু সমূহে ব্রাহ্মী, খরোষ্ঠী ও ব্রাহ্মী-খরোষ্ঠী মিশ্রিত লিপির ব্যবহার দেখা যায়। লিপি তত্ত্বের বিচারে এই লেখগুলির সময়সীমা খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী থেকে পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এই লেখগুলির সাহায্যে ঐ সময় এই অঞ্চলে ব্রাহ্মী অক্ষরগুলির আকার পুনর্গঠন করা যায়। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে এই লেখগুলির 'শ' এর আকার মৌর্য যুগের

'শ'-এর মত কিন্তু খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকে ও পঞ্চম[৪] শতকে 'শ' এর বিবর্তন ঘটেছে এটা সুস্পষ্ট। তৃতীয় খ্রীষ্টাব্দে 'শ' এর আকার অনেকটা এখন প্রচলিত 'ম' অক্ষরের ন্যায় যদিও নীচের দিকের বৃত্তাকার অংশটি অক্ষরের সঙ্গে সেই সময় যুক্ত হয় নি ( )। পঞ্চম খ্রীষ্টাব্দে 'শ' এর বাঁদিকের অংশের সঙ্গে ডানদিক একটি সমতল রেখার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ও ডান দিকের রেখাটি নীচের দিকে অনেকখানি প্রলম্বিত হয়েছে ( )। বাঁকুড়া জেলার শুশুনিয়া গুহাগাত্রে[৫] উৎকীর্ণ চতুর্থ খ্রীষ্টাব্দের চন্দ্রবর্মার অভিলেখটিতে 'শ' এর আকার মৌর্যোত্তর যুগের 'শ'-এর ন্যায় যদিও অক্ষরটির উপরের অংশ কৌণিক হয়ে গেছে ( )।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকে অবিভক্ত বঙ্গদেশের উত্তরাঞ্চল থেকে গুপ্ত সম্রাটগণ প্রদত্ত দামোদরপুর দানপত্র সমূহ আবিষ্কৃত হয়েছে। এই লেখমালায়[৬] অক্ষরগুলি গুপ্তযুগে পূর্ব ভারতে ব্যবহৃত ব্রাহ্মী অক্ষরে সদৃশ ও লেখগুলির সর্বত্র 'শ' অক্ষরটির আকার মৌর্যোত্তর যুগের তালব্য 'শ'-এরই অনুরূপ যদিও বাঁদিকের প্রলম্বিত সরল বেখাটির নীচের মাত্রাচিহ্ন ছোট হয়ে গেছে অথবা শুধুমাত্র বাঁদিকে দেওয়া হয়েছে। ডান দিকেব সোজা বেখাটিও আরও কিছুটা প্রলম্বিত হয়েছে ( )। ডঃ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়[৭] উল্লেখ করেছেন-— In the Dhanaidaha grant of Kumāra Gupta we find in all cases, the looped form of the dental sibilant śa, has been used." প্রকৃত পক্ষে প্রথম কুমার গুপ্তের রাজত্বকালীন ধনাইদহ[৮] তাম্রশাসনে (৪৩২–৪৩৩ খ্রীষ্টাব্দ) 'শ' অক্ষরটি এতটা বিবর্তিত হয়নি, এর আকৃতি অন্যান্য গুপ্ত অভিলেখগুলির 'শ' অক্ষরের সদৃশ ( )।

খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে বাংলাদেশে ব্যবহৃত লিপির নমুনা পাওয়া যায় গুণাইঘর তাম্রশাসনে (৪৯৫–৫০৯ খ্রী), গোপচন্দ্রের মল্লসারুল[৯] (রাজ্য ৩৩) তাম্রশাসন, শশাঙ্কের (৬০০–৬২৫ খ্রী) প্রথম ও দ্বিতীয় মেদিনীপুর তাম্রশাসন[১০] ও এগরা[১১] তাম্রশাসন ও ধর্মাদিত্য (আ ৫৩০–৪০ খ্রী) ও গোপচন্দ্রের (৫৪০–৮০ খ্রী) ফরিদপুর তাম্রশাসনগুলি[১২] থেকে গোপচন্দ্রের ফরিদপুর তাম্রশাসনের 'শ' অক্ষরের সঙ্গে ধর্মাদিত্যের ফরিদপুর শাসনের 'শ' অক্ষরটির সাদৃশ্য আছে যদিও ধর্মাদিত্যের শাসনে 'শ' অক্ষরটির বাঁদিকের অংশের নীচে যে মাত্রাচিহ্নটি আছে সেটি বিভক্ত হয়ে গেছে ( )। লোকনাথের (৬৬৩–৬৬৪ খ্রী) কুমিল্লা[১৩] শাসনে এই ধরনের 'শ' পাওয়া যায় যদিও S.N. Chakravarti বলেছেন ৬৫০ খ্রীষ্টাব্দের পর এই 'শ' পাওয়া যায়নি। গোপচন্দ্রের মল্লসারুল তাম্রশাসনে কৌণিক 'শ' অক্ষরটির নীচে মাত্রচিহ্ন আর নেই, বাঁদিকের সরলরেখাটি বক্রভাবে বাঁদিকে ঘুরে গেছে। শশাঙ্কের অভিলেখ-র 'শ'-এর সঙ্গে ফরিদপুর শাসনের

'শ' অক্ষরটির সামঞ্জস্য আছে। ভাস্করবর্মার দূবী[১৪] ও নিধনপুর[১৫] দানপত্রের 'শ' এই রকমের যদিও নিধনপুরের একটি 'শ' এর ক্ষেত্রে বাঁদিকের রেখাটির নীচের অংশ তির্যক হয়ে ভরাট হয়ে গেছে (A)। S.N. Chakravarti comments for practical purposes the shape of the palatal 'śa' is the most important test for determining the age of insrciptions from the century A.D. onwands." তিনি মনে করেন ৬৫০ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে দুই ধরনের 'শ' পাওয়া যায়— (ক) 'looped form' অথবা ফাঁসা কৃতি 'শ' ও (খ) 'transitional form' অথবা মধ্যন্তরের 'শ'।

সপ্তম শতকের দ্বিতীযার্দ্ধ ও দশম শতাব্দীর মধ্যে প্রাক্-পাল ও পালযুগের লেখমালায ব্যবহৃত অক্ষরগুলির ভরাট ত্রিভূজাকৃতি মাত্রা[১৭]। আল-বেরুণী এই ধারাটাকে সিদ্ধমাতৃকা বলে উল্লেখ করেছেন। সিদ্ধমাতৃকার পূর্ণরূপ দেখা যায ধর্মপালের খালিমপুর তাম্রশাসনে[১৮] (৭৭৫–৮১৩ খ্রীষ্টাব্দ), ও নারায়ণপালের (আঃ ৮৬০–৯১৭) রাজত্বকালের বাদাল[১৯] স্তম্ভলেখতে। ধর্মপালের বোধগয়া ও খালিমপুর তাম্রশাসনগুলি নবম শতাব্দীর প্রথম ভাগে উৎকীর্ণ। খালিমপুর তাম্রশাসনের অক্ষর পরীক্ষা করলে দেখা যায 'এখানে ফাঁসাকৃতি (Looped form), তালব্য 'শ'। দেবপালের (আঃ ৮১২–৫০) মুঙ্গের[২০] তাম্রশাসনে (৩২ রাজ্যবর্ষ) ও নালন্দা তাম্রশাসনে (৩৮ রাজ্যবর্ষ) এই ধরনের 'শ'-এর ব্যবহার দেখা যায়। পরবর্তী অভিলেখগুলি যার মধ্য বাদাল স্তম্ভলেখ অন্যতম প্রমাণিত করে যে ক্রমশঃ এই তালব্য 'শ' স্থানচ্যুত হয়ে মধ্যন্তরে 'শ'-এর জায়গা করে দিয়েছে। এই প্রসঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে ডঃ এস. এন. চক্রবর্তী[২১] উল্লেখ করেছেন যে নবম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত 'looped form' অথবা ফাঁসাকৃতি 'শ'-এ নিদর্শন পাওয়া যায়।

নারায়ণপালের (আঃ ৮৬০–৯১৭ খ্রীষ্টাব্দ) বাদাল স্তম্ভলেখে 'শ'-এর বিভিন্ন রূপ পাওয়া যায়। এই স্তম্ভ লেখটির বৈশিষ্ট্য হল এখানে 'শ'-এর পূর্ণতা লাভের আগের মধ্যবর্তী রূপের আবির্ভাব। মহীপালের বাণগড়[২২] তাম্রশাসনে (৯৭৭–১০২৭; ৯ম বর্ষ) 'শ' অক্ষরটির উপরিভাগে সামান্য বিভাজনের চিহ্ন সুস্পষ্ট। এই ধারাটি আরও সুস্পষ্ট হয়েছে বিজয়সেনের দেওপাড়া[২৩]প্রশস্তিতে (বিজয়সেনের রাজত্ব কাল ১০৯৬–১১৫৯ খ্রীষ্টাব্দ), ঈশ্বর ঘোষের রামগঞ্জ[২৪] শাসনে (ঈশ্বর ঘোষের রাজত্বকাল ১০৪০–১০৮০ খ্রীষ্টাব্দ), লক্ষ্মণসেনের আনুলিয়া[২৫] তাম্রশাসনে (লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকাল (১১৯৭–১২০৬ খ্রীষ্টাব্দ), বিশ্বরূপসেনের সাহিত্য পরিষদ[২৬] তাম্রশাসনে (বিশ্বরূপসেনের রাজত্বকাল ১২০৬–১৩২৫ খ্রীষ্টাব্দ) ও দামোদর দেবের (রাজত্বকাল ১২৩০–৫৫ খ্রীষ্টাব্দ) মেহার[২৭] তাম্রশাসনে।

বীরধরদেবের চারপত্রমুড়া তাম্রশাসনে 'শ'-এর ঔপরের বিভাজন আরও সুস্পষ্ট। একটি 'শ' অক্ষরের নমুনায় বাঁদিকের অর্দ্ধবৃত্তের আগমন ঘটেছে। এর পরের যুগে অর্থাৎ ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতকে, বেশী সংখ্যক অভিলেখ পুঁথি পাওয়া যায় না। সেইজন্য এই যুগে 'শ'-এর বিবর্তন অনুসরণ করা যায় না। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকের বাংলা লিপির অন্যতম নিদর্শন পাওয়া যায় প্রথম বিজয় মাণিক্যের তাম্রশাসনে (শক ১৪১০)[২৯]। ১৪৮৮ খ্রীষ্টাব্দে উৎকীর্ণ এই অভিলেখটির বৈশিষ্ট্য হল সমতল (Horizontal) রেখা থেকে অক্ষরগুলি নীচে নেমে এসেছে। এই শাসনে 'শ' অক্ষরটি বর্তমান 'শ'-এর আকারের নিকটবর্তী রূপ কারণ এখানে 'শ'-এর আকারে দুইটি অর্দ্ধবৃত্তের প্রথম আবির্ভাব দেখা যায়। ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার মন্তব্য করেছেন, "The characters employed in the inscription are the same as those found in the epigraphic and manuscipt records of about the 16th century, discovered in Bengal and its neighbourhood. They may be compared with the characters of the Barakar inscriptions of Śaka 1382 (1461 AD) and Śaka 1468 (1546 AD), the inscription of Vikrama Samrat 1553 (1496 As), discussed above and the Kāmākhya hill inscription of Pramatta Simha dated Śaka 1666 (1744 AD) among epigraphs and the Cambidge Manuscript No 1669 (1-2) of 1198 AD, Purusottama's Prākrtāhuśaśana dated 1265 AD, the Bodhicharyāvatāra dated 1435 A.D. and the Śrīkishma Kīrttana. Since the date of the insciption under discussion falls about the close of the 15th century AD, some of its palaeographical features, which are either not usually notical or are often ascribed by scholars to earlien or later dates, may be noticed here. Te theory that the fully develoved Bengali form of the letter śa with its two small circles is not to be found till the enpiry of the 15th century, does not appear to be supported by our record which exhibits the modern form of śa." ১৫৪৫ খ্রীষ্টাব্দ (শকাব্দ ১৪৬৭) উৎকীর্ণ পঞ্চোপাসনা[৩০] মন্দির লেখে তালব্য 'শ'-এর আকৃতি পরিপূর্ণতা লাভ করেছে এবং অর্দ্ধ বৃত্তাকার অংশ দুটি ভরাট হয়ে গেছে।

যদিও 'শ'-এর বর্তমান রূপ দেখা যাচ্ছে পঞ্চদশ শতকের মধ্যে তবুও পরবর্তী কয়েক শতকে (দুই-তিন শতকে) পুঁথিতে এই অক্ষরের একধিক রূপ পাওয়া যায় যা কখনও কখনও অপেক্ষাকৃত প্রাচীন রূপের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। যতদিন ছাপাখানার আবির্ভাব ঘটেনি, যাঁরা পুঁথি তৈরী করতেন তাঁদের হাতে

বাংলা অক্ষরগুলির একাধিক রূপ পাওয়া যায়, ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত 'A Code of Gentoo Laws'[৩১]—এ বাংলা অক্ষরের সারণীতে 'শ' অক্ষরটির পূর্ণ বিকাশিত রূপ পাওয়া যায়। উনবিংশ শতাব্দীতে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'বর্ণ পরিচয়' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে (১৯১২ সংবৎ, ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দ) বর্তমানে প্রচলিত তালব্য 'শ' অক্ষরটির রূপ দেখা যায়।

সূত্র নির্দেশ

১. এ ভট্টাচার্য: এ গাইড টু আর্লি ব্রাহ্মী এ্যাণ্ড ইট্স ডেরিভেটিভস ইন বেঙ্গল, ১৯৮৭; স্কুল অফ হিস্টরিক্যাল এ্যাণ্ড কালচারাল স্টাডিজ এ্যাণ্ড ন্যুমিস্ম্যাটিক সোসাইটি অফ ক্যালকাটা, কলিকাতা, প্লেট ১(ক), ১(খ)।

২. ডি আর ভাণ্ডারকর: এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা ভল্যুম ২১; ১৯৩১–১৯৩২, ৮৩ পৃঃ. প্লেট।

৩/৪ ডঃ বি. এন. মুখার্জী: ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম বুলেটিন, ১৯৯০, কলিকাতা, খরোষ্ঠী এ্যাণ্ড খরোষ্ঠী-ব্রাহ্মী ইন্‌স্ক্রিপ্‌শনস্ ইন ওয়েষ্ট বেঙ্গল (ইণ্ডিয়া), পৃঃ ৯-২০ প্লেট ৮।

৫. দীনেশচন্দ্র সরকার, সিলেক্ট ইন্‌স্ক্রিপ্‌শনস্ ভল্যুম ১, ১৯৬৫, ৩৫৭ পৃঃ।

৬. এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা, ভল্যুম ১৫, ১৯১৯–১৯২০।

৭. ডঃ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়: দি ওরিজিন অফ দি বেঙ্গলি স্ক্রিপ্ট, নবভারত পাবলিশার্স, ১৯৭৩।

৮. এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা, ভল্যুম ১৭, ১৯২৩–২৪। ৩৪৭ পৃঃ।

৯. এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা, ভল্যুম ২৩।

১০. সিলেক্ট ইন্‌স্ক্রিপশন্‌স ভল্যুম ২। জার্নাল রয়্যাল অফ্ এশিয়াটিক সোসাইটি বেঙ্গল লেটার্স, সংখ্যা ১১, ১৯৪৫, প্লেট নং ২, পৃঃ ৯।

১১. দীনেশচন্দ্র সরকার: শিলালেখ তাম্রশাসনাদির প্রসঙ্গ পৃঃ ৫৯-৬৪। (প্লেট বইটির পিছনে)।

১২. পার্জিটার: ইণ্ডিয়ান এ্যান্টিকুয়েরি, ভল্যুম ৩৯, ১৯১০।

১৩. এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা, ভল্যুম ১৫, ১৯১৯-২০।

১৪. এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা, ভল্যুম ৩০, ১৯৫৩-৫৪।

১৫. এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা ভল্যুম ১২, ১৯১৩-১৪।

১৬. জার্নাল রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল লেটার্স, সংখ্যা ১৯৩৮; এস. এন. চক্রবর্তী: ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য বেঙ্গলি এ্যালফাবেট ফ্রম দ্য ফিফ্‌থ সেঞ্চুরি এ.ডি টু দ্য এণ্ড অফ দ্য মুহাম্মাদান রুল, পৃঃ ৩৬১।

১৭. এ ভট্টাচার্য: সম্ আস্পেক্টস্ অফ দি বেঙ্গলি স্ক্রিপ্ট।

১৮. এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা ভল্যুম ৪, পৃঃ ২৪৩।

১৯. এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা, ভল্যুম ২।

২০. এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা, ভল্যুম ১৮।

২১. জার্নাল রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটী অফ বেঙ্গল লেটার্স, সংখ্যা ১৯৩৮; এস. এন. চক্রবর্তী: ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য বেঙ্গল এ্যালফাবেট ফ্রম দ্য ফিফ্থ সেঞ্চুরি এ. ডি. টু দ্য এণ্ড অফ দ্য মুহাম্মাদান রুল, পৃঃ ৩৬৫।
২২. এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা ভল্যুম ১৪, পৃঃ ৩৮৪।
২৩. এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা ভল্যুম ১।
২৪. এ ভট্টাচার্য: এ গাইড টু আর্লি ব্রাহ্মী এ্যাণ্ড ইট্স ডেরিভোটিভ্স্ ইন বেঙ্গল; স্কুল অফ হিস্টারিক্যাল এ্যাণ্ড কালচারাল স্টাডিজ এ্যাণ্ড নিউমিস্ম্যাটিক্স্ সোসাইটী অফ ক্যালকাটা, কলিকাতা, ১৯৮৭। প্লেট ৩ ক ও ৩খ।
২৫. ননীগোপাল মজুমদার; ইন্স্ক্রিপশন্স্ অফ বেঙ্গল পৃঃ ১০২-২২ প্লেট বইটির পেছনে।
২৬. ননীগোপাল মজুমদার: ইন্স্ক্রিপশনস্ অফ বেঙ্গল, ভল্যুম ৩।
২৭ এ ভট্টাচার্য: এ গাইড টু আর্লি ব্রাহ্মী এ্যাণ্ড ইট্স্ ডেরিভোটিভ্স্।
২৮. দীনেশচন্দ্র সরকার: ছবি, বারাণসী, ১৯৭১।
২৯. ডি সি সরকার: সাম এপিগ্র্যাফিকাল রেকর্ডস অফ দি মিডিয়েভাল পিরিয়ড ফ্রম ইষ্টার্ণ ইণ্ডিযা, দিল্লী, ১৯৭৯, প্লেট ১৪।
৩০/৩১. এ. কে ভট্টাচার্য: এ কর্পাস অফ ডেডিকেটরী ইন্স্ক্রিপশন্স্ ফ্রম টেম্পলস্ অফ ওযেষ্ট বেঙ্গল, কলিকাতা, ১৯৮২।

'শ' অক্ষরের সারণী

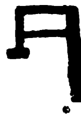
১। সম্রাট অশোকের রৌলী শিলাস্তম্ভ



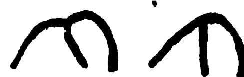
২। সম্রাট অশোকের 'রিবনার শিলাস্তম্ভ



৪। শুশুনিয়া অভিলেখ



৩। চন্দ্রকেতুগড়ের মৃন্ময় পাত্রের লিপি। ক। প্রথম শতক



খ। তৃতীয় শতক

ঘ। পঞ্চম শতক

৫। কুমারগুপ্তের দামোদরপুর তাম্রশাসন

৬। কুমারগুপ্তের ধনাইদহ তাম্রশাসন

৭। সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তি

৮। ধর্মাদিত্যের ফরিদপুর তাম্রশাসন

৯। গোপচন্দ্রের মল্লসারুল তাম্রশাসন

১০। লোকনাথের কুমিল্লা তাম্রশাসন

১১। ভাস্কর বর্মার নিধনপুর তাম্রশাসন

১২। খালিমপুর তাম্রশাসন

১৩। বাদাল স্তম্ভলেখ

১৪। বার্ণগড তাম্রশাসন

১৫। দেওপাড়া প্রশস্তি

১৬। বিজয়মাণিক্যদেবের মহারাণী শাসন

১৭। পঞ্চোপাসনা মন্দিরলেখ

১৮। A Code of Gentoo Laws, 1776.

প্রাচীন বঙ্গের দুটি বিপত্তারিণী তাবিজ

সংযুক্তা দত্ত

মানুষ বিপদ কাটানোর জন্য সাধারণত দুটি পন্থা অবলম্বন করে। প্রথমত বিপদের সাথে লড়বার উপযুক্ত প্রত্যক্ষ উপায় তথা হাতিয়ার খোঁজে। যেমন অসুখ হলে ওষুধ খায়। দ্বিতীয়ত অতি প্রাকৃতিক শক্তির ওপর নির্ভর করে তার মাধ্যমে বিপদেব হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার চেষ্টা করে। মানুষের এই প্রবণতা আজও আছে, পুরাকালেও ছিল। অতি প্রাকৃতিক শক্তির ওপর নির্ভর করা বা তার মাধ্যমে বিপদ কাটানোর বহু ধরনের প্রমাণ প্রাচীন ও বিশেষত মধ্যযুগের বাংলায় পাওয়া গেছে।

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ তাই এখানে খাল, বিল, জলা যত বেশী সাপের উৎপাতও তত বেশী। এই সাপ ক্ষোপের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য গাছ-গাছড়া, শিকড়-বাকড়, তাবিজ-কবচ ইত্যাদি নানা ধরনের উপায় অবলম্বিত হত প্রাচীন ও মধ্যযুগে গ্রাম্য জনসাধারণের ভেতর, যা আজও হয়। ঠিক কোন সময় থেকে তাবিজ-কবচের ব্যবহার বঙ্গদেশে চালু হয়েছিল তা বলা কঠিন। তবে সাম্প্রতিক কালের পুরাতাত্ত্বিক গবেষণায় কয়েকটি সীল পাওয়া গেছে যা তাবিজ হিসাবে ব্যবহার হত বলে আধুনিক পণ্ডিতদের ধারণা। আজকে এমনই দুটি তাবিজ আমার আলোচনার বিষয়বস্তু।

এগুলি পাওয়া গেছে চন্দ্রকেতুগড় অঞ্চলে সাম্প্রতিক কালের প্রত্ন অনুসন্ধানে। তাবিজগুলি পোড়া মাটির তৈরী, ছাঁচটি গোলাকার যার ব্যাস ৩.২৫ সে.মি। বর্তমানে এগুলি আশুতোষ মিউজিয়াম এবং চন্দ্রকেতুগড়ের ডি..কে. মাইতির সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে। তাবিজগুলির ওপর উৎকীর্ণ লেখর হরফতত্ত্বের বিচার করে অধ্যাপক ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এগুলিকে আনুমানিক প্রথম থেকে দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যেকার বলে অভিমত দিয়েছেন। বঙ্গে ব্যবহৃত তাবিজের এইগুলিই সম্ভবত প্রাচীনতম নিদর্শন। তাবিজগুলির গোলাকার ছাঁচের মধ্যে একটি তোরণের ওপর অঙ্কিত ময়ূর দেখতে পাওয়া যায়। তোরণটির একপাশে একটি পদ্ম-গুল্ম, অন্যপাশে একটি উল্টানো শঙ্খ ও তিনটি ধানের শিষ অঙ্কিত আছে। এই ধরনের অন্য একটি তাবিজে শঙ্খের জায়গায় এ্যাম্ফোরা ধরনের জালা আঁকা আছে। তাবিজগুলির কিনারা খরোষ্ঠী-ব্রাহ্মী মিশ্রিত লিপিতে প্রাকৃত ভাষায় একটি লেখ উৎকীর্ণ আছে। এটির পাঠোদ্ধার করেছেন অধ্যাপক ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

এই লেখটির সংস্কৃত ভাষান্তর করলে দাঁড়ায় "মধুরেণ শিখিনা ত্রিপিষ্টং যোজয়তু জিতসেনক দত্তেন ঢালেন জজ্জিনাং (বা জজবিনং)" এর অর্থ হল এই তাবিজটি দৈত্যের অথবা দৈত্যরূপী সাপের দ্বারা সন্ত্রস্ত মানুষটির সঙ্গে মন্ত্রঃপূত ময়ূরটির সংযোগ স্থাপন করুক এবং এটি পূজা প্রদানকারীর (সম্ভবত যিনি যোদ্ধা) সঙ্গে জিতসেন বা কার্তিকেয়র ঢালের সংযোগ স্থাপন করুক। এখানে সাপের সাথে দৈত্যের তুলনা করা হয়েছে আবার এই দৈত্যকে প্রতিরোধ করার জন্য সাপেব চিব শত্রু ময়ূরকে মন্ত্রঃপূত করা হয়েছে শুধু তাই নয় তাবিজটিকে আবও কার্যকর করে তুলতেই সম্ভবত ময়ূর যে দেবতার বাহন সেই দেবতার ঢালের সাথেও তাবিজটার সংযোগের কথা বলা হযেছে।

শুধু সাপের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যই নয়। সমুদ্রগামী নাবিকদের মধ্যে আজও সমুদ্রের ঝড় ঝঞ্ঝার হাত থেকে বাঁচার জন্য কবচ-তাবিজ নেবার প্রবণতা বা বিশেষ পূজার পাঠে রীতি দেখা যায়। এই রীতিও অতি প্রাচীন। দ্বিতীয় খ্রীস্টাব্দ নাগাদ প্রাচীন বাংলায় সমুদ্রগামী নাবিকদের এমন তাবিজ ব্যবহারের প্রমাণ পাওযা গেছে।

পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনায় বেড়াচাঁপাতে এই ধরনের একটি তাবিজ পাওযা গেছে। বর্তমানে ঐ অঞ্চলেই জি.এস.দে মহাশয়ের ব্যক্তিগত সংগ্রহ শালায রক্ষিত আছে। এটিও পোড়ামাটির তৈরী গোলাকৃতি তাবিজ। এর ব্যাস ৩.৮ সে.মি, এটির একটি কোণ সামান্য ভাঙা। তাবিজটির উপর বুটিদার বর্ডারের মধ্যে একটি সমুদ্রগামী মাস্তুল যুক্ত নৌকা অঙ্কিত আছে। নৌকাটির ওপর একটি গোলাকার বস্তু দেখা যায (এটা হয়ত আকাশ বা সূর্যের প্রতিকৃতি) নৌকাটির নীচে খরোষ্ঠী-ব্রাহ্মী মিশ্রিত লিপিতে প্রাকৃত ভাষায় উৎকীর্ণ একটি 'লেখ' আছে। যেটির সংস্কৃত ভাষান্তর করলে দাঁড়ায় "ভজথ দ্বিজেষু উদধৌ"। এর অর্থ, তুমি সমুদ্র যাত্রার সময় বা সমুদ্রে থাকাকালীন ব্রাহ্মণের স্মরণ নাও বা আশ্রয় নাও। এই তাবিজটি নিশ্চয় সমুদ্রগামী বণিক বা নাবিকদের জন্যই তৈরী।

এই তাবিজগুলি থেকে একটি লক্ষণীয় জিনিস দেখতে পাওয়া যায়। সেটি হল প্রথম-দ্বিতীয় খ্রীস্টাব্দে বঙ্গদেশের একই সমাজে সাধারণ মানুষ লৌকিক বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে অতিপ্রাকৃত শক্তির আশ্রয় চায় ও বিপদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার চেষ্টা করে এবং অন্য এক শ্রেণীর মানুষ ব্রাহ্মকে বিপদ ভঞ্জন বলে মনে করে। ভগবানের থেকেও ব্রাহ্মণের স্মরণ নেওয়ায় তাদের উৎসাহ বেশী। কাজেই বলা যায় যে ব্রাহ্মণকে দেবতা ভাবার একটা প্রবণতা এই সমাজের আছে একই সমাজের মানুষদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে লৌকিক ধর্ম ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম উভয় প্রবাহই সমাজকে প্রভাবিত করছে।

সমুদ্রযাত্রার বিভিন্ন বিপদের হাত থেকে রেহাই পাবার চেষ্টা শুধু যে বঙ্গ তথা ভারতীয় নাবিকরাই করেছেন তা নয় চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েনের বিবরণী থেকে জানা যায় যে পঞ্চম শতাব্দীর গোড়ায় যখন ফা-হিয়েন একটি বাণিজ্য পোত-এ শ্রীলঙ্কা হয়ে চীনে প্রত্যাবর্তন করছিলেন সেই সময় বঙ্গোপসাগরে তিনি প্রবল ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্যে পড়েন। এই ভয়ঙ্কর বিপদের মধ্যে তিনি 'প্রজ্ঞা-পারমিতা'-কে আশ্রয় করে বসে ছিলেন। এখানে তাগা-তাবিজ নয় প্রজ্ঞা পারমিতা নামটিই বিপদতারণ হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং দেখতে পাচ্ছি যে মন্ত্রের দ্বারা প্রাকৃতিক বিপদ বা অশুভ শক্তির ওপর আধিপত্য করার এই মানসিকতা শুধু ভারতীয় নাবিককেই নয় চৈনিক বৌদ্ধ ভিক্ষুকেও আলোড়িত করেছে। অতি প্রাকৃতিক শক্তির সাহায্য নিয়ে বাঁচার চেষ্টা নাবিক থেকে সর্বত্যাগী ভিক্ষু সবাই করে এবং এর থেকে মানুষের সাধারণ বিশ্বাসের জগৎটাও ধরা পড়ে।

তথ্য সূত্র

বি.এন.মুখার্জী: খরোষ্ঠী এণ্ড খরোষ্ঠী ব্রাহ্মী ইনসক্রিপসনস ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল (ইণ্ডিয়া) পৃঃ ৫১, ৫৬—৫৭ ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ম বুলেটিন, কলিকাতা, ১৯৯০।

প্রাচীন ভারতের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা : মৌর্যযুগ-গুপ্তযুগ

সুরজিৎ কুমার ধর

প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনায় তথ্যাল্পতার কথা স্বীকার করে নিয়েও বলা যায় যে, প্রাচীন ভারতবর্ষে সামাজিক, রাজনৈতিক জীবনের পাশাপাশি অর্থনৈতিক জীবনও বিকাশ লাভ করেছিল। অনিশ্চিত জীবন থেকে পশুচারিত অর্থনীতি, পরবর্তী পর্যায়ে কৃষি অর্থনীতির বিকাশের মধ্যে দিয়ে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতিব উদ্ভবের পাশাপাশি বাণিজ্যের বিস্তৃতি লাভও উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলে মনে হয। কিন্তু বাণিজ্যের বিস্তৃতি ঘটলেও, ঋক বৈদিক যুগ থেকে প্রচলিত অর্থে যাকে আমরা ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা নামে অভিহিত করে থাকি, তার সুস্পষ্ট প্রকাশ পাওয়া যায না। তবে বাণিজ্যিক ব্যবস্থাকে সচল রাখার জন্য সুদে অর্থ লেনদেনের পরিচয পাওয়া যায়; এমনকি মৌর্যযুগে গিল্ডগুলির উদ্ভব ও বিকাশ লাভের মধ্যে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার ধারণাটি প্রতিফলিত হযেছে।

ধনার্থী বণিক ব্যবসায়ের জন্য নানা অঞ্চলে পাড়ি দিচ্ছেন, এই জাতীয় বর্ণনা ঋক্‌বেদে পাওয়া যাবে (১.৫৬.২)। ঋক্‌বেদে 'পানি' বলতে সম্ভবত বণিকদেরই বোঝানো হয়েছে। 'কুসিদ', 'ঋণ' শব্দের ব্যবহারও ঋক্ বৈদিক যুগ থেকেই প্রচলিত ছিল। এমনকি 'বৃদ্ধি' শব্দটিও সুদে অর্থ প্রদান বোঝাতে ব্যবহৃত হত[১]। কোন কোন গবেষক এর সময়সীমা মোটামুটিভাবে ২০০০ খ্রীঃ পূঃ-র পরে স্থির করেছেন[২]। পাশাখেলার দরুন ঋণগ্রস্ততার (১১.২৭.৪) সংবাদ ঋক্‌বেদে পাওয়া গেলেও, জোর দিয়ে বলা যায় না। পাশাপাশি ঋক্‌বেদে পুনরায় পরিশোধযোগ্য সুদের পরিমাণ হিসেবে $\frac{১}{৮}$, $\frac{১}{১৬}$ -এর উল্লেখ রয়েছে (VIII, ৪৭, ১৭)। এমনকি কৃষিজাত, বাণিজ্য ও অন্যান্য বৃত্তিধারীরাও সুদে ঋণ নিতে পারতেন।

বাণিজ্যের ব্যাপক বিস্তৃতিই সুসংগঠিত ও পরিকল্পিত উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার উদ্ভবে সহায়তা করায় একটি সংগঠিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রয়োজন দ্রুত অনুভূত হচ্ছিল, যার অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতি হিসেবে শ্রেষ্ঠী[৩] নামক সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটেছিল, যারা বাণিজ্যিক পরিকাঠামো ব্যক্তিগত উদ্যোগের[৪] পাশাপাশি সমবেত

প্রয়াসের[৫] মাধ্যমে পরিচালনা করতেন। পালি সাহিত্যে শ্রেষ্ঠী শব্দটি নগরব্যাপী ধনাঢ্য বণিক, কোষাধ্যক্ষ, নিগমের প্রধান ও ব্যাঙ্কার বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে[৫ক]। এমনকি বিনয়-পিটকে কোন কিছু জামানত না নিয়ে অন্যের বিপদে সহায়তা প্রদান এসব বণিকদের দ্বারাই সম্ভব হ'ত বলে উল্লিখিত হয়েছে[৬]। কিন্তু CULLA-SETTHI JATAKA-4 এ সীলমোহরের বিনিময়ে অর্থপ্রদানের মধ্যে দিয়ে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার চিত্রটি প্রতিফলিত হয়েছে[৭]। দীর্ঘ নিকায়তে গহপতি সম্প্রদায় কর্তৃক ব্যবসায়ীদের বাণিজ্য সচল রাখার জন্য সুদে অর্থ ধার দেওয়ার প্রমাণও রয়েছে[৭ক]। অঙ্গুত্তর নিকায় অনুসারে চাতুর্য, দক্ষতা ও ক্রেতার প্রতি আস্থা অর্জনের ক্ষমতার উপর ছোট ব্যবসায়ীর সাফল্য নির্ভর করে[৭খ]। ভ্রাম্যমান বণিকের ক্রিয়াকলাপও সমকালীন তথ্যসূত্রে অজানা ছিল না। এই জাতীয় বণিক বা বণিকদের প্রধান 'সার্থবাহ' নামে পরিচিত। বহুশত গো-শকটে পণ্য বোঝাই করে সার্থবাহ 'পুবন্ত' (পূর্বসীমা) থেকে 'অপরান্ত' পাড়ি দিচ্ছেন, পালি সাহিত্যে এটি খুবই পরিচিত দৃশ্য। পালি সাহিত্যে বলা হয়েছে ব্যবসা শুরু করতে হলে (কমমন্তে পযোজেস্য), অর্থ ও রসদ দুই-ই ধার করতে হয়। আবার অর্থ ধার দানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে সমবায় সংস্থাগুলির উল্লেখ গণ, পূজা, নৈগম শব্দগুলির মধ্যে প্রতিফলিত হযেছে[৮]।

সমবায় সংঘগুলির কার্যাবলীর প্রমাণ ইন্দোর শিলালেখ,[৯] মান্দাসোর শিলালেখ'র[১০] অস্তিত্ব থেকে জানা যায়। পাহাড়পুর ও দামোদরপুর লেখতে[১১] ব্যবহৃত শ্রেষ্ঠী শব্দটি ব্যাঙ্কার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে বলে ব্লখ মনে করেছে। এ সকল গিল্ডগুলি মৌর্য আমলে জনগণের অর্থ জমা রাখত, এমনকি নগদ অঙ্কের উপর সুদ দিত। এথেকে একথাও প্রমাণিত হয় যে, অন্যদের অর্থ ধার দিয়ে সেখান থেকে সুদ হিসেবে অর্থ এই গিল্ডগুলি দাবী করতে পারত, নতুবা গিল্ডগুলিতে অর্থদানকারীদের টাকা জমা রাখার জন্য সুদ প্রদান করা সম্ভবপর হত না[১২]। নাসিকে প্রাপ্ত লেখটি[১৩] থেকে ঋষভদত্তের গচ্ছিত ৩০০০ কাহন অর্থ থেকে ২০০০ কাহন প্রতি মাসে ১% হারে সুদ হিসেবে অন্য একটি তন্তুবায় সমবায়ে ধার দেওয়ার প্রমাণ রয়েছে; বাকী ১০০০ কাহন থেকে মাসিক $\frac{৩}{৪}$% সুদ হিসেবে পাওয়া যেত। এখান থেকে সুদের হার প্রতি বছরে ১২%—৯% পর্যন্ত পাওয়া যেত বলে মনে হয়। স্কন্দগুপ্তের ইন্দ্রপুর লেখও এর উল্লেখযোগ্য প্রমাণ। বারিগাজাতে মিনান্দারের সময়ে বিদেশীমুদ্রার আদান-প্রদানের চিত্রটিও অর্থশাস্ত্রে সমর্থিত হয়েছে[১৪]। যেখানে ব্যবসায়ীদের জন্য প্রতি মাসে ৫%, ভ্রাম্যমান বণিকদের জন্য ১০% ও সমুদ্রগামী বণিকদের থেকে ১৫% সুদ হিসেবে প্রাপ্তির কথা অর্থশাস্ত্রে বলা হয়েছে।

পাণিনিব বচনায় উচ্চসুদে অর্থ ধার দেওয়ার প্রমাণ হিসেবে দ্বৈগুনিক, ত্রৈগুনিক, দশাইকাদাসিক শব্দগুলির উল্লেখ রয়েছে[১৫]। ঋণ প্রথার ব্যাপক বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে নোটের প্রচলন খদিরঙ্গর জাতক (KHADIRANGARA JATAKA) ও রুরু জাতক (RURU JATAKA) কর্তৃক সমর্থিত, সেখানে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির নগদে অর্থ ফেরত দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে অর্থধারদানকারী ব্যক্তিদের নদীতটে নিয়ে গিয়ে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির নদীগর্ভে আত্মবিসর্জনের দৃষ্টান্ত ঋণ ব্যবস্থার হতাশাময় চিত্রটি তুলে ধবে[১৬]। এই ঋণব্যবস্থার কুফলগুলির জন্যই রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের প্রযোজনীযতা দেখা দিয়েছিল।

সংঘগুলি জনগণের নিকট যেমন বিশ্বস্ততার প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল, ঠিক তেমনই নৃপতিও সংঘে অর্থ জমা রাখতে দ্বিধাবোধ করতেন না[১৬ক]: দ্বিতীয চন্দ্রগুপ্ত কর্তৃক দুটি কিস্তিতে ২০ ডিনার জমা অর্থ থেকে প্রাপ্ত সুদ দিযে দুটি অনাথ আশ্রমের ভরণপোষণের দৃষ্টান্ত গাধওয়া শিলালেখ কর্তৃক সমর্থিত হয়েছে। অনুকপ দৃষ্টান্ত প্রথম কুমার গুপ্ত কর্তৃক স্থাপিত হয়েছিল।

গুপ্তযুগে সুদে অর্থ ধার দিযে আহৃত সম্পদকে 'Spotted wealth' ও 'Black wealth' নামে অভিহিত করা হয়েছে[১৭]। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী, কৃষকরাই এই অর্থ ধার করতেন। শষ্যের বিনিময়ে ঋণ পরিশোধ করা গেলেও, এই সুদেব হার অত্যন্ত বেশী ছিল বলে নারদ ধারণা পোষণ করেছেন। অন্যদিকে বৃহস্পতি বলেছেন যে, কোন কিছু বন্ধ রেখে তার বিনিময়ে অর্থ ধার পাওয়া যেত[১৮]। তার মতে চার ভাবে বন্ধক দেওয়া হত। (১) স্থাবর বা অস্থাবর; (২) ব্যবহার যোগ্য / রক্ষণযোগ্য; (৩) যে কোন সময়ে ফেরতযোগ্য; (৪) নির্দিষ্ট সময়ান্তে ফেরতযোগ্য; কিন্তু মনুর মতে যে সকল স্থলে জামানত রাখতে হত না, সেক্ষেত্রে সুদের হার ছিল শতকরায় যথাক্রমে ২৪, ৩৬, ৪৮ ও ৬০।

নারদ ৬ প্রকার সুদের কথা বলেছেন[১৯]। যথা: (১) শারীরিক পরিষেবায় পরিশোধযোগ্য (কায়িক); (২) মাসান্তে বা নির্দিষ্ট সময়ে পরিশোধযোগ্য (কালিক); (৩) চক্রবৃদ্ধি বা সুদের উপর সুদ; (৪) কারিত বা নির্দিষ্ট অর্থের উপর সাধারণ পরিশোধযোগ্য সুদ, (৫) শিখাবৃদ্ধি বা প্রতিদিনে সুদের হার বৃদ্ধি; (৬) ভোগলাভ বা ঋণের জন্য স্থাবর সম্পত্তি জমা রাখা বা উৎপন্ন পণ্য থেকে প্রাপ্ত সুদ। কিন্তু খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতকে গৌতম "ব্যবহারিকি" নামক সুদের উল্লেখ করেছেন, যার পরিমাণ পাঁচ গুণের মত[২০]।

সুদের হার নির্ভর করত কিসের জন্য টাকা ধার নেওয়া হয়েছে তার ওপর। মৌর্যযুগে সুদের হার বছরে ২৪০ শতাংশ হলেও পরবর্তীকালে তা এসেছিল

মাত্র ২০ শতাংশে[২১]। সুদের হার বেআইনীভাবেও চড়া হত যদি ওই হারে দুপক্ষেরই সম্মতি থাকত। কিন্তু সাধারণত সুদ নিম্নমুখী হওয়ার কারণ জিনিসপত্রের প্রাচুর্য ও লাভের হার হ্রাস।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় টাকার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠার ফলে অনেকেই ব্যাঙ্কের কাজ শুরু করে দিয়েছিল। ব্যাঙ্কের কাজকর্মের মধ্যে তেজারতি কারবারও ছিল[২২]। সুদ নেওয়া হত শতকরা ১৫ হিসাবে। সমুদ্র বাণিজ্যের জন্য টাকা ধার দিলে তার সুদের হার আর চড়া হত। এযুগের এক লেখকের মতে, গ্রহিতার সামাজিক বর্ণ অনুসারে সুদের হার স্থির হত। অর্থাৎ উচ্চবর্ণের লোকেরা কম সুদ দিত ও নিম্নবর্ণের লোকেদের চড়া সুদ দিতে হত। বিশেষত ব্রাহ্মণদের জন্য প্রতি মাসে শতকরা ২, ক্ষত্রিয় ৩% বৈশ্য ৪% ও শূদ্রদের জন্য ৫% নির্দিষ্ট ছিল[২৩]। এর পশ্চাতে একটি স্পষ্ট কারণ হল যে নিম্নবর্ণের মানুষের পক্ষে ধার শোধ করা বেশ কঠিন ছিল। ঋণের জালে জড়িয়ে তাদের পক্ষে কোথাও চলে যাওয়াও সম্ভব হ'ত না। এসব মানুষের মধ্যে ক্রমশ একটা বশ্যতাভাবের সৃষ্টি হত।

ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায ঝুঁকির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সুদ নেওয়ার রীতি[২৪] প্রচলিত চিত্র বলে মনে হলেও, বাণিজ্যিক ব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধিতে সুদে অর্থ কারবারের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধির পাশপাশি প্রায়গিক ক্ষেত্রে এর কঠোরতা হ্রাস উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলে মনে হয়। সুতরাং উপরিলিখিত যুগক্ষণে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপকে সচল রাখতে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থাব ধারণা অর্থনৈতিক ইতিহাস আলোচনার উল্লেখযোগ্য বিষয় বলে মনে হয়।

সূত্র-নির্দেশ

1. Social & Rural Economy, A.N. Basu. p. 338 RV I
2. R.N. Saletore: Early Indian Economic history.
3. Pali English Dictionary, PTS 2 3;
   Economic life and progress in Ancient India (ed): N.C. Banerjee, Hindu Period VOL.I p. 285; Early Indian Trade and Industry (ed): D.C. Sircar, University of Calcutta, (1972) p. 68:
4. Arthasastra IV 1, V-2
5. J.A. R.S. 1901

5A. Pali-English Dictionary, PTS 2-3

6. JATAK VOL VI p. 69, VOL IV p. 256
7. JATAK VOL I, pp. 121, 127

7A. Arthasastra IV 1, V 2; Corporate Life In Ancient India (Ed): R.C. MAJUMDER p. 8-10.

7B. DIG. NIK VOL II p. 69
8. HISTORY OF SOUTH INDIA: K.A. NILAKANTHA SASTRI. p 139
9. SELECT INSCRIPTIONS, (ed): D.C. SIRCAR VOL I p. 318
10. IBID p. 299
11. DO p. 290, 292, 346
12. ECONOMIC LIFE IN NORTHERN INDIA: S.K. MAITI, p. 204
13. SELECT INSCRIPTIONS (ed): D.C. SIRCAR VOL I p. 164, 167 LUDER'S LIST NO: 1133, 1137
14. THE WONDER THAT WAS INDIA: A.L. BASHAM p. 223.
15. VASISTHA II 40
16. GAU. DHARMA SUTRA XI, 21;
Economic Life & Progress in Ancient India. Vd I (ed): N. C. Banerjee, p. 288
16A S.K. MAITI: ECONOMIC LIFE IN NORTHERN INDIA: p. 205
17 DO - P. 229
18. DO - P. 230
19. DO - P. 235
20. R.N. SALETOR: EARLY INDIAN ECONOMIC HISTORY.
21. রোমিলা থাপার: প্রাচীন ভারতের ইতিহাস পৃ: ১০৯
22. তদেব: পৃঃ ৮২
23. NARADA I, 100
24. ECONOMIC LIFE & PROGRESS IN ANCIENT INDIA: VOL I. N.C. BANERJEE. p. 290

বাঙলার লেখমালায় প্রথম শূন্য ও দশমিকের প্রচলন

মলয় কুমার দাস

অধ্যাপক হলস্টেড যে 'শূন্যে'র আবিষ্কারকে 'নির্বাণ' লাভের সঙ্গে তুলনা করেছেন এবং হুপার মেকারস্ অফ্ ম্যাথেমেটিকসে যাকে অভিনব বৈপ্লবিকই নয় বরং বর্তমান যুগের বিজ্ঞান, কারিগরী বিদ্যা ও নভোশ্চারণ বিদ্যার মূল পথ প্রস্তুতকারী বলে অভিহিত করেছেন, সেই 'শূন্যের' আবিষ্কারক কে তা নিয়ে বিতর্ক বহুদিন আগে শুরু হলেও—এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি। যদিও দাবিদার হিসাবে মেসোপটেমিয়া, আরব এবং চীনের নাম উঠে এসেছে। তবে আরবীয়রাই নয়, বিশ্বের বেশীর ভাগ পণ্ডিতরা যেখানে 'দশগুণোত্তর স্থানিক মান' পদ্ধতিতে 'সংখ্যা লিখন ও শূন্য'— এই দুটির আবিষ্কার ভারতীয়দের কৃতিত্ব বলে স্বীকার করে নিয়েছেন, সেখানে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ও বিশেষজ্ঞ ন্যুগেবাওয়ার মনে করেন 'শূন্য এবং স্থানীয় মান' সাধারণভাবে গ্রীক এবং ব্যাবিলনীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানে প্রথম ব্যবহৃত হত। কিন্তু ভারতীয়দের উদ্ভাবনায় ইহা সংখ্যা বিন্যাসের ক্ষেত্রে রূপান্তরিত হয়েছিল দশগুণোত্তর স্থানিক মান পদ্ধতিতে[২]।

একথা স্বীকার্য যে প্রাচীন পৃথিবীর গণিতচর্চায় ভারতীয় গণিতের স্থান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'দশগুণোত্তর স্থানিক মান' পদ্ধতিতে সংখ্যালিখন ও 'শূন্য' প্রভৃতি বিস্ময়কর ও মহামূল্য কিছু আবিষ্কারের মধ্যে দিয়ে ভারত বর্তমান বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞদের প্রশংসাপত্র অর্জনে সক্ষম হয়েছে। ঐতিহাসিক এ.এল. ব্যাসাম মনে করেন, গৌতম বুদ্ধের পর কেউ যদি ভারতে জন্মে থাকেন, তা হলে তিনি হলেন সেই অনামী গণিতজ্ঞ যিনি 'শূন্য' আবিষ্কার করেছিলেন।

'শূন্যের' আবিষ্কার ও ব্যবহার ভারতে কখন থেকে তা নিয়েও যথেষ্ট মত পার্থক্য লক্ষ করা যায়। আনুমানিক দু'শ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে রচিত পিঙ্গলের ছন্দসূত্রে শূন্যের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। জি. আর. ক্যে-র মতে ভারতীয়রা নবম-দশম-শতাব্দীতে স্থানীয় মান সহকারে অঙ্কপাতন পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত ছিল। ভারতীয়দের কাছে সংখ্যাপাতনের ব্যবহার যে অজানা নয় তা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মনে করেন। তাই তিনি খ্রীষ্টাব্দের সূচনালগ্নকে সংখ্যা পাতন পদ্ধতির

প্রচলনের সময় কাল বলে মনে করেন। অপরদিকে বিউলার, ভি. এ. স্মিথ, ভাণ্ডারকার প্রমুখ পণ্ডিতরা বলেন ৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দে শূন্য ও স্থানীয় মান সহকারে সংখ্যাপাতনের ব্যবহার ভারতীয়দের অজানা নয়। জি. থিবো আবার ৫০০ খ্রীষ্টাব্দকে চিহ্নিত করেছেন। অনেক ঐতিহাসিক আবার গুপ্তযুগে 'সংখ্যাতত্ত্ব ও শূন্যের' প্রচলন বলে মনে করেন। প্রাপ্ত উপাদান ও বিভিন্ন সাক্ষ্য প্রমাণাদির দ্বারা একথা বলা যায় যে, উক্ত পদ্ধতি খ্রীষ্টীয় প্রথম শতক থেকে তৃতীয় শতকের মধ্যে আবিষ্কৃত ও প্রচলিত হয়েছিল[৩]।

অঙ্কের মধ্যে স্বতন্ত্র ও সুনির্দিষ্ট, ভাবে শূন্য ব্যবহারের বহুপূর্বে অন্য কোন প্রতীক যথা বিন্দু (বকাশালী পাণ্ডুলিপি) এবং বৃত্তীয় (পঞ্চরাশিক, সপ্তরাশিক অঙ্কের ক্ষেত্রে) রূপে ব্যবহার করত ভারতীয়রা। এমন কি শূন্যের পরিবর্তে নাম সংখ্যা (দিক, আকাশ, গগন, অভাব, অভ্র, অম্বর, পুষ্কর, জলধর, অন্তরীক্ষ প্রভৃতি) ব্যবহৃত হত। তবে স্থানীয় মান সহকারে অঙ্ক করতে গেলে শূন্যের প্রয়োজনীয়তা আবশ্যিক। কারণ এই পদ্ধতি অবলম্বন করলে মানগুলো ডান দিক থেকে বাম দিকে উত্তরোত্তর দশগুণ বৃদ্ধি (শ দ এ / ৮ ৮ ৮) পেয়ে থাকে। দশকে একক ধরে গণনা করার পদ্ধতি বৈদিক ভারতে প্রচলিত থাকলেও অন্যান্য প্রাচীন দেশে অল্প বিস্তর প্রচলিত ছিল। যাইহোক এক থেকে নয় (১—৯) পর্যন্ত সংখ্যার প্রতিটির একটি এবং 'শূন্য' (০) এই মোট দশটি প্রতীকের সাহায্যে সংখ্যা প্রকাশের পদ্ধতি ভারতীয়দের দ্বারা আবিষ্কৃত হওয়ায় গণিত শাস্ত্রে বিপ্লব ঘটে যায়[৪]।

এবার আসা যাক ভারতীয় লেখমালা প্রসঙ্গে, মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পায় প্রাপ্ত উপাদান হতে অনেকে অনুমান করেছেন যে, এখানে পাশাপাশি, উপর নীচ বা লম্বাদাঁড়ির মাধ্যমে ১ থেকে ১৩ পর্যন্ত সংখ্যা লেখার প্রচলন ছিল। এরপরই আমরা 'অশোকের উৎকীর্ণ লেখমালা' থেকে সংখ্যার পরিচয় পাই। অথচ হরপ্পা থেকে অশোক মধ্যবর্তী দীর্ঘ প্রায় দেড় হাজার বছরের মধ্যে এরূপ কোন উপাদান পাই না যা থেকে সংখ্যা লিখন পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। প্রাচীন ভারতীয় লিপি মালার মধ্যে ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী লিপিই ছিল প্রধান। ফলে বিভিন্ন চিহ্নের দ্বারা সংখ্যাগুলি বোঝান হত।

ভারতীয় লেখমালায় ১ থেকে ৯ পর্যন্ত যে সংখ্যাগুলো বর্ণিত হয়েছে সে গুলোর প্রত্যেকটি সংখ্যাবাচক চিহ্ন দ্বারা বুঝান হয়েছে। আবার ১০,২০,৩০,৪০,৫০,৬০,৭০,৮০,৯০ পর্যন্ত প্রত্যেকটি সংখ্যার জন্য পৃথক পৃথক সাইন বা চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। অনুরূপ ভাবে ১০০,২০০,৩০০,৪০০ বা ১০০০,২০০০,৩০০০ ইত্যাদি সংখ্যা লিখবার জন্য পৃথক পৃথক সংকেত বা সাঙ্কেতিক চিহ্নের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন ১১৯(১০০+১০+৯)

ও ১২৮ (১০০+২০+৮) সংখ্যা দুটি। দুটি ক্ষেত্রে যথাক্রমে ১০০-র জন্য একটি ২০-র জন্য একটি ও ৮-এর জন্য অপর একটি চিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে। প্রাক্‌গুপ্ত ও গুপ্ত যুগের লেখমালায় এরূপ ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। ব্রাহ্মী বা খরোষ্ঠী লিপির সাহায্যে ছোট সংখ্যাকে লিখতে কোনরূপ অসুবিধা হত না। কিন্তু বড় সংখ্যার বেলায় অসুবিধা দেখা দেয়। এরূপ অসুবিধা দূরীকরণের উদ্দেশ্যেই মনে হয় 'শূন্য' ও 'স্থানীয় মান' বা দশমিক পদ্ধতির আবিষ্কার হয।

প্রথম কুমার গুপ্তের রাজত্বকালের একটি লেখমালায় অর্থাৎ মানকোয়ার মূর্ত্তি লেখ-এ ১২৯ তারিখটি পড়া হয়েছিল। ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার এটিকে ১০৯ পড়েছেন। ১০০ এবং ৯-এর মধ্যখানের সংখ্যা চিহ্নটি আগে ২০ পড়া হত। ডঃ সরকার সেটিকে শূন্য ধরেছেন। পুরোপুরি ১০৯ লেখা হয়। ১০০ এবং ৯-এর জন্য পৃথক চিহ্ন ব্যবহার করলে যে মাঝে শূন্য (০) দেবার প্রয়োজন নেই, এই সত্যটি তখন পর্যন্ত জানা ছিল না। কুমারগুপ্তের সময়কাল হল ৪১৩-৪৫৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। যদি ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার-এর অভিমত গ্রহণ করা যায় তবে এখানে আমরা শূন্য ব্যবহারের একটি প্রচেষ্টা লক্ষ্য করতে পারি[৫]।

বাংলাদেশে আমরা প্রথম দশমিক প্রথায় সংখ্যা লিখবার উদাহরণ দেখতে পাই দেবখড়্গের প্রথম আশ্‌রাফ্‌পুর (বর্তমান ঢাকা জেলা) তাম্রশাসন লেখতে। এখানে ১ এবং ৩ এই দুটি সংখ্যার দ্বারা ১৩ বুঝান হয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে এই অঞ্চলে দশমিক এর ব্যবহার প্রচলিত ছিল। রাজ্যবর্ষ ১৩ তারিখটি কেউ কেউ আবার অন্য কিছু (বর্ষ ৭, ৭৩, ৭৯, ৬৩ ইত্যাদি) পড়তে চেয়েছেন। অধ্যাপক ব্রতীন্দ্রনাথ মুখার্জী তারিখটি ৭৩ বলে মনে করেন। অনেকে আবার ১৩ ছাড়া বাকি সব ভ্রান্ত বলে মনে করেন। লেখমালার তারিখ অনুযায়ী খড়্গবংশের শাসনকাল কেউ কেউ নবম-দশম শতাব্দীর পূর্ববর্তী বলতে চান না। সেই মতও ভ্রান্ত বলে মনে হয়। সাধারণত দেবখড়্গের সময় কাল হল সপ্তম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে (আনুমানিক ৬৬০—৬৮৫ খ্রীষ্টাব্দ)। অতএব বলা যায় বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের অন্তর্গত ভূখন্ডে এটি দশমিক প্রথায় (স্থানীয়মান) সংখ্যা লেখবার প্রাচীনতম নিদর্শন[৬]।

তবে এরও পূর্বে এই ধরনের একটি প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায় শশাঙ্কের রাজত্বকালীন এগরা (বর্তমান মেদিনীপুর জেলা, পশ্চিমবঙ্গ) তাম্রশাসনে। এতে কোন তারিখ নেই। এখানে উল্লেখ আছে দোষতুঙ্গাকে দানের জন্য ১০০ দ্রোণবাপ বিক্রয় করা হয়। শশাঙ্কের রাজত্বকাল আনুমানিক ৬০০-৬২৫ খ্রীষ্টাব্দ। লিপি তত্ত্বের দিক থেকে উল্লেখ্য এই যে, এখানে ১০০ সংখ্যাটি বুঝাবার

জন্য প্রথমে ১০০-এর জন্য নির্ধারিত চিহ্নটি লেখা হয়েছে। কিন্তু তার পরে আবার অকারণ দুটি শূন্য চিহ্ন বসান হয়েছে। এটা বিভিন্ন চিহ্ন দ্বারা সংখ্যা লিখনের প্রাচীন পদ্ধতির উপর নব প্রচলিত দশমিক প্রথায় সংখ্যালিখন প্রণালীর প্রভাবের ফল[৭]।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে পদ্ধতিটির নিদর্শন গাঙ্গেয় উপত্যকায় বিশেষত মধ্যগাঙ্গেয় উপত্যকায় খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকে লক্ষ করা যায়। অপরদিকে নিম্নগাঙ্গেয় উপত্যকায় সেটি খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের পূর্বে পাওয়া যায় না। এই অঞ্চলে অর্থাৎ প্রাচীন বাঙলায় গুপ্ত এবং প্রাক্‌গুপ্ত পূর্বের সংখ্যা চিহ্নের যত নিদর্শন পাওয়া গেছে তার কোনটিতেই উক্ত পদ্ধতি প্রযুক্ত হয়নি। খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর গোড়া থেকে অবশ্য পরিপূর্ণ বিকাশ দেখা যায়।

সূত্র-নির্দেশ

১। হলস্টেড—অন দি ফাউণ্ডেশন এ্যান্ড টেকনিক অফ্ এরিথমেটিক গ্রন্থ।

২। নন্দলাল মাইতি—প্রচীন ভাবতীয গণিতেব ইতিবৃত্ত। পৃষ্ঠা-১৫২।
নন্দলাল মাইতি—গ্রীকগণিতের ইতিবৃত্ত। পৃষ্ঠা-২১৪।
প্রদীপকুমাব মজুমদাব—প্রচীন ভারতে গণিত চর্চা, পৃষ্ঠা-১৭৭।
রমাতোষ সরকার—প্রচীন ভারতের গণিত চিন্তা।
দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়—প্রচীন ভাবতে গণিতেব উৎপত্তি।—ইতিহাস অনুসন্ধান-২, পৃষ্ঠা-৩৬।

৩। জার্নাল, এশিয়াটিক সোসাইটি, বেঙ্গল,—নোটস্ অন ইন্ডিয়ান জি.আর.কো.—ম্যাথামেটিকস্ এ্যারিথমেটিকাল নোটেসন। খণ্ড-Vol 3, 1907।
প্রদীপকুমার মজুমদার— প্রচীন ভারতে গণিত চর্চা, পৃষ্ঠা-৫৫, ১৭৭।
নন্দলাল মাইতি — প্রচীন ভারতীয় গণিতের ইতিবৃত্ত।

৪। নন্দলাল মাইতি — প্রচীন ভারতীয় গণিতের ইতিবৃত্ত।

৫। ফ্লীট — করপাস ইনস্‌ক্রিপসন—পার্ট-টু, ভল্যুম থ্রী। ডি.সি.সরকার—ইন্ডিয়ান এপিগ্রাফি দিল্লী, ১৯৬৫।

৬। মেমোয়র্স অফ্ দি এশিয়াটিক সোসাইটি অফ্ বেঙ্গল-খন্ড-১ পৃষ্ঠা-৮৯-৯৬।

৭। ডি.সি.সরকার—শিলালেখ তাম্রশাসনাদি প্রসঙ্গ। পৃষ্ঠা-৫৯—৬৩।

প্রাচীন বাংলার লোকশিল্প : নিম্নবর্গীয় সংস্কৃতির একটি রূপরেখা

সোমা মুখোপাধ্যায়

লোকশিল্পের সম্ভারে বঙ্গলক্ষ্মীর ভান্ডার সর্বদাপূর্ণ। সেই সুদূর অতীতে প্রাগৈতিহাসিক মানুষ সে আদিম শিল্প স্বাক্ষর রেখেছিলেন আজকের গ্রামীণ কৌম সমাজ বর্তমানেও তা বহন করে চলেছে। লোকায়ত সমাজের দৈনন্দিন প্রয়োজন, বিশ্বাস-সংস্কার, আচার অনুষ্ঠান ইত্যাদির অপরিহার্য্য অঙ্গ হিসেবে সৃষ্টি করে চলছে লোকশিল্পের যা ছড়িযে আছে বাংলাদেশের সর্বত্রই।

বাংলার লোকশিল্পের বিবরণ, সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গুরুসদয় দত্ত, বিনয় ঘোষ, অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বিদগ্ধ ব্যক্তিরা বারংবার মূল্যবান আলোচনা করেছেন। কিন্তু আদিপর্বে বাঙলার এই শিল্পধারা ও তার সঙ্গে সম্পৃক্ত শিল্পীদের অবস্থার কথা অনেকাংশে আজও অজানা রয়ে গেছে। প্রাচীন বাংলার শিল্প-ইতিহাসচর্চায় লোকশিল্পের গুরুত্বের তুলনায় এখনও পন্ডিতসমাজ শাস্ত্র নির্ভর মার্গ রীতির শিল্পধারাটির প্রতি অধিকতর মনোযোগ নিক্ষেপ করে চলেছেন।

এই প্রবন্ধে প্রাচীন বাংলার লোকশিল্পের পুংখানুপুংখ বিবরণ নয়, এই শিল্পের সৃষ্টিকর্তা যে নিম্নবর্গের মানুষ তাদের অবস্থায় কথাটাই তুলে ধরা মূল উদ্দেশ্য। বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক ও সাহিত্যগত উপাদানের ভিত্তিতে তৎকালীন সমাজে এদের স্থান নির্ণয়ের একটা প্রাথমিক প্রয়াস এই প্রবন্ধের মাধ্যমে করবার চেষ্টা করবো।

আমাদের প্রাচীন সাহিত্যগুলোর অনেকখানিই শিল্পীদের প্রতি একটা অবহেলা আর তাচ্ছিল্যের মনোভাব দেখিয়ে এসেছে। একেবারে সভ্যতার ঊষালগ্নে শিল্পীদের অবস্থাটা হয়তো এরকম ছিল না প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে হরপ্পা সংস্কৃতির যে শিল্প নির্দশনগুলো আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে তাকে বিশ্লেষণ করলে একটা সত্য অন্তত স্পষ্ট হয়ে যায়। তৎকালীন যুগেও সাধারণ মানুষ সৃষ্টির অনাবিল আনন্দে যে শিল্প নিদর্শনগুলো রেখে গেছেন তারই ভিতর দিয়ে ফুটে উঠেছে সমাজচিত্র, হরপ্পা সংস্কৃতির পোড়ামাটির শিল্পগুলো সাধারণ মানুষের সৃষ্টির প্রতীক অপরদিকে প্রস্তর ও ব্রোঞ্জ নির্মিত শিল্পগুলো ছিল উচ্চবিত্ত শ্রেণীর সৃষ্টি। সিন্ধুলিপির এযাবৎ পর্যন্ত কোন পাঠোদ্ধার না হওয়ায় তৎকালীন

পরিস্থিতিতে সমাজে শিল্পীদের কি অবস্থান ছিল তার লিখিত কোন প্রমাণ আমাদের নেই।

ঋগ্বেদের যুগে কৃষি ও পশুপালনের ওপর নির্ভর একটা মিশ্র অর্থনীতির সূচনা হয়। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আর্যদের জীবিকার ক্ষেত্রও সম্প্রসারিত হয়েছিল। কোশাম্বির মতে কারিগররা তখন উপজাতির স্বাধীন সদস্যরূপে গণ্য হতো। ঋগ্বেদে যে সব শিল্পীদের নামের উল্লেখ আছে তারা হলো কর্মার, তক্ষক, তন্তুবায় ও চর্মশিল্পী, রথকার। তক্ষক, রথকার ও কর্মারদের শাসনকার্যে দায়িত্বের কথা ও বিভিন্ন শাস্ত্রে উল্লিখিত হয়েছে। তাদের রত্নিন উপাধিতে ভূষিত করা হতো এবং রাজার সিংহাসন আরোহণের সময় এদের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। বৈদিক যুগের প্রথমদিকে এই সমস্ত শিল্পীরা সমাজে সম্মানজনক স্তরে অবস্থান করতেন কৃষিকার্য্য ও যুদ্ধবিদ্যার প্রয়োজনে বিভিন্ন ধরনের শিল্পবস্তু নির্মাণে বৈদিক সমাজে এদের স্থান ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

পরবর্তী বৈদিক যুগ থেকে শিল্পীদের এই অবস্থা বিশেষভাবে পরিবর্তিত হলো। এই যুগে জীবনযাত্রা ক্রমশ জটিল হওয়ায বিচিত্র শিল্পের প্রকাশ হয়েছিল। কর্মীদের সংঘ রূপায়িত হয়েছিল জাতি বা বর্ণে বৌদ্ধ শাস্ত্রসমূহ যথা 'মজ্ঝিম নিকায়', 'মহাবস্তু', মিলিন্দ পন্হো প্রভৃতিতে বিভিন্ন বৃত্তি ও কর্মী সংঘের উল্লেখ আছে। বিনয়-পিটকে নিম্নমানের শিল্প ও উচ্চমানের শিল্প এই দুই ধরনের শিল্পের পার্থক্য করা হয়েছে। নিম্নমানের শিল্পে স্থান দেওয়া হয়েছে মৃৎশিল্প, চর্মশিল্প তাঁত শিল্প ও টুকরি নির্মাণ শিল্পকে অপরদিকে উচ্চমানের শিল্প আখ্যা দেওয়া হয়েছে মুদ্রা, গণনা ও রচনাশৈলীকে। 'দিঘনিকায়' এ আবার যারা নীচকুলে জন্মগ্রহণ করেছে ও যারা নিম্নমানের শিল্পকে জীবিকার জন্য গ্রহণ করেছে তাদের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা হয়েছে।

অন্যদিকে সূত্র সাহিত্য কিন্তু অগ্রসর হয়েছে আরো একটি ধাপ। সেখানে স্পষ্টভাবেই শিল্পবৃত্তিকে শূদ্রদের কর্ম হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। রামশরণ শর্মা তার 'প্রাচীন ভারতে শূদ্র' গ্রন্থে দেখিয়েছেন কেমনভাবে বৈদিকযুগের গুরুত্বপূর্ণ শিল্পী রথকার ও তক্ষক তাদের পদমর্যাদা হারিয়ে শূদ্রদের পর্যায়ে নেমে এসেছিল। খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে শূদ্ররা বিভিন্ন ধরনের শিল্প বৃত্তির সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছিল এবং বিভিন্ন শিল্পকর্মে নিযুক্ত ব্যক্তি যেমন মৃৎশিল্পী, চর্মশিল্পী, কর্মকার প্রভৃতিরা পরিচিত হয়েছিল জাতি হিসেবে। এইভাবে সৃষ্টি হয়েছিল কর্মভিত্তিক বংশানুক্রমিক এই গোষ্ঠীগুলোর।

প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে পণ্ডিতমহল আজ সুনিশ্চিত সে অজয়-ময়ূরাক্ষী-কোপাই-কুনুর-দামোদর নদী বিধৌত অঞ্চলে বাংলার প্রাচীন সংস্কৃতির প্রকাশ হয়েছিল দ্বিতীয়-প্রথম খৃষ্টপূর্ব সহস্রাব্দে। এই সংস্কৃতি ছিল একান্তভাবে

লোকায়ত গ্রামীণ সংস্কৃতি পাণ্ডুরাজার ঢিবি উৎক্ষণণের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে সে, ইতিহাসের এই ঊষাকালে মানুষ কেমনভাবে অগ্রসর হয়েছিল যাযাবর বৃত্তি পরিত্যাগ করে, একটি স্থায়ী কৃষিকার্য ও পশুপালন ভিত্তিক গ্রাম সমাজের প্রবর্তনের পথে। লোকাযত শিল্পী মানসের রূপটিও উদ্ভাসিত হয়েছিল পাণ্ডুরাজার ঢিবি, বানেশ্বর ডাঙ্গা, মহিষাদল থেকে সংগৃহীত পোড়ামাটির সামগ্রীগুলোর মধ্যে। পাণ্ডুরাজার ঢিবি থেকে প্রাপ্ত চিত্রসমন্বিত দুটি কৃষ্ণবর্ণের মৃৎপাত্র বিশেষ প্রংশসার দাবি রাখে। ধূসর সাদা বর্ণে সাবলীল রেখায় অঙ্কিত সর্পমুখে ময়ূর ও জাল সংলগ্ন একসার মৎস্য এই চিত্রদুটি তিন হাজার বছর পূর্বের বাঙলার শিল্পীর অসামান্য সৃষ্টির নজিরকে আমাদের সম্মুখে হাজির করেছে। দৈনন্দিন ব্যবহারের সাম গ্রীকে অসামান্য নান্দনিক ভাবে উপস্থাপিত কববার ক্ষেত্রে তৎকালীন শিল্পীমন যে পেছ্পা ছিল না এ যেন তার উজ্জ্বল উদাহরণ। পোড়ামাটির মাতৃকামূর্ত্তি ও জীবজন্তুর প্রতিকৃতি প্রচুর সংখ্যায় পাওযা গেছে চন্দ্রকেতুগড়, মঙ্গলকোর্ট, ডিহর, আটঘরা, তমলুক, পান্না প্রভৃতি স্থানে শিল্প, ঐতিহাসিকদের ভাষায় কালাতীত মৃৎশিল্প নামে খ্যাত পোড়ামাটির এই শিল্পসম্ভারগুলো নিবেদিত হতো গ্রাম্য দেবতার থানে। আজও বাঙলাদেশের গ্রামাঞ্চলে এই ধরনের পোডামাটির মাতৃকা মূর্ত্তি, হাতি ঘোড়া, মনসা ঘট প্রভৃতি নির্মিতি হয় লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান, দেবস্থানে উৎসর্গ করবার জন্য। লৌকিক ধর্মাচার নির্ভর কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ সমাজের ধারাবাহিকতাটি এইখানে স্পষ্ট হযে উঠেছে। এরই পাশাপাশি দৈনন্দিন সমাজের মূর্ত প্রতীককে রূপায়িত করেছে লৌকিক শিল্পীরা পাহাড়পুর সমস্থান ময়নামতীর পোড়ামাটির ফলকে। স্তূপ বা মন্দিরকে অলঙ্কৃত করবার জন্য উচ্চবর্গের মাগরীতিব শৈলীর স্থলে, কেমনভাবে বাঙলার লোক শিল্পীরা নিজেদের শিল্পকলাকে স্থান করে নিয়ে ছিল, শিল্প শাস্ত্রের কঠোর নির্দেশকে একেবারে উপেক্ষা করে। একথা ভাবতে আশ্চর্যই লাগে। এই শিল্পে প্রকৃতি পশু-পক্ষী ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে উপস্থিত হয়েছে দেবকুলও তবে একেবারে অপার্থিব রূপবর্জিত হয়ে। বৈদ্যদেবের কমৌলি লিপিতে কুম্ভকারের উল্লেখ আছে। নিধনপুর লিপিতে কুম্ভকার গর্তের উল্লেখ আছে।

বাংলার লোকাশিল্পের আদিতম সাক্ষ্য পোড়ামাটির উক্ত শিল্প বস্তু। এরই পাশাপাশি পরবর্তীকালের আর সে সমস্ত শিল্পের সন্ধান পাওয়া যায় বিভিন্ন লিপি ও সাহিত্য উপাদানের ভিত্তিতে তা হল, বাঁশ ও বেতের শিল্প, বস্ত্রশিল্প, লৌহশিল্প, কংসশিল্পের, কাষ্ঠশিল্প, তক্ষক ও স্থাপত্য শিল্প, স্বর্ণশিল্প প্রভৃতি। চারুকলার ক্ষেত্রে বাঙলার লোকশিল্পীরা তাদের স্বাক্ষর রেখেছিল লোকায়ত চিত্রশিল্প যেমন পট, পাটাচিত্র, পুথিচিত্র ইত্যাদিতে। এ ব্যতীত ব্রত ও অন্যান্য মঙ্গলাচারকে

কেন্দ্র করে বিভিন্ন আলপনায় দেওয়াল চিত্রে, কাঁথার সূচীকর্মে ও নানা ধরনের গৃহকলায় এর স্বাক্ষর ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট, দুঃখের বিষয় বাংলার তৎকালীন এইসব শিল্প নিদর্শনগুলি দু একটি ছাড়া আর কোনটাই আমাদের হাতে এসে পৌঁছয়নি।

তৎকালীন বাংলাদেশে সামাজিক বা অর্থনৈতিক দিক থেকে কতটা মর্যাদা সম্পন্ন ছিলেন বাঙলার এই শিল্পীকুল? এই প্রশ্নটির উত্তর পেতে হলে অবশ্যই সাহায্য নিতে হয় ইতিহাসের। বাংলাদেশে আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রসারের পূর্বে এই অঞ্চলের বাসিন্দা ছিল অসংখ্য কোমে বিভক্ত আদিম জনগোষ্ঠী। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সমূহ থেকে জানা যায় গ্রামীণ সংস্কৃতিতে লালিত উক্ত মানুষদের জীবন ও জীবিকা ছিল শিকার, কৃষি ও গৃহশিল্পকেন্দ্রিক। সমাজ জীবনের ভিত্তি ছিল গোষ্ঠী ও পরিবার ভিত্তিক। সহজ, সরল, অনাড়ম্বর গ্রামীণ সংস্কৃতির মধ্যে দিয়েই ঘটেছিল লোকশিল্পের আত্মপ্রকাশ, আদিপর্বের বাংলা ও তার জনগণের প্রতি সংস্কৃতির রূপকারদের ঘৃণা, অবজ্ঞা ও উন্নাসিকতার ভাব যে কেমনভাবে বর্ষিত হয়েছিল আমাদের ঐতিহ্যাশ্রিত প্রাচীন সাহিত্যগুলো তার প্রমাণ। বাঙলা ও তার সংজ্ঞা সম্বন্ধে সর্বপ্রথম সন্ধান পাওয়া যায় ঐতরেয় আরণ্যক গ্রন্থে। উক্ত গ্রন্থটিতে এই অঞ্চলের বসবাসকারীদের 'পক্ষী বিশেষাঃ' এই নিম্নমানের বিশেষণে ভূষিত করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে উক্ত মানুষেরা আর্যসংস্কৃতি বহির্ভূত। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে উক্ত মানুষদের আখ্যা দেওয়া হয়েছে দস্যু হিসেবে। এরাই ক্রমে পরিচিত হয়েছেন মহাভারতে 'ম্লেচ্ছ', ভগবতপুরাণে 'পাপ' বৌধয়ন ধর্মসূত্রে 'সংকীর্ণ সোনয়ঃ' ইত্যাদি আখ্যায়। জৈন আয়ারঙ্গ সূত্র ও বৌদ্ধ আর্য মঞ্জুশ্রী মূলকল্পেও এই অবজ্ঞার ছাপ স্পষ্ট। কালক্রমে এই বাংলাদেশে আর্য সভ্যতার প্রসার ও প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বর্ণবিন্যাসও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আর্য সংস্কৃতি বহির্ভূত সম্পূর্ণ ভিন্ন সংস্কৃতির ধারক বাহক আদিম কোমগুলোকে স্ববশে আনবার উপায় নির্ধারণ করেছিল আর্যরা তাদের বর্ণবিন্যাস ব্যবস্থার মাধ্যমে। এই বর্ণবিন্যাস ব্যবস্থার স্বীকার হয়েছিলেন তৎকালীন শিল্পীরা যা তাদের সামাজিক মর্যাদা ধ্বংস কমে নামিয়ে এনেছিল শূদ্রের পর্যায়।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, বৃহদ্ধর্মপুরাণ, ভবদেব ভট্টের প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ গ্রন্থে শিল্পীদের যে তালিকা দেওয়া হয়েছে সেইখান থেকে সহজে তাদের স্থান অনুমান করা যায়। বৃহদ্ধর্মপুরাণ ব্রাহ্মণ ব্যতীত তৎকালীন যুগের আর সমস্ত বর্ণকে স্থান দিয়েছে শূদ্রবর্ণের পর্যায়। কেননা এরা চতুবর্ণের যথেচ্ছ মেলামেশায় উৎপন্ন মিশ্র বর্ণের। এই পুরাণে উক্ত শূদ্র সংকর উপবর্ণের তিনটি উপবিভাগ রয়েছে যে উপবিভাগে তাদের বৃত্তি ও পেশাও নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এই বিভাজনের

ফলে উত্তম সংকর পর্যায়ে স্থান পেয়েছে তন্তুবায়। কর্মকার, কুম্ভকার, কাংসকার, শাঙ্খিক বা শঙ্খকার এবং মালাকার। মধ্যম সংকর পর্যায়ে তক্ষক ও স্বর্ণকার এবং একেবারে অধম সংকর পর্যায়ে তক্ষক ও চর্মকার। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণেও এই ধরনের বর্ণবিন্যাসের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে আবার সৎশূদ্র, অসৎশূদ্র ও অন্ত্যজ অজলচল পর্যায় এই তিনভাগের বর্ণবিন্যাস দেখা যায়। এইখানে সৎশূদ্র পর্যায়ে স্বর্ণকার, মালাকার, কর্মকার, শঙ্খকার, তন্তুকায়, বা কুবিন্দক, কুম্ভকার, কাংসকার, সূত্রধার, চিত্রকাররা স্থান পেয়েছে, অসৎশূদ্র পর্যায়ে রয়েছে স্বর্ণকার, সূত্রধার, চিত্রকার ও চর্মকার। ব্রহ্মশাপে চিত্রকার, সূত্রধার ও স্বর্ণকার সৎশূদ্র তালিকা থেকে অসৎশূদ্র পর্যায়ে নেমে এসেছে। ভবদেব ভট্ট প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ গ্রন্থে নিম্নবর্ণের সে তালিকাটি প্রস্তুত করেছেন তার মধ্যে চিত্রোপজীবী, শিল্পী, স্বর্ণকার এবং কর্মকারের উল্লেখ আছে। ভবদেবভট্ট এইসব শ্রেণীর বৃত্তিকে ব্রাহ্মণদের গ্রহণীয় নয় বলে আদেশ দিয়েছেন। এছাড়া চর্যাপদে একেবারে নিম্নবর্ণের অচ্ছুৎ পর্যায়ে ডোমদের উল্লেখ আছে। সেখানে বলা হয়েছে ডোম, নিষাদ প্রভৃতি নিম্নবর্ণের মানুষরা গ্রামের বাইরে বাস করতো। এদের জীবিকা ছিল বাঁশের তাঁত, চাঙারি প্রভৃতি নির্মাণ ও বিষয়ে।

এইসব শিল্পীদের মধ্যে লোকশিল্পীর স্থান কি ছিল? এ সম্বন্ধে উপাদানের অভাবে সঠিক কিছু মন্তব্য করা যায় না তবে এ সময়কার যেসব শিল্পীদের রাষ্ট্রে ও সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল তারা আর যাই হোক কখনোই লোকশিল্পী ছিলেন না রাজানুকূল্যে উচ্চকোটি সমাজের মনোরঞ্জন ও ইতিহাসে উক্ত পৃষ্ঠপোষকদের ভূমিকাকে উজ্জ্বল করে রাখার জন্য তারা তাদের শিল্পকর্মকে নিয়োজিত করেছিল। তারানাথ কথিত ধীমান ও তাঁর পুত্র বীটপাল খোদাই, মূর্তিশিল্প ও চিত্রকলার ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট শিল্পগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। এ ব্যতীত এই আমলের লিপিতে উৎকীর্ণ আর যেসব শিল্পীদের নাম পাওয়া যায় তাঁরা হলেন ভোগটের পৌত্র সুভটের পুত্র তাতট, সৎ সমতটনিবাসী শুভদাসের পুত্র সংকদাস বিমলদাস, সূত্রধার বিষ্ণুভদ্র, বিক্রমাদিত্যের পুত্র শিল্পী মহীধর ও তাঁর পুত্র শিল্পী শশিদেব, শিল্পী কর্ণভদ্র, শিল্পী তথাগতসার।· শিল্পীদের যে একটা সংঘও ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় বিজয়সেনের দেওপাড়া লিপিতে সেখানে বরেন্দ্রভূমির শিল্পীগোষ্ঠী চূড়ামণি রাণক শূলপাণির নাম উল্লিখিত হয়েছে। এমনকি ভূমিদানে রাজাকে পরামর্শ দেবার জন্য প্রথম কুলিকের নাম পাওয়া যায়। কুলিকের অর্থ শিল্পী।

অর্থাৎ গুপ্ত পর্ব থেকে সেনপর্ব পর্যন্ত লিপি ও সাহিত্যের বর্ণনায় যেসব শিল্পীদের পাওয়া যায় তারা একান্তভাবেই উচ্চবর্গের রুচি ও মতাদর্শে শিল্প কর্মে নিযুক্ত। মূলত লিপি উৎকীর্ণ করা ও বিভিন্ন ধর্মের দেবাদেবীর মূর্তি

নির্মাণ করাই. এদের প্রধান জীবিকা ছিল। তবু সামাজিক অনুশাসনে এরাই ছিল নিম্নস্তবের মানুষ।

এই পটভূমিকায লোকশিল্পীদের অবস্থাটা যে আরো মর্মান্তিক হবে তা আর বলবার অপেক্ষা রাখে না; রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতা লাভে অসমর্থ অজ্ঞাত শিল্পীকুলেব সৃজিত ঐসব সৃষ্টি-সম্ভার কালের স্রোতে সহজেই বিলীয়মান হয়ে গিয়েছিল। অথচ কি সেই গৃহশিল্প যা বাঙলার মানুষ কৃষি কার্যের পাশাপাশি জীবিকা অর্জনের জন্য বেছে নিয়েছিলেন? তার কোন হদিশ আমরা পাই না। অথচ বর্তমানের ক্ষীযমান লোকশিল্পের যেমন পট, শোলা, মৃৎশিল্প, বাঁশ ও বেতের শিল্প, কাষ্ঠ শিল্প ধাতুশিল্প—-ঢোকবা প্রভৃতির মাধ্যমে আমরা সহজেই আন্দাজ করতে পারি যুগ যুগ দরে এগুলো নির্মিত হতো। লোকশিল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল বংশানুক্রমিক ভাবে ঐতিহ্যানুসারে সমষ্টিগত চেতনার শৈল্পিক প্রকাশ। এই বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই গ্রামীণ কৌম সমাজের যৌথ জীবনচর্চ্চার চেতনাটা সহজেই চোখে পড়ে অথচ আদিপর্বেব এই নিদর্শন গুলো আজ আমাদের সেই। যে সমস্ত উপাদান থেকে আমরা এদের কথা জানতে পারি তার সংখ্যাও অত্যন্ত স্বল্প। তাই প্রাচীন বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতিকে গভীরভাবে অনুধাবনের জন্য ঐ বর্গের লোকশিল্পেব স্বরূপে ও সন্ধানে আমাদের আরো ভালোভাবে অগ্রসব হতে হবে।

সূত্র নির্দেশ

১। নীহাববঞ্জন বায— বাঙালীব ইতিহাস (আদিপর্ব)
২। দীনেশচন্দ্র সেন— বৃহৎবঙ্গ, ১ম ও ২য খণ্ড
৩। আব.এন.মিশ্র— এ্যানসেন্ট আর্টিষ্ট অ্যান্ড আর্ট অ্যাকটিভিটি
৪। ডি. ডি. কোশাম্বি— কালচাব অ্যান্ড সিভিলাইজেশান অব এ্যানসিয়েন্ট ইন্ডিয়া
৫। কল্যাণকুমার গাঙ্গুলী— বাংলাব লোকশিল্প
৬। অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়— বঙ্গলক্ষ্মীর ঝাঁপি
৭। তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকাব—পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্প
৮। অশোক ভট্টাচার্য্য— বাংলার চিত্রকলা
৯। গৌতম সেনগুপ্ত/মধুবিমা সেনগুপ্ত— প্রচিন বাংলার লোকায়ত শিল্পধারা
১০। রামশবণ শর্মা—প্রাচীন ভাবতে শূদ্র

দেউলবাড়ি প্রতিমালেখর দেবী শর্বাণী

শম্ভুনাথ কুন্ডু

বাংলাদেশের ত্রিপুরার কুমিল্লা জেলাব প্রায় ২০ মাইল দক্ষিণে চৌদ্দগ্রাম থানার অধীন দেউলবাড়ি গ্রামের ধ্বংসস্তূপ থেকে একটি অষ্টধাতুব দেবীমূর্তি আবিষ্কৃত হয বর্তমান শতকের প্রথম দশকে। মূর্তিটির পাদপীঠে উৎকীর্ণ লিপি থেকে দেবী এবং দেবীর প্রতিষ্ঠাত্রীর নাম ও পবিচয় পাওযা যায। দেবীর নাম শর্বাণী আর প্রতিষ্ঠাত্রীর নাম প্রভাবতী দেবী। তিন পংক্তির মূর্তিলেখ থেকে জানা যায় যে, মহাদেবী প্রভাবতী হলেন খড়গবংশীয দানশীল ও প্রতাপশালী রাজা দেবখঙ্গের প্রধানা মহিষী। এই দেবখঙ্গেরও পরিচয এখানে উৎকীর্ণ আছে। তিনি হলেন খঙ্গোদ্যমের পৌত্র এবং জাতখঙ্গের পুত্র। জানা যায যে, মহাদেবী প্রভাবতী মূর্তিটিকে স্বর্ণপত্রে আবৃত করিযেছিলেন। আবও লক্ষণীয ব্যাপার হল যে মূর্তিলেখটি যে প্রতীকচিহ্ন দিয়ে শুরু হয়েছে তার অর্থ হলো সিদ্ধি হোক—"সিদ্ধিরস্তু" যা বৌদ্ধ নরপতিদের লেখে প্রারম্ভিক মঙ্গলাচরণরূপেই প্রচলিত। এই মূর্তিটির সঙ্গে কযেকটি লিঙ্গ যার মধ্যে একটি লেখযুক্ত এবং একটি অষ্টধাতুর সূর্যমূর্তিও আবিষ্কৃত হযেছিল।

দেবী শর্বাণী পাদপীঠে উৎকীর্ণ লেখটি এখানে উদ্ধৃত করা হল:

১ম পংক্তি: (সিদ্ধিরস্তু) স্বস্তি খঙ্গোদ্যমো নাম নৃপাধিবাজস্তৎসুনুরাসীদ্ভুবি জাত খঙ্গঃ। তদাত্মজো দানপ—

২য় পংক্তি: তিঃ প্রতাপী শ্রীদেবখঙ্গো বিজিতারিখঙ্গঃ। রাজ্ঞস্তস্য মহাদেবী মহিষী শ্রী প্রভাবতী শর্বাণী প্রতিমাং।

৩য় পংক্তি: ভক্ত্যা হেমলিপ্তামকারয়ৎ।[১]

মূর্তিলেখটির অর্থ হল: সিদ্ধি হোক—স্বস্তি হোক। খঙ্গোদ্যম নামে (এক) রাজাধিরাজ ছিলেন। তাঁর পুত্র জাতখড়গ নামে পৃথিবীতে পরিচিত হন। তাঁর মহাপ্রতাপশালী এবং দানশীল পুত্র দেবখড়গ শত্রু ধ্বংসকারী খড়গস্বরূপ ছিলেন। তাঁর প্রধানা মহিষী শ্রীযুক্ত প্রভাবতী ভক্তিবশে শর্বাণী প্রতিমাটিকে স্বর্ণপত্রে আবৃত করিয়েছিলেন।

লেখ থেকে সমতটের খড়গবংশের প্রতিষ্ঠাতা খড়গোদ্যম এবং তাঁর পুত্র জাতখড়গ ও পৌত্র দেবখড়গের (আ. ৬৬০—৮৫) নাম উৎকীর্ণ আছে। এই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ নামগুলি আমরা দেবখড়গের আস্রফপুর শাসনদ্বয়েও পেয়েছি[২]। এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নবপতি দেবখড়গের একটি শাসন থেকে আমরা তাঁর প্রধানা মহিষী প্রভাবতীদেবীরও দানশীলতার পরিচয় পেয়েছি—তিনি বৌদ্ধমঠে কিছু ভূমিদান করেছেন।

নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় মূর্তিটির বর্ণনা দিতে গিয়ে জানিয়েছেন যে, দেবীমূর্তিটি ২০" উচ্চতাবিশিষ্ট হলেও যথেষ্ট গুরুভার সম্পন্ন। দেবী অষ্টভুজা এবং সিংহবাহিনী। সিংহের পৃষ্ঠোপরি পদ্মাসনে তিনি দণ্ডায়মানা। তাঁর দুই পার্শ্বে চামরধারিণী দুই পরিচারিকা। দেবীর অষ্টভুজে ঘটিকাক্রমে (Clock wise) শর, অসি, চক্র, শঙ্খ, ত্রিশূল, ঘণ্টা, খেটক এবং ধনু বিদ্যমান। মূর্তিটির লক্ষণ, লাঞ্ছন ও আয়ুধবিন্যাসের ভিত্তিতে ভট্টশালীমহাশয় এই দেবীকে ভদ্রদুর্গা, ভদ্রকালী, অম্বিকা, বেদগর্ভা এবং ক্ষেমংকরী দেবীমূর্তি বলেই চিহ্নিত করেন[৩]। অবশ্য তিনি এই মূর্তিপ্রতিষ্ঠার বহু পরবর্তীকালে রচিত শারদাতিলকতন্ত্রে (১১।৭৫) বর্ণিত দেবীমূর্তি নির্মাণবিধির ভিত্তিতেই একথা মনে করেন। মহিষমর্দিনী মূর্তির সঙ্গে এই দেবীর সাদৃশ্য অত্যধিক, ব্যতিক্রম শুধু দেবীর বামপার্শ্বস্থ একটি ভুজে যেখানে ঘণ্টা সন্নিবেশিত, মহিষমর্দিনীমূর্তিতে সেখানে তর্জনীমুদ্রার নির্দেশ আছে। ভট্টশালী মহাশয় দেবীর স্বরূপনির্ধারণে বেশ কয়েক শতাব্দী পরবর্তীকালে রচিত তন্ত্রশাস্ত্রের আশ্রয় নিয়ে পরবর্তীকালের সমাজে প্রচলিত ভদ্রদুর্গা, ভদ্রকালী প্রমুখা দেবীদের সঙ্গে সাদৃশ্যবিধান করেছেন। কিন্তু আমাদের মনে হয়, প্রভাবতী-প্রতিষ্ঠাতা শর্বাণীপ্রতিমা সপ্তম শতকের বঙ্গীয় সমাজে উক্ত নামেই সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন। যে কোন কারণেই হোক, পরবর্তীকালে দেবীমূর্তি বর্ণনায় শর্বাণী বিস্মৃতা হয়ে পড়েছিলেন শাস্ত্রকারদের স্মৃতিতে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে 'শর্বাণী' নামটির প্রাচীনত্ব কিন্তু কম নয়। শিবের নামান্তর 'শর্ব' এর শক্তিরূপে তিনি স্বীকৃতা। অথর্ববেদে রুদ্রনামের তালিকায় 'শর্ব' নামটি দৃষ্ট হয়[৪]। যজুর্বেদের 'শতরুদ্রীয়স্তোত্রে' ও রুদ্র 'শর্ব' রূপে স্তুত[৫]। পুরাণগুলিতেও শিব 'শর্ব' রূপে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন[৬]। শর্বশক্তি শর্বাণী তাই মা-পার্বতী-রুদ্রাণীর সঙ্গে অভিন্না রূপেই গ্রহণীয়া। পরবর্তীকালে রচিত ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের প্রকৃতিখণ্ডে (৫৭।২) দেবী দুর্গার ষোড়শ নামের তালিকায় শর্বাণী অন্তর্ভুক্ত। এই পুরাণে শর্বাণী নামের তাৎপর্য বিশ্লেষণে উক্ত হয়েছে যে, যিনি বিশ্বচরাচর সমস্ত প্রাণীবর্গকে জন্ম, মৃত্যু, জরা প্রভৃতি দান করেন এবং সকলকে মোক্ষও প্রদান করেন। সেই দেবীই জগতে শর্বাণী নামে প্রসিদ্ধ :

সর্বান্ মোক্ষং প্রাপয়তি জন্ম-মৃত্যুজবাদিকম্।
চরাচবাংশ্চ বিশ্বস্থান্ সর্বাণী তেন কীর্তিতা।।[৭]

শুধু তাই নয, ধর্মপালের (আ. ৭৭৫-৮১৩ খ্রীঃ) খালিমপুর তাম্রশাসনে ধর্মপালজননী দেবদেবীর পাতিব্রত্যের বর্ণনা প্রসঙ্গে তাঁকে শিবের শর্বাণীর সঙ্গে উপমিত করা হয়েছে—'সর্বাণীবশিবস্য'[৮]।

একথা সর্বজনবিদিত যে সমতটের খড়গবংশীয রাজাবা সকলেই বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নবপতি দেবখড়গেব প্রধানা মহিষী প্রভাবতী দেবী কর্তৃক এই দেবীমূর্তি প্রতিষ্ঠা কিসেব ইঙ্গিত বহন কবে তা আলোচ্য নিবন্ধে পর্যালোচনার অবকাশ রাখে। একথা বিস্মৃত হলে চলবে না যে এই মূর্তিপ্রতিষ্ঠা নিছক একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয। এই দেবীপ্রতিষ্ঠার পশ্চাতে তৎকালীন সামাজিক ও ধর্মীয় কারণ অনুসন্ধান অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

খড়্গনবপতিরা 'পরমসৌগত' হলেও তাদেব কৌলিক ধর্ম যে শৈবধর্ম ছিল তা জানা যায তাদের বাজকীয সীলমোহর ও মুদ্রায বৃষলাঞ্ছন দেখে। পরবর্ত্তীকালে বৌদ্ধধর্মের আশ্রয নিলেও তাঁবা তাঁদেব সীলে কুলধর্মেব অতীতস্মৃতি-চিহ্নটুকু সযত্নে রক্ষা করে গেছেন। যেমন হর্ষবর্ধন বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ কবার পবও শিব এবং সূর্যের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম আনুগত্য বজায রেখেছিলেন যা হিউয়েন-সাঙের বিবরণী থেকেই জানা যায়[৯]। সুতরাং যে বাজবংশের শৈবানুগত্য তাঁদেব সীলে প্রতিফলিত সেই বংশের প্রধানা মহিষী কর্তৃক শিবশক্তিরূপিণী শর্বাণী মূর্তিপ্রতিষ্ঠা মোটেই অস্বাভাবিক নয। তাছাড়া সমতট অঞ্চলে শৈবধর্মের বিশেষ জনপ্রিযতাব সংবাদ আমরা আগেই পেযেছি। দ্বাদশাদিত্য বৈন্যগুপ্তের (আ. ৫০৭ খ্রীঃ) গুনৈঘর তাম্রশাসনে বৈন্যগুপ্ত নিজেকে ভগবান মহাদেবের চবণাশ্রিত বলে পরিচয দিয়েছেন—"ভগবন্মহাদেবপাদানুধ্যাতো মহারাজঃ শ্রী বৈন্যগুপ্তঃ কুশলী"[১০]। উল্লেখ থাকে যে, প্রভাবতী দেবীর পৌত্র, রাজবাভট্টের পুত্র বলভট "পরমমাহেশ্বর" ছিলেন বলে জানা যায়[১১]। অনুমিত হয, তিনি মাতামহীর শৈবানুরক্তিব দ্বারা ভীষণভাবে প্রভাবিত হযে রাজধর্ম পরিত্যাগ করে কৌলধর্মের উপরই তাঁর আস্থা পুনরায় স্থাপন করেন। অর্থাৎ উক্ত অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম বাজধর্মরূপে মর্যাদা পেলেও প্রজাপুঞ্জের মধ্যে পৌবাণিক শৈবধর্ম বিশেষভাবে আদরনীয় হয়ে উঠেছিল। সম্ভবত প্রজাদের সামাজিক ও ধর্মীয ধ্যানধারণা এবং বিশ্বাসের মর্যাদা দেবীর জন্যই মহারাণী এই মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন জনকল্যাণের শুভ কামনার তাগিদেই। একথা তো ভুললে চলবে না যে কোন দেবদেবীর মূর্তিপ্রতিষ্ঠার মূলে থাকে উক্ত অঞ্চলের সাধারণ মানুষের প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধা। কারণ মূর্তিপ্রতিষ্ঠা হয় পূজার্চনার প্রয়োজনেই। প্রভাবতী দেবী জনগণের সেই চাহিদার পূর্ত্তি ঘটিয়েছিলেন বলেই অনুমিত হয়।

শৈব ধর্মের সঙ্গে সঙ্গে শাক্ত-ধর্ম অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত হওয়ায় এই শক্তি-ধর্মও যে এই এলাকায় জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল তার আর একটি প্রমাণ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। এই অঞ্চলেই অজ্ঞাতনামা কোন এক নরপতির স্বর্ণমুদ্রার পশ্চাদ্ভাগে শর্বাণীদেবীমূর্তির মতোই অষ্টভুজা এক দেবীমূর্তি উৎকীর্ণ আছে। দেবীর ভুজস্থিত আয়ুধবিন্যাস স্পষ্ট না হলেও ইনি যে শিবশক্তিরূপিণী দুর্গা তা সহজেই অনুমেয়। অনন্ত সদাশিব আলতেকার মনে করেন শশাঙ্কপরবর্তী কোন অজ্ঞাতনামা রাজা কর্তৃক এই স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন হয়েছিল।[১২] আমাদের ধারণা সমাচারদেবই বঙ্গদেশের প্রথম রাজা যিনি গুপ্তবংশীয় মুদ্রার প্রতীকী (device) ঐতিহ্যভেঙ্গে স্বর্ণমুদ্রায় লক্ষ্মীর পরিবর্তে সরস্বতীর মূর্তি উৎকীর্ণ করেন। সুতরাং সমাচারদেব পরবর্তী কোন রাজা হয়তো এই মুদ্রার প্রচলন করেন।[১৩]

বস্তুত খড়্গদের রাজত্বের আগে থেকেই প্রাচীন সমতট অঞ্চলের ধর্মীয় আকাশটি যে পৌরাণিক শাক্ত-ধর্মের দ্বারা রঞ্জিত হয়েছিল তা এই আলোচনা থেকে স্পষ্টতর হয়। সাহিত্যগত প্রমাণরূপে দেবীপুরাণে উল্লিখিত প্রাসঙ্গিক তথ্যটি এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। এই পুরাণে কথিত আছে যে দেবী বিভিন্নরূপে রাঢ়ী, বরেন্দ্র, কামরূপ-কামাখ্যা, ভোটদেশে বামাচারী সম্প্রদায় কর্তৃক পূজিত হতেন।[১৪] যদিও পণ্ডিতেরা দাবী করেন যে দেবীপুরাণ সপ্তম শতকের শেষভাবে রচিত হয় কিন্তু পুরাণগুলির রচনাকাল সম্পর্কে বিশেষজ্ঞরা সংশয়মুক্ত নন। তাই এই সাহিত্যগতপ্রমাণ ঘাতসহ নয় বলেই দৃঢ়তার সঙ্গে কিছু বলা যায় না। পক্ষান্তরে, লেখসম্বলিত এই মূর্তি সমস্ত সংশয় ছিন্ন ক'রে নিজের মাহাত্ম্য ও জনপ্রিয়তা ঘোষণায় সোচ্চার। তাই একথা দৃঢ়তার সঙ্গে বলা যায় যে দেউলবাড়ির শর্বাণী মূর্তি প্রাচীন বঙ্গসমতট অঞ্চলে শাক্ত-ধর্মের অভ্যুদয়, উপাসনা ও ব্যাপক জনপ্রিয়তার প্রথম ঐতিহাসিক নিদর্শনরূপে গণ্য হওয়ার দাবী রাখে।

সূত্র নির্দেশ

১. 'Some Image Inscriptions from East Bengal', Epigraphia Indica, Vol XVII, PP. 357 359.

২. B.M. Morrison, Lalmai a Cultural Center of Early Bengal, Washingtion, 1974, PP, 99 101; Sircar D.C., Select Inscription bearing on Indian History and Civilization, Vol.II, Delhi, 1983, PP. 41 ft.

৩. Bhattasali, N.K., Iconography of Buddhist and Brahmanical Sculptures in the Dacca Museum, Dacca, 1929, PP. 203-205; Plate No. LXX.

৪. অথর্ববেদ, ৪র্থ কাণ্ড, ষষ্ঠ অনুবাক, তৃতীয় সূক্ত।

৫. যজুর্বেদ, ৪র্থ কান্ড ৫ম প্রপাঠক, ৫ম মন্ত্র।

৬. বিষ্ণুপুরাণ ১।৮।৫-৬; কূর্মপুরাণ, উপবিভাগ ১৮।৩৮।
৭. ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, প্রকৃতিখন্ড, ৫৭।১৭।
৮. অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, গৌড়লেখমালা, রাজসাহী, ১৩১৯, পৃ.১২ (শ্লো.৫)।
৯. Epigraphia Indica, Vol. XVII, P. 358.
১০. Sircar D.C., Select Inscriptions, Vol.I, Calcutta 1965, PP. 340 ff; 1. H.Q., Vol. VI P. 561 ff.
১১. B.M. Morrison, Op.cit, p. 101.
১২. Altekar, A.S., The Coninage of the Gupta Empire, Benaras, The Journal of the Numismatic Society of India, Vol. XLIX, 1987, PP. 98 99.
১৩. Kundu, S.N. Eight armed Goddess on a Gold Coin of Bengal, The Journal of the Numismatic Society of India, Vol. XLIX, 1987, PP. 98 99.
১৪. দেবীপুরাণ, ৩৯।১৪-১৫; ৪২।৯।

পূর্বভারতে আদি পর্বের নগরায়ণের প্রেক্ষিত ও লৌহ প্রযুক্তির ভূমিকা

গৌরীশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাচীন ভারতবর্ষের বিশেষ করে পূর্ব-ভারতের নগরায়ণের (urbanisation) ধারাবাহিক ও পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস আজ অবধি রচিত হয়নি। অথচ এই ইতিহাস ছাড়া, বিশেষ করে পূর্বভারতে আর্থ সংস্কৃতির সম্প্রসারণের পাশাপাশি প্রথম নগরায়ণের আত্মপ্রকাশ ও তার পিছনে নিহিত কার্যকারণগুলি সম্পর্কে যথাযথ ধারণা গড়ে না উঠলে ঐ অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক রাষ্ট্রীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনের অনেকটাই অনাবিষ্কৃত থেকে যায়। যাই হোক নগরায়ণ বা urbanisation প্রাচীন পূর্বভারতের জীবনচর্যার যে ব্যাপক ও সর্বাত্মক পরিবর্তন এনেছিল এবং পূর্বাঞ্চলের ঐতিহ্যবাহিত গ্রামীণ সংস্কৃতিতে যে টানাপোড়েন তুলেছিল তার রূপরেখা অংকন এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়; আমি শুধু এখানে পূর্বভারতে প্রথম পর্যায়ের নগরায়ণের প্রেক্ষাপট আলোচনা প্রসঙ্গে লোহার ব্যবহারের অপরিসীম গুরুত্ব তুলে ধরার মধ্য দিয়েই আমার বক্তব্যকে সীমাবদ্ধ রাখতে চাই। বলাই বাহুল্য যে পূর্বদিকে আর্য সভ্যতার সম্প্রসারণ নগরায়ণ সংক্রান্ত মূল প্রশ্নটির সঙ্গে অনেকটাই নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত।

বৈদিক যুগের শুরুতে অর্থাৎ ঋক্-বৈদিক পর্বে আর্য সংস্কৃতির কেন্দ্র ও পরিমণ্ডল সপ্তসিন্ধু অঞ্চল ও আলাদাভাবে সরস্বতী নদীর তীরে প্রতিষ্ঠিত থাকলেও পরবর্তীকালে তা পূর্ব দিকে প্রসারিত হতে থাকে। বৈদিক ঔপনিষদিক যুগের শেষ পর্বে 'আর্যাবর্তে'র সীমা পূর্বভাগে সম্প্রসারিত হতে থাকে এবং আনুমানিক ৭০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের কিছু আগে বিহারের রাজগীর-এ আর্য-উপনিবেশ গড়ে উঠে[১]। আর্য-প্রাধান্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত বিষয় দুটি হল— অশ্ব ও লৌহ। পূর্বভারতে বিহারের রাজগীরের সংলগ্ন পার্বত্যভূমিতে আকরিক লোহা আবিষ্কার আর্য সম্প্রসারণবাদীদের এই অঞ্চলের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। এই পর্যায়ে লৌহ প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার এক সম্পূর্ণ অভিনব আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামো রচনা করেছিল যার পরিণতিতে এই অঞ্চলে নগরায়ণের সূত্রপাত অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। পূর্বভারতের দক্ষিণ-পূর্ব বিহার, বিশেষভাবে ধলভূম, মানভূম, সিংভূম জেলাগুলি হতে প্রচুর পরিমাণে উন্নত

মানের আকরিক লোহা আনুমানিক ৮০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ থেকেই নিষ্কাশিত হচ্ছিল।[২] উত্তর ও পূর্ব ভারতের নগরায়ণে লোহার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে প্রায় নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। শুধু আমাদের দেশই নয়, মানব সভ্যতার ইতিহাসে এক নতুন যুগের প্রবর্তন ঘটেছিল লোহার আবিষ্কার ও ব্যবহারের মধ্য দিয়ে। এই প্রসঙ্গে মার্ক্স ও এ্যাঙ্গেলস্-এর মূল্যায়নকে স্মরণ করা যেতে পারে। তাঁরা দেখিয়েছেন যে লোহা একদিকে যেমন ছিল শস্তা ও সুলভ ধাতু এবং অপরদিকে এর তৈরী যন্ত্রপাতির পাশে পাথর বা পরিচিত যে কোন ধাতুর তৈরী যন্ত্রপাতি এতটা কঠোর ও ধারালো হয়ে উঠতে পারে না। লোহা যেমন বৃহদায়তন কৃষি ব্যবস্থার জন্ম দিযেছিল তেমনি জঙ্গল পরিষ্কার করার মধ্যে দিয়ে কৃষির সম্প্রসারণও ঘটিয়েছিল।[৩]

প্রাচীন ভারতীয় সমাজজীবনেও লোহার ব্যবহারের প্রভাব ছিল অনতিক্রম্য[৪]। কার্যত লোহার ব্যাপক ব্যবহার প্রাচীন পূর্ব ভারতের জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক জীবনকে বিপ্লবায়িত কবেছিল। বিজযকুমার ঠাকুর[৫] তাঁর সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, গঙ্গা অববাহিকার প্রথম লোহা-ব্যবহারকাবীদের প্রাকৃতিক জলবায়ু তাদের লৌহ প্রযুক্তির প্রয়োগের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। লোহাব সহজলভ্যতা ঐ অঞ্চলে জঙ্গল কেটে চাষ জমি তৈরী করার পদ্ধতিতে আরো বেশী গতি দান করেছিল। দ্রুতগতিতে চাষের প্রয়োজনে কৃষি যন্ত্রপাতি নির্মাণে লোহার প্রয়োগ কৃষি উৎপাদনে জোয়ার এনেছিল এবং বাড়তি উৎপাদন এই এলাকায় নগরায়ণের সহায়ক হযে উঠেছিল বললে অত্যুক্তি হয় না। লৌহের ব্যবহার তৎকালীন কৃষি-অর্থনীতিতে তাৎপর্যপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলেছিল। প্রকৃতপক্ষে, কৃষির মূলগত প্রকৃতিই এর ফলে পরিবর্তিত হয়ে পড়েছিল। লোহার আবিষ্কার ও ব্যবহারের ফলে জীবনধারণোপযোগী অর্থনীতি রূপান্তরিত হয় খাদ্য-উৎপাদনমুখী অর্থনীতিতে যেখানে বাড়তি উৎপাদন সম্ভব হয়েছিল যা আবার নগরগুলির আবির্ভাব ও প্রতিপালনের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। বাড়তি উৎপাদনের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং নগরায়ণের সম্বন্ধ অত্যন্ত নিবিড়তর ছিল। বিজয়কুমার ঠাকুরের একটি প্রাসঙ্গিক উক্তি উদ্ধৃত করা যেতে পারে—'Iron technology, played the most crucial role in the emergence of towns in the early historical period.'[৬]। ভারতবর্ষে এভাবে তথাকথিত লৌহযুগে উৎপাদন ব্যবস্থার উপর লৌহ প্রযুক্তির প্রভাব তীব্রভাবে অনুভূত হয়েছিল। কার্বন চতুর্দশ পরীক্ষা পদ্ধতি অনুসারে জানা যাচ্ছে যে প্রায় ৭০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ হতে বাংলা ও বিহারের বিভিন্ন এলাকায় লোহার প্রচলন ছিল।[৭]

প্রখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক ভি. গর্ডন চাইল্ড সর্বপ্রথম ১৯৩৬-এ নগরায়ণের ধারণা প্রচার করেন এবং ১৯৫০ সালে তিনি নাগরিক পুনরুজ্জীবনের কয়েকটি শর্তের

উল্লেখ করেন। ভারতীয় নগরায়ণের পক্ষে সমানভাবে প্রযোজ্য ঐ শর্তগুলির মধ্যে অন্যতম প্রধান হল বাড়তি কৃষিজ উৎপাদন। এই বাড়তি উৎপাদন কেবলমাত্র কৃষি সংক্রান্ত উন্নত জ্ঞান ও লোহা থেকে প্রস্তুত অত্যন্ত উপযোগী কৃষি যন্ত্রপাতির সাফল্যের উপর বহুলাংশে নির্ভর ছিল[৮]। পশ্চাদভূমি হতে বাড়তি কৃষিজ উৎপাদনের ফলে নগরগুলির আবির্ভাব ঘটতে থাকে এবং তথাকার অনুৎপাদক নাগরিক বাসিন্দাদের ভরণ-পোষণের ভারও তার ফলে বহন করা সম্ভব হয়। বলা বাহুল্য যে প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত একদল মানুষ তাদেব সেই জ্ঞান কৃষিক্ষেত্রে আরোপের মধ্য দিয়ে বেশ বড় মাপের বাড়তি ফসল উৎপাদনে সক্ষম হয়েছিল। একটি অঞ্চলে এই সমস্ত দক্ষ কৃষকদের বাডতি উৎপাদনের উপর নির্ভরশীল পরভৃত অনুৎপাদক সম্প্রদায়ের মানুষদের আগমন এবং বসবাস একাধারে নগরায়ণের পদ্ধতিকে গতিশীল করে তুলেছিল এবং রাষ্ট্র ও সমাজের বিকাশে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল।

কৃষির পাশাপাশি পূর্বভারতে হস্তশিল্প-কারিগরী শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও লৌহ প্রযুক্তির ভূমিকা কম তাৎপর্যপূর্ণ ছিল না। বস্তুত নগরাযণ শুধুমাত্র বাডতি কৃষিজ উৎপাদনের কারণেই সম্ভব নয়; শিল্প-বাণিজ্যের সমৃদ্ধিও নগর গড়ে ওঠার পক্ষে অত্যন্ত জরুরী। রামশরণ শর্মামহাশয়[৯] দেখিযেছেন বিভিন্ন বৃত্তি বা পেশার বিশেষীকরণ ও বিভাজন কিভাবে বুদ্ধের যুগের নগরায়ণের বিশেষ সহায়ক হযে উঠেছিল। জাতকসমূহ ও গোড়ার দিকের বৌদ্ধ গ্রন্থগুলি থেকে বিভিন্ন প্রকার হস্তশিল্প ও কারিগরি শিল্পের উল্লেখ মেলে। আনুমানিক ৫ম খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের রচনা পাণিনির 'অষ্টাধ্যাযী'তেও একাধিক শিল্পের পরিচয মেলে। বস্তুত এ সমস্ত শিল্প সমূহের মধ্যে অধিকাংশই ছিল লোহার উপর নির্ভরশীল। কৃষি যন্ত্রপাতি ছাড়াও অস্ত্রশস্ত্র, তৈজসপত্র, আসবাবপত্র, ও অট্টালিকা নির্মাণে লোহার ব্যাপক ব্যবহার ঘটত এবং এই লোহার যোগান দিত রাজগীর, ধলভূম, সিংভূম, মানভূমের আকরিক লোহার খনিগুলি। খনিগুলির এহেন গুরুত্বের জন্য পরবর্তীকালে মৌর্যযুগে সমস্ত খনি রাষ্ট্রের একচেটিয়া মালিকানাধীনে আনা হয়েছিল এবং অস্ত্র নির্মাণ শিল্প ও জাহাজ নির্মাণ শিল্প পুরোপুরি রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত ভারী শিল্পে পরিণত হয়েছিল। উত্তর ভারতের রাজ্য-রাজনীতির প্রাণকেন্দ্র রাজগৃহ ও পরবর্তীকালে পাটলিপুত্রের সদর্প আত্মপ্রকাশের পিছনেও খুব সম্ভবতঃ পূর্বভারতের বিশেষত বিহারের আকরিক লৌহখনিগুলির বিশেষ অবদান ছিল।

সেকালেও শহরও নাগরিক কেন্দ্রগুলি আবশ্যিকভাবেই তাদের প্রতিবেশী কৃষিজ পশ্চাদভূমির উপর নির্ভরশীল থাকত। প্রাচীন ভারতে সাধারণভাবে সমাজ এবং অর্থনীতি অপরিহার্যভাবে ছিল গ্রামীণ এবং মজার ব্যাপার এই সব গ্রামীণ উপাদানগুলি এমনকি নগরীর প্রাকারের মধ্যেও সমানভাবে ক্রিয়াশীল ছিল। স্বাভাবিকভাবেই

ব্যাপক ও সুবিস্তৃত কৃষিজ পটভূমি ব্যতিরেকে একটি নাগরিক সভ্যতা কদাপি টিকে থাকতে পারে না। অন্যভাবে বলা যায় যে একটি নগরীর অত্যাবশ্যক প্রয়োজন হল তার সংলগ্ন বাড়তি উৎপাদনের এলাকা থেকে আসা খাদ্যশস্য যার সাহায্যে সে তার নাগরিক অনুৎপাদক সমাজকে প্রতিপালন করে থাকে। এই সূত্র ধরেই বলা যেতে পারে যে, নির্বিচারে সবকটি পুরাকালীন নাগরিক সভ্যতার ভিত্তিই ছিল কৃষি। প্রাচীন মিশর এবং ইউফ্রেটিসের নগর সভ্যতা এমনকি হরপ্পার নাগরিক সংস্কৃতিও তাদের সম্পদ ও প্রাণশক্তি সংগ্রহ করেছিল ভূমি থেকে। পূর্বভারতের নগরায়ণের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ছিল না। এভাবেই প্রাচীন পূর্ব ভারতের নগরায়ণের শর্ত হিসেবে ব্যাপক কৃষিজ উৎপাদনকে এবং কৃষির সাফল্য ও সম্ভাবনার পিছনে নিহিত লৌহ প্রযুক্তির ভূমিকাকে সক্রিয় থাকতে দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে, Iron technology বা লৌহ প্রযুক্তি ব্যতীত পূর্বভারতে নগরায়ণের গতি সন্দেহাতীতভাবে বিলম্বিত হতো।

সূত্র নির্দেশ

১। Kosambi, D.D., The Culture and Civilization of ancient India, Delhi, 1976, p. 89

২। ঐ, পৃষ্ঠা—৪9

৩। মার্ক্স ও এঙ্গেলস, নির্বাচিত রচনাবলী, মস্কো, ১৯৫৫, পৃষ্ঠা-৩১১

৪। Ghosh, Amalananda, Puratatva, No. 6, pp. 27 35

৫। Thakur, V.K., Urbanisation in Ancient India, দিল্লী, ১৯৮১, পৃষ্ঠা—১৬-১৭

৬। ঐ, পৃষ্ঠা – ৬৫

৭। Agarwal, D.P. & Kusumgar, S., Pre historical chronology and Radiocarbon Dating in India, 1974

৮। Childe, V. Gordon; 'The Urban Revolution' in Town Planning Review, Vol. 21, 1950, pp. 3-7

৯। Sharma, R.S., 'Iron and Urbanisation in the Ganga basin' in Indian Historical Quarterly, Vol. I, No. I, March, 1974, p. 101

আদি মধ্যকালীন বাংলার একটি আরোগ্যশালা

কৃষ্ণেন্দু রায়

ভারতবর্ষের নানাবিধ জ্ঞানচর্চার মধ্যে চিকিৎসাশাস্ত্রের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে এবং এর একটি সুদীর্ঘ ঐতিহ্যও আছে। যেমন অশ্বিনীকুমার ভ্রাতৃদ্বয়[১], খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক জীবক[২], পরবর্তীকালের চরক ও সুশ্রুত সংহিতা, কিংবা বাংলাদেশের পাল রাজত্বকালীন (খ্রীষ্টীয় ৭৫০ থেকে ১২০০ খ্রীষ্টাব্দে) চক্রপাণি দত্তের **'চিকিৎসা-সংগ্রহ'**, **আয়ুর্বেদ-দীপিকা** ইত্যাদি, পাল-পর্বের শেষ অধ্যায়ের নিদান-শাস্ত্রবিদ সুরেশ্বর ও বঙ্গসেন প্রমুখেরা উল্লেখ্য[৩]। এরই সঙ্গে এই বৃত্তিতে যারা বিশেষভাবে যুক্ত, তারাই বৈদ্য নামে অভিহিত। বৌদ্ধগ্রন্থে এদেরকেই বলা হয়েছে অম্বষ্ঠ বা প্রায় বৈদ্যের সমার্থক[৪]।

শাস্ত্র অনুযায়ী অম্বষ্ঠ হল—পরিণীতা বৈশ্য কন্যায় ব্রাহ্মণ হতে জাত সন্তান। আনুমানিক ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকের **বৃহদ্ধর্ম পুরাণ** অনুসারে অম্বষ্ঠেরা উত্তম সংকর গোষ্ঠীভুক্ত[৫]। উক্ত পুরাণেই বলা হয়েছে যে, অম্বষ্ঠ তথা বৈদ্যেরা আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে পারঙ্গম ও চিকিৎসকের বৃত্তিধারী[৬]। কিন্তু ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীর পূর্বে বৈদ্যদের সম্বন্ধে তথ্য কম। তবে লেখমালা থেকে এদের সম্বন্ধে তথ্য পাওয়া যায়।

আদি মধ্যযুগের বাংলায় বৈদ্যদের উল্লেখ তাম্রশাসনের মাধ্যমে অগ্রহার[৭] দানের ক্ষেত্রে পাওয়া যায়। যেমন শ্রীহট্ট[৮] থেকে পাওয়া নন্দবংশীয় রাজা শ্রীচন্দ্রের (আঃ ৯২৫—৭৫ খ্রীষ্টাব্দ) পশ্চিমভাগ তাম্রশাসন। এই তাম্রশাসনের মাধ্যমে দুজন বৈদ্যকে তিন পাটক করে মোট ছয় পাটক[৯] জমি দেওয়া হয়েছিল। এই বৈদ্যেরা দুটি মঠের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। দুটি মঠেই অগ্নি-বৈশ্বানর, যোগেশ্বর (শিবের রূপ বিশেষ), জৈমনি (বা জৈমিনি) এবং মহাকাল (শিবের রূপ বিশেষ যা বৌদ্ধদের মধ্যে বিশেষ জনপ্রিয়) পূজিত হতেন। পশ্চিমভাগ তাম্র শাসনে রাজা শ্রীচন্দ্রের দাক্ষিণ্যে এক বিশাল ব্রাহ্মণ নিবেশন গড়ে তোলার বিবরণ আছে। ব্রাহ্মণদের সঙ্গে সঙ্গে বিবিধ পেশাদারী গোষ্ঠী ও কারিগরদের নিবেশনেরও ব্যবস্থা করা হয়েছিল[১০]। এরা ব্রাহ্মণদের জীবিকা নির্বাহের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ। অতএব একথা মনে করা যেতে পারে যে, পশ্চিমভাগ তাম্রশাসনের বৈদ্যেরা ঐ মঠদুটির অধিবাসীদের সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু চি—কি—ৎ—সা—ল—য়ে—র কোন স্পষ্ট বিবরণ বা উল্লেখ নেই।

চিকিৎসালয় সম্বন্ধে তথ্য পাওয়া যায় সিয়ান শিলালেখ থেকে। পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার দক্ষিণ-পূর্বে স্থিত বোলপুরের (৮৮° পশ্চিম দ্রাঘিমাংশ ও ২৪° দক্ষিণ অক্ষাংশ) অদূরবর্তী সিয়ান গ্রামের শাহজাপুর অঞ্চলে মখদুম শাহ্ জালালের দরগা অবস্থিত। এই দরগায় যে-লেখমালা আবিষ্কৃত হয়েছে, তাকেই বলা হয় সিয়ান শিলালেখ। লেখটি পালবংশীয় রাজা নয়পাল (আঃ ১০২৭–৪৩ খ্রীষ্টাব্দ) কিংবা তাঁর পুত্র তৃতীয় বিগ্রহ পালের (আঃ ১০৪৩–৭০ খ্রীষ্টাব্দ); অর্থাৎ লেখাটি একাদশ শতকের প্রথম থেকে দ্বিতীয় ভাগের মধ্যে[১১]। এই লেখমালায় বহু সংখ্যক মন্দির-নির্মাণের এবং প্রতিমা-স্থাপনের কথা বলা আছে[১২]।

এইরকম একটি বিষ্ণু মন্দিরের সন্নিকটে রোগীদের রোগ আরোগ্যের জন্য একটি আরোগ্যশালা নির্মাণ করা হয়েছিল।

'আরোগ্য-শালামারোগ্য-হেতৌ
রোগবতাং নৃণাং[নাম্]।'

লেখমালায আরও বলা হ'য়েছে যে, উক্ত মন্দিরের নিকটেই আবার বৈদ্যদের জন্য বসতিও স্থাপন করা হ'য়েছিল—'তথা বৈদ্যবাসঃ
[কৃতো মন্দি] রস্যান্তিকে.....।।'[১৩]

পশ্চিমভাগ তাম্রশাসনের মত, সিয়ান শিলালেখটি ধর্মস্থানের সঙ্গে সংলগ্ন চিকিৎসাস্থানের আর একটি নজির। এইটিই প্রাচীন বাংলার সর্বপ্রথম লেখমালায় আরোগ্যশালার উল্লেখ।

'রোগবতাং নৃণাং' কথা দুটি থেকে একথা-ই বোঝা যায় যে, আরোগ্যশালাটি শুধুমাত্র ধর্মস্থানটির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের জন্য-ই ব্যবহৃত হত না; স্থানীয় সাধারণ মানুষেরাও অসুস্থ হলে পর এই আরোগ্যশালায় তারা চিকিৎসা পেতো। অথাৎ হাসপাতালটিতে[১৪] দুই ধরনের মানুষ চিকিৎসা পেতো—(১) মন্দিরের ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিরা এবং (২) স্থানীয় সাধারণ মানুষ। সেকালে মন্দির সংলগ্ন স্থানে চিকিৎসালয় স্থাপন করে অসুস্থ মানুষের চিকিৎসা করার লেখমালা-ভিত্তিক নজির আছে[১৫]।

পূর্বোল্লিখিত 'তথা বৈদ্যবাসঃ ....।' কথাগুলি থেকে বোঝা যায় যে, উক্ত মন্দিরের সন্নিকটে যথেষ্ট সংখ্যক বৈদ্যদের বসতি ছিল। যেমন স্মরণীয় প্রাচীন শ্রীহট্টের ব্রহ্মপুর যেখানে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণদের নিবেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বলাই বাহুল্য, আলোচ্য মন্দির সংলগ্ন বৈদ্যেরা অসুস্থ লোকেদের সেবায় নিযুক্ত ছিলেন এবং তাদের কর্মস্থল ছিল উক্ত আরোগ্যশালা[১৬]।

তাহলে প্রাচীন বাংলায় অন্তত দুটি নজির আছে যা-থেকে বোঝা যায় যে, বৈদ্যদের নিবাস ও ধর্মস্থল উভয়ই ধর্মস্থানের সঙ্গে যুক্ত। এবং নিছক ধর্মচর্চার সঙ্গেই নয়, ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলি জাগতিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গেও ঘনিষ্টভাবে যুক্ত ছিল।

সূত্র নির্দেশ

১. তর্কবত্ন পঞ্চানন (সম্পাদিত), বৃহদ্ধর্ম্ম পুবাণম্, উত্তবখণ্ড, কলিকাতা, ১৩৯৬, পৃঃ ৩৪৪, শ্লোক নং ৪০।

২. জালালসেখব জি. পি. ডিকশনাবী অব পালি প্রপাব নেমস, খণ্ড ১, নতুন দিল্লী, ১৯৮৩, পৃঃ ৯৫৭।

৩. বায নীহাববঞ্জন, বাঙ্গালীব ইতিহাস, আদিপর্ব, কলিকাতা, ১৪০০, পৃঃ ৫৭৯।

৪. এদেব বৃত্তি চিকিৎসা—তর্কবত্ন পঞ্চানন (সম্পাঃ), মনুসংহিতা, কলিকাতা, ১৩৯৭, দশম অধ্যায়, পৃঃ ২৯৫, শ্লোক নং ৪৭—'সূতাজনমাশ্বসাবথ্য মম্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতম্'।

৫. তর্কবত্ন পঞ্চানন (সম্পাঃ), বৃহদ্ধর্ম্ম পুবাণম্, উত্তব খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৯৬, পৃঃ ৩৪৪, শ্লোক নং ৪৩।

৬. ঐ, তদেব, পৃঃ ৩৪৪-৪৫, শ্লোক নং ৪৪-৪৭; তুলা—ঐ, মনুসংহিতা, কলিকাতা, ১৩৯৭, দশম অধ্যায, পৃঃ ২৯৫, শ্লোক নং ৪৭।

৭. অগ্রহাব হ'ল ধর্মস্থান বা পুবোহিত সম্প্রদায়েব উদ্দেশ্যে নিষ্কব ভূ-সম্পদ দান। এই বিষয়ে বিস্তাবিতভাবে জানতে হ'লে অবশ্য পাঠ্য চক্রবর্তী বণবীব, প্রচীন ভাবতেব অর্থনৈতিক ইতিহাসেব সন্ধানে, কলিকাতা, ১৩৯৮, সপ্তম অধ্যায, পৃঃ ১৫৪-৭৮।

৮. শ্রীহট্ট হ'ল বর্তমান উত্তব-পূর্ব বাংলাদেশেব সিলেট অঞ্চল—দে নন্দলাল, দ্য জিওগ্রাফিকাল ডিকশনাবি অব এনশেন্ট অ্যাণ্ড মিডিযাভাল ইণ্ডিয়া, দ্বিতীয সংস্কবণ, নতুন দিল্লী, ১৯৭৯, পৃঃ ১৯১; ভট্টাচার্য নবেন্দ্রনাথ, দ্য জিওগ্রাফিকাল ডিকশনাবি, এনশেন্ট অ্যাণ্ড মিডিয়াভাল ইণ্ডিযা, নতুন দিল্লী, ১৯৯১, পৃঃ ১৪৫; ২৩.৫৯—২৫.১৩ উত্তব অক্ষাংশ এবং শ্রীহট্টে অবস্থিত; উত্তবে খাসিয়া ও জযন্তীযা পাহাড়, পূর্বে কাছাড় জেলা, দক্ষিণে পার্বত্য ত্রিপুবা এবং পশ্চিমে ত্রিপুবা ও ময়মনসিংহ জেলা—দেব বণেন্দ্রনাথ, শ্রীহট্ট পবিচয়, কলিকাতা, ১৯৮৩, পৃঃ ৩।

৯. 'পাটক', 'দ্রোণবাপ', 'কুল্যবাপ' ইত্যাদি জমিব পবিমাপ বিশেষ। ১ পাটক=৪০ দ্রোণবাপ বা ৫ কুল্যবাপ। এখন, ১ কুল্যবাপ=১২৮/১৬০ বিঘা। অতএব, ৫ কুল্যবাপ=৫×১২৮/৫×১৬০ =৬৪০/৮০০ বিঘা জমি। অর্থাৎ ১ পাটক= কমপক্ষে ৬৪০ বিঘা জমি ধরা যেতে পাবে। সুতরাং ৩ পাটক=৩×৬৪০=১৯২০ বিঘা জমি—সরকাব ডি. সি, 'উদমান ইন বেঙ্গল এপিগ্রাফস্', ইণ্ডিয়ান হিস্টোরিকাল কোয়ার্টারলি, খণ্ড ২৬, সংখ্যা ৪, পৃঃ ৩১০-১১।

১০. এ-বিষয়ে খুব যুক্তি পূর্ণ আলোচনা পাওয়া যাবে—চক্রবর্তী রণবীর, 'অভিন্ন দেবতা, ভিন্ন মঠ : প্রাচীন শ্রীহট্টের একটি ব্রহ্মপুর', পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি পত্রিকা, সংখ্যা ৪, ১৩৯৮; সরকার ডি. সি, এপিগ্রাফিক ডিসকভারিস ইন ইষ্ট পাকিস্থান, কলিকাতা, ১৯৭৩, পৃঃ ১৯–৪০; ঐ, এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা, খণ্ড ৩৭, পৃঃ ২৮৯ থেকে; ঐ, সিলেক্ট ইনস্ক্রিপশন, খণ্ড ২, নতুন দিল্লী, ১৯৮৩, পৃঃ ৯২–১০০।

১১. সরকার ডঃ দীনেশচন্দ্র, শিলালেখ তাম্রশাসনাদির প্রসঙ্গে, কলিকাতা, ১৯৮২, পৃঃ ১০২।

১২. ঐ, তদেব, পৃঃ ১২১।

১৩. ঐ, তদেব, পৃঃ ১০৯, শ্লোক নং ৩৪।

১৪. আরোগ্যশালাকে হাসপাতালের (Hospital) সমার্থক মনে করা যেতে পারে—উইলিয়ামস্ মনিয়ের এম, এ স্যান্সক্রিট—ইংলিশ ডিকশনারি পুনর্মুদ্রণ, নতুন দিল্লী, ১৯৯০, পৃঃ ১৫১, স্তম্ভ নং ২।

১৫. রাজরাজদেবের (৯৮৫—১০১৪ খ্রীঃ) তাঞ্জাবুর মন্দির লেখমালা নং ৪ (২৬ তম রাজ্যবর্ষের=১০১১ খ্রীঃ)— এ মন্দিরের দক্ষিণ দিকের দেওয়ালে দ্বিতীয়সারিতে 'মরুত্তুবপ্পেক' ব'লে একটি তামিল শব্দের উল্লেখ আছে। শব্দটির অর্থ হ'ল যে ব্যক্তি অসুস্থ বা আহত মানুষকে চিকিৎসা করে সুস্থ ক'রে তোলে। এজন্য আমি বারণসীর আমেরিকান ইন্সটিটিউট অব ইণ্ডিয়ান স্টাডিস গ্রন্থাগারের কর্মিদ্বয় কে. শ্রীধর ও বি. সুব্রামনিয়াম-এর নিকট কৃতজ্ঞ। কথাটির অর্থের সঙ্গে বৈদ্যদের পেশাগত অর্থের পুরোপুরি মিল আছে। সুতরাং সঙ্গতভাবেই মনে করা যেতে পারে যে, তাঞ্জবুর মন্দিরের সন্নিকটেরও সাধারণ মানুষের চিকিৎসার জন্য ব্যবস্থা ছিল। হুল্‌ৎস্ ই, সাউথ ইণ্ডিয়ান ইন্সক্রিপশনস, খণ্ড ২, অংশ ১ ও ২, পুনর্মুদ্রণ, নতুন দিল্লী, ১৯৮৩, পৃঃ ৪৮। আরও অনুধাবন যোগ্য—গরুড়বাহন ভট্টের শ্রীরঙ্গম লেখমালাতেও (শকবর্ষ ১৪১৫=১৪৯৩ খ্রীঃ) মন্দির সংলগ্ন আরোগ্যশালার উল্লেখ আছে। এই লেখমালাতেই বলা হ'য়েছে যে, হয়শালরাজ বীররামনাথদেবের তৃতীয় রাজ্য বর্ষে (তথা ১২৫৭ খ্রীঃ) কোন এক গরুড়বাহন ভট্টকে মন্দিরস্থিত '(আরোগ্য) শালৈ' রক্ষণাবেক্ষণের জন্য জমি দান করা হয়েছিল। অর্থাৎ মন্দিরের নিকটে হাসপাতাল নির্মাণ করে অসুস্থ মানুষের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।—এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা, খণ্ড ২৪, পৃঃ ৯০—৯১

১৬. সরকার ডঃ দীনেশচন্দ্র, **শিলালেখ তাম্রশাসনাদির প্রসঙ্গ**, কলিকাতা, ১৯৮২, পৃঃ ১১৭।

মনু ও প্রত্নলেখসমূহ

পর্ণশবরী ভট্টাচার্য

মনুস্মৃতি মূলত একটি আইনগ্রন্থ এবং মনু হলেন বিভিন্ন ধরনের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও নৈতিক নিয়মসমূহের উদ্‌গাতা। স্বাভাবিকভাবেই অর্থনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসে বহুলভাবে মনুর ব্যবহার হয়েছে কারণ বর্তমান যে মনুস্মৃতি তা বহু শতাব্দী ধরেই অবিকৃত আকারে চলে আসছে এবং প্রতি যুগেই একজন করে টীকাকার অবতীর্ণ হয়েছেন যাঁদের টীকাভাষ্য সহজলভ্য। তৎসত্ত্বেও অন্য এক ধরনের সূত্রেও মনুর উল্লেখ আছে যা হল প্রত্নলেখ বিশেষত ভূমিদান লেখ। এই সকল লেখসমূহে যে মনুবচনগুলি আছে যেগুলির প্রতি ঐতিহাসিকবর্গ এ পর্যন্ত যথেষ্ট মনোযোগ দেননি তার কারণ মূল গ্রন্থে যা আছে সেটাই তাঁদের পক্ষে স্বাভাবিকভাবেই পর্যাপ্ত। তৎসত্ত্বেও এই সকল প্রত্নলেখে যে সকল বিষয় উল্লিখিত আছে তার প্রতিও যথার্থ দৃষ্টিপাত প্রয়োজন।

মনু সম্পর্কিত লেখসমূহকে চারটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম শ্রেণীতে সেই সকল লেখগুলিকে ফেলা যায় যেখানে মনু একজন পৌরাণিক রাজা (Legeadavy ruler) রূপে বর্ণিত, যাঁর প্রবাদপ্রতিম প্রজ্ঞা আছে এবং এই শ্রেণীর লেখতে যিনি লেখটির প্রচলন করেছিলেন তাঁর সঙ্গে মনু নামক রাজার তুলনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখতে মনুস্মৃতি এবং তার লেখক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উল্লিখিত। তৃতীয় শ্রেণীতে ভূমিদান লেখর উল্লেখ করা হয়েছে যেগুলির শেষে প্রশস্তিমূলক (laudable) অথবা অভিশাপমূলক (imprecatory) কিছু শ্লোক মনুর (কখনও কখনও অন্য আইন প্রণেতা যেমন ব্যাস) নামে আরোপিত। চতুর্থ শ্রেণীর লেখগুলিতে মনুর নামটি সরাসবি উল্লিখিত হয়নি কিন্তু তাঁর মতবাদ এবং রাষ্ট্রনীতি আইন ইত্যাদির ক্ষেত্রে তাঁর বিশেষ পরিভাষাগুলি প্রতিবিম্বিত হয়েছে।

প্রথম পর্যায়ের লেখর ক্ষেত্রে কনৌজের মৌখরীরাজ ঈশানবর্মার 'হরা লেখ'র উল্লেখ করা যেতে পারে, যিনি খ্রীষ্টিয় ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি রাজত্ব করতেন। এতে ঐ রাজার সম্পর্কে বলা হয়েছে যে তিনি এমন একজন

> যাঁর নাম প্রশংসার দাবী রাখে এবং যাঁর সুন্দর মনোরম খ্যাতি জগৎকে পরিপূর্ণ করে যখন তিনি মনুর মতই ধর্মের পথে নৈতিক আইনসমূহকে রক্ষা করেন।

পূর্ব চালুক্য রাজা প্রথম জয়সিংহের. (খ্রীঃ ৬৩২-৬৩) পূলিবর্মা লেখতে এই বাক্যটি আছে— 'বৃহস্পতিরিব নয়জ্ঞো মনুরিব বিনযজ্ঞঃ যুধিষ্ঠিরৈব ধর্মপরায়ণঃ' অর্থাৎ উক্ত রাজার বৃহস্পতির ন্যায় কূটনীতির জ্ঞান, মনুর ন্যায় প্রজ্ঞা এবং যুধিষ্ঠিরের মত আচার ও ব্যবহারের দৃঢ়তা আছে।

বলভীর মৈত্রকদের লেখমালা দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে। ধ্রুবসেনের লেখতে (বলভী বর্ষ ২০৭, খ্রীষ্টীয় ৫২৫-২৬), রাজাকে মানবাদি প্রণীতবিধিবিধানধর্ম বলা হয়েছে। সিংহদেবের 'পলিতন তাম্রশাসনে' (বলভী বর্ষ ২৫৫ এবং খ্রীষ্টীয় ৫৭৪) সামন্ত মহারাজ সিংহাদিত্য, বরাহদাস অর্থাৎ শাসকের পিতার উল্লেখ করে বলছেন যে তিনি এমন একজন যিনি বিশুদ্ধ প্রজ্ঞালাভে করেছেন মন্যাদি রচিত স্মৃতিশাস্ত্রের অতলে অবগাহন করে। দ্বিতীয় ধবসেনের 'পলিতন লেখ' বা গুহসেনের 'ওযালা লেখ'তে সাধারণভাবে স্মৃতি গ্রন্থের উল্লেখ আছে। সপ্তম শতকে রাজা পঞ্চম দদ্দ মনুর নিয়মাবলীর ওপর সবিশেষ জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের একটি লেখতে একজন চালুক্য রাজার উল্লেখ আছে যিনি মনু নির্দেশিত পথ অবলম্বন করেছিলেন। কিছুটা পরবর্তী চাহমান রাজা রত্নপালের (খ্রীষ্টিয় ১১১০-২০) লেখতে ভৃগুর আইনগ্রন্থের উল্লেখ আছে যা মনুরই নামান্তর।

তৃতীয় পর্যায়ের লেখগুলি মূলত ভূমিদান সংক্রান্ত যেখানে প্রশস্তি অথবা অভিশাপমূলক শ্লোক মনু এবং অন্যান্য আইনপ্রণেতাদের নামে বর্ণিত হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই শ্লোকগুলি লেখর শেষ দিকে থাকে যেখানে দাতার গুণাবলীর প্রশংসা করা হয় অথবা কোনভাবে প্রবঞ্চিত হবার ফলে তাকে যে কুফল পেতে হয় তাও বর্ণিত থাকে। এগুলি প্রথাগত শ্লোক এবং এর লেখকগণও তাদের প্রকৃত উৎস সম্পর্কে তেমন অবহিত নন। ফলে মনুর নামে আরোপিত কোন শ্লোক মনুস্মৃতিতে পাওয়া না গিয়ে অন্য কোথাও পাওয়া যেতেই পারে। আবার অপর কোন আইন প্রণেতার শ্লোকও মনুস্মৃতিতে পাওয়া যায়। এরকমও কখনও কখনও হয় যেখানে লেখতে উদ্ধৃত শ্লোক প্রকৃতই মনু বা অন্য কোন আইন প্রণেতার। যেমন, কনৌজের গোবিন্দচন্দ্রের 'বারাণসী তাম্রশাসনে' মনু ৫.২৩৫ এর উল্লেখ করা হয়েছে— "যিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে দানগ্রহণ করেন এবং যিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে তা অর্পণ করেন উভয়েরই স্বর্গলাভ হয় অন্যথায় তাঁরা উভয়েই নরকগামী হন।" কদম্ব রাজা কৃষ্ণবর্মণের একটি লেখর উপসংহারে বলা হয়েছে 'অত্রমনুগীতাশ্লোকাভবন্তি' (এখানে নিম্নোক্ত শ্লোকগুলি মনু রচিত)। এই লেখতেই চারটি আশীর্বাদমূলক এবং অভিশাপমূলক শ্লোক আছে। ইন্দ্রবর্মনের 'রামনাথন শাসনে'ও এই ধরনের বন্দনা এবং অভিশাপমূলক

শ্লোক আছে যা মনু ও ব্যাসের নামাঙ্কিত। মনুর নামে আরোপিত এরকম প্রথাগত শ্লোক আরও অনেক ভূমিদান লেখতে পাওয়া যায়।

চতুর্থ পর্যায়ের লেখমালায় মনু তাঁর নিজের নামে উল্লিখিত নন, কিন্তু রাজার কর্তব্য ও দায়িত্ব সংক্রান্ত, মন্ত্রী এবং রাজকর্মচারী সংক্রান্ত, রাষ্ট্রনীতি, অষ্টাদশ আইন, বিচারব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর শ্লোকগুলি বহুক্ষেত্রেই উল্লিখিত হয়েছে।

সূত্র নির্দেশ

১. এপ্ ইণ্ড্ ১৪. পৃ. ১১০-২০
২. তদ্দৃশ্ত ১৫. পৃ. ২৫৬
৩. ইণ্ড্ অ্যান্ট্ ২. পৃ. ২০৫
৪. এপ ইণ্ড্ ১১. পৃ. ১৬-২০
৫. তদ্দৃশ্ত পৃ. ৮০-৮২
৬. ইণ্ড্ অ্যান্ট ১৭. পৃ. ১৯৮, তুলনীয় ৮. পৃ. ৯৭. ৩০৩; ৯. পৃ. ৪৮
৭. এপ্ কর্ণাটিকা ৫. পৃ. ২৩,১৫১
৮. এপ্ ইণ্ড্ ১১, পৃ. ৩০৪ ১৩
৯. তদ্দৃশ্ত ২. পৃ. ৩৬০
১০. ব্যুলারের মনুর অনুবাদ ৪. ২৩৫
১১. এপ্ ইণ্ড্ ৬.১৮
১২. তদ্দৃশ্ত ১২. পৃ. ১৩৫
১৩. তদ্দৃশ্ত ৩. পৃ. ৮০-৮১, ৩২২; ৪. পৃ. ২৮৮, ৩৪৬, ৬ পৃ. ১৭৮, ২১৭-১৮, ৩৪৯. ৯. পৃ. ৯৫. ৩২৬, ৩৪৬; ৬. পৃ. ১৭৮, ২১৭-১৮, ৩৪৯, ৯, পৃ. ৯৫ ৩২৬, 'সি.আই.আই' ৩.পৃ. ১৪৭, ১৬৮, ১৮২, 'এপ্ কর্ণাটিকা', ৪. পৃ. ৬০-৬২, ৭. পৃ. ৫০, ৫৮, ৫৯, ৮৯, ১৪৬; ৯. পৃ. ৩১, ৭৩, ৮৫, ১০, পৃ. ৭৮; ১১. পৃ. ১৩, ৪১, ৪৫; ১২, পৃ. ১২৫।

উদীচ্য বৌদ্ধ ধর্ম : ব্রায়ান হটন হজসন

নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত

বহুমুখী বিদ্যায় ব্রায়ান হটন হজসনেব (১৮০০–৯৪) উৎসাহ ছিল। তিনি সবার্থ-সাধক। কিন্তু তাঁব চর্চাব সমস্ত দিক আমাদেব আলোচ্য বিষয় নয়। ভাবতীয় ঐতিহ্যেব অনুসন্ধানে তাঁব নিবলস উদ্যোগ অনেক নতুন এবং প্রয়োজনীয় তথ্যেব সমাবেশ ঘটিয়েছে। হয়তো তাঁব পাঠ চর্চাব পিছনে ছিল এই দেশকে জানাব আকুতি, ঔপনিবেশিক চিন্তনেব প্রভাব বা গূঢ় কোনো অভিসন্ধি; কিন্তু একথা তো সত্যি যে, লুপ্ত ধর্মীয় ও সামাজিক উপাদানেব উদ্ধাব আমাদেব ইতিহাস চেতনাকে সমৃদ্ধ কবেছে। উন্মোচিত হয়েছে ঐতিহ্যেব অনাস্বাদিত দিক। আব এই প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে হজসনেবও আগে আঠাবো শতকেব দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই। প্রাচ্যকে জানাব আকাঙ্ক্ষা থেকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এশিয়াটিক সোসাইটি (১৭৮৪)। সেখানে জ্ঞানচর্চাব মূল লক্ষ্য ছিল প্রাকৃতিক সম্পদেব খোঁজ-খবব নেওয়া, ঔপনিবেশিক শাসনেব ভিত শক্ত কবা। ফলে বৃটিশ প্রশাসনেব কর্ণধাববা ভাবতেব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যেব অনুসন্ধান জরুবি মনে কবেছিলেন। দৃষ্টি ছিল ভাবতীয় সর্ববিদ্যায়। এই অনুসন্ধান কর্মেব সূত্রপাত ঘটাতে উইলিয়ম জোন্স (১৭৪৬-৯৪) এবং তৎকালীন গভর্ণব-জেনাবেল ওয়াবেন হেস্টিংসেব (১৭৩২–১৮১৮) যৌথ প্রয়াস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সেইসঙ্গে যোগ দিলেন পাশ্চাত্যেব আবো অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি। প্রথমদিকে এশিয়াটিক সোসাইটিতে কোনো ভাবতীয় তথা এশিয় ব্যক্তিত্বেব অনুপস্থিতি লক্ষণীয়। কিন্তু পববর্তীকালে এদেশীয় বহু পণ্ডিত ব্যক্তি এশিয়াটিক সোসাইটিব কর্মধাবাব সঙ্গে যুক্ত হয়ে ভাবতীয় ঐতিহ্য অনুসন্ধানে সক্রিয় ভূমিকা পালন কবেছেন। বৃটিশ পণ্ডিত হজসনেব ভাবতবিদ্যা চর্চাও স্বভাবিকভাবেই এশিয়াটিক সোসাইটিব অনুগামী হয়েছিল। তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল এই সংস্থাব। হজসনেব যে ধবনের কাজের আলোচনা আমবা এই প্রবন্ধে করব, সেই ধবনের কাজেব সঙ্গে যুক্ত হাঙ্গেরিব পণ্ডিত আলেকজাণ্ডাব চোমা দ্য কোরোশের (১৭৮৪–১৮৪২) আলোচনাও এখানে প্রাসঙ্গিক। কিন্তু ইতোপূর্বে বর্তমান লেখক কোরশ সম্পর্কে আলাদা প্রবন্ধে[১] সে আলোচনা করায় পুনরুক্তির দায় এড়াতে চায়। তবে একটা কথা বলে রাখি, হজসনের ভাবনায় রাজনীতির ছোঁয়া থাকলেও কোরশে তা ছিল না একেবাবেই।

হজসন বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসে যোগ দেন আঠারো বছর বয়সে। চাকরির বেশির ভাগ সময় কেটেছে নেপালে। সেখানে তিনি পোস্টমাস্টার, সহকারী রেসিডেন্ট এবং রেসিডেন্ট হিসেবে কাজ করেন। তাঁর কর্মময় জীবনের আর একটা দিক হলো মানবিকী-বিদ্যা এবং বিজ্ঞানবিদ্যার নিরন্তর সাধনা। তাঁর অনুসন্ধিৎসার ফসল হচ্ছে বিভিন্ন বিষয়ে বহু নতুন তথ্যের সমাবেশ। এই নতুন তথ্যের মধ্যে বৌদ্ধ-বিদ্যা বিষয়ক অজানা একটি ধারার আবিষ্কার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আগে দক্ষিণী বৌদ্ধধর্মই সকলের জানা ছিল। য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা বৌদ্ধদের ইতিহাস খুঁজতে গিয়ে দক্ষিণী বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্বই লক্ষ করেছেন। সেই তথ্য দিয়েই তাঁরা বৌদ্ধদের একটি ইতিহাসের আদ্রা তৈরি করতে চেষ্টা করেছেন। "বৌদ্ধদের ইতিহাস লিখিবার চেষ্টা হিন্দুতে করে নাই, মুসলমানেরাও করে নাই, বৌদ্ধেরাও বড়ো করে নাই; করিয়াছেন ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা, আর সেই ইউরোপীয়দিগের শিষ্য শিক্ষিত ভারতসন্তান।"[২] কিন্তু উদীচ্য বৌদ্ধধর্মের আবিষ্কারের ফলে চলতি ধারণায় ফাটল দেখা দিল, বৌদ্ধদের ইতিহাস নতুন করে লেখার দরকার হয়ে পড়ল। এই খোঁজ "হজসন সাহেব নেপালে বৌদ্ধধর্মে পাইলেন। তিনি দেখিলেন, বৌদ্ধদের অনেক দর্শন গ্রন্থ আছে এবং তাহাদের দর্শন অতি গভীর।"[৩] এই দর্শনের সঙ্গে দক্ষিণী ধর্মমত বা তার দর্শনের মিল নেই। ফলে এই ধর্মীয় মতাদর্শ উদীচ্য বৌদ্ধধর্ম হিশেবে চিহ্নিত হলো। উদীচ্য বৌদ্ধধর্মই মহাযান বৌদ্ধধর্ম।

হজসনের বৌদ্ধপুথি আবিষ্কারের আগেও নেপালে বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্ব অজানা ছিল না। মৌর্য সম্রাট অশোকের সময় থেকেই সেখানে বৌদ্ধধর্ম বিস্তার লাভ করে। তাঁর ধর্মপ্রচারকরা সেখানে নিয়মিত যেতেন। ধর্ম প্রচার করতেন। সে এক দীর্ঘ ইতিহাস। এবং তা "is strongly confirmed by the fact that Nipal have been time immemorial, attributed to Asoka as their founder."[৪] বেশ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, ভারত থেকে বৌদ্ধধর্ম নেপালের মানুষজনের মধ্যে প্রোথিত হয়েছিল। এবং তা স্থায়িত্ব পেয়েছিল। এই প্রোথিত ধর্মের অনেকগুলি খোপ্ বা ভাগ এবং ভিন্নতা সমাজে বড়ো ছাপ ফেলেছিল। গৌতম বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের একশো বছরের মধ্যেই বৌদ্ধধর্মের দুটি শাখা— হীনযান ও মহাযানের উৎপত্তি। "আগে কিন্তু দুটি যান ছিল — ১. প্রত্যেক বুদ্ধযান বা প্রত্যেকযান আর ২. শ্রাবকযান। বুদ্ধদেবও প্রত্যেক বুদ্ধযান স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।...বুদ্ধের মুখে ধর্মকথা শুনিয়া যাহারা ধর্মজ্ঞান লাভ করে, তাহাদের নাম শ্রাবক।"[৫] কিন্তু বৈশালীতে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় মহাসঙ্গীতির সময় ভাগটা অন্যরকম হয়— স্থবিরবাদ ও মহাসাংঘিক। স্থবিরবাদ বা থেরবাদ বর্মা ও সিংহলে প্রসার লাভ করে। ভিত্তি পালি ভাষায় লেখা 'ত্রিপিটক'। এটিই

দক্ষিণী বৌদ্ধধর্ম। মহামহোপাধ্যায হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে, মহাসাংঘিকরাই মহাযানপন্থী হয়ে গেল।[৬] 'মহাবস্তু অবদান'-এর নির্দেশনা মেনে চলত মহাসাংঘিকেরা। তা ছাড়া 'ললিতবিস্তার', 'অবদান শতক', 'সদ্ধর্মপুন্ডরীক', 'দিব্যাবদান', 'অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা' প্রভৃতি মিশ্র সংস্কৃতে[৭] লেখা বইগুলিতে মহাযানী বিশ্বাসের নিবিষ্ট চিত্র পাওয়া যায়। থেরবাদী বা হীনযানীরা ধর্মীয আচারে খুব রক্ষণশীল ছিল। অন্যান্য ধর্মীয অনুষ্ঠানের প্রভাব থেকে নিজেদের বাঁচিযে চলত। এ ব্যাপারে তারা খুব সাবধানী। বিশেষ করে হিন্দু আচার-অনুষ্ঠান এবং বিভিন্ন মূর্তির পুজো তারা এড়িয়ে চলত। কিন্তু গোড়া থেকে মহাযাত্রীরা এ বিষয়ে খোলামেলা। তারা রক্ষণশীলতার পথে যায নি। বৌদ্ধধর্মের এই শাখা হিন্দু আচার দ্বারা প্রভাবিত হয়। সেই সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত আঞ্চলিক ধর্মীয রীতি-পদ্ধতিগুলিকে আস্তে আস্তে মহাযানীরা হজম করে ফেলে। নানারকমের মূর্তির উপাসনা, তান্ত্রিক আচার-অনুষ্ঠান পালন বৌদ্ধদের মধ্যে আবার পরিবর্তনের স্রোত বয়ে নিয়ে এল। মহাযান থেকে সৃষ্টি হলো সহজযান, বজ্রযান প্রভৃতি। উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রাক্-মধ্যযুগীয সমাজে বৌদ্ধধর্মের এই সমস্ত শাখা-প্রশাখা বেশ জাঁকিয়ে বসেছিল এবং তা ক্রমান্বযে নেপাল তিব্বতে ছড়িয়ে পড়ে। এই বহুমুখী ধারায বিভক্ত বৌদ্ধধর্ম অন্যান্য ধর্ম, বিশেষ করে ব্রাহ্মণ্যধর্মকে গ্রাস করে।

নেপালের মহাযানী বৌদ্ধদের বিশ্বাস, ধর্মের দুটি ভাগ — ১. দেবভাজু, ২. গুভাজু। দেবভাজুরা ঈশ্বরের উপাসনা করে। গুভাজুদের উপাস্য গুরু। ব্রাহ্মণেরা দেবভাজুতে বিশ্বাসী, অপরপক্ষে বৌদ্ধরা গুভাজুতে[৮]। সুতরাং নেপালে ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধধর্মের মধ্যে ফারাক অনেকটা বেশি। কিন্তু একটি বিষয় লক্ষনীয, নেপালে প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন বৌদ্ধ মঠগুলি ক্রমশ তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি হারাচ্ছিল। ফলে বৌদ্ধধর্ম অধঃপাতে যায়, বিকৃতিতে আচ্ছন্ন হয়, দেখা দেয় বিশৃঙ্খলা। ধর্মের নৈতিক দিকটি সম্পূর্ণভাবে ধ্বস্ত হয়। কিন্তু তত্ত্বগত দিক থেকে ধর্ম অপরিবর্তিত থাকে[৯]। বস্তুতপক্ষে, নেপালের বৌদ্ধরা মধ্যযুগের ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় চেতনার পথ থেকে সরে আসে। হিন্দুয়ানী বৌদ্ধদের আত্মভূত করে। এবং ক্রমে ক্রমে হিন্দুরা নেপালী সমাজকে গ্রাস করে ফেলে। নেপালের একটি মিশ্র জাতি "derived from Indian and Thibetan stocks."[১০] কিন্তু "mixture of Hindu with Buddhist principles became almost necessary feature of their religion."[১১] অনেক হিন্দু দেশান্তরী নেপাল পরিভ্রমণে গিয়ে বৌদ্ধধর্মে ধর্মান্তরিত হয়। তারা নেপালের আদিবাসীদের সঙ্গে অন্তর্বিবাহে আবদ্ধ হয়[১২]। কিন্তু, বস্তুতপক্ষে, তারা হিন্দুত্বেই বিশ্বাসী থেকে যায়[১৩]। মোট কথা, নেপালি সমাজে হিন্দু-বৌদ্ধে মেশামেশি হয়ে এক জটিল আবর্তের সৃষ্টি হলো।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই হজসন নেপালের বৌদ্ধধর্মের গোপন কোষাগারের ঢাকনি খুললেন। তিনি আবিষ্কার করলেন সংস্কৃত, তিব্বতি এবং নেওয়ারি ভাষায় লেখা অনেক পাণ্ডুলিপি। এই সমস্ত পাণ্ডুলিপি বৌদ্ধধর্ম পাঠের ক্ষেত্রে একটা বড়ো-সড়ো পরিবর্তন নিয়ে এল। পরিবর্তিত এই বৌদ্ধধর্ম উদীচ্য বৌদ্ধধর্ম (Northern Buddhism) হিসেবে পরিচিত। স্থবিরবাদ বা থেরবাদের সঙ্গে এর পার্থক্য দুস্তর। থেরবাদী বা হীনযানী বৌদ্ধধর্ম দক্ষিণী বৌদ্ধধর্ম নামে পরিচিত। কেউ কেউ একে পালি বৌদ্ধধর্মও বলেন। হজসনের আগে য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা দক্ষিণী বৌদ্ধধর্মের চর্চা করেছেন, কারণ তাঁরা উদীচ্য বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। ফরাসি পণ্ডিত ইউজিন বর্নুফ (১৮০১—৫২) 'দ্য হিস্ট্রি অভ বুদ্ধিজম' নামে একটি বই লিখেছিলেন তাতে তিনি 'দ্য এশিয়াটিক রিসার্চেস্'-এ প্রকাশিত হজসনের "নোটিসেস্ অভ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ, লিটারেচার অ্যান্ড রিলিজিয়ন অভ দ্য বুদ্ধস অভ নেপাল অ্যান্ড ভোট" প্রবন্ধের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তাঁর মতে এই প্রবন্ধ বৌদ্ধদর্শন-পাঠে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। য়ুরোপীয় পণ্ডিতদের কাছে বিষয়টি একেবারেই নতুন। অপরপক্ষে, হাঙ্গেরীয় পণ্ডিত আলেকজাণ্ডার চোমা দ্য কোরশ তিব্বতি বৌদ্ধপুথিপত্র নিয়ে গভীরভাবে মগ্ন ছিলেন। তাঁর এই প্রাচ্যবিদ্যাচর্চাও উদীচ্য বৌদ্ধধর্ম পাঠে সহায়ক। উদীচ্য বৌদ্ধ ধর্মচর্চার ক্ষেত্রে নেপালী এবং তিব্বতি সাহিত্য নিঃসন্দেহে অপরিহার্য। এ ব্যাপারে হজসন ও চোমার কৃতিত্ব অবশ্যই স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

বর্নুফের মতে, হজসনের আবিষ্কারগুলি ছিল "wholly unknown fact that in Nepal there existed numerous Buddhist works composed in Sanskrit, the original language of Buddhism."[১৪] এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে আঠারোটি মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছিলেন। প্রবন্ধগুলি "are replete with most varied and instructive informations. Much has been done since, but no one can even now write on Buddhism with an accuracy who has not thoroughly studied Mr. Hodgson's essays."[১৫] উদীচ্য বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে জানতে হলে অবশ্যই হজসনের দ্বারস্থ হতে হয়।

হজসন নেপাল থেকে যে সমস্ত সংস্কৃতে লেখা বৌদ্ধ পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করেছেন তা থেকে তিনি এই সত্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন যে বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ শুধুমাত্র পালিতে লেখা হয়নি, সংস্কৃতেও লেখা হয়েছে। এই বিষয় বৌদ্ধতত্ত্বের য়ুরোপীয় পণ্ডিতদের আলোকিত করেছিল। কোরশ মন্তব্য করেছিলেন, "Mr. Hodgson's illustrations of the literature and origin of the Buddhists

from a wonderful combination of knowledge on a new subject with the deepest philosophical speculation, and will astonish the people of Europe."[১৬] আধুনিক গবেষকদের হাতে সেই সমস্ত বৌদ্ধপুথির পাণ্ডুলিপি তিনি পূর্ণাঙ্গ অনুসন্ধানের জন্য তুলে দিয়েছিলেন[১৭]। সেজন্য তিনি স্বেচ্ছায় পুথিগুলি পাঠিয়েছিলেন বাংলার এশিযাটিক সোসাইটিতে, গ্রেটবৃটেন এবং আয়ারল্যাণ্ডের এশিয়াটিক সোসাইটিতে, অক্সফোর্ড বডলিয়ন লাইব্রেরিতে, ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে এবং পারির সোসাইতে আশিয়াতিক-এ। তাঁর নিপুণ নজরে আসা বৌদ্ধধর্মের নতুন নতুন বিষয়গুলি নিয়ে তিনি 'দ্য জর্নাল অভ্ বেঙ্গল'-এ অনেকগুলি প্রবন্ধ লেখেন। 'এশিযাটিক রিসার্চেস'-এ তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধটি[১৮] প্রকাশিত হলে এশিয়াটিক সোসাইটির তৎকালী সম্পাদক হোরেস হেম্যান উইলসন (১৭৮৬—১৮৬০) লিখেছিলেন, "of the number and character of those works which are the authorities of the Buddhas of Nepal, the only description on which any reliance can be placed is contained in the preceeding communication, from Mr. Hodgson, to whose active and intelligent zeal the society is so largely indebted."[১৯] কিন্তু নেপালের মানুষ-জনের কাছ থেকে পুথি সংগ্রহ করা সহজ ছিল না। হজসনের মতে, য়ুরোপীযরা নেপাল সরকারের সন্দেহভাজন ছিল, তাই নেপালে সঞ্চিত জ্ঞান তাদের কাছে উন্মুক্ত করতে যথেষ্ট কুণ্ঠা ছিল[২০]। তবু হজসন নানা ফিকিরে যে পরিমাণ পুথি সংগ্রহ করেছিলেন তা কম নয়। এই পুথিগুলির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের থেকে যে অভিমত বেরিয়ে আসে তাকে তিনি শেষ কথা বলে দাবি করেননি কখনো। তিনি তাঁর গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত অন্যান্য গষেক-পণ্ডিতদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন আরও নতুন অনুসন্ধানের জন্য।[২১] ফলে সেগুলি নতুন নতুন ভাবনায় আলোকিত হয়ে উঠেছে।

১৮৩৭ খৃস্টাব্দে হজসন পারিতে ১৪৭টি পুথি পাঠিয়েছিলেন। বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্ বর্নুফ, যিনি নিজেকে হজসনের কাছে অশেষ ঋণে ঋণী মনে করতেন, সেই সমাহৃত পুথি থেকে গড়ে তুললেন "great work on the History of Buddhism."[২২] 'অতি বিশিষ্ট বন্ধু'[২৩] হজসনের নেপাল থেকে সংগ্রহ করা পুথির উপর নির্ভর করে বর্নুফের উদীচ্য বৌদ্ধধর্ম তত্ত্বটি গড়ে ওঠে। হজসনের এই যুগান্তকারী কাজের জন্য পারির সোসাইতে আশিয়াতিক তাঁকে বিশেষ সম্মানে ভূষিত করে।

নেপাল থেকে হজসনের সংগ্রহ করা সংস্কৃত পুথিগুলির একটি তালিকা তৈরি করেন স্যর উইলিয়ম উইলসন হান্টার (১৮৪০—১৯০০)। এই পুথিগুলি

ছিল মূলত উদীচ্য বৌদ্ধধর্ম সংক্রান্ত। পুথিগুলির অবস্থা সম্পর্কে হান্টারের লেখা থেকে জানা যায় : নেপালের শুষ্ক আবহাওয়ায় পুরনো দলিলগুলি রক্ষা পেয়েছিল। নেপাল মুসলমান আক্রমণকারীদের চোখের আড়ালে থাকায় পুথিপত্র তাদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল। ভারতের বহু প্রাচীন সাহিত্য ভাণ্ডার মুসলমান আক্রমণকারীর হাতে ধ্বংস হয়। তা ছাড়া নেপালের পুথিগুলি টেঁকসই তিব্বতি কাগজে লেখা, কিন্তু ভারতীয় তালপাতা পুথি ভঙ্গুর। নেপালে শিক্ষার অবক্ষয়ের কালেও প্রাচীন পাণ্ডিত্যের স্মৃতি রক্ষিত হয়েছে। শত শত বছর ধরে বহু প্রাচীন নেপালি পুথি বিস্মৃত এবং অপঠিত হিসেবে রক্ষা পেয়েছে।[২৪] এও প্রমাণিত যে, হজসনের আবিষ্কৃত পুথিগুলি একাদশ শতাব্দীর আগের লেখা।

বাংলায় মুসলমান আগমনের আগে পূর্ব ভারত জুড়ে উদীচ্য বৌদ্ধধর্মের খুব প্রতিপত্তি ছিল, কিন্তু ব্রাহ্মণ্যবাদীরা ক্রমশ বৌদ্ধদের গ্রাস করে[২৫]। বৌদ্ধদের অবস্থা খুবই সঙ্গীন হয়ে পড়ে এবং বাংলা থেকে তারা প্রত্যক্ষভাবে ক্রমশ মুছে যায়। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১) তাঁর 'নর্দার্ন বুদ্ধিজম' প্রবন্ধে সমাজ এবং ধর্মীয় বিবর্তনের অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেছেন[২৬]। কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে মুসলমান আক্রমণের ফলে বাংলা থেকে বৌদ্ধধর্ম লুপ্ত হয়ে যায়, কিন্তু হরপ্রসাদ অন্য কথা বলেন। তাঁর মতে, মুসলমানদের বিজয় আংশিক, পাঠানরা সামরিক ক্ষমতার দ্বারা কিছু অঞ্চলে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করে মাত্র। তাদের পক্ষে গোটা দেশের বৌদ্ধধর্ম ধ্বংস করা সম্ভব ছিল না[২৭]। মুসলমান শাসকদের কাছে হিন্দু ও বৌদ্ধদের মধ্যে কোনো তফাত ছিল না। তাদের দৃষ্টিতে উভয় সম্প্রদায়ই ছিল সমান। সুতরাং হিন্দু-বৌদ্ধ উভয়কেই সমান দুর্ভোগ ভুগতে হয়েছে। কিন্তু একসময় বাংলায় বৌদ্ধধর্মের প্রাবল্য ছিল। বিখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ সিসিল বেণ্ডাল (১৮৫৬-১৯০৫) হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে বারবার জিজ্ঞাসা করেছেন : "Where was all that Buddhism gone?" উভয়ে একসঙ্গে নেপাল গেছেন। নেপাল ও তিব্বতি পুরানো পুথি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করেছেন। তাঁদের পর্যবেক্ষণ থেকে আহৃত ফল এবং হজসনের আবিস্কৃত পুথিগুলি থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে উদীচ্য বৌদ্ধধর্ম নেপালে আশ্রয় নিয়েছিল। সুতরাং বৌদ্ধধর্ম নেপালে ভুঁইফোঁড় নয়। বেণ্ডাল কেম্‌ব্রিজে বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে গবেষণা করেছেন। তিনি সেখানে বসে একদা হজসনের পাঠানো এবং কেম্‌ব্রিজে সংরক্ষিত বিপুল সংখ্যক পুরনো পুথি দেখেছেন।

১৮৩৪ খৃস্টাব্দে 'দি জর্নাল অভ্ এশিয়াটিক সোসাইটি'তে হজসন "য়ুরোপীয়ান স্পেকুলেশান্‌স অন্ বুদ্ধিজ্‌ম" নামে একটি প্রবন্ধ লিখে প্রাচ্যতত্ত্ববিদদের আলোড়িত করেছিলেন। এই প্রবন্ধই গতানুগতিক বৌদ্ধচর্চার ক্ষেত্রে বড়রকমের পরিবর্তন

আনে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে 'তেঙ্গুর-কেঙ্গুর'-এর মতো উল্লেখযোগ্য আবিষ্কারের কথা। বুদ্ধের বাণী এবং ভারতীয় ও তিব্বতিয় পণ্ডিতদের তাত্ত্বিক রচনার সংকলন 'তেঙ্গুর-কেঙ্গুর' বৌদ্ধধর্মের বিবর্তনে নতুন আলোকপাত করেছে। এর মধ্য দিয়ে নেপাল ও তিব্বতের উদীচ্য বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। বিখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২২-৯১) এশিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত হজসন সংগ্রহ পরীক্ষা করেন। এই সংগ্রহ ব্যবহার করে তিনি লিখলেন 'দি স্যান্‌স্‌ক্রিট লিটারেচার অভ নেপাল' (১৮৮২)। রাজেন্দ্রলালের মতে এগুলির ঐতিহাসিক মূল্য আছে।[২৮] এই কাজটি তিনি সংস্কৃত পণ্ডিতদের সাহায্যে করেন। নেপাল থেকে হজসন 'অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা'র পুথি আবিষ্কার করেন। রাজেন্দ্রলাল ১৮৮৮ খৃস্টাব্দে পুথিটি সম্পাদনা করেন। তাঁর মতে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ[২৯]। ১৮২৮ খৃস্টাব্দের 'দি এশিযাটিক রিসার্চেস্‌'-এ প্রকাশিত রচনায় হজসন প্রজ্ঞাপাবমিতার অর্থ বিশ্লেষণ করেন।

চোমা দ্য কোবোশ এবং হজসন ছাড়াও ড্যানিয়েল রাইটস্‌, সিসিল বেণ্ডাল এবং অন্যান্য পণ্ডিতেরা নেপাল ও তিব্বত থেকে মূল্যবান পুথি এবং নানান চিহ্নাদি আবিষ্কার করেন। তাঁদের অনুসন্ধান এটাই প্রমাণ করে যে, উত্তর-পূর্ব ভারত, বিশেষ করে বাংলায সংস্কৃত নির্ভর বৌদ্ধধর্ম বিস্তারলাভ করে। বৌদ্ধধর্মের দার্শনিক দিকও উল্লিখিত অঞ্চলের সমাজ জীবনে বিশেষ প্রভাব ফেলেছিল।

হজসনের প্রাচ্যবিদ্যাচর্চা, বিশেষ করে নেপালের বৌদ্ধ পুথি পাঠ য়ুরোপীয় এবং ভারতীয় পণ্ডিতদের মধ্যে নতুন ভাবনার জোয়ার এনেছিল। এবং সঙ্গে তার আবিষ্কার ভারত ও নেপালের ধর্মীয়, সামজিক ও সাংস্কৃতিক লুপ্ত ইতিহাস রচনায় সহায়ক হয়েছে। নেপালের বিভিন্ন মন্দিরের মূর্তির সঙ্গে উত্তর-পূর্ব ভারতের বৌদ্ধ মূর্তির সাদৃশ্য তিনি লক্ষ্য করেছেন। মূর্তিগুলি মিলিয়ে দেখার সময় বৌদ্ধপুথি ব্যবহার করে তিনি বুঝতে চেয়েছেন ঐগুলির প্রকৃত অর্থ। হজসনের অনুসন্ধান আমাদের জানিয়ে দেয় যে, নেপালে তান্ত্রিক আচারের প্লাবন দেখা দিয়েছিল। গড়ে উঠেছিল গূঢ় রহস্যময় সাধন ভাবনা। নেপালে রাজনৈতিক প্রতিনিধি হিশেবে হজসনের কর্মজীবনের সূত্রপাত। তাঁর সর্বক্ষণ লক্ষ্য ছিল সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থের দিকে। কিন্তু তাঁর অন্যধারার কাজ, অর্থাৎ গবেষণা, তাঁকে আন্তর্জাতিক খ্যাতি এনে দিয়েছে।

সূত্র নির্দেশ

১. নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত, "উদীচ্য বৌদ্ধধর্মের সন্ধানে আলেকজাণ্ডার চোমা দ্য কোরশ," আবদুল ওয়াহাব মাহমুদ সম্পাদিত "ইতিহাস অনুসন্ধান-৯", কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ. ৭৫২—৬০।

২. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, 'হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ', তৃতীয় খন্ড, কলকাতা ১৯৮৪, পৃ. ২৪১।

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪১—৪২

৪. Oldfield, Henry Ambrose, **Sketches from Nipal**, Vol II, London, 1880 p 71

৫. 'হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ', তৃতীয় খণ্ড, কলকাতা ১৯৮৪, পৃ. ৩২৩।

৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৯—৪৬।

৭. "যে-সকল অতি প্রচীন বৌদ্ধ পুস্তক পাওয়া গিয়াছে, তাহা না-সংস্কৃত, না মাগধী, না-কোশলী; এককরূপ মাঝামাঝি গোছের ভাষা। সংস্কৃত পণ্ডিতেরা বোধ হয় ইহারই নাম দিয়াছেন 'মিশ্র ভাষা'। একজন ইউরোপীয় পণ্ডিত ইহারই নাম দিয়াছেন Mixed Sanskrit" (পৃ. ২৪২—৪৩)। 'মহাবস্তু অবদান', 'ললিত বিস্তর,' 'সদ্ধর্ম্ম পুণ্ডরীক,' 'শত সাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা গুণরত্ন সঞ্চয় গাথা', নাসিক কার্লিগুহার সাতকর্ণি রাজাদের শিলা লেখগুলি "কতক কতক সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ অনুসারে চলে, কতক কতক সে ব্যাকরণ একেবারে মানে না। রাজেন্দ্রলাল মিত্র ইহার নাম দিয়াছেন গাথাভাষা। সিনার সাহেব (E. Senart) এ ভাষার নাম দিয়াছেন মিক্সড সংস্কৃত (mixed Sanskrit)। কেহ কেহ ইহার নাম দিয়াছেন ভারনাকুলারাইজড্ সংস্কৃত (Vernacularised Sanskrit)। কেহ কেহ ইহার নাম দিয়াছেন স্যানস্কৃটাইজড্ ভারনাকুলার (Sanskritized Vernacular) যেমন আমাদের পণ্ডিতি ভাষা।" (পৃ. ৩৪২-৪৩)। "বৌদ্ধরা আর-এক ভাষায় পুথি লিখিতেন, তাহার নাম মিশ্র ভাষা, উহার কতক সংস্কৃত কতক প্রাকৃত। এই ভাষায় অনেক বই আছে। গদ্যে এই লেখা, মাঝে মাঝে প্রমাণ স্বরূপ পদ্য। পদ্য ও গদ্যের ভাষা একরূপ নহে, পদ্যের ভাষা পুরানো। ক্রমে গদ্য অংশ সংস্কৃত হইতে আরম্ভ হইল। সে সংস্কৃত পড়িলেই মনে হইবে, এ 'মহাভাষ্যে'র ভাষা নয়, কোনো প্রাকৃতের তর্জমা মাত্র। এসব কথা আগে কেহ বিশ্বাস করিত না। কিন্তু 'সদ্ধর্ম্ম-পুণ্ডরীক' নামে একখানি বই আছে, উহার গদ্যটা এই রকম সংস্কৃত, আর পদ্যটা মিশ্র। নেপাল হইতে যে কয়খানি পুথি পাইয়াছি, সব ঐ রকম। কিন্তু তকলামাকান মরু খুঁড়িয়া যে 'সদ্ধর্ম্ম পুণ্ডরীকে'র যে প্রচীন পুথি পাওয়া গিয়াছে, তাহার সবটাই ঐ মিশ্র ভাষায় লেখা।" (পৃ. ৫১৩)।—প্রাগুক্ত। এ ছাড়া দ্র. Sukumar Sen, "An outline Syntax of Buddhistic Sanskrit," **Journal of the Department of Letters**, Vol. XVII, Calcutta University 1928.

৮. 'হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ', তৃতীয় খন্ড, পৃ. ৩৪৪।

৯. Oldfield, p.72.

১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩।

১১. প্রাগুক্ত, পৃ.৭৩।
১২. প্রাগুক্ত, পৃ.৭৫।
১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫।
১৪. Mitra Rajendrala, **The Sanskrit Buddhist Literature of Bengal**, Calcutta, 1971, p. xxvi.
১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. xxvi
১৬. Hunter, William Wilson, **Life of Brian Houghton Hodgson, British Resident at the Court of Nepal**, London, 1896, p. 278.
১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬১।
১৮. Hodgson, "B.H., Notices of the Languages, Literature, and Religion of the Buddhas of Nepal and Bhot", **Asiatic Researches**, Vol. xvi, Calcutta, 1828.
১৯. Wilson, Horace Hayman, "Notices of Three Tracts Received from Nepal," **Asiatic Researches**, Vol xvi, Calcutta, 1828, p. 451
২০. Hodgson, As.Res., Vol XVI, p 409.
২১. "The various contributions which I have had the honour to forward to the Library and Museum of the Asiatic Society, and the lists by which they have been accompanied, will have put the society in possession of such information as I have been able to collect respecting the articles presented. Some connected observations, suggests by the principal of them, may, however, be not unacceptable, as derived from enquiry on the spot, and Communication with learned Nepalese. I do not pretend to offer a couplet or detailed view of the Literature or Religion of the Nepalese. ... A few general remarks are all, therefore, that can be attempted at present, and may prepare way, it is hoped, for further investigation." - *Ibid.*, p. 409.
২২. Hunter, p. 267.
২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৮
২৪. "The dry climate of Nepal is admirably adapted for the preservation of documents. Its isolated position saved it from the havoc of the Muslim invasions, amid which so many of the literary treasures of ancient India perished. The very early use of paper in Tibet suppled an alternative substance more enduring than the brittle palm-leaves employed for the purpose in India, and to some extent also in Nepal. Even the decline of learning in Nepal tended to conserve the memorials of its ancient scholarship. Many of the old Nepalese manuscripts survived for centuries forgotten and unread."—*Ibid*, p. 265.

২৫. Sengupta, Nikhileswar, "Revival of Brahmanism in Bengal Under the aegis of Bhavadeva Bhatta," N.R. Ray and P.N. Chakraborti ed. ***Studies in Cultural Development of India***, Calcutta, 1991, pp. 96-104.

২৬. Shastri, H.P., "Northern Buddhism," ***Indian Historical Quarterly***, Calcutta, 1925.

২৭. "... the Muhammadan conquest itself was not complete conquest, the Pathans held the country simply in military occupation. The held some of the big cities and left the rest of the country to govern itself the best it could. It was not possible for them to destroy Buddhism all over the country." Shastri, H.P., "Buddhism in Bengal since the Muhammadan conquest," ***Journal of the Asiatic Society of Bengal***, 1895.

২৮. "Believing the authenticity and great historical value of the Mss. presented to the Asiatic Society of Bengal, often urged me to examine them and prepare an analysis of their contents; but the magnitude of the work deterred me." Mitra, R.L., "Preface", ***The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal***, Calcutta, 1971, p. XIIX.

২৯. Abhidharma of the Ceylonese includes philosophical works: and the Prajnaparamitas and their commentaries take in place in the Nepalese collection." *Ibid.*, p. xiviii.

সাম্প্রতিকতম তথ্যের আলোকে প্রাচীন বঙ্গের (আঃ খৃষ্টীয় প্রথম-পঞ্চম শতকের প্রারম্ভ) রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রেক্ষাপট

রঙ্গন কান্তি জানা

আলোচ্য কালপর্বে (খৃষ্টীয় প্রথম শতক থেকে পঞ্চম শতকের প্রারম্ভ) বঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাস অনুসন্ধানের আগে, এই সময়কার বঙ্গের ভৌগোলিক অবস্থান এবং সীমা সম্পর্কে যে তথ্যগুলো পাওয়া যায়, সে সম্পর্কে কিছু বলে নেওয়া দরকার বলে মনে হয়। বঙ্গের সীমা সম্পর্কে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে এবং বিদেশী বিবরণে কোন একক সুনির্দিষ্ট উল্লেখ নেই। তবে প্রাপ্ত সমস্ত তথ্যকে একত্রিত করে তৎকালীন বঙ্গের ভৌগোলিক অবস্থান তথা সীমা সম্পর্কে এক আপাতগ্রাহ্য সিদ্ধান্তে আসা সম্ভবপর। একথা ঠিক যে খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতক পর্যন্ত এই ধারণা খুব একটা স্বচ্ছ নয়। সঙ্গতভাবেই প্রশ্ন থেকে যায় আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতক পর্যন্ত প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে উল্লেখিত 'বঙ্গ'[১], আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযানকালে তাঁর সংবাদগ্রাহক দ্বারা সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে রচিত গ্রীক বিবরণে উল্লেখিত 'গঙ্গারিডই'[২] এবং চীনা বিবরণ 'ছিয়েন-হান-সু' (CH'IEN HAN SHU)[৩] উল্লেখিত 'হুয়ান-চি' (বা গঙ্গারাষ্ট্র) বলতে কি এক দেশ বা রাষ্ট্র বা একই ভৌগোলিক অঞ্চলকে বোঝাত? তবে খৃষ্টীয় প্রথম শতক থেকে চতুর্থ শতকের শেষ বা পঞ্চম শতকের প্রারম্ভ পর্যন্ত যে সব প্রাচীন ভারতীয়[৪] ও বিদেশী বিবরণ[৫] পাওয়া যায়, তার বিশ্লেষণে দেখা যায় বঙ্গ, গঙ্গারিডই বা গঙ্গারিডি, বা গঙ্গাদেশ বলতে মূলত যে অঞ্চলকে বোঝাত তা হ'ল বর্তমান পশ্চিমবাংলার নিম্ন গাঙ্গেয় অববাহিকা অঞ্চল এবং সমুদ্র উপকূলবর্তী ভূভাগ। এছাড়া খুব সম্ভবত পার্শ্ববর্তী বর্তমান স্বাধীন বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলের কিছুটা অঞ্চল।

এছাড়া চীনা বিবরণ 'উইল্যুয়ে'[৬]-র তথ্য বিশ্লেষণে (যার আনুমানিক রচনাকাল খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকের মধ্যবর্তী সময়) দেখা যায় যে 'বঙ্গ', 'গঙ্গাদেশ' নামেও পরিচিত ছিল। এক্ষেত্রে শেষোক্ত কালপর্বের মধ্যে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে মনে করা অসঙ্গত হবে না যে খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতক থেকে প্রথম শতকের

'বঙ্গ', 'গঙ্গারিডই', এবং 'গঙ্গারাষ্ট্র' (বা হুয়ান-চি) বলতে খুব সম্ভবত, একই ভৌগোলিক অঞ্চল বা ঐ অঞ্চলের কিছুটা অংশকে বোঝাত। খুব সম্ভবত বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক ক্ষমতার বিস্তৃতি ও সংকোচনের ফলে বঙ্গের ভৌগোলিক অবস্থানের পরিবর্তন ঘটেছিল। সবমিলিয়ে বর্তমান মানচিত্রে আলোচ্য কালপর্বে প্রাচীন বঙ্গের ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে এক যুক্তি গ্রাহ্য ধারণায় আসা যায়, সেটি হ'ল — উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা, হুগলী, হাওড়া, ও মেদিনীপুর জেলার সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চল এবং বর্ধমানের কিছুটা অংশ। এছাড়া খুব সম্ভবত বীরভূম, বাঁকুড়া, ও নদীয়ার কিছুটা অংশ।

প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যায় যে, এই নদীমাতৃক কৃষি প্রধান অঞ্চলে (আলোচ্য ভৌগোলিক সীমার মধ্যে) নগরায়ণের সূত্রপাত ঘটে খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের শেষ ভাগ থেকে দ্বিতীয় শতকের মধ্যবর্তী সময়ে। কিছু বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে (যথাক্রমে মেদিনীপুর জেলার তমলুক[৭], উত্তর ২৪ পরগণা জেলার চন্দ্রকেতুগড় অঞ্চল[৮] ও বর্ধমানের মঙ্গলকোট[৯] প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের ফলে এই অঞ্চলের মূলত খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতক থেকে প্রথম শতক এবং খৃষ্টীয় প্রথম শতক থেকে চতুর্থ/পঞ্চম শতকের মধ্যবর্তী সময়ের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল সম্পর্কে একটা ধারণা করা সম্ভবপর হয়েছে।

নগরায়ণের যে বিন্যাস এই অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায় প্রথমদিকে তা ছিল স্থানীয় ও গুরুত্বপূর্ণ নগর বন্দর কেন্দ্রিক যেমন তাম্রলিপ্ত, গঙ্গাবন্দর নগরী। এই সব বড বড় প্রত্নস্থলের চারদিকে বেশ কিছু ছোট ছোট প্রত্নস্থলের হদিশ পাওয়া যায়, যার থেকে মনে হয় পরবর্তী পর্যায়ে এর বিস্তৃতি ঘটেছিল গঙ্গার নিম্ন অববাহিকা ও রূপনারায়ণ নদের নিম্ন অববাহিকা অঞ্চলে — যা দক্ষিণে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে। প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননে এবং পর্যবেক্ষণে তৎকালীন আর্থ-সামাজিক তথা সাংস্কৃতিক জীবনের যে বিকাশ লক্ষ্য করা যায়, তাতে করে মনে হয় এই অঞ্চলের অন্তঃ ও বর্হিদেশীয় বাণিজ্যে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ এই বিকাশকে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করেছিল। এই শ্রী বৃদ্ধির লক্ষনগুলি আঃ খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের শেষ বা পঞ্চম শতকের প্রারম্ভ পর্যন্ত বজায় ছিল। খৃষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে পেরিপ্লাসের[১০] ও টলেমীর বিবরণে[১১] ও মিলিন্দপঞ্হোতে[১২] যে সুসমৃদ্ধ ব্যবসা বাণিজ্যের উল্লেখ আছে এবং নাগার্জুন কোণ্ডা শিলালিপিতে বৌদ্ধধর্মের প্রচার সূত্রে সিংহল ও দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে বঙ্গের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের আভাস পাওয়া যায়, তা থেকে স্পষ্টতই মনে হয়, রাষ্ট্রগত ও সমাজগত শৃঙ্খলা বর্তমান না থাকলে এই ধরনের বানিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ কিছুতেই সম্ভব হত না। পেরিপ্লাস উল্লেখিত স্বর্ণমুদ্রার (কলটিস)[১৩] প্রচলন এই অনুমানকে আরও দৃঢ় করে।

আলোচ্য ভৌগোলিক সীমার মধ্যে উত্তর ২৪ পরগণার চন্দ্রকেতুগড়, গাজিতলা, হাদিপুর বেড়াচাপা, ; দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার হরিনারায়ণপুর; মেদিনীপুর জেলার তমলুক প্রভৃতি অঞ্চল থেকে বেশ কিছু লিপি উৎকীর্ণ নামমুদ্রা (Seal) ও মৃৎপাত্র ও মৃৎপাত্রের টুকরো পাওয়া গিয়েছে।

বর্তমানে এই প্রত্নবস্তুগুলো সরকারী ও বেসরকারী সংগ্রহে রক্ষিত আছে। কিন্তু লেখাগুলোর পাঠোদ্ধার না হওযায় প্রত্নবস্তুগুলোর সঠিক মূল্যায়ন এতদিন সম্ভবপর হয়নি। ১৯৮৯ সালের মাঝামাঝি প্রখ্যাত ঐতিহাসিক অধ্যাপক ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যাযের গাঙ্গেয় নিম্ন অববাহিকা অঞ্চলে খরোষ্ঠী লিপির আবিষ্কার এবং খরোষ্ঠী ও ব্রাহ্মী লিপির মিশ্রণে মিশ্রিত লিপির[১৪] ঐতিহাসিক আবিষ্কার ও তার সফল পাঠোদ্ধার খৃষ্টীয় প্রথম শতক থেকে চতুর্থ শতকেব শেষ বা পঞ্চম শতকের প্রাবম্ভ পর্যন্ত প্রাচীন বঙ্গের (অন্তর্ভুক্ত এই অঞ্চলের) রাজনৈতিক আর্থ সমাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের মূল্যবান তথ্যকে তুলে ধরেছেন, যার উল্লেখ আগে কোথাও পাওয়া যাযনি। এই তথ্যগুলো থেকে সম্পূর্ণ বংশানুক্রমিক রাজনৈতিক ইতিহাসকে জানা সম্ভবপব না হলেও, এর দ্বারা তৎকালীন এ অঞ্চলের রাজনৈতিক ঘটনা ধারাকে বুঝতে অসুবিধা হয় না।

একথা ঠিক, আমাদের হাতে এমন কোন তথ্য নেই যে, যা সাহায্যে বঙ্গের সঙ্গে তৎকালীন কুষাণ সাম্রাজ্যের সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোকপাত করা যায়। তবে কুষাণ আমলের বিভিন্ন রাজাদের কিছু কিছু স্বর্ণমুদ্রা ও বেশ কিছু তামার মুদ্রার হদিশ এই অঞ্চলে পাওয়া যায়। এই স্বর্ণ মুদ্রাগুলো (এব মধ্যে কিছু আসল আর বেশ কিছু নকল) হয়ত বাণিজ্যসূত্রে এই অঞ্চলে এসে থাকবে। কারণ এখন পর্যন্ত বাংলায় তথা আলোচ্য ভৌগোলিক সীমায় কুষাণ আধিপত্যের কোন অকাট্য প্রমাণ আমাদের হাতে আসেনি। তবে খুব সম্ভবত তামার মুদ্রা গুলো নিম্ন গাঙ্গেয় সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে বাণিজ্যসূত্র ধরে এসেছিল। এবং এই অঞ্চলের মুদ্রা। বিনিময় ব্যবস্থায এর অনুকরণে নকলমুদ্রা একটা বিশেষ জায়গা করে নিয়েছিল। খৃষ্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতকের কোন এক সময় থেকে এই অঞ্চলে কোন সুসংবদ্ধ প্রশাসন বা কোন বাণিজ্যিক সংঘের দ্বারা প্রচলিত হয়েছিল। এই শ্রেণীর মুদ্রাগুলোকে অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় কুষাণ-রাঢ় বা কুষাণ বঙ্গ মুদ্রায় অভিহিত করেছেন।[১৫]

এই অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত খরোষ্ঠী ও খরোষ্ঠী-ব্রাহ্মী লিপি উৎকীর্ণ লেখ গুলো লিপিতত্ত্বের বিচারে দেখা যায় খৃষ্টাব্দ প্রথম শতক থেকে খৃষ্টাব্দ চতুর্থ শতকের শেষ বা পঞ্চম শতকের প্রারম্ভিক কালের মধ্যবর্তী। খরোষ্ঠী লিপির এবং খরোষ্ঠী-ব্রাহ্মী লিপির ব্যবহার থেকে মনে হয় খৃষ্টীয় প্রথম শতকের কোন সময়ে ভারত

উপ-মহাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল থেকে ঐ অঞ্চলের ভাষাভাষী এক বা একাধিক গোষ্ঠীর মানুষ বর্তমান উত্তর ২৪ পরগণার চন্দ্রকেতুগড় অঞ্চলে (গঙ্গারাষ্ট্রের রাজধানী গঙ্গানগর উত্তর ২৪ পরগণার দেগঙ্গা অঞ্চলে অবস্থিত ছিল বলে মনে করা হয়)[১৬] এবং বর্তমান মেদিনীপুর জেলার তমলুক ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের (খুব সম্ভবত প্রাচীন তাম্রলিপ্ত বন্দরকে কেন্দ্র করে) প্রধানত ব্যবহার স্বার্থে বসতি স্থাপন করে।

এই গোষ্ঠীর মানুষদের মধ্যে কেউ কেউ বা ঠিক তাদের পরবর্তী প্রজন্মের মানুষেরা কৃষিকাজ করে এবং কৃষিজদ্রব্যের ব্যবসা বাণিজ্য করে খুব অর্থবান ও প্রতিপত্তিশালী হয়ে উঠেছিল। নামমুদ্রার লেখতে তার প্রমাণ পাওয়া যায়[১৭]। এই গোষ্ঠীর মানুষ কালক্রমে উত্তর ২৪ পরগণা জেলার চন্দ্রকেতুগড় অঞ্চলে এবং খুব সম্ভবত সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে নিজেদের রাজনৈতিক ক্ষমতা কায়েম করে। একটি নাম মুদ্রার লেখতে 'গণরাজ্য'[১৮] কথাটি পাওয়া যায়। লিপিতত্ত্বের বিচারে লেখটির সময়কাল খৃষ্টাব্দ প্রথম/দ্বিতীয় শতক। তবে এখন পর্যন্ত, এই 'গণরাজ্য' শাসন ব্যবস্থার ধরন এবং কতদিনই বা তা চলেছিল, এ সম্পর্কে কিছু বলা দুষ্কর। তবে চন্দ্রকেতুগড অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত অন্য বেশ কয়েকটি নামমুদ্রার লেখ পাঠোদ্ধারে বেশ কয়েকজন রাজার নাম পাওয়া যায়। যেমন (১) জুজু[১৯], (২) জধন[২০], (৩) টাজটা[২১], (৪) লড়পেয়[২২], [লিপিতত্ত্বের বিচারে লেখগুলো যথাক্রমে (১) খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতক, (২) খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতক, (৩) খৃষ্টীয় চতুর্থ শতক, (৪) খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকের প্রারম্ভিক কালের]। এই লেখগুলো থেকে মনে করা অসঙ্গত হবে না যে, খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতক থেকে পঞ্চম শতকের প্রারম্ভিককালের মধ্যে এই অঞ্চলে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। রাজারা হলেন যথাক্রমে জুজু, জধন, টাজটা, এবং লড়পেয় এবং তাঁরা ছিলেন মিশ্রিত লিপি ব্যবহারকারী গোষ্ঠীর মানুষ। এই অঞ্চলে রাজতন্ত্রে যুগ্ম কর্তৃত্বের নজিরও পাওয়া যায়। একটি নামমুদ্রার লেখতে 'টাজটা'-কে যুগ্ম কনিষ্ঠ রাজা বলে উল্লেখ করা হয়েছে[২৩]। এই যুগ্মভাবে রাজ কর্তব্য পালনের নজীর কুষাণ রাজবংশেও প্রচলিত ছিল[২৪]। তবে নাম মুদ্রায় উল্লেখিত এই রাজাদের রাজ্যসীমা সম্পর্কে বা তাম্রলিপ্তের সাথে সম্পর্ক সম্বন্ধে কিছুই এখনও জানতে পারা যায়নি। 'কাং-তাই'-এর বিবরণে[২৫] (যার আনুমানিক রচনাকাল খৃস্টীয় তৃতীয় শতক) তাম্রলিপ্তকে একটি স্বাধীন রাজ্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা প্রয়োজন, ফা-হিয়েনের বিবরণ[২৬] অনুসারে জানা যায় যে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকে তিনি এই রাজ্যে আসেন।

চন্দ্রকেতুগড় অঞ্চলের যাঁদের হাতে শাসনভার ছিল তাঁরা রাজ্যরক্ষার স্বার্থে সৈন্যবাহিনী মোতায়েন করেছিলেন বলে মনে হয়। কারণ একটি নামমুদ্রার লেখতে একজন সৈন্যের উল্লেখ পাওয়া যায়[২৭]। মিলিন্দপঞহোতে এক নাবিকের বঙ্গসহ অন্যান্য বন্দরে শুল্ক প্রদানের উল্লেখ আছে[২৮]। যার থেকে সঙ্গতভাবেই মনে করা যেতে পারে রাজা বা প্রশাসন রাজস্বের উৎস হিসাবে কৃষিজ দ্রব্য ও বাণিজ্যিক আমদানী ও রপ্তানীর ওপর কর ধার্য করত। এই প্রসঙ্গে আরও একটি নামমুদ্রার উল্লেখ এখানে করা যেতে পারে[২৯], যাতে আয় ও ব্যয়ের হিসাবরক্ষক কার্যালয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়।

কিছু পুরাণের বিবরণে গুপ্ত রাজশক্তির উত্থানের সমসাময়িককালে (অর্থাৎ খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের প্রথমভাগে) তাম্রলিপ্ত ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে 'দেবরক্ষিত'[৩০]-দের প্রাধান্যের উল্লেখ মেলে। কিন্তু এই 'দেববক্ষিত' রাজাদের সাথে কুষাণদের (যাদের উপাধি 'দেবপুত্র') কোনও যোগসূত্র ছিল কিনা, তা জানা যায় না। অন্যদিকে গুপ্তরাজশক্তির উত্থানের সমসাময়িক বঙ্গের ভৌগোলিক সীমায় বা তার কাছাকাছি একটি স্বাধীন রাজ্যের নাম পাওয়া যায়। শুশুনিয়া থেকে প্রাপ্ত ব্রাহ্মী লেখতে (লিপি তত্ত্বের বিচারে খৃষ্টাব্দ চতুর্থ শতক) চন্দ্রবর্মন নামে এক রাজার নাম পাওয়া যায়। যিনি ছিলেন পুষ্করন অধিপতি মহারাজ সিংহবর্মনের পুত্র[৩১]। সম্ভবত এই লেখ উল্লেখিত পুষ্করন বর্তমান বাঁকুড়ার পোখরান অঞ্চল। একটি 'বর্মন' রাজবংশ খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের প্রারম্ভিক ভাগে বঙ্গের একটি অংশে বা তার কাছাকাছি অঞ্চলে রাজত্ব করত। এলাহাবাদ প্রশস্তিতে[৩২] সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয়কালীন পরাজিত রাজাদের তালিকায় চন্দ্রবর্মন নামে এক রাজার নাম পাওয়া যায়। এখানে সঙ্গতভাবেই একটা প্রশ্ন উঠতে পারে যে সমুদ্রগুপ্ত কি তবে তার দিগ্বিজয়কালে সাম্রাজ্য সীমা বঙ্গ পর্যন্ত বিস্তৃত করেছিলেন? তবে এর থেকে এই সিদ্ধান্তে আসার কোন কারণ নেই যে এইসময বঙ্গের অপরাপর স্থানীয় রাজাদের রাজত্ব শেষ হয়ে গিয়েছিল। খুব সম্ভবত এই সব রাজারা গুপ্তরাজ শক্তির আনুগত্য স্বীকার করে নেয়[৩৩]। মেহরৌলী লেখে[৩৪] জনৈক রাজা চন্দ্রের সাথে বঙ্গের রাজাদের সম্মিলিত শক্তি জোটের যুদ্ধের ও শক্তি জোটের পরাজয়ের তথ্য উল্লেখিত আছে। যদি চন্দ্রকে গুপ্ত বংশের দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বলে মেনে নেওয়া হয় (যদিও এবিষয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতের অমিল আছে) যার আনুমানিক রাজত্বকাল খৃষ্টীয় ৩৭৬ বা ৩৮০ থেকে ৪১২/১৩ শতক, তাহলে সঙ্গতভাবেই বলা যায় যে, সমুদ্রগুপ্তের পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত তাঁর রাজত্বকালে বঙ্গে গুপ্ত আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। খুব সম্ভবত ঘটনাটি ঘটে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকের প্রারম্ভিক পর্যায়ে। এ পর্যন্ত যে সব মিশ্রিত

লিপি উৎকীর্ণ পুরাবস্তু পাওয়া গিয়েছে লিপিতত্ত্বের বিচারে তাদেরকে আনুমানিক খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকের প্রারম্ভিক কালের মধ্যে ফেলতে হয়। যার থেকে একটা আপতত গ্রাহ্য সিদ্ধান্তে আসা যায়, তা হল — মিশ্রিত লিপি ব্যবহারকারী গোষ্ঠীর রাজাদের রাজত্বকাল খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকের প্রারম্ভিক কালের কোন এক সময় শেষ হয়ে যায় এবং বঙ্গে গুপ্ত আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

সূত্র নির্দেশ

১. ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ২.১.২; কৌটিল্য অর্থশাস্ত্র ২.১১; মহাভারত বনপর্ব তীর্থযাত্রা অধ্যায় ২/৩০, ৮৫/২–৪: সভাপর্ব ৫২/১৭; রামায়ণ ২.১০ ৩৬–৩৭; এম্ উইন্ট্রাবনিস, এ হিসট্রি অব ইনডিয়ান লিটেরেচার ভল্যুম ২ (অনুবাদক) এস কেটকর ও এইচ কোন কলকাতা ১৯৩৩, পৃঃ ৪৩৩

২. Diodorus Sicular, **Bibleo thokes Historikes XVII**, 93.

৩. **Chien Han shu**, ch 28b, pp. 32 a b,1; Wang Gungwu, Nanhai Trade, **Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society, Val XXXI**, No 2, 1958, PP. 19 21.

৪. ভীক্ষু জে কশ্যব (সম্পাদিত) মহানিদ্দেশ (ক্ষুদ্দনিকায় ভল্যুম-চার, পার্ট-এক), নালন্দা ১৯৬০, পৃঃ ৩৫৭, ১.১৫.১৭৪; টি ডবলু রিস ডেভিস, দ্য কোয়চেনস্ অব্ মিলিন্দ, দ্য সেকরেড বুকস অব দ্য ইষ্ট, ভল্যুম-৩৫, অক্সফোর্ড ১৯২৫, পৃঃ ১০, ৬.২১.৩৬০; কালিদাস রঘুবংশ ৪.৩৪.৩৭.

৫. মহাবংশ ১৯.৬; **T'oung Pao**, 1905 s II, Vol VI pp 510–520 and 551–552; জি ডবলু বি হানটিংটন, দ্য পেরিপ্লাস অব্ দ্য ইরিথ্রিয়ান সী, লণ্ডন ১৯৮০, পৃঃ ১২০ (সেকসনস ৬২–৬৩); এইচ ল্যাডেল এ্যাণ্ড আর স্কট, এ গ্রীক ইংলিশ লেক্সিকন, অক্সফোর্ড ১৯৬১, পৃঃ ১৩৬০; Q. Curtius Rufus. **De Rebus gestis Alexandri Magni ix. 2; plutarch, life of Alexander, lives I XII; Justin, Epitoma Historiarum philippicarum libri xliv. Xii.** 8; pliny, **Naturalis Historia** vi 21.65; **ptolemy, Geographike Huphegesis vii 1.18 and vii 1.81;**

৬. T'oung pao, 1905 s II, vol-vi, pp 510-520 and pp. 551–552; বি কার্ল গ্রেণ, অ্যানালিটিক ডিকশনারি অব চাইনিস এ্যাণ্ড সিনো জাপানিস নং ৬৯০ এবং ১৩৪০, নং ৩৮৯-এবং ১৩৪৮; জেসিকুয় কনসাইজ চাইনিজ ইংলিশ ডিকসনারি

টোকিও (পুনঃমুদ্রণ) ১৯৬২, পৃঃ ১১৭; মেমোয়ার অব দ্য রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট অব দ্য টয়ো-বানকো, নং ১৩ ১৯৫৭, পৃঃ ৪১।

৭. ইনডিয়ান অর্কিয়লজি এ রিভ্যুয় ১৯৫৪–৫৫ পৃঃ ১৯–২০ (এবপব আই. এ. আর. পডতে হবে) আই. এ. আর ১৯৭৩–৭৮, পৃঃ ৩৩।

৮. আই. এ. আর. ১৯৫৬–৫৭ থেকে ১৯৬৪–৬৫ সবকটি সংখ্যা দেখতে হবে; এ. বায়. আববানাইজেসন ইন বেঙ্গল, ইনডিয়ান হিষ্ট্রি কংগ্রেস, ৪৮ তম অধিবেশন গোয়া প্রেসিডেন্সিয়াল অ্যাড্রেস, সেকসেন এক (এনসিয়েন্ট হিস্ট্রি) পৃঃ ১২

৯. এ. রায় ও এম. কে. মুখার্জী 'এক্সকাভেসন এ্যাট্ মঙ্গলকোট' প্রত্নসমীক্ষা ভল্যুম-১ ১৯৯২, পৃঃ ১০৭–১৩৪।

১০. জি. ডবলু, বি. হানটিংটন, দ্য পেবিপ্লাস অব দ্য ইবিথ্রিযান সী, লণ্ডন ১৯৮০, পৃঃ ১২০ (সেকসন ৬২-৬৩)

১১. Ptolemy, Geopraplikc Huphegesis VII. 1.81 এবং vii 1 18

১২. টি. ডবলু. বিস. ডেভিস, দ্য কোসচেনস অব্ মিলিন্দ, দ্য সেকরেড বুকস অব দ্য ইষ্ট ভল্যুম-৩৫, অক্সফোর্ড ১৯২৫, পৃঃ ১০ ৬.২১. ৩৬০

১৩. নং ১০ দেখুন

১৪. ললিতবিস্তর, অধ্যায় ১০-ম (সম্পাদক পি. এল. বৈদ্য) দাবভাঙ্গা ১৯৫৮, পৃঃ ৮৮।

১৫. বি. এন. মুখার্জী 'কয়নস ইন প্রি গুপ্ত বেঙ্গল' স্টাডিস ইন আর্কিওলজি (সম্পাদক এ. দও) কলকাতা ১৯৯১, পৃঃ ২৯৩।

১৬. ইনডিয়ান মিউজিয়ান বুলেটিন, কলকাতা ১৯৯০, পৃঃ ২৪ (এবপব আই. এম. পডতে হবে)

১৭. আই. এম. পৃঃ ৪৬ নং ৯; পৃঃ ৪৮ নং ১৪

১৮. আই. এম. পৃঃ ৪৮, নং নং ১২

১৯. আই. এম. পৃঃ ৪৮, নং ১৩

২০. আই. এম. পৃঃ ৪৮ নং ১৪

২১. আই. এম. পৃঃ ৪৯ নং ১৬

২২. আই. এম. পৃঃ ৪৯ নং ১৭

২৩. আই. এম. পৃঃ ৪৯ নং ১৬

২৪. বি.এন.মুখার্জী, দ্য বাইস এণ্ড ফল অব দ্য কুষাণ এমপায়াব, কলকাতা, ১৯৮৮, পৃঃ ৩১২ এক এবং ৩৩৪

২৫. L. petech Northerm India According to Shui ching chu Rome 1950, p 53

২৬. Fo-Kuo-Chi, ch-xxxvii

২৭. আই. এম. পৃঃ ৫০ নং ১৮

২৮. নং ১২ দেখতে হবে

২৯. আই.এম. পৃঃ ৫০, নং ১৯

৩০. এফ. ই. পারজিটার, দ্য পুরাণ টেক্সট্ অব্ দ্য ডাইনাসটিস অব্ দ্য কলি এজ, অক্সফোর্ড ১৯১৩, পৃঃ ৫৪; বি সি সেন, সাম হিস্টোরিকাল অ্যাসপেকটস্ অব দ্য ইনস্ক্রিপসেনস অব বেঙ্গল, কলকাতা ১৯৪২, পৃঃ ২০৫।

৩১. ডি.সি. সরকার সিলেক্ট ইনস্ক্রিপসেনস্ বিয়ারিং অন ইনডিয়ান হিস্ট্রী এ্যাণ্ড সিভিলাইজেসন্, ভল্যুম-১, কলকাতা, ১৯৪২ (এরপর সি. আই পড়তে হবে) পৃঃ ৩৫১ ৩৫২।

৩২. সি. আই. পৃঃ ২৬৫

৩৩. সি. আই. পৃঃ ২৬৬

৩৪ সি. আই. পৃঃ ২৮১

মধ্যযুগের ভারত

মধ্যযুগীয় মধ্যভারতের কিছু ভাস্কর্য: সামাজিক ধর্মীয় প্রেক্ষাপট

সর্বশ্রী বন্দোপাধ্যায়

ভারতীয় ভাস্কর্য শিল্পের ইতিহাসের সময় সীমা ও বৈশিষ্ট্যকে কেন্দ্র করে যথেষ্ট বিতর্ক লক্ষ্য করা গেছে। কুমারস্বামী সহজভাবে যখন নবম থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়কে মধ্যযুগরূপে চিহ্নিত করেছেন, তখন বাসুদেব আগরওয়ালা মধ্যযুগকে দুটি পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন— (ক) আদি মধ্যযুগ (৬৫০-৯৫০ অব্দ) এবং (খ) শেষ মধ্যযুগ (৯৫০-১২০০ অব্দ)। অন্যদিকে কড্রিংটন ভারত ভাস্কর্য ও স্থাপত্য শিল্পের ইতিহাসকে সাতটি পর্যায়ে বিভক্ত করলেও মধ্যযুগকে দুটি ধারায় নির্দিষ্ট সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে চিহ্নিত করেছেন—(অ) আদি মধ্যযুগ (৬ষ্ঠ—৮ম শতাব্দীর পাহাড়-কাটা মন্দির নির্মাণের কাল) (আ) শেষ মধ্যযুগ, (অষ্টম থেকে চতুর্দশ শতাব্দী হর্ম্য মন্দির নির্মাণের কাল)।[১]

আলোচ্য প্রবন্ধের বিষয় হল—খৃস্টীয় দশম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যযুগীয় মধ্য ভারতের কিছু ভাস্কর্য শিল্পের ব্যাখ্যা প্রদান তৎকালীন ভারতীয় সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনের বৈশিষ্ট্যের আলোকে। উক্ত সময় সীমার মধ্যে ভারতে স্থানীয় বা আঞ্চলিক শক্তিগুলি কর্তৃত্ব পরায়ণ হয়ে ওঠে এবং মধ্য ভারতের উত্তরে কচ্ছপঘাত, কেন্দ্রে চান্দেল, পূর্বে কলচুরী ও পশ্চিমে পরমার রাজবংশ স্বীয় ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। সদা জাগ্রত প্রহরী বিন্ধ্য ও সাতপুরা পর্বত এবং ঘন অরণ্য, মধ্যপ্রদেশকে এক বিশেষত্ব দিয়েছে এবং চম্বল, বেতোয়া, নর্মদা, শোন, তাপ্তী ও মহানন্দার কোলে গড়ে উঠেছে মধ্য ভারতের সভ্যতা। এখানকার আদিবাসী মানুষরা মূলত নিষাদ, শবর, বানর ও রিক্সো সম্প্রদায়ভুক্ত।[২]

গুপ্তযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক সামাজিক বৈশিষ্ট্য খৃস্টীয় পঞ্চম শতাব্দী থেকে ভারতীয় সামাজিক-রাজনৈতিক মেরুদণ্ডের ভিত্তি প্রস্তররূপে স্পষ্টভাবে আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করে। বর্তমানে মধ্য ভারতের জেজাকভূক্তি বা বর্তমান খাজুরাহকে কেন্দ্র করে চান্দেল শক্তির বিকাশ ঘটে এবং চান্দেলরা খুব সম্ভবত কনৌজের প্রতিহার রাজশক্তির অধীনে সামন্ত ছিলেন এবং চান্দোল রাজা ধংগো ৯৫৪ খৃস্টাব্দের পর প্রথম স্বাধীন চান্দোল রাজারূপে নিজেকে স্বীকৃতি দেন। মধ্য ভারতের পূর্বে (বর্তমান জব্বলপুর অঞ্চল) কলচুরীরা ছিলেন দক্ষিণের রাষ্ট্রকূট রাজাদের

সামন্ত শক্তি। রাষ্ট্রকূট রাজা তৃতীয় গোবিন্দ কর্তৃক নিযুক্ত ব্যক্তিই ছিলেন কলচুরী রাজ পরিবারের প্রথম প্রতিনিধি। গোয়ালিয়রের কচ্ছপঘাতরা ছিলেন চান্দেলদের সামন্তের অধীনস্থ সামন্ত এবং খৃস্টীয় দশম শতাব্দীতে কচ্ছপঘাত রাজা বজ্রদামন নিজেকে স্বাধীন রাজারূপে ঘোষণা করেন। মধ্য ভারতের পশ্চিমের পরমার-রা রাষ্ট্রকূট রাজপরিবার থেকে উদ্ভূত বলেই মনে করা হয়। ঐতিহাসিক ডি. সি. গাঙ্গুলী পরমার রাজশক্তিকে মালবের প্রভু এবং অবন্তী অথবা উজ্জয়িনী এবং ধারা-র রাজা রূপে চিহ্নিত করেছেন।[৩]

মধ্যযুগীয় মধ্য ভারতের ভাস্কর্য শিল্পের বিষয়টি নিম্নলিখিত কতগুলি পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত তথ্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল।

(ক) যদিও মধ্য ভারত পর্বত ও বনাঞ্চলে ঘেরা ও আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী তথাপি ভৌগোলিক কারণেই মধ্য ভারত পূর্ব ও পশ্চিম ভারতের শিল্প-চেতনার বৈশিষ্ট্য সমূহকে স্বাগত জানিয়েছিল। ফলে মধ্য ভারতীয় ভাস্কর্য শিল্পে একই সঙ্গে পূর্বের ওড়িশি বা ভুবনেশ্বরের বিষয়বস্তু এবং পশ্চিমের গুজরাট ও রাজস্থানের অলংকরণ সুস্পষ্ট।

(খ) আলোচ্য সময়ের মধ্য ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস মূলত চারটি রাজপরিবার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হলেও একই সঙ্গে চারটি রাজপরিবারের সদস্যদের মধ্যে অথবা অন্যান্য প্রধান ভারতীয় রাজশক্তিগুলির সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হত — যার অনিবার্যতা ছিল বিভিন্ন আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন। ফলে মধ্য ভারত তার স্বাতন্ত্র নিয়েও একই সঙ্গে ভারতীয় শিল্পের এক সদস্যরূপে সামগ্রিক স্বীকৃতি লাভে সমর্থ হয়েছিল।

(গ) মধ্য ভারতের বৃহৎ শিল্প সৃষ্টির ইতিহাসের পশ্চাতে সক্রিয় ছিল ধর্মীয় অনুপ্রেরণা। একই সঙ্গে শিল্পগুলি রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা অর্জন করতো এবং এ কারণেই ত্রয়োদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে যে রাজনৈতিক বিশৃংখলা মধ্যভারতে সৃষ্টি হয়েছিল তা শিল্পের প্রগতির পথে অন্তরায় হয়েছিল এবং অবনতি ডেকে এনেছিল।

(ঘ) মধ্যযুগীয় ভারতের শিল্প-ইতিহাস, শিল্পী-র ব্যক্তিগত প্রতিভাকে কোন বিশেষ স্বীকৃতি দেয়নি, তা ছিল সামগ্রিক শিল্পী গোষ্ঠীর যৌথ প্রয়াসের ফলশ্রুতি, অন্য দিকে ইওরোপের শিল্প ইতিহাস ব্যক্তি প্রতিভাকে স্বীকৃতি দেওয়াকে সামাজিক দায়িত্ব রূপে গণ্য করেছিল।

(ঙ) মধ্য ভারতের মধ্যযুগীয় ভাস্কর্য শিল্পের ইতিহাসের ধারাটি এক বিশেষ ধরনের সামাজিক চিত্রের পরিচয় বহন করে— সেখানে জ্ঞান, বিজ্ঞান, সাহিত্য, ধর্ম— অর্থাৎ সাংস্কৃতিক অবয়বটি নারী-পুরুষের সম্পর্ককে কেন্দ্র করে বার বার আবর্তিত হয়েছে ও শেষ পর্যন্ত ধর্মীয় আঙিনায় মুক্তির শ্বাস ফেলেছে।

এই দৃষ্টিভঙ্গীর সমর্থনে হারবার্ট রীডকে স্মরণ করে বলা যায় যে অনুকূল সামাজিক পরিবেশেই শিল্প পরিণতি লাভ করতে পারে। উপযুক্ত পরিবেশে আগুনের শিখার মতো শিল্প প্রতিভার স্ফুরণ হয়, ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পরিক সংঘাতেই আহিতাগ্নির মতো শিল্পপ্রতিভা অকস্মাৎ ভাস্কর হয়ে ওঠে[৪]।

(চ) উপরিউক্ত তথ্য সমূহ আলোচনার সাপেক্ষে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ'ল যে মধ্যযুগীয় ভারতীয় শিল্পের যে নিদর্শন আমরা পাই তা কোন আকস্মিক সৃষ্টি স্থাপত্য বা ভাস্কর্য নয়, দীর্ঘ দিনের ধারাবাহিক শিল্প সৃষ্টির এক চূড়ান্ত পরিণত প্রকাশ হ'ল মধ্যযুগীয় ভারত শিল্প।

মধ্য ভারতের উত্তরে (বর্তমান গোয়ালিয়রকে কেন্দ্র করে) কচ্ছপঘাত রাজাদের মন্দিরগুলি অবস্থিত। মন্দিরের জঙ্ঘায় দুসারি ভাস্কর্য, মাঝারি ধরনের উঁচু শিখর, কখনও গর্ভগৃহের চারদিকে প্রদক্ষিণ পথ, অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'পঞ্চরথ' ভিত্তি সংস্থান অনুসারে গর্ভগৃহ ও ভিতর দিক ভাস্কর্য সজ্জায় সজ্জিত। গোয়ালিয়রের দুর্গের মধ্যে অবস্থিত 'সাস-বহু' মন্দিরটি এই রাজাদের শিল্প নিদর্শনের পূর্ণ বিকাশ।[৫]

গোয়ালিয়রের উত্তর সীমান্তে মোরেনা জেলায পধাবলী গ্রামের দুর্গস্থিত খৃস্টীয় দশম শতাব্দীর মন্দিরটি কচ্ছপঘাত রাজাদের এক অনুপম শিল্প সৃষ্টি। মূল মন্দিরের গর্ভগৃহ কালের প্রভাবে বিনষ্ট হয়ে গেলেও নাট মন্দিরের কারুকার্য এখনও পর্যন্ত দর্শককে অভিভূত করে। মন্দিরগাত্রে নিপুণ হস্তে খোদিত হয়েছে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের পূর্ণাবয়ব মূর্তি, এছাড়াও রয়েছে সূর্য মূর্তি। এই মন্দিরটির বিশেষত্ব এই যে, দশভূজা দুর্গা ও শিব লিঙ্গের নিকটেই লক্ষ করা যাবে অসংখ্য নরকংকালের ন্যায় খোদিত মূর্তি — যার থেকে সহজেই অনুমেয় যে উক্ত সময়ে ঐ অঞ্চলে তান্ত্রিক ধর্ম বা শক্তি পূজা পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। অধিকন্তু খোদিত অসংখ্য মিথুন মূর্তিও উপরিউক্ত ধারণাকে সমর্থন করে। ঐ গ্রামেরই আরও অভ্যন্তরে এক বিশাল অঞ্চল জুড়ে রয়েছে ভগ্নপ্রায় বটেশ্বর শ্রেণীর মন্দির। সংশ্লিষ্ট অঞ্চল প্রায় জনহীন ও আধুনিক সভ্যতার নিত্য নতুন সংবাদ থেকে বিচ্ছিন্ন। অরণ্য ও ঘেরা গ্রামটির শ্রী বৃদ্ধি করেছে অসংখ্য বন্য ময়ূর— যারা প্রকৃতির সঙ্গেই কেবলমাত্র সখ্য স্থাপন করেছে। এই বটেশ্বর শ্রেণীর মন্দিরসমূহের সঠিক সময়কাল সম্পর্কে স্থানীয় লোকজন এখন নিশ্চিত নন— কিন্তু দুর্গস্থিত পূর্বোক্ত মন্দিরের শিল্পকর্মকে বটেশ্বর মন্দির শিল্পের পরিণতরূপ হিসেবে মেনে নেওয়া অসঙ্গত হয় না। কিন্তু এই মন্দিরে মিথুন মূর্তির সংখ্যা ও তার আবেগগত তীব্রতা পূর্বের দুর্গস্থিত মন্দিরের তুলনায় অনেক কম। আর একটি বিষয় হ'ল পধাবলী মন্দির শিল্পের সঙ্গে ওড়িশার শিল্প সম্ভারের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

কচ্ছপঘাত রাজারা হিন্দু ছিলেন এবং বজ্রদামন এর পরবর্তী দুই রাজা মঙ্গলরাজ ও কীর্তিরাজ যথাক্রমে বিষ্ণু এবং শিব ভক্ত ছিলেন। কিন্তু কচ্ছকঘাত রাজা পদ্মপাল জৈন ধর্মানুরাগী ছিলেন এবং তিনি ব্রহ্মপুরা জেলার এক বিশাল অংশের জমি, প্রচুর পরিমাণ রত্নসম্ভার, রৌপ্য, স্বর্ণ দ্রব্য সমূহ জৈন সম্প্রদায়কে দান করেন[৬]। এছাড়াও গুণা জেলার কাডওয়াহা-তে অবস্থিত মন্দিরগুলি কচ্ছপঘাত রাজাদের অর্থনৈতিক প্রাচুর্যের পরিচায়ক।

মধ্যভারতের কেন্দ্রাঞ্চলে (বর্তমান খাজুরাহো ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল) চান্দেল বংশ খৃস্টীয় দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত নিজেদের কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ন রাখতে সমর্থ হয়েছিল। ৯৫০–১০৫০ এ.ডি. সময়কাল ছিল চান্দেল শিল্পের স্বর্ণযুগ, পরবর্তী ১০০ বছরে শিল্প বৈশিষ্ট্যের তীব্রতার গতি ক্রমশ অবরুদ্ধ হতে থাকে। চান্দেল রাজাদের কর্তৃত্ব মূলত জেজাকভুক্তি বা বর্তমান খাজুরাহোকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল। চান্দেল ভাস্কর্যের শ্রেষ্ঠ নমুনা মন্দির শিল্প ত্রিধারায় গড়ে উঠেছিল— দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিমের মন্দিরসমূহ। মন্দিরগুলি 'Sand stone' দ্বারা নির্মিত। চান্দেল মন্দিরগুলি নাগর স্থাপত্যরীতি অনুসারে নির্মিত হয়েছিল। এই সময়কার সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য মন্দিরগুলি হল রাজা যশোবর্মনের সময় নির্মিত লক্ষ্মণ মন্দির, একাদশ শতাব্দীতে নির্মিত (রাজা ধঙ্গো-র সময়ে) বিশ্বনাথ মন্দির, দেবী জগদম্বা মন্দির ও রাজা বিদ্যাধরের সময়ে নির্মিত মহাদেব কন্দরীয় মন্দির (১০২৫–১০৫০ খৃস্টাব্দ)।

উপরিউক্ত মন্দিরগুলি পশ্চিমদিগস্থ, এই মন্দিরগুলি প্রত্যেকটি পরস্পরের নিকটবর্তী। এই মন্দিরগুলিব প্রধান বৈশিষ্ট্য হল যে প্রাচীন কামশাস্ত্রানুসারে (বাৎসায়ন ও কোকপন্ডিত) মন্দির গাত্রে অসংখ্য মিথুন ও মৈথুন মূর্তি খোদিত হয়েছে। এই মূর্তিগুলির বিশেষ দেহভঙ্গি প্রমাণ করে সংশ্লিষ্ট সময়ে নারী-পুরুষ উভয়েই দেহ সৌষ্ঠব সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। বিভিন্ন যোগ পদ্ধতিতে মৈথুন দৃশ্যসমূহ এই অঞ্চলে তান্ত্রিক ধর্মের উপস্থিতিকে সমর্থন করে। এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, কচ্ছপঘাত শিল্পরীতির সঙ্গে চান্দেল শিল্পরীতির বিশেষত বিষয়বস্তুর নির্বাচনে গভীর সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

চান্দেল রাজারা যদিও মূলত শিব ও বিষ্ণু ভক্ত ছিলেন তথাপি এই সময়েও কিছু জৈন মন্দির গড়ে উঠে, যথা— আদিনাথ, পার্শ্বনাথ ও শান্তিনাথ মন্দির। জৈন তীর্থংকরগণের নামানুসারে এগুলি নামাঙ্কিত হয়। এই মন্দিরগুলি মৈথুনদৃশ্য বর্জিত। বিপরীতে মন্দিরগুলির দৃশ্য তৎকালীন অভিজাত নারীদের রূপ সচেতন মনস্কতাকে তুলে ধরেছে। পুরনারীগণ অঙ্গ সুরভিত করার স্বার্থে চন্দন বা উগ্র ব্যবহার করতেন। অঙ্গ মার্জন করার জন্য ব্যবহার করা হত কলেয়ক বা তৈল নিঃসরণকারী গাছ, এবং হরিচন্দন। স্নানান্তে কেশচর্চার জন্য ব্যবহার হত কালো

অগুরু, লোধ্ররেণু, ধূপ ও অন্যান্য দ্রব্য। মহিলাগণ নিজেদের সুসজ্জিত করার প্রয়োজনে অঞ্জন, অলতক এবং কুমকুম ব্যবহার করতেন।

চান্দেল মহিলাগণ শাড়ি, চনুরী ও চোলী-র সঙ্গে সম্যকরূপে পরিচিত ছিলেন। দেহসৌষ্ঠব প্রদর্শনের জন্য খুব শক্তভাবে শাড়ি পরা হত[৭]।

খাজুরাহো মন্দির শিল্প থেকে সমাজ জীবনের একটি সামগ্রিক চিত্র ভেসে ওঠে। নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা সমাজে স্বীকৃত ছিল। বিশ্বনাথ মন্দির শিল্প থেকে প্রতীয়মান হয় যে সামাজিক অনুষ্ঠানের সময় নারী-পুরুষের একত্রে মদ্যপান সমাজে নিষিদ্ধ ছিল না। অন্য দিকে নারী-পুরুষ একত্রে বসে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা সাপেক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারিবারিক সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী। তবে সমাজে অবৈধ সম্পর্কও তৈরি হত — যার প্রতিফলন শিল্পকর্মে সুস্পষ্ট।

চেদী বা আধুনিক জব্বলপুরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল কলচুরী শক্তির ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি। কলচুরী রাজারা শৈব মতাবলম্বী মত্তময়ূর আচার্য শ্রেণীর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই আচার্য-কুলের প্রভাবে তৈরি হয়েছিল বৈজনাথ, অমরকন্টক, গার্গী ও সোহাগপুরের মন্দিরসমূহ। কলচুরী শিল্পরীতির সঙ্গে (বিশেষত নর্মদা নদী তীরে চৌষট্ট যোগিনী মন্দির ও শাহডল জেলার সোহাগপুরের বিরাটেশ্বর মন্দির) খাজুরাহো মন্দির শিল্পের এক সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। কলচুরী রাজা প্রথম যুবরাজ চালুক্য কন্যা নোহলাকে বিবাহ করেন। মহারাণী গভীর ধর্মভাবাসম্পন্না ছিলেন এবং একটি শিব মন্দির নির্মাণ করেন এবং প্রতিদিনের দান ভিন্ন সাতটি গ্রামের রাজস্ব মন্দিরের ব্যয় নির্বাহের স্বার্থে দান করেন[৮]। দ্বিতীয় যুবরাজ মত্তময়ূর সম্প্রদায়ভুক্ত আচার্য সদ্‌ভাবশম্ভু বা প্রভাবশিবকে তিন লক্ষ গ্রাম দান করেছিলেন, যিনি পরবর্তীকালে গোলোকী মঠ নির্মাণ করেন।[৯]

মধ্য ভারতের পশ্চিমে মালবকে কেন্দ্র করে পরমার রাজশক্তির বিস্তার ঘটে। পরমারদের শ্রেষ্ঠ কীর্তির নিদর্শন হল সাঁচী স্তূপ। ৪৫ নং মন্দিরটির (দশম-একাদশ শতাব্দীতে নির্মিত) উপর বৌদ্ধ প্রভাব সুস্পষ্ট, যদিও মার্শাল মনে করেন চরিত্রগত প্রশ্নে এটি হিন্দু মন্দির।

সাঁচীর নিকটস্থ কাকপুর গ্রামের দেবী মন্দিরটির ভাস্কর্য মিথুন মূর্তির জন্য সুবিখ্যাত। এছাড়াও খৃস্টীয় একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মধ্যভারতের পশ্চিমে মালবকে কেন্দ্র করে ভূমিজ স্থাপত্য রীতির যে বিকাশ ঘটেছিল তার চূড়ান্ত পরিণতি দেখা যায় বিদিশা জেলার উদয়পুরের মন্দিরে। এই মন্দিরের স্তম্ভগাত্রের মিথুন মূর্তিসমূহের তাৎপর্য হল মূর্তিগুলি আকারে ছোট ও গোপন অঞ্চলে খোদিত। এই বিশেষত্ব পরমার শাসনের সমাজ ব্যবস্থার একটা নিয়ন্ত্রণকেই প্রকাশ করে।

পরমাব রাজা ভোজদেব বা তার ভ্রাতা উদয়াদিত্য ছিলেন শিবের উপাসক এবং উদয়াদিত্য উদয়পুরে নীলকণ্ঠেশ্বর মন্দির স্থাপন করেছিলেন। পরমার যুগে মালবকে কেন্দ্র করে ব্রাহ্মণ শ্রেণীর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পরমার মহারাজা উদয়াদিত্য এবং নরবর্মন বর্ণ-ব্যবস্থার প্রতিরক্ষক রূপে পরিগণিত হয়েছিলেন। বাক্‌পতি রাজের ৯৭৪ খৃস্টাব্দের প্রশস্তি থেকে জানা যায় যে, মহারাজ স্বয়ং মহান শৈবভক্ত ছিলেন এবং ব্রাহ্মণ দার্শনিক বসন্তাচার্য্য-কে 'Tadar' দান করে ছিলেন।[১০]

নাগপুর প্রশস্তি (শিলালিপি) থেকে জানা যায় যে পরমার রাজা লক্ষণদেব (উদযাদিত্যের পুত্র) এক সূর্যগ্রহণ অনুষ্ঠানে ব্যাপুরা মন্ডলের দুটি গ্রাম একটি মন্দিরের ব্যযভার নির্মাণের স্বার্থে দান করেছিলেন[১১]। লক্ষ্মণ বর্মনের ভ্রাতা নরবর্মনের ১১০৪ খৃস্টাব্দের প্রশস্তি থেকে জানা যায় যে, তিনিও মন্দিরের প্রতিরক্ষা করণেব প্রয়োজনে উপরোক্ত অঞ্চলের আরও একটি গ্রাম দান করেছিলেন।

মাউন্ট আবু প্রশস্তি (১২০৮ খৃস্টাব্দ) পরমার শাসনের সমৃদ্ধি ঘোষণা করে। অবন্তীর শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে— এই অঞ্চল "বিত্তশালী মানুষের আবাসস্থল এবং শাসকগণ তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব দ্বারা পৃথিবীকে রক্ষা করেন, অবন্তী শুদ্ধ হয মানুষেব পবিত্র ও অপূর্ব জীবন ধারা এবং ব্রাহ্মণ সাহচর্যে— যাঁরা শাস্ত্রানুযায়ী জীবনপথ অনুসরণ করেন এবং অবন্তী সুখী হয় তার যৌবন সুরভিত সৌন্দর্য্যে....."[১২]।

উপরোক্ত চারটি অঞ্চলের ভাস্কর্য শিল্প তৎকালীন যে সমাজ মনস্কতার পরিচয় বহন করে তা নিঃসন্দেহে ভাস্কর্য শিল্পবিজ্ঞানের ইতিহাসে দুর্লভ প্রশংসাব দাবি রাখে। গোযালিয়র দুর্গ থেকে শাস-বহু মন্দির অথবা পধাবলী মন্দির থেকে খাজুরাহো মন্দির সর্বত্রই যে নির্মাণ কৌশল অনুসৃত হয়েছিল তা আধুনিক বৃহৎ প্রাসাদোপম অট্টালিকার ঈর্ষার কারণ হতে পারে। শুধুমাত্র বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর খন্ডকে সারাজীবন ধরে অপরিসীম ধৈর্য ও অধ্যাবসায় সহযোগে নির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে খনন করেছেন স্থপতি ও ভাস্করগণ। মূল মন্দিরসমূহে কোথাও আধুনিক সিমেন্টের বা অনুরূপ কোন অস্তিত্ব চোখে পড়ে না। প্রতিটি প্রস্তরকে অপর একটি প্রস্তরের সঙ্গে বসানোর জন্য নিখুঁত দক্ষতায় ছেদন করা হত।

এই সমস্ত অনুপম ভাস্কর্য শিল্পের পশ্চাতে রাজশক্তির আনুকূল্যের প্রশ্নটি ছিল অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। পৃথিবীর ইতিহাসে ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে বিভিন্ন সময় সখ্য বা আপোস লক্ষ করা গেছে। যেহেতু ক্ষাত্রতেজে উদ্দীপ্ত রাজশক্তি জাতির রক্ষক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন সেই হেতু রাজশক্তিকে শাস্ত্রানুসারে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আবির্ভূত হয়েছেন ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়। সেই কোন প্রাচীনকাল থেকে এইভাবে পরস্পরের স্বার্থে পরস্পরের মধ্যে রক্তপাতহীন সন্ধি স্থাপিত হয়েছে। ভারতবর্ষে মৌর্য শাসনের অবসানে যেমন বৈদেশিক শক্তির আগমনে এক ধরনের রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছিল ঠিক তেমনই গুপ্ত শাসনের শেষ পর্যায়ে হূণ আক্রমণের ফলে ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক ঝড়ো হাওয়ার দাপট লক্ষ করেছিল।

৭১২ খৃস্টাব্দের রাযোর যুদ্ধে সিন্ধের রাজা, দাহির মহম্মদ বিন কাশিমের নেতৃত্বে আরবদের নিকট পরাস্ত হলে ভারতে মুসলিম আক্রমণের যে কেবল সূচনাই ঘটেছিল তাই নয় একই সঙ্গে হিন্দু কেন্দ্রীয় সাম্রাজ্য শক্তির অবসানের পথ সুপ্রশস্ত হয়েছিল। এই সময় সর্বত্রই বিভিন্ন আঞ্চলিক হিন্দু রাজশক্তিগুলি স্বাধীনভাবে আত্মরক্ষায় ও আত্মপ্রকাশে ব্যস্ত হয়ে ওঠে, মধ্য ভারতেও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

এই সময় সারা ভারতবর্ষ জুড়েই অসাধারণ বিভিন্ন মন্দির নির্মিত হয়েছিল। মধ্যযুগীয় মন্দিরগুলিতে সামগ্রিক ভাবে হিন্দু দেবদেবীর-ই প্রাধান্য, তার মধ্যে আবার শৈবশক্তি, বৈষ্ণব, এবং জৈন প্রভাব লক্ষনীয়। কেন রাজারা ঐ সকল বৃহৎ মন্দির নির্মাণ করতেন তার একটি সাধারণ ব্যাখ্যা হল স্বীয় মহিমা-কীর্তন— কিন্তু তার পশ্চাতে নিঃসন্দেহে ধর্মীয় প্রভাব লক্ষ্যণীয়, বিভিন্ন দান কার্য থেকেই এই ধারণা সঙ্গত। ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় বা ধর্মীয় গোষ্ঠী এবং রাজশক্তির যৌথ কিন্তু সাধারণগ্রাহ্য প্রধান জমি হল মন্দির শিল্প। এবং তৎকালীন কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতার ফলে স্থানীয় রাজনৈতিক ও ধর্মীয় শক্তিগুলির একতা মুসলিম আক্রমণের প্রভাব থেকে হিন্দু সমাজকে সংঘবদ্ধ রাখতে সহায়ক হতে পারত। সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়েই এই মূলভাব সেই সময় সামাজিক প্রেক্ষাপটে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

মন্দিরগাত্রে মূলত রাজপুরবাসী অভিজাত নর-নারীর ভাস্কর্যই খোদিত হয়েছিল— তাদের জীবন-যাপন পদ্ধতিই বিষয়বস্তুরূপে নির্ধারিত হয়েছিল, সুতরাং সাধারণ মানুষের জীবন মধ্যযুগীয় শিল্প চেতনাকে আলোড়িত করেনি— তৃণমূলের অবদান, মধ্যযুগীয় মধ্যভারতের শিল্প ইতিহাসে অবহেলিত, যদিও ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর বিপ্লব ইতিহাসের নেতৃত্বে সাধারণ মানুষের ভূমিকা বিশেষভাবে স্বীকৃত।

মধ্যযুগীয় ভারতীয় ভাস্কর্য শিল্পের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল— এই সময়কার শিল্প চেতনা তীব্র যৌন আবেদনে প্রভাবিত হয়েছিল— কেন এরূপ ঘটেছিল সে বিষয়ে বিভিন্ন মতপার্থক্য লক্ষ করা যায়।

মানবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে মিলন স্পৃহা-ই এই প্রকার মিথুন ও মৈথুন ভাস্কর্য নির্মাণ কল্পে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল।[১৩]

ঈশ্বরের সঙ্গে ব্যক্তির আধ্যাত্মিক মিলনের আকাঙ্ক্ষার সত্যতা পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে ঐরূপ মিথুন বা মৈথুন দৃশ্যের অবতারণা।

একপ্রকার প্রচলিত ধারণা অনুসারে অনিষ্টকারী শক্তির প্রভাব থেকে মন্দির অভ্যন্তরস্থ দেবতাকে রক্ষণের উদ্দেশ্যেই মন্দিরগাত্রে এরূপ ভাস্কর্য গড়ে উঠেছিল।

আবার যেহেতু যৌন দর্শন চৌষট্টি কলার-ই অন্তর্ভুক্ত— সুতরাং মন্দির ছিল এই বিষয়ে শিক্ষাদানের স্বীকৃত শিক্ষাদান কেন্দ্র যা সামাজিক প্রয়োজনেই উদ্ভূত হয়েছিল। মন্দিরকে কেন্দ্র করেই জনসমাগম হত।

আবার এরূপ সিদ্ধান্তেও অনেকে উপনীত হয়েছেন যে, মধ্যযুগীয় ভারতীয় হিন্দু ধর্মের উপর তান্ত্রিক প্রভাবই এরূপ ভাস্কর্য শিল্পের সহায়ক হয়েছিল।

অন্যদিকে মধ্যযুগীয় মন্দিরগাত্রে বিস্তৃত ও নির্বাধ মৈথুন অবতারণাকে তৎকালীন জীবনধারণের এক সহজ উদাহরণ রূপে গ্রহণ করা হয়েছে।[১৪]

আলোচ্য সময় সীমায় ভারতীয় ভাস্কর্য শিল্পের একটি লক্ষণীয় বিষয় হল যে, খৃস্টীয় দশম থেকে ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত মূলত পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের ভাস্কর্য শিল্প চেতনায় তীব্র মৈথুন দৃশ্য অসাধারণ গুরুত্ব লাভ করেছিল এবং এরূপ ব্যাপক প্রচার কখনোই সামাজিক অনুমোদন ভিন্ন লাভ করা সম্ভবপর ছিল না। এ প্রসঙ্গে ওড়িশার রাজরানী (আনুমানিক ১৪০০ খৃস্টাব্দ) মন্দিরের মৈথুন দৃশ্য এবং গোয়ালিয়রের পধাবলী গ্রামের বটেশ্বর মন্দিরের একটি মৈথুন দৃশ্যের তুলনায় অপূর্ব সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। উভয় ক্ষেত্রেই একজন নারী ও একজন পুরুষ দৃঢ় আলিঙ্গনে চুম্বনরত। অধিকন্তু মধ্য ভারতের ভাস্কর্য শিল্পের মৈথুন দৃশ্যগুলির পূর্বভারতের কোণারক, মহীশূরের বেলুর, হালেবিড, বাভকা ইত্যাদি অঞ্চলের ভাস্কর্য শিল্পের সঙ্গে অপূর্ব সাদৃশ্য লক্ষনীয়। সুতরাং এ ক্ষেত্রে মধ্য ভারতের শিল্পচেতনা আঞ্চলিক হয়েও সমগ্র ভারতীয় শিল্প চেতনার শরিক হয়েছে।

আলোচ্য সময়ে মধ্য ভারতীয় শিল্প চেতনা শিল্পীর ব্যক্তিগত পরিচয় সম্পর্কে নীরব। তবে খাজুরাহো ভাস্কর্য শিল্প সংগ্রহশালায় একটি ভাস্কর্য নিদর্শনে সমবেতভাবে কিছু শিল্পীকে লক্ষ করা যায়।

মধ্য ভারতের মধ্যযুগীয় ভাস্কর্য নিদর্শনগুলি অভিজাত জীবনধারাকে বিষয়বস্তু রূপে গ্রহণ করেছিল, সেই সময় শুধু ভাস্কর্য নয়— চিত্রকলা, সাহিত্য সর্বত্রই সমাজের সর্বাধিক বিত্তশালী শ্রেণী-ই প্রাধান্য পেয়েছিল। খাজুরাহো অঞ্চলে জৈনমন্দির গাত্রে অভিজাত রমণীদের সাজসজ্জার দৃশ্যায়ন ঘটেছে। জব্বলপুর অঞ্চলের (কলচুরী) শাহ্ডলের নিকটবর্তী সোহাগপুরের বীরাটেশ্বর মন্দিরে এরূপ কিছু দৃশ্য লক্ষ্যণীয়। অধিকন্তু যদিও মন্দির গাত্রে মূলত হিন্দু দেব-দেবী-ই সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছেন তথাপি কিছু কিছু ভাস্কর্য নিদর্শনে ঐ অঞ্চলে জৈন ধর্মের প্রভাব অনুমেয়। ভাস্কর্য শিল্পের নৃত্যরতা রমণী থেকে কেশ-বন্ধন, সিন্দুর সহ অঞ্জন সহযোগে সজ্জাবিন্যাসে ব্যস্ত শিল্প নিদর্শন— আধুনিক নারীদের সৌন্দর্য চর্চার অতীত রূপটি স্মরণ করিয়ে দেয়।

মধ্য ভারতীয় মধ্যযুগের ভাস্কর্য নিদর্শনগুলি কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ে তীব্রতাপ্রাপ্ত হলেও আকস্মিকভাবে আবির্ভূত হয়নি— প্রকৃতপক্ষে ঋক্-বৈদিক যুগ থেকে গুপ্তযুগের কালিদাসের অনন্য সৃষ্টি সম্ভার এবং তারও পরে কবি কৃষ্ণ মিশ্র, কবি জয়দেবের সাহিত্যসৃষ্টি— ভারতীয় রাজন্যবর্গসহ শিল্পীকে যথেষ্ট প্রভাবিত

করেছিল। ধর্মীয় শাস্ত্র সমূহে মিথুন দৃশ্যের অনুমোদন স্বীকৃত ছিল— অধিকন্তু নির্দিষ্ট বিষয়ের পন্ডিতগণের শাস্ত্রীয় নির্দেশ শিল্পীকে সাহায্য করেছিল।

সর্বশেষে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যে ভারতবর্ষে মুসলিম শাসন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় একধরনের রক্ষণশীলতার অনুপ্রবেশ ঘটে— বিজাতির সঙ্গে দূরত্ব রক্ষার দ্বারা আত্মরক্ষার প্রয়োজনে বা বিজয়ী শক্তির নির্দেশে— যে কোনভাবেই হোক না কেন মধ্যযুগীয় ভাস্কর্য শিল্পের সূর্য অস্তমিত হতে থাকে— বিপরীতে বিজয়রথে যাত্রা শুরু হয় মুসলিম চিত্রকলা ও স্থাপত্য শিল্পের।

সূত্র নির্দেশ

১. নির্মলকুমাব ঘোষ · ভাবত শিল্প, ফার্মা কে এল. মুখোপাধ্যায় কলিকাতা-১৯৭৩, পৃঃ ১০৮-১০৯

২. কে. ডি. বাজপেয়ী · হিস্ট্রি অ্যান্ড কালচাব অফ মধ্যপ্রদেশ, বি.জে. ইনস্টিটিউট অফ লার্নিং অ্যান্ড বিসার্চ, আহমেদাবাদ, ১৯৮৪, প্রথম অধ্যায়

৩. ডি. সি. গাঙ্গুলী · হিস্ট্রি অফ দি পরমার ডাইনাস্টি, দি ইউনিভার্সিটি অফ ঢাকা, রমনা ঢাকা, ১৯৩৩, পৃঃ ২৬

৪. হারবার্ট রীড · আর্ট অ্যান্ড সোসাইটি, ১৯৫৬, পৃঃ ৩

৫. শ্রী পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী · যুগে যুগে ভাবত শিল্প। শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা। পৃঃ ৮১

৬. বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র · ভেসটিজেস অফ দি কিংস অফ গোয়ালিয়র, জে.এ.এস.বি. ১৮৬২

৭. উর্মিলা আগরওয়াল · খাজুরাহো স্কাল্পচারস অ্যান্ড দেয়াব সিগনিফিক্যান্স, এস. চাঁদ অ্যান্ড কোং, ১৯৬৪ পৃঃ ১২৯

৮. রায় বাহাদুর হীরালাল · দি কলচুরীস অফ ত্রিপুরী। আনালস অফ ভান্ডারকার ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইনস্টিটউট, পুনা। ভলিউম—৯, ১৯২৮ পৃঃ ২৪৮৮

৯. ভি. এস. পাঠক · হিস্ট্রি অফ শৈব কাল্ট ইন নর্দান ইন্ডিয়া (৭০০ এ.ডি—১২০০ এ.ডি) তাবা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, বারানসী, ১৯৬০, পৃঃ ৩৫—৩৭

১০. ইন্ডিয়ান আরকিওলজি — ভলিউম-ষষ্ঠ, পৃঃ ৫১

১১. এপিগ্রাফিকা ইন্ডিকা — ভলিউম-দ্বিতীয়, পৃঃ ১৮০

১২. ইন্ডিয়ান আরকিওলজি — ভলিউম— একাদশ পৃঃ ২২২

১৩. এইচ. আর. জিমার — মিথস্ এ্যান্ড সিমবলস ইন ইন্ডিয়ান আর্ট অ্যান্ড সিভিলাইজেশন, প্যানথিওন বুকস, লন্ডন, চতুর্থ অধ্যায়, পৃঃ ১২৩—১৮৫

১৪. নারায়ণ সান্যাল — এরোটিকা ইন ইন্ডিয়ান টেম্পলস্, কলিকাতা, ১৯৮৪, পৃঃ ৪০

সুলতান হুসেন শাহের ৯৩১ হিজরীর মুদ্রা : কিছু প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সুতপা সিংহ

বিগত ১৯৮৬ সালে পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার অন্তর্গত আলিপুরদুয়ার শহরের ১৩ কিমি. দক্ষিণ-পূর্বে 'চণ্ডীর ঝাড়'[১] নামক গ্রামে ভূ-প্রোথিত একটি বৃহৎ মুদ্রাভাণ্ডারের সন্ধান পাওয়া যায়। এই মুদ্রাভাণ্ডারটি উদ্ধার হওয়ার পর বহুদিন পর্যন্ত আলিপুরদুয়ার থানার হেপাজতে ছিল। ১৯৯২ সালের ডিসেম্বর মাসে মুদ্রাভাণ্ডারটি রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব সংগ্রহশালায় (পশ্চিমবঙ্গ সরকার) স্থানান্তরিত করা হয়।

রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব সংগ্রহশালার আধিকারিক এবং বর্তমান লেখিকা এই মুদ্রাভাণ্ডারটির একটি বর্ণনামূলক তালিকা প্রস্তুত করেন যা রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব অধিকারের বাৎসরিক পত্রিকা "প্রত্ন-সমীক্ষা"-য়[২] প্রকাশিত হয়েছে । বৈচিত্র্যপূর্ণ এই মুদ্রাভাণ্ডারটিতে ৭৬৭ টি রৌপ্য মুদ্রা আছে, এবং এটি বাংলার স্বাধীন সুলতান, দিল্লীর সুর সুলতান, দক্ষিণের বাহমনি সুলতান, ত্রিপুরা নৃপতি, মোঘল সুলতান এবং কোচ নৃপতির মুদ্রা দ্বারা সমৃদ্ধ[৩]। এই মুদ্রাভাণ্ডারটিতে কোনো স্বর্ণমুদ্রা অথবা কোনো তাম্রমুদ্রা পাওয়া যায়নি। সংখ্যায় সুর সুলতান এবং কোচ নৃপতির মুদ্রা অধিক হলেও এগুলির মধ্যে বিশেষ কোনো উল্লেখযোগ্য মুদ্রা নেই। তুলনায়, বাংলার স্বাধীন সুলতানগণের, বিশেষত হুসেন শাহী বংশের মুদ্রার মধ্যে অনেকগুলি নূতন ও গুরুত্বপূর্ণ মুদ্রার সন্ধান পাওয়া যায়। এমনই একটি গুরুত্বপূর্ণ মুদ্রা হল সুলতান আলাউদ্দীন হুসেন শাহের 'খাজানা ৯৩১' হিজরী উৎকীর্ণ একটি মুদ্রা যা এই নিবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

আধুনিক ঐতিহাসিকগণ যথা ডঃ এম. আর. তরফদার[৪], অধ্যাপক আবদুল করিম[৫] এবং অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়[৬] —এঁরা সুলতান হুসেন শাহের রাজত্বকাল ৮৯৯-৯২৫ হিজরী (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দ) এই বিষয়ে সহমত। কিন্তু ৯৩১ হিজরী উৎকীর্ণ এই মুদ্রাটি আবিষ্কারের ফলে সুলতান হুসেন শাহ'র রাজত্বকালের বিস্তৃতি সম্বন্ধে সন্দেহের উদ্রেক হয়। ১৯৭৭ সালে শ্রী জি. এম. ফরিদ[৭] তাঁর সংগ্রহের একটি অনুরূপ মুদ্রা প্রকাশ করেন এবং এই মুদ্রাটির তারিখ নিয়ে সেই সময় যথেষ্ট বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল[৮]। কিন্তু আলোচ্য মুদ্রাভাণ্ডারের "৯৩১ হিজরী"-র মুদ্রাটি যেহেতু একটি ভূ-প্রোথিত মুদ্রা ভাণ্ডার থেকে প্রাপ্ত

কাজেই এর অকৃত্রিমতা বা মৌলিকতা নিয়ে কোনো সংশয় নেই। সুলতানী আমলে এই ধরনের মুদ্রা প্রচলিত ছিল বলে মনে হয়। মুদ্রাটি সুলতান হুসেন শাহের নামাঙ্কিত। এর গৌণদিকে 'খাজানা ৯৩১' উৎকীর্ণ করা আছে এবং এই বিষয়ে কোনো মতভেদ নেই। এই মুদ্রাটির সাক্ষ্যের ভিত্তিতে ফরিদসাহেব হুসেন শাহেব রাজত্বকালের সময়সীমা ৯২৫ থেকে ৯৩১ হিজরী পর্যন্ত বর্ধিত করেন। একই সঙ্গে নুসরৎ শাহের রাজত্বকালের কালক্রম ৯৩১-৯৩৮ হিজরী বলে নিধারণ করেন[৯]। হুসেন শাহের রাজত্বকালের মেয়াদ ৯২৫ হিজরী পর্যন্ত নয়, ৯৩১ হিজরী—এই সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে ফরিদসাহেব কিন্তু উক্ত ৯৩১ হিজরীর মুদ্রাটি ব্যাতীত আর কোনো যুক্তি বা তথ্য প্রমাণ পেশ করেননি[১০]। পক্ষান্তরে তিনি নিম্নলিখিত তথ্যগুলিকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করেছেন:—

প্রথমত, সুলতান হুসেন শাহ ছিলেন বহুল পরিমাণ মুদ্রার প্রবর্তক। তার রাজত্বকালে, ৮৯৯-৯২৫ হিজরী পর্যন্ত প্রায় প্রত্যেক বছরেই তিনি প্রচুর সংখ্যায় মুদ্রা প্রবর্তন করেছিলেন। যদি হুসেন শাহ ৯৩১ হিজরী পর্যন্ত রাজত্ব করে থাকেন তাহলে কেবলমাত্র ঐ বছরেই প্রবর্তিত কয়েকটি মুদ্রা পাওয়া যাচ্ছে কেন? মধ্যবর্তী ৯২৬, ৯২৭, ৯২৮, ৯২৯, এবং ৯৩০ হিজরীতে প্রবর্তিত কোনো মুদ্রা পাওয়া গেছে বলে জানা নেই।

দ্বিতীয়ত, ৯২৬ হিজরী থেকে ৯৩১ হিজরীর অন্তবর্তীকালীন হুসেন শাহের নামোৎকীর্ণ কোনো প্রকাশিত শিলালেখ এখনও পর্যন্ত আমাদের গোচরে আসে নি অথচ ৮৯৯ হিজরী থেকে ৯২৫ হিজরীর মধ্যে হুসেন শাহের নামোৎকীর্ণ ৬৭টি[১১] শিলালিপি বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে পাওয়া গেছে।

আলোচ্য মুদ্রাটি সুলতানী আমলের বিতর্কিত কতিপয় মুদ্রার মধ্যে নবতম সংযোজন, যে মুদ্রাগুলি ঐতিহাসিক সমস্যার সমাধান করার পরিবর্তে আরও জটিলতর সমস্যার সৃষ্টি করে। এই রূপ মুদ্রার সাক্ষ্যের ভিত্তিতে কোনো ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের পরিবর্তন কতটা নির্ভরযোগ্য, সে বিষয়ে যথেষ্ট চিন্তাভাবনা করা প্রয়োজন। এই কারণে বাংলাদেশের সুলতানী ইতিহাসের সঠিক কালক্রম নির্ণয়ের জন্য সমসাময়িককালে লিখিত প্রামাণ্য বিবরণী খুঁজে পাওয়া অত্যন্ত জরুরী। নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়[১২] বহুকাল পূর্বেই এইরূপ সমসাময়িক ঐতিহাসিক উপাদান খুঁজে বার করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন।

'চণ্ডীর ঝাড়' মুদ্রাভাণ্ডারটির তালিকা ও নিবন্ধ প্রস্তুত করা কালীন ডঃ অনিরুদ্ধ রায় আমাদের একটি অপ্রকাশিত সমসাময়িক পর্তুগীজ বিবরণীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এই বিবরণীটি একজন অনামী অনুলেখকের যিনি বাংলার সুলতান নাসিরুদ্দীন নুসরৎ শাহের রাজসভায় এ্যান্টনিও ডি ব্রিটোর পর্তুগীজ প্রতিনিধি দলের সঙ্গে ১৫২১ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ ৯২৭—৯২৮ হিজরীতে

গৌড়ে এসেছিলেন[১৩]। এই অনুলেখক গৌড় শহর, .গৌড় দুর্গ এবং সুলতানের রাজসভার আনুপূর্বিক বিবরণ লিখে গেছেন। বিবরণী-টির ৭৯ নং অনুচ্ছেদে[১৪] হুসেন শাহকে তৎকালীন ক্ষমতাসীন সুলতানের পিতা হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে। ৫৮ নং অনুচ্ছেদে[১৫] সুলতানের হারেমের বর্ণনা দিতে গিয়ে, অনুলেখক ক্ষমতাসীন সুলতানের পিতার স্ত্রী ও উপপত্নীদের কথা উল্লেখ করেন এবং এও বলেন যে তাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব ক্ষমতাসীন সুলতানের উপর ন্যস্ত ছিল। উক্ত অনুচ্ছেদ দুটি বিশ্লেষণ করলে দুটি তথ্য আমাদের কাছে খুব স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। যথা:—

(১) ৯২৭-৯২৮ হিজরীতে অর্থাৎ ১৫২১ খ্রীষ্টাব্দে, বাংলার মসনদে সুলতান ছিলেন হুসেন শাহের পুত্র; এবং

(২) ঐ সময়ে হুসেন শাহ জীবিত ছিলেন না। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, ৯৩১ হিজরীতে সুলতান হুসেন শাহর মুদ্রা তাহলে কিভাবে প্রবর্তিত হল?

উক্ত প্রশ্নের উত্তর সম্ভবত নিহিত রয়েছে সুলতানী আমলের অনুন্নত (অবৈজ্ঞানিক) মুদ্রা প্রস্তুত প্রযুক্তিতে। 'চণ্ডীর ঝাড়' মুদ্রাভাণ্ডারেই এইরূপ আরও কয়েকটি অসংগতি পূর্ণ সুলতানী মুদ্রার নিদর্শন পাওয়া গেছে। '৯৩১ হিজরী' উৎকীর্ণ মুদ্রাটি সুলতান হুসেন শাহ কর্তৃক প্রবর্তিত মুদ্রা নয়—এই বক্তব্যের স্বপক্ষে দৃঢ় সমর্থন মেলে এই মুদ্রাটির সঙ্গে অপর একটি হুসেন শাহের মুদ্রার তুলনা করলে[১৬]। শেষোক্ত মুদ্রাটির সঙ্গে প্রথমোক্ত মুদ্রাটির মুখ্য ও গৌণ, উভয়দিকেরই সম্পূর্ণ সাদৃশ্য বর্তমান এমনকি ফরিদসাহেব তাঁর '৯৩১ হিজরীর' মুদ্রাটির লেখায় যে কয়েকটি অসংগতি নির্দেশ করেছেন[১৭] (লেখার মধ্যে 'আদিল' শব্দটির স্থলে 'আদি' এবং 'আল-মুজাফ্ফর এর স্থলে ল-মুজাফ্ফর), শেষোক্ত মুদ্রাটির লেখার মধ্যেও একই অসংগতি বর্তমান। পার্থক্য কেবল মুদ্রাদুটির গৌণদিকে উৎকীর্ণ তারিখের মধ্যে। শেষোক্ত মুদ্রাটির তারিখ '৯২১' হিজরী।

সুতরাং, উক্ত 'খাজানা ৯২১' মুদ্রাটির সাক্ষ্যই আমাদের এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সাহায্য করছে যে, হুসেন শাহ'র ৯২১ হিজরীতে প্রবর্তিত মুদ্রার পাটা(die) প্রস্তুত কালে সম্ভবত কোনো অদক্ষ পাটা কারিগর '৯২১' এর মধ্যবর্তী '২' সংখ্যাটির বদলে ভুলবশত অথবা অন্য কোনো কারণে '৩' সংখ্যাটির নঞর্থক রূপ উৎকীর্ণ করেন। আলোচ্য ৯৩১ হিজরী উৎকীর্ণ মুদ্রাটি বোধহয় তারই ফলশ্রুতি।

'চণ্ডীর ঝাড়' মুদ্রাভাণ্ডারেই প্রাপ্ত অপর কয়েকটি ত্রুটিপূর্ণ মুদ্রার উদাহরণ দিয়ে বর্তমান নিবন্ধ শেষ করব। সুলতান নাসিরুদ্দীন নুসরৎ শাহের 'দার-উল-জরব' (টাঁকশাল) থেকে প্রবর্তিত ৯২৫ হিজরীর কয়েকটি মুদ্রার মুখ্যদিকের লেখার নীচে 'ফতেহাবাদ ৮৯' শব্দ দুটি ভুলক্রমে উৎকীর্ণ করা হয়েছে, কারণ 'ফতেহাবাদ ৮৯'. হুসেন শাহ'র মুদ্রার উৎকর্ণ করা হতো[১৮]। অনুন্নত মুদ্রা প্রস্তুত প্রযুক্তির

অপর একটি নজিরবিহীন উদাহরণ হল সুলতান নাসিরুদ্দীন নুসরৎ শাহ. এবং সুলতান গিয়াসউদ্দীন মাহমুদ শাহের দুটি মুদ্রা[১৯]। দুটি মুদ্রারই মুখ্য ও গৌণ, উভয়দিকেই লেখার সদর্থক রূপের (positive impression) পরিবর্তে নঞর্থক রূপ (negetive impression) ফুটে উঠেছে। অতএব মনে করা যেতে পারে মুদ্রাদুটির মুখ্য ও গৌণ দিকের পাটাগুলিতে সম্ভবত লেখর বাস্তব-রূপ উৎকীর্ণ কবা হয়েছিল, ফলশ্রুতি স্বরূপ মুদ্রাদুটির উভয় পৃষ্ঠে নঞর্থক রূপ প্রতীয়মান। নুসরৎ শাহের অপর একটি মুদ্রার[২০] গৌণদিকে তারিখ '৯৩৫' উৎকীর্ণ করার পরিবতে '৫৩৯' উৎকীর্ণ করা হয়েছে।

উপরোক্ত উদাহরণসমূহ এবং অন্যত্র প্রকাশিত সুলতানী আমলের ত্রুটিপূর্ণ মুদ্রার নজির দেখে মনে হয় যে বাংলার সুলতানী আমলে, প্রতিষ্ঠিত টাঁকশাল ছাড়াও বিভিন্ন স্থানে এবং তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে মুদ্রা প্রবর্তন করার রেওয়াজ ছিল। কোনো বাজ্য জয়ের অব্যবহিত পরে সেই অঞ্চলে বিজয়ী সুলতানের নামে মুদ্রা প্রবর্তন কবাব প্রয়োজনে অনেক সময় যুদ্ধ শিবির থেকেই অদক্ষ কারিগব দ্বারা মুদ্রা প্রবর্তন করা হতো[২১] বলেও মনে হয়। সুতরাং আমাদের মতে, হুসেন শাহের রাজত্বকালের সময়সীমা ৮৯৯-৯৩১ হিজরী, এই বক্তব্যের স্বপক্ষে আরও সঠিক তথ্য ও প্রমাণ না পেলে, সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া উচিত হবে না। এবং এই প্রসঙ্গে আরও বলা যেতে পারে যে, শ্রী ফরিদ সুলতানী আমলের Concurrent Issue[২২] সংক্রান্ত যে সংশোধিত তালিকাটি প্রস্তুত করেছেন, সেটি বোধহয় পুনরায় বিবেচনা করে দেখা উচিত।

সূত্র নির্দেশ

১. চণ্ডীর ঝাড অথবা চণ্ডী ঝাড় (জে. এল. নং ৬৩-১০৪) গ্রামটি পশ্চিমবঙ্গেব জলপাইগুড়ি জেলার আলিপুবদুয়াব থানাব অন্তর্গত আলিপুবদুয়াব সদব থেকে প্রায় ১৩ কি:মি: উওব-পশ্চিমে অবস্থিত। ১৯৭১ সালের Census Report-এ গ্রামটির নাম Chandi Jhar লেখা আছে। দ্রষ্টব্য, **Census of India, 1971. Administration Atlas, Series 22.** West Bengal. Part IX A, Delhi, 1972, p. 15 of Jalpaiguri District.

২. প্রতীপ কুমার মিত্র ও সুতপা সিন্‌হা, Chandir Jhar Hoard of Silver Coins, **Pratna Samiksha,** Vol. 23 (1993 94), Calcutta, 1995, pp. 278 419.

৩. ঐ, পৃ. ২৭৮-২৭৯

৪. এম. আর. তরফদাব, **Husain Shahi Bangal, A Socio-Political Study,** Dacca, 1965, p. 40

৫. আবদুল করিম, **বাংলার ইতিহাস-সুলতানী আমল,** ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ২৮৮ এবং পৃ. ৩১৭

৬. সুখময় মুখোপাধ্যায়, **বাংলার ইতিহাসে দুশো বছর : স্বাধীন সুলতানদের আমল,** কলকাতা, ১৯৮৮, পৃ. ২৯৪, ৪২৮-৪২৯,

৭. জি. এস. ফরিদ, "The Duration of the Reign of Alauddin Husain Shah of Bengal, in the Light of a New Coin Dated 931 A.H.", **Journal of Numismatic Society of India (সংক্ষেপে JNSI), Vol. XXXIX, pt's I-II, 1977, pp. 145-148, pl. VIII**

৮. এ. এম. কে মাসুমী, "A Fresh Note on the Recently Discovered Silver Coins of Sultan Husain Shah of Bengal", **JNSI**, Vol. XLIII, part II, 1981, pp. 82 85

৯. জি. এস. ফরিদ, "A Coin of Alauddin Husain Shah of Bengal Dated 931 A.H A Rejoinder" **JNSI**, Vol. XLV, pt's I&II (Combined), 1983, pp. 196 200, pL. IX.

১০. শ্রী ফরিদ নিজের সংগ্রহের '৯৩১ হিজরী'-র মুদ্রাটি ছাড়া শ্রী বাবুলাল জৈনের সংগ্রহে অনুরূপ একটি মুদ্রার কথা উল্লেখ করেছেন।

১১. আবদুল করিম, **Cor pus of the Arabic and Persian Inscriptions of Bengal,** Dacca, 1992, pp. 234 326.

১২. নলিনীকান্ত ভট্টশালী, **Coins and chranology of the Sultans of Bengal, New Delhi, 1976 (Reprint), p. 5-6**

১৩. **Lembranca d'algumas cousas que sa passaram quandro Antonio de Brito c Diego Pereira foram a Bengala, assi em Bengala Como em Tanacarim e em pegu onde Tamben Fomos.** Translated and Edited by Genevieve Bouchon and Luis Filipe Thomaz under the title Voyage Dans Les Deltas Du Gange et de L'irraouaddy 1521 (in French). Paris, 1988.

তথ্যসূত্রটি জানাবার জন্য লেখিকা ডঃ অনিরুদ্ধ রায়, প্রফেসর, ঐস্লামিক ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—এঁর কাছে কৃতজ্ঞ রইলেন। ডঃ রায় ফরাসী ভাষায় অনূদিত সংস্করণ থেকে অনেকখানি অংশ ইংরাজীতে অনুবাদ করে লেখিকাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন।

১৪. Bauchon and Thomaz, **উপরিউক্ত গ্রন্থ,** (ইংরাজী সংস্করণ), পৃ. ৩৩২—৩৩.

১৫. ঐ. পৃ. ৩২৬.

১৬. **প্রত্নসমীক্ষা,** পৃ. ৩১৭

১৭. **জি. এস. ফরিদ JNSI,** Vol. XXXIX, pt. I II, পূর্বে উল্লিখিত।

১৮. **প্রত্নসমীক্ষা,** পৃ. ২৮৩

১৯. ঐ, পৃ. ২৮৩—২৮৪

২০. ঐ, পৃ. ২৮৪, ক্রমিক নং ৯১.

২১. রমা নিয়োগী, "Two Coins in Museums and Two Husayni Tankas - A Comparative Study," **Indian Museum Bulletin,** Calcutta, 1984.

২২. **জি. এস. ফরিদ,** "A Note on the Concurrent Coins of the Princes and Sultan of Bengal," Journal of the Asiatic society of Bangladesh, Vol XXXI, No.2. Dacca, December, 1986, p. 35.

বিষ্ণুপুরের দশাবতার তাস : কিছু প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মৌসুমী চক্রবর্তী

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে[১] গোলাকার তাস তৈরী হয়। বিষ্ণুপুরের গোলাকার তাস দু-রকমের[২]—দশাবতার তাস ও নকসা তাস। দশাবতার তাসের প্রাচীনত্ব নিয়ে যথেষ্ট মতপার্থক্য রয়েছে। প্রাচীন কোন সংস্কৃত গ্রন্থে—তাস জাতীয় কোন খেলার উল্লেখ পাওয়া যায় না, তাই প্রাচীন ভারতে এই খেলার প্রচলন ছিল না এমন ধারণা হওয়াই স্বাভাবিক। বিষ্ণুপুরের দশাবতার তাসের প্রাচীনত্ব নিয়ে প্রথমে আলোচনা করেন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী[৩]। শাস্ত্রী মহাশয়ের দৃঢ় অভিমত ছিল যে বিষ্ণুপুরে এই তাস খেলার সূচনা হয় আনুমানিক খ্রীষ্টীয় সপ্তম বা অষ্টম শতকে[৪] যখন মল্লরাজকুলের আদি পুরুষেরা বিষ্ণুপুরের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং সম্ভবত—তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতাতেই এই খেলার প্রচলন হয়। দুটি যুক্তি শাস্ত্রী মহাশয়ের অনুমানের প্রধান কারণ। প্রথমত, বিষ্ণুপুরের দশাবতার তাসের অবতার বিন্যাসে বুদ্ধের স্থান পঞ্চম এবং তাঁর দেহাবয়ব খুব স্পষ্ট নয় (গোলাকার দেহকাণ্ডের উপর মাথা ও দুটি হাত)। শাস্ত্রী মহাশয়ের অনুমান এই প্রায় মানব আকৃতির জন্য বুদ্ধের স্থান অর্ধ-নর অর্ধ-পশু নৃসিংহ ও পূর্ণ অথচ বিকৃত মানব বামনের মধ্যে (অর্থাৎ পঞ্চম স্থানে) নির্দিষ্ট হতে পারে কারণ নিম্নতমজীব মৎস্য থেকে কলির অবতার পূর্ণমানব কল্কি পর্যন্ত প্রাণীজগতের এক সুনির্দিষ্ট ক্রম লক্ষ করা যায়। কিন্তু পুরাণ সম্মতভাবে বিষ্ণুর দশাবতার তালিকায় বুদ্ধের স্থান নবম এবং এই পুরাণ সিদ্ধ অনুক্রমটি স্থির হয় একাদশ শতকে, ক্ষেমেন্দ্র অথবা দ্বাদশ শতকে জয়দেবের সময়ে। তাই শাস্ত্রী মহাশয়ের অনুমান পুরাণসিদ্ধভাবে বুদ্ধের নবম স্থানটি নির্দিষ্ট হবার আগেই অর্থাৎ একাদশ-দ্বাদশ শতকের অনেক আগেই দশাবতার তাসের প্রচলন হয়েছিল কারণ তাসে বুদ্ধের স্থান পঞ্চম। দ্বিতীয়ত, দশাবতার তাসে বুদ্ধ বা জগন্নাথের প্রতীক চিহ্ন পদ্মফুল অর্থাৎ এই তাসের প্রচলন তখনই হয়েছিল যখন বুদ্ধ 'পদ্মপাণি' নামে অভিহিত হতেন এবং পদ্ম তাঁর প্রতীক ছিল। বাংলায় পালবংশের রাজত্বকাল ৮০০, থেকে ১২০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বা তার কিছু আগে মহাযান বৌদ্ধধর্মের আধিপত্যের যুগে বুদ্ধ পদ্মপাণি রূপে সমধিক পরিচিত ছিলেন।

এর থেকে শাস্ত্রী মহাশয় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে মল্লরাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বিষ্ণুপুরে দশাবতার তাসের প্রচলন হয় খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতক নাগাদ।

শাস্ত্রী মহাশয়ের সিদ্ধান্ত যুক্তিনির্ভর হলেও ঐতিহাসিক কারণে তা মেনে নেওয়া যায় না। কারণ খ্রীঃ সপ্তম-অষ্টম শতকে মল্লরাজকুলের আদিপুরুষেরা সত্যিই বিষ্ণুপুরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন কিনা সে বিষযে সন্দেহের অবকাশ আছে। বিভিন্ন গবেষক, ঐতিহাসিকেরা বিষ্ণুপুরের রাজবংশের যে তালিকা[৫] দিয়েছেন তাতে আদিমল্ল থেকে বীরমল্ল[৬] পর্যন্ত যাদের নাম পাওয়া যায় তাঁরা যে ঐতিহাসিক চরিত্র ছিলেন এমন কোনও সুনির্দিষ্ট প্রমাণ আমাদের হাতে নেই। অতএব ইতিহাসের নিরিখে বিচার করলে দশাবতার তাসের উৎপত্তি খ্রীঃ সপ্তম-অষ্টম শতকে মল্লরাজকুলের পৃষ্ঠপোষকতায় হয়েছিল এ কথা নিশ্চিতভাবে মেনে নেওয়া যায না। সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন উঠতে পারে কবে বিষ্ণুপুরে এই তাসের উৎপত্তি হল। বীর হাম্বীর মল্লরাজবংশের প্রথম উল্লেখযোগ্য নরপতি —তাঁর রাজত্বকাল আনুমানিক ১৫৯১—১৬১৬ খ্রীঃ[৭]। বীর হাম্বীর ১৫৯২ খ্রীঃ মুঘল সম্রাট আকবরের কাছ থেকে কিল্লজাত মহল্লার জমিদারী লাভ করেন[৮] এবং নিশ্চিতভাবে বলা না গেলেও কিছু কিছু সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে (পরে আলোচিত) অনুমান করা যায় যে এর পরেই আকবর প্রচলিত মুঘল তাসই অল্পবিস্তর পরিবর্তিত হযে বিষ্ণুপুরের রাজদরবারে প্রবেশ করে। তবে দশাবতার তাসের প্রাচীনত্ব নিয়ে বিতর্ক থাকলেও এই খেলা যে বিষ্ণুর দশাবতার মূর্তিরূপ কল্পনা থেকেই সৃষ্টি হয়েছিল তা 'দশাবতার' নামটি থেকে ধারণা করা যেতে পারে।

অতি প্রাচীন এই দশাবতার তাস তৈরীর প্রণালী নিতান্তই সরল ও অনাড়ম্বর। সাধারণত এক একটি তাস সাড়ে চার ইঞ্চি ব্যাসের হয়, তবে কোন কোন শিল্পী চার ইঞ্চি ব্যাসের তাস তৈরী করে থাকেন। এক সেট তাস তৈরী করতে লাগে তেঁতুল বিচির কাঁই, পুরনো পাতলা কাপড়, টিনের তৈরী একটি গোলাকার চাক্তি (ধাঁচা), শিরিষ আঠা, রঙ-তুলি ইত্যাদি। তেঁতুল বিচিকে বালিতে ভেজে চব্বিশ ঘণ্টা জলে ভিজিয়ে রাখা হয়। এরপর হাত দিয়ে ঘষে ঘষে বিচির লাল খোসাগুলি তুলে ফেলা হয়। খোসা ছাড়ান বিচির সাদা অংশটি ঠাণ্ডা জলে ধুয়ে শিলে বেটে মিহি-গুঁড়ো করা হয়। এই গুঁড়ো জল দিয়ে ফুটিয়ে আঠার মত কাই তৈরী করা হয়। তিনভাগ কাইয়ের সঙ্গে একভাগ খড়িমাটি মিশিয়ে আঠা তৈরী করা হয়। একটা সমতল জায়গায় বড় এক ফালি কাপড় পেতে তার দুপিঠে আঠার প্রলেপ লাগিয়ে তা শুকিয়ে নিতে হয়। এভাবে মোট দু খেপে তিন ফালি কাপড় একের উপর এক আঠা দিয়ে লাগাতে হবে। এই আঠা লাগানো কাপড় পাঁচ ছয় দিন রোদে শুকিয়ে 'পট' তৈরী করে একটি সমতল পাথর দিয়ে ঘষে মসৃণ করে নেওয়া হয়। এভাবে

তাস তৈরীর জমিন মসৃণ হওয়ার পর টিনের গোল চাকতি অর্থাৎ 'ধাঁচা' বসিয়ে কেটে গোলাকার তাস করে নেওয়া হয়। এভাবে একসঙ্গে অনেকগুলি তাস বানানো যায়। এবার 'কাঠি' নামে একটি কাঠের তৈরী বিশেষ যন্ত্র দিয়ে কাটা তাসের ধারগুলি মসৃণ করা হয়। তাসগুলির উভয়তল আরো মসৃণ করার জন্য শিলের উপর রেখে নোড়া দিয়ে বারবার ঘষা হয়। ধারগুলি যাতে খুলে বা আলগা হয়ে না যায় তাই প্রতিটি তাসের ধারে শিরিষ আঠা লাগানো হয়। গোলাকার এ তাসগুলিতে দশাবতারের বিভিন্ন রূপ এঁকে তার উভয়পিঠে সাবুর আঠা খুব পাতলা করে লাগিয়ে তা রোদে শুকিয়ে নেওয়া হয়। এক এক শ্রেণীর তাসের জমি এক এক রঙের। মূল ছবি আঁকার আগে রঙ দিয়ে প্রথমে ছবির আদল 'স্কেচ' করে নেওয়া হয়। একে বলে 'হড়ক' বা 'দাগা'। পরে এর উপরে চোখ, মুখ ও অলঙ্করণ করা হয়। অবতারের মূর্তি বা প্রতীক আঁকতে আগে সনাতন পদ্ধতিতে তৈরী উদ্ভিজ্জ রং ব্যবহার করা হত। বিষ্ণুপুরের আগে 'পাটরাঙা' নামে এক সম্প্রদায়[১০] বসবাস করত যাদের বংশানুক্রমিক পেশা ছিল বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিজ্জ রং প্রস্তুত করা। বর্তমানে চাহিদা কম বলে প্রয়োজনানুসারে বাজাব চলতি রং কিনে ব্যবহার করা হয়। ছবি আঁকার পর তাসগুলি রোদে শুকিয়ে নিয়ে ছবির বিপরীত পিঠে স্পিরিটে গোলা পাতলা ও নরম গালা এবং মেটে সিঁদুরের প্রলেপ দেওয়া হয়। এরপর তাস তৈরীর শেষ পর্যায়। ছবি আঁকা শুকনো তাসগুলিকে উন্মুক্ত আকাশের নীচে রেখে রাতের হিম ও ভোরের শিশির লাগাতে হয়। তারপর সকালের অল্প রোদ লাগার পর তাসগুলি গুছিয়ে তুলে নেওয়া হয়। এভাবে তাসগুলিকে খটখটে শক্ত, মজবুত ও টেঁকসই করার পদ্ধতিকে 'বতর' বলে। যে সকল তাসে বতর করা হয় না সেগুলি অনেক সময় বেঁকে বা ফেটে যায়, কোন কোনটি আবার ভেঙেও যায়। তাস তৈরীর পদ্ধতিতে তাই যেমন কাঁইনিকানো বা জমিন তৈরী করার উপর তাসের মান নির্ভর করে, তেমনি তাস তৈরীর শেষ পর্যায়ে বতর করার উপর তার স্থায়িত্ব নির্ভর করে। গঠন প্রণালী অতি সাদামাটা হলেও তাসে বহুবর্ণের সমাবেশ দর্শক মনকে আকৃষ্ট করে। তাসের উপর অঙ্কিত ছবিগুলিও অত্যন্ত সহজ, সরল ও অনায়াসে চিত্রিত লোকশিল্পের এক অপূর্ব সৃষ্টি। ছবিগুলিতে দেশীয় শিল্পের ভাব খুবই স্পষ্ট। তুলনামূলক বিচারে রাজস্থানের হাতির দাঁত অথবা ল্যাকার করা তাসের মধ্যে যে অভিজাত্যের গৌরব আছে বিষ্ণুপুরের দশাবতার তাসে তা অনুপস্থিত।

বিষ্ণুপুরের দশাবতার তাসে দশটি রঙের প্রতিটিতে বারোটি করে মোট তাসের সংখ্যা একশ কুড়ি। প্রতিটি রঙের বারোটি তাসের মধ্যে 'অনার্স' কার্ড দুটি। সর্বোচ্চটিতে থাকে এক বহুবর্ণ অবতারের ছবি এবং তার পরেরটিতে থাকে উজির বা মন্ত্রীর ছবি। উভয়ের চেহারা প্রায় একই রকম হলেও রাজা বোঝাতে

ছবিটি মন্দিরের অভ্যন্তরে আঁকা হয় এবং দুপাশে থাকে দুই সহচর। আর উজির বা মন্ত্রী বোঝাতে শুধুই অবতারের ছবিটি থাকে, কোন মন্দির থাকে না। অন্য তাসগুলি অবতারের প্রতীক ও প্রতীকের সংখ্যা দেখে চিনতে হয়। পরবর্তী তাসগুলি দশ, নয়, আট, সাত, ছক্কা, পঞ্জা, চৌকা, তিরি, দুরি, টেক্কা এইভাবে নিম্নক্রম অনুসারে করা হয়ে থাকে। এই অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যের তাসগুলিতে অবতারের নিজস্ব প্রতীক অঙ্কিত হয়। আবার অবতার অনুসারে তাসের প্রতীক এবং বর্ণভেদও হয়ে থাকে। যেমন—

অবতারের নাম	প্রতীক	পশ্চাদপটের রঙ
মৎস্য	মাছ	কালো
কূর্ম	কচ্ছপ	খযেরী
বরাহ	শঙ্খ	সবুজ
নৃসিংহ	চক্র	ধূসর
বামন	কমণ্ডলু	ফিরোজা বা নীল
পরশুরাম	কুঠার	সাদা
রাম	তীর	লাল
বলরাম	মুষল	হাল্কা সবুজ
জগন্নাথ	পদ্ম	হলুদ
কল্কি	অশ্ব বা তলোয়ার	মেটে সিঁদুর

বিষ্ণুপুরের প্রচলিত দশাবতার তাসের সাধারণত মৎস্য, কূর্ম, বরাহ ও নৃসিংহ অবতারদের যথাক্রমে মৎস্য, কূর্ম, শঙ্খ ও চক্রধারী রূপে দেখা যায়। নৃসিংহ অবতারের পর কোন কোন বিষ্ণুপুরী তাসের সেটে কমণ্ডলু প্রতীক সম্বলিত বামন বা ত্রিবিক্রমের স্থান, আবার কোথাও বা নৃসিংহের পরেই জগন্নাথ অবতারও তাঁর প্রতীক পদ্ম লক্ষ্য করা যায়। তবে, সাধারণত বিষ্ণুপুরের সকল তাসেই পরশুরাম, রাম ও বলরামের সংস্থাপন হয়ে থাকে। জগন্নাথ অবতারের স্থান বিষ্ণুপুরের অনেক তাসে বলরামের পরে ও কল্কির ঠিক আগে, অথবা বামন বা ত্রিবিক্রমের আগে হলেও[১১] নরসিংহ অবতারের পূর্ববর্তী স্থানে নয়। তবে কল্কি অবতারের অবস্থান শুধু বিষ্ণুপুরে কেন, ভারতের অন্যান্য সব অঞ্চলের তাসেই সর্বশেষে।

এবার দেখা যাক, বিষ্ণুপুরের সঙ্গে অন্যান্য প্রদেশের দশাবতার তাসের প্রতীকের সামান্য তারতম্য। বিষ্ণুপুর উড়িষ্যা ও জয়পুরে তাসে বরাহ অবতারের প্রতীক স্বয়ং বরাহই। নরসিংহ অবতারের ক্ষেত্রেও প্রতীকরূপে চক্রের পরিবর্তে সিংহকে দেখা যায় শেষোক্ত দুই অঞ্চলসহ জয়পুরের কোন কোন তাসের সেটে। কিন্তু, ভারতের সর্বত্রই দশাবতার তাসের শিল্পীরা মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, বামন

বা ত্রিবিক্রম ও পরশুরাম অবতারের ক্ষেত্রে যথাক্রমে মৎস্য, কূর্ম, শঙ্খ, কমণ্ডলু. এবং পরশুকে দেখিয়েছেন। বিষ্ণুপুর, উড়িষ্যা এমনকি জয়পুরেও রামঅবতারের প্রতীক তীর, তবে জয়পুরের কিছু তাসে তীরের পরিবর্তে বানর দেখা যায়। অথচ, সাও-তবাড়ী ও কুড্ডাপার তাসে বানর অথবা তীরের পরিবর্তে ধনুকের প্রতীক থাকে। নবম অবতারের স্থানে জয়পুর ও দাক্ষিণাত্যের তাসে বুদ্ধকে দেখা যায়। তবে কুড্ডাপার বুদ্ধের পরিবর্তে ঐ স্থান কৃষ্ণ অধিকার করে থাকেন। কিন্তু উড়িষ্যা বা বিষ্ণুপুরের বেশীরভাগ তাসে বুদ্ধের অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। তার পরিবর্তে জগন্নাথের আবির্ভাব ঘটেছে। তবে এপ্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, বাঙলায় বা উড়িষ্যায় নবম স্থানে রয়েছেন বলরাম এবং নৃসিংহের ঠিক পরেই অর্থাৎ পঞ্চম স্থানে রয়েছেন জগন্নাথ। তবে বিষ্ণুপুরের কোন দশাবতার তাসেই বুদ্ধের প্রাধান্য স্বীকার করা হয় না বললে ভুল হবে। কারণ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী দশাবতার তাসের পঞ্চমস্থানে যে বুদ্ধ ছিলেন তা দেখিয়েছেন[১২]। দশম স্থানে কল্কি অবতার বাঙলা ও উড়িষ্যায সাধারণত খড়্গ বা তলোয়ারধারী আবার জয়পুর ও দাক্ষিণাত্যে তিনি হয় অশ্বারোহী নয় খড়্গবাহী, কিন্তু কুড্ডাপায় তিনি কেবল অশ্বারোহী। সুতরাং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশেব দশাবতার তাস কমবেশী গুরুত্বপূর্ণ। মীন, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ ও বামন এদের মনুষ্যেতর বা তার কাছাকাছি আকৃতির জন্য হীনশ্রেণী বা 'অন্ত্যজ' আর মনুষ্য বা দেবতার আকৃতির জন্য রাম, বলরাম, পরশুরাম, জগন্নাথ বা বুদ্ধ ও কল্কির উচ্চ বা 'অভিজাত' শ্রেণীর[১৩]। অভিজাত অবতারদের ক্ষেত্রে অনার্স কার্ডের পরে টেক্কা সর্বোচ্চ ও দশ সর্বনিম্ন। অন্ত্যজের ক্ষেত্রে ঠিক এর বিপরীত অর্থাৎ টেক্কা সর্বনিম্ন এবং দশ সর্বোচ্চ।

বিষ্ণুপুরের দশাবতার তাসের সাথে মুঘল তাসের সাদৃশ্য বিশেষভাবে লক্ষণীয় এবং তা পৃথকভাবে আলোচনার দাবী রাখে। ভারতে তাস খেলার প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় মুঘল সম্রাট বাবরের আত্মজীবনীতে[১৪]। এখানে তাসের সমার্থক শব্দ হিসেবে 'গঞ্জিফা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এরপর সম্রাট আকবরের সময় আবুল ফজল তাঁর 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে জানাচ্ছেন যে, ১২টি স্যুটের মোট ১৪৪টি তাসকে ৮টি স্যুটের ৯৬টি তাসে পরিবর্তিত করে আকবর তাঁর আমলে তাস খেলাকে এক সরলতর রূপদান করেছিলেন[১৫]। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, সম্ভবত আকবরের আমলে বিষ্ণুপুরে দশাবতার তাসের প্রচলন হয়েছিল। সে সময়ে মল্লরাজ বীর হাম্বীর বিষ্ণুপুরের সিংহাসনে আসীন ছিলেন। এর স্বপক্ষে আরোও যুক্তি হল দশাবতার তাসের অবতারদের মূর্তি ও পোষাক-পরিচ্ছদ লক্ষ্য করলে তাতে হিন্দুরীতির বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, কিন্তু অবতারদের সহচুরদের বেশভূষা মুঘল রীতির নিদর্শন। বিশেষভাবে উল্লেখনীয় হল দশাবতার তাসের কল্কি অবতারের চিত্র। এই চিত্রের বেশভূষার সাথে

মুঘল রাজপুরুষের বেশভূষার সাদৃশ্য অত্যন্ত প্রকট। মনে হয় কল্কি অবতারের তাস মুঘল তাসের অশ্বারোহী স্যুটের রাজা তাসটির অনুকরণে করা হয়েছে[১৬]। এছাড়াও মুঘল তাসের মতই দশাবতার তাসের প্রথম পাঁচটি অর্থাৎ মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ এবং বামন স্যুটের তাসগুলি শক্তিশালী এবং ষষ্ঠ থেকে দশম অর্থাৎ রাম, পরশুরাম, বলরাম, বুদ্ধ (বা জগন্নাথ) ও কল্কি স্যুটের তাসগুলি কমজোরি। আরোও একটি অনুধাবণীয় বিষয় হল বীর হাম্বীর মুঘল সম্রাট আকবরের শাসন ব্যবস্থার রীতি অনুসারে বাজ্য পরিচালনরা ক্ষেত্রে ফৌজদার, সরকার, বিশ্বাস, মুন্সী, শিকদার ইত্যাদি পদবীর রাজকর্মচারী নিয়োগ করেছিলেন। বিষ্ণুপুরে শাঁখারী বাজারে ফৌজদাব বংশই পুরুষানুক্রমে দশাবতার তাস তৈরী করে আসছেন। তাস শিল্পে দক্ষতার জন্য শিল্পীরা 'ফৌজদার' উপাধিতে ভূষিত হতেন[১৭]। এই সব সাক্ষ্যপ্রমাণ দশাবতার তাস আকবরের সমসাময়িক কালে অর্থাৎ মল্লরাজ বীর হাম্বীরের রাজত্বকালে বিষ্ণুপুরে প্রচলিত হয়েছিল— এই ধারণায় উপনীত হতে সাহায্য করে।

এবারে দশাবতার তাস খেলার নিযমকানুন সম্পর্কে কয়েকটি কথা। দশাবতার তাস খেলার কোন নির্দিষ্ট নিযম নেই। খেলোযাড়রা স্বতন্ত্রভাবে অথবা পরস্পর সঙ্গী বা পার্টনার হিসাবে খেলে থাকে। সাধারণত পাঁচজন খেলোয়াড় নিয়ে এই খেলা চলে। প্রত্যেকের হাতে থাকে ২৪টি করে তাস। খেলা ডানদিক থেকে বাঁদিকে আবার কখনো বাঁদিক থেকে ডানদিকে চলতে পারে। খেলা শুরু হবার আগেই খেলোয়াড়রা নিজেদের মধ্যে চুক্তি করে নেন কত 'পার' বা 'চিল্লিক' পর্যন্ত খেলা হবে। এক একটি পার হতে ১০ থেকে ১৫ মিনিট সময় লাগে। দিনের বেলা খেলা হলে রাম অবতারের তাস দিয়ে আর বিকেলে বা সন্ধ্যায় খেলা হলে নৃসিংহ অবতারের এবং রাত্রে হলে কৃষ্ণঅবতার দিয়ে খেলা শুরু করতে হয়। কিন্তু বৃষ্টির দিনে খেলা হলে কূর্ম অবতার দিয়ে খেলা শুরু হয়। একাধিক নিয়মে খেলাটি খেলা যায়। সাধারণত হাতের রাজা দিয়ে এই খেলা শুরু করতে হয়। অবতারদের মধ্যে রামের গুরুত্ব সর্বাধিক। যিনি রাম অবতারের তাস দিয়ে খেলা শুরু করবেন তিনি সেই পিঠটি এবং ঐ অবতারের সম্মানে তারপরের পিঠটিও পাবেন। খেলায় মোট ২৪টি পিঠ থাকে এবং মূল্য পয়েন্টও ২৪। প্রতিটি পিঠের মোট পয়েন্ট থেকে মূল পয়েন্ট ২৪ বাদ দিয়ে পয়েন্টের হিসাব করা হয়। ধরা যাক পাঁচজনের এই খেলায় কেউ যদি ৫টি পিঠ পান তবে তার পয়েন্ট হবে ৫ × ৫ = ২৫ – ২৪ = ১ পয়েন্ট। কিন্তু আবার কেউ যদি ৮টি পিঠ পান তবে তিনি পাবেন ৫ × ৮ = ৪০ – ২৪ = ১৬ পয়েন্ট। কিন্তু কেউ যদি দুটি পিঠ পান সেক্ষেত্রে তার পয়েন্ট হয়ে হবে 'মাইনাস' ১৪ কারণ ৫ × ২ = ১০ – ২৪ = –১৪। এবারে যদি পরের দানে তিনি ৮টি পিঠ পান তবে তার পয়েন্ট হবে ৫ × ৮ = ৪০। এই ৪০ থেকে

আগের বারের –১৪ যোগ করে হবে ২৬। এবারে ২৬–মূল পয়েন্ট ২৪=২ পয়েন্ট পাবেন ঐ খেলোয়াড়। এই অঙ্কের নিয়ম থেকে দেখা যাচ্ছে কোন একবার ন্যূনতম ১ পয়েন্ট পেতে গেলে কোন খেলোয়াড়কে অন্তত ৫ পিঠ পেতেই হবে। কোন একজন খেলোয়াড়ের হাতে যদি কোন অবতারের রাজা ছাড়া অন্য তাস থাকে তবে তিনি সেই অবতারকে সেরওয়া[১৮] দিতে পারেন। এছাড়াও খেলায় অনেক মার-প্যাঁচ আছে যা আয়ত্ব করা বেশ সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। চুক্তি অনুযায়ী খেলতে বসা 'পার' এর শেষে যার পয়েন্ট বেশী হবে তিনি জিতবেন। অনেক সময় পয়েন্টের উপর বাজী ধরেও খেলা হয়[১৯]।

দশাবতার তাস লোকশিল্পের অন্তর্গত হলেও এর তুলির টানে এবং মূর্তিতত্ত্বের রূপায়ণে পালযুগীয় শিল্পশৈলীর প্রভাব সুস্পষ্ট। বিষ্ণুপুরের দশাবতার তাসে পাল যুগের বিষ্ণুর দশাবতার মূর্তির পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। পালযুগের বিভিন্ন বিষ্ণুমূর্তিতে দেখা যায় মূর্তিটির 'চালা' (Stella) পীঢ়া দেউলের আকৃতির। তাসেও বিভিন্ন অবতারের রাজার মূর্তিটি পীঢ়া দেউলের মধ্যে আঁকা হয়। পাল যুগের বিভিন্ন মূর্তি ও চিত্রকলায় রূপায়িত দেব-দেবী ও মানুষের বস্ত্রের সমান্তরাল ভাঁজের সঙ্গে দশাবতার তাসের পরিধেয় বস্ত্রের সমান্তরাল ভাঁজের সাদৃশ্যটি বিশেষ লক্ষণীয়। মূর্তিগুলির এই সাদৃশ্য শুধু পরিধেয় বস্ত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না। সাজসজ্জা ও অলঙ্কারেও তা প্রতিফলিত হয়েছে। বিষ্ণুর আজানুলম্বিত বনমালা তাঁর অন্যতম মূর্তিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য এবং এই বনমালা পরিধানের বিষয়টি কিন্তু তাস নির্মাণকারী শিল্পীদের দৃষ্টি এড়ায়নি। কিন্তু এ প্রসঙ্গে একটি বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে যে বিষ্ণুপুর থেকে সংগৃহীত দশবতার তাসের সেটের[২০] বরাহঅবতার তাসটিতে দেবতার বাম পদটি সামান্য উত্তোলিত ভঙ্গিমায় রয়েছে এবং ডান পদটি সুদৃঢ়ভাবে মাটিতে প্রোথিত থাকায় দেবতার বনমালাটি দোদুল্যমান রূপ পেয়েছে। অর্থাৎ লোকশিল্পকলার অন্তর্গত দশাবতার তাসে বনমালাটি রূপায়িত হয়েছে একটু ভিন্ন রূপে, বিষ্ণুপুরের বরাহ অবতার অঙ্কিত তাসে দেবতার গতিশীল ভঙ্গিমার সাথে তাল মিলিয়ে বনমালাটিও কিছু মাত্রায় দোদুল্যমান। বরাহ অবতারের পাল-সেন যুগীয় মূর্তিগুলির প্রায় প্রতিটি নিদর্শনেই[২১] দেখা যায় যে, বরাহ অবতারের পদতলে নাগ-নাগিনী পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, অতএব, এখানেও বরাহ অবতারের পদতলে সর্প থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। এপ্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় মুঘল যুগে আকবর সংস্কৃত প্রাচীন তাসের কথা। এধরনের তাসে দ্বাদশ স্যুটের মন্ত্রী তাসটিতে একটি সাপের উপর অপর একটি সাপের ছবি অঙ্কিত থাকে[২২]। আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি যে, আকবরের আমলে প্রচলিত মুঘল তাসগুলি পরবর্তী কালে কোথাও কোথাও অনুকরণ আবার কোথাও কোথাও অল্পবিস্তর পরিবর্তন করে মল্লরাজা বীর হাম্বীরের আমলে বিষ্ণুপুরে গোলাকার তাস তৈরী হয়।

দশাবতার তাস একসময় যেভাবে রাঢ় বাঙলার লোকশিল্পীর হাতে সমৃদ্ধিলাভ করেছিল, বর্তমানে ইউরোপীয় তাসের প্রভাবে তার ব্যবহার প্রায় বিলুপ্ত, তবুও এখনো যে অল্পসংখ্যক তাস তৈরী হয় তা অধিকাংশই সংগ্রহশালার শোভাবর্দ্ধন এবং দেশী-বিদেশী শৌখিন অভিজাত ব্যক্তিমহলের চাহিদা পূরণ করে। অথচ এককালে বিষ্ণুপুরে দশাবতার তাসের বহু কারিগর-এর বাস ছিল। এঁদের বংশগত উপাধি ছিল 'সূত্রধর'। এই 'সূত্রধর' সম্প্রদায় কেবলমাত্র তাসই নয়। পাথরের ভাস্কর্য, কাঠ-খোদাই, পোড়ামাটির পুতুল ও পটচিত্রের কাজও করতেন। শেষোক্ত কাজের জন্য দশাবতার তাসের অঙ্কনশৈলীর সাথে পটচিত্রের অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। উচ্চমানের কাজের জন্য তাস শিল্পীরা 'ফৌজদার' উপাধি লাভ করতেন। গদাধর ফৌজদার, সতীশ ফৌজদার, কেদার সূত্রধর প্রমুখ শিল্পীদের তাস চিত্রণের দক্ষতার জন্য একদা বিষ্ণুপুরের খ্যাতি বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে বর্তমানে বিষ্ণুপুরে তাস শিল্পীদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়[২৩]। চাহিদার অপ্রতুলতার জন্য জীবনসংগ্রামে বিপর্যস্ত এই ঐতিহ্যবাহী শিল্পটির সাথে একদা যুক্ত কুশলী শিল্পীরা তাঁদের অতি যত্নে লালিত বংশানুক্রমিক পেশা ছেড়ে অন্য পেশার আশ্রয়ে যেতে বাধ্য হয়েছেন। দশাবতার তাস খেলার প্রচলনও এখন আর নেই বললেই চলে। চর্চার অভাবে খেলাটি ক্রমশই সীমিত পরিসরে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে এবং বর্তমানে কেবল বিষ্ণুপুরেরই কিছু স্থানীয় লোক ছাড়া এখেলার নিয়ম প্রায় সকলেরই অজ্ঞাত। তাই মৃতপ্রায় এই লোকশিল্পের পুনরুজ্জীবনে আজ যেমন সরকারী অনুদান প্রয়োজন তেমনই প্রয়োজন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের বা ব্যক্তিগত উদ্যোগের বাড়িয়ে দেওয়া সাহায্যের হাত।

সূত্র নির্দেশ ঃ

১. উড়িষ্যার পুরী, পারালেখ গঞ্জামের বড়পল্লী, রাজস্থানের জয়পুর, মহারাষ্ট্রের ঔরঙ্গাবাদ, দক্ষিণ ভারতের বিজাপুর, গোলকুণ্ডা, কুরনুল, কুডাপ্পা, মহীশূর, উত্তর ভারতের হিমাচল প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে গোলাকার তাসের প্রচলন ছিল বা আছে।
দ্রঃ মানিকলাল সিংহ—'মুঘল তাস ও বিষ্ণুপুরী তাস', পশ্চিম রাঢ় তথা বাঁকুড়া সংস্কৃতি, বিষ্ণুপুর (বাঁকুড়া), ১৩৮৪, পৃঃ ২০৬ (পাদটীকা)

২. প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বিষ্ণুপুরে 'অষ্টমল্ল' নামে আর এক ধরনের তাসের প্রচলন ছিল। জোড়বাংলা মন্দিরে কৃষ্ণ বলরামের সঙ্গে যুদ্ধরত অষ্টমল্লের যে টেরাকোটা চিত্র দেখা যায় তারই মত করে তৈরী হত অষ্টমল্ল তাস। এই তাসে আটটি অসুরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত কৃষ্ণ অথবা বলরামের ছবি আঁকা প্রতিটি তাসে যুদ্ধের চিত্র সম্বলিত চারটি করে মোট ৩২টি তাস অথবা প্রত্যেকটি যুদ্ধের ছবি সম্বলিত আটটি করে তাস—মোট ৬৪টি তাস নিয়ে খেলা হত।
দ্রঃ ঐ—পৃঃ ২০৬ (পাদটীকা)।

৩. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—'নোটস্ অন বিষ্ণুপুর সার্কুলার কার্ডস', জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, খণ্ড ৬৪, কলকাতা, ১৮৯৫ পৃঃ ২৮৪-২৮৫।

৪. শাস্ত্রীর ভাষায়— I fully believe that the game was invented about eleven or twelve hundred years before the present date "
দ্রঃ ঐ—পৃঃ ২৮৫।

৫. উইলিয়াম ডব্লু. হান্টার—এ্যানালস অব রুরাল বেঙ্গল, কলকাতা, ১৮৬৮ অ্যাপেনডিকস ই অভয়পদ মল্লিক—হিস্ট্রি অব বিষ্ণুপুর রাজ, কলিকাতা, ১৯২১ পৃঃ ১২৮—১৩০।

৬. অভয়পদ মল্লিক প্রদত্ত তালিকা অনুসারে।

৭. অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—বাঁকুড়ার মন্দির, কলিকাতা ১৩৭১, পৃঃ ২২। হান্টার জানাচ্ছেন বীর হাম্বীরের জন্ম ৮৬৮ মল্লশকে (১৫৬২ খ্রীঃ), সিংহাসনে আরোহণ ৮৮১ মল্লশকে (১৫৭৫ খ্রীঃ) এবং তাঁরা রাজত্বকাল ২৬ বছর, দ্রঃ উইলিয়াম ডব্লু হান্টার—এ স্ট্যাটিসটিকাল অ্যাকাউন্ট অব বেঙ্গল, খণ্ড ৪, নিউদিল্লী, ১৯৭৩ (পুনর্মুদ্রণ), পৃঃ ২৩৫।

৮. মানিকলাল সিংহ—প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০৯।

৯. সুমিত দে—'দশ অবতারের তাসমহলে', সানন্দা, কলকাতা, ২১শে জানুয়ারী, ১৯৯৪, পৃঃ ৫৩।

১০. অমিয়কুমার বন্দোপাধ্যায়—'দশাবতার তাস', দেখা হয় নাই, কলিকাতা ১৩৮০, পৃঃ ৪৮।

১১. আর.অ্যাণ্ড.এন.ভন.লেইডেন—'গঞ্জিফা : দ্য প্লেইং কার্ডস অব ইণ্ডিয়া' মার্গ, খণ্ড ৩, সংখ্যা ৪, বম্বে, ১৯৪৬, পৃঃ ৪০।

১২. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৮৫।

১৩. অমিয়কুমার বন্দোপাধ্যায়—প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৬।

১৪. মেমোয়ার্স অব বাবর, খণ্ড ২, অক্সফোর্ড, ১৯২১ পৃঃ ৩১৭ (আর.অ্যাণ্ড এন.ভন.লেইডেনের পূর্বোক্ত প্রবন্ধে উদ্ধৃত, পৃঃ ৩৬)।

১৫. আবুল ফজল আলামী—আইন-ই-আকবরী, খণ্ড ১, কলকাতা, ১৮৭৮ পৃঃ (আর.অ্যাণ্ড এন.ভন লেইডেনের পূর্বোক্ত প্রবন্ধে উল্লিখিত পৃঃ ৩৬)।

১৬. মানিকলাল সিংহ—প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০৮।

১৭. অমিয়কুমার বন্দোপাধ্যায়—প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৮।

১৮. দশাবতার তাস খেলায় 'সেরওয়া' শব্দটির দ্বারা বোঝায় যখন কোন খেলোয়াড়ের হাতে কোন অবতারের রাজা ছাড়া অন্য কোন তাস থাকে তবে সেই অবতারের রাজা দিয়ে খেলতে অন্য খেলোয়াড়েরা তাকে বাধ্য করেন।
দ্রঃ অরুণাভ খান—'দশাবতার তাস কি হারিয়ে যাবে অনাদরে, অবহেলায়', যুগান্তর, কলকাতা, ডিসেম্বর ৭, ১৯৯৩।

১৯. বিনয় ঘোষ—পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, ১ম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৮৯, পৃঃ ৩৫৬।

২০. বর্তমান লেখিকার ব্যক্তিগত সংগ্রহে রয়েছে।

২১. ব্যানার্জী, রাখালদাস—ইষ্টার্ন ইণ্ডিয়ান স্কুল অব মিডিয়াভেল স্কাল্পচার, নিউ দিল্লী, ১৯৮১ (পুনর্মুদ্রণ), চিত্রাবলী ৬৫, সি.ডি. এবং ই।

২২. মানিকলাল সিংহ—প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০৬।

২৩. বর্তমানে বিষ্ণুপুরে একমাত্র তাসশিল্পী সুধীর ফৌজদার ও তাঁর ছেলেরা এখনও এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রেখেছেন।

ফরাসীদের চোখে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমে বাংলা

অনিরুদ্ধ রায়

১

এই সময়কার ইতিহাস প্রধানত লিখেছেন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার, আবদুল করিম ও অঞ্জলি চ্যাটার্জী[১], যাঁরা ভিত্তি করেছেন অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত সলিমুল্লাহ ও গোলাম হোসেন সলিম-এর রচনার উপর। করিম ও চ্যাটার্জী সমকালীন ইংবাজি চিঠিপত্রের সাহায্য নিয়েছেন। এর ফলে সরকার যেখানে বাংলার কোন উন্নতি দেখতে পাচ্ছেন না, করিম সেখানে মুর্শিদকুলির অধীনে উন্নতি হচ্ছে বলছেন।. কিন্তু দুজনেই বলছেন যে যুবরাজ আজিবুদ্দীন ও মুর্শিদকুলির ঝগড়ার ফলে বাংলার দেওয়ানী বিভাগ মুখসুদাবাদে (পরবর্তীকালে মুর্শিদাবাদ) সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং মুর্শিদকুলি সৎ দেওয়ান ছিলেন যিনি খাজনা ·বাড়ানোর চেষ্টা করেছিলেন। এখানে আমরা সমকালীন ফরাসী চিঠিপত্র থেকে বণিক-ব্যবসায়ীদের সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক দেখব প্রধানত ১৭০৫ সাল পর্যন্ত। এর থেকে দেখব যে আগেকার ঐতিহাসিকদের মূল্যায়ন আমাদের সঙ্গে মিলছে না।

২

১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৭০০ সালে ফরাসী বণিক মার্তাঁ[২] বাংলার আর্থিক পরিস্থিতি খারাপ বলে বলেছেন। এর কারণ হিসাবে উনি বলছেন যে জায়গীরদাররা মোগল সম্রাটের কাছে উদ্বৃত্ত পাঠাত যার ফলে বাংলার টাকা অনেকখানি বাইরে চলে যেত। সুদের হার অত্যন্ত চড়া— বছরে শতকরা বার— এবং ধনী ব্যক্তির সংখ্যা সীমিত। এর মধ্যে কিছু কিছু জায়গীরদারকে বাংলার বাইরে অন্যপ্রদেশে বদলী করা হয়েছে— ফলে কিছুটা বিশৃঙ্খলা দেখা দিচ্ছে। উল্লেখযোগ্য যে ঐতিহাসিক সরকার ও করিম অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে লেখা রিয়াজ আস সালাতিন[৩]-এর উপর নির্ভর করে এই বদলীর জন্য মুর্শিদকুলিকে দায়ী করেছেন। বলা বাহুল্য এই সময় পর্যন্ত মুর্শিদকুলি বাংলায় আসেননি।

এই সময়ের আগেই বিদ্রোহী শোভা সিংহের মৃত্যু হয়েছে যদিও রহিম খান- এর বিদ্রোহ পুরোটা অস্তমিত হয়নি। যুবরাজ আজিমুদ্দীন (পরবর্তীকালে

আজিমুস্তান) সুবাদার। হুগলী থেকে ১৭০০ সালের জুন[৪] মাসে একটা চিঠিতে দেখা যায় যে সুবাদার রাজমহলে রয়েছেন। ঢাকায় নয়। যদিও সরকার-করিমের লেখা থেকে মনে হয় যে যুবরাজ প্রায় সব সময়েই ঢাকায় ছিলেন। ঐ চিঠিতেই প্রথম দেখা যায় যে যুবরাজ বণিকদের কাছে টাকা চাইছেন। ১৭০১ সালের জানুয়ারির চিঠিতে দেখা যায় যে সুবাদার জোর করে টাকা আদায় করছেন। এ জন্য তিনি বালাসোর, কাশিমবাজার ইত্যাদি জায়গায় আমলার সংখ্যা বাড়িয়ে দিয়েছেন[৫]। ১৭০১ সালের মার্চ মাসের চিঠিতে বলা হচ্ছে যে যুবরাজকে বাংলা ছেড়ে দেবার আদেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু নানা ছুতো করে সুবাদার থেকে যাচ্ছেন[৬]। ১৭০১ সালের শেষ দিকে অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ে যার বিশদ বর্ণনা আমরা ১৭০২ সালের জানুয়ারির চিঠিতে পাই[৭]।

ফরাসীরা লিখছে যে টাকা পয়সা জোগাড় করা গত ছয় মাস ধরে খুব শক্ত হয়ে পড়েছে। এমন কি দশ হাজার টাকার যোগাড় করা যাচ্ছে না। ১৭০১ সালের আগস্ট থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই অবস্থা শোচনীয় আকার ধারণ করে। এর একটা কারণ হয়ত যে সুবাদার রাজমহলের টাঁকশাল বন্ধ করে দিয়েছিলেন। সেপ্টেম্বরের শেষে শরফরা বহু টাকা দিয়ে আবার এটা খোলান।

যুবরাজের জোর করে টাকা আদায় করা অন্যান্য আমলারাও অনুকরণ করছিল। হুগলীর ফৌজদার একটি নূতন কর বসান এবং জোর করে এটি আদায় করতে থাকেন। তাঁতীরা আগাম টাকা নিয়ে পালায়। বণিকরা যুবরাজের কাছে অভিযোগ করলে তিনি কর আদায় বন্ধ করার আদেশ দেন। কিন্তু সে আদেশ মানা হয় না।

এর ফলে সারা নদীপথে ধারে ধারে কর আদায়-এর চৌকি গজিয়ে ওঠে। কাশিমবাজার ও হুগলীর মধ্যে ফরাসীরা ৪৬টি চৌকি দেখেছে। এরা প্রতি গাঁটরির উপর এক টাকা থেকে দু টাকা আদায় করে। একটা চৌকিতে ফরাসীরা ঐ টাকা দিতে রাজি না হলে, নৌকা আটকানো হয়। কাশিমবাজারের ফৌজদার নৌকা ছাড়বার আদেশ দিলেও কোন কাজ না হওয়ায়, তিনি ঘোড়সওয়ার পাঠিয়ে নৌকা ছাড়ান। এর ফলে ইউরোপীয় কোম্পানীরা ২০ থেকে ৩০ জন পিয়নকে নৌকার সঙ্গে পাঠাত। চৌকির লোকেরা সব ধরনের লোকের কাছ থেকে টাকা আদায় করত — এমন কি ধোপাদেরও বাদ দিত না। এ সবের ফলে জিনিষপত্রর দাম প্রচুর বাড়তে থাকে এবং কোন বণিকই তাঁতীদের টাকা আগাম দিতে রাজি নয়। এই সময়েই আমরা মুর্শিদকুলি খাঁর দেওয়ান হিসাবে বালাসোরে আসার কথা পাই। ওখানে ফরাসী কোম্পানীর প্রতিনিধির কাছে উনি নিরপেক্ষ বিচার ও সৎ শাসনব্যবস্থার কথা বলেন।

৩

১৭০৩ সালের জানুয়ারি মাসের[৮] মধ্যে বাংলায় ইউরোপীয় বাণিজ্যের পরিবর্তন হয়েছে। ভারতীয় মহাসাগরে দস্যুতার অভিযোগে মোগল সম্রাট সারা সাম্রাজ্যে ইউরোপীয়ানদের বাণিজ্য বন্ধ করে দিয়েছেন। ছাপড়া, পাটনা ও রাজমহলে ইংরাজ ও ওলন্দাজ কর্মচারীরা কারারুদ্ধ হলে প্রচুর অর্থের বিনিময়ে তারা মুক্তি পায়। কাশিমবাজারের ইংরাজরা পালানোর সময়ে ধরা পড়ে। কিন্তু টাকা দিয়ে মুক্তি পায়।

এসবের মধ্যেও যুবরাজ জোর করে টাকা আদায় করতে থাকেন। ফলে টাকার ঘাটতি দেখা দেয়— ধার পাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। এর সঙ্গে চলতে থাকে চৌকিগুলিতে জোর করে টাকা আদায়। হুগলীর সামনে ষাটটি নৌকা আটক করা হয়। সোরার দাম বেড়ে হয় প্রতি মণে চার টাকা।

এই সময়ই আমরা প্রথম যুবরাজের একচেটিয়াভাবে মাল কেনা ও বেচার কথা পাই — যাকে **সওদা-ই-খাস** ও **সওদা-ই-আম** বলা হয়েছে। সম্ভবত এই কারণেই দেওয়ান ও যুবরাজের মধ্যে মত বিরোধ হয়। এর আরেকটি কারণ ছিল যে দেওয়ান ইউরোপীয বাণিজ্য চালু করার পক্ষে ছিলেন।

রিয়াজ-ওস-সালাতিনের উপর নির্ভর করে সরকার যুবরাজের শাসনের প্রথম থেকেই **সওদা-ই-খাস** ও **সওদা-ই-আম**-এর প্রবর্তনের ইঙ্গিত দিয়েছেন[৯]। কিন্তু ঐ প্রথা যুবরাজ শুরু করেন ইউরোপীয় বাণিজ্য বন্ধ হবার পর এবং এই প্রথা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। সরকার ও করিম মতবিরোধের প্রধান কারণ হিসাবে দেখিয়েছেন যুবরাজ কর্তৃক দেওয়ানের প্রাণনাশের চেষ্টা ও ফলত দেওয়ানি বিভাগ মুখসুদাবাদে সরিয়ে নেওয়া[১০]। সমকালীন ফরাসী চিঠিতে ঐ ধরনের কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না।

১৭০৩ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারির চিঠি থেকে জানা যায় যে বাণিজ্য আবার শুরু হয়েছে। সরকারীভাবে বাণিজ্য চালানোর আদেশ দেবার জন্য যুবরাজ টাকা দাবি করছেন।[১১]। ঐ সময়ের চিঠি থেকে জানা যায় যে যুবরাজ ও দেওয়ান এক হয়ে ইউরোপীয়ান কোম্পানীগুলির কাছ থেকে ষাট হাজার টাকা চাইছেন সরকারী আদেশ বের করার জন্য। গুজব ছিল যে সম্রাট ঐ আদেশ দিয়েছেন— ফলে কোম্পানীগুলি ঐ টাকা দিতে অস্বীকার করে[১২]। পয়লা মার্চ-এর চিঠিতেও ঐ একই কথার পুনরাবৃত্তি পাওয়া যায়। ফরাসীরা মনে করছে যে দেওয়ান ও যুবরাজ ঐ আদেশ চেপে রেখেছে[১৩]।

অক্টোবরের শেষের চিঠিতে[১৪] দেখা যাচ্ছে যে যুবরাজ বেশ কিছুদিন হল ঢাকায় আছেন ও দেওয়ান মুখসুদাবাদে গিয়েছেন। ঐ মাসে অবশ্য দেওয়ান বর্ধমানে গিয়েছেন ওখানে এক বিদ্রোহী জমিদারকে শায়েস্তা করার জন্য। কিন্তু

ফরাসীরা দেওয়ানের উপর যে ভরসা রেখেছিল, তা পূরণ হয়নি। দেওয়ানকে অনেক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে এবং তার ব্যবহার করে দেওয়ান নানাভাবে টাকা সংগ্রহ করছেন সম্রাটকে টাকা পাঠানোর জন্য। এই পরিমাণ টাকা বাইরে চলে যাওয়ার ফলে দেশে টাকার অভাব দেখা যাচ্ছে। খুব ধনী ব্যক্তিরাও দু'হাজার টাকা জোগাড় করতে পারছে না।

দেওয়ানের অত্যাচারের নানা দৃষ্টান্ত ফরাসীরা দিয়েছে। মথুরাদাস ও বল্লভদাস, দুজন বড় বণিক, ইজারাদার হয়েছিল কিস্তিতে টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে। টাকা না দিতে পারার ফলে মথুরাদাস কারারুদ্ধ হয়। আর একজন বড় বণিক, কসমো গোমেজ, প্রায় তিরিশ মাস কারারুদ্ধ থাকার পর বহু টাকা দিয়ে মুক্তি পায়। ইতিমধ্যে দেওয়ান ও যুবরাজ ইংরাজ কোম্পানীগুলিকে ষাট হাজার টাকা দিতে বলেন। ইংরাজরা কাশিমবাজার ছেড়ে চলে যায়। ফরাসীরা ছাড়বার উদ্যোগ করে। ওলন্দাজরা অবশ্য বিশ হাজার টাকা দিতে রাজি ছিল। ওদের ষোলটা নৌকা আটকে ছিল। বক্সী মহম্মদ রাজার সাহায্যে টাকার বিনিময়ে সেগুলি ছাড়ানো সম্ভব হয়। পাটনা থেকে হুগলী পর্যন্ত অসংখ্য চৌকি রয়েছে যারা নৌকা থামিয়ে টাকা আদায় করছে। কাশিমবাজার ইজারা দেওয়া হয়েছে এবং দেওয়ান ফরাসীদের উপর চাপ দিচ্ছেন যেন তারা ওখানে শুল্ক দেয়। ফরাসীরা নিয়মের ব্যতিক্রম করতে রাজি নন। ইতিমধ্যে যুবরাজ ঢাকা ছেড়ে রাজমহলে রওয়ানা হয়েছেন। ওঁর ছেলে ঢাকায় শাসনকাজ চালাচ্ছে আতালিক-এর সাহায্যে।

দেওয়ানের মখসুদাবাদ-এ যাওয়াই সরকার ও করিম 'রিয়াজ'-এর উপর নির্ভর করে ঝগড়া হিসাবে দেখিয়েছেন। কিন্তু ১৬৯০ সাল থেকে দেওয়ান মখসুদাবাদ-এ ছিলেন। দেওয়ান কাফায়েৎ খান ১৬৯৬ সালে মখসুদাবাদ থেকে ফরাসীদের পরওয়ানা দেন[১৫]। এছাড়া রাজমহলে টাঁকশাল ছিল যেখানে যুবরাজ প্রায় দু বছর ছিলেন। ঝগড়া না হওয়ার প্রমাণ হচ্ছে যে দেওয়ান ও যুবরাজ মিলিতভাবে কোম্পানীদের কাছ থেকে টাকা চাইছেন। কাশিমবাজার ইজারা দেওয়ার মধ্যে থেমে মনে হয় যে দেওয়ান যতটা রাজস্ব আদায় হবে ভাবছিলেন, ততটা হচ্ছে না। এর একটা ইঙ্গিত পাওয়ার যায় তাঁতীদের গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়া মধ্যে ও ছোটখাট জমিদারদের বিদ্রোহের মধ্যে। ইজারা থেকে টাকা আসছে না। মথুরাদাসের কারারুদ্ধ হওয়াই তার প্রমাণ। এই অবস্থার চিত্র 'রিয়াজ'-এর উপর নির্ভর করে লেখা সরকার ও করিমের লেখার বিপরীত। ফরাসীরা বলছে মহম্মদ রাজা একই সঙ্গে বক্সী ছিলেন ও হুগলীর কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। করিম ঐ সময়ে হুগলীর ফৌজদার হিসাবে মহম্মদ ইব্রাহিম-এর নাম করেছেন[১৬]। মনে হয় হুগলীর কোষাধ্যক্ষে-র কাজটা অতিরিক্ত হিসাবে মহম্মদ রাজাকে দেওয়া হয়েছিল।

১৭০৪ সালের ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি[১৭] দেখা যায় যে কাশিমবাজার টাঁকশাল মাস তিনেক হল চালু হয়েছে। ইংরাজ ও ওলন্দাজ কোম্পানী কাশিমবাজারে শুল্ক দিচ্ছে। ওলন্দাজরা একটা পরওয়ানা পেযেছে দেওযানের কাছ থেকে বহু টাকার বিনিময়ে। ফরাসীরা অবশ্য কিছু দেবার মত অবস্থায নেই। যুবরাজ তখন বিহারের সুবাদার হওযাতে পাটনা গিযেছেন। দেওযান বর্ধমান থেকে বালাসোর ও কটকে গিয়েছেন প্রধানত বিদ্রোহী জমিদারদের শাযেস্তা করতে। বিদ্রোহী রহিম শাহর সঙ্গে যুবরাজেব সৈন্যদের ছোটখাট সংঘর্ষ হচ্ছে। দেওযান ও যুবরাজের আমলারা একই ভাবে জোব করে টাকা সংগ্রহ করছে। মথুবাদাসেব ছেলে বাবার মুক্তির জন্য দেওযানের কাছে গেলে, তাকেও আটক কবা হয়। এসবের ফলে কাশিমবাজারে রেশমেব দাম পড়ে যাচ্ছে কাবণ ক্রেতার সংখ্যা খুব কম। কিন্তু চালের দাম বেড়ে এক টাকায ২৫ বা ৩০ সের হযেছে। সমস্ত হস্তশিল্পের উপর কর বসানো হযেছে। সোরার প্রতি মণে দেড় টাকা অতিরিক্ত কব বসানো হয়েছে। ফরাসীদেব মতে যে টাকা যুববাজ ও দেওযান তুলেছেন সেটা পাঠানো হচ্ছে সম্রাটেব কাছে। ফলে টাকার অভাব দেখা দিচ্ছে।

১৭০৫ সালের জানুয়ারির[১৮] মধ্যে মুখসুদাবাদে টাঁকশাল বসানো হযেছে ও কাশিমবাজারের টাঁকশাল বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। টাকার অভাব তখনো রয়েছে। অক্টোবর[১৯] মাসেব চিঠিতে দেখা যায় যে যুবরাজ ও দেওযানেব অত্যাচার চলছে। জমিদারদেব উপর প্রচণ্ড চাপ দেওযা হচ্ছে। একজন জমিদাব কাবারুদ্ধ হযেছিলেন। বহু টাকার বিনিময়ে মুক্তি পান। ওলন্দাজের পর ইংরাজরাও দেওয়ানকে টাকা দিযেছে, ফলে বাণিজ্য স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। বর্ধমানে দেওয়ানেব সঙ্গে ফরাসীদের দেখা হলে, দেওয়ান পরওয়ানা দেবার জন্য পনের হাজার টাকা চান। এক আর্মেনিয়ান বণিকের মাধ্যমে ফরাসীরা কথাবার্তা চালাতে থাকে।

৪

অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে বাংলার যে চিত্র পাওযা যায় তা অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক। এটি সরকার ও করিমের সঙ্গে মেলে না। অত্যাচারের মাত্রায ফরাসীরা দেওয়ান করতলব খান (১৭০২-তে মুর্শিদকুলি খান)-কে যুবরাজের ব্যতিক্রম বলে মনে করছেন না। তাদের মধ্যে ঝগড়ার কোন কথা পাওয়া যায় না। তবে কোন কোন বিষয়ে তাঁরা একমত হননি। কিন্তু এই অবস্থাটি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ বিদ্রোহের কিছুটা ফল ও কিছুটা বৃদ্ধ সম্রাট আওরংজেবের মৃত্যুর পর আসন্ন গৃহযুদ্ধের আশংকার সঙ্গে জড়িত। সমকালীন ইংরাজি দলিলে এই অবস্থার আভাস থাকলেও, ঐতিহাসিক করিম ঐ আভাস গ্রহণ করেন

নি। ঐতিহাসিক সবকার পববর্তী গ্রন্থ **‘রিয়াজ’**-এর উপব বেশি নির্ভর করায। তাঁব মতও গ্রহণযোগ্য নয। নূতন মূল্যায়নের এখন প্রয়োজন।

সূত্র নির্দেশ

১. যদুনাথ সবকাব সম্পাদিত: **দ্য হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল**, দ্বিতীয় খণ্ড, ঢাকা, ১৯৭২ (পুনঃ মুদ্রণ), পৃঃ ৩৯৭–৪১৭; আবদুল কবিম: **মুর্শীদকুলী খান এ্যাণ্ড হিস টাইমস**, ঢাকা, ১৯৬৩; অঞ্জলি চ্যাটার্জী: **বেঙ্গল ইন দ্য রেইন অফ আওরংজেব**, কলিকাতা, ১৯৮৭।

২. **আর্চিভ নাসিওনাল ও কলোনীয়াল**। প্যাবিস (এখানে শুধু **আর্চিভ**)। সি (২) ৬৫, পৃঃ ৫৩।

৩. গোলাম হোসেন সলীম: **বাংলার ইতিহাস** (বাংলায অনুদিত), ঢাকা, ১৯৭৪, পৃঃ ১৯১–১৯৬।

৪. **আর্চিভ**, ২৬শে জুন ১৭০০, পৃঃ ৩৬খ (হুগলী থেকে লেখা)।

৫. ঐ. হুগলী, ১৫ই জানুয়াবি ১৭০১, পৃঃ ৭৭ (সি (২) ৬৬)।

৬. ঐ. দু লিভিয়াব–এব চিঠি হুগলী থেকে, পযলা মার্চ, সি(২) ৬৬, পৃঃ ১১–১২।

৭. ঐ, হুগলী, ১২ই জানুযাবি ১৭০২, পৃঃ ২২২–২৪৪খ।

৮. ঐ, সি (২) ৬৭, হুগলী, ১২ই জানুয়াবি ১৭০৩ ১৭০৩, পৃঃ ৩৩–৫৩।

৯. **রিয়াজ**, পৃঃ ১৯১; সবকাব, পৃঃ ৪০২–০৩।

১০. **রিয়াজ**, পৃঃ ১৯৩–৯৮, সবকাব, পৃ. ৪০৪; কবিম, পৃঃ ২১–২২।

১১. **আর্চিভ**, পণ্ডিচেবী, ৫ই ফেব্রুযাবি ১৭০৫, পৃঃ ৯খ।

১২. ঐ, হুগলী, ১২ই ফেব্রুযাবি ১৭০৩, পৃঃ ৭৫।

১৩. ঐ. হুগলী, পযলা মার্চ ১৭০৩. পৃঃ ৭৬–৭৮খ।

১৪. ঐ, হুগলী, ২৪শে অক্টোবব ১৭০৩, পৃঃ ৯২–১০৫।

১৫. বাংলাব দেওযানেব পবওযানা মুখসুদাবাদ থেকে ফবাসী কোম্পানীকে সম্রাটেব ৩৭ বছবেব সময (**বিবলিওথেক নাসিওন্যাল**, প্যাবিস, নং.ন.আ. ৯৩৬৭. পৃঃ ২০)।

১৬. কবিম, পৃঃ ৬৫।

১৭. **আর্চিভ**, হুগলী, ১৮ই ডিসেম্বব ১৭০৪, পৃঃ ১৯৫খ–২০২খ।

১৮. ঐ, হুগলী, ১০ই জানুয়াবি ১৭০৫, পৃঃ ৩০১খ।

১৯. ঐ, হুগলী, ২১শে অক্টোবব ১৭০৫, পৃঃ ৩৪০খ–৩৪৬।

মুঘল রাজশক্তি ও বিষ্ণুপুরের মল্লরাজাদের মিত্রতা : প্রেক্ষাপট ও ফলাফল

শেখর ভৌমিক

আফগান তরবারীর সামনে পশ্চিম বাংলার কাছাকাছি শেষ স্বাধীন রাজ্য উড়িষ্যা বিজিত হবার পর পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ও ষোড়শ শতকেব প্রথমার্ধে বাংলা বিহার ও ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধে বাংলা বিহার ও উড়িষ্যা সীমান্ত অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ছোট ছোট অসংখ্য বাজ্য বা 'প্রিন্সিপ্যালিটি'র উদ্ভব হয়। ভবিষ্যপুরাণের ব্রহ্মাণ্ড খণ্ডে এইসব রাজ্যের কিছু কিছু হদিস পাওযা যায়[১]। এই রাজ্যগুলোর অনেকগুলোরই নামের শেষে থাকত 'ভূম' নামক শব্দটা। এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, গোপভূম, সামন্তভূম, তুঙ্গভূম, ধলভূম, মানভূম, শূরভূম, বরাহভূম, শিখরভূম ইত্যাদির কথা।

কিন্তু এদের মধ্যে যে রাজ্য বা ভূখণ্ডটা সকলকে অতিক্রম করে এক বিশেষ সম্মান ও প্রতিপত্তির আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিল তার নাম 'মল্লভূম', রাজধানী যার বিষ্ণুপুর। উন্নতমানের টেরাকোটা সমৃদ্ধ অসংখ্য মন্দিব, ধ্রুপদী সঙ্গীতচর্চা, বৈষ্ণব ধর্ম ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা, সামরিক শক্তি — এই সবের মধ্যে মল্লভূমি ছিল অগ্রগণ্য।

ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি, প্রায় ১৫৬৪ সাল নাগাদ বাংলায় কররানী আফগান বংশীয় এক ব্যক্তি সিংহাসনে বসেন। এই বংশের সুলেমান কররানী ছিলেন খুবই উল্লেখযোগ্য। চিতোর অভিযানে ব্যস্ততার সুযোগ নিয়ে সুলেমান ১৫৬৭-৬৮ সালে উড়িষ্যায় অভিযান পাঠান। গজপতিরাজ হরিচন্দন মুকুন্দদেব এদের হাতে নিহত হন। উত্তর উড়িষ্যা চলে যায় এদের দখলে[২]। সুলেমান তনয় দাউদ আবার মুঘলের বশ্যতামূলক মিত্রতা পরিত্যাগ করে নিজের নামে 'খুৎবা' পড়েন[৩]। ফলত দ্বন্দ্ব অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে।

শুরু হল যুদ্ধ। ১৫৭৪ সালে টাণ্ডায় পরাজিত হয়ে দাউদ সহ আফগান বাহিনী পালিয়ে যান উড়িষ্যায়[৪]। এবার কিন্তু এতকাল পর্যন্ত আফগানরা বাংলার রাজধানী থেকেই উড়িষ্যা শাসন করছিল। কিন্তু উত্তরদিক থেকে মুঘলের হামলায় তারা উড়িষ্যায় সরে যেতে বাধ্য হয়। দাউদের মৃত্যুর পর কত্‌লু লোহানী নামে দাউদের এক সেনাপতি উড়িষ্যায় নিজের প্রতিপত্তি স্থাপনে সচেষ্ট হন[৫]। মঙ্গলকোটে মুঘল বাহিনী তাঁর কাছে পরাজিতও হয়। আকবর পাঠালেন মান

সিংকে। মান সিং শিবিব পাতলেন আধুনিক আবাস্বাগ, সে যুগের জেহানাবাদে[৬]। ফৌজের দাযিত্বে ছিলেন মানসিং তনয জগৎ সিং, যাঁর বিরুদ্ধে ষডযন্ত্র করলেন কত্‌লু খান্‌, জগৎকে সতর্ক করলেন বিষ্ণুপুররাজ বীর হাম্বীর, শুনলেন না তিনি, হাম্বীব বিপদ বুঝে আত্মগোপন করে রইলেন। জগৎ সিংহ আক্রান্ত হলে তাকে বক্ষা কবে বিষ্ণুপুবে নিযে গেলেন হাম্বীর[৭]।

তবে ১৫৯০ সালে কতলুকে ঘায়েল করলেও[৮] আফগানদের বিরোধিতা কিন্তু কমেনি। ইতিমধ্যে মুঘলদের সাহায্য কবায় নাসির খান আক্রমণ করলেন বিষ্ণুপুর,[৯] অবশেষে ১৫৯৩তে উডিষ্যায় আফগান শক্তির অবসান ঘটে, উড়িষ্যা যুক্ত হয বাংলাব সাথে[১০]। সংক্ষেপে এই হল বীর হাম্বিরেব সমকালীন, সীমান্ত বাংলা ও উডিষ্যার বাজনৈতিক চিত্র।

বাংলায ও পববর্তী সময়ে পার্শ্ববর্তী বাজ্য উডিষ্যায গজপতি বাজ্য আফগানদের হাতে চলে যাওযাব পর থেকেৎ মুঘলরা শঙ্কিত হযে পডেছিল। উডিষ্যার নিযন্ত্রণ স্থাপনে তারা বিশেষভাবে চিন্তিত হযে পডে ছিল। আকবব সম্ভবত ওই অঞ্চলে এমন একজন অনুগত শাসককে চেযেছিলেন, ইতিমধ্যেই যাঁব সেখানে কিছুটা নাম, যশ, প্রতিপত্তি হযেছে, তাঁর শক্তিকে উৎসাহিত কবে মুঘল বিরোধী আফগান শক্তির উত্থানকে তিনি প্রতিহত কবতে চেয়েছিলেন। তাই আফগান শক্তিব প্রতিরোধী হিসাবেই বোধ হয মুঘলবা ঐ অঞ্চলে মল্লদের শক্তি বৃদ্ধিতে বাধা দেয়নি। প্রথম দিকে আকবর বন্ধুত্বেব এই অন্বেষণটা করেছিলেন উড়িষ্যায। ১৫৬৫তে তিনি সুলেমানেব বিরুদ্ধে সম্ভাব্য দ্বন্দ্বে উডিষ্যাবাজ হরিচন্দন মুকুন্দদেবের বন্ধুত্ব চেযে দু'টো দৌত্য প্রেরণ করেন। বদাযুনীর 'মুন্তাখাব-উৎ-তাওযারিখ'-এ আছে, হাসান খান খাজাঞ্চী ও মহাপাত্র নামের দুই দুতকে রাজসভায় সমাদর করা হয়, তাঁবা বিদ্রোহী খান্‌ জামানকে আশ্রয় না দেবার জন্য মুকুন্দদেবকে অনুরোধ করেন।[১১] কিন্তু আফগান শক্তির হাতে মুকুন্দদেবের পরাজয় ও মৃত্যু মুঘলদের হতাশ করে। কিন্তু বিষ্ণুপুরকে আঞ্চলিক মুঘল ঘাঁটি হিসাবে গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছিলেন।

আর মল্লরা আফগানদের সম্পর্কে সতর্ক হয়ে যায়। তুর্কো-আফগান যুগেও বিষ্ণুপুর রাজ্যের সীমান্ত অঞ্চলে, একাধিক বার আফগান শাসক ও উড়িষ্যার রাজাদের পারস্পরিক সংঘর্ষের প্রভাব পড়েছিল। উভয়ের শক্তিপরীক্ষার ক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল এই অঞ্চল, একদিকে লখনৌতি, অন্যদিকে যাজনগর। সীমান্তে আফগান বাহিনীর উড়িষ্যা আক্রমণ[১২] ইত্যাদি ঘটনা বিষ্ণুপুরের মল্লশক্তিকে চিন্তিত করে তুলেছিল; মুঘলদের মধ্যেই তাঁরা খুঁজে পেল সেই শক্তিকে।

আসলে দু'টো ভিন্ন স্বার্থে মল্ল ও মুঘল—উভয়েরই শত্রু হয়ে দাঁড়ায় আফগান/পাঠানরা, মুঘলরা আফগানদের ধ্বংস করতে চেয়েছিল নিজেদের

সাম্রাজ্যকে সুরক্ষিত করতে, মুঘল শাসনকে .অপ্রতিহত করে তুলতে, আর মল্লরা মল্লভূমে নিজেদের নিরাপত্তা বজায় রাখতে।

কিন্তু এই রাজনৈতিক স্বার্থ ছাড়াও আরও কয়েকটা বিষয়ও উভয়ের মিত্রতার পটভূমি বলা যেতে পারে।

প্রথমত, মল্লরাজারা মাল, তাগদী ইত্যাদি নিম্ন বর্ণের মধ্য থেকেই উঠে এসেছিলেন বলে মনে করা হয়। পরবর্তীকালে তাঁরা নিজেদের ক্ষত্রিয় হিসাবে পরিচয় দেন। এঁদের সঙ্গে রাজস্থানের যোগাযোগ ছিল বলে লোকশ্রুতি আছে। 'বিষ্ণুপুরের রাজারা যদি নিম্নবর্ণের হতেন তাহলে মহাপাত্ররা পুরোহিতের পদগ্রহণ করতেন না'[১৩]।

রঘুনাথ পূর্ববর্তী সময়কার রাজাদের উপাধি ছিল 'মল্ল', যাকে হান্টার প্রচীন অনার্য প্রভাবের শেষ নিদর্শন রূপে মনে করেছেন।[১৪] কিংবদন্তী গুলোও ত্রুটিপূর্ণ। যেমন, সপ্তম শতকেই আদিমল্লের পূর্বপুরুষ পুরীধাম দর্শনে যাচ্ছিলেন বলা হয়, কিন্তু, যতদূর জানা যায দশম শতকের প্রথমার্ধেব আগে পুবী মন্দিবের নির্মাণকার্য শুরু হযনি। আবার সাঁওতাল সৈন্যবাহিনী নিযে আদিমল্লেব অভিযানেব ব্যাপারটাও গোলমেলে, কারণ অষ্টাদশ তকের শেষার্ধে, মন্বন্তরের আগে, সাঁওতালরা এই অঞ্চলে আসেনি।

মল্লভূমের বাগ্দীরা মল্ল রাজাদের বাগ্দী বলেই মনে করে। বাঁকুড়ার 'কুশমেটিযা' বাগ্দীরা নিজেদের কিছুটা উচ্চমর্যাদাভুক্ত বলেই মনে করে কারণ তাদের বিশ্বাস যে মল্লরাজারা তাদের সম্প্রদায থেকেই উঠে এসেছিলেন। রমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ মনে করেন, যোদ্ধা সম্প্রদায ও স্বাধীন শাসকরূপে প্রতিষ্ঠা বা কৃতিত্ব অর্জনের পরই যেন ক্ষত্রিয রূপে নিজেদেব পবিচয় দানে তৎপর হয়ে ওঠেন[১৫]। মল্ল রাজারা বাগ্দী ও তাদেরই সগোত্রীয় মাল জাতি—উভয়েরই সার্বভৌম শক্তিরূপে স্বীকৃত[১৬]। বস্তুত মাল জাতির মধ্য থেকে উত্থিত হওয়ার কারণেই মল্লভূমের উঁচু জাতের ছত্রীরা মল্লরাজাদের সুনজরে দেখে না এবং উচ্চমর্যাদাভুক্ত বলেও গণ্য করে না[১৭]। বস্তুত মাল, বাগ্দী ইত্যাদি জাতি থেকে উত্থিত হয়ে পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন ক্ষত্রিয় বংশের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেন—পণ্ডিতের বিবরণীতে বারবার এই সমস্ত উচ্চ বর্ণে আদান প্রদান উল্লিখিত হয়েছে[১৮]।

ব্রাহ্মণ্য ব্যবস্থায় রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তি থাকা সত্ত্বেও বাগ্দীর মত নিম্নবর্ণের বা জাতির দেশ শাসনের বৈধ অধিকার থাকে না, আর ইতিমধ্যেই স্মার্ত ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ওই অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, উচ্চবর্ণ সহ অন্যান্য মানুষের ওপর সামাজিক ও নৈতিক কর্তৃত্ব স্থাপনের ক্ষমতাও তাহলে মল্লদের থাকে না। আর কর্তৃত্ব নিশ্চিত করার জন্য রাজনৈতিক প্রশাসনিক বা সামরিক শক্তিই যথেষ্ট নয়, জনসমর্থন দ্বারা সমাজে নিজের স্থান বা মর্যাদাকে সুনিশ্চিত করাই

হল রাজার পক্ষে, বিশেষত স্থানীয় কোন রাজার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়, যাতে তিনি সমাজকাঠামো ও সংস্কৃতির রক্ষকরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন। মল্লরাজারা তাই বাগ্দীদের সঙ্গে তাঁদের পূর্বপুরুষের সম্পর্ক নিয়ে বিশেষভাবে চিন্তিত ছিলেন[১৯]।

দ্বিতীয়ত, অন্যদিকে আবার যে মাল, বাগ্দীদের মধ্য থেকে মল্লরা উঠে এসেছিল, তাদের দিক থেকে একটা চ্যালেঞ্জ আসবার সম্ভবনা ছিল। ভূমিজ, খয়রা, ডোম বাগ্দীরা ছিল খুবই সক্রিয়। স্থানীয় রাজনীতিতে এরা ছিল অত্যন্ত প্রভাবশালী। এদের অনেকের কাছেই থাকত অস্ত্র, নিয়ন্ত্রণের অসাধ্য জাতিগোষ্ঠীকে এরা নিযন্ত্রণ করত। এদের অনেকেই সর্দার বা প্রধান ঘাটোয়াল রূপে নিযুক্ত হত। বিভিন্ন ভাবে এই সর্দার ঘাটোয়াল সহ স্থানীয় নেতৃবর্গ স্বশাসন প্রসারিত করার চেষ্টা করত। প্রতিবেশী সর্দারদের সঙ্গে ঘনঘন হাঙ্গামা করত। পতিত জমিতে বে-আইনভাবে দখল নেবার চেষ্টা করত, জমিতে ব্যক্তিগত প্রজা বসিযে নিজেব ক্ষমতা সুদৃঢ় করার চেষ্টা করত, জমি ইজারা দিত। নিষ্কর জমি দান কবত, গ্রাম্য বিবাদের মীমাংসা করত, শাস্তি দিত। এককথায় স্ব-শাসিত শাসক বা গোষ্ঠীপতির চেযে কোন অংশে কম ছিল না তার ভূমিকা। মল্লভূমের মণ্ডল মুখিযাদেব ক্ষমতাও প্রায একইরকম ছিল। মণ্ডল ছিল গ্রাম প্রধান, মুখিযা জাতি প্রধান। এদের সহযোগিতা ছাড়া গ্রাম বা গোষ্ঠী সংক্রান্ত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা কষ্টকরই ছিল স্থানীয় পরিস্থিতির সম্পর্কে জ্ঞান থাকায় ও স্থানীয় সমাজ এদের নিয়ন্ত্রণে থাকায় রাজারা তাদের প্রশাসনের অন্তর্ভুক্ত করতে চেযেছিলেন। অন্যদিকে রাজকীয় প্রশাসনের অন্তর্ভুক্ত হবার ফলে এবা নিজেদের কর্তৃত্বকে আরও বলিষ্ঠ করে তুলতে বা স্থানীয় সমাজে প্রভাব আরও বাড়াতে সক্ষম হয়। সম্ভব হলে রাজার বিনা অনুমতিতে শুরু করে মন্দিব নিমার্ণ কার্যও[২০]। আরও কিছুকাল পরে তারা জমিও আত্মসাৎ করতে শুরু করে। জমিতে নিয়ন্ত্রণ থাকায় এবং স্থানীয় সমাজ ও রাজনীতিতে এই ধরনের ক্ষমতা ভোগ করার ফলে মল্লভূমে সর্দার ঘাটোয়াল, মণ্ডল মুখিয়ারা হয়ে ওঠে স্থানীয় সমাজ সংগঠন এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী। এর ফলে রাজার ক্ষমতা সংকুচিত হয়। উপজাতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যবাহী মল্লভূমের সমাজে রাজকীয় সার্বভৌমত্ব বজায় রাখা ছিল প্রাথমিক শর্ত[২১]।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ও ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধে ছোটনাগপুরের অরণ্য প্রদেশের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ছোট ছোট অসংখ্য রাজ্যের উদ্ভব হয়েছিল। বৃহৎ রাজশক্তির উত্থানে ছোট রাজ্যগুলো তখন জনগোষ্ঠীর বৈচিত্র্যসহই বৃহৎ রাজ্যের মধ্যে অন্তর্লীন হয়ে যায়। উড়িষ্যা রাজের পতনের পর রাজশক্তি শিথিল হতেই স্বকীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে আবার তারা স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যে জাগ্রত হয়ে উঠেছিল[২২]। এ প্রসঙ্গে ছাত্না অঞ্চলে সামন্তভূম, দক্ষিণ বাঁকুড়ায় তুঙ্গভূম,

অম্বিকানগর অঞ্চলে ধলভূম, রায়পুর অঞ্চলে শিখরভূম ইত্যাদির কথা বলা যায়। ষোড়শ শতকে মল্লভূমের চারপাশে এই সমস্ত রাজবংশের অস্তিত্ব বীর হাম্বীরকে নিশ্চিতভাবে চিহ্নিত করে তুলেছিল। এছাড়া এই ভূমণ্ডল বাদ দিয়েও মল্লভূমের চারপাশে আরও একাধিক রাজনৈতিক কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল।

সুতরাং একদিকে পাঠান হাঙ্গামা, পার্শ্ববর্তী 'ভূমরাজ্য' সমূহ এবং অন্যদিকে ছিল স্বাধিকার প্রমত্ত মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণী, মণ্ডল, মুখিয়া সর্দাররা গ্রাম সমাজে রাজার নিয়ন্ত্রণ ক্রমশ শিথিল হয়ে পড়ছিল। তাছাড়া সর্বোপরি ছিল মল্লরাজাদের বাগ্দীত্ব যার জন্য প্রতিনিয়তই অন্ত্যজ হিন্দু বা আদিবাসীদের থেকে একটা 'চ্যালেঞ্জ' আসবার সম্ভাবনা তাদের শঙ্কিত করে তুলেছিল। ফলত উচ্চবর্ণসহ সাধারণ মানুষের ওপর মল্লদের সামাজিক ও নৈতিক কর্তৃত্ব স্থাপনের ক্ষমতা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছিল নিশ্চযই। এই অবস্থায বৃহত্তর কোন শক্তির সহযোগিতা বা সমর্থন কাম্য হয়ে পড়েছিল, যাকে কাজে লাগিযে তাঁরা পৌঁছে যাবেন বৃহত্তর রাষ্ট্রব্যবস্থায়, সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে, যেখানে তাঁদের জাতিসত্তা, শাসনাধিকার নিয়ে প্রশ্নের সুযোগই থাকবেনা, পার্শ্ববর্তী স্থানীয় শক্তিগুলোও তাঁদের সামনে গৌণ হয়ে পড়বে। যাই হোক মাম সিংহ সেই সম্ভাবনাই এনে দেন, যার সুযোগ নিতে মল্লরাজারা বিন্দুমাত্র দেরিও করেননি।

সুতরাং পারস্পরিক স্বার্থের এই প্রেক্ষাপটেই মুঘল ও মল্লদের একটা অলিখিত বোঝাপড়া হয় বলে অনুমান করে যেতে পারে, যে বোঝাপড়া, মিত্রতাই, মূলত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিষ্ণুপুরের সমৃদ্ধির পেছনে কাজ করেছিল। জগৎ সিংহের অনিচ্ছা সত্ত্বেও হাম্বীর কেন আর মানসিংহ বা আকবরও কেন মল্লদের প্রতি ঔদার্য প্রদর্শন করলেন তা বোঝা যায় এই প্রেক্ষাপটে। আমরা স্মরণ করতে পারি, অনেকটা এই রকমই পারস্পরিক স্বার্থে রাজপুতদের সঙ্গেও মুঘলদের মিত্রতা গড়ে উঠেছিল, আকবরের সময়ে।

যাই হোক মুঘলরাও কিন্তু এর দ্বারা ভালোই লাভবান হয়েছিল। হাম্বীরের পূর্বসূরী ধর হাম্বীরের সময়ই মুঘলরা, আফগানদের বিরুদ্ধে অভিযানে মল্লদের সাহায্য লাভ করেছিল বলে জানা যায়। পাঠানদের বিরুদ্ধে উত্তর উড়িষ্যা অভিযানে মানসিংহের সঙ্গে সহযোগিতা করেন ধর হাম্বীর[২৩]। বীরভূম অভিযানে মুঘলদের সাহায্য করেন বীর হাম্বীর[২৪]। এরপর মল্লরা আর কোনদিনই মুঘলের কর্তৃত্ব সেভাবে অস্বীকার করেনি। অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধেও এই সম্পর্ক অব্যাহত ছিল। চিতুয়া বরদার তালুকদার শোভা সিংহের উত্তরসূরী হেমন্ত সিংহের বিরুদ্ধে মুঘলের অনুরোধে অভিযান করেন রাজা দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহ[২৫]।

আর মল্লরা? একথা ঠিক যে মুঘলের সঙ্গে একটা মৈত্রী সেভাবে গড়ে উঠবার আগে থেকেই তাঁরা ঐ অঞ্চলে মহারাজার স্বীকৃতি পেয়ে আসছিলেন,

যার জন্য মুঘলের দৃষ্টি সেখানেই পড়েছিল। তা সত্ত্বেও মুঘল মিত্রতা যে মল্লরাজাদের সমৃদ্ধি ও নূতন সম্ভাবনা এনে দেয়, সে ব্যাপারে সন্দেহ নেই, যার সূত্র ধরে সপ্তদশ শতকের শেষ পর্যন্ত মল্লদের শ্রীবৃদ্ধি ও সমৃদ্ধি ছিল প্রশ্নাতীত। সপ্তদশ শতকের প্রায় শেষ পর্যন্ত মুঘল সুবেদাররা মল্লভূমের শাসন সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ভাবে কোনই হস্তক্ষেপ করেননি। মল্লরা নিয়মিত করও দিত না। মুঘল সুবেদারেরা সনদও মাঝেমাঝেই অগ্রাহ্য করত। বস্তুত আধা-স্বাধীন শাসক হিসাবেই তারা শাসন করত[২৬]।

মান সিংহের আনুকূল্যে বীর হাম্বিরের প্রতিপত্তি ও রাজ্যসীমা দূর বিস্তৃত হয়। বিহার ও উড়িষ্যার জঙ্গলাকীর্ণ গড়জাত মহলের যে সমস্ত ছোট ছোট জমিদারী পাঠানদের অনুগত ছিল, মান সিংহের দ্বারা বিজিত হবার পর তাদের কিছু কিছু মল্লভূমের অন্তর্ভুক্ত হয়। যেমন বলা যায় পঞ্চকোট রাজ্যের কথা, বেগলার যখন এই অঞ্চলে আসেন, তখন দুয়ারবন্দ্ ও খড়িবাড়ি তোরণের উপর বীর হাম্বীরের নাম লেখা লিপি তাঁর নজরে এসেছিল[২৭]।

আবার পাণিপথের প্রথম যুদ্ধের মাত্র ৬০/৭০ বছরের মধ্যেই, বিষ্ণুপুরে কামানের প্রচলন দেখা গেল। লোহার ও কামারদের আনানো হয় এই কামান তৈরির উদ্দেশ্যে[২৮]। তবে এব কারিগরী নিঃসন্দেহে মুঘলের দান। মল্লদের শিল্প স্থাপত্যের বিশেষজ্ঞরা মুঘল রাজপুত চিত্ররীতির সংমিশ্রণ দেখেছেন। এ সবেরই মূলে ছিল মুঘল পৃষ্ঠপোষকতা[২৯]। আবার বিখ্যাত বিষ্ণুপুরী তাসের প্রচলনও অনেকে বলেন সম্রাট আকবরের মুঘল তাসের অনুকরণে হয়েছিল[৩০]। যদিও অনেকেই তা মানতে নারাজ। যাইহোক্ মল্লরাজারা 'ঘায়ের আম্লি কিল্লাজাত্ জমিন্দার'—সার্বভৌম শক্তির প্রদত্ত সনদ দ্বারা স্ব-শাসিত ভূ-স্বামীর মতই নির্দিষ্ট কর বা পেশকাশ দিয়ে বংশানুক্রমিক ভাবে রাজ্যশাসন ও কেল্লা তৈরির অধিকার প্রাপ্ত শাসকের মর্যাদা লাভ করায় তাদের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্তৃত্ব কেন্দ্রীয় শক্তির স্বীকৃতি লাভ করে[৩১]। অন্যদিকে সপ্তদশ শতকের শেষার্ধের আগে আফগানদেরও কোন সাড়াশব্দ ওই অঞ্চলে পাওয়া যায়নি। পার্শ্ববর্তী ভূম রাজ্যগুলো থেকেও আসেনি কোন আক্রমণ, তেমন কোন সমস্যা।

এইভাবে উত্তেজনামুক্ত হয়ে মল্লরা সময়ের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছিল। গড়ে তোলে অসংখ্য মন্দির, ঘটানো হয় মল্লভূমের সাংস্কৃতিক শ্রীবৃদ্ধি। এই অবকাশ, স্থিতাবস্থাই মল্লভূমের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলটা গড়ে তুলতে সহায়ক হয়, যা অন্যান্য ভূম রাজ্যগুলো থেকে বা আঞ্চলিক শক্তিবর্গের চেয়ে অধিকতর মর্যাদা ও স্বাতন্ত্র্য দেয় মল্লভূমকে। এই পরিবেশেই তৈরে হল অসংখ্য মন্দির, যা বিষ্ণুপুরকে আখ্যা দিয়েছে 'মন্দিরনগরী', যেগুলোর মধ্যে শ্যামরায়, লালজী, কালাচাঁদ, জোড়বাংলা, মদনমোহন, মুরলীমোহন, মদনগোপাল ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া

পার্শ্ববর্তী বাসুদেবগনগর, গোকুলনগর, সাব্রাকোন, রাণীয়াড়া, যাদবনগর, বৈতল অঞ্চলে একাধিক মন্দির এই ষোড়শ শতকের মধ্যভাগ থেকে সপ্তদশ শতকের মধ্যে নির্মিত হয়েছিল।

একদিকে তাই মুঘলের সঙ্গে মিত্রতাবদ্ধ হবার ফলে অর্জিত সমৃদ্ধির দ্বারা যে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল, মন্দির নির্মাণ কর্মসূচি তারা গড়ে তোলে, তার ফলে স্বাধিকাব প্রমত্ত জাতিগোষ্ঠী, তাদের সর্দার এবং পার্শ্ববর্তী ভূম রাজ্য ও জমিদার অংশগুলোর তুলনায় তারা পৃথক এবং এক স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী হযে যায়। এই স্বাতন্ত্র্য অর্জিত হবার পর বা তার পাশাপাশিই তারা ক্রমশ আঞ্চলিক সত্তাটা মুছে দিযে বৃহত্তব বাষ্ট্র ব্যবস্থার দিকে অগ্রসর হয়, নানাভাবে সেই বাষ্ট্র কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত হবার চেষ্টা করে। অন্যদিকে আবার এই বৃহত্তর শক্তির সমর্থন লাভ করে নিজেদের সামাজিক মর্যাদা, প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করে, মন্দির নির্মাণ কর্মসূচি গ্রহণ করে, নিষ্কর ভূমি দান করে, ধ্রুপদী সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষকতা করে মল্লরা ধবাছোঁযার বাইরে চলে যায়। উপজাতীয সমাজের গোষ্ঠী প্রাধান্য বা প্রভাব থেকেও মুক্ত হবার সুযোগ তারা অনেকটাই পায ফলত যে জাতিগোষ্ঠী থেকে নিজেদের উত্থান, মুঘলের সহায়তায়, পবোক্ষ সমর্থন বা প্রশ্রয়ে বৃহত্তর রাষ্ট্র ব্যবস্থার দিকে ক্রমশ তারা এগিয়ে গেলে, সেই নিম্নবর্ণের জাতিগোষ্ঠী থেকে 'চ্যালেঞ্জ'-এর সম্ভাবনা ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে পড়ে।

সূত্র নির্দেশ

১. তরুণদেব ভট্টাচার্য, বাঁকুড়া, কলি, ১৯৮২, পৃঃ ১০৩
২. প্রভাত কুমাব মুখোপাধ্যায়, **The History of Gajapati Kings of Orissa and their successors**, কলি, ১৯৫৩, পৃঃ ১১৪।
৩. বি. সি. বায়, **Orissa under the Mughals** কলি, ১৯৮১, পৃঃ ৮, যদুনাথ সবকাব, History of Bengal, দ্বিতীয় খণ্ড, ঢাকা বিশ্বাবিদ্যালয়, ১৯৪৮, পৃঃ ১৮৬
৪. তদেব, পৃঃ ১০
৫. তদেব, পৃঃ ১৪
৬. তদেব, পৃঃ ১৫
৭. তদেব, পৃঃ ১৫
৮. তদেব, পৃঃ ১৬
৯. তদেব, পৃঃ ১৯
১০. তদেব, পৃঃ ২৭-২৮
১১. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১২, পাদটীকা নং ২০৯।
১২. অভয়পদ মল্লিক, **History of Bishnupur Raj**, কলি, ১৯২১, পৃঃ ২৬, ফকির নারায়ণ কর্মকার, বিষ্ণুপুরের অমর কাহিনী, কলি, ১৩৭৪ সাল, পৃঃ ২৭।

১৩. ফকির নারায়ণ কর্মকার, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৮-২৯, ৩৭ ও ২১ (গোড়ার কথা' অধ্যায়) কিংবদন্তীগুলোর জন্য দ্রষ্টব্য, পৃঃ ১-১০

১৪. ডব্লু, ডব্লু, হান্টার, 'গ্রাম বাংলার ইতিকথা' কলি, ১৯৮৪, পৃঃ ২৯৮

১৫. রমেশচন্দ্র দত্ত, **'The Aboriginal Elements In the Population of Bengal', Calcutta Review**, ১৮৮২, No CL p 282

১৬. ডব্লু. বি. ওল্ডহ্যাম, **Some Historical and Ethnical Aspects of the Burdwan District**. কলি, ১৮৯৪, পৃঃ ১৮৫—৮৬

১৭. সুরজিৎ সিন্হা—**Tribal Politics and State Systems In Pre-colonial Eastern and North Eastern India**, কলি, ১৯৮৭, হিতেশ রঞ্জন সান্যাল, 'Mallabum', পৃঃ ৭৯

১৮. রজত রায়, **'পলাশীর ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ'**, কলি, ১৯৯৪, পৃঃ ১০৪—০৫

১৯. হিতেশ সান্যাল, পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, পৃঃ ১০৪—০৫.

২০. তদেব, পৃঃ ১০০

২১. তদেব, পৃঃ ১২০

২২. তরুণদেব ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০৩

২৩. আবুল ফজল. আকবরনামা, তৃতীয় খণ্ড, এইচ. বেভারিজ (অনুঃ) কলি, ১৯৩৯, পৃঃ ৮৭৯

২৪. মির্জা নাথান্, 'বাহারিস্থান-ই খায়েবী, প্রথম খণ্ড, এম. এল, বোরা (অনু), গুয়াহাটি, ১৯৩৬, পৃঃ ১৮ ২০, ১৩৯

২৫. অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায, **West Bengal District Gazzetteer, Bankura**, কলি, ১৯৬৮, পৃঃ ৯৮

২৬. জেমস্ লঙ, **'Selections From Unpublished Records of Government'**, মহাদেব প্রসাদ সাহা (সম্পা), ফার্মা কে. এল. এম সংস্করণ, কলি, ১৯৭৩, পৃঃ ১৩৩

২৭. তরুণদেব ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০৪—০৬

২৮. ফকির নারায়ণ কর্মকার, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৪

২৯. সাক্ষাৎকার চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, বিষ্ণুপুর শাখা, বিষ্ণুপুর, ২৫-৪-৯৪

৩০. মাণিকলাল সিংহ, পশ্চিম রাঢ় তথা বাঁকুড়া সংস্কৃতি, বিষ্ণুপুর, ১৩৮৪ সাল, পৃঃ ২০৬ ও ২০৯

৩১. এফ্. ডব্লু. রবার্টসন **'Final Report on the Survey & Settlement operations in the District of Bankura'**, কলি, ১৯২৬, পৃঃ ২৮।

সপ্তদশ শতকে বাংলায় তামার দর ও মূল্যসূচক

অনিলকুমার দাস

আলোচ্য যুগে তিন রকমের ধাতু মুদ্রা প্রচলিত ছিল— স্বর্ণমুদ্রা 'আসরফি' বা 'মোহর', রৌপ্যমুদ্রা 'রূপিয়া' এবং তাম্রমুদ্রা 'দাম'। মুদ্রাগুলো ছিল উচ্চমান সম্পন্ন। মোহর ছিল প্রায় ১০০ ভাগ বিশুদ্ধ, ওজন ১১ মাসা। রূপিয়ার ওজন ১১.৫ মাসা, তার মধ্যে সঙ্কর ধাতু ৪ শতাংশ। দাম-এর থেকে নির্দিষ্ট মানের ধাতব মুদ্রা তৈরি করে নেওয়ার 'স্বাধীনতা' প্রত্যেকের ছিল। আকবর স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্রমুদ্রার বিনিময়-হার নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। ১টি মোহর এর বিনিময় হার ছিল ৯টি রৌপ্যমুদ্রা 'রূপিয়া' এবং ১টি রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়ে পাওয়া যেত ৪০টি তাম্রমুদ্রা (দাম)[১]। আকবরের আমলে নির্ধারিত এই পারস্পরিক বিনিময়-হার জাহাঙ্গীরের শাসনের প্রথম দশ বছর পর্যন্ত মোটামুটি বজায় ছিল[২]। এর পর থেকে তাম্র ও স্বর্ণমুদ্রার রৌপ্যমূল্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে।

পূর্ব রাজস্থানের দ্রব্যমূল্যের উপর তাম্রমুদ্রার রোপ্যমূল্য বৃদ্ধির প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এস. পি. গুপ্তা এবং সিরিন মুসভি[৩]। আলোচ্য প্রবন্ধের প্রেক্ষাপট সপ্তদশ শতকের বাংলা।

সোনা-রূপার প্রায় সবটাই আসত ভারতের বাইরে থেকে বাণিজ্যিক লেন-দেনের বিনিময়ে। কিন্তু আমদানী-কৃত তামার পরিমাণ ছিল যৎকিঞ্চিৎ। তামার যোগানের মূল উৎস ছিল পূর্ব ও উত্তর আরাবল্লী পর্বতমালার ঢালে অবস্থিত খনিগুলো[৪]। যোগানের তুলনায় বেশি চাহিদা, একক প্রতি উৎপাদন হ্রাস প্রভৃতি কারণের ফলে তামার দর বৃদ্ধি পেত। যোগানের উৎস থেকে দূরত্বও দরের আঞ্চলিক তারতম্য ঘটাত[৫]। তামার দরের ওঠা-নামার সঙ্গে রোপ্যমুদ্রার যোগান ও সঞ্চালনের নিবিড় সম্পর্ক ছিল।

জাহাঙ্গীরের শাসনের প্রথম দশ বছর পর্যন্ত তাম্রমুদ্রার নির্দিষ্ট রৌপ্যমূল্য যেমন বজায় ছিল, তেমনি খাদ্যশস্যের দরও ছিল স্থিতিশীল[৬]। ১৬১৫ সালের পর থেকে তাম্রমুদ্রার রৌপ্যমূল্য উত্তররোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। চল্লিশের দশকের আগেই তাম্রমুদ্রার রৌপ্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়েছিল দেড়গুণ[৭]। এ সময়ে রূপোর অবমূল্যায়নের অন্যতম কারণ ছিল রূপোর যোগান বৃদ্ধি। ১৫৯২ থেকে ১৬৩৯

সালের মধ্যে মোগল সাম্রাজ্যে রৌপ্যমুদ্রার যোগান বাড়ে প্রায় তিনগুণ[৮]। ১৫৯৬ থেকে ১৬২৫ সালের মধ্যে বাংলায় যে পরিমাণ নূতন রৌপ্যমুদ্রার সংযোজন হয়েছিল সে তুলনায় পরের দশ বছরে যোগান বেড়েছিল আড়াই গুণের বেশি[৯]। এর ফলে একদিকে যেমন তামার দর বাড়ে তেমনি খাদ্যশস্যের দামও বেড়ে যায়। তথ্যের অভাবে বলা সম্ভব নয়, মূল্যসূচক ঠিক কতটা বেড়েছিল। তবে আগ্রায় গম ও ঘি'র[১০] এবং বাংলায় চাল ও গরুর দাম[১১] যে পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল তার উপর ভিত্তি করে বলা যায় যে, উৎপাদন বৃদ্ধি সত্ত্বেও[১২] এ সময়ে (১৬১৫-৪০) মুদ্রাস্ফীতি ঘটেছিল। ভারতের অন্যান্য স্থানেও খুব মূল্যবৃদ্ধি পেয়েছিল।[১৩]

১৬৫৮ সালের ডিসেম্বরে হুগলীর ইংরেজ কর্মচারীরা বাংলায় বিগত কয়েক বছরে খাদ্যশস্যের মূল্য তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে বলে কর্তৃপক্ষের কাছে ভাতা বৃদ্ধির দাবি জানায়। এই তথ্যের উপর ভিত্তি করে মোরল্যাণ্ড মন্তব্য করেছেন যে, ১৬৫০ থেকে ১৬৬০ এই সময়ের মধ্যে বাংলায় খাদ্যশস্যের মূল্য অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গিয়েছিল[১৪]। উপরিউক্ত প্রমাণ ছাড়া ঐ সময়ে এই অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির আর কোন তথ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে ১৬৫০ থেকে ১৬৫৯ সালের মধ্যে চিনির দাম বেড়েছিল ১৫ থেকে ২৫ শতাংশ[১৫]। এই মূল্য বৃদ্ধিকে অস্বাভাবিক বলা যায় না। বাংলায় অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছিল ষাটের দশকে। শিয়াবুদ্দিন তালিশের লেখায় এর প্রমাণ মেলে[১৬]। সমকালীন তথ্য অনুযায়ী[১৭] ষাটের দশকের প্রথমার্ধে মোগল ভারতের অন্যান্য স্থানেও মুদ্রাস্ফীতি ঘটে। বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, আভ্যন্তরীণ খনিগুলোতে প্রতি একক উৎপাদন হ্রাস পাওয়ায় ভারতের অন্যান্য স্থানের সঙ্গে বাংলাতেও তামার দর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে[১৮]। এ সময়ে বিদেশ থেকে তামার যোগানও হ্রাস পায়[১৯]। ষাটের দশকের প্রথমার্ধে তামার অভাব এতই প্রকট হয় যে, ঔরঙ্গজেব ২০.৮৮ মাসার পরিবর্তে ১৪ মাসার তাম্রমুদ্রা প্রচলন করে অবস্থার সামাল দেন।[২০] ১৬৪০ সাল থেকে ১৬৬৯ সালের মধ্যে বাংলায় তাম্রমুদ্রার রৌপ্যমূল্য বৃদ্ধি পায় ৪০ শতাংশ[২১]। ১৬৬৯ সালে বালাসোরের ইংরেজ কর্মচারীরা জানায় যে, যেখানে সাধারণত প্রতি মন তামার দাম ছিল ৩৬ থেকে ৪২ টাকা সেখানে দাম যাচ্ছে ৫০ টাকা।[২২]

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট হয় যে, তামার মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে মুদ্রাস্ফীতির সংগতি ছিল। এ সময়ে তামার দাম বাড়ার অন্যতম কারণ ছিল তামার যোগানের অভাব। এ সময়ে বাংলায় ওলন্দাজরা জাপান থেকে যে তামা আমদানী করত তার পরিমাণ ছিল খুবই কম[২৩]। সত্তরের দশকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বাংলায় জাপানী তামার বাজার বিস্তার লাভ করে। এর প্রভাবে বাংলায়

তামার বাজার দর কমতে থাকে[২৪]। স্বাভাবিকভাবে মূল্যসূচকের উপর এর প্রভাব পড়েছিল। MV-PT অর্থনীতির এই মূল সূত্রটি ধরে মূল্যসূচক বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে প্রথম সারণীতে চাল, গম, চিনি এবং ঘি'র মূল্য (১৬৫৯-১৬৯১)[২৫] এবং দ্বিতীয় সারণীতে ১৬৫৯ কে ভিত্তি বছর ধরে মূল্যসূচক দেওয়া হল।

সাবণী—১

মূল্য প্রতি সাহজাহানী মণ (১৬৫৯-১৬৯১)

১	২	৩	৪	৫
বৎসব	চাল	গম	চিনি	ঘি
১৬৫৯	০.৪৯	০.৫০	৪.০৮	৪.৫০
১৬৬১	০.৪৮	১.১১	৪.৩০	৫.০০
১৬৬২	০.৭১	১.১৩	৪.৬৩	৬.৭৪
১৬৬৫	০.২৭	০.৫১	৪.৩৩	৩.৯৫
১৬৬৬	০.৩৩	০.৯০	৩.৫৬	৬.৯০
১৬৬৯	০.৩৯	০.৬৫	৪.০০	৬.৫০
১৬৭০	০.৬৬	০.৬৩	৩.১০	৫.৭১
১৬৭৫	০.৪২	০.৬৯	৩.৯৮	৫.৩৪
১৬৮৩	০.৪২	০.৫৯	৪.৩০	৬.১৬
১৬৮৪	—	০.৫০	৪.৬১	৭.০০
১৬৮৫	০.৪৪	০.৯৯	৪.৮১	৬.৬৮
১৬৮৬	০.৫৩	০.৭৩	৪.২২	৬.০০
১৬৮৭	০.৪৯	১.১৪	৩.৭৭	৪.৬০
১৬৯১	০.৭২	০.৫৬	৪.৪৩	৫.৭১

সারণী—২

চাল, গম, চিনি ও ঘি'র মূল্যসূচক ভিত্তি বৎসর ১৬৫৯

১	২
বৎসর	মূল্যসূচক
১৬৫৯	১০০
১৬৬১	১১৩
১৬৬২	১৩৮
১৬৬৫	৯৫
১৬৬৬	১২২

১	২
বৎসর	মূল্যসূচক
১৬৬৯	১২০
১৬৭০	১০৫
১৬৭৫	১০৯
১৬৮৩	১২০
১৬৮৫	১৩৫
১৬৮৬	১২০
১৬৮৭	১০৪
১৬৯১	১১৯

ষাটেব দশকে ভাবতেব সর্বত্র রূপার মূল্য হ্রাস পায এবং সোনা ও তামার দাম বাডে[২৬]। এর ফলে মূল্যসূচক বৃদ্ধি পায। ১৬৫৯ ভিত্তি বছর অনুযাযী ১৬৬২ সালে চাল, গম, চিনি ও ঘি'র মূল্যসূচক দাঁডায ১৩৮[২৭]। ১৬৬১ সালে মূল্যসূচক ছিল ১১৩[২৮]। এক বছরে মূল্যসূচক বৃদ্ধি পেয়েছিল ২৫ শতাংশ। রূপার মূল্য হ্রাস ছাড়াও উত্তরাধিকার যুদ্ধের বিরূপ প্রতিক্রিয়া, বেশি পরিমাণ জাকাৎ ও জবরদস্তি আবওযাব আদায় এবং রাহ্‌দার ও চৌকিদারদের অত্যাচার[৩০] ইত্যাদি কারণের ফলে এই অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছিল। ১৬৬৪ সালে অবস্থার পরিবর্তন হয়। তালিশের লেখা[৩১] থেকে জানা যায় যে, প্রথমে অস্থাযী শাসক দাউদ খাঁ (২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৬৬৩—৮ই মার্চ, ১৬৬৪) এবং পরে সায়েস্তা খাঁ খাদ্যশস্যের উপর জবরদস্তি শুল্ক আদায় বন্ধ করার জন্য কঠোর নির্দেশ দেন। জববদস্তি শুল্ক ও তোলা আদায় বন্ধ হলে বাজারে খাদ্যশস্যের দাম কমে যায়[৩২]। এর ফলে ১৬৬৫ সালে মূল্যসূচক অনেক নীচে নেমে যায়[৩৩]। কিন্তু এই অবস্থা বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। অল্পদিনের মধ্যে রাহ্‌দার ও চৌকিদাররা আগের মতই জবরদস্তি করে শুল্ক ও তোলা আদায় শুরু করে দেয়। মনে হয়, ব্যক্তিগত ব্যবসায়ে[৩৪] লিপ্ত হবার পর সায়েস্তা খাঁর আগের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে যায়। ১৬৬৬ সাল থেকেই মূল্যসূচক আবার বাড়তে থাকে।[৩৫]

উপরিউক্ত কারণ ছাড়াও ১৬৬৬ সাল থেকে ১৬৬৯ সাল পর্যন্ত মূল্যবৃদ্ধির অন্য কারণও ছিল। ১৬৬৫—৬৭ এই সময়ের মধ্যে বিশেষত ১৬৬৭ সালে ওলন্দাজরা তাদের ব্যবসার জন্যে জাপান থেকে বাংলায় প্রচুর পরিমাণে রূপা আমদানী করে[৩৬]। এর প্রভাব পড়েছিল মূল্যসূচকের উপর। ১৬৬৮ সালে জাপান সরকার রূপা রপ্তানীর উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করলে বাংলায় জাপান থেকে রূপা আমদানী একরকম বন্ধ হয়ে যায়[৩৭]। রূপার যোগান হ্রাস পেলে সত্তরের

দশকে মূল্যসূচক কমতে থাকে[৩৮]। এ সময়ে তামার দর ষাটের দশকের তুলনায় কম ছিল[৩৯]। এর অন্যতম কারণ ছিল জাপানী তামা আমদানী বৃদ্ধি[৪০]। রূপার পরিবর্তে ওলন্দাজরা জাপান থেকে বাংলায় প্রচুর পরিমাণ স্বর্ণমুদ্রা কোবান[৪১] আমদানী করে (১৬৬৮—৭৫)। সত্তরের দশকের দ্বিতীয় ভাগে ওলন্দাজরা ইউরোপ থেকে বাংলায় যে পরিমাণ রূপা আমদানী করত তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল ছিল[৪২]। ইংরেজদের আমদানীকৃত রূপার পরিমাণও ছিল কম[৪৩]। এ সময় ওলন্দাজ এবং ইংরেজ উভয়েরই মূলধনের বেশিটাই ছিল সোনা[৪৪]। ১৬৭৪[৪৫] সালের পর থেকে বাংলায় রূপার দর বাড়তে থাকে[৪৬]। ১৬৬৯ থেকে ১৬৭৯ সালের মধ্যে বাংলায় মোহরের রৌপ্যমূল্য এবং তামার দর হ্রাস পায়[৪৭]

১৬৬৮ সালের পর রূপার যোগান হ্রাস পাওয়ায় টাকার অভাব দেখা দেয়। সত্তরের দশকের দ্বিতীয়ার্ধে রৌপ্যমুদ্রার অভাব আরো প্রকট হয়। সুদের হার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে[৪৮]। তাছাড়া ১৬৭৮ সালে সায়েস্তা খাঁ বিপুল পরিমাণ সোনা, রূপা এবং মোহর ও রৌপ্যমুদ্রা নিয়ে বাংলা ত্যাগ করেন[৪৯]। উপরিউক্ত কারণগুলোর জন্য রৌপ্যমুদ্রার সঞ্চালন কম হয় এবং মূল্যসূচক হ্রাস পায়। আশির দশকের গোড়ার দিকে রূপার যোগান বাড়ে[৫০] কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা কম ছিল[৫১]। উপরন্তু টাঁকশালে দেয় শুল্কের হার $১\frac{১}{২}$ শতাংশ বৃদ্ধি করার ফলে ১৬৭৯ থেকে ১৬৮২ সালের মধ্যে ইংরেজ এবং ওলন্দাজরা মুদ্রা তৈরি করার জন্য টাঁকশালে রূপা পাঠায়নি।[৫২] ১৬৮১ সালে ইংরেজরা চড়া সুদে ১,১৮০০০ টাকা ধার নেয়[৫৩]। টাঁকশালে শুল্ক সংক্রান্ত সমস্যা মিটে গেলে ১৬৮৩ সেপ্টেম্বর থেকে ১৬৮৪ মার্চের মধ্যে ইংরেজরা টাঁকশাল থেকে ১০ লক্ষ রৌপ্যমুদ্রা তৈরি করিয়ে নেয়। ওলন্দাজরাও সমপরিমাণ টাকা টাঁকশাল থেকে তৈরি করে[৫৪]। নূতন মুদ্রার সংযোজনের ফলে বাজারে সুদের হার তুলনামূলক ভাবে হ্রাস পায়[৫৫]। ফলে ১৬৮৩ সালে মূল্যসূচক ১৬৭৫ সালের তুলনায় বৃদ্ধি পায় এবং ১৬৬৯ সালের সমান হয়।[৫৬]

১৬৮৪ সালেও বাজার দরের উর্ধ্বমুখী প্রবণতা বজায় থাকে। সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বরের মধ্যে ইংরেজরা টাঁকশালে যে পরিমাণ রূপা পাঠিয়েছিল তার মূল্য ১০ লক্ষ টাকার কম নয়[৫৭]। নূতন মুদ্রার সংযোজনের ফলে বাৎসরিক সুদের হার $১৩\frac{১}{২}$ শতাংশ থেকে কমে দাঁড়ায় ১২ শতাংশ[৫৮]। ১৬৮৫ সালে মূল্যসূচক ছিল ১৩৫[৫৯]। কিন্তু পরের বছর থেকে মূল্য সূচক কমতে থাকে[৬০]। এ সময়ে মোগলদের সঙ্গে যুদ্ধ চলায় ইংরেজদের ব্যবসা-বাণিজ্য বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাছাড়া ১৬৮৪ থেকে ১৬৮৭ সালের মধ্যে ওলন্দাজদের রূপা আমদানী হ্রাস পেয়েছিল। ১৬৮৮—৮৯ সালে রূপার দর বৃদ্ধি পায় এবং সোনা ও তামার দাম হ্রাস পায়[৬১]। নব্বই-এর দশকের গোড়ায় অবস্থা একই রকম

থাকে। তামার দর পড়ে যাওয়ায় ওলন্দাজরা বাজারে তামা বিক্রি একরকম বন্ধ রাখে[৬২]। উপরিউক্ত কারণগুলোর জন্য ১৬৮৭ সালে মূল্যসূচক কমে গিয়ে দাঁড়ায় ১০৪। ১৬৯১ সালে মূল্যসূচক বৃদ্ধি পেলেও ১৬৬৯ ও ১৬৮৩ সালের সীমার নিচে ছিল[৬৩]। নব্বই-এর দশকের পরবর্তী বছরগুলোতে দামের তেমন হেরফের হয়নি[৬৪]। কিন্তু অষ্টাদশ শতকের প্রারম্ভে খাদ্যশস্যের দাম আবার বৃদ্ধি পেতে থাকে[৬৫]।

১৬৫৯ থেকে ১৬৬৯ এ সময়ে মূল্যসূচকের বাৎসরিক বৃদ্ধির হার ছিল ২ শতাংশ[৬৬]। কিন্তু ১৬৬৯ থেকে ১৬৯১ সালের মধ্যে স্বল্পকালীন হ্রাস-বৃদ্ধি সত্ত্বেও মূল্যসূচক মোটামুটি স্থিতিশীল ছিল[৬৭]। উক্ত সময়ে সুতো, সোরা ও তাফেতার দাম বিশ্লেষণ করেও একই সিদ্ধান্তে পৌঁছান গেছে[৬৮]। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ঐ সময়ের মধ্যে পূর্ব-রাজস্থানেও দামের তেমন হেরফের হয়নি।[৬৯]

মোরল্যাণ্ড[৭০] মন্তব্য করেছেন যে, সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ইউরোপীয় কোম্পানির বাণিজ্য বৃদ্ধির সুবাদে বাংলায় রূপা আমদানী বৃদ্ধি পায়। এর ফলে বাংলায় খাদ্যশস্যের দাম বাড়তে থাকে এবং ভারতের অন্যান্য উপকূলের দামের সঙ্গে সমতা আসে। ষাটের দশকের গোড়ার দিকে বাংলায় খাদ্য শস্যের দাম বাড়লেও তা মাদ্রাজের তুলনায় অনেক সস্তা ছিল[৭১]। ১৬৭০ সালে বাংলার তুলনায় আগ্রার গম ও ঘি'র দাম ছিল প্রায় দ্বিগুণ[৭২]। ১৬৭৬ সালে করমণ্ডল উপকূলে চালের দাম বাংলার তুলনায় অনেক চড়া ছিল[৭৩]। এ জন্যে মাদ্রাজ, করমণ্ডল উপকূল ও গুজরাটে বাংলার চালের চাহিদা ছিল।[৭৪]

সূত্র-নির্দেশ

১. আবুল ফজল, আইন-ই-আকবরী, ব্লখম্যান অনুদিত এবং ফিলট্ সম্পাদিত কলি. ১৯২৭, ১ম খণ্ড পৃ. ৩২-৩৩। ইরফান হাবিব, এগ্রারিয়ান সিস্টেম অফ মুঘল ইণ্ডিয়া, বোম্বাই, ১৯৬৩ পৃ. ৩৮৭ (পরে হাবিব, এগ্রারিয়ান বলে উল্লিখিত)।

২. কেম্ব্রিজ ইকনমিক হিস্ট্রি অফ ইণ্ডিয়া, ওরিয়েন্ট লংম্যান, ১৯৮৪, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬৯—৭১ (পরে সি-ই-এইচ-আই, ১ম বলে উল্লিখিত)। হাবিব, এগ্রারিয়ান, পৃ. ৩৮৭। সিরিন মুসভি, দি ইকনমি অফ দি মুঘল এম্পায়ার, সি. ১৫৯৫, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস ১৯৮৭, পৃ. ৩৬৮—৭১।

৩. এস পি গুপ্তা, সিরিন মুসভি, ওয়েটেড প্রাইস এণ্ড রেভেন্যু-রেট ইন্ডিসেস অফ ইস্টার্ন রাজস্থান (সি. ১৬৬৫—১৭৫০), আই. ই. এস. এইচ, আর, ১২, ১৯৭৫। এস পি গুপ্তা, প্রাইসেস এণ্ড রুরাল কর্মাস ইন সেভেন্টিনথ সেঞ্চুরি ইস্টার্ন রাজস্থান, পি.আই.এইচ.সি, ১৯৮২ পৃ. ২৭৩—৭৪।

৪. হাবিব, এগ্রারিয়ান পৃ. ৩৮৭।

৫. ইরফান হাবিব, মুঘল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা (১৫৫৬-১৭০৭), কলিকাতা, ১৯৮৫। পৃ. ৪১৪—১৭।

৬. লিন ছোটেন, অনুবাদ এ.সি. বারনেল, লণ্ডন, ১৮৮৫, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৪, পাইবার্ড লাভাল, অনুবাদ গ্রে এবং বেল, লণ্ডন ১৮৮৭, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২৮, সিবিন মুসভি, দি ইকনমি অফ মুঘল এম্পায়ার পৃ. ৩৬৮—৭১ তুলনীয় শেরওয়ানি, মহম্মদ কুলী কুতুবশাহ, বোম্বাই, ১৯৬৭ পৃ. ৪৭৮, বিলেশনস অফ গোলকুণ্ডা পৃ. ৬৩। ১৬১০ সালে বাংলার তুলনায় মসলিপত্তম, গোলকুণ্ডা ও গুজরাটে চালের দাম অনেক গুণ বেশি ছিল (অরস রত্নম, মার্চেন্টস, কোম্পানিস এণ্ড কমার্স অন দি করমণ্ডল কোস্ট, ১৯৮৬, পৃ. ৩৩৬)।

৭. মানবিক, লুয়ার্ড ও হস্টেন, অক্সফোর্ড, ১৯২৭, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০২, ১২৯, ১৩৬, ১৭৪। সি ই এইচ আই, ১ম পৃ. ৩৭০।

৮. আজিজা হাসান, দি সিলভার কারেন্সী আউট পুট অফ দি এম্পায়ার এণ্ড প্রাইসেস ইন ইণ্ডিয়া ডিউরিং সিক্সটিনথ এণ্ড সেভেনটিনথ সেঞ্চুরিজ, আই ই এস এইচ আর, ৬ (১), ১৯৬৯ পৃ. ৮৫—১১৬।

৯. অনিলকুমার দাস, বাংলায় পর্তুগীজ বাণিজ্য, ইতিহাস অনুসন্ধান, ৫ম, পৃ. ১৬৮—৮০। ১৫৯৫ থেকে ১৬৩২ পর্যন্ত বাংলার ব্যবসা বাণিজ্যের সিংহভাগ ছিল পর্তুগীজদের দখলে। সঞ্জয় সুব্রহ্মণীয়াম, ইম্প্রোভাইজিং এম্পায়ার, পর্তুগীজ ট্রেড এণ্ড সেটেলমেন্ট ইন দি বে অফ বেঙ্গল ১৫০০—১৭০০, অক্সফোর্ড ১৯৯০, পৃ. ৯৬—১২৭।

১০. সি ই এইচ আই, ১ম, পৃ. ৩৭৩।

১১. মানবিক ১ম, পৃ. ৫৪।

১২. অনিলকুমার দাস, আরবানাইজেশন ইন মোগল বেঙ্গল ইন দি সেভেনটিনথ সেঞ্চুরি—কেস স্টাডি অফ এ ফিউ সিটিস এণ্ড সি-পোর্টস, ২য় অধ্যায় (অপ্রকাশিত থিসিস) ১৫৯৫ থেকে ১৬৩৮ সালের মধ্যে বাংলায় জমা বেড়েছিল ৬৮ শতাংশ।

১৩. সি ই এইচ আই ১ম, পৃ. ৩৭২—৭৫; অরসরত্নম, পৃ. ৩৩৫।

১৪. ইংলিশ ফ্যাক্টরিজ ১৬৫৫—৬০ পৃ. ২৯২ (পরে ই.এফ. বলে উল্লেখিত)।
মোরল্যাণ্ড, আকবার টু ঔরংজেব, লণ্ডন, ১৯২৩, পৃ. ১৭৮—৭৯

১৫. ই. এফ. ১৬৪৬—৫০, পৃ. ৩৩৭, ১৬৫৫—৬০, পৃ. ২৯২।

১৬. শিহাবুদ্দিন তালিশ, ফথিয়া ইব্রিয়া পৃ. ৭৯খ—৮০ক, ১১০খ—১১১ক, হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৪৩—৪৪।

১৭. আলমগীরনামা, ৬০৯—১১; খাফি খাঁ, ২য়, পৃ. ৮৭, ১২৪, উদ্ধৃত হাবিব, এগ্রারিয়ান, পৃ. ১০৬; বারনিয়ের, স্মিথ, লণ্ডন, ১৯১৬ পৃ. ৪৩৩; সি ই এইচ আই, ১ম, পৃ. ৩৭৫।

১৮. জার্নাল ইন ইণ্ডিয়া, এস.এ.খান সম্পাদিত, লণ্ডন, ১৯২৭, পৃ. ১১৮—২৬, ৪১৬—১৭, ই. এফ. (১৬৬৮—৬৯) পৃ. ৩১১; তুলনীয় বৌরি, কান্ট্রিস রাউণ্ড দি বে অফ বেঙ্গল, আর.সি.টেম্পল কেম্ব্রিজ ১৯০৫, পৃ. ২৩২—৩৩, সি.ই.এইচ.আই, ১ম, পৃ. ৩৭০; হাবিব, এগ্রারিয়ান, পৃ. ৩৮৯—৯০।

১৯. মোরল্যাণ্ড, আকবার টু ঔরংজেব, পৃ. ১৮৪, হাবিব, এগ্রারিয়ান, পৃ. ৩৯০।

২০. হাদিভালা, জে.এ.এস বি, নিউ সিবিজ, ২৮, ১৯১৭ পৃ. ৬২; হাবিব, পৃ. ৩৯০।

২১. মানাবক, ২য়, পৃ. ১০২, ১৩৬, ১৭৪; মার্শাল পৃ. ১১৮—২৬, ৪১৬—১৭।

২২. ই. এফ. (১৬৬৮—৬৯), পৃ. ৩১১।

২৩. গ্লাম্যান, দি ডাচ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী'স ট্রেড ইন জাপানীস কপার ১৬৪৫—১৭৩৬, স্কান্দিনেভিয়ান ইকনমিক হিস্ট্রি রিভিউ, ১ম, ১৯৫৩, পৃ. ৫১—৫৩।

২৪. ওম প্রকাশ, ডাচ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এণ্ড দি ইকনমি অফ বেঙ্গল ১৬৩০—১৭২০, দিল্লী, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৮, পৃ. ১৩৪—১৪০।

২৫. ই.এফ ১৬৫৫–৬০; হেজেস ডায়েবি, আব, বাবলো এবং এইচ.ইউল সম্পাদিত, লণ্ডন, ১৮৮৭—৮৯, ১২ পৃ. ৭৫; উইলসন, আবলি এনালস অফ দি ইংলিশ ইন বেঙ্গল, কালকাতা, ১৮৯৫, ১২. পৃ. ৩৭৯—৮০, ৩৯২; ওমপ্রকাশ, পৃ. ২৫২—৫৩।

২৬. কে. এন. চৌধুবী, ট্রেডিং ওয়ার্ল্ড অফ এশিয়া এণ্ড দি ইংলিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ১৬৬০–১৭৬০, কেম্ব্রিজ, ১৯৭৮, পৃ. ১৭৭; অনিল কুমাব দাস, অপ্রকাশিত থিসিস, ১২ পবিচ্ছেদ; ফ্লাকচুয়েশন অফ সিলভাব প্রাইস অফ গোল্ড মোহব—ইটস ইম্প্যাক্ট অন ট্রেড এণ্ড কমার্স ১৬৬০—৯০, প্রসিডিংস অফ ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি কংগ্রেস, ১৯৮৮, পৃ. ২৬৬ ৭৬, তুলনীয় এবসববত্নম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০১, ৩৪১–৪২, ১৬৫৪ থেকে ১৬৭০ এব মধ্যে কবমণ্ডলে বৌপামূল্য হ্রাস পাওযাব ফলে তামাব দাম বাড়ে ৪০ শতাংশ।

২৭. সাবণী ২।

২৮. ঐ।

২৯. ১৬৬১ সালে নূতন বৌপামুদ্রাব সংযোজনেব প্রভাব পড়েছিল বাজাবেব উপব। ঐ বছব ওলন্দাজেবা টাকশাল থেকে ৮,৮০,০০০ বৌপামুদ্রা তৈবি কবিযে নেয় (ওমপ্রকাশ, পৃ. ৯২)

৩০. তালিশ, পৃ. ৭৯খ, ৮০ক, ১১০খ, ১১১খ।

৩১. ঐ

৩২. সাবণী—১।

৩৩. সাবণী—২।

৩৪. ১৬৬৬ সালে শায়েস্তা খাঁ ওলন্দাজদেব কাছ থেকে রূপা কিনতে চান কিন্তু তাবা সে প্রস্তাবে বাজি হযনি (ওমপ্রকাশ পৃ. ৯২)।

৩৫. সাবণী—২।

৩৬. ওমপ্রকাশ, পৃ. ৬৩, ৬৬।

৩৭. ঐ পৃ. ১২৮; অনিলকুমাব দাস, পূর্বে উল্লিখিত অপ্রকাশিত থিসিস অষ্টম পরিচ্ছেদ।

৩৮. সাবণী—২।

৩৯. মাস্টাব ডায়েবি, টেম্পল, ১ম, পৃ. ৪৪১; ওমপ্রকাশ, পৃ. ১৩৪।

৪০. ওমপ্রকাশ. পৃ. ১৩৪।

৪১. কোবান জাপানেব স্বর্ণমুদ্রার নাম। ১৬৯৫ পর্যন্ত এব ওজন ছিল ১৭·৭৬৮ গ্রাম। এর মধ্যে সোনা ৮৫.৬৯%, রূপা ১৪.২৫% এবং মিশ্র ধাতু ০.০৬% (ঐ পৃ. ২৬৮)।

৪২. অনিলকুমার দাস, অপ্রকাশিত থিসিস, ৮ম পরিচ্ছেদ।

৪৩. ঐ।
৪৪. ঐ।
৪৫. ১৬৭৪ সালে ওলন্দাজদেব সোনা ও রূপা আমদানীব অনুপাত ছিল ৯০.৪ : ৯.৬ (ওমপ্রকাশ পৃ. ৬৭)।
৪৬. অনিলকুমাব দাস, পূর্বে উল্লিখিত অপ্রকাশিত থিসিস, অষ্টম পবিচ্ছেদ।
৪৭. অনিলকুমাব দাস, ফ্লাকচুয়েশন অফ সিলভাব প্রাইস অফ গোল্ড মোহব, প্রসিডিংস হিস্ট্রি কংগ্রেস, ১৯৮৮, পৃ. ২৬৬—৭৬।
৪৮. ১৬৭৬ সালে সুদেব সর্বোচ্চ হাব ছিল ১৫%। ১৬৭৯ সালে এই হাব বেড়ে দাঁড়ায ১৮% (মাস্টাব, ১ম, পৃ. ১৩৭; উইলসন, আবলি এনালাস, ১ম, প. ৩৮২)।
৪৯. অনিলকুমাব দাস, অপ্রকাশিত থিসিস, নবম পবিচ্ছেদ।
৫০. গ্লাম্যান, ডাচ এশিয়াটিক ট্রেড পৃ. ৬২—৩, ৬৯।
৫১. ই.এফ., ১৬৭৮—৮৪, ২য, পৃ. ১৬৮, ২১৮—১৯, ২৫৪, ২৩১।
৫২. অনিল কুমাব দাস, অপ্রকাশিত থিসিস, নবম পবিচ্ছেদ।
৫৩. হেজেস ডাযেবি, ২য, পৃ. ৪৫ —
১৬৮৩ সালে (অক্টোবব) ইংবেজদেব ঋণেব পবিমাণ ছিল ৩½ লক্ষ টাকা (হেজেস, ১ম, পৃ. ৮৩)।
৫৪. ই.এফ. ১৬৭৮—৮৪, পৃ. ৩৩৯, ৩৪৫, ৩৫৮।
৫৫. ঐ; ১৬৮৩ সুদেব হাব ছিল ১৩½%
৫৬. সাবণী—২।
৫৭. ই.এফ. ১৬৭৮—৮৪, পৃ. ২৫৪, ২৬১।
৫৮. ঐ।
৫৯. সাবণী—১।
৬০. ঐ।
৬১. ওমপ্রকাশ, পৃ. ১৩৭।
৬২. ঐ।
৬৩. সাবণী -২।
৬৪. ওমপ্রকাশ, পৃ. ২৫২—৫৩।
৬৫. ঐ; অনিরুদ্ধ বায়, ফবাসীদেব চোখে অষ্টাদশ শতাব্দীব প্রথমে বাংলা (মধ্যযুগেব ভাবত বিভাগে প.ব. ইতিহাস সংসদেব একাদশ বার্ষিক সম্মেলনে পঠিত প্রবন্ধ)।
৬৬. সাবণী- ২
৬৭. ঐ
৬৮. অনিলকুমাব দাস, প্রসিডিংস্ অফ হিস্ট্রি-কংগ্রেস, ১৯৮৮, পৃ. ২৬৬—৭৬।
৬৯. এস.পি.গুপ্তা ও সিরিন মুসভি, পূর্বে উল্লিখিত, ১৮৩—৯৪।
৭০. মোবল্যাণ্ড, আকবব টু ঔবংজেব, পৃ. ১৭০—৮০।
৭১. ই.এফ. ১৬৬১—৬৪, পৃ. ৬৫।
৭২. সাবণী- ১; সি.ই.এইচ আই, ১ম, পৃ. ৩৭৩।
৭৩. অরসরত্নম, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৩৩৬—৩৭।
৭৪. অনিলকুমাব দাস, পূর্বে উল্লিখিত অপ্রকাশিত থিসিস, চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

গ্রাম শ্রীপুর, হুগলী : আঞ্চলিক ইতিহাসের একটি অধ্যায়

অমলা দাস

ভাগীরথী নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত শ্রীপুর একটি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ গ্রাম। গ্রামটি হুগলী জেলার বলাগড় থানার অন্তর্গত। প্রসিদ্ধির অন্যতম কারণ হ'ল, রঘুনন্দন মিত্র মুস্তৌফী কর্তৃক শ্রীপুর প্রতিষ্ঠা এবং তৎকালীন সমাজ ধর্ম ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তার। শ্রীপুরের অতীতের সাক্ষ্য বহন করছে মূলত মিত্র মুস্তৌফী বংশ। অতীতের সেই ঐতিহ্যকে অবলম্বন করেই আজকের শ্রীপুর পরিচিতির একটি স্বক্ষেত্র তৈরি করে নিয়েছে।

সমগ্র বঙ্গদেশের মধ্যে মুস্তৌফী বংশ একটি প্রাচীন ও অতি সম্ভ্রান্ত দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থ বংশ। তবে এই পদবীর মিত্রটি জাতিগত অর্থাৎ আসল পদবী মিত্র এবং মুস্তৌফীটি নবাবী আমলের পেশাগত উপাধি।

বঙ্গদেশে মিত্র বংশের প্রতিষ্ঠাতা হলেন কালিদাস মিত্র।

কালিদাস মিত্র থেকে সপ্তদশ পর্যায়ে রাজীব মিত্রের পুত্র মোহনের বংশই উলার বিখ্যাত "মুস্তৌফী" বংশ।

মোহন মিত্রের পুত্র রামেশ্বর মিত্র শায়েস্তা খাঁর শাসনকালে (১৬৬৪—১৬৮৯) ঢাকার রাজকার্যে নিযুক্ত হন। সংস্কৃত, পারস্য ও আরব্য ভাষায় তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। নিজ প্রতিভাবলে এক সময় তিনি মুস্তৌফী দপ্তরের সর্বময় কর্তা হয়ে ওঠেন।

ঔরঙ্গজেব বিভিন্ন কাজে তাঁর দক্ষতা, আরব্য ও পারস্য ভাষায় অগাধ পাণ্ডিত্য দেখে প্রীত এবং মুগ্ধ হন। ফলে ১৭০৪ খৃস্টাব্দে তিনি রামেশ্বরকে "মুস্তৌফী" উপাধি দেন। সেই সঙ্গে মূল্যবান খেলাত ও বঙ্গের নানা স্থানে জায়গীর প্রদান করেন।

মুর্শিদকুলির আমলেই মুস্তৌফীদের সামাজিক প্রতিপত্তি বিস্তার লাভ করে। সেইসময় যাঁরা নায়েব, কানুনগো বা মুস্তৌফীর পদে বহাল ছিলেন তাঁরা দোর্দণ্ড প্রতাপে সমাজে কর্তৃত্ব করেছেন।

উইলসনের অভিধানে মুস্তৌফী পদবীর অর্থ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, মুস্তৌফী হচ্ছে হিসাবপত্রের পরীক্ষক এবং মহমেডান সরকারের অধীন কালেক্টর অথবা কৃষকদের খাজনা আদায়কারী পরীক্ষক অফিসের সর্বপ্রধান বিভাগীয় অফিসার বা আধিকারিক।

উলার মিত্র মুস্তৌফী বংশের প্রতিষ্ঠাতা হলেন রামেশ্বর মিত্র। যাঁর পরিচয় ইতোপূর্বে দেওয়া হয়েছে। উলার মুস্তৌফী বংশের অপর দুটি শাখা হল হুগলী জেলার শ্রীপুর এবং সুখড়িয়া।

রামেশ্বরের জ্যেষ্ঠপুত্র রঘুনন্দন। ইনিই হলেন মুস্তৌফী বংশের শ্রীপুর শাখার প্রতিষ্ঠাতা। সম্ভবত তিনি প্রথমে ঢাকায় ও পরে মুর্শিদাবাদে পিতার অধীনে নবাব সরকাবেব কানুনগো দপ্তরে দেওয়ানীর কাজ কবতেন। কিন্তু তাঁর মতি ছিল ধর্মে কর্মে। তাই দেওয়ানীর কাজ বেশিদিন কবেননি। যদিও সংস্কৃত, পার্সী ভালোই জানতেন, কিন্তু খ্যাতি অর্জন করেছিলেন সিদ্ধ মহাপুরুষ হিসাবে। উলায় থাকাকালীন তিনি কুলগুরুর থেকে দীক্ষা নিযে ধর্মকর্মে মন দেন।

রামেশ্ববেব মৃত্যুর পর রঘুনন্দন ১৭০৭ খৃস্টাব্দে, উলা ত্যাগ করে পূর্বতন জেলা বর্ধমানেব পরগণা বাযপুরের অন্তর্গত ভাগীরথী তীবস্থ ভূতপূর্ব বেণীপুর থানার অধীন শ্রীপুর গ্রামে গঙ্গাতীবে বাস করেন। এপারের নাম তখন আঁটিশেওড়া। রামেশ্বরেব অপব পুত্র অনন্তবাম শ্রীপুরেব কিছু দূরে সুখড়িয়া গ্রামে বাস করেন। উলার মিত্রমুস্তৌফী বংশ এইভাবে হুগলী জেলার শ্রীপুর ও সুখড়িয়ায় এসে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। এইসব অঞ্চল তখন প্রধানত বাঁশবেড়িযাব রাজাদের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

শ্রীপুরেব অনতিদূরে হাট গোবিন্দগঞ্জের গঙ্গাতীরবর্তী এলাকায বৈষ্ণবদের একটি আখড়া ছিল। একসময এলাকাটিতে বৈষ্ণবধর্মের জোয়ার বযে গিযেছিল। কিন্তু রঘুনন্দন আসার পর তা স্তিমিত হযে পড়ে, কারণ তিনি ছিলেন শক্তির সাধক। তাই তিনি বৈষ্ণব যুগের প্রাচীন নাম পরিবর্তন করে নতুন নামকরণ করেন শ্রীপুর (১১১৮ সাল, ১৭০৭ খৃস্টাব্দে)। রঘুনন্দন কর্তৃক শ্রীপুর প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর এই স্থানের ধর্মের ক্ষেত্রে একটি নতুন মোড় নিল। প্রাধান্য পেল রঘুনন্দনকৃত শাক্তধর্ম। রঘুনন্দন পুরোপুরি বৈষ্ণবধর্মের অবলুপ্তি না ঘটিয় কুলদেবতা হিসাবে গোবিন্দজিউকে প্রতিষ্ঠা করেন। পরে তিনি অনেক শিবমন্দির তৈবি করে শিবলিঙ্গও প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ফলে বৈষ্ণব, শাক্ত এবং শৈব এই তিনের সম্মিলিত ধর্ম সমন্বয় লক্ষ করা যায় এই গ্রামাঞ্চলটিতে।

শ্রীপুর সেই সময় বাঁশবেড়িয়ার রাজাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বাঁশবেড়িয়ার তদানীন্তন রাজা রঘুদেব রায় রঘুনন্দনকে ৭৫ বিঘা মহাত্তরাণ ভূমি দিয়েছিলেন। সেই ভূমি প্রাপ্ত হয়ে উলার অনুসরণে রঘুনন্দন শ্রীপুরে গড়ে তুললেন গড়বেষ্টিত বাড়ি, দীঘি, চণ্ডীমণ্ডপ এবং অন্যান্য দেবালয়াদি। এখন পর্যন্ত উলার বাড়ির অনুকরণেই শ্রীপুরে পূজাপার্বণ হয়ে চলেছে।

শ্রীপুর গ্রামে ৭৫ বিঘা মহাত্তরাণ পাবার পর রঘুনন্দন আশপাশের জমিগুলি একে একে ক্রয় করতে থাকেন। তাছাড়াও নদীয়াধিপতি কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে বিশেষ

সন্তাব থাকার সুবাদে ১১৩৭ সালের ১৬ই ভাদ্র তারিখের একখানি দানপত্র দ্বারা রঘুনন্দনকে গঙ্গার পূর্ব কূলে পলাশি, বেলেগাঁ, কলিকাতা ও হাবেলিশহর পরগণায় বাগান করার জন্য ৩০ বিঘা নিষ্কর ভূমি দান করেছিলেন। রঘুনন্দন মিত্র মুস্তৌফীকে কৃষ্ণচন্দ্র কর্তৃক প্রদত্ত যে তায়দাদখানি পাওয়া যায় তার আলোকচিত্রটি নিম্নরূপ—

শ্রীরাম শরণং

সুহৃৎশুচন্দ্র শর্ম্মণঃ

সকল মঙ্গলালয় শ্রীযুক্ত রঘুনন্দন
মুস্তৌফী সদন্তকরণেষু পরমশুভাশীঃ
শিবং বিজ্ঞাপনঞ্চ বিশেষঃ——আমাব
অধিকারে ৵পূর্বে কুলেসেওয়ায
পলাশী বেলগ্রাম কলিকাতা ও হাবিলিসহর
পরগণা বাগ কাঁরিতে জঙ্গল ভূমি ৩০ বিঘা
লাযেক দিলাম চাবা আর্জিযা বাগ করিযা ভাগ করহ।
বাজস্ব মাফ ইতি সন ১১৩৭ ১৬ই ভাদ্র।

সাধক হিসাবে রঘুনন্দনের যেমন খ্যাতি আছে তেমনি শ্রীপুরের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবেও তিনি শ্রীপুরবাসীর কাছে চিরস্মরণীয় হযে আছেন। তিনি উলার মুস্তৌফী বাটীর অনুকরণে শ্রীপুরে যে বাড়ি, দীঘি জলাশয দেবালযাদি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সঙ্গে সঙ্গে সেগুলির সুরক্ষার ব্যবস্থাও করেছিলেন। বর্গীদের ঘনঘন আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য তিনি মুস্তৌফী বাড়ির পুরো জাযগাটাই পরিখা এবং দীঘির দ্বারা বেষ্টিত করে রেখেছিলেন। গড়ের উত্তব দিকের কোনও এক জায়গায রঘুনন্দন ১০৮টি শালগ্রামশিলা প্রোথিত করে মুস্তৌফী বাড়ির বন্ধনের ব্যবস্থাও করেছিলেন।

রঘুনন্দন ১৬৬১ শকাব্দে (১১৪৬ সাল, ১৭৩৮ খৃস্টাব্দে) মৃত্যুমুখে পতিত হন। মৃত্যুর সময় রঘুনন্দন তাঁর ৭টি পুত্র, ১৮টি পৌত্র এবং ২২টি প্রপৌত্র রেখে যান। তাঁর পুত্রদের নাম—বিজযরাম, জানকীরাম, লক্ষ্মীরাম, সুন্দররাম, আনন্দরাম, কেশবরাম ও কনকরাম। পুত্রদের জন্য তিনি কয়েকটি জমিদারী রেখে যান এবং দেবত্র সম্পত্তি আলাদা ভাগ করে দিয়ে যান। শ্রীপুরের মুস্তৌফী বংশ উলা ও সুখড়িয়ার বংশ অপেক্ষা বহুবিস্তৃত। এই বংশে অনেক কৃতি সন্তান জন্মগ্রহণ করেছেন।

বলাগড় থানার অন্তর্গত শ্রীপুরের ধর্মীয় সংস্কৃতি প্রধানত দেবালয়গুলিকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। এখানকার মন্দিরগুলি বাংলার প্রাচীন স্থাপত্যরীতির গৌরবময় নিদর্শন। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে "বাংলারীতি"

বলে রাঢ়ের যে মন্দির স্থাপত্যরীতি গড়ে উঠেছিল ও বহির্বঙ্গেও জনপ্রিয় হয়েছিল, সেই বাংলারীতিতেই এই মন্দিরগুলি নির্মিত।

শ্যামাকোঠা, দক্ষিণদ্বারী ও পঞ্চচূড় বিশিষ্ট কয়েকটি শিবমন্দির, গোবিন্দজিউর মন্দির, পরিখা, দ্বিতল নহবৎখানা, রাসমঞ্চ, দোচালা চণ্ডীমণ্ডপ এগুলি বিশেষভাবে উল্লেখের দাবিরাখে। দোচালা চণ্ডীমণ্ডপটি প্রাচীন কারুকলা ও কারিগরির উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। এই মন্দিরটি হুবহু উলার বাড়ির অনুকরণে তৈরি। বাংলাদেশের প্রাচীন তক্ষণ শিল্পের নির্দশন হিসেবে এই ধরনের চণ্ডীমণ্ডপ অত্যন্ত বিরল। হুগলী জেলার মধ্যে শ্রীপুর এবং আঁটপুরের মিত্রদের বাড়ির মণ্ডপ এই দুটি মাত্র লক্ষ করা যায়। বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি, পৌরাণিক চিত্র কড়িকাঠে ও ফ্রেমের উপর খোদাই করা আছে। চালের নীচের বিভিন্ন অংশে নানা রঙের সরু বাঁশের শলার চিক অতিসূক্ষ্ম বেতের সুতো দিয়ে বাঁধা আছে লক্ষ করা যায়।

এখানকার আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য উৎসব হল রাসমেলা। শ্রীপুরের বারোয়ারি গৃহে রাসপূর্ণিমা থেকে তিনদিন কার্তিক-গণেশসহ জগদ্ধাত্রীর মূর্তি গড়ে গ্রামবাসীগণ পূজা করেন। শ্রীপুবের অন্যতম সাংস্কৃতিক উৎসব হ'ল এই রাসমেলা। প্রতিবছরই গ্রামবাংলার মানুষ মেলা উপলক্ষ্যে. মিলনোৎসবে মেতে ওঠে। তবে এই পূজা বা উৎসবের প্রচলন কবে থেকে হয়েছিল তার সঠিক সময়কাল পাওয়া যায় না।

প্রবাদ আছে যে নদীয়াধিপতি কৃষ্ণচন্দ্রের সময় থেকে বঙ্গদেশে বারোয়ারি পূজা ও সেই সঙ্গে আমোদ প্রমোদের প্রচলন হয়েছে। কিন্তু ১৮৪৬ খৃস্টাব্দে "কলিকাতা রিভিউ" পত্রে চাকদহের বর্ণনাস্থলে লেখা আছে যে, "বারোয়ারি পূজা সর্বপ্রথম ১৭৯০ খৃস্টাব্দে গুপ্তিপাড়ার কতিপয় ব্রাহ্মণ কর্তৃক প্রবর্তিত হয়। গুপ্তিপাড়ার অনুকরণে উলা, চাকদহ ও শ্রীপুরে বারোয়ারি প্রবর্তন হইয়াছে।

ধরে নেওয়া হয় রঘুনন্দনই এই রাস উৎসবের প্রতিষ্ঠাতা। রাস উৎসব কবে রাসমেলায় পরিণত হয়েছিল তাও যুক্তিনির্ভর। সম্ভবত রঘুনন্দন বা তাঁর পরবর্তী বংশধরদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ও এক্তিয়ারে বিন্দুবাসিনী পূজার প্রবর্তন হয়। পরবর্তীকালে শ্রীপুর সংলগ্ন বিভিন্ন গ্রামের মিলিত উদ্যোগে এই পূজা হস্তান্তর হয়। রাস উৎসবে বৈষ্ণব ভাবধারার সঙ্গে বিন্দুবাসিনী পূজার শাক্ত ভাবধারার সমন্বয়-সাধনের উদ্দেশ্যে মনে হয় কোন মহৎ জ্ঞানী উদার মনোভাবাপন্ন ব্যক্তি বা সমষ্টি এই দুই অনুষ্ঠানের মধ্যে সংযোগ ঘটান। যার ফলশ্রুতি স্বরূপ জন্ম নেয় সপ্তগ্রাম শিব বারোয়ারি রাসমেলা।

মুস্তৌফীদের অনেকেই শ্রীপুর শাখা থেকে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়লেও রঘুনন্দনের সাতপুত্রের বংশধর শ্রীপুরে এখনও বিদ্যমান। শ্রীপুরের শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্প এবং অন্যান্য উন্নয়নমূলক দিকগুলি বর্তমানে একটি নির্ভরযোগ্য জায়গায় এসে পৌঁছেছে। এক্ষেত্রে শ্রীপুরের মুস্তৌফীদের অবদান অনেকটাই।

বাংলার কুলপঞ্জিকায় ইউরোপীয়দের প্রসঙ্গ

শ্রাবণী বসু

আমাদের দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপে যেমন পঞ্জিকা দেখা আবশ্যক হয়, পঞ্জিকায় যেমন অতি সংক্ষেপে প্রত্যেক দিনকৃত্য ও অনুষ্ঠানাদি লেখা থাকে, সেই রকম প্রত্যেক পরিবারের, প্রত্যেক ব্যক্তির অংশ, বংশ ও করণীয় সামাজিক কুলনিয়মাদি যাতে লেখা হত তাকেই কুলপঞ্জিকা বলা হয়।[১]

কুলপঞ্জিকা মাত্রই নির্ভুল, ঐতিহাসিক ভিত্তি সম্পন্নতা নয়। কুলশাস্ত্র ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত কিনা এবং বাংলার প্রাচীন ইতিহাসের উপাদান হিসাবে এর মূল্য কি? এই প্রশ্নের উত্তরে নগেন্দ্রনাথ বসু, রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন—ঘটক উপাধিধারী এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বিভিন্ন স্থানে ও কালে এই গ্রন্থ রচনা করতেন, তাঁদের বংশধরেরা এই গ্রন্থের রক্ষনাবেক্ষণ ও আবশ্যকমত পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেছেন। পরবর্তী লেখকরা যে কেবল নতুন নাম ও বংশাবলী যোগ করেছিলেন তা নয়, অনেক সময় অজ্ঞতাবশত পুরোনো পুথি নকল করতে ভুল করেছেন কিংবা নতুন তথ্য সংযোগ করেছেন[২]। অপণ্ডিত কুলজ্ঞরা স্বার্থে ব্যাঘাত হলে তাদের জাতীয় কর্তব্য ভুলে অনেক সময় কুলে কলঙ্ক আরোপ করার চেষ্টা করেছেন[৩]।

অনেক সময় কুলগ্রন্থের প্রাচীনতা ও সময়কাল নিয়ে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে কৃত্রিম উপায়ে লেখা কাগজের উপর অ্যাসিড দিয়ে বালির নীচে রেখে অনেক পুঁথি নকল করা যায় যা দেখতে ঠিক পুরনো পুথির মত[৪]। তিনি কুলগ্রন্থের যেগুলো প্রাচীন ও প্রামাণিক বলে পরিচিত, ঐতিহাসিক উপাদান হিসাবে তাদের ব্যবহারেরও নানা অসুবিধার কথা উল্লেখ করেছেন, কারণ এই সব পুথি কোথায়, কার কাছের থেকে পাওয়া গেছে, পুথির সময়কাল, ভাষা ইত্যাদির বিবরণ, বর্তমানে এইসব পুথি কোথায়, কার কাছে রক্ষিত আছে তার সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না। ফলে অনেক কুলগ্রন্থের আর সন্ধান পাওয়া যায় না।[৫]

এইসব কারণে অক্ষয়কুমার মৈত্র, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রমাপ্রসাদ চন্দ প্রমুখ ঐতিহাসিকেরা কুলশাস্ত্রের ঐতিহাসিকতার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন। অন্যদিকে নগেন্দ্রনাথ বসু, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, দীনেশচন্দ্র সেন প্রমুখ ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিকরা কুলশাস্ত্রকে ঐতিহাসিক প্রমাণ রূপে গ্রহণ করে বহু সামাজিক ইতিহাস রচনা করেছেন।[৬]

কুলশাস্ত্রের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন, কুলশাস্ত্রে যে সমুদয় ঐতিহাসিক ঘটনা আছে তা সত্য কিনা এবং বিশ্বাসযোগ্য কিনা এই যুক্তির উপর ভিত্তি করে মেনে নিতে হবে[৭]। অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় বলেছেন, রচয়িতারা কুলজী গ্রন্থের মধ্যে তথ্য ও অতথ্য দুইই সংগ্রহ করেছেন[৮]। বিভিন্ন কুলজীগ্রন্থের প্রাচীন পুথি সংগ্রহ করে তাদের উক্তির তুলনামূলক বিচার করে, অন্যান্য সূত্রের সাক্ষ্য দিয়ে কুলজীগ্রন্থের উক্তিকে যাচাই করে নিলে তবেই কুলজীগ্রন্থগুলিকে গবেষণার কাজে সার্থকভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হবে[৯]। কুলজী গ্রন্থের মধ্যে অনেক অকৃত্রিম তথ্য পাওয়া যায় বলে তিনি উল্লেখ করেছেন[১০]। দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের নাম এবিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, তিনি প্রাচীন কুলজী গ্রন্থের হাতে লেখা পুথি থেকে অজস্র সংবাদ আহরণ করেছেন ও প্রবন্ধ রচনা করেছেন। অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য সম্বন্ধে বলেছেন, কুলজী গ্রন্থ থেকে যে সব সংবাদ তিনি আহরণ করেছেন তাদের গুরুত্ব কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না।[১১]

আমার আলোচনার বিষয় হল বাংলার কুলজীগ্রন্থের থেকে ইউরোপীয়দের সম্বন্ধে কতটা জানা যায় এবং তারা সেই সময় বাঙালি সমাজের উপর কতটা প্রভাব ফেলেছিল। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে রচিত কুলপঞ্জিকায় ইউরোপীয় বিশেষত পর্তুগীজদের ফিরিঙ্গি হার্মাদ নামে সনাক্ত করা হয়েছে, তবে সেই সময়ের ইউরোপীয়দের কথা বলতে গেলে সেই সময়ের রাজনৈতিক-সামাজিক পরিস্থিতি আলোচনা করা দরকার। এই সময়ে মুসলমান শাসনের প্রথম আঘাত শেষ হবার পর মুসলমানদের সঙ্গে সামাজিক মেলামেশা, চিন্তাধারার আদান-প্রদান লক্ষ করা যায়। বিশেষ করে নিম্নবর্ণের মানুষরা সুফী প্রভাবে একটা মিশ্র-ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন যা লৌকিক ধারায় মিশে গেছে। বাংলাদেশ সত্যপীর-সত্যনারায়ণ হিন্দু মুসলমানেরই উপাস্য। বাংলার বাউল ও জিকির বলে যে সব মণ্ডলী তাদের না বলতে পারা যায় কোন জাতি, না কোন সম্প্রদায়, তারা না মুসলমান, না হিন্দু। ময়মনসিংহের পূর্বভাগে জিকির জাতি বসবাস করে। এই দুই শ্রেণীর মধ্যে হিন্দু-মুসলমান ধর্মের গোড়ামি নেই। খানিক বৈষ্ণব, খানিক সূফীভাবে এঁরা অনুপ্রাণিত[১২]। এই কথা কুলজী গ্রন্থে উল্লেখ নেই। কারণ কুলজী গ্রন্থ হচ্ছে উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়ের বিবৃতি। এই সমাজ তখন অত্যন্ত অন্তর্মুখী ও সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে। এরা বিদেশী আক্রমণের ভয়ে ভীত কারণ তাদের আভিজাত্য ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। এই কারণে এরা যবনদেরকে বহিরাগত অত্যাচারী শাসকগোষ্ঠী বলে চিহ্নিত করেছে। এমন কি পরবর্তীকালে যে কোন বহিরাগতকেই তারা একই ভাবে চিহ্নিত করেছে ফলে তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে যবন ও ইউরোপীয়রা একই হয়ে যাচ্ছে।

যবনদের অত্যাচার সম্বন্ধে লঘু জাতি চন্দ্রিকায় উল্লেখ আছে। সম্রাট শাজাহানের সময় সৌলুকবংশের কিছু বণিক উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ থেকে এসে বাংলার সমাজে মিশে যায়। লঘু জাতি চন্দ্রিকায় উল্লেখ আছে—

রাজদণ্ডভয়াদ্বিপ্র জগ্রাহ জবনাদ্ধনং।
অসৎ প্রতি গ্রহাদাসন প্রায়স্তে হততেজসঃ॥
ক্ষত্রিয়াশ্চ মহামানং প্রাপুস্তস্মাৎ মহীভৃতঃ।
পাণিগ্রহে দদুঃ কেচিৎ ক্ষত্রিয়া পাপবুদ্ধয়ঃ॥
তস্মৈ যমনরাজ্ঞে বৈ স্বসারঞ্চসুতাং তথা।
এবং যমন সম্পর্কাৎ যমনত্বং প্রাপ্র দিয়ে॥
এবং বিপ্রাঃ ক্ষত্রিয়াস্ববৈশ্যাশ্চ হত তেজসঃ॥

অর্থাৎ মুসলমান নরপতিদের দণ্ডভয়ে ব্রাহ্মণরা মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। ক্ষত্রিয়রা নিজের বোন, মেয়েদের মুসলমানদের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে মুসলমান সংস্পর্শে মুসলমান প্রাপ্ত হলেন। প্রভাবে পূর্বতন বহু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যরা তেজহীন হয়ে পড়েন[১৩]। বৈদিক কুলার্ণবের ষষ্ঠ অধ্যায়ে লেখা আছে—আখনা গ্রামে চণ্ডীদাসের ছোট ছেলে গঙ্গেশের রূপে আকৃষ্ট হয়ে হাজি নামে জনৈক প্রতাপশালী মুসলমান নিজের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেবার জন্য তাকে মুসলমান ধর্মে ধর্মান্তরিত করেন[১৪]। বৈদিক কুলদীপিকায় আখরাবাসী অন্যান্য ব্রাহ্মণদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে হাজি যবন আখরাবাসী একজন ব্রাহ্মণকে বলপূর্বক মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করেন, ফলে ব্রাহ্মণরা হাজির ভয়ে ভোজেশ্বরে গিয়ে বসবাস করেন।

গঙ্গেশা খ্যস্তৃতীয়োহভূদ রূপেন মদনোপমঃ।
তস্মৈ তু স্বসুতাং দাতুং হাজিনা যবনীকৃতঃ॥
নারায়ণাত্মজঃ শ্রীমান ধ্রুবানন্দো মহামতিঃ।
হাজি ভয়ে সমুৎপন্নে ভয়াদ ভোজেশ্বরং গতঃ॥[১৫]

যবনদের অত্যাচারের মত ফিরিঙ্গিদের অত্যাচারের কথাও বঙ্গীয় কুলপঞ্জিকায় উল্লেখ আছে। কুলপঞ্জিকায় নারী, পুরুষ নির্বশেষে ধরে নিয়ে যাবার কথা উল্লেখ আছে কিন্তু তার পর তারা কি করছে তার কথা সঠিকভাবে উল্লেখ নেই, কিন্তু সমসাময়িক অন্য সূত্র থেকে জানা যায় যে তারা এদের বিক্রি করে দিত। সঙ্গী হিসাবে এরা বেছে নিয়েছিল মগদের। মগ ফিরিঙ্গির মিলিত অত্যাচারে বাঙালির সমাজ জীবনে এক দারুণ আঘাত করেছিল। তার প্রমাণ স্বরূপ কবিকণ্ঠহার প্রণীত সদ্বৈদ্য কুলপঞ্জিকার একটি শ্লোক উল্লেখ করা যায়। মগ ও তার সাথীরা বৈদ্যজাতীয় একজনের একমাত্র ছেলেকে ধরে নিয়ে যায় এবং তাতে তাদের বংশ একেবারে বিলুপ্ত হয়। শ্লোকটি এই—

মহেশ সেন জাভর্স্তু গোপীনাথাৎ সুতোহভবৎ।
চাটীগ্রাম মসৌনীতো বনাম্মঘ চসৃচটর।।

গ্রন্থটি ১৫৭৫ শক অর্থাৎ ১৬৫৩ খৃস্টাব্দে রচিত। শ্রীরামকুমার সেন সঙ্কলিত কবিকণ্ঠহার, ৫৭ পৃষ্ঠার উদ্ধৃত শ্লোকের অর্থ—মহেশ সেনের জামাতা গোপীনাথের একমাত্র পুত্র মগের অনুচররা বলপূর্বক ধরে নিয়ে যায়[১৬]। মগদের সঙ্গে যুক্ত হবার থেকে ফিবিঙ্গিরা দুর্দান্ত হয়ে ওঠে। তৎকালীন কুলপঞ্জীতে এই সব ফিরিঙ্গিদের বিবরণের মধ্যে ঘটকরা অজ্ঞাতসারে বহু করুণ ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন যা জাতীয় ঐতিহাসিক উপকরণ অন্য কোন গ্রন্থাদিতে পাওয়া সম্ভব নয় বলে দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মনে করেন[১৭]। তিনি ৬টি বৃহদাকার হস্তলিখিত কুলগ্রন্থ থেকে সংকলিত করেছেন[১৮]। সাঞ্জাডাঙ্গার কুলাচার্য্য রামহরি ন্যায়লঙ্কারের গৃহে ১২১০-১ সালে লেখা (সংক্ষেপে সাঞ্জা নামে উদ্ধৃত) কুলপঞ্জিকা ও হুগলী নামে উদ্ধৃত কুলপঞ্জিকাতে মগদের অত্যাচার সম্বন্ধে বলা আছে—

"ততো বিষ্ণুপ্রিয়ানাম্নী কন্যা মঘেন নীতা সর্ব্বনাশাদ্ধামঃ"
.(সাঞ্জা—৯৩/১, হুগলী ৮০/১)

এই ঘটনা ১৭শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে (১৬০০-৫০ সনে) পড়ে[১৯]। ঐ একই কুলঞ্জিকায লেখা আছে—"চাঁদস্য পিতৃভদ্রকালে মুৎ যাদবেন্দ্র রায়স্য কন্যাবিবাহ অত্র সাধুঃ, পশ্চাৎ মঘে নীতা" (সাঞ্জা ৯৩/২, হুগলী ৮০/২)। তাঁর বাড়ীর আরো চার ভাই অর্থাৎ একই বাড়ী থেকে মোট ৫ ভাই ও ৩ বোনকে মঘেরা ধরে নিয়ে যায়। কুলপঞ্জিকায় বলা হয়েছে—

চাঁদ বিনোদ রাজারাম যদু মধু মঘে নীতাঃ (ঐ)[২০]
ততঃস্বরূপা মণিরূপা— কর্পূর মঞ্জরী এতাঃকন্যা
মঘেন নীতা সর্ব্বনাশাদ্ধানিঃ(ঐ)[২১]

যশোরের জয়ন্তীপুর ঘটক সম্প্রদায়ের পুথি যা জয়ন্তী নামে উদ্ধৃত (সময়কাল নেই) চেতলা নামে উদ্ধৃত চেতলার এক ঘটক পরিবারের পুথি (সময়কাল নেই) বর্ধমান জেলার কামাল গ্রামে ঘটক সম্প্রদায়ের পুথি যা কামাল নামে পরিচিত (সময়কাল উল্লেখ নেই) ১৭২০ শকে লেখা পরিষদ নামে উদ্ধৃত পুথিতে মগ ফিরিঙ্গিদের অত্যাচার সম্বন্ধে প্রচুর উল্লেখ আছে। যেমন—সাগরদিয়া বংশে খড়দহ মেলের প্রসিদ্ধ কুলীন ছিলেন শ্রীমন্ত। শ্রীমন্তের পৌত্র কৃষ্ণচন্দ্র সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

"কৃষ্ণচরণস্য ফিরাঙ্গি অপবাদঃ বিক্রমপুর কাঁঠালতলি গ্রামে"
(জয়ন্তী ৩৭৪/১)

মতান্তরে ঐ অপবাদ কৃষ্ণচরণের ভাই রামদেবের সম্বন্ধে ছিল—

"রামদেবস্য ফারাঙ্গিতে নীতা মঘ সংপর্ক"

(কামাল বন্দ্য প্র, ৪১/২)

অন্য এক কারিকায় আছে—

"কৃষ্ণচরণ বন্দ্যবর, পাইয়া ফিরিঙ্গিভর, কাঁঠালতলা করি পরিত্যাগ"

(চেতনা ৬৫/২)

কাঞ্জীবংশে নীলকন্ঠের পুত্র গোপীকান্তের মেয়েকে ধরে নিয়ে যাবার কথা উল্লেখ আছে—"কন্যা হারমাদেন নীতা" (পরিষদ ৩৬৩/১), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে সংরক্ষিত মহেশ মিশ্র বিরচিত ১৭২০ শকে[২২] লেখা "সারাবলী কুলপঞ্জী" নামে অসম্পূর্ণ এক পুথিতে এই ঘটনার কথা উল্লেখ আছে—

"গোপীকান্তস্থ দিগডিথ্যা বট্ট বিষ্ণ চক্রবর্ত্তিন কন্যা বিবাহ কেচিৎ মিন্দুবামন্ন বন্দ্যবদন্তি ততঃ কন্যা হারমাদেন নীতা[২৩]"। মগ ফিরিঙ্গি ধরে নিয়ে যাবার পর তাদের কবল থেকে ফিরে আসার কথাও কোন কোন পুঁথিতে উল্লেখ আছে— যেমন অবসথী চট্টবংশীয় রবিকর প্রকরণে গোবিন্দের পুত্র (রামশরণ) বারামগ সম্বন্ধে লেখা আছে—

"রামশরণস্য স্ত্রী হরিহরস্য কন্যা মঘেন নীতা পিপ্পলী
বন্দরে বিবাহিতা, সা কন্যা পুনরপি শান্তিপুরে আগতা
রামশরণ গৃহে। তেন রামশরণেন গর্ভঃ কৃতঃ, সা
পুনরপি মাট্যারিতে স্থিতা, জনাপবাদ ইত্যাচার্য্যৎ

(কামাল, অবসথী প্রকরণ ১৬/২)[২৪]

একই পুথিতে লেখা আছে—

"শ্রীকৃষ্ণো মঘেন নীতঃ, পুনশ্চ গৃহমাগতঃ চিরদিনাৎ পরৎ, তৎপুত্রো মহাদেবো ব্যবহারঞ্চকার। ততঃ শ্রীকৃষ্ণো মৃত, অস্যাগ্নীকার্য্য শ্রাদ্ধাদিকং কৃত্ত্বা মহাদেবো জাতিহীন" (কামাল চট্টপ্রকরণ (৭/১-২) অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ বহুকাল পরে মঘের কবল থেকে ফিরে আসলে তাঁর পুত্র মহাদেব তাঁকে গ্রহণ এবং মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধাদি করে জাতিহীন হয়েছিলেন[২৫]। ঘটককেশরীর এক কুলপঞ্জিকায় উল্লেখ আছে ধানা চট্টবংশের রাজীব চক্রবর্তীর পুত্র শিবরাম চক্রবর্তী "ইমং মঘেন নীত্ত্বা গতং, পশ্চাৎ মুদ্রাং দত্ত্বা আদিত্যমূল বৈদ্যেন নীতঃ মঘাবাসে ষড়দিনং ব্যাপৎ স্থিতং" (৫/২/পত্র) অর্থাৎ মঘেরা তাঁকে নিয়ে ছয় দিন রেখেছিলেন এক বৈদ্য মুদ্রা দিয়ে তাঁকে ছাড়িয়েছিলেন। ধনো চট্টবংশীয় রাঘবপুত্র নারায়ণ ন পাড়ীবন্দ্য বংশীয় রামচন্দ্রের পুত্র রঘুনন্দনের সঙ্গে কুল সম্বন্ধ করে মঘ দোষ পান, কারণ "বং রামচন্দ্রে মঘে নীতা পলাইতবান্, জাতিধ্বংসো ন ভবতি, স্পর্শদোষে দ্বাদ্মা ভবন্তি" (সাকা ২৯৬/২)[২৬]। সুতরাং এর থেকে বোঝা যাচ্ছে

এদের অত্যাচারে অনেককে বাস্তুভিটা ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে, অনেক পরিবার সামাজিক দোষের কবলে পড়ছেন। তবে এই সর্বনাশ ও সামাজিক দোষ হচ্ছে মেয়েদের ধরে নিয়ে যাবার ফলে, পুরুষদের ক্ষেত্রে নয়।

সপ্তদশ শতক থেকেই ফিরিঙ্গিরা শাসকগোষ্ঠী হিসাবে চিহ্নিত হচ্ছেন। অধ্যাপক অনিরুদ্ধ রায় যশোরের প্রতাপাদিত্য গুহ রায়ের সময় পর্তুগীজদের ক্ষমতা সম্বন্ধে উল্লেখ করে বলেছেন যে এই সময় পর্তুগীজরা চট্টগ্রাম অঞ্চলে নৃপতি সৃষ্টির ভূমিকা নিয়েছিল[২৭]। এমন কি তিনি মুঘলদের সাঙ্গ যুদ্ধে পর্তুগীজ সেনাপতি গঞ্জালেসের সাহায্যও নিয়েছিলেন। প্রতাপাদিত্য ফিরিঙ্গিদের সাহায্যে তাঁর গোলন্দাজ বাহিনী কিভাবে চালিত করতেন তা চন্দ্রদ্বীপের ঘটক-কারিকায উল্লেখ আছে। যেমন—

"পূর্ব্বাস্যাং দিশিচৈবান্তে দুর্ভেদ্যং দূর্গমদ্ভুতং।
ফেরঙ্গ বলিভি সম্যক রক্ষিতং কূটযোর্দ্ধভি"[২৯]॥

অর্থাৎ পূর্বদিকের কেল্লা ফিরিঙ্গি সেনারা রক্ষা করত। মানসিংহেব সঙ্গে তাঁর যুদ্ধে ফিরিঙ্গি সেনাপতি রুডার সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

সেনানী সূর্য্যকান্তশ্চ রঘুঃপ্রাচ্যপতিস্তথা।
ফেরঙ্গপতি রুডাখ্যো বিডালাক্ষকুলোদ্ভব॥[৩০]

আরো বলা হয়েছে—

তূর্ণং রুডা স্ততঃ পূর্ব্বৎ সার্দ্ধং সৈনৈঃ মহাবলঃ।
মানসিংহাং সমাক্রমে কালকেয়োসমো রণে॥[৩১]

ঘটক কারিকায এই যুদ্ধের বর্ণনায সেনাপতি সূর্য্যকান্ত, পূর্বদেশীয় সৈনিক অধিপতি রঘু ও ফিরিঙ্গিরুডাকে একই মর্যাদাই দেওয়া হযেছে। কখনই ফিরিঙ্গিদের বহিরাগত বলে উল্লেখ করা হয় নি। যেমন—

সূর্য্যকান্ত স্তথা রুডা প্রতাপশ্চৈব বীর্যবান্,
তোষামনু প্রধাবন্তো ববর্ষুবিঘিধাযুধং॥[৩২]

আবার কখনও বলা হয়েছে—

মদনঃ সূর্যপন্তশ্চ মুখাখ্যশ্চ তথা রঘু।
এবং দৃষ্ট্বা তু তে বীরা রুডা সন্নিধিমাযুযঃ।[৩৩]

অধ্যাপক সুশীল চৌধুরীর লেখায় আমরা দেখতে পাই যে সপ্তদশ শতক থেকে বাঙ্গালি ব্যবসায়ীরা ইউরোপীয় বিশেষ করে ইংরেজদের সঙ্গে বড় ধরনের ব্যবসা করছেন[৩৪]। অন্য সূত্র থেকে জানতে পারি হোলী, দুর্গাপূজা প্রভৃতি উৎসবে সাহেবদের বাঙালিরা বাড়িতে নিয়ে আসছেন কিন্তু সামাজিক আদান প্রদান যেমন বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে তুলছেন না। কারণ বর্ণ হিন্দু সমাজ ছিল অন্তমুখী। কেউ সম্পর্ক গড়ে তুললে সমাজ তাকে মেনে নিচ্ছে না।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত রাম নাথ বিরচিত এক তারিখহীন অসম্পূর্ণ পুথি কুলমঞ্জরীতে উল্লেখ আছে—

"কৃষ্ণজীবন্য হটগ্রোম নিবাসি বন্দ্য গোপীবল্লভ পিরাঙ্গি কন্যা বিবাহক"(১২/২)[৩৫]

আরও লেখা আছে "ভোজন তথা পিরাঙ্গি দোষশ্চ" (২৯/২), "মাধব পৌত্রঃ পিরাঙ্গি দোষা" (৬৫/১), "পিরাঙ্গি জা বিবাহ জাতিবাদক" (৭৪/২) ইত্যাদি[৩৬]। ১৭২৬ শকাব্দে (১৮০৪ খৃস্টাব্দে) লেখা রামায়ণ দেবশর্ম্মা বিরচিত সাঞ্জাডাঙ্গার নির্দেষ কুলপঞ্জিকায় লেখা আছে— "রাজারামরায় মেম খত পুত্র— গঙ্গারাম দ্বারা ক্ষেত্ররাম জীবনীভাবঃ"[৩৭] (৯৪/২)।

সুতরাং পরিশেষে আমরা একথা বলতে পারি যে যবনদের সঙ্গে সমাজের নিম্নবর্ণের মানুষ যেমন মিশে যেতে পেরেছিলেন, ইউরোপীযদের সঙ্গে তাঁরা ততটা পারেন নি, কারণ এরা উচ্চবর্ণের লোকেদের সঙ্গেই তাদের কাজকর্ম চালিযেছিলেন। কিন্তু উচ্চবর্ণের সমাজ ছিল সংকীর্ণ, অন্তর্মুখী মনোভাব সম্পন্ন। ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্য ক্ষুন্ন হবে এই ভযে তাঁরা ইউরোপীয়দের সঙ্গে সামাজিক আদান প্রদান, বিবাহ ইত্যাদি গড়ে তুলতে পারেননি। যদিও অষ্টাদশ শতকে কিছু কিছু আদান প্রদান হযেছিল যেমন অনেক মেম সাহেবকে বিবাহ করেছিলেন কিন্তু তার ফলে তারা সমাজে কলুষিতই হয়েছিলেন। অর্থাৎ সমাজ তাদের একঘরে করে দিযেছিল।

সূত্র-নির্দেশ

১. নগেন্দ্রনাথ বসু, বঙ্গেব জাতীয় ইতিহাস, বাজন্যকাণ্ড। কায়স্থকাণ্ডেব প্রথমাংশ, বিশ্বকোষ প্রেস, ১৩২১ পৃঃ ৬

২. রমেশচন্দ্র মজুমদাব, বঙ্গীয় কুলশাস্ত্র, কলিকাতা, ১৯৭৩ পৃঃ ৩

৩. নগেন্দ্রনাথ বসু, ঐ, পৃঃ ৮

৪. রমেশ চন্দ্র মজুমদাব, ঐ, পৃঃ ৯

৫. ঐ, পৃঃ ১৩

৬. ঐ, পৃঃ ১

৭. ঐ, পৃঃ ৮৮

৮. ঐ, পৃঃ ১১৮

৯. ঐ, পৃঃ ১২৬

১০. ঐ, পৃঃ ১২৪

১১. ঐ, পৃঃ ১২৮

১২. ক্ষিতিমোহন সেন, ভাবতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩০, পৃঃ ২৬

১৩. নগেন্দ্রনাথ বসু, বঙ্গেব জাতীয় ইতিহাস, বৈশ্যকাণ্ড, প্রথম ভাগ, বিশ্বকোষ প্রেস, ১৩১৮, পৃঃ ২৯৭–২৯৮
১৪. নগেন্দ্রনাথ বসু, বঙ্গেব জাতীয় ইতিহাস। দ্বিতীয় ভাগ, ব্রাহ্মণ কান্ড, তৃতীয়াংশ থেকে পঞ্চমাংশ, শ্যামপুকুব কলিকাতা, ১৩১১ পৃঃ ৭২
১৫. ঐ, পৃঃ ৭৫
১৬. সুখবিন্দু সেনগুপ্ত, একটি পুবাতন দুর্গ, ঐতিহাসিক চিত্র, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, পঞ্চম পর্যায, আশ্বিন ১৩১৬, পৃঃ ২৮৭
১৭. দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, বাংলায় মঘ দৌবত্মেব বিববণ, প্রবাসী, ১৩৫৩ চৈত্র, পৃঃ ৬০৬
১৮. ঐ, পৃঃ ৬০৬
১৯. ঐ, পৃঃ ৬০৬
২০. ঐ
২১. ঐ
২২. ঐ, পৃঃ ৬০৬–৬০৭
২৩. বঙ্গীয সাহিত্য পবিষদ সংবক্ষিত। সংখ্যা—৭৮৭, নাম সাবাবলী (কুলপঞ্জী) বিববণ, মহেশ মিশ্র বিবচিত। তাবিখ ১৭২০ শকাব্দ। জনসংখ্যা ১–৫, ৭–৩৬৯, অসম্পূর্ণ।
২৪. দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ঐ, পৃঃ ৬০৭
২৫. ঐ
২৬. ঐ
২৭. অনিকন্দ্ধ বায়, বাজা প্রতাপাদিত্য গুহ বায অফ যশোব, সুশোভন সবকাব স্মাবকমালা। নতুন দিল্লী-১৯৭৬, পৃঃ ১৪১
২৮. ঐ, ১৩৭
২৯. নিখিলনাথ বায়, প্রতাপাদিত্য, কলিকাতা-১৩১৩, পৃঃ ৩১২
৩০. ঐ, পৃঃ ৩১৪
৩১. ঐ, পৃঃ ৩১৫
৩২. ঐ, পৃঃ ৩১৮
৩৩. ঐ, পৃঃ ৩২০
৩৪. সুশীল চৌধুবী, ট্রেড এন্ড কমাবসিয়াল অবগানাইজেসন ইন বেঙ্গল ১৬৫০–১৭২০, কলিকাতা-১৯৭৫, পৃঃ ৬২–৮৫
৩৫. বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদে বক্ষিত, ক্রমিক সংখ্যা ১৮১৫ (ক) গ্রন্থেব নাম কুলমঞ্জবী। বচয়িতা— বামনাথ। পত্র সংখ্যা—১–৩১, ৩৩–৫৬, ৫৮৭৮, তাবিখ নেই, মন্তব্য অসম্পূর্ণ
৩৬. ঐ
৩৭. বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদে বক্ষিত— ২১০২ সং পুঁথিব নাম— সাঞ্চাডাঙ্গাব নির্দোষ কুলপঞ্জিকা। ভৈববচন্দ্র ঘটক বিদ্যাসাগর প্রণীত। লিপিকাব— বামবাম দেবশর্মা প্রভৃতি। পত্র—১-৫৬৫, ৫৬৭-৬১৮ অসম্পূর্ণ। ১৭২৬ শকাব্দ

ইউরোপীয় পর্যটকদের চোখে ১৭শ শতকের সুরাট বন্দর

প্রণবকুমার মিত্র

পঞ্চদশ শতকের গোড়ার দিকে গুজরাট স্বাধীন রাজ্য হিসাবেই গড়ে উঠেছিল। তার প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য ইউরোপীয় তথা বিদেশী পর্যটকদের প্রশংসা অর্জন করেছিল। সফল নাবিক ভাস্কো-ডি-গামা ভারতবর্ষে এবং পর্তুগালের মধ্যে সমুদ্রপথ আবিষ্কার করার পর তৎকালীন গুজরাটের বিখ্যাত বন্দর ক্যাম্বে যেতে মনস্থ করেছিলেন।[১] পাইরার্দ ডি লাভেল ক্যাম্বেকে বলেছিলেন ভারতের সবচেয়ে বড় এবং সম্পদশালী বন্দর যেখানে বিভিন্ন দেশ থেকে ব্যবসায়ীরা আসে।[২] কিন্তু, ১৬২০ সাল নাগাদ, বন্দরটা গুরুত্ব হারায় আর সেইজন্যেই পেনসার্ট দেখলেন ক্যাম্বে আগেই ধ্বংস হয়ে গেছে।[৩] ক্যাম্বের এই অবক্ষয়ই বোধ হয় সুরাট বন্দর গড়ে উঠতে সাহায্য করেছিল। আবার এটাও বলতে হবে যে বিভিন্ন ইউরোপীয় কোম্পানি সুরাটে আসায় এখানকার উন্নতি তাড়াতাড়ি হয়েছিল এবং এই শতাব্দীতে মুঘল ভারতে সুরাট শ্রেষ্ঠ বন্দর হিসাবে টিকে ছিল[৪]। ১৫৪০ সাল পর্যন্ত সুরাট জনসংখ্যা এবং ব্যবসার দিক থেকে ছোট শহরই ছিল। গুজরাট সুলতানদের আমলে এর সীমানা কিতোয়াল খানপুর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পর্তুগীজ আক্রমণ থেকে শহর বাঁচাতে গুজরাটের সুলতানরা সুরাটে একটি দুর্গ তৈরি করতে মনস্থ করলেন। দায়িত্বটা দেওয়া হল তখনকার শাসনকর্তা খাজা নফরকে। ১৫৪০ সালে দুর্গ তৈরি হল।[৫] দুর্গ তৈরি হলে লোকেরা এর কাছাকাছি বসতি শুরু করেন। যার ফলে জনসংখ্যা এবং ব্যবসার দিক থেকে সুরাট বেড়ে উঠতে লাগল। মুঘলদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ভারতে সুরাট বন্দরকে বন্দর মোবারক বা আশীর্বাদপূতঃ বন্দর বলা হত। ১৬৪০ সালে বনল্লাইয়া-লা-গাউজ সুরাটের কথা বলেছিলেন। ইংল্যান্ডে এতদিন ধরে মনে করা হত যে, পর্তুগীজরাই ভারতীয়দের দুর্গ তৈরি করতে শিখিয়েছিল। কিন্তু লা গাউজের কথা থেকে বোঝা যাচ্ছে ধারণাটা ঠিক নয়।[৬] আকবরের আমলে গুজরাট দখল করার পর ননদুরবার পরগণা মুঘল শাসনে এসেছিল। সুরাটের সীমানা তখন টাইব্লেঁ পরগণার দিকে মীরকোট এবং বিলগাঁর দিকে কুন্দমর পর্যন্ত বেড়ে গেল।[৭] ১৬০৮ সালে ফিনচ্ সুরাটে এসে দেখলেন শহরটা একটা

সুন্দব নদীব ধারে কুড়ি মাইল জাযগা জুড়ে ভাল ভাল বনিকদেব বাডি নিযে বযেছে। ডানদিকে বযেছে দুর্গগুলো, যেগুলো বেশ বড এবং সুন্দব আব দেওযাল এবং পবিখা দিযে ঘেবা। ফিন্‌চ্‌ শহবেব তোবণ এবং শুল্ক ভবনেব কথাও বলেছিলেন। আলকাঁদিকা বা শুল্ক ভবনগুলোতে বযেছে মাল ওঠানো নামানোর জন্যে সুন্দর সুন্দব সিঁডি। তাবপবেই বললেন বাজাবেব কথা।[৮] ফিন্‌চ্‌ এব বর্ণনা থেকে বোঝা যাচ্ছে শহবটা আগে থেকেই বাডতে শুরু কবেছিল এবং তখনও বেডে চলেছিল।

তবে, ১৬৪০ সালে, ফ্রাঁসোবা পাইবাদ ডি লাভেল সুবাটেব বদলে ক্যাম্বেব কথা বলেছেন,[৯] গোযাব সঙ্গে তুলনা কবে ক্যাম্বে সম্বন্ধে তিনি যা বলেছেন তাতে বোঝা যায যে, ওই সমযেব আগে ততখানি বেডে উঠতে পারেনি বলেই তাঁব দৃষ্টি আকর্ষণ কবতে পাবেনি। ১৬২৩ সালে দেল্লে ভেল্লা দেখলেন যে সুবাট শহবটা বেশ বড এবং ভাবতেব পক্ষে ভালভাবেই তৈাব শহবটাযে পাকা বাডি দিযে সাজান।[১০] ওই সময পর্তুগীজ শহব দক্ষিণীবা দখল কবে বেখেছিল বলেই সেখান থেকে ব্যবসাযীবা এখানে এসে জাযগাটা জনাকীর্ণ কবে তুলেছিল। ওবা লক্ষ্য কবেছিল যে লেহিত সাগবে মোটা সুমাত্রাব আচিন এব সঙ্গে সুবাটেব বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল। আবিসিনিযা এবং মিশবেব কাযবোব বনিকবা সুরাটেব জিনিসপত্র কিনত।[১১] আব ১৬৩০ সালে মাবাত্মক দুর্ভিক্ষ এই বন্দবেব সমৃদ্ধি এবং জনসংখ্যা প্রায শেষ কবে দিযেছিল। আব ১৭শ শতকেব চাবেব দশক থেকে আবাব তা বাড়তে থাকে।

১৬৪০ থেকে ১৬৬৭ সালেব মধ্যে ফবাসী পর্যটক জঁ বাপ্তিস্তে তাভার্নিযে দুবার সুবাটে এসে দেখেছিলেন শহবটাব আযতন মাঝাবি। আব দুর্গ ব্যবস্থা দুর্বল শহরে নটা কি দশটা বাডি পাকা বাকিগুলো গোলা নলখাগডা দিযে ছাওযা, কাঠামোটা গোবরমাটি মিশিযে প্রলেপ দেওযা যাতে বাইবে থেকে ভিতবেব কিছু না দেখা যায।[১২] মুসলমান, ইংবাজ এবং ওলন্দাজ কোম্পানিব বাডিগুলো ছিল মজবুত। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, ১৬৪০ থেকে ১৬৫০ সালেব মধ্যে সুরাট আগেব অবস্থায় পৌঁছতে পারেনি, তাব উন্নতি সেইমাত্র শুরু হযেছিল। আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য শুরু হলে শহরটা গডে উঠতে পারত। সিন্ধু এবং খাট্টা গুরুত্ব হারাচ্ছিল কারণ ওই অঞ্চলের নদীগুলো নৌ বাণিজ্যেব অযোগ্য হযে গিয়েছিল এবং মূলতান থেকে আগ্রা হযে ভারতে সূতির কাপড আসাও কমে যাচ্ছিল।[১৩] তাভার্নিয়ে এটাও লক্ষ্য করেছিলেন যে, ক্যাম্বে বন্দব নষ্টই হযে গিয়েছিল কারণ সমুদ্র একটু একটু করে সরে যাচ্ছিল। ফলে জাহাজগুলি শহরের ৪/৫ লীগের বেশি কাছে আসতে পারত না। পর্তুগীজ বন্দর গোযাও নষ্ট

হচ্ছিল, কারণ ওলন্দাজরা সমুদ্র ঘিরে রেখেছিল। ওলন্দাজরা সমুদ্রপথ এবং গোযা বন্দব অবরোধ করায়, ওখানকার লোকেরা জায়গা ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল এবং তাভার্নিযের কথায় বিশ্বাস করলে বলতে হয় তারা সুরাটেই আশ্রয় নিয়েছিল। আগন্তুকদেব যে উদাবতা দেখানো হয়েছিল তার দুটো দিক আছে। বোঝা যায়, যে শহরটা আগের অবস্থায় ছিল এবং সরকারও ব্যবসা-বাণিজ্যে মন দিয়েছিল।

১৬৬৬ সালের ১০ই মে হোপওয়েল জাহাজে চড়ে থিভেনো সুরাটের পার-এ এলেন। শিবাজী সুরাট বন্দর ধ্বংস করার ঠিক দুবছর পরে তিনি এসেছিলেন। তিনি দেখলেন শহরটা গড়ে উঠেছে। আওরঙ্গজেবের আদেশে শহরটার সীমানা ইট দিয়ে ঘেরা শুরু হয়েছে।[১৪] ১৬৫৫-৫৬ সালে মানু-চি সুরাটে প্রথম এসে শহরের চারদিকে কোন দেওয়াল দেখতে পাননি। তার আলোচ্য সময়ের শেষ দিকে তিনি যখন আবার এলেন তখন দেখলেন আওরঙ্গজেবের আদেশে দেওয়াল তৈরি হয়েছে।[১৫] ফ্রিযার (১৬৭২-৮১) দেখলেন শহরটা দেওয়াল এবং পরিখা দিয়ে ঘেরা।[১৬] ওভিংটন (১৬৮৪) এবং হ্যামিলটনও (১৬৮৮-১৭২৩) চারিদিকের দেওয়ালের উল্লেখ করেছেন।[১৭] তাহলে, এটা পরিষ্কার যে, ১৬৬৪ তে শিবাজীর সুরাট ধ্বংসের পর সীমার দেওযাল তৈরী হযেছিল। শহরবাসীর জীবন এবং বাণিজ্য রক্ষাব জন্যে যদিও দেওয়াল ছিল তবুও এই সময়ে জনসংখ্যা কমা বাড়া কবছিল। থিভেনো এটাও লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি বলেছেন মৌসুমী আবহাওযায় যখন শহর আশ্রয পাওয়া ভার; তখনও লোকসংখ্যা খুব বেড়েছিল। যদিও শহরের দেওযাল আযতন কমিয়ে দিয়েছিল।[১৮] এই সময়ে শহরে মিশ্রিত জনসংখ্যা থিভেনোর নজব এড়ায়নি, তিনি বলছেন যে ইংরাজ এবং ওলন্দাজ ছাড়াও এখানে আরব, পারস্য, তুর্কী এবং আর্মেনিয়ার লোকেরা এখানে থাকত এবং স্থানীয় জনসংখ্যার মধ্যে হিন্দু এবং মুসলমান ছাড়া পার্শীরাও থাকত, এরা ছিল গার্বী বা অগ্নির উপাশক। মানুচিও মিশ্র প্রকৃতির কথা সমর্থন করেছেন। তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে এই সময়ে এখানে অর্থাৎ সুরাটে ব্যবসা-বাণিজ্য ভালই চলছিল।

১৬৬৮ সালে সুরাট ক্যারেরীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তার বিবরণ থেকে জানা যায় যে শহরটা তখনও গড়ে উঠেছিল। সেখানে তিন রকমের বাড়ি ছিল— ধনীদের বাড়িগুলো ছিল মজবুত, গরিবদের কুঁড়ে ঘর আর কিছু বাড়ি ছিল যেগুলো সাধারণের শাসন করার কাজে ব্যবহার করা হত।[২০] শহরের মিশ্র জাতের উপস্থিতির কথা বলতে গিয়ে তিনিও বলেছেন লোকে সচরাচর ভুলে যায় যে তারা এখানে বিদেশে আছে।[২১] সোসো রিনোকার ১৬৬৯ সালে সুরাটে এসে প্রায় তিন বছর ছিলেন। তার মতে বাণিজ্যের দিক থেকে সুরাট প্রথম শ্রেণীর শহর—ভারত ও এশিয়ার মধ্যে। তিনিও দেখেছিলেন শহরের

দেওয়াল ইট দিয়ে তৈরি, ১২ ফুট চওড়া এবং সম্পূর্ণ।[২২] বিভিন্ন রকমের বাড়ি সম্বন্ধে তাঁর মতামত শ্রেণী বৈষম্য খুব একটা বোঝায় না। বাড়ির জানালা সম্বর্কে তিনি যা বলেছেন তা ক্যারেরীর সঙ্গে মেলে না। মনে হয় তাঁরা শহরের বিভিন্ন দিক দেখেছিলেন। রিনোকার হয়ত শহরের পুরনো এবং রক্ষণশীল অংশটা দেখেছিলেন ক্যারেরী হয়ত নতুন অংশটা শহরে গোটা কতক মসজিদও ছিল। ধর্মীয় গোঁড়ামি হয়ত হিন্দুদের বাড়িতে অথবা শহরের বাইরে মন্দির তৈরী করতে বাধ্য করেছিল।[২৩] দেল্লোন (১৬৬৯-৭০) সুরাটকে মুঘল সাম্রাজ্যের মূল্যবান অংশ বলে উল্লেখ করেছেন। তিনিও বলেছেন শহরের দেওয়াল সম্পূর্ণ হয়েছিল। জনসংখ্যা সম্বন্ধে তিনি বলেছেন সাধারণ লোক ধনী আর গরীব এই দুভাবে বিভক্ত ছিল। জল আর আগুন থেকে বাঁচার জন্যে গরীবরা টালির ঘরে থাকত, আর ধনীরা থাকত ইটের বাড়িতে। কিছু কিছু বাড়ি ছিল দোতলা।[২৪] ওর থেকেই বাসিন্দাদের শ্রেণীটা বোঝা যায়। তাঁর মতে, সুরাটের রাস্তাগুলো সুন্দর হলেও গ্রীষ্মকালে ধুলোর জন্যে অসুবিধা হয়।[২৫] আবার শহরের নাগরিক জীবন সম্বন্ধেও তিনি, মন্তব্য করেছেন। বলেছেন সরকারি খরচে রাস্তা ধোয়া হত। সাধারণের ব্যবহার্য্য স্নানাগার ছিল। অবশ্য সাধারণ লোকের ব্যক্তিগত স্নানাগারও ছিল। স্নানাগার ছিল দুরকমের, কিছু ছিল সাজান। এগুলো পয়সা দিয়ে ব্যবহার করা যেত, আর কিছু ছিল গরীবদের জন্যে, এগুলো সাধারণ।[২৬] দেখা যাচ্ছে সুরাটে দুরকম লোকই থাকত।

ফ্রেয়ার (১৬৭২-৮১) এসে দেখলেন শহরের দেওয়াল তখনও তৈরি হচ্ছে, আওরঙ্গজেব প্রায় আর্য বছর আগেই আদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি যখন দ্বিতীয়বার সুরাটে এলেন তখন দেখলেন ৭০০ লোক শহর রক্ষার কাজে লেগে গেছে, ১৬৭৯ সালে দেওয়ালের কাজ শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু শিবাজীর আক্রমণের ভয়ে ব্যবসায়ীরা শহর ছেড়ে পালিয়েছে। কিন্তু এই সময়ে সুরাট দুর্গে ৩০০ সৈনিক ছিল আর কামান ছিল ৩০টা বা ৪০টা। তিনি বলেছেন সুরাটে শুল্ক ভবন, টাকশাল ছিল, আর ছিল উঁচু বাড়ি যেগুলো সামনেটা ঝর্ণা আর মর্মর পাথর দিয়ে সাজান থাকত।

বির্লাজের দ্য লিসপিনের মতে সুরাটের লোকেরা ছিল খুব ধনী। তাঁর মতে সুরাট বন্দর ভীষণ জনাকীর্ণ এবং সমস্ত ভারতের মধ্যে বড় এবং সম্পদশালী। সুরাট এর দুর্গটা দেওয়াল দিয়ে ঘেরা হলেও শহরটা তখনও তৈরি হচ্ছিল। বুরাজের সংখ্যা বেশি ছিল না। বাজারে দুর্গের সামনে ছিল শুল্কভবন, এটা পোড়া ইট দিয়ে তৈরি। বসত বাড়িও ইট দিয়ে তৈরি হত।[২৭] বাজারে দুর্গের সামনে শুল্কভবনের অবস্থান থেকে বোঝা যায় যায় যে এটাকে সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে বাঁচাতে এবং স্বল্প সময়ে ও খরচে এখান থেকে যাতে মালপত্র নিয়ে-

আসা বা নিয়ে যাওয়া যায় তার জন্যেই পরিকল্পনা করে তৈরি করা হয়েছিল। আবার কাঠ এবং পাথরের বদলে ইট দিয়ে বাড়ি তৈরির ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে অল্প আয়ের লোকেরাই ইট দিয়ে বাড়ি তৈরি করত। ১৬৮১ সালে সুরাটের ব্যবসা বাণিজ্য যথেষ্ট বেড়ে গিয়েছিল। মার্টিন ১৬৬৯ সালে মুসলমান বনিকদের ১৭ বা ১৮টা জাহাজ দেখেছিলেন। কিন্তু, ১৬৮১ সালে দেখলেন ৬০টা। মার্টিনের মন্তব্য থেকে দেখা যাচ্ছে ১৬৬৮ থেকে ১৬৮১ সালের মধ্যে সুরাটের ব্যবসা তিনগুণ বেড়েছিল। ১৬৮১ মার্চ থেকে ১৬৮২-র এপ্রিলের মধ্যে সুরাটে ভীষণ আগুন লাগে, ফলে প্রায় ৫০০ বাড়ি ধ্বংস হয়।[২৮] এই ঘটনার সঠিক কারণ জানা যায় না, তবে মার্টিন সন্দেহ করেছেন যে কিছু লোক যারা ধরা পড়েছিল, তারাই দোষ স্বীকার করেছে। এই ক্ষতিপূরণ হওয়ার আগেই শহরে সম্রাটের আদেশে জিজিয়া করের বোঝা নেমে এল। শুধুই তাই নয়, ১৬৮৪ সালে কয়েকটা ভূমিকম্প ক্ষতির পরিমাণ আরও বাড়িয়ে ছিল। বন্দর শহরের সব বাড়িই প্রায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।[২৯] ১৬৮৬ সালে মার্টিন সুরাট ছেড়ে পাওবেবী গেলেন। কিন্তু শহর ছেড়ে যাওয়ার আগে তিনি এখানকার যে বিবরণ রেখে গেলেন তা দারুণ আকর্ষণীয। তিনি বলছেন, একমাত্র কার্ডিস ছাড়া পৃথিবীর আর কোন শহরে বোধ হয় লোকে এত সোনা রূপো নিয়ে ঢোকে না। পেগু আর স্পেন থেকে যে সম্পদ আসে সে সব সেখানে থাকে না এবং সাম্রাজ্যের অন্য অংশে চলে যায়, কিন্তু সুরাটে যা আসে তা সেখানেই থাকে। শহরটা ঠিক সার্বজনীন হয়ে গেছে। বিভিন্ন দেশ থেকে বিভিন্ন জাতের লোক এসে ছোটখাট ব্যবিলন তৈরী করেছে। শহরের অবস্থাটাও মার্টিনের নজর এড়ায়নি। তিনি বলছেন, শহরটা বিশ্রীভাবে তৈরি, নোংরা, আর কয়েকটা জায়গা সংক্রমণশীল আর বর্ষার সময় নোংরা আর জলে ভর্তি হয়ে যায়।[৩০] মার্টিনের এই মন্তব্য বুঝিয়ে দিচ্ছে নাগরিক পরিসেবা ভাল ছিল না এবং জলনিকাশী ব্যবস্থাও খুব দুর্বল। অধিকন্তু জনসংখ্যাও যে বেশি ছিল সেকথাও বোঝা যাচ্ছে।

হ্যামিলটন (১৬৮৮-১৭২৩) এসে দেখলেন, যে সব লোক ব্যবসা করতে আসে তাদের পক্ষে দেওয়াল ঘেরা শহরটা খুবই ছোট। তাই শহরের সুবিধার জন্য পরে বড় বড় শহরতলি তৈরি হল। শহরের বাইরে ধনী লোকেরা দেওয়ালের বাইরে বাড়ি ঘর করেছিল। সে সম্পর্কে তাঁর যা মন্তব্য তাতে দেখা যায় যে ঘেরা শহরটার জনসংখ্যা উপচে পড়েছিল। সেজন্যই শহরটা আক্রমণের আশংকা সত্ত্বেও তৈরি লোকেরা শহরের বাইরে ঘরদোর করেছিল।

১৬৮৯ সালে অভিংটন শহর ঢোকার ছটা বা সাতটা তোরণ দেখলেন। বাড়ি ছিল অনেক, যেগুলো সুন্দর এবং আভিজাত্যপূর্ণ, রাস্তাগুলো সরু কিন্তু কয়েক জায়গায় বিশেষ করে বাজারের কাছাকাছি জায়গা বেশ সুন্দর আর

বাজারগুলো লণ্ডনের অন্য অংশের চেয়েও জনপূর্ণ। আরো বিস্তৃতভাবে তিনি সুরাটে প্লেগ এবং মহামারীর কথা বলেছেন। যখন তিনি বলছেন যে গুনে দেখা গেছে শহরের জনসংখ্যা ২,০০,০০০ তখন বোঝাই যাচ্ছে যে সুরাটের রাস্তাঘাটও জনাকীর্ণ ছিল।[৩১] ফাদার টেফার্ড সুরাটে এসেছিলেন ১৬৯৬ সালে। তিনিও এসে শহরে প্লেগ দেখলেন। তবে একথা না বলে পারলেন না যে বাটাভিয়া এবং গোয়া ছাড়া ভারতে আর তখন কোন সুন্দর এবং ধনী বাণিজ্য শহর দেখলাম না[৩২]। তাহলে বিদেশীদের মন্তব্য থেকে একথা বোঝা যাচ্ছে যে, সে সময়ে অর্থাৎ সপ্তদশ শতকে সুরাট ছিল একটি বর্ধিষ্ণু শহর। ইংরেজ এবং ওলন্দাজদের আসার সঙ্গে সঙ্গে জায়গাটা সামুদ্রিক বাণিজ্যের প্রবেশ পথ হয়ে দাঁড়াল। বন্দর এবং ক্যাম্বের অবক্ষয় সুরাটকে বেড়ে উঠতে সাহায্য করল। তবে শহরের অগ্রগতি ১৬৩০-৩২ সালের দুর্ভিক্ষের জন্য বাধা পেয়েছিল।

শহরের রাজ কর্মচারীদের আমলাতান্ত্রিক কাজকর্ম সত্ত্বেও সুরাট ভালভাবেই গড়ে উঠেছিল। তাভার্নিয়ে থেকে থিভেনোর সময় পর্যন্ত প্রায় পঁচিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে শহরটা এবার নজরে এল এবং ১৬৬৭ সালে সুরাট আন্তর্জাতিক বাজার হযে গেল। এই ঘটনা গোয়া এবং থাট্টার অবক্ষযের সমকালীন হয়েছিল। তারপর ১৬৮০ থেকে ১৬৯০ সালের মধ্যে আমলাতান্ত্রিক হস্তক্ষেপ প্রাধান্য পেয়েছিল। রাজকোষ পূরণ, যুদ্ধের খরচ এবং তাদের নিজেদের পকেট ভর্তি করার জন্যে বন্দর শাসকরা যখন ব্যবসাদারদের উপর স্বৈরতান্ত্রিক কাজকর্ম শুরু করল তখন সেটা সুরাটের পক্ষে ক্ষতিকরই হয়েছিল।[৩৪] ভূমিকম্প, প্লেগ এবং অগ্নিকাণ্ড শহরে ধন ও জলের ক্ষতি করেছিল। তাছাড়া, নয়ের দশকের মধ্য ভাগে বাণিজ্য শহর হিসাবে বোম্বের উত্থান এবং বহু বাণিজ্যিক সংগঠনের স্থানান্তকরণ এবং বেশি কিছু সুযোগ সুবিধার জন্য ব্যবসাদারদের সেখানে বসবাস সুরাটের মত বন্দরের অবক্ষয়ের সূচনা করেছিল।[৩৫] তবুও এত কিছু অসুবিধে এবং বাধা সত্ত্বেও যদি আমরা ফ্রেয়ারের কথা জানি, তাহলে একথা জানতে হয় যে, প্রাকৃতিক দিক থেকে জল ও স্থল পরিবহন এর সুবিধেযুক্ত সুরাট শহরটার সারা পৃথিবীর রানী হওয়ার পক্ষে হারাবার কিছুই ছিল না।

সূত্র-নির্দেশ

১. মিশ্র, এস, পি, দি রাইজ অফ মুসলমি পাওয়ার ইন গুজরাট, এশিয়া, ১৯৬৪: গুজরাট মুসলমান শক্তির অভ্যুত্থানের বিবরণের জন্য উল্লিখিত পুস্তক দ্রষ্টব্য।
গোপাল, সুরেন্দ্র, কমার্স এণ্ড ক্রাফটস অফ গুজরাট, এন.ডি. ১৯৭৫ পৃ. ১
২. পাইরাড ডি লেভেল: দি ভয়েজেস্ অফ ফ্রাঁসোয়া পাইবাদ দি মেভেল টু দি নুষ্ট ইণ্ডিজ. দি মালিন্দি. দি মুলাস্কোস এণ্ড ব্রাজিল, দুইখণ্ড, প্রথমখণ্ড লণ্ডন ১৮৮৭, ২য় খণ্ড ১৮৯১; বেনীপ্রসাদ: হিষ্ট্রি অফ জাহাঙ্গীর: পৃ. ৮৯—৯০; বয়ওয়ালা,

এম.ডি. মুকাবব খাঁ: একটি অপ্রকাশিত গবেষনাপত্র, বম্বে বিশ্ববিদ্যালয, ১৯০১, পৃ. ২৮ টীকা ৩

৩. পেলসার্ট: জাহাঙ্গিবস্ ইণ্ডিযা: ডাচ ভাষা থেকে অনূদিত মোবল্যাণ্ড এণ্ড গিল, দিল্লী ১৯২৫, পৃ. ১৬

৪. বযওয়ালা: পূর্ব উল্লিখিত: পৃ. ২৮ টীকা ৩

৫. মিবাত-ই-আহমদী, পৃ. ১৮৭-৮৮
ফিবেস্তা: হিস্ট্রি অফ মহমেডান রুল ইন ইণ্ডিযা, অনুবাদ· জন ব্রিজ, খণ্ড ৪ পৃ. ১৪৭

৬. বায অনিরুদ্ধ: দা গ্রোথ অফ দা সিটি অব সুবাট ১৬১০-১৬৭১। প্রকাশিত জার্নাল অফ দা এ'সযাটিক সোসাইটি অফ বাংলাদেশ। ঢাকা, ১৯৭৯ ৮০। পৃ. ৯৫-১০১।

৭. আইন-ই-আকববী: অনুবাদ: গ্লাডউইন: খণ্ড ২ পৃ. ২৪১ ৪২। বাউলিনসন্· ব্রিটিশ বিগিনিং ইন ওযেষ্টার্ন ইণ্ডিযা (১৫৭৯-১৬৫৭), অক্সফোর্ড ১৯২০, পৃ. ৪১ ৪৪ থেকে গৃহীত।

৮. পাইবাইড: ভয়েজেস: ২য খণ্ড: পৃ. ২৮৯

৯. ডেলা ভেলী· দি ট্রাভেলস্ অফ পিটাব ডেলাভেলী: লণ্ডন, ইংবাজী অনুবাদ. প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৪

১০. টেবী: এ ভযেজ টু ইস্ট ইণ্ডিযা, লণ্ডন ১৭৭৭ পৃ. ১০০

১১. তাভের্নিযাব· ট্রাভেলস ইন ইণ্ডিযা। অনুবাদক দুই খণ্ড, অক্সফোর্ড ১৮৯৯, প্রথম খণ্ড, পবিচিত অংশ দ্রষ্টব্য বায অনিরুদ্ধ: পূর্বে উল্লিখিত।

১২. তাভের্নিযাব পূর্বে উল্লিখিত, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১২

১৩. বায অনিরুদ্ধ: পূর্বে উল্লিখিত।

১৪. সেভনট্ এণ্ড কাবেবী: ইণ্ডিযান ট্রাভেলস অফ ফেওনট এণ্ড কাবেবী, সম্পাদক, সেন. এস. এন. নিউদিল্লী ১৯৪৯ পৃ, ২১-২৭, নগবেব জন্য এবং পৃ: ৩৭-৩৮ বন্দবেব জন্য দ্রষ্টব্য।

১৫. মানু চি. এন: স্টোবিয়া ডো মগব: অনুবাদ ৪ খণ্ড: লণ্ডন ১৯০০—১৯০৮, প্রথম খণ্ড পৃ. ৬১।

১৬. জন ফ্রায়াব: এ নিউ একাউন্ট অফ ইস্ট ইণ্ডিযা এ্যাণ্ড পাবসিযা বিযিং নাইন ইযাবস্ ট্রাভেলস, ১৬৭২-৮১, প্রথম খণ্ড: লণ্ডন, পৃ. ১৮

১৭. আউংটন, জে: এ ভয়েজ টু সুবাট ইন দি ইয়াব ১৬৮৯, অনুবাদ-সম্পাদনা, বাউলিনসন, এইচ.জি লণ্ডন ১৯২৯

১৮. পিংকাবটন, জন: এ কালেকসন অফ ভয়েজেস এণ্ড ট্রাভেলস: ৩য় খণ্ড, লণ্ডন ১৮১১।

হ্যামিলটন বলেন যে, শিবাজীব আক্রমণেব পবে আওবঙ্গজেব সুবাট বন্দবকে (ইংবাজ) বক্ষা কবাব জন্য একটি উচ্চ প্রচীব দ্বাবা বেষ্টিত কবেন, যাব দৈর্ঘ্য ছিল প্রায ৪ মাইল। হ্যামিলটনেব বর্ণনা অতিবঞ্জিত বলে মনে হয়; কাবণ আওবঙ্গজেব সুবাটকে প্রচীব দ্বাবা ঘিবে ছিলেন ইংবাজদেব বক্ষা কববাব জন্য নয় এব জনগণ বাণিজ্য এবং যাতে ভবিষ্যতে মারাঠা দ্বাবা আক্রান্ত না হয় তার জন্য।

১৯. মানুচি: পূর্ব উল্লিখিত, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৬১।
২০. বায় অনিরুদ্ধ পূর্ব উল্লিখিত
ট্রাভেলস্ অফ আবে কাব ১৬৭২-৭৪, সম্পাদনা ফবেষ্ট: ৩ খণ্ড লণ্ডন ১৯৪৭।
২১. বায় অনিরুদ্ধ, পূর্ব উল্লিখিত
২২. বায় অনিরুদ্ধ, পূর্ব উল্লিখিত
২৩. বায় অনিরুদ্ধ, পূর্ব উল্লিখিত
১৬৬৯ সালেব ডিসেম্ববমাসে মার্টিন বলেছেন যে, কাজীব মন্দিব ধ্বংস কবে দেওযাব জন্য সুবাটেব বালিয়াগণ সুবাট ত্যাগ কবে ক্যাম্বেতে চলে যাচ্ছে।
২৪. ডেলন্ এম ভি: এ ভযেজ টু দি ইস্ট ইণ্ডিজ, লণ্ডন ১৬৯৮ পৃ: ৩৭-৩৮
২৫. পূর্ব উল্লিখিত পৃ ৩৭
২৬. পূর্ব উল্লিখিত পৃ. ৩৮
২৭. বায অনিরুদ্ধ: পূর্ব উল্লিখিত,
২৮. বায অনিরুদ্ধ: পূর্ব উল্লিখিত
২৯. বায় অনিরুদ্ধ· পূর্ব উল্লিখিত
৩০. বায অনিরুদ্ধ: পূর্ব উল্লিখিত
৩১. হ্যামিলটন: পূর্ব উল্লিখিত, পৃ. ১৪৮-৪৯
৩২. হ্যামিলটন: পূর্ব উল্লিখিত, পৃ. ১৪৬
৩৩. ১৬৮০ থেকে ১৬৯০-এব মধ্যে বাজস্ব আদাযেব জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওযা হয়, এব ফলে ১৬৬৭ খ্রীঃ সেখানে বাজস্বেব পবিমাণ ছিল ১ লক্ষ টাকা তাই ১৬৮৫ খ্রীঃ দাঁডায় ৯০ লাখ টাকায।
বায অনিরুদ্ধ: পূর্বে উল্লিখিত।
৩৪. ডেভিড: হিস্ট্রি অফ বোম্বে: বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয, বোম্বে, বোম্বেব উত্থানেব জন্য এই বই দ্রষ্টব্য
৩৫. ফ্রাইয়াব: পূর্বে উল্লিখিত: পৃ. ১২০-১২১

আধুনিক ভারত

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরিপ্রেক্ষিতে সীমান্ত বাংলার উপজাতীয় সমাজ রূপান্তরণ ও ঔপনিবেশিকতা বিরোধিতার ঐতিহাসিক পরিলেখ

রাধাগোবিন্দ সরকার

সীমান্ত বাংলাব সমতল ভূমির উপজাতি অধ্যুষিত এলাকাব ইতিহাস পর্যালোচনা করলে একটা সত্য প্রতিপন্ন করা যায় যে এলাকার উপজাতিগণের বসবাস খুব প্রাচীন নয়। সাঁওতাল প্রভৃতি উপজাতিগণ আগে ছোটনাগপুর পার্বত্য অঞ্চলে বাস করতে বলেই নৃতাত্ত্বিকদের ধারণা। রিজলে সাহেব মন্তব্য করেছেন—আহিরি পিপিরি বা হিহিরি পিপিরি সাঁওতালদের লোককথার আদিম বাসভূমি।[১] এই আহিরি পিপিরি বা হিহিরি পিপিরিকে তিনি হাজারীবাগ জেলার উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত একটা বিশেষ এলাকা বলে চিহ্নিত করেছেন। সমতলভূমিতে এদের আগমন ঘটেছে নানা অর্থনৈতিক কারণে। বাঁকুড়া এবং মেদিনীপুর সমতলভূমিতে তাদের বিস্তৃতি শুরু হয়েছিল '৭৬-এর মন্বন্তরের পরে। আমাদের জানা আছে '৭৬-এর মন্বন্তরের পরে বনের গা ঘেঁষা প্রান্তিক জমিগুলিতে জঙ্গল গজিয়ে উঠেছিল—বিস্তৃত হয়েছিল বনভূমি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বর্ধমান ও মেদিনীপুর চাবালা অধিগ্রহণ করার পর জোত জমিদারিগুলি নতুন করে ঢেলে সাজাতে শুরু করেছিলেন। যে সমস্ত বেনিয়া এজেন্ট এবং কর্মচারীরা তৎকালীন কোম্পানির ব্যবসায় সাহায্যকারী হিসেবে কাজ করতেন তাঁরা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কাছ থেকে অরণ্য অঞ্চলের বড় বড় ভূখণ্ড বন্দোবস্ত নিতে শুরু করেন। জঙ্গল হাসিল করে আবাদ প্রতিষ্ঠা করা তখনকার পরিবেশে একটা বিশাল সমস্যা ছিল। কারণ জমির তুলনায় রায়ত ও চাষীর সংখ্যা '৭৬-এর মন্বন্তরে জনসংখ্যার বিলুপ্তির ফলে কমে যায়। জমির পরিমাণ এত বেশি ছিল যে জঙ্গল হাসিল করে আবাদ পত্তন করার লোকই পাওয়া যেত না। এর ফলে যে সমস্ত বেনিয়া এজেন্ট এবং কর্মচারীরা জমি বন্দোবস্ত নিয়েছিলেন তাঁরা উচ্চভূমির

উপজাতিদের আমন্ত্রণ জানাতে শুরু করেন এলাকায় আসতে এবং জঙ্গল হাসিল করে আবাদ পত্তন করতে।[২] ঘটনাটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আগেই এত গুরুত্বপূর্ণ আকার ধারণ করেছিল যে ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে ২৩শে অক্টোবর লণ্ডনের Morning Chronicle প্রতিবেদন ছেপেছিল— 'Every propitor is collecting husband men from the hills to improve his low lands".[৩]

জঙ্গলের গা ঘেঁষা প্রান্তিক জমিগুলি ছিল অনুর্বর ও পাথুরে। ঐ সব এলাকায় জঙ্গল হাসিল ও আবাদ পত্তনের অধিকার তখন দেওয়া হত মণ্ডলী প্রথায়। যে সমস্ত উপজাতি জঙ্গল হাসিলের কাজে নামতেন তাদের মুখ্য ব্যক্তিকে বলা হত মণ্ডল। দলের পক্ষ থেকে আবাদী জমি সহ গ্রাম পত্তনের ইজারা নিতেন তিনিই। মেদিনীপুর, বাঁকুড়া এমনকি বর্ধমানের পশ্চিমাঞ্চলে মণ্ডলী ব্যবস্থার প্রচলন লক্ষ্য করা যায়, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরে যে সব জমিদারগণ ঐসব এলাকায় জমিদারি পেয়েছিলেন তাঁদের আমলে ঐ ব্যবস্থা স্বীকৃতি পায় সরকারি মহলে। মণ্ডলী ব্যবস্থায় রাযতগণ মণ্ডলের কাছে কর প্রদান করতেন এবং মণ্ডল জমিদাবকে কর দিতেন। মণ্ডলী ব্যবস্থা সম্পর্কে 'রেন্ট কমিশনের' প্রতিবেদনে বিশেষ মন্তব্য প্রকাশ করা হয়েছে।[৪]

মণ্ডলী প্রথার উদ্ভবের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে যে পটভূমি পাওয়া যায় সেটি অবশ্য 'রেণ্ট কমিশন'-এর প্রতিবেদনে বর্ণিত অবস্থার থেকে ভিন্নতর। মেদিনীপুর এবং বাঁকুড়া জেলার বৃহৎ অঞ্চলে উপজাতীয়দের নিয়ে গ্রাম পত্তনের পটভূমিতে মণ্ডলী ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। যে সব উপজাতি এতে অংশগ্রহণ করেছিল তারা মূলত সাওঁতাল, ভূমিজ, মাহাতো প্রভৃতি। এই উপজাতিদের সমাজ সংগঠন মূলত দলভিত্তিক থাকার ফলে মণ্ডল ছিলেন দলের নেতা। তাঁর সাথে জমির বন্দোবস্ত করার অর্থ ছিল দলের সাথে বন্দোবস্ত করা। যখন কোন পতিত এলাকা পুনরুদ্ধারের জন্য মণ্ডলকে প্রদান করা হত সেটা তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে দেওয়া হত না, দেওয়া হত দলগতভাবে অর্থাৎ সেখানকার জমির উপরে আদতে মণ্ডলের ব্যক্তিগত অধিকার মেনে নেওয়া হত না, দলের দলগত অধিকার স্বীকৃত ছিল। মণ্ডল তাঁর দলের সদস্যদের মধ্যে জমিকে ভাগ করে দিতেন এবং তাদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করে জমিদারের কাছে কর প্রদান করতেন। প্রথমে জমিদারকে যেটুকু পরিমাণ রাজস্ব দিতে হত সেটুকু রাজস্বই মণ্ডল তাঁর দলের লোকদের কাছ থেকে আদায় করে নিতেন। কিন্তু পরবর্তীকালে লক্ষ্য করা যায় যে ক্রমে ক্রমে তাঁরা নিজেদের লভ্যাংশ সংরক্ষিত করার উদ্দেশ্যে বেশি পরিমাণ রাজস্ব সংগ্রহ করছেন। সময়ের গতিতে মণ্ডলদের দৃষ্টিভঙ্গীও পরিবর্তিত হচ্ছে। তাঁরা নিজেদের একজন Tenure holder-এর অবস্থানে প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছেন,[৫] এবং স্থায়ী বংশানুক্রমিকভাবে হস্তান্তর যোগ্য ভূম্যাধিকারীর

অধিকার অর্জন করেছেন। জমিদারের অধীনে তিনি একজন বাস্তবে মধ্যবর্তী খুদে জমিদারে পরিণত হয়েছেন। যারা একসময় তাঁর সহ-রায়ত ছিল তারা তার অধীনে কৃষকে পরিণত হয়েছে। সহ-রায়ত থেকে খুদে ভূম্যাধিকারীতে রূপান্তরের প্রক্রিয়া, সমতলভূমির উপজাতীয় নেতৃত্বের কাঠামোগত পরিবর্তন ঊনবিংশ শতকের সীমান্ত বাংলার সামাজিক ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

জমির উপরে মণ্ডলী অধিকার সরকার স্বীকার করে নিয়েছিলেন ঊনবিংশ শতকে[৬]। এই মণ্ডল শ্রেণীভুক্ত উপজাতীয় সর্দারগণ যেহেতু উপজাতীয় সমাজের বাইরের দুনিয়ার সাথে বেশি যোগাযোগ রাখতেন, উচ্চ জমিদার বর্গের সাথে তাঁর চলাফেরা এবং যোগাযোগ অনবরতই ঘটত এবং শাসক শ্রেণীর সাথেও তাঁর লেনদেন চলত যেহেতু সঙ্গতিপূর্ণ মণ্ডলেরা ক্রমে ক্রমে তাঁর উপজাতীয় ভ্রাতৃবৃন্দ থেকে একটু আলাদা ধরনের জীবনযাপনে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। হিন্দু জমিদারদের সান্নিধ্যে এসে তাঁরা বেশি পরিমাণে অনুপ জাতীয় সাংস্কৃতিক ধারাকে গ্রহণ করে নেন। এমন কতকগুলো এলাকা আছে যেখানে দেখা যায় এই উপজাতীয় সর্দারগণ সিং, ঠাকুর প্রভৃতি উপাধি গ্রহণ করে হিন্দু রাজন্যের কৌলিন্যকে অনুকরণ করার চেষ্টা করেছেন। কেউ কেউ আবার হিন্দু ক্ষত্রিয় ঐতিহ্য ধারাকে অনুকরণ করার চেষ্টা করে ক্ষত্রী চা ছত্রী উপাধি গ্রহণ করেছেন। এই সমস্ত সর্দারগণ নিজেদের উপজাতীয় উৎসধারাটিকে গোপন রাখতে পছন্দ করেন। ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বহু হিন্দু মহাজন উপজাতীয় এলাকায় ব্যবসা-বাণিজ্য এবং টাকা লেনদেনের জন্য গিয়েছিলেন। তাদের সাথেও এই সমস্ত সর্দারগণের যোগাযোগ বাঁকুড়া, বীরভূম প্রভৃতি এলাকার গ্রামীণ ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায়। এই সমস্ত অনুপজাতীয় হিন্দু মহাজনদের কাছে অনেক মণ্ডল তাদের এলাকা বিক্রিও করেছেন।[৭]

উপজাতীয় সমাজগঠন মূলত ছিল দলগত এবং যৌথভাবাপন্ন। উপজাতীয় সমাজের সমাজ পরিচালনা ও নেতৃত্বের জন্য গঠিত হত পাঁচজনকে নিয়ে গ্রাম সভা। সাঁওতালদের মধ্যে এঁরা ছিলেন মাঝি, জগমাঝি, নায়েকী, গঢ়হিত, পারগানাইক। এক এক জনের উপর এক একটা কাজের দায়িত্ব ছিল। মাঝি সমন্বয়ক হিসেবে কাজ করতেন। মণ্ডলী ব্যবস্থার রূপান্তরণের মাধ্যমে উপজাতীয় সর্দার যখন তাঁর এলাকায় খুদে জমিদারে পরিণত হলেন তখন স্বাভাবিকভাবেই যৌথ গ্রামীণ নেতৃত্বে প্রচণ্ড ভাঙ্গন দেখা দেয়। অর্থ কৌলিন্য বলে এবং বাইরের সাথে যোগাযোগের ফলে এই সর্দারগণ যে ক্ষমতা অর্জন করেন সেটা কিছুটা স্বৈরাচারী। এতে উপজাতীয় সমাজে আভ্যন্তরীণ সাম্য ভেঙ্গে যায়। একজন উপজাতি কর্তৃক অন্য সহ উপজাতি ভ্রাতৃবৃন্দকে শোষণের অধ্যায় শুরু হয়।

ঊনবিংশ শতকে উপজাতীয় এলাকার ভূমিকে নিয়ে যে সমস্ত অশান্তি হয়েছে সেক্ষেত্রে এই নতুন উদীয়মান উপজাতীয় সর্দারগণের কার্যকলাপ কম দায়ী ছিল না। এদের ভূমিকায় দ্বৈত ধারা লক্ষণীয়। কখন হিন্দু মহাজনদের সাথে সংঘর্ষের সময়ে তাঁরা উপজাতীয় ভ্রাতৃবৃন্দকে উত্তেজিত করেছিলেন, আবার কখন নিজেরাই বিক্ষুব্ধ উপজাতি কৃষকদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিলেন। ভিন্ন প্রকৃতিতে মণ্ডলী ব্যবস্থায় উদ্ভাবিত সর্দারগণের কার্য্যকলাপ উপজাতীয় ইতিহাস এবং সমাজ পরিবর্তনে একটা বিশেষ দিক বলে বিবেচিত হতে পারে।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি মূলত চেয়েছিলেন তাঁদের বিদেশভূমি বাংলার বুকে একটা অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব। এই অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব অর্জন করতে গিয়ে তাঁরা শুধু পুরনো জমিদারদের ব্যবহার করতে চেষ্টাই করেছেন তাই নয়, তার সাথে পুরাতন ও নতুন জমিদারি বা জমিদার পরিবারের সাথে বিশেষ ধরনের রাজস্ব সম্পর্কে সম্পর্কিত হবার চেষ্টা করেন। ফলে মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম এমনকি বর্ধমান প্রভৃতি এলাকায় বহু পুরনো ও নতুন জমিদার পরিবার সংকটের সম্মুখীন হন।[৮] উদাহরণ স্বরূপ ফুলকুসমার জমিদার, সিমলাপালের জমিদার ও ভেলাই ডিহার জমিদারগণের উল্লেখ করা যেতে পারে।[৯] এই সমস্ত জমিদার স্থানীয় মানুষদের কাছ থেকে উচ্চ হারে কর আদায় করে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নতুন চাকলার শর্ত অনুসারে দাবি দাওয়া মেটাতে ব্যর্থ হওয়ায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সাথে তাঁদের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে। এই সংঘর্ষগুলিকে এক কথায় ঔপনিবেশিক দাবি দাওয়ার সাথে দেশীয় স্বার্থের বিবাদ বলা চলতে পারে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর কোম্পানি পাইকান জমি অধিগ্রহণের কাজ শুরু করলে অরণ্য অঞ্চলের ব্যাপক জনগোষ্ঠীর কম বেশি সকলেই বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন। এই সমস্ত বিক্ষুব্ধ জনগোষ্ঠী অবশেষে বিদ্রোহের সামিল হয়েছিলেন। এই রকম বিদ্রোহের নমুনা আমরা খুঁজে পাই দুর্জন সিংহের বিদ্রোহের মধ্যে। ইতিহাসে আমরা জঙ্গল মহলের দৃষ্টির পটভূমিতেই এই সমস্ত বিদ্রোহের কাহিনী নথিভুক্ত হতে দেখি ১৮০৫ সালের আগে।

আঞ্চলিক ভূমি ব্যবস্থার পুরনো ঐতিহ্য থাকার ফলে কৃষকদের সাথে জমিদারগণের অর্থনৈতিক লেনদেনে কতকগুলো ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। এই সব ব্যবস্থা নানা নামে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে পরিচিত ছিল। বাংলা বিহার সীমান্তে যে সব ব্যবস্থা ছিল সেগুলো হলো মণ্ডলী, সর্দারী, ঘোরুই, মালগুজার প্রভৃতি ব্যবস্থা। উপজাতীয় সমাজের ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক কৃষকই সমানভাবে তার এলাকার জমির লভ্যাংশ পেতে অধিকারী, কারণ উপজাতীয় সমাজে যৌথ মালিকানার ধারণা বিদ্যমান। কিন্তু এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ঐ যৌথ মালিকানার বিষয়টিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে উপরিওলা জমিদার এবং ব্রিটিশ

সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় মণ্ডল, ঘাটোয়ালী প্রভৃতিদের স্বার্থ রক্ষায় নতুন ধরনের আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল। যৌথ মালিকানার ধ্যান ধারণা অবলুপ্ত হওয়ার ফলে উপজাতি সমাজে জমিকে নিয়ে আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব গড়ে ওঠে যা অবশেষে উপজাতি বিদ্রোহের রূপ পরিগ্রহ করে।

বহুমুখী এই সব সমস্যা ঊনবিংশ শতকে উপজাতীয় জীবনচর্চাকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছিল এবং সীমান্ত বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাসে একটা অভিশাপ পর্বের সূচনা করেছিল।

সূত্র নির্দেশ

১. Resley- Tribes and Castes of Bengal.

২. তরুণদেব ভট্টাচার্য—বাঁকুড়া

৩. Morning Chronicle (London, 1792)

৪. 'In the settlement proceedings of 1839 these Mandals were declared to have only the rights of Sthani or Khud Kasht Ryots and not to be entitled to any Munafa or profit; but do not exactly recognised as Talukdars. They gradually required rights superior to those of ordinary Khud Kasht Ryots and as they were left with the Ryots settled by them they must have every considerable profit besides what they obtained from any land cultivated by themselves. The Mandal's rights became transferable by custom.

(Report of the Rent Commission, 1842)

৫. K. B. Saha—Economics of Rural Bengal, page-94.

৬. Guha—Land System in Bengal and Bihar, page-409.

৭. Settlement Report of Midnapur.

৮. Bengal District Record Mid. Vol.I. Letter No.-60, 112, 128, Dated. 2.1.67.

৯. Letter No. 63, BDR, Mid. Vol.III চার্লস স্টুয়ার্টের চিঠি, 26th Nov. 1772.

মেদিনীপুরের রাণী শিরোমণি
ও
কৃষক বিদ্রোহ

শ্যামাপদ ভৌমিক

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ লগ্নে দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের কৃষকবিদ্রোহের নেত্রী শিরোমণি ছিলেন মেদিনীপুর জমিদারীর শেষ রাজা অজিত সিংহের পত্নী এবং শিবায়ন কাব্য রচয়িতা রামেশ্বর ভট্টাচার্য্যের পৃষ্ঠপোষক, ইতিহাস প্রসিদ্ধ জমিদার যশোবন্ত সিংহের পুত্রবধূ। অজিত সিংহের মৃত্যুর পর নিঃসন্তান বিধবা দুই রাণী যথাক্রমে রাণী ভবানী ও রাণী শিরোমণি মেদিনীপুর জমিদারীর অধিকারণী হন। তাঁরা যৌথভাবে জমিদারী দেখাশোনার দায়িত্ব দেন নাড়াজোলের জমিদার ত্রিলোচন খানকে। উল্লেখ্য, বহুদিন নাড়াজোল মেদিনীপুর জমিদারীর অন্তর্গত ছিল। মেদিনীপুরের জমিদার বংশের অন্যতম আবাসস্থল ছিল নাড়াজোল। অন্য দুটি ছিল মেদিনীপুর শহরের অতি সন্নিকটে আবাসগড় ও মেদিনীপুর থেকে কয়েক মাইল দূরে কর্ণগড়। মেদিনীপুরের জমিদাররা অধিকাংশ সময়ই কর্ণগড়ে থাকতে পছন্দ করতেন দুটি কারণে। এক, কর্ণগড়টি তাঁদের জমিদারীর প্রায় মধ্যস্থলে। দুই, অঞ্চলটি ঘন জঙ্গলে আবৃত হওয়ায় আত্মরক্ষার সুবিধা ছিল। তাই মেদিনীপুরের জমিদারই কর্ণগড়ের জমিদার রূপে সুবিদিত হতে থাকেন। এই কর্ণগড়েই রাণী ভবানীর মৃত্যু হয় (১৭৬০)। ফলে মেদিনীপুর জমিদারীর সমস্ত প্রজার দায়িত্ব রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব এসে পড়ে শিরোমণির উপর। রাণী ভবানীর মৃত্যুর পর তাঁর অংশ মত জমিদারী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হস্তগত হলেও শিরোমণির জমিদারী অটুট থাকে। তিনি পূর্বের মত নাড়াজোলের জমিদার ত্রিলোচন খানের সাহায্য নিয়ে জমিদারী চালাতে থাকেন।[১] তখনকার দিনে বড় বড় জমিদারদের প্রজারা 'রাজা' বলে সম্বোধন করতো। মেদিনীপুরের প্রায় প্রত্যেক জমিদারকে রাজা বলা হতো। এই কারণে জমিদার পত্নী শিরোমণিও 'রাণী' রূপে সম্মানিতা হতে থাকেন।[২]

রাণী শিরোমণির জন্ম ঠিক কোথায়, কোন গ্রামে বা বংশে তা জানা যায় নি। তবে সম্ভবত তিনি জমিদার কন্যা ছিলেন না। কারণ তিনি জমিদার কন্যা হলে তাঁর বিদ্রোহের সময় তিনি অবশ্যই তাঁর পিত্রালয়ের সাহায্য পেতেন। এদিক থেকে মনে হয় ত্রিলোচন তাঁর পিত্রালয়ের কেউ। তিনি জমিদারীর মালিক

হওয়ার পর তাই নাড়াজোলের আবাসগৃহ সহ জমিদারীর কিছু অংশ সম্ভবত ত্রিলোচন খানকে ছেড়ে দেন। তিনি যখন বিদ্রোহের পরিচালনা করছেন, বন্দী হয়েছেন তখন সব সময়েই নাড়াজোলের জমিদার ও তাঁদের আত্মীয়বর্গ তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছেন।[৩] নাড়াজোলের জমিদার আনন্দলাল খানের একজন আত্মীয় চুনীলাল খান রাণীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও প্রতিবাদী আন্দোলনের সহকারী ছিলেন।[৪] চুনীলাল খান যদি তাঁর নিকট আত্মীয় না হতেন তাহলে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের জন্য সমাজ তাঁকে সন্দেহ করতো। কিন্তু তা করেনি। পক্ষান্তরে শিরোমণিকে তাঁরা তাদের মাথার মণির মতো রক্ষা করার চেষ্টা করেছে। বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি নথিপত্র থেকে জানা যায় নাড়াজোলের জমিদাররা জাতিতে সদগোপ ছিলেন।[৫] গোষ্ঠী হিসেবে এঁরা মোটামুটি সঙ্গতিসম্পন্ন কৃষক ছিলেন। সে কারণে অনুমান করা যেতে পারে রাণী শিরোমণি ছিলেন জাতিতে সদ্‌গোপ এবং কৃষক কন্যা। অধ্যাপক জে.সি.ঝা তাঁকে, কোন সূত্র নির্দেশ না করেই "আধা উপজাতি"[৬] বলে যে আখ্যা দিয়েছেন তা অযৌক্তিক।

গ্রাম্য পরিবেশে লালিতপালিত শিরোমণি কর্মঠ, বুদ্ধিমতী ও অত্যন্ত সুন্দরী ছিলেন। তখনকার দিনের জমিদারদের আভিজাত্যের অন্যতম অঙ্গ ছিল গ্রামে, বিশেষত নিজের জমিদারী এলাকায় কোন সুন্দরী অবিবাহিতা যুবতী দেখলে তাকে বিয়ে করে ঘরে আনা। অজিত সিংহও শিরোমণিকে গ্রাম থেকে তুলে এনে রাণীর মর্যাদা দেন। রাণী হলেও কৃষক পরিবারের কন্যা শিরোমণি কৃষকদের দুঃখকষ্টের কথা ভোলেননি। তাদের সুখে দুঃখে সর্বদা পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। প্রজাদের সন্তানবৎ লালনপালনের চেষ্টা করেছেন। রাণীর ব্যক্তিত্ব, মধুর বাক্য ও ব্যবহারের জন্য প্রজাদের কাছে তিনি মাতৃরূপিনী ছিলেন।[৭]

ইংরেজরা রাণীর সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে খারাপ ব্যবহার করতে থাকে। রাণীর জমিদারী হস্তগত করার জন্য নানা অছিলার আশ্রয় নেয়। ১৭৯৪ সালে রামগড়ের কালেক্টার অভিযোগ তুললো রাণী শিরোমণি ও তাঁর আত্মীয়বর্গ, প্রজাসাধারণ কেউই ইংরেজদের সাথে যথাযথ ও আশানুরূপ ব্যবহার করছে না, তাদের ব্যবসার ভীষণ ক্ষতি করছে। এই অজুহাতে কালেক্টার প্রথমেই আঘাত হানার জন্য ১৭৯৪ সালের ১৮ই জানুয়ারি রাণীর জমিদারী পরিচালন ব্যবস্থার কর্তৃত্ব গ্রহণ করে।[৮]

অবশ্য রাণী ইংরেজ বিদ্বেষী এই সন্দেহ ইংরেজদের বহুদিন থেকে ছিল এবং তার সঙ্গত কারণও ছিল। যেমন ১৭৮৪ সালের ৮ই জুলাই কর্ণগড়ে কৃষকবিদ্রোহ দেখা দেয়— কর্ণগড়ের সীতারাম খান ও বনসুরাম (বাঞ্ছারাম) বক্সীর নেতৃত্বে। রাণী শিরোমণি এই বিদ্রোহীদের সমর্থন জানায়। ইংরেজ কোম্পানি শঙ্কিত হয়ে পড়ে। সৈন্য পাঠিয়ে সীতারাম ও বাঞ্ছারামকে বন্দী করে বিচারের

জন্য মেদিনীপুরের ফৌজদারী কোর্টে পাঠিয়ে দেয় এবং একটি স^^কারি নির্দেশনামায় রাণীকে এই বলে সতর্ক করে দেওয়া হয় যে ভবিষ্যতে তিনি যদি আবার চোয়াড় জাতীয় অসভ্য মানুষদের বিদ্রোহে সাহায্য করেন তাহলে তাঁকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হতে পারে।[৯] ১৭৯০ সালে মেদিনীপুরের রাণী শিরোমণির ১১৯৫ টাকা খাজনা বাকী পড়ায় তাঁর খাজনামুক্ত নানকর জমি ইংরেজ প্রশাসন ক্রোক করে দেয়।[১০] এইরূপ বহু অবিচার শিরোমণির উপর নেমে আসে। রাণীর ইংরেজ বিদ্বেষ চরমরূপ নেয় যখন ইংরেজরা তাঁর সন্তানবৎ প্রজাদের 'পাইকান' জমি কেড়ে নেয়। তিনি উপায়ান্তর না দেখে বিদ্রোহী কৃষকদের নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসেন।

অষ্টাদশ শতকের আশির দশক থেকে জঙ্গল মহলের আর্থিক সংকট চরমরূপ ধারণ করতে থাকে। ১৭৮৮ সালে লবনের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, ১৭৮৯ সালে মারাঠা আক্রমণের ধাক্কা এবং ১৭৯১ সালে রাজা সুন্দবনারায়ণের অতিরিক্ত করসংগ্রহ কৃষকদের চরম আর্থিক দুর্দশার মধ্যে ফেলে দেয়। তাছাড়া, তখন মেদিনীপুর জমিদারীর অধিকাংশ অঞ্চল ছিল জঙ্গলাবৃত ও অনুর্বর, তাই জনবিরল। যেটুকু চাষযোগ্য জমি তাদের ছিল তাতে ভালো ফসল ফলতো না, আয়ও বেশি হতো না। তাই চাষবাসে তারা মনোযোগীও তেমন ছিল না।[১১] সামরিক জীবন তারা বেশি পছন্দ করতো। টাকা পেলে ইংরেজদের হয়েও তাদের যুদ্ধ করতে আপত্তি ছিল না। তারা ইংরেজ কোম্পানির হয়ে দাক্ষিণাত্য, মহীশূর, উত্তর ভারত ইত্যাদি অঞ্চলেও যুদ্ধ করতে গেছে।[১২] কিন্তু এদের স্বার্থে যখন ইংরাজরা ঘা দিয়েছে, তাদের নিষ্কর পাইকান জমি কেড়ে নিয়েছে, তারাও প্রত্যাঘাত হেনেছে। তাদের অতিপ্রিয় রাণীর জমিদারী কেড়ে নিলে তারা আরো ক্ষুব্ধ হয়ে বিদ্রোহী হয়েছে।

মেদিনীপুরের জমিদারীর অন্তর্গত পাইক-বরকন্দাজেরা ইংরেজদের চোখে ছিল অসভ্য, জংলী, চোয়াড়। আসলে এই পাইক বরকন্দাজেরা ছিল সাধারণ খেটে খাওয়া গরীব কৃষক। বনজ সম্পদ সংগ্রহ করা ছাড়া এদের মূল পেশা ছিল কৃষিকাজ। পাইকের কাজ করতে ভূনজ্ (ভূমিজ), কুরমালি, কোড়া, মুণ্ডারী, কুর্মী, বাগদী, মাঝি, লোধা ইত্যাদি উপজাতিসমূহ। এরা বংশানুক্রমে দীর্ঘদিন ধরে এলাকার শান্তিরক্ষক হিসেবে কিছু নিষ্কর জমি ভোগদখল করছিল। ১৭৯৩-৯৪ সালে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মেদিনীপুর জমিদারী অঞ্চলে নতুন পাইক নিয়োগ করে সরকারের সরাসরি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য।[১৩] পাইক বরকন্দাজদের সমস্ত পাইকান জমিতে ইংরেজরা খাজনা বন্দোবস্ত করে। নিষ্কর জমিতে যে সব ভূমিহীন কৃষকরা চাষবাস করে, তার কিছু অংশ পাইকদের দিয়ে বাকিটাতে নিজেদের সংসার চালাতো, এখন তারাও ভূমিহীন হয়ে পড়লো। নতুবা বেশি টাকা দিয়ে

জমি বন্দোবস্ত নিতে বাধ্য হল ও শহরস্থ মহাজনদের দালালের শরণাপন্ন হয়ে কৃষি-ক্রীতদাসে পরিণত হল। মন্বন্তর, বর্গীর আক্রমণ, রাজনৈতিক অত্যাচার, ইংরেজদের সমর্থনপুষ্ট শহরস্থ বাবু মহাজনদের শোষণে নিষ্পেষিত কৃষকসমাজ তাই তাদের সমব্যাথী রাণী ইংরেজদের অন্যায় দেখলেই প্রতিবাদ জানাতে শুরু করলেন। তাঁর জমিদারীতে রতন সিং, রাম সিং, রঞ্জিত মহাপাত্র প্রভৃতি কয়েকজন সর্দার—তহশীলদারকে ইংরেজ সরকার যখন বরখাস্ত করা, এমনকি তাদের কোন জমি বন্দোবস্ত দিতে অস্বীকার করলো, তখন ইংরেজ প্রেরিত নিষ্ঠুর খাজনা আদায়কারী রামমোহন রায়কে তিনি হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

এই সময় মেদিনীপুর জমিদারীর অন্তর্গত কৃষক বিদ্রোহেব মূল কারণ ছিল তিনটি। এক, খাজনা বাকি পড়লে কৃষকদের জমি নিলাম হতো। দুই, নিষ্কর জমির খাজনা বন্দোবস্ত দেওয়া হলো। তিন, পাইক বরকন্দাজদের সামাজিক দায়িত্ব অস্বীকার করে পরিবর্তে বহিরাগত দারোগা ও পুলিশদের স্থানীয় শান্তিরক্ষার ভার অর্পণ করা হ'লো। তাদের শোষণের জন্য আবাব একটি নতুন ট্যাক্স ধার্য হলো ১৭৯৩ সালের ২২নং বেগুলেশান বলে। তার উপব জমিদাবী এলাকায় ব্যাপক বে-আইনী বাণিজ্যের প্রসার ঘটতে থাকে। চাষীদের নেশায় আচ্ছন্ন করে রাখার জন্য ইংরেজরা গোপনে বিনামূল্যে আফিম সরববাহ করতে থাকে।[১৪] তবু ইংরেজদের লাভ হলো না। চাষীদের সুখ দুঃখের অংশীদার রাণী শিরোমণির জমিদারী বাজেযাপ্ত হলে তারা ক্ষোভে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। মেদিনীপুর জমিদারীর মধ্যে যারা বাস কবতো তাদের অধিকাংশই ছিল পাইক। এরা জমিদারেব হয়ে লড়াই করতো, বিনিময়ে কিছু নিষ্কর জমি করতো। তাদের জীবন ধারণের উৎস সমূহ ইংরেজ কোম্পানি রূদ্ধ করে দিলে তারা সঙ্গতি সম্পন্ন, সুদখোর, ইংরেজ পদলেহনকারী ব্যক্তিদেব বাড়িতে ডাকাতি ও লুঠপাট শুরু করল। ইংরেজ ও তাদের আশ্রিত ও সমর্থনপুষ্ট ব্যক্তিদের তারা প্রধান শত্রু রূপে চিহ্নিত করল। রাণী এইসব ডাকাতি বা লুঠপাট বন্ধ করার চেষ্টা না করে বরং তাদের উৎসাহিত করতে থাকেন।[১৫]

রাণী শিরোমণি বিদ্রোহী হয়েছিলেন মূলত কযেকটি কারণে। এক, তাঁর জমিদারীর ম্যানেজমেন্ট ইংরেজরা ১৭৯৪ সালে কেড়ে নেওয়ায় তিনি অপমানিত ও ক্ষুব্ধ হন। দুই, রাণীর সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের সাথে ইংরেজদের মাখামাখি গলাগলি রাণীকে শঙ্কিত করে তুলেছিল। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করার অভিপ্রায়ে এইসব চক্রান্তমূলক প্রচেষ্টা। সর্বোপরি তাঁর পিতৃপরিবার ও আত্মীয় সবাই কৃষক ছিল। ইংরেজদের নতুন ভূমিব্যবস্থার ফলে এখানকার কৃষক সম্প্রদায় দারুণ আর্থিক দুর্গতির মধ্যে পড়ে। সরকারকে খাজনা দিয়ে যা তাদের উদ্বৃত্ত থাকতো তাতে তাদের ওপর প্রতিনিয়ত চলতো ইংরেজ সেপাই, তহশীলদার,

গোমস্তা ইত্যাদির নিত্য নিপীড়ন ও শোষণ। এসময় শুধু গরীব চাষীরা সর্বস্বান্ত হয়নি, মাঝারি কৃষকেরাও হয়েছিল। আত্মীয়, পরিবার-পরিজনদের উপর ইংরেজদের শোষণ ও শাসন রাণীকে বিচলিত করে তুলেছিল। তিনি স্বেচ্ছায় ও স্বপরিকল্পনায় ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন। আন্দোলনের সমস্ত কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব নিজের কাঁধে নিয়েছিলেন।

আজ থেকে প্রায় দুশ বছর আগে রাণী শিরোমণি জঙ্গলমহাল থেকে ইংরেজদের বিতাড়িত করার জন্য যে কৌশল অবলম্বন করেছিলেন তা তারিফ করার মতো। তাঁর প্রথম পদক্ষেপ ছিল নিজের জমিদারীর সমস্ত প্রজার সমর্থন অর্জন করা। প্রজাদের দুঃখকষ্টে তিনি পাশে এসে দাঁড়াতেন বলে গণ সমর্থন অর্জন করতে তাঁকে অপেক্ষা করতে হয়নি। জঙ্গলমহালের বিশেষত তাঁর জমিদারীর প্রায় সমস্ত উপজাতি সর্দারদের সাহায্যের আশ্বাস তিনি পেয়েছিলেন।[১৬] তাছাড়া তিনি বুঝেছিলেন পার্শ্ববর্তী জমিদারদের সাহায্য ও সমর্থন না পেলে তাঁর আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়বে। একই সঙ্গে ইংরেজ ও পার্শ্ববর্তী জমিদারদের মোকাবিলা করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। এই কারণে বিদ্রোহ শুরু করার পূর্বে তিনি পার্শ্ববর্তী জমিদারদের নিয়ে একটি গোপন বৈঠক করেন। এ বৈঠকে তিনি গুরুত্ব দিয়ে বিশ্লেষণ করেন— ইংরেজ কেন সবার শত্রু। শুধু তাই নয়— এই ইংরেজ বিরোধী গণআন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য তিনি জমিদারদের আহ্বান করেন।[১৭] তাঁর নিজের কর্তব্য ও দায়িত্বের কথা বৈঠকে পেশ করেন।

রাণী প্রথমাবধি ইংরেজ বিরোধী ছিলেন। সব সময়ই তিনি ইংরেজ বিরোধীদের সাহায্য করেছেন। যেমন ১৭৬৭ সালের নভেম্বর মাসে নাড়াজোলের জমিদার অযোধ্যারাম ইংরেজদের খাজনা দিতে অস্বীকার করলে কর্ণগড়ের রাণী শিরোমণি তাঁকে আশ্রয় দেন। এ সমস্ত কারণে তিনি প্রজাপ্রিয় ও জমিদারদের আস্থাভাজন ছিলেন। এর প্রমাণ পাওয়া যায় যখন দেখি কর্ণগড়ের রাণী শিরোমণির নিষ্কর জমির নিলাম ডাক শুরু হলে কোন পার্শ্ববর্তী জমিদার এমন কি কোন মহাজনও ঐ জমি নিলামে ডেকে নিতে এগিয়ে আসেননি। অবশ্য মহাজনেরা ভয়ে নিলামে অংশ নেয়নি।[১৮] ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কৌশল হিসাবে তিনি গেরিলা পদ্ধতিকে বেছে নিয়েছিলেন। কারণ মেদিনীপুর জমিদারীর অধিকাংশ অঞ্চল ছিল ঘন জঙ্গলাবৃত। জঙ্গলের ভিতর থেকে তীর ধনুক নিয়ে অতর্কিতে ইংরেজ সৈন্য আক্রমণ করে গা ঢাকা দেওয়া সহজ ছিল।[১৯] আবার কোন কোন সময় কৌশল প্রয়োগ করে ইংরেজ সেনাবাহিনীকে দুর্বল করে দিতেন। যারা ইংরেজকে সমর্থন করতো, সাহায্য করতো তাদের ঘরবাড়ি লুঠপাটের আদেশ দিতেন এবং অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করে কখনও তাদের মেরে রাস্তার ধারে গাছে তাদের মৃতদেহ ঝুলিয়ে রাখার ব্যবস্থা করতেন। রাণীর আদেশে বিদ্রোহী কৃষকরা লুণ্ঠনজাত সামগ্রী

কর্ণগড়ে এনে ভাগাভাগি করে নিত।[২০] রাণী শিরোমণির নেতৃত্বে বিদ্রোহ এমন চরমরূপ ধারণ করেছিল যে ইংরেজরা তাদের পরিবার পরিজনদের কলকাতায় পাঠিয়ে দিতে শুরু করেছিল নিরাপত্তার কারণে। গ্রামের যে সব কৃষক ইংরেজদের আদেশ শিরোধার্য করেছিল তাদের গ্রাম ছেড়ে, সব ফেলে রেখে শহরে আসতে বাধ্য করল। ইংরেজদের পদলেহনকারী মহাজন ও সম্পন্ন কৃষকদের সম্পত্তি লুঠপাট হল, তাদের জমির ধান কেটে নিয়ে গরীব কৃষকদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া হল। বিদ্রোহী সর্দাররা এলাকার সমস্ত কৃষককে জানিয়ে দিল— কোনভাবেই ইংরেজদের বা তার প্রতিনিধিদের খাজনা দেওয়া চলবে না। এই নিয়ম লঙ্ঘন করলে তাদের হত্যা করা হবে।[২১] এ হলো তাদের রাণী শিরোমণির আদেশ। সম্পন্ন কৃষক যারা বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেনি তারা ঘর ছেড়ে শহরে পালিয়ে এলো। চাষবাস বন্ধ হয়ে পড়ার উপক্রম হলো। খাজনা আদায় করা ইংরেজদের আর সম্ভব হলো না। ইংরেজরা দারুণ আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির মধ্যে পড়লো। এমনকি মেদিনীপুর শহরের নিরাপত্তাও বিপন্ন হয়ে পড়লো। অথচ ইংরেজরা তখনও সঠিক বুঝে উঠতে পারেনি যে এ সমস্ত বিদ্রোহ ও ক্ষয়ক্ষতির মূলে আছেন শিরোমণি। মেদিনীপুরের কালেক্টার তখনও আশা কবেছিলেন যে রাণী শিরোমণি ও তাঁর সহযোগী নাড়াজোলার জমিদার আত্মীয় চুনীলাল খান এইসব জংলী চোয়াড় পাইকদের আয়ত্বে রাখতে না পেরে এদেরই হাতে শেষ হবে। কালেক্টার তাই আদেশ দিয়েছিলেন কর্ণগড়ের দুর্গ রক্ষার জন্য রাণী যে আবেদন করেছন তাতে সাড়া দিয়ে এখনই যেন কোন সেপাই সেখানে না পাঠানো হয়। কারণ তাঁর মতে রাণী তখন খুব বিপজ্জনক অবস্থায়।[২২] আসলে রাণী ইংরেজদের সাথে মোকাবিলা করার জন্য যে কৌশল অবলম্বন করেছিলেন তা কালেক্টার প্রথমে বুঝে উঠতে পারেন নি। কর্ণগড়, নাড়াজোল প্রভৃতি অঞ্চল দখলের জন্য যখন ইংরেজরা নতুন করে সৈন্য কলকাতা থেকে আমদানী করছিল তখন ঐ সৈন্যবাহিনীকে বিভাজিত করে, দুর্বল করে, অতর্কিতে জেলা প্রশাসনের মূলকেন্দ্র মেদিনীপুর শহর আক্রমণের পরিকল্পনা তিনি নিয়েছিলেন। তাই তিনি জেলা প্রশাসনকে জনিয়েছিলেন যে তিনিও পাইকদের বিদ্রোহে অতিষ্ঠ এবং তাঁরও সম্পত্তি পাইকরা ডাকাতি করে নিয়েছে। এ অবস্থায় জেলা কালেক্টর যেন সেপাই পাঠিয়ে দুর্বৃত্ত পাইকদের হাত থেকে তাঁকে রক্ষা করেন। কিন্তু রাণীর দুর্ভাগ্য তাঁরই নায়েব যুগলচরণ কর্ণগড়ের রাজা হওয়ার আশায় সমস্ত বিষয় গোপনে ইংরেজদের জানিয়ে দেয় এবং আরও জানায় যে ইংরেজরা যদি রাণীকে সরিয়ে তাকে কর্ণগড়ের জমিদার করে তাহলে ইংরেজদের তিনি অনেক বেশি খাজনা দেবেন।[২৩] এবার সমস্ত বিষয় ইংরেজদের কাছে পরিষ্কার হলো। ইংরেজরা রাণীকেই সমস্ত গন্ডগোলের জন্য দায়ী করলো এবং কৌশলে রাণীকে দমন করার জন্য সচেষ্ট হলো। প্রথমে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কমান্ডিং অফিসারকে

আবাসগড় দখল করতে আদেশ দিলেন। কৃষক বিদ্রোহের কার্যস্থল আবাসগড়ে থাকতেন রাণীর সহযোগী চুনীলাল খান। আবাসগড় আক্রমণ করে ইংরেজ আগে রাণীর ডানহাত ভেঙ্গে দিতে চাইলো। কয়েকদিন পর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, রাণী, চুনীলাল খান ও নরনারায়ণ বক্সীর নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি করে একদিকে কর্ণগড় অন্য দিকে আবাসগড়ে দ্বিমুখী আক্রমণ চালালেন। অতর্কিত আক্রমণে শিরোমণি আত্মগোপন করার সুযোগ পেলেন না। ইংরেজরা আবাসগড় ও কর্ণগড় দখল করে রাণীকে ও রাণীর সহযোগী পাইক যারা কর্ণগড় দখল করে রাণীকে ও রাণীর সহযোগী সমর্থকদের বন্দী করে। ৩০০ জন কৃষক বিদ্রোহী তথা পাইক যারা কর্ণগড়ের কাছাকাছি জঙ্গলে অবস্থান করছিল তারা এই অকস্মাৎ আক্রমণে কোনক্রমে আত্মগোপন করে।[২৪] কর্ণগড় ও তার আশপাশ জনমানবহীন হয়ে পড়ে। সমস্ত গোলমালের জন্য ইংরেজরা রাণীকে দায়ী করে ১৭৯৯ সালের ৬ই এপ্রিল বন্দী করে। শিরোমণি, চুনীলাল খান, নুরু বক্সী প্রভৃতিকে দুর্গের অর্ডিনেন্স ডিভিসনে বন্দী করে রাখা হয়। কারুর সাথে বন্দী অবস্থায় রাণী সাক্ষাৎ করতে পারবেন না বলে আদেশ দেওয়া হয়। বিশেষ প্রয়োজনে, ভারতীয় কোন বিশ্বস্ত পদস্থ কর্মচারীর উপস্থিতিতে, রাণী কয়েক মিনিটের জন্য কারুর কারুর সঙ্গে কথা বলতে পারতেন। কারণ কথাবার্তার বিষয়বস্তু ঐ পদস্থ সরকারী কর্মচারী কর্তৃক ইংরেজরা জানতে পারবে।[২৫]

রাণীকে আদালতে অভিযুক্ত করার জন্য জেলা প্রশাসন কেস সাজাতে থাকে। কর্ণগড়ে অনেক যুদ্ধাস্ত্র পাওয়া গেছে বলে তারা অভিযোগ তোলে। যেমন ২৭টি গাদা বন্দুক, ৪টি বিলাতি গাদা বন্দুক, ২৫টি তলোয়ার, ৪টি যুদ্ধ কুঠার, ৪টি বল্লম, ১০টি ক্ষুদ্র গোলাকার ঢাল, ৫টি বাঁশের ধনুক, ১৪টি ধনুকের তীর রাখার ক্ষুদ্র থলি, ৯টি ছোরা, ৪টি গুঁড়া বারুদের অস্ত্র এবং একটি রৌপ্য আবৃত ছোট তলোয়ার। এই যুদ্ধাস্ত্রগুলি রাণীর বিচারের দিন প্রমাণ হিসাবে পেশ করার জন্য ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সেনাবাহিনী কর্ণগড় থেকে মেদিনীপুরে নিয়ে আসে।[২৬] উল্লেখ্য, একটি বড় জমিদারের বাড়িতে উপরোক্ত যুদ্ধাস্ত্র মজুত রাখা অতি সাধারণ ব্যাপার ছিল। তখনকার দিনে এর চেয়ে অনেক বেশি যুদ্ধাস্ত্র অনেক ছোট ছোট জমিদারদের থাকতো। বস্তুতপক্ষে রাণী নিজের গড়ে বেশি যুদ্ধাস্ত্র মজুত রাখেননি। অধিকাংশ অস্ত্র বিদ্রোহী কৃষকদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্য।

প্রথমে ইংরেজরা রাণীকে কর্ণগড় দুর্গে ও নাড়াজোলের জমিদার চুনীলাল খান ও নরনারায়ণ বক্সী দেওয়ানকে মেদিনীপুর জেলে বন্দী করে রাখে। কিছুদিন পরে এঁদের সবাইকে বিচারের জন্য কলকাতা পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বিশাল সংখ্যক সেপাই কর্ণগড়, আবাসগড় ও নাড়াজোলে মোতায়েন করা হয়। ২০শে

যে জেলায় ৫ কোম্পানি অতিরিক্ত সেপাই কলকাতা থেকে আনা হয় এবং কিছু সেপাইকে মূল উপদ্রুত অঞ্চলসমূহে যেমন, আনন্দপুর, সংপতি, কর্ণগড়, শালবনি, গোপীবল্লভপুর ও বলরামপুরে মোতায়েন করা হয়। সহযোগী হিসাবে থাকে সুবাদার, জমাদার, হাবিলদার, নায়েক প্রভৃতি যাদের মোট সংখ্যা ছিল (সেপাই সহ) ৩০৯ জন।[২৭]

রাণী শিরোমণির চূড়ান্ত বিচার মেদিনীপুরেই হয়। নাড়াজোলের জমিদার সীতারাম খানের পুত্র আনন্দলাল খানের মধ্যস্ততায় কোম্পানীর সঙ্গে রাণীর মিটমাট হয়। বিচারে তিনি মুক্তি পান। চুনীলাল খান ও নরনারায়ণ বক্সীকেও আবাসগড় দুর্গে কার্যতঃ নজরবন্দী করে রাখা হয়। এখানেই তিনি জীবনের শেষ তের বছর কাটিয়ে ১৮১২ সালে ইহলোক ত্যাগ করেন।

রাণী শিরোমণি যথার্থই ছিলেন রাণী। তিনি ছিলেন সুন্দরী, বুদ্ধিমতী, সাহসী ও প্রজাহিতৈষী। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। মেদিনীপুর জমিদারীর অর্ধেক ভাগ তিনি পেয়েছিলেন। সাধারণ কৃষক প্রজাদের স্বার্থের কথা বিবেচনা না করে, বিদ্রোহে নেতৃত্ব না দিযে, আর পাঁচটা জমিদার গৃহিণীর মত তিনি আরামে বিলাসে জীবন কাটিযে দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। গ্রামের সাধারণ পরিবেশে তাঁর বাল্যকাল অতিবাহিত করে তিনি কৃষকদের দুর্দশা স্বচক্ষে দেখেছেন, এমনকি নিজেও অনুভব করেছেন। তাই ধনী জমিদারের গৃহিণী হয়েও তিনি কৃষক প্রজাদের স্বার্থের কথা ভোলেননি। প্রায় অশিক্ষিত এই রমণীর আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল। তিনি দয়াদাক্ষিণ্য, দক্ষতা, বুদ্ধিমত্তার বলে প্রজাদের হৃদয় জয় করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁর জনপ্রিয়তার স্বাক্ষর মেলে একটি ঘটনা থেকে। তিনি যখন নিজামত আদালতের নির্দেশে কলকাতা থেকে মেদিনীপুরে বিচারের জন্য আনীত হচ্ছিলেন তখন পথিমধ্যে বানগ্রাজ গ্রামে তাঁব শত শত প্রজা, শুভানুধ্যায়ী, এমনকি প্রাক্তন দেওয়ান এসে তাঁকে শ্রদ্ধা ও সমবেদনা জানিয়েছিলেন। বাহ্যতঃ রাণী মুক্তি পেলেও কার্যতঃ তিনি ছিলেন বন্দিনী। রাণী শিরোমণিকে তাঁর সাহস, দৃঢ়তা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়ার জন্য বহু ক্লেশ ভোগ করতে হয়েছিল। তিনি যে, পাইক বা কৃষক বিদ্রোহের প্রকৃত নেত্রী বা কর্ণধার ছিলেন তার প্রমাণ মেলে যখন দেখা যায় তাঁকে বন্দী করার পরেই বিদ্রোহ একেবারে দমিত না হলেও বিদ্রোহের তীব্রতা অনেক কমে যায়।[২৮] কিন্তু বিদ্রোহীরা কিছুটা দমিত হলেও নিরুৎসাহিত হয়নি। তারা বিভিন্ন জায়গায় পূর্বের মত ইংরেজ ঘাঁটিগুলিতে আক্রমণ চালাতে থাকে। ১৮০০ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারি আরনেস্ট, রেভেনিউ বোর্ডের সভাপতি কাউপারকে এক পত্র মারফৎ জানিয়েছিলেন যে চুয়াড় কৃষকেরা নতুন নিলামদার, জমিদারদের জমি আক্রমণ করা শুরু করেছে। বিভিন্ন জায়গায় ঘরবাড়ি লুঠপাট করছে কিংবা

পুড়িয়ে দিচ্ছে। সুযোগ. পেলেই ইংরেজদের লোককে হত্যা করছে। ভিখারী ছদ্মবেশে অতর্কিতে মহাজন ও ইংরেজ কর্মচারীদের হত্যা করছে।[২৯]

অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করে কৃষক পাইকদের খাজনা অনেকক্ষেত্রে মকুব করা হল। বিক্ষুব্ধ কৃষকদের নিষ্কর জমি নাম মাত্র জমায় ফিরিয়ে দেওয়া হল এবং সর্বোপরি শান্তিরক্ষার ট্যাক্স মকুব করে সুপ্রাচীন জমিদারদের উপর স্থানীয় শান্তিরক্ষার ভার অর্পণ করা হলো। তারা হিন্দুযুগ থেকে যেসব ঘাটোয়ালী অধিকার ভোগ করে আসছিল তা সবই বলবৎ রাখা হল। রাজনৈতিক বন্দীদের অনেককেই ক্ষমা করা হল। তবু বিদ্রোহের আগুন নির্বাপিত হল না। প্রথমে ১৮০৬, পরে ১৮৩২ সালে আবার জঙ্গলমহালের কৃষকেরা ইংরেজ শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে তীব্র সশস্ত্র প্রতিবাদ জানাল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে জঙ্গলমহালের কৃষক বিদ্রোহ ও রাণী শিরোমণি দুটি অবিচ্ছেদ্য বিষয়। একে অপরের পরিপূরক। মেদিনীপুর জমিদারীর কৃষক বিদ্রোহ মানেই রাণী শিরোমণি, রাণী শিরোমণি মানেই কৃষক বিদ্রোহ। প্রায নিরক্ষর এই কৃষক কন্যার কৃষক ও গরীব দুঃখীদের জন্য আত্মত্যাগ, বুদ্ধি ও কৌশল বিস্ময়ের উদ্রেক করে। তিনি সম্ভবত ইংরেজদের হাতে ভারতের প্রথম রাজনৈতিক বন্দিনী। ভারতের কৃষক বিদ্রোহের ইতিহাসে তাঁর নাম চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

সূত্র নির্দেশ

১. তরুণদেব ভট্টাচার্য্য, পশ্চিমবঙ্গ দর্শন। মেদিনীপুব, (কলিকাতা ১৯৭৯), পৃ. ১৯০

২.* ডাবলিউ. ডাবলিউ. হান্টাব, স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যাকাউন্ট অব বেঙ্গল, তৃতীয় খণ্ড, (লণ্ডন, ১৮৭৬), পৃ. ৫

৩. জুডিশিয়াল ডিপার্টমেন্ট (ক্রিমিন্যাল) প্রসিডিংস। মেদিনীপুবের ডিষ্ট্রিক্ট কালেক্টব মিঃ মিহাট কর্তৃক বোর্ড অব বেভেনিউকে লিখিত পত্র, ৬ই এপ্রিল, ১৭৯৯।

৪. প্রাগুক্ত

৫. বিনোদশংকর দাস (সম্পা:), মেদিনীপুর: ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিবর্তন, প্রথম খণ্ড, (কলিকাতা, ১৯৮৯), পৃ. ৭০

৬. জগদীশচন্দ্র ঝা, দ্যা ভূমিজ রিভোল্ট, (১৮৩২-৩৩), (দিল্লী, ১৯৬৭), পৃ. ১৯

৭. হবিসাধন দাস, মেদিনীপুব সম্পদ, (মেদিনীপুর, ১৯৩৫,) পৃ. ২০৪

৮. রেভেনিউ বোর্ড মেদিনীপুরের অ্যাক্টিং কালেক্টার ডড ওয়েলকে লিখিত পত্র, ২৯শে জানুয়ারি ১৭৯৪

৯. গভর্নর জেনারেল কর্তৃক মেদিনীপুরের কালেক্টার জন পিয়ারীকে লিখিত পত্র, ২২শে জুলাই, ১৭৮২

১০. ১৭৯১ সালের ১৪ই এবং ১৯শে জানুয়ারিব লিখিত মেদিনীপুর জেলা কালেক্টারের পত্র। পত্রটি নরেন্দ্রনাথ দাসের হিষ্ট্রি অব মিড্নাপুর, প্রথম খণ্ডে ১৬৭ পৃষ্টায় উল্লিখিত।

১১. ভ্যানসিটার্ট কর্তৃক কালেক্টর জেনারেল জেম্স আলেকজাণ্ডারকে লেখা পত্র, মেদিনীপুর, ১০ই এপ্রিল, ১৭৬৯

১২. ভ্যানসিটার্ট কর্তৃক লেফ্টেন্যান্ট নান কে লিখিত পত্র, মেদিনীপুর, ৩১শে মার্চ, ১৭৭০

১৩. রেভেনিউ বোর্ড কর্তৃক মেদিনীপুরের অ্যাক্টিং কালেক্টার ডড ওয়েলকে লিখিত পত্র, ২৯শে জানুয়ারি, ১৭৯৪

১৪. বিনোদশংকর দাস, জঙ্গলমহাল ও মেদিনীপুরের গণবিক্ষোভ, (মেদিনীপুর, ১৯৬৮), পৃ. ৩৪

১৫. মেদিনীপুর জাজেস্ কোর্ট রেকর্ড রুমে রক্ষিত মেদিনীপুর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হেনরী স্ট্র্যাচির নোট্স, মেদিনীপুর, ১৮০২

১৬. প্রকাশ চট্টোপাধ্যায়, কর্ণগড়েব কথা— সাধনা ও কাব্য, (কলিকাতা, (?)), পৃ. ১০

১৭. জে.সি. প্রাইস, দ্যা চুয়াড় রেবেলিয়ন অব ১৭৯৯। বিনোদশংকর দাসের চেঞ্জিং প্রোফাইল অব দ্যা ফ্রন্টিয়ার বেঙ্গল, (দিল্লী, ১৯৮৪), ২৬৪ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত।

১৮. বিনোদশংকর দাস, জঙ্গলমহাল ও মেদিনীপুরের গণবিক্ষোভ, (মেদিনীপুব, ১৯৬৮), পৃ. ৩৪

১৯. প্রকাশ চট্টোপাধ্যায়, কর্ণগড়ের কথা— সাধনা ও কাব্য, (কলিকাতা,(?)), পৃ. ৮

২০. নরেন্দ্রনাথ দাস, হিষ্ট্রি অব, মিড্নাপুর, প্রথম খণ্ড, (মেদিনীপুর, ১৯৫৬), পৃ. ২০৮

২১. বিনোদশংকর দাস, চেঞ্জিং প্রোফাইল অব্ দ্যা ফ্রন্টিয়ার বেঙ্গল, (দিল্লী, ১৯৮৪), পৃ. ২৩১

২২. প্রকাশ চট্টোপাধ্যায়, কর্ণগড়ের কথা— সাধনা ও কাব্য, (কলিকাতা, (?)), পৃ. ১১

২৩. প্রাগুক্ত পৃ. ১৩

২৪. নরেন্দ্রনাথ দাস, হিষ্ট্রি অব্ মিড্নাপুর, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২১১-২১২

২৫. জুডিশিয়াল ডিপার্টমেন্ট (ক্রিমিন্যাল) প্রসিডিংস, ভলিউম ৫০ অ্যাডজুট্যান্ট জেনারেল স্কটকে প্রেরিত মেদিনীপুরের কম্যান্ডিং অফিসার এস. ওয়াটসনের রিপোর্ট, ৭ই এপ্রিল, ১৭৯৯

২৬. জুডিশিয়াল ডিপার্টমেন্ট (ক্রিমিন্যাল) প্রসিডিংস, ভলিউম ৫০ মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট রবার্ট গ্রেনার্জের রিপোর্ট, ৫ই এপ্রিল, ১৭৯৯

২৭. এল. এস. এস. ওম্যালে, বেঙ্গল ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার্স, মিডনাপুর, (ক্যালকাটা, ১৯১১), পৃ. ৪২

২৮. নরেন্দ্রনাথ দাস, হিষ্ট্রি অব্ মিডনাপুর, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২১৪

২৯. কর্নেল ডুনকে লিখিত মেদিনীপুর কালেক্টরের পত্র, মেদিনীপুর, ২১শে মার্চ, ১৭৯৯

বরিশাল ব্রাহ্মসমাজ

কানাইলাল চট্টোপাধ্যায়

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ ব্রাহ্ম সংস্কার আন্দোলনে প্রভূত পরিবর্তন সাধন করেছিল। এই সময়ের অন্যতম নেতা হলেন কেশবচন্দ্র সেন। কেশবচন্দ্রের যুগকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। (১) কেশবচন্দ্র ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যে সার্বিক সহমর্মিতার যুগ (১৮৫৮-৬৫), (২) কেশবচন্দ্রের সংস্কার আন্দোলনের চরম বহিঃপ্রকাশের যুগ (১৮৬৬-৭৮) ও (৩) কেশবের ক্রমাগত সমাজসংস্কারক রূপে পতন ও দ্রুত নবীন উদার ব্রাহ্মদের উদ্ভব (১৯৭৮—৮৪)।

কেশবচন্দ্র ১৮৫৮ সালে ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন। সেই সময়ের ভারতীয় সমাজ কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল। সমকালীন ইউরোপের যুক্তিবাদী চিন্তা সমাজের শিক্ষিত ব্যক্তিদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। যুক্তির বিচারে ধর্ম আলোচিত হচ্ছিল। সময়োপযোগী হয়ে ধর্মের পরিবর্তন একান্ত প্রয়োজন ছিল। ধর্মের নূতন সঞ্চার প্রয়োজন ছিল। কেশবচন্দ্র একদিকে কঠোর যুক্তিবাদ ও অপরদিকে ধর্মের গোঁড়ামীকে চ্যালেঞ্জ জানালেন। তিনি বললেন ধর্মের চরিত্র যুক্তিহীনতা বা অবৈজ্ঞানিক নয়।[১]

১৮৬৫ সালে কেশবচন্দ্র স্মরণীয় পূর্ববাংলা ভ্রমণ সমাপ্ত করেন। এবারে তিনি ময়মনসিংহ, ফরিদপুর ও ঢাকা পরিভ্রমণ করেন। এই ভ্রমণে তাঁর সহচর ছিলেন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও অঘোরনাথ গুপ্ত। তাঁর জনপ্রিয় বক্তৃতায় এইসব স্থানের শিক্ষিত ব্যক্তিরা এতই অভিভূত হন যে এইসব স্থানে ব্রাহ্মসমাজের শাখা স্থাপিত হয়। এরপর বরিশাল, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা প্রভৃতি স্থানেও শাখা সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ব্যাপারে গোঁড়া হিন্দুদের সঙ্গে সংঘাত উপস্থিত হয় এবং তাঁরা "হিন্দু ধর্ম রক্ষিণী সভা" ঢাকায় প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর তিনি "Indian Mirror" পত্রিকায় উদাত্ত আহ্বান জানালেন "Brahmos Arise" এবং নতুন ধর্মকে যতদূর সম্ভব বিস্তৃত করা। এরপর তিনি প্রচারকের কাজ নিয়ে বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করতে শুরু করেন। ১৮৬৮ সালে তিনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বোম্বাই ভ্রমণ করেন, এখানেও তিনি শিক্ষিত ভদ্রলোকদের মধ্যে তাঁর আদর্শ প্রচার করতে সক্ষম হন।[২] ১৮৬৯ সালে কেশবচন্দ্র আবার ঢাকায় যান। এরপর কলকাতায় "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ" প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময় সদস্য সংখ্যা ৫০০০ থেকে ৬০০০ এ দাঁড়ায়।[৩] এক দশকে ব্রাহ্মদের সংখ্যা ১৫০০ থেকে ৬০০০ এ উন্নীত হয়। এর পেছনে কেশবচন্দ্রের বাগ্মিতা ও বক্তৃতা নিঃসন্দেহে সবিশেষ কার্যকর ছিল।

আগেই বলা হয়েছে পূর্ববঙ্গে ব্রাহ্মসমাজ প্রথম ঢাকাতে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি কলকাতার বাইরে প্রতিষ্ঠিত প্রথম সমাজ। ঢাকা সমাজের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন ব্রজসুন্দর মিত্র, যাঁর সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কখনও দেখা হয়নি। শিবনাথ শাস্ত্রীর মতে ব্রজসুন্দরবাবুর ব্রাহ্মসমাজের প্রতি এই আকর্ষণের মূলে ছিল "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার" প্রভাব। যাতায়াতের অব্যবস্থা ও প্রচারকের অভাবে এই সময়ে ব্রাহ্মসমাজের বিকাশে "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" বিরাট ভূমিকা পালন করে। ঢাকার সমাজ প্রতিষ্ঠিত হলে কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ হয় এবং পূর্ববঙ্গে ব্রাহ্ম ধর্ম বিস্তারে কলকাতার সমাজ সমভাবে সাহায্য করে।[৪]

ঢাকায় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের পর ১৮৭০ সালের আগে পূর্ববঙ্গের প্রায় প্রধান প্রধান শহরগুলিতে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়েছিল। ঢাকার সমাজ সংহত হবার পর বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচারক পাঠান হয়েছিল। ঐ ব্যাপারে কলকাতা থেকে প্রেরিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, কালীনারায়ণ গুপ্ত ও কেশবচন্দ্র সেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালান করেছিলেন। প্রচারকদের প্রচার ছাড়াও কোন ব্রাহ্ম নিজ কর্মস্থল ছেড়ে অন্য কর্মস্থলে গেলে একটি ব্রাহ্মসমাজ গড়বার চেষ্টা করতেন।

বাংলাদেশে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে বরিশালে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ১৮৬০ সালে রামতনু লাহিড়ী বরিশাল জেলাস্কুলের হেডমাস্টার হয়ে এলে বরিশালে ব্রাহ্ম আন্দোলনের সূচনা হয়। তিনি অবশ্য বেশীদিন বরিশালে ছিলেন না কিন্তু তাঁর থাকাকালীন অবস্থান তাঁর ছাত্রদের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। তিনি ছাত্রদের জন্য উদার মতবাদের যে বীজ বপন করেছিলেন তা প্রায় মহীরুহে পরিণত হয়। তাঁর পদপ্রান্তে বসে যে কজন ছাত্র নব্যধর্মমতে আকৃষ্ট হয়েছিলেন তাঁদের অন্যতম ছিলেন বরিশালের নিকটে লাখুটিয়ার জমিদার বাড়ির সন্তান রাখালচন্দ্র রায়। তাঁর পিতা ছিলেন স্থানীয় আদালতের উকিল রাজচন্দ্র রায়। রামতনু রাখালচন্দ্র রায়ের উপর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়েছিলেন।

১৮৬১ সালে বরিশালে প্রথম ব্রাহ্মোপাসনা শুরু হয়েছিল। ঢাকা নর্মাল স্কুল থেকে পাশ করে পাঁচ জন ছাত্র কর্মোপলক্ষে বরিশাল এসে মিলিত হয়েছিলেন। এঁরা হলেন নন্দকুমার সেন, হরিশচন্দ্র মজুমদার, গোপালনাথ রায়, বৈদ্যনাথ রায় এবংললিতমোহন সেন। এদেরই প্রচেষ্টায় প্রথম ব্রহ্মোপাসনা শুরু হয়েছিল। এঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন রামতনু লাহিড়ী প্রভাবিত লাখুটিয়ার জমিদার পুত্র রাখালচন্দ্র রায়। এই পাঁচ জন সম্ভবত ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন ঢাকার ব্রজসুন্দর মিত্রের প্রভাবে। এদের সঙ্গে আর এক যুবক মিলিত হলেন, আনন্দচরণ বর্মা। এরা সকলে রাখালচন্দ্র রায়ের গৃহেই গোপনে মিলিত হয়ে ব্রাহ্মোপাসনা করতেন। কিন্তু রাখালচন্দ্রের পিতা তা জানতে পেরে

বাধা দিয়েছিলেন, এর একটি কারণ ছিল। কলকাতা থেকে খবর আসে যে রাজচন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্র খৃষ্টধর্মের দিকে ঝুঁকেছে এবং জ্যেষ্ঠপুত্র রাখালচন্দ্র বাড়িতে গোপনে ব্রাহ্মোপাসনা করছে। তাই তিনি এই আন্দোলন বন্ধ করার নির্দেশ দিলেন।

সুতরাং এরপর থেকে রাখালচন্দ্ররা প্রতি বুধবার গাছের ছায়ায় বা নদীর তীরে মিলিত হতেন। এই সময় তাঁদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছিলেন স্কুল সমূহের ডেপুটি ইন্সপেক্টর শ্যামচন্দ্র বোস। তিনি তাঁর বাড়িতে একটি ঘর এদের উপাসনার জন্য ছেড়ে দিয়েছিলেন।[৫] এখন থেকে আবার নিয়মিতভাবে প্রার্থনা সভা বসতে লাগল।[৬]

এই সভাব সংকটের সময় তাঁদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ছিলেন দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জামাতা তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। একই সময়ে উভয়ে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হিসাবে বরিশালে এসে সমাজের কাজে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। এখন থেকে বরিশালের ব্রাহ্মরা প্রকাশ্যে কাজ শুরু করেছিলেন।[৭] এখন থেকেই বরিশালে সাধারণের মধ্যে ব্রাহ্ম সমাজ ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। বহু ব্যক্তি সমাজে যোগ দিলে কোন ক্ষতি হচ্ছে না দেখে এবং তারাপ্রসাদ চ্যাটার্জীর উৎসাহে সমাজে নিয়মিত যাতায়াত শুরু করেন।

নব্যযুবক দল কলকাতার ব্রাহ্মদের অনুসরণ করতে লাগলেন। এইসব চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁরা সমাজ সংস্কারেও মন দিলেন। প্রথম যে দুঃসাহসী কাজ তারা করেন তা হল এক খৃষ্টান ভদ্রলোকের বাড়িতে একত্রে আহার করেন। এতে বরিশালে সাংঘাতিক আলোড়ন শুরু হয়। গোঁড়া হিন্দুরা এই সব ব্যক্তিদের সমাজচ্যুত করতে উঠে পড়ে লাগেন।

এইভাবে সমাজের কাজ চলতে লাগল ১৮৬৫ সাল পর্যন্ত যখন এক বিরল ব্যক্তিত্ব বরিশালে উপস্থিত হলেন। স্থানীয় উকিল কাশীশ্বর দাসের পুত্র দুর্গামোহন দাস ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেন। তাঁর ব্রাহ্ম সমাজে যোগদান শুধু বরিশাল ব্রাহ্ম সমাজই নয়, সামগ্রিকভাবে ব্রাহ্ম সমাজের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে লেখাপড়ার সময় অধ্যাপক কাওয়েল-এর দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে খৃষ্টধর্মের দিকে আগ্রহী হন। এমনকি তিনি স্ত্রীসহ খৃষ্টধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করার সব ব্যবস্থা করেন। এই সময় দাদা হাইকোর্টের বিচারপতি কালীমোহন হস্তক্ষেপ করে দুর্গামোহনকে বরিশালের আদালতে প্রেরণ করেন। তিনি দুর্গামোহনকে থিওডোর পার্কারের রচনাবলী উপহার দেন। এই পুস্তকপাঠে তিনি খৃষ্টধর্ম গ্রহণ নাকচ করেন এবং বরিশালে এসে ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষিত হন। এই সময় তাঁকে সবচেয়ে বেশি সহায়তা করেছিলেন ডাঃ অন্নদাচরণ খাস্তগীর, গিরিশচন্দ্র মজুমদার

এবং .সর্বানন্দ দাস।[৮] এঁদের নাম বরিশালে ব্রাহ্ম সমাজের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। এই চার জন বরিশাল ব্রাহ্ম সমাজকে নতুন প্রাণদান করেছিলেন। এঁদের সক্রিয় সহায়তায় বহু নতুন সদস্য এবং সমর্থক বরিশাল সমাজে যোগ দিয়েছিল।

এখন প্রথম কাজ হল একটি ব্রাহ্মমন্দির স্থাপন করা। এর জন্য এঁরা সকলের কাছে সাহায্যের জন্য আবেদন করেন। অনেকেই এতে সোৎসাহে সমর্থন জানিয়ে উদার হাত বাড়িয়ে দেন। জমিদার চণ্ডীচরণ রায়ের দেওয়া একখণ্ড জমির উপর ব্রাহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে এর আরও উন্নতি হয়েছিল এবং এখানেই এখন থেকে ব্রাহ্মোপাসনা নিয়মিত হত।

এই সময়ে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রচারের উদ্দেশ্যে বরিশালে এসে পৌঁছেছিলেন। রাখালচন্দ্র তাঁকে নিজ বাড়িতে আমন্ত্রণ জানালে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ ক্ষুব্ধ হয়েছিল। রাখালচন্দ্র বিজয়কৃষ্ণকে লাখুটিয়ায় নিজ বাড়িতে রেখে তাঁর কাছে ধর্মশিক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁর স্ত্রী সৌদামিনীদেবীও ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করেন। পিতার মৃত্যুর পর সব বন্ধন মুক্ত হয়ে রাখালচন্দ্র ও তাঁর ভাই ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

ববিশালের ব্রাহ্মরা এখন থেকে এগিয়ে চলার নীতি গ্রহণ করেন। লাখুটিয়ায় যখন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর ধর্মপ্রচার চলছিল তখন বরিশাল শহরে দুর্গামোহন একের পর এক বিবাহ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এমনকি নিজের অকালে বিধবা বৈমাত্রেয় মায়ের স্থানীয় ডাক্তারের সঙ্গে বিবাহ দেন। এতে দুর্গামোহনের বন্ধুবান্ধব ও গোঁড়া হিন্দু সমাজ তাঁর উপর খড়্গহস্ত হয়ে ওঠেন। তাঁর মক্কেলরা তাঁকে ত্যাগ করল। রাস্তায় দেখা হলে লোকে মুখ ঘরিয়ে চলে যেতে লাগল। কিন্তু দুর্গামোহন অবিচল থেকে দৃঢ়ভাবে নিজের সমাজ সংস্কার কাজের দিকে দৃষ্টি দিলেন। এ ব্যাপারে তাঁকে তাঁর স্ত্রী অকুণ্ঠ সাহায্য করেছিলেন। শুধু তাঁর স্ত্রীই নন বরিশাল ব্রাহ্ম আন্দোলনে নেতাদের স্ত্রীদের ভূমিকা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা উচিত। মহিলাদের উন্নতির প্রশ্নে বরিশাল ব্রাহ্মসমাজ সোচ্চার হয়েছিল।

১৮৬৭ সালের প্রারম্ভে দুর্গামোহন কলকাতা পরিদর্শনে যান। ব্রাহ্মসমাজের প্রথম বিচ্ছেদে বরিশাল সমাজের সদস্যরা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই সময় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও অঘোরনাথ গুপ্ত পূর্ববঙ্গ ভ্রমণে যান এবং যেখানেই গেছেন সেখানে তাদের স্বতঃস্ফূর্ত বক্তৃতায় জনসাধারণকে ব্রাহ্ম আন্দোলনের দিকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছিলেন। পক্ষান্তরে যদুনাথ চক্রবর্তী বরিশালে থেকে সংস্কার আন্দোলন চালিয়ে যান, বিশেষ করে মহিলাদের মধ্যে। তাদের জন্য বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হয়, যেখানে সমাজের মেয়েরা দুপুরে জড়ো হয়ে বিদ্যালাভ করতে পারে। স্থানীয় ইংরাজ অফিসাররাও এত

৭।

আগ্রহী হয়েছিলেন। জেলাজজের স্ত্রী মিসেস বালফর মহিলাদের কার্পেট ও সূচীশিল্প শিক্ষা দিতেন। প্রচারকরা তাদের স্ত্রীদের নিয়ে বরিশালে থাকায় বরিশালের ব্রাহ্ম মহিলাদের উৎসাহ যোগায় এবং তাঁরা প্রতিটি সংস্কারমূলক কাজে অংগ্রহণ করেন এবং তাঁদের স্বামীকে সমভাবে সাহায্য করেন।

কিন্তু এই সংস্কার আন্দোলন বরিশালের গোঁড়া হিন্দুদের খুশি করতে পারল না। তাঁরা ব্রাহ্মদের একেবারে একঘরে করে দিলেন। তাদের চাকর-বাকর, ধোপা-নাপিত, রাঁধুনি প্রভৃতিকে ব্রাহ্ম বাড়িব কাজ করতে দেওয়া হল না ফলে ব্রাহ্মদের দৈনন্দিন বাড়ি পরিষ্কার থেকে নিজের যাবতীয় কাজ নিজেদের করতে হচ্ছিল। আমরা সবাই জানি বরিশালে নৌকাই একমাত্র যাতায়াতের উপায। তাই নৌকার মাঝদের নিষেধ করা হল ব্রাহ্মদের তাদের নৌকায় যেন পারাপার না করা হয়। একবার শিবনাথ শাস্ত্রী বরিশালে গিয়ে কি অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন দেখা যাক। বরিশালের কাজ শেষ করে তিনি নৌকা যোগে কলকাতায ফিরতে মনস্থ করেন। তাঁর সঙ্গে ব্রাহ্ম গিরিশচন্দ্র মজুমদার ছিলেন। প্রথমে শিবনাথ নৌকার হিন্দু মালিকদের কাছে গিয়ে বিফল হলেন। তিনি অবাক হয়ে এর কারণ বুঝতে চেষ্টা করেছিলেন। তখন একজন অনুচ্চারিত স্ববে বলেন এর কারণ তাঁর সঙ্গে গিরিশ মজুমদার মশাই আছেন তাই। এ থেকে খুব সহজেই বোঝা যায় যে বরিশালের ব্রাহ্মদের উপর কিরূপ অত্যাচার করা হত। স্বভাবতই তাদের মূল রাগ ছিল ব্রাহ্মনেতা দুর্গামোহন দাসের উপর।

বরিশাল ব্রাহ্ম সংস্কারকদের অন্যতম কৃতিত্ব হল তাঁরা লাখুটিয়ার জমিদার কন্যা দিনতারিণীর সঙ্গে কেশবচন্দ্র সেনের দলের নিবারণচন্দ্র মুখার্জীর বিবাহ দিতে সক্ষম হযেছিলেন। এই উপলক্ষে কেশবচন্দ্র সেন সস্ত্রীক বরিশালে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং তাঁর আগমনে বরিশাল ব্রাহ্ম সমাজের সংস্কার আন্দোলনে নতুন জোয়ার এসেছিল। ১৮৭০ সালে দুর্গামোহন দাস কলকাতায় বদলী হয়ে গেলেন। এই উপলক্ষে টাউন কমিটি, যেখানে ইংরাজ কর্মচারীদের আধিক্য, একটি প্রস্তাব পাশ করে। এতে বলা হয়, "This committee with deeply feel the loss which his absence from the District will occasion and it may be that his place will scarecly and properly be filled up."[৯]

দুর্গামোহন দাসের প্রস্থানের পর বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের যিনি হাল ধরলেন তিনি হলেন জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক জগৎবন্ধু লাহা। তিনি ১৮৭১ সালে বরিশালে আসেন এবং সমস্ত ভালো কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন। যুবকদের ধর্মীয় শিক্ষা দেবার জন্য তিনি সংগত সভা প্রতিষ্ঠা করেন। জেলায় স্ত্রীশিক্ষা

বিস্তারের জন্য "ফিমেল ইমপ্রুভমেন্ট সোসাইটি" স্থাপন করেন। এই সভা কয়েকটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করে এবং মহিলাদের শিক্ষিত করে তোলে।

১৮৭২ সালে 'তিন আইন' (Act III) পাশ হলে বরিশালের ব্রাহ্মরা এগিয়ে এসে একে অভিনন্দিত করে। কারণ তাদের মতে সমাজ সংস্কারে এটি একটি দৃঢ় পদক্ষেপ। বাবু জগৎবন্ধু লাহা তাদের "ম্যারেজ রেজিস্ট্রার" নিয়োজিত হলেন।

এরপর কিছুদিনের জন্য বরিশাল ব্রাহ্ম সমাজ ঝিমিয়ে পড়ে। এই সময়ে গিরিশচন্দ্র মজুমদার এবং সর্ব্বানন্দ দাস এই সমাজের প্রাণ ছিলেন। নিজেদের অদম্য উৎসাহ ও কর্মনিপুণতার দ্বারা তাঁরা ব্রাহ্মসমাজের পতাকাকে উড্ডীন রাখলেন। রাখালচন্দ্র রায়ের স্ত্রী সৌদামিনী দেবীর কার্যকলাপ এখানে স্মরণীয়। তিনি মন্দিরে প্রার্থনা সংগীতের দায়িত্ব নিলেন এবং বাড়ি বাড়ি গিয়ে মহিলাদের মধ্যে ধর্মপ্রচার করতে লাগলেন। এছাড়া তিনি স্বামীর সঙ্গে ঢাকা এবং অন্যত্র ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করতে লাগলেন।

১৮৭৮ সালে যখন কুচবিহার বিবাহ নিয়ে সমগ্র ব্রাহ্ম সমাজ উত্তাল তখন বরিশাল ও তার থেকে দূরে থাকতে পারল না। দুর্গামোহন দাস যে উদার মতবাদে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন সেই পথ স্মরণ করে 'বরিশালের ব্রাহ্মরা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পাশেই দাঁড়ালেন। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজকে অনুসরণ করে বরিশালের সমাজকেও একটি দীর্ঘস্থায়ী সাংবিধানিক ধারায় গ্রথিত করা হল এবং মন্দিরের ট্রাস্টী নিয়োগ করা হল। এ ছাড়া একাধিক আইন লিপিবদ্ধ করে সামাজকে একটি গণতান্ত্রিক রূপ দেবার চেষ্টা করা হল।

এখন থেকে বরিশাল সমাজ বহু নতুন নতুন কাজে মেতে উঠল। ১৮৮১ সালে স্থানীয় স্কুল শিক্ষক কালীমোহন দাস স্কুলের চাকুরিতে ইস্তফা দিয়ে সর্বক্ষণের কর্মী হিসাবে ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিলেন।

১৮৭৯ সলে সমাজের পুনর্গঠনের পর থেকে মহিলারা দলে দলে এসে সমাজের সদস্যপদ গ্রহণ করতে লাগলেন। ১৮৮১ সালে বরিশালের ব্রাহ্ম সমাজ একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন গিরিশচন্দ্র মজুমদারের স্ত্রী মনোরমা মজুমদারকে প্রথম মহিলা ধর্ম প্রচারক হিসাবে নিয়োগ করে। তিনি মহিলাদের মধ্যে ধর্মপ্রচার করে বেড়াতে লাগলেন। তিনি একাধিকবার সহকারী আচার্যের আসনে বসেছেন। তিনি কলকাতায় এলে একাধিকবার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে আচার্যের কাজ করেছেন।

সমাজের এই উত্থানের সময়ে কলকাতায় হিন্দু পুনরুত্থানবাদের উদ্ভব হয়। এর ঢেউ এসে লাগে বরিশালে। 'ঢাকা ধর্মরক্ষিণী সভা'র অনুকরণে 'বরিশাল ধর্মরক্ষিণী সভা' প্রতিষ্ঠিত হলেও এতদিন তা প্রায় বন্ধ ছিল। কিন্তু এই হিন্দু ধর্মান্দোলনের চাপে তা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। অনেক যুবক ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এখানে এসে ভীড় জমাতে শুরু করলেন।

দুর্গামোহন দাস বরিশাল থেকে বদলি হয়ে গেলে সর্ব্বানন্দ দাস সেক্রেটারির দায়িত্ব অতি নিষ্ঠার সঙ্গে চালিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু এই সময় তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুব পর পুত্র সত্যানন্দ পিতার অসম্পূর্ণ কাজে এগিয়ে যেতে প্রয়াসী হন।

১৮৬০ সালের পর দেখা যায়, স্কুল কলেজের ছাত্র ও শিক্ষকরা সমাজ সম্বন্ধে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। এদের অধিকাংশ নিজ এলাকাতেই থাকতেন এবং পেশাগত দায়িত্ব পালনের পর সমাজের জন্য পুরো সময়টা ব্যয় করতেন। এভাবে এ সময় থেকে ব্রাহ্ম সমাজগুলি একটি সাংগঠনিক রূপ লাভ করে এবং তাদের কাজকর্ম সংহত করে প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়েছিল। তখন সমাজগুলিতে একক প্রাধান্য লুপ্ত হয়েছিল এবং বিস্তৃত হয়েছিল যৌথ প্রাধান্য।

ত্রুটি, বিচ্যুতি, ব্যর্থতা সত্ত্বেও একথা স্বীকার্য যে, ব্রাহ্ম আন্দোলন বাঙালি সমাজ গতিশীলতাব সৃষ্টি করেছিল।[১০] সমাজকে দিয়েছিল নতুন আদর্শ, জীবনযাপনের এক নতুন শৃঙ্খলাপূর্ণ পদ্ধতি,[১১] চেষ্টা করেছিল আধ্যাত্মিক বাঁধন থেকে মানুষের মনের মুক্তির।

বরিশাল জেলার ব্রাহ্ম সংস্কার আন্দোলনে আদি ব্রাহ্মসমাজ কিম্বা 'নববিধান বা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের তেমন কোনো ভূমিকা লক্ষ্য করা যায় না। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের প্রেরণায় এবং পরিচালনায় জেলার এই আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, ছড়িয়ে পড়েছিল।

ইংরেজি শিক্ষিত শহুরে নব্য হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একাংশ ছিল এই আন্দোলনের সামাজিক ভিত্তি। অন্যান্য আধুনিক আন্দোলনের মতো, ব্রাহ্মসংস্কার আন্দোলন ও জেলার মোট অধিবাসীর শতকরা আশি ভাগের মধ্যে মুসলমানদের মধ্যে শিকড় ছড়াতে পারেনি। এই সাধারণ ব্যর্থতার কারণ সম্পর্কে বহু পণ্ডিত ব্যক্তি বিভিন্ন প্রসঙ্গে বিস্তর আলোচনা করেছেন।

বরিশালের 'মুকুটহীন রাজা' অশ্বিনীকুমার দত্ত (১৮৫৬-১৯২৩) দীক্ষিত ব্রাহ্ম ছিলেন না, কিন্তু সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে তাঁর মেলামেশা ছিল। জেলার ব্রাহ্ম সংস্কার আন্দোলনের তিনি ছিলেন ঘনিষ্ঠ সহযাত্রী। তাঁর প্রখর ব্যক্তিত্ব এবং বিপুল জনপ্রিয়তা এই আন্দোলনে গতিবেগ সঞ্চারে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। পূর্ববঙ্গের অন্যান্য জেলার ব্রাহ্ম সংস্কার আন্দোলনের ভাগ্যে অনুরূপ সুযোগ ঘটেনি। বরিশাল জেলার এই বৈশিষ্ট্য সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। কারণ, আন্দোলনে নেতৃত্বের ভূমিকা সর্বত্র এবং চিরদিনই স্বায়ত্ত্বপূর্ণ।

সমাজজীবনে সংযত আচরণ এবং সুরুচিবোধের প্রসার, পত্রপত্রিকা প্রকাশ, সমাজসেবামূলক কার্যকলাপ, শহর-গ্রামে আধুনিক শিক্ষার বিস্তার, প্রকাশ্য সভা-সমিতিতে যোগদানের জন্য মহিলাদের উৎসাহদান, সর্বোপরি স্বদেশী

আন্দোলনের দুকূল ভাঙা দিনগুলিতে ব্রাহ্মদের সাগ্রহ ও সক্রিয় অংশগ্রহণ ইতিহাসের কাহিনী হয়ে আছে।

সবাই জানেন, রূপসী বাংলার কবি জীবনানন্দ বরিশাল শহরের এক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্ম পরিবারের সন্তান ছিলেন। কিন্তু তাঁর কাব্যে ব্রাহ্ম সংস্কার আন্দোলনের উদ্দীপনাময় আদর্শ, মতবাদ ও কর্মকাণ্ডের কোন দূরাগত প্রতিধ্বনিও শোনা যায় না। কেন যায় না, তাঁর অসংখ্য অনুরাগী পাঠক-পাঠিকাদের মনে সেই প্রশ্ন কখনো না কখনো নিশ্চয়ই ছায়াপাত করেছে। সেই ছায়া অপসারণের জন্য সংশ্লিষ্ট গবেষকরা নিশ্চয়ই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

শহর থেকে কীর্তনখোলা নদীর পারে যাবার পথে খৃষ্টান কবরখানার দক্ষিণে অবস্থিত ব্রাহ্মসমাজের দোতলা বাড়িটি এখন কি অবস্থায় আছে জানিনা, হয়ত খণ্ডকালের এক ইতিবৃত্তকে সযত্নে বুকে ধারণ করে বাড়িটি এখন মুখ থুবড়ে পড়ে আছে, একটি স্তম্ভিত দীর্ঘশ্বাসের মতো।

যে ভৌগোলিক এলাকা জুড়ে বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠিত হয়েছে, সেই অঞ্চলে ব্রাহ্ম সংস্কার আন্দোলন একদা যে অগ্রগামী শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল, তার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস আজও লেখা হয়নি। এই বিস্মৃত প্রায় আন্দোলন তার ঐতিহাসিকের আবির্ভাবের জন্য অধীর প্রতীক্ষায় প্রহর গুনছে। সেই প্রতীক্ষা সংক্ষিপ্ত হোক, এই কামনা করি।

সূত্র নির্দেশ

১. Amiya Charan Banerjee, An Article on Keshab Chandra Sen, **Studies in the Bengal Renaissance**, Cal, 1958, pp 80.

২. Sastri, History of the Sadharan Brahmo Samaj (1974 ed), pp.142

৩. Report on the Census of India, 1891.

৪. মুনতাসির মামুন, উনিশ শতকের বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িক পত্র, চতুর্থ খণ্ড, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ৭

৫. শ্রীনাথ চন্দ্র, ব্রাহ্মসমাজে চল্লিশ বৎসব, ১৯১৩, পৃ. ২০৭

৬. শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪২১

৭. প্রাগুক্ত।

৮. বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, পৃ. ৪। ১৩৩৪ সাল।

৯. শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রাগুক্ত। পৃ. ৪২৬

১০. B. C. Pal, Brahmo Samaj and the Battle of Swaraj in India, Cal, 1926, pp. 5

১১. আদর্শ পরিবার, ঢাকা ১৮৯৪ (আরো দেখুন মুনতাসির মামুন, প্রাগুক্ত)।

উনিশ শতকের বাঙালি হিন্দু ভদ্রলোক

অমলশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

ইতিহাস সংসদের পূর্ববর্তী দুটি বার্ষিক অধিবেশনে উনিশ শতকের বাঙালি হিন্দু ভদ্রলোকের মধ্যে থেকে ব্রাহ্মদের উত্থানের আলোচনা প্রসঙ্গে তাদের 'হিন্দু' ও 'বাঙালি' পশ্চাৎপট নিয়ে দু-চার কথা বলা হয়েছে। বর্তমানে তাদের 'ভদ্রলোক' অভিধা প্রসঙ্গে কয়েকটি সাধারণ দিক নির্দেশ করা হচ্ছে। এই 'ভদ্রলোক'দের সমসাময়িক সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব এতই যে এদের নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে যার দ্বারা জগৎ ও জীবনের নানান দিকই মোটামুটিভাবে নির্দেশিত হয়ে গিয়েছে। এবারের আলোচনা এক্ষেত্রের মূল গবেষকদের অবদানের একটা সংহত রূপরেখা নির্দেশ করার চেষ্টা।

একদিকে ধনাঢ্য, বনেদী বা অভিজাত ও অপরদিকে শ্রমজীবীদের মধ্যবর্তী এই ভদ্রলোকের— 'মধ্যবিত্ত, শিক্ষিত, বুদ্ধিজীবী, এলিট'— ইত্যাদি নানা আখ্যায় ভূষিত করা হয়েছে। জীবিকার দৃষ্টিকোণ থেকে যদি তাঁদের ভূম্যাশ্রয়ী খাজনা ভোগী বা পেশাজীবী গোষ্ঠী বলা যায় তবে সামাজিক পরম্পরার দিকে তাকিয়ে বলা যায় যে তাঁরা বাংলার তিনটি উচ্চবর্ণ থেকে (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ) উদ্ভূত।

আবার আচার-ব্যবহার, কুলশীল, মান-মর্যাদা, ভাব-ভাষা-বাচনভঙ্গী, আবাসন, খাদ্যাখাদ্য, পেশা ও সংসর্গ দ্বারা এঁরা অনেক আগে থাকতেই নির্ধারিত আদর্শের সুবাদে অন্যদের থেকে পৃথকীকৃত। তাই কারো কারো দ্বারা এঁরা "এলিট" পদমর্যাদাতেও উন্নীত হয়েছেন। কিন্তু মনে রাখা উচিত যে ঔপনিবেশিক বাতাবরণে যথার্থ ও অনন্য 'এলিট' ছিল শ্বেতাঙ্গরাই।

ভদ্রলোকদের কিন্তু একটি সুচিহ্নিত সামাজিক শ্রেণী হিসাবে নির্দেশ করাও সঠিক নয়। তাঁদের বরং তীব্র অন্তর্বিরোধ— সম্পন্ন, সতত পরিবর্তনশীল ভূমিকাযুক্ত আত্মিক আদান-প্রদান ও সম্পর্কজালের বহিঃপ্রকাশ হিসাবে দেখা উচিত— যা একদিকে তখনকার ঔপনিবেশিক প্রশাসন ও অন্যদিকে উচ্চপ্রভাবসম্পন্ন সমাজের উপস্থিতিতে বিকশিত হতে দেখা গিয়েছিল।

যাঁরা অর্থনৈতিক বা বৃত্তিগত লক্ষণগুলির চেয়ে সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলির ওপর জোর দিতে ইচ্ছুক, বিশ্লেষণের একটা মাত্রা হিসাবে ব্যবহার করে তাঁরা 'ভদ্রলোক' কথাটি একটি সামাজিক পদমর্যাদা (Status) নির্দেশক শব্দ বলেই দেখতে ও দেখাতে চান। এঁরা মনে করেন যে সুনির্দিষ্ট পরিমাণ ধন অর্জন

অথবা কয়েকটি বিশিষ্ট পদলাভ কিংবা আর্থিক ক্ষতি কি পদচ্যুতি— কোনো কিছুই ঐ শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্তির পথে সুবিধা বা বাধা সৃষ্টি করে না। ট্যালকট পারসনের নির্দেশিত সামাজিক পদমর্যাদার বিচারে এঁরা ছিলেন উচ্চ গোষ্ঠীভুক্ত। আবার মার্ক্সীয় অর্থনীতি ভিত্তিক শ্রেণীকরণ প্রয়োগ করলে দেখা যাবে অনেক মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত (যথা ব্যবসায়ী বা সম্পন্ন চাষী) এর থেকে বাদ পড়ছে, আবার উচ্চতর ও নিম্নতর বিত্ত সম্পন্ন অনেকেই এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছেন। স্বাভাবিকভাবে এই শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্তি সম্ভব ছিল বিদ্যার্জন ও জন্মসূত্রে। উঁচু জাতের লোকরা সহজেই ভদ্রলোক হিসাবে চিহ্নিত হতে পারতেন, কিন্তু নিম্নজাতিভুক্তদের মধ্যে কেবলমাত্র উচ্চতর দক্ষতা অর্জনকারীরাই এতে সামিল হতে পারতেন।

জাত বিচারের নিরিখে এঁদের চিহ্নিত করার চেষ্টাও অনুরূপ সমস্যা— বিড়িত। প্রদীপ সিংহ মনে করেন যে এঁরা এসেছিলেন বাঙালি সমাজের উচ্চতম তিন জাত থেকে। কিন্তু উচ্চ তিন জাত ও ভদ্রলোকদের এই একীকরণ সর্বক্ষেত্রে নির্দ্বিধায় প্রযুক্ত নয় বলে মন্তব্য করেছেন সুমিত সরকার। সরকারের জিজ্ঞাসাঃ তা হলে গ্রাম্য পুরোহিত বা ব্রাহ্মণ পাচকদের ঐ দলে ফেলা যায় কি? ব্রুমফিল্ড কিন্তু অনেক বিকল্প শর্তসাপেক্ষ ভদ্রলোকের সঙ্গে মধ্যবিত্তদের কিছু কিছু পার্থক্য নির্দেশ করেছেন।

'ভদ্রলোকত্ব' সম্বন্ধে তাঁদের নিজেদের ও আশে-পাশের অন্যদের একটা চলনসই ধারণা থাকলেও এই সব তাত্ত্বিক বিতর্ক আমাদের একটা প্রায় অনাবশ্যক সংজ্ঞাগত জটিলতার সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। চুলচেরা বিতর্কের ভিতর না গিয়ে আমরা যদি একে একই গোষ্ঠী সম্পর্কে দৃষ্টিকোণগত পার্থক্যের একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন বলে গ্রহণ করি, তবে ভদ্রলোকদের আপাত-বিরোধী লক্ষণগুলির একটা সন্তোষজনক সামঞ্জস্য বিহিত হয়। এই দৃষ্টিকোণগণ পার্থক্য সূচিত হয় ভদ্রলোকদের মধ্যেকার অর্থনৈতিক শ্রেণীকরণ (Classification) ও জাতভিত্তিক বর্গীকরণ (Stratification)- কে সমাজ ব্যবস্থা ব্যাখ্যার (কাঠামোগত ও বিন্যাস নির্দেশের) দুটি বিপ্রতীপ নীতি বলে বুঝতে না পারার জন্য। অপরদিকে এই দুই জাতীয় বিভাগকে একই ব্যক্তির বিকল্প যোগ্যতা (Alternate resources) বিকল্প বৈশিষ্ট্য, আত্মনির্দিষ্ট লক্ষ্য কি প্রয়োগ পদ্ধতি বুঝলে সমস্যা অনেক সহজ হয়। আধুনিক সাংগঠনিক রীতিনীতি অনুযায়ী গড়ে ওঠা জাতি সংগঠনগুলির কার্যকলাপ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, ওগুলি সেই চিরাচরিত লক্ষ্যকে ছাড়া অন্য কিছুকে অনুবর্তন করে চলছে না। দক্ষিণ এশিয়া নিয়ে গবেষণারত অনেক নৃতাত্ত্বিকই এই জাতীয় আপাত বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছেন।

'ভদ্রলোক' পদটি ব্যবহারের পক্ষ ও বিপক্ষবাদীরা উভয়েই স্বীকার করেন যে ঐ পদটি সঠিক অর্থ বোধের পক্ষে অতিরিক্ত ব্যাপক ও সেইহেতু অস্পষ্ট।

ময়মনসিং-এর মহারাজা (জমিদার) থেকে ইস্ট ইণ্ডিয়া রেল কোম্পানীর কেরানি সকলেই 'ভদ্রলোক' শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। আর যে কোনো সামাজিক গোষ্ঠীর সীমা নির্ধারণের চেষ্টার ক্ষেত্রে প্রান্তিক দৃষ্টান্তগুলিকে চিহ্নিত করা নিয়ে প্রায় সব সময়েই মতভেদ থেকে যায়। ভিন্ন ভিন্ন মানদণ্ড গ্রহণ ও সংশ্লিষ্ট গবেষকদের সামাজিক অভিজ্ঞতা ও মূল্যবোধই এর কারণ। তাই সুনির্দিষ্ট ভাবে এদের পরিমাণ নির্ধারণ করাও সাধ্যাতীত।

অন্যান্য শ্রেণীর লোকদের সঙ্গে ভদ্রলোকদের মূল পার্থক্য সূচিত হয়েছিল কায়িক শ্রম করাকে নিয়ে। জমি চাষ করা নয়, জমির মালিকানা ছিল তাদের কাছে বিশেষ সম্মানের উৎস। কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা জীবিকা উপার্জন ছিল নিম্নশ্রেণীর লোকেদের জন্য নির্দিষ্ট। এটা ছিল বাংলার তিনটি উচ্চবর্ণের জন্য নির্ধারিত সুপ্রাচীন সামাজিক ব্যবস্থা। আর ভদ্রলোকদের ভিতর যেহেতু ঐ তিনটি উঁচু জাতের প্রাধান্য দেখা যায়— তাই উঁচু জাতের সমাজ চেতনা ভদ্রলোকদের ধ্যান-ধারণা ও মূল্যবোধকে ওতপ্রোতভাবে প্রভাবিত করে রেখেছিল। এখানে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে যে বাংলার জন-বিকাশের দীর্ঘ বিচিত্র ধারায় উক্ত তিনটি জাতিভুক্তদের সঙ্গে অন্য জাতিভুক্তদের অস্বাভাবিক সামাজিক ব্যবধান গড়ে উঠেছিল। এই ব্যবধানের আরেকটি মাত্রা হচ্ছে ঐ গোষ্ঠীভুক্তদের নিজেদের মধ্যেকার ধর্মানুষ্ঠানগত (Ritualistic) দূরত্ব। অন্তত তত্ত্বগতভাবে বাংলাদেশে দুটি মাত্র আদি বর্ণের সন্ধান মেলে— যাতে সর্বোচ্চ ছিলেন ব্রাহ্মণেরা ও সর্বনিম্ন শুদ্রেরা— মাঝখানে অন্য কোন বর্ণই আসে না। অথচ অন্যবিধভাবে সামাজিক ক্ষমতা ও পদমর্যাদাসম্পন্ন কায়স্থ ও বৈদ্য জাতিভুক্তদের স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে ব্রাহ্মণোত্তর বর্ণের সঙ্গে একাসনে। এইভাবে ঐতিহাসিক বিবর্তনের পথ বেয়ে বাংলায় বর্ণাদর্শের যে কাঠামো গড়ে উঠেছে তাতে উপরোক্ত তিনটি জাতই বাস্তব ও ভাবজগতে প্রাধান্য বজায় রেখে এসেছে, এবং জনসংখ্যার অতি ক্ষুদ্রাংশ হয়েও আপন সংখ্যাগত অনুপাতের অনেক বেশী পেশাগত ও বৈষয়িক কর্তৃত্ব দাবি ও ভোগ করে এসেছেন বৃটিশ শাসন চালু হবার অনেক আগে থাকতেই। "আধুনিক পর্বে ভদ্রলোকদের বৈষয়িক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ, নেতৃত্ব অর্জন ও তা রক্ষা সম্ভবপর হয়েছিল জমি থেকে আত্ম-অনজির্ত ক্রমন্নোতির উদ্বৃত্ত আত্মসাৎ মারফৎ" বলে অনিল শীল যেমন দেখাতে চান, তা সত্য নয়। প্রাধান্য এদের হঠাৎ পাওয়া নয়। বরং পারম্পরিকতার দ্বারা পূর্ব নির্ধারিত হওয়ায় এখানকার চিরায়ত বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী স্বল্প বা বিনা আয়াসে সদ্য উন্মুক্ত চাকুরিগুলি নবপ্রবর্তিত পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভের অন্তে ও তার জোরেই লাভ করতে থাকেন। এখানে চাকুরিজীবী ও চাকুরি-প্রত্যাশী বাঙালিদের বহু কথিত কায়িক শ্রম বিমুখতার ধারণাটি নিয়ে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন।

ব্যবসা-বাণিজ্যে বাঙালিদের অনুৎসাহের কারণ তাদের শ্রমবিমুখতা নয়, আর এ নিয়ে তাদের চেতনা বেশি বই কম ছিল না। গোটা উনিশ শতক ধরেই মধ্যবিত্ত সম্পাদক-পরিচালিত পত্র-পত্রিকাগুলি স্বজাতীয়দের স্বাধীন শিল্প-বাণিজ্য স্থাপনে আত্যন্তিক উৎসাহ জুগিয়ে আসছিলেন। স্বদেশী অর্থনীতিতে যে কর্তৃত্ব বৃটিশ সওদাগরি সংস্থা ও তাদের অধস্তন মারোয়াড়ী সহযোগীদের দ্বারা ক্রমবর্ধমান হারে কুক্ষিগত হয়ে পড়ছিল,— তা পুনরাধিকার করতে ঐ সব পত্র-পত্রিকা ক্রমাগতই উৎসাহ যোগত। ইতিমধ্যে স্থানীয় ছোটখাটো ব্যবসা অবাঙালিরা সম্পূর্ণ করায়ত্ত করে ফেলেছিল। শীল ব্যবসায়ে ব্যর্থতার কারণ হিসাবে বাঙালিদের আরামপ্রিয়তা বা উদ্যোগহীনতাকে নির্দেশ করতে চান। অথচ ঔপনিবেশিক বাণিজ্যনীতির দায়-দায়িত্ব নিয়ে কিছু বলেন না, যে বাণিজ্যনীতি আঞ্চলিক ব্যবসাপত্র ক্রমবর্ধমান হারে স্থানীয় লোকেদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিচ্ছিল। খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ও এই মতের সমর্থক এবং একে অত সহজে নস্যাৎ করা যায় না, যদিও ঔপনিবেশিক বাণিজ্যনীতিও আংশিক ভাবে বাঙালির শ্রম-বিমুখতার জন্য দায়ী। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে এখন ধীরে ধীরে এই মনোভাবের পরিবর্তন হচ্ছে।

ভদ্রসমাজে প্রবেশের অন্যতম ছাড়পত্র ছিল শিক্ষাগত যোগ্যতা। ঔপনিবেশিক শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল ব্যয়বহুল ও তাই সীমাবদ্ধ। তার সুযোগ লাভ করত অল্প সংখ্যক লোকই। আর তা বহুলাংশে ভদ্রলোকদের দ্বারাই পরিচালিত হতো। তা বলে মনে করার কোন কারণ নেই যে তাতে অর্থবানদেরই প্রাধান্য ছিল। শীল ও ব্রুমফিল্ড মনে করেন যে, পশ্চিমী শিক্ষা ভদ্রলোকদের সংকীর্ণ উদ্দেশ্য সাধনেই ব্যবহার হতো। তবে একথা ঠিক যে চিরায়ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণী লেখাপড়ার সঙ্গে নিজেদের দীর্ঘ দিনের পরিচিতির সুবাদে বিদ্যার্জন ও চাকুরি জগতের আঁতঘাঁত, রীতিনীতি সহজেই আত্মস্থ করে ফেলতে সমর্থ হতেন। আর সামাজিক ভাবে নীচু জাতের লোকেরা অর্থ সহজেই আত্মস্থ করে ফেলতে সমর্থ হতেন। আর সামাজিক ভাবে নীচু জাতের লোকেরা অর্থ সঞ্চয় ও শিক্ষা অর্জন করে আচার-আচরণ, বিশ্বাস, রীতিনীতি ইত্যাদি বাহ্যিক ও মানসিক ভাবে ভদ্রলোকদের জগতের শরিক হয়ে ঐ শ্রেণীতে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে যেতেন। একে অনেক আধুনিক সমাজতত্ত্ববিদ সংস্কৃতায়ন বা ব্রাহ্মণীকরণ বলে অভিহিত করেছেন।

ভদ্রলোকদের রাজনৈতিক কার্যকলাপের স্বরূপ সন্ধান করতে গিয়ে আরেক দফা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। ভদ্রলোকদের কঠিন সমালোচকেরা দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে লেখাপড়া শিখে উপযুক্ত কাজ না জোটায়, কিম্বা মূল্যবৃদ্ধির দরুণ জমির খাজনা থেকে পরিবারের ব্যয় সঙ্কুলান কঠিন হয়ে পড়লে সত্যকারের আভিজাত্যদের পক্ষে যা করা উচিত অর্থাৎ নব লব্ধ রাজনৈতিক বোধকে কাজে

লাগিয়ে গভীর হতাশা তাড়িত হয়েই ভদ্রলোকেরা রাজনীতিকে স্বার্থ-সাধনের যন্ত্র বানিয়ে ফেলেন। এর দ্বারাই নাকি ভদ্রলোকেরা নিজেদের ক্ষয়িষ্ণু সামাজিক প্রতিপত্তি টিকিয়ে রাখার ব্যবস্থা করতেন। এটি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ধ্বজাধারী ঐতিহাসিক ও তাদের দ্বারা দীক্ষিত মুষ্টিমেয় হিন্দু ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের হেয় করার প্রয়াস মাত্র। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দুই-তিন দশকে শিক্ষিত বাঙালিদের (সামাজিক সম্মানবিত্ত প্রতিপত্তি নির্বিশেষে) শতকরা আশি জনই সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি প্রকাশ্যে বা প্রচ্ছন্নভাবে সহানুভূতিশীল ছিলেন। বহু তথাকথিত মডারেট নেতাও এই দলে ছিলেন (যেমন, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)।

বরং শিক্ষা-বিস্তার ও তজ্জনিত উচ্চ জাতের খবরদারির বিরুদ্ধে সমাজ-সংস্কারের চেষ্টার পিছনে ভদ্রলোকদের অনেককেই পর্যাপ্ত ব্যক্তিগত ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করতে দেখা গেছে। নিজেদের যৎসামান্য আয়ের মধ্যেও বেসরকারী উদ্যোগে স্কুল-কলেজ স্থাপন কবে শিক্ষাকে নিজের আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীর দ্বারে পৌঁছে দিতে সাহায্য করেন অনেক ভদ্রলোক। এর পিছনের সদিচ্ছাকে সর্বক্ষেত্রে অর্থলোভ বলে ভাবা ঠিক নয়। যাঁরা এ ধরনেব কাজ কখনো করেননি, তাঁরাও জীবনে অন্যভাবে তীব্র অর্থলোভের পরিচয় দিয়েছেন।

এঁদের সম্বন্ধে রজনীপাম দত্ত ও সোভিয়েট ঐতিহাসিকগণ-নির্দেশিত মার্কসীয় শ্রেণী স্বার্থ সম্পর্কিত অতি সরলীকৃত বিশ্লেষণও অকার্যকর হয়ে পড়ে, খতিয়ে দেখলে। আধুনিক যুগের ইউরোপের ইতিহাসে বহু সামাজিক মাত্রা বিশিষ্ট 'বুর্জোয়া' শ্রেণীর উত্থানের সঙ্গে উনিশ শতকের বাঙালি ভদ্রলোকদের কার্যকরী ও আত্যন্তিক পার্থক্য রয়েছে। কিছু কিছু 'বুর্জোয়া'-সুলভ মনোবৃত্তি ও উচ্চাশা ব্যতিরেকে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন এই ভদ্রলোকরা ইউরোপীয় 'বুর্জোয়া'দের ভারতীয় বাঙালি পরিপূরক বা প্রতিপক্ষ হয়ে উঠতে পারেননি। তাই ঔপনিবেশিক শোষণে ক্লিষ্ট এদেশের আলোচনাধীন গোষ্ঠীর সম্বন্ধে ঐ অভিধা আরোপ আকর্ষণীয় হলেও কার্যকরী নয়।

কোনো লেখক এই গোষ্ঠীর সদস্যদের গ্রামসী নির্দেশিত পথে 'চিরায়ত সনাতন বুদ্ধিজীবী' (Traditional intelligentsia) বলে চিহ্নিত করতে আগ্রহী। সহজাত (Organic) নয়, এই সব শিক্ষিত পেশাধারী বুদ্ধিজীবীগণ উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত না থাকলেও সাংস্কৃতিক ও ভাবাদর্শগত টানা-পোড়েনে সহজেই প্রভাবিত ও উদ্বেল হয়ে থাকেন। ইংরাজী-শিক্ষিত এই বাঙালি ভদ্রলোকেরা,— যাঁরা বহুলাংশে স্থানীয় পরম্পরাগত বুদ্ধিজীবী পেশাদার জাতগুলির মধ্যে থেকে উঠে এসেছিলেন,— ১৮৫০ এর পর থেকে কার্যত শিল্প-বাণিজ্য, এমনকি সক্রিয় কৃষিকর্ম, থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক ভাবাদর্শসমূহ

যথা,—উদারনৈতিকতাবাদ, জাতীয়তাবাদ এমনকি অবশেষে আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিকতার প্রতি কিছুটা ভাসা ভাসা ভাবে হলেও সাগ্রহে সাড়া দেন। এঁদের আবার দুটি গোষ্ঠীতে পৃথক করা যায়, যথা— ঐহিক (যেমন শিক্ষক, ব্যবহারজীবী ইত্যাদি) ও পারত্রিক (যেমন পুরোহিত ইত্যাদি)।

কোনো একটি জন সমবায়কে চিরায়ত ঐহিক বুদ্ধিজীবীরা চিন্তা-জাগতিক, সূক্ষ্ম, বাস্তবেতর (Non-material) পরামর্শ ও মানসিক সহায়তা জুগিয়ে থাকেন। একটি গ্রামীণ বাতাবরণে এঁরা সামাজিক ক্ষেত্রে প্রাগ্রসর অংশের যথোপযুক্ত ভূমিকা পালন করে থাকেন। মফঃস্বলের পারিপার্শ্বিকতায় সাধারণ মানুষদের থেকে এঁদের পৃথক করা সম্ভব এঁদের এক ঐকান্তিক কামনার নিরিখে, যাতে দেখা যায় যে এঁরা চান যে এঁদের নিজেদের পুত্র-কন্যারা শিক্ষা বা বৌদ্ধিক দক্ষতা অর্জন করে সমাজে আগের চেয়ে উচ্চতর পদমর্যাদা ও সুবিধা অর্জন করতে সক্ষম হয়।

এঁরা সাধারণ লোকেদের যেমন পথ দেখিয়ে থাকেন তেমনি শাসক শ্রেণীর প্রাধান্যের সপক্ষে নৈতিক ও আদর্শগত সমর্থন জুগিয়ে থাকেন এবং ঐ পৌনঃপৌনিক কর্তৃত্ব বজায় রাখার পক্ষে অনুকূল বাতাবরণ সৃষ্টি করতে উদ্যোগী হন— যাতে জনসাধারণ এঁদের কর্তৃত্বে বসবাস করে যেতে দ্বিধাগ্রস্ত না হয়। এঁরা আদর্শের আবরণে সামাজিক শোষণের যন্ত্রটিকে কার্যক্ষম, সক্রিয় ও তৎপর রাখেন। এক কথায় এঁরা একটি গোষ্ঠীর উপর অপর গোষ্ঠীর ভূমিকা নির্দেশ ও তাকে কার্যকরী রাখেন।

সূত্র নির্দেশ

এই নিবন্ধটি রচনায় নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির সাহায্য নেওয়া হয়েছে—

১. জে.এইচ. ব্রুমফিল্ড, মোস্টলি এবাউট বেঙ্গল (নিউদিল্লী: মনোহর পাবলিকেশন্স, ১৯৮২)।

২. প্রদীপ সিন্‌হা, 'সোসাল চেঞ্জ', হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল (১৭৫৭-১৯০৫), (কলকাতাঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৭)।

৩. প্রদীপ সিন্‌হা, নাইনটিন্থ সেঞ্চুরী বেঙ্গলঃ আসপেক্টস অফ্ সোসাল হিস্ট্রি, (কলকাতাঃ ফার্মা কে. এল.এম ; ১৯৬৫)।

৪. শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, 'প্রেটেস্ট এ্যান্ড একোমোডেশন্: টু কাস্ট মুভমেন্টস্ ইন ইস্টার্ণ এ্যান্ড নরদার্ণ বেঙ্গল (আনুমানিক ১৮৭২-১৯৩৭), ইন্ডিয়ান হিস্টোরিকাল রিভিউ, ভলুম, ১৪, সংখ্যা-১-২, জুলাই ১৯৭৮-জানুয়ারি ১৯৮৮।

৫. জে.এইচ.ব্রুমফিল্ড, এলিট কনফ্লিক্ট ইন এ প্লুরাল সোসাইটি (বোম্বে: অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটি প্রেস, ১৯৬৮)।

৬. জন ম্যাকগাওয়াব, মেকিং অফ্ এ কলোনিয়াল মাইন্ড: এ কোয়ান্টিটেটিভ স্টাডি অফ দি ভদ্রলোক অব ক্যালকাটা, (১৮৫৭-১৮৮৫) (ক্যানবেবাঃ অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভাবসিটি, ১৯৮৩)।

৭. বজতকান্ত বায়, সোসাল কনফ্লিক্ট এ্যান্ড পলিটিক্যাল আনবেস্ট ইন বেঙ্গল, ১৮৫৭-১৯২৭, দিল্লী: ১৯৮৪)।

৮. বি.টি. ম্যাককুলী, ইংলিশ এডুকেশন এ্যান্ড দি অবিজিন্স অফ দি ইন্ডিয়ান ন্যাসেনালিজম্ (নিউ ইয়র্ক: কলম্বিয়া ইউনিভাবসিটি প্রেস, ১৯৪০)।

৯. অনিল শীল, দি ইমার্জেন্স অফ ইন্ডিয়ান ন্যাশানেলিজম্ঃ কম্পিটিশন এ্যান্ড কনষ্ট্রেশন (কেম্ব্রিজঃ কেম্ব্রিজ ইউনিভাবসিটি প্রেস, ১৯৬৮)।

১০. সুমিত সবকাব, দি স্বদেশী মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল (১৯০৩-১৯০৫) (নিউ দিল্লীঃ পিপল্স পাব্লিশিং হাউস, ১৯৭৫)।

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় গ্রন্থাগার আন্দোলন

শ্রীকান্ত বসু

উনবিংশ শতাব্দী বাংলা তথা ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ শতাব্দী। বহু বৎসর লালিত জীর্ণ পুরাতন সংস্কারকে ঝেড়ে ফেলে নতুন প্রগতিশীল চিন্তাধারাকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে যাবার পথ দেখিয়েছে এই শতাব্দী। তাই বাংলা তথা ভারতবর্ষে এই শতাব্দীর আর-এক নাম নব-জাগরণের শতাব্দী। এই সময়েই সাহিত্য, কলা, শিক্ষা, বিজ্ঞান, শিল্প প্রভৃতি বিষয়ে নবচেতনার উন্মেষ হয়। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ও জাতীয়তাবোধ এই সময়েই নবরূপ ধারণ করে। এই নবজাগরণের মূলে ছিল শিক্ষার জাগরণ। আর শিক্ষার জাগরণের সাথে সাথে গ্রন্থাগারের বিষয়টিও অনিবার্য ভাবে আসে। এই উনবিংশ শতাব্দীতে গ্রন্থাগার আন্দোলন কিভাবে বাংলা তথা ভারতবর্ষের ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছে সে বিষয়ে কিছু আলোচনা করা যাক।

প্রাচীন ও মধ্যযুগে ভারতবর্ষে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা চালু থাকলেও সাধারণের (Public Library) ব্যবস্থার কোন সন্ধান মেলে না। প্রাচীন যুগে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রচলন দেখতে পাওয়া যায় মুখ্যত বৌদ্ধ মঠ ও বিহারগুলিতে[১]। হিন্দু রাজাদের প্রাসাদে এবং মন্দিরগুলিতে[২,৩]। মধ্য যুগেও গ্রন্থাগার ব্যবস্থা চালু ছিল রাজা-বাদশাহদের প্রাসাদে, মন্দির ও মসজিদে[৪]। এই সমস্ত গ্রন্থাগারগুলি সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ছিল না। সাধারণের জন্য গ্রন্থাগার ভাবনাটির জন্ম বিদেশীরা বিশেষত ইংরেজ-রা এদেশে আসার পর। শিক্ষার বিস্তার ঘটার সঙ্গে সঙ্গে একদিকে যেমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক গ্রন্থাগারগুলি গড়ে উঠতে থাকে তেমনই অন্যদিকে সাধারণ গ্রন্থাগারও প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। এই সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি যেমন একদিকে সাধারণ মানুষের জ্ঞানান্বেষণের পথ খুলে দেয় তেমন অন্যদিকে এই গ্রন্থাগারগুলিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে— ব্যায়ামাগার, অনুশীলন সমিতি, যুগান্তর দল প্রভৃতি। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরের সাধনা লাইব্রেরির কথা। এই গ্রন্থাগারকে কেন্দ্র করে একটি বিপ্লবী দল স্বাধীনতা সংগ্রামে কাজ করছিলো। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন বিপ্লবী গোবিন্দপদ দত্ত।[৫]

১৭৮৪ সালে স্যার উইলিয়াম জোনস্ কর্তৃক এশিয়াটিক সোসাইটি এবং গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার পর গ্রন্থাগারের নবদিগন্তের সূচনা হয়। এরপর ১৮০০ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠা হয়। এই কলেজের উদ্দেশ্য ছিল এদেশে আগত ইংরাজদের ভারতীয় ভাষা শিক্ষা দেওয়া। কালে কালে এখানে একটি গ্রন্থাগার গড়ে ওঠে। এখানে বিভিন্ন বিষয়ের উপর পুস্তক, ভারততত্ত্বের উপর পত্র-পত্রিকা এবং পুঁথি রক্ষিত ছিল। এই সমৃদ্ধ পুস্তকালয়ের অবলুপ্তির পর এই সংগ্রহগুলি লণ্ডনের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে, এশিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরি এবং কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরিতে দেওয়া হয়।[৬]

১৮১৯ সালে কিছু বাঙালি ভদ্রমহোদয় দ্বারা গঠিত হয় 'কলিকাতা গ্রন্থাগার সমিতি'। এটি ছিল একটি মালিকানা ভিত্তিক গ্রন্থাগার অর্থাৎ বিশেষ কিছু উচ্চ সম্প্রদায়ের স্বচ্ছল ব্যক্তি এই গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে পারতেন। তবুও এই সমিতির মধ্যে দিয়ে আমরা সাধারণের জন্য গ্রন্থাগার গড়ে ওঠার একটি সংকেত পাই। সেদিক থেকে বিচার করলে এই সমিতির গুরুত্ব আছে এবং তৎকালীন যুগে একটিকে সাধারণের গ্রন্থাগার হিসেবে আখ্যা দেওয়া হতো। এই সমিতি প্রায় তের বছর চালু ছিল। এখানে প্রায় ছ'হাজার সাতশ পুস্তক ছিল। এই সমিতির প্রয়াসকে বলা যেতে পারে বাংলায় সম্মিলিত উপায়ে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার প্রথম প্রয়াস।[৭]

১৮২১ সালে গড়ে ওঠে কলিকাতা বিদ্যালয় পুস্তক সমিতি (Calcutta School Book Society) । এই সমিতি একটি গ্রন্থাগারও গড়ে তোলে। এই সমিতি-র সাথে রাজা রামমোহন রায়ের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল। রাজা রামমোহন রায় গ্রন্থাগার বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। তাঁর লেখা বিভিন্ন পত্রাবলী থেকে এই উৎসাহের পরিচয় পাওয়া যোয়। যেমন ১১.১০.১৮২৩ তারিখে লর্ড আমহার্স্টকে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা বিষয়ে লেখা এক পত্রে তিনি লিখছেন ".....and providing a college furnished with the necessary books, instruments and other apparatus."[৮]

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যুগোপযোগী শিক্ষা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাকেন্দ্রগুলির উপযুক্ত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রয়োজন এই চেতনা ভারত পথিক সেই সময়েই উপলব্ধি করেছিলেন শুধু তাই নয় তাঁর সাহায্য ধন্য প্রতিষ্ঠান Unitarian Society-র গ্রন্থাগারে সেই সময়েই বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে গ্রন্থাগার পরিচালনার ব্যবস্থা ছিল। এই গ্রন্থাগারটির দেখাশুনা করতেন Mr. Adam। তিনিই এই গ্রন্থাগারে আসা পুস্তকগুলিকে Catalogue বা সূচীকৃত করতেন। রাজা রামমোহন রায় ৭.২.১৮২৭ তারিখে ইংল্যাণ্ডের ব্রিস্টলের J. B. Estleenকে লিখেছেন ".....I am happpy to inform you that the books which you kindly presented

me with, were deservedly placed in our library, under the care of Rev. Mr. Adam."[৯]

রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থাগারের সম্পর্কে প্রগতিশীল চিন্তা বাংলা তথা ভারতবর্ষে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে তরান্বিত করতে সাহায্যে করেছে।

বাংলার আর এক কৃতি সন্তান সেই সময়ের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নে বিশেষ অবদান রেখে গেছেন। তিনি হলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। যদিও সাধারণের গ্রন্থাগার স্থাপনের জন্য তাঁর প্রয়াসের বিবরণ আমরা পাই না, তবুও তাঁর পুস্তক প্রীতি, গ্রন্থাগার পরিচর্যা সেই যুগের গ্রন্থাগার ভাবনাকে নব পথ নির্দেশ করতে পেরেছিল।

এই শতাব্দীতে শিক্ষায় পাশ্চাত্ত্য প্রভাব আসার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন কলেজ গড়ে উঠতে থাকে এবং তার সাথে, যুক্ত হয় তাদের প্রাতিষ্ঠানিক গ্রন্থাগার। যেমন হিন্দু কলেজ (Presidency College, স্থাঃ ১৮১৭), শ্রীরামপুর কলেজ (১৮১৮), সংস্কৃত কলেজ (১৮২৩), সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ (১৮৩৫), হুগলী মহসিন কলেজ (১৮৩৬), মেডিক্যাল কলেজ (১৮৩৫), বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ (১৮৫৬)।

এছাড়া দুটি গবেষণা কেন্দ্র ও তাদের গ্রন্থাগার গড়ে ওঠে, যথা বোটানিক্যাল গার্ডেন ও তার গ্রন্থাগার এবং জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া ও তার গ্রন্থাগার (১৮৫১)।

কলেজ গ্রন্থাগারগুলি সেই সময় থেকেই পুস্তক সংগ্রহ ও সংরক্ষণে বিশেষ মনোযোগী ছিল। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর একটি বিশেষ পুস্তকের সন্ধানের বিষয়ে লিখতে গিয়ে 'সবদর্শন সংগ্রহে'-র বিজ্ঞাপনে লিখেছেন "There were tow manuscripts in Calcutta, one in the library of Sanskrit College and the other in that of the Asiatic Society."

এর থেকে একদিকে যেমন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গ্রন্থাগার ব্যবহারের প্রবলতর পরিচয় মেলে তেমনই অন্যদিকে সংস্কৃত কলেজ গ্রন্থাগারের সংগ্রহের গভীরতার কথা জানা যায়।

১৮৩৫ সালে একটি যুগান্তকারী ঘটনা ঘটে। স্যার চালর্স মেটকাফে কলকাতার বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়গণকে নিয়ে একটি বৈঠক ডাকেন। এই বৈঠকের মূল উদ্দেশ্য ছিল সংবাদ মাধ্যমের শৃঙ্খলমোচনের বিষয়ে জনমত যাচাই। এই বৈঠকে জনমত কতটা প্রতিফলিত হয়েছিল তা আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। কিন্তু ওই বৈঠকেই বিদগ্ধ মানুষবর্গ সাধারণ মানুষের জ্ঞানান্বেষণ ও সাহিত্য চর্চার জন্য একটি সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত নেন। এই সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়

".....That it is expedient and necessary to establish in Calcutta a public library of reference and circulation that shall be apened to all ranks and classes without distinction and sufficiently extensive to supply the wants of entire Community in every depts of Literature."[১০]

এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রসন্ন ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ, রুস্তমজী কোয়াসজী, রাজা সত্যচন্দ্র ঘোষাল, নিত্যলাল শীল, প্রতাপচন্দ্র সিং, রাধানাথ শিকদার, প্যারীচাঁদ মিত্র, রসময় দত্ত, রসিক কৃষ্ণ মল্লিক, শশীচন্দ্র দত্ত, কিশোরীচাঁদ মিত্র, শম্ভুনাথ পণ্ডিত, ডঃ মহেন্দ্রলাল সরকার প্রমুখ। এঁরা ছাড়াও শিক্ষানুরাগী ইংরেজগণ যেমন টি.বি.ম্যাকুলে, জে.সি.মার্শম্যান, এবং অবশ্যই লর্ড মেটকাফে।[১১]

এই সভার ফলশ্রুতি দেখা যায় ১৮৩৬ সালের ২১শে মার্চ। সেদিন কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠা হয়। প্রথমত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ৪৬৭৫টি পুস্তক নিয়ে এই গ্রন্থাগার চালু হয়। বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এই গ্রন্থাগার স্থাপনের পিছনে থাকলেও যাঁর অবদান অনস্বীকার্য তিনি ছিলেন 'দি ইংলিশম্যান' পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক জে. এইচ. সিডন। তাঁর নিরলস পরিশ্রমে এই গ্রন্থাগার বাস্তব রূপ পায়। প্রথমে গ্রন্থাগারটি স্থাপিত হয় চব্বিশ পরগণার সিভিল সার্জেনের বাসস্থানের নীচতলায়, পরে ১৮৪১ সালে এটি স্থানান্তরিত হয় স্ট্র্যান্ড রোডের মেটকাফে হলে।[১২]

কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরির ইতিহাস অনুসন্ধান করতে গিয়ে রাজ্য লেখ্যাগারের নথিপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায়, ১৮৩৬ সালের ২০শে জুলাই (General Dept. No.-12) দ্বারকানাথ ঠাকুর এবং রসময় দত্ত মেটকাফে লাইব্রেরির জন্য সরকার বাহাদুরের নিকট জমি প্রার্থনা করছেন। এর থেকে বোঝা যায় লর্ড মেটকাফের মৃত্যুর পর কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরির নাম পরিবর্তনের কথা ভাবা হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে তা রূপায়িত হয় নি কারণ ১৮৩৭ সালের ১লা মার্চ সরকার কর্তৃক কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরির জন্য জমি নির্ধারিত হয় (General dept Nos 49-50)। আবার দেখা যায় ট্যাঙ্ক স্কোয়ারে অর্থাৎ ডালহৌসী স্কোয়ারে গ্রন্থাগার ভবনটি লর্ড মেটকাফের স্মরণে রাখা হয়েছে (General Dept May 27, 1840. Nos 18-20)। এরপর কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরি মেটকাফে বিল্ডিং-এ উঠে যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এই গ্রন্থাগারের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে পড়ে। কারণ ১৮৫৭ সালে সিপাই বিদ্রোহের পর ইংরেজগণ গ্রন্থাগার উন্নয়নে তেমন আগ্রহ দেখাননি। সরকারের আনুকূল্য না পেলে যা অবস্থা হয় সেই দুরবস্থার মধ্যে পড়ে এই গ্রন্থাগার। তার পরের ইতিহাস তো বিংশ শতাব্দীর।[১৩]

গ্রন্থাগার ভাবনা বাংলার চতুর্দিকে ছড়াতে শুরু করে কিন্তু অত্যন্ত ধীর ভাবে। আমরা ঊনবিংশ শতাব্দীতে কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরি ছাড়া গোটা পশ্চিমবঙ্গ এলাকায় মাত্র তিপান্নটি সাধারণের গ্রন্থাগার দেখতে পাই।[১৪] ১৮৩৫ সালের পর দীর্ঘ পঁয়ষট্টি বছর ধরে মাত্র তিপান্নটি গ্রন্থাগার নিশ্চয় উৎসাহব্যঞ্জক নয়। তাও এই গ্রন্থাগারগুলির বেশির ভাগই স্থাপিত হয়েছিল কলকাতা এবং তার আশেপাশে হাওড়া, হুগলী ও চব্বিশ পরগণা জেলায়। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ এলাকার বেশিরভাগ অংশ ও পূর্ববঙ্গের বেশির ভাগ অংশ গ্রন্থাগার আন্দোলনের আগে ঊনবিংশ শতাব্দীতে দেখতে পায়নি। ঊনবিংশ শতাব্দীতে কলকাতায় ২০টি, হাওড়ায় ৯টি, হুগলীতে ৯টি, অবিভক্ত চব্বিশ পরগণায় ১০টি, মেদিনীপুরে ২টি, নদীয়ায় ২টি, বর্ধমানে ১টি এবং মুর্শিদাবাদের ১টি গ্রন্থাগারের পরিচয় আমরা পাচ্ছি। পশ্চিমবঙ্গের বাকি জেলাগুলিতে গ্রন্থাগারের কোন পরিচয় দেখতে পাই না। এর কারণ হিসেবে কয়েকটি বিষয়কে ভাবা যেতে পারে (ক) শিক্ষার ধীর প্রসার, (খ) মুদ্রিত পুস্তকের অপ্রতুলতা, (গ) যোগাযোগ ব্যবস্থার দুরবস্থা, (ঘ) দারিদ্র, (ঙ) সাধারণ মানুষের গৃহকেন্দ্রিকতা ও অন্তর্মুখিনতা, (চ) সরকারী অনীহা, (ছ) সামাজিক কুসংস্কার ইত্যাদি।

গ্রন্থাগার ছড়িয়ে না পড়ার ফলে স্ত্রী-শিক্ষার অভ্যন্তরীণ অগ্রগতি দীর্ঘায়িত হয়েছে। সাক্ষর গৃহবধূরা যদি নাগালের ভিতর সেই সময় থেকে বই পেয়ে আসতেন তবে বর্তমান কালে বাঙালির নারীজাতির আরও উন্নতি ঘটত।

যাইহোক, এই প্রসঙ্গের পরিশেষে একথাই বলা যায় যে ঊনবিংশ শতাব্দী, বাংলা তথা ভারতবর্ষের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার নব-জাগরণের শতাব্দী। গ্রন্থাগার চেতনা যা বাঙালি তথা ভারতবাসীর মনের মধ্যে জাগ্রত হওয়ার প্রয়োজন ছিল এবং তার কিছু যুগান্তকারী উদাহরণ আমরা এই শতাব্দী থেকে পাই। এই শতাব্দী-র সূত্র ধরেই বিংশ শতাব্দীতে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা একটা সম্মানজনক রূপ পেয়ে এসেছে এবং আসছে।

সূত্র নির্দেশ

১. উইনটারনিটস, এম: হিস্টরি অব ইণ্ডিয়ান লিটারেচার, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮
২. ই. জে. র‍্যাপসান: কেমব্রিজ হিস্টরি অব ইণ্ডিয়া, এস চাঁদ, ১৯৬২, পৃ. ৪৩৫
৩. আর, শর্মাশাস্ত্রী (সম্পাঃ): অর্থশাস্ত্র অব কৌটিল্য, মাইসোর, ১৯৩৯, পৃ. ৬২
৪. সাদিক মহম্মদ, শাহজাহান নামা, খণ্ড ২, পৃ. ৫০৫
৫. সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান — সংসদ, ২য় সং, ১৯৮৮, পৃ. ৯৪

৬. রায়চৌধুরী,.প্রবীর: পাবলিক লাইব্রেরি মুভমেন্ট ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল: এ রিভিউ, লাইব্রেরি মুভমেন্ট ইন ইণ্ডিয়া, কলি, বি. এল. এ; ১৯৮৯; পৃ. ১৩৫-১৪৮

৭. রায় অরুণ: বেঙ্গল লাইব্রেরি এ্যাসোসিয়েশন; লাইব্রেরি মুভমেন্ট ইন ইণ্ডিয়া, কলি, বি, এল, এ: ১৯৮৯; পৃ. ১৪৯-১৫২

৮. কোলেট, এস. ডি: দি লাইফ এণ্ড লেটারস্ অব্ রাজা রামমোহন রায়। সম্পাঃ ডি. কে. বিশ্বাস এণ্ড পি. সি. গাঙ্গুলী, সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ, কলিকাতা, ৩য় সং, ১৯৬২ পৃ. ৪৬০

৯. ঐ

১০. দ্রষ্টব্য ৬নং সূত্র

১১. কেশবন, বি. এস. ইণ্ডিযান ন্যাশনাল লাইব্রেরি পৃ. ৪।

১২. দ্রষ্টব্য ৬ নং সূত্র

১৩. চক্রবর্তী অধীর, (সম্পাঃ): (চঞ্চ এ্যাণ্ড কনটিনিউটি: ফোকাস অন্ ফ্যাক্টস্ কলি, পঃ বঃ সরকার ১৯৯২, পৃ. ৯

১৪. দ্রষ্টব্য ৬ নং সূত্র।

বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন ও তৎকালীন আলিম সম্পাদিত সংবাদ সাময়িক পত্র

সুনীলকান্তি দে

উনিশ শতকে রামমোহনের (১৭৭৪-১৮৩৩) যুক্তিবাদ, স্বদেশ-প্রেম, ডিরোজিওর (১৮০৯-১৮৩১) মুক্তচিন্তা ও অনুসিন্ধিৎসা ও অক্ষযকুমাব দত্তের (১৮২০-১৮৮৬) বিজ্ঞান চেতনা এবং সর্বোপরি বিদ্যাসাগরের (১৮২০-১৮৯১) মানবপ্রেম বাংলায় যে নব-জাগৃতি সূচনা করেছিল, বর্তমান শতকের তৃতীয় দশকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত একদল উদারপন্থী তরুণ মুসলিম এই ভাবাদর্শে এবং রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১), হজরত মোহাম্মদ[সঃ] (৫৭০-৬৩২), নজরুল (১৮৯৯-১৯৭৬), মুস্তফা কামাল (১৮৮৫-১৯৩৮), গ্যেটে (১৭৪৯-১৮৩২) ও রোঁমা রোঁলা (১৮৬৮-১৯৪৪) প্রমুখ মনীষীর চিন্তাধারা ও কর্ম পদ্ধতির অনুপ্রেরণায বাঙালি মুসলিম সমাজের "বিচারবুদ্ধিকে অন্ধ সংস্কার ও শাস্ত্রানুগত্য থেকে মুক্তিদান"—এর উদ্দেশ্যে 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ' (ঢাকা ১৯২৬) গঠনের মাধ্যমে বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন শুরু করেন। তাঁদের মূল মন্ত্র ছিল 'বুদ্ধির মুক্তি' (Emancipation of the intellect); মুখপত্র ছিল 'শিখা' (চৈত্র ১৩৩৩)[১]। তাঁরা ঘোষণা করেন, "জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট—মুক্তি সেখানে অসম্ভব"। 'বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন' তথা 'শিখা' গোষ্ঠীর চিন্তানায়কদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০), আবুল হুসেন (১৮৯৭-১৯৩৮), আবদুল কাদির (১৯০৬-১৯৪৮), কাজী আনোয়ারুল কাদির (১৮৮৭-১৯৮৪), কাজী মোতাহের হোসেন (১৮৯৭-১৯৮১), মোতায়ের হোসেন চৌধুরী, আবুল ফজল (১৯০৩-১৯৮৩) প্রমুখ মনীষী। এরা সওগাত (অগ্রহায়ণ ১৩২৫), তরুণপত্র (বৈশাখ ১৩৩২), অভিযান (ভাদ্র ১৩৩৩), শিখা (চৈত্র ১৩৩৩), জাগরণ (বৈশাখ ১৩৩৫), সঞ্চয় (ভাদ্র ১৩৩৫), জয়তী (বৈশাখ ১৩৩৭) প্রভৃতি প্রগতিশীল পত্রিকায় বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিবাদী যুক্তিতে ইসলাম ধর্মের ব্যাখ্যা করে সকল প্রকার গোঁড়ামী, কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা ও প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরুদ্ধে লেখনি চালনা করেন। রক্ষণশীল বাঙালি মুসলিম বিশেষত রক্ষণশীল আলিম সমাজ তরুণ চিন্তাবিদদের এসব প্রাগ্রসর চিন্তা-ভাবনায় প্রচণ্ডভাবে ক্ষুব্ধ হন এবং প্রতিক্রিয়া স্বরূপ শুরু করেন বিরূপ সমালোচনা। সমকালীন রক্ষণশীল

উলেমা ও আলিম সম্পাদিত ধর্মীয় পত্র-পত্রিকায় 'বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন' তথা আন্দোলনের নায়কদের বিরুদ্ধে যে প্রতি আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন আলোচ্য প্রবন্ধে তা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে তুলে ধরার প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

'বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনে'র তরুণ চিন্তাবিদগণ নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা বাঙালি সমাজের কাছে তুলে ধরতে মাতৃভাষা, শিক্ষাব্যবস্থা, অর্থনীতি, রাজনীতি, ললিতকলা প্রভৃতি বিষয়ের চর্চার সাথে ইসলাম ধর্মকে যুক্তির আলোকে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদেব এসব ধ্যান ধারণা বিভিন্ন প্রবন্ধ, নিবন্ধে উপরে উল্লখিত প্রগতিশীল পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে।[২] আন্দোলনকারীগণের এরূপ মুক্তচিন্তা এবং যুক্তিবাদী, কার্যক্রমে তৎকালীন সংস্করাচ্ছন্ন মোল্লা মৌলবীগণ প্রতিবাদ মুখর হযে উঠে এবং তাঁদের বিরুদ্ধে শরিয়ত অবমাননা ও ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগ আনে। আলিম সম্পাদিত সাপ্তাহিক **আল মুসলিম** পত্রিকাটি মন্তব্য কবে, "বাংলাদেশের তথা কলিকাতা ও ঢাকার একদল ইসলামী শিক্ষা-বর্জিত যুবক মনে করেন মোল্লা ও আলিম তথা শরিয়তের বিরুদ্ধতা কবিতে পারিলেই যেন সমাজের একটা বড হিতাকাঙ্ক্ষা হওয়া গেল। এবং পবিত্র কোরআন ও হাদিসের বিরুদ্ধাচরণ কবিযা মোল্লাগণকে গালি দিতে পারিলেই যেন বড একটা 'ন্যাতা' হইযা এস্‌লামের সংস্কার করা হইল।...আফগানিস্তানের রাজনৈতিক পরিবর্তনের সহিত এই রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। ইহার পরিণাম চিন্তা করিলে রূসিযাব সেই নাস্তিকতার কথা মনে হয়। এদের এই মোল্লাদ্রোহিতা তথা ইসলামদ্রোহিতা প্রকৃতপক্ষে খোদাদ্রোহিতার নামান্তর মাত্র।"[৩] অনুরূপভাবে আলিম সাপ্তাহিক **হানাফী** এদেরকে উচ্ছৃঙ্খল, অনাচারী, পবিত্র ইসলামেব সত্য সনাতন আদর্শের অবমাননাকারী আখ্যায়িত করে তাঁদের শাস্তি দাবী করে এবং মুসলিম তরুণদেরকে তাঁদের সঙ্গ থেকে দূরে থাকার উপদেশ দিয়ে লেখে, "বর্তমানে বাঙ্গালার মোসলেম সমাজে নবীনতার ধ্বজাধারী যে উচ্ছৃঙ্খল তরুণ দলের উদ্ভব হইয়াছে, কলিকাতা ও ঢাকার দুইটি অনাচারী দল এবং তাহাদের পরিচালিত মুখপত্রগুলিই ইহাদের পথ প্রদর্শক। এই উভয দলের নানাবিধ অনাচার সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বে বহুবার নানারূপ আলোচনা করিয়া আসিয়াছি। উচ্ছৃঙ্খলতা ও অনাচারের পঙ্কিল প্রবাহে যাহাতে মোসলেম জনসাধারণ গা ভাসাইয়া দিতে না পারে এবং যাহাতে জগতমঙ্গল পবিত্র দীন-ইসলামের শাশ্বত সনাতন আদর্শ অব্যাহত রাখিয়া মুসলমানগণ সাচ্চা মুসলমানেরই মত জীবনের জয়যাত্রায় অগ্রসর হইতে পারে, 'হানাফী' জন্মাবধি সেই সাধনাই করিয়া আসিয়াছে। পথভ্রান্ত উন্মার্গগামীদিগকে আচ্ছা করিয়া 'দোররা' মারিয়া সোজা রাস্তায় (সেরাতুল মোস্তাকীমে) পরিচালনা করাই 'হানাফীর' একমাত্র জীবন সাধনা এবং সেই জন্যই গোড়া হইতে আমরা উচ্ছৃঙ্খল তরুণ দলের বিরুদ্ধে লেখনি

চালনা করিয়া আসিতেছি।”[৪] এতদসঙ্গে হানাফী অভিযোগ করে যে, এরা শরিয়তের ভাব ও অনাচার সমাজে চালাবার চেষ্টা করছে। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ নাস্তিক্য ও পৌত্তলিকতার ভাবে বিভোর হয়ে মুসলিম সমাজেও নাস্তিকতা ও পৌত্তলিকতার প্রচার চালাতে চেষ্টিত। হানাফী দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করে যে হানাফীর লেখনি চালনার ফলস্বরূপ একদিন না একদিন এসব উচ্ছৃঙ্খল ও অনাচার চিরবিদায় নিতে বাধ্য হবে।[৫] 'বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনে'র দিশারীগণের রচনা শিখা ছাড়া অধিক সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে সাপ্তাহিক ও মাসিক সওগাত পত্রিকায়। তাই রক্ষণশীল উলেমা সম্পাদিত পত্রিকা সমূহের আক্রমণস্থল ছিল সত্তগাত ও সওগাতের লেখকবৃন্দ। শিখা ও সওগাতের লেখক তথা বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনকারীগণকে অবিশ্বাসী, বেদাতী ও নাস্তিক প্রভৃতি আখ্যায়িত করে নাযেবে-নবী আলেম সমাজকে তাঁদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে সামিল হতে আহবান জানিয়ে সাপ্তাহিক হানাফী লেখে, “যাহারা কোরআন-হাদিসের অর্থকে উপেক্ষা করিয়া আলেমগণের দীর্ঘ সাধনার ফল ফেকা শাস্ত্রকে 'গুদাম পচাঁ' মাল বলিযা আজ কোটি কোটি মানব-সন্তানের সরল বিশ্বাসে আঘাত কবতঃ মোস্‌লেম জগতেব বিরুদ্ধে অন্যায় অভিযানে বদ্ধপরিকর হইয়াছে, সমূদয যুক্তি ও ইতিহাসের জলন্ত সত্যের মাথায় পদাঘাত করিয়া এমাম ও সোজতাহেদগণের জীবনী আলোচনা না করিয়া নিতান্ত অর্ব্বাচীনের ন্যায় ইহাদের প্রতি কটুক্তি করিতেছে তাহাদের সহিত শক্তি পরীক্ষায় আত্মনিয়োগ করা বিশাল আলেম সমাজের অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই বলি কে কোথায় আজ নায়েবে-নবীর দল, সাড়া দাও। আজ তোমাদের সমবেত শক্তির দ্বারা বিরুদ্ধবাদী দলকে চক্ষে অঙ্গুলী দিয়া দেখাইয়া দাও—আলেমগণ প্রকৃতই 'ওরাছাতুল আম্বিয়া; ইহারা অশিক্ষিত নন, গোমরাহ্ নয়, দুর্ব্বল বেদাতী নয়, নাস্তিক নয়—ইহারা ছেরাতুল মোস্তাকীমের যোগ্য যাত্রী”।[৬]

'বুদ্ধির মুক্তি-আন্দোলনে'র নেতৃবর্গ সামাজিক রীতিনীতি ও ধর্মের ব্যাপারে গতানুগতিক রীতি পরিহারপূর্বক যুক্তি ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে গ্রহণ করাকে সমকালীন সংস্কারাচ্ছন্ন মুসলিম সমাজের জন্য অধিকতর কল্যাণ মনে করেছিলেন। তাই তাঁদের চিন্তাভাবনা এ পথ ধরে এগিয়েছে। তার যুক্তিবাদী চিন্তাভাবনা প্রকাশ পেয়েছে তাঁদের রচনায়। আন্দোলনের অন্যতম নায়ক আনোয়ারুল কাদির বলেন, “বুদ্ধির মুক্তি না হলে ধর্ম্ম-শিক্ষা হতে পারে না। ধর্ম্মের আদেশ ও নিষেধ পালন করার জন্য বুদ্ধির দরকার।”[৭] আন্দোলনের বিশিষ্ট প্রবক্তা কাজী মোতাহের হোসেন এ সম্পর্কে লিখেছেন, “সব সময় মনে রাখতে হবে, লোকহিতই ধর্মের উদ্দেশ্য, ধর্মকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে গিয়ে যদি দেখা যায় অকল্যাণ হচ্ছে, তবে বুঝতে হবে, কোথাও একটা গোলমাল আছে। হয়,

ধর্মের প্রকৃত মর্ম উপলব্ধ হয় নাই, নয়ত ধর্মের সে অংশের উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা না থাকায় বর্তমান অবস্থায় তা অপ্রযোজ্য হয়ে পড়েছে"[৮]। তিনি আরো বলেন, "আমরা ইসলামের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে চাই না—আমরা চাই বর্তমান মুসলমান সমাজের বদ্ধ কুসংস্কার এবং বহুকাল সঞ্চিত আবর্জনা দূর করিতে। আমরা অতীতের মোহে ডুবিয়া থাকিয়া সুখের স্বপ্ন দেখিতে চাই না—আমরা চাই কর্মস্রোতে ঝাঁপ দিয়া ইসলামের ভবিষ্যতকে মহিমা মন্ডিত করিতে। আমরা চাই সমাজের চিন্তাধারাকে কুটিল ও পঙ্কিলপথ হইতে ফিরাইয়া প্রেম ও সৌন্দর্যের সহজ সত্য পথে চালিত করিয়া আমাদের দায়িত্ববোধের পরিচয় দিতে।"[৯] বুদ্ধির মুক্তির আন্দোলনের চিন্তা-নায়কগণ "ধর্ম্মানুষ্ঠানের আবশ্যকতা স্বীকার করে কিন্তু প্রাণহীন অনুর্ব্বব অনুষ্ঠানচর্চার প্রতি কোন দরদ দেখাতে চায় না"[১০]। যদিও তাঁরা ইসলাম ধর্ম ও ইসলাম ধর্মের অনুশাসনের বিরোধী ছিলেন না তথাপি ধর্ম সম্পর্কে তাঁদের মুক্তচিন্তা ও আধুনিক যুক্তিবাদী ব্যাখ্যাদানে রক্ষণশীল আলেম সমাজ অসন্তুষ্ট হয়। আঞ্জুমানে ওয়ায়েজীনে বাঙলার মুখপত্র সাপ্তাহিক আহলে হাদিস-এ সকল যুক্তিবাদী ব্যাখ্যার বিরূদ্ধাচরণ করে মন্তব্য করে, "এতদ্বারা 'এই যুবাদলের মনোভাব বেশ পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে। তাঁরা এসলামের প্রাচীন ধর্ম্ম রীতি, নীতি, আইনকানুনের বিরুদ্ধে ভীষণ বিদ্রোহ উপস্থিত করবেন। করবেন কেন, করেছেন। এখন পবিত্র এসলাম ধর্ম্ম ও সমাজের প্রতি কেতাব ও সোন্নতের প্রতি যদি কাহারও সত্যিকার মমতা থাকে কবে আত্মরক্ষার জন্য, ধর্ম্ম ও সমাজ রক্ষার জন্য, কেতাব ও সোন্নতের রক্ষাব জন্য অবিলম্বে তিনি প্রস্তুত হউন; ইংরেজী শিক্ষিত যুবক যুবতীদের এই ভীষণ বিদ্রোহ ও যুদ্ধ ঘোষণার উত্তরে তার স্বরে সংগ্রাম ও জেহাদ ঘোষণা করুন। নচেৎ তারা আজ না হয় ত কালই তোমাদের মাথা ভাঙবে ও দাঁড়ি ছিঁড়বে। হিন্দু ও খৃষ্টান ধর্ম্মনিষ্ঠ মুসলমানদের যে অনিষ্ট, যে অপমান, যে ক্ষতি করতে সাহসী হন নাই মুসলমানদের নিজের ঘরের যোয়ান ছকরা ছুকরীর দল—এই সকল সোনার চাঁদেরা সেই অপমান ও ক্ষতি করতে অগ্রসর হয়েছেন।"[১১] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন' দ্বারা প্রভাবিত একদল মুসলিম তরুণ রক্ষণশীল আলেম সম্পাদিত পত্র-পত্রিকায় উদারনৈতিক, যুক্তিবাদী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধ প্রচারণার পাল্টা জবাব দিতে গঠন করলেন 'মোল্লাকী বিরোধী লীগ' (যাঁরা সওগাতী দল নামে খ্যাত)।[১২] মওলানা আবদুর রাজ্জাক মলিহাবাদী, আবুল মনসুর আহমদ, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, আবুল হায়াত প্রমুখ ছিলেন লীগের প্রধান ভূমিকায়।[১৩] এরা সভাসমিতি এবং প্রগতিশীল সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রে বিভিন্ন প্রবন্ধ-নিবন্ধের মাধ্যমে রক্ষণশীল উলামাদের প্রভাবের ফলে সৃষ্ট মুসলিম সমাজের অনিষ্টকর দিকগুলো তুলে ধরেন। প্রখ্যাত সাহিত্যিক সাংবাদিক

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী ছিলেন এ কর্মে অগ্রণী। তিনি 'মোল্লা প্রভাবের অনিষ্টকারিতা' নামক ধারাবাহিক প্রবন্ধে রক্ষণশীল উলমাদের হানাফি-মোহাম্মদী ধর্মীয় তর্ক-বিতর্ক, একদল অন্যদলকে মালাউন, মর্দ্দুর, কাফের ফতোয়া দান, এক সম্প্রদায়ের সাথে অন্য সম্প্রদাযের বিয়ে শাদী বর্জনে প্ররোচনা দান, মুসলিম সমাজে ইসলাম বিরুদ্ধ জাতিভেদ প্রথায় উদাসীনতা প্রদর্শন' প্রভৃতি উল্লেখ করে মন্তব্য করেন, "এই সব কিছুব জন্য যে মোল্লা-মৌলবীরাই সম্পূর্ণ রূপে দায়ী, তাহা কোন চক্ষুষ্মান ব্যক্তি অস্বীকার করিতে পারিবেন না। তাঁহারা জানিযা শুনিয়া, ইচ্ছাপূর্ব্বক ছত্রিশ জাতিতে বিভক্ত সমাজ দেহকে শত শত খণ্ডে খণ্ডিত করিযা নিজেদের প্রভাব-প্রভুত্ব ও অর্থাগমের পথ সুপ্রশস্থ করিতেছেন। তাঁহারা ভুলিযা গিযাছেন শত শত দলে বিভক্ত আরবগণকে মিলনের হেম শৃঙ্খলে যিনি আবদ্ধ করিযাছিলেন তাঁহারই প্রতিনিধিত্বের ভাব তাহাদের উপর; তাঁহারা বিস্মৃত হইযাছেন, ইসলামেব মূলমন্ত্র মানুষকে ভ্রাতৃত্বেব বন্ধন সৃষ্টি করা। শিক্ষার বৈগুণ্যে, স্বার্থের তাডনে, আত্মসর্ব্বস্ব পীরগণেব প্রবোচনায তাঁহারা তাহাদেব কর্ত্তব্যের সম্পূর্ণ বিপরীতাচারণ করিতেছেন।"[১৪] বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নাযক কাজী আবদুল ওদুদেব মতে তথাকথিত "আলেমদের কাছে ধর্ম হলো দরুদ পাঠ, কোরান চুম্বন ও শাস্ত্র বিষয়ে আস্ফালন মাত্র।...দুই একজন আলেম ইসলাম ধর্মের আদর্শ, সার্বজনীনতা ইত্যাদি 'গুরু গম্ভীর বচন আওডান' কিন্তু মনুষ্যত্ব, সুন্দর ও সংজীবন বোধ থেকে তারা এসব কথা বলেন না, কারণ আলেমরা ধর্মের প্রতি সম্মোহিত।"[১৫]

মোল্লামী বিরোধী লীগের সদস্য ও 'বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনে'র চিন্তাবিদগণ কর্তৃক ধর্মের যুক্তি নির্ভব ব্যাখ্যা সংস্কারাচ্ছন্ন আলেম সমাজ মেনে নিতে পারেননি। তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত সংবাদ সাময়িকপত্রগুলো নিজস্ব বিশ্বাস অনুযায়ী জবাব দিতে উদ্যোগী হন এবং আধুনিক শিক্ষিত উদারনৈতিক যুক্তিবাদী মননশীল মুসলিম তরুণদের চিন্তা ভাবনার কঠোর সমালোচনা করে। মওলানা আবুবকর সিদ্দিকীর পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত মাসিক শরিয়তে এসলাম লেখে, "যাহার যাহা ইচ্ছা বলুক; কিন্তু সমাজে মোল্লাদের বেশ একটা প্রয়োজন আছে। সমাজের মূর্ত্তিমতী মূর্খতা, পর্ব্বত প্রমাণ দরিদ্রতা এই সকল প্রকৃত বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করিয়া সমাজকে উন্নতির পথে পরিচালিত করিবার ক্ষমতা মোল্লাদের।...আর যদি আমাদের সমাজে ধর্ম্ম-কর্ম্ম বলিয়া কিছু থাকিয়া থাকে, তবে সে এই মোল্লাদের জন্যই আছে —ইংরেজী শিক্ষিতদের জন্য নহে।...নব্য-শিক্ষিত মোসলমানেরা শ্রদ্ধেয় আলেমগণকে মোল্লা বলিয়া গালি দেওয়া ছাড়া সমাজের কোন হিতকর কার্য্য করিতে পারিয়াছে বলিয়া শুনি নাই। জাতীয় উন্নতির কার্য্য আমাদের দেশে এ যাবৎ যাহা কিছু হইয়াছে তথাকথিত মোল্লাদের দ্বারাই হইয়াছে।

নব্য-শিক্ষিত কেহ একখানা সংবাদপত্র পর্য্যন্ত এ দেশে চালাইতে পারে নাই। সমাজের ও দেশের কাজ নিঃস্বার্থভাবে কেমন করিয়া করিতে হয় তাহা তথাকথিত মোল্লাদের নিকট হইতে নব্য-শিক্ষিতগণকে কিছুদিন শিখিতে হইবে।”[১৬] অপর এক সংখ্যায় শরিয়তে এসলাম মন্তব্য করে যে, সমাজ ধ্বংস ও অবনতির কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে 'যত দোষ নন্দ ঘোষে'র ন্যায় সমাজের স্বভাব নেতা ও এসলাম এবং মুসলমানের প্রকৃত খাদেম আলেম ও মোল্লাদিগকে দায়ী করে থাকেন এবং মনের সাধ মিটিয়ে বিভিন্ন ভাষায় গালিবর্ষণ করে নিজেদের প্রবৃত্তি ও রুচির পরিচয় দেন। আনেম ও মোল্লাগণের উপর অযথা দোষারোপ করার পূর্বে একটিবারও চিন্তা করতে সক্ষম হয় না যে আবহমানকাল হতে দীন ইসলাম ও মুসলিম জাতিকে জাগ্রত রাখার মূলে আলেম ও মোল্লাদের আপ্রাণ চেষ্টা, লিল্লাহ, খেদমত এবং অসত্যের বিরুদ্ধে প্রাণান্তর জেহাদ বিদ্যমান রয়েছে। আজও ইসলাম ও মুসলমানের প্রকৃত খাদেম যদি কেউ থাকে তবে সে আলেম সমাজ। এঁদের চেষ্টায় ইসলাম ও মুসলমানের নাম নিশানা বজায় রয়েছে।[১৭] সমাজের উন্নতির মূলে যে আলেম সমাজ তা গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করে সাপ্তাহিক আহলে হাদিস লেখে, “আজ পর্যন্ত ভারতের যত জাতীয় আন্দোলন হইয়াছে, যত সদানুষ্ঠান সম্পাদিত হইয়াছে—তাহাতে মোল্লা বা আলেম শ্রেণী সব সময় সিংহের ভাগ গ্রহণ করিয়াছে”[১৮]। এ সকল আলিম সম্পাদিত পত্র-পত্রিকাসমূহ শুধুমাত্র সমাজে আলিম সমাজের কার্যক্রম ও প্রয়োজনীয়তার কথা বলে ক্ষান্ত হয়নি, 'বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনে'র প্রবক্তা ও তৎসংশ্লিষ্ট বুদ্ধিজীবীদের বিভিন্ন রচনাকে কেন্দ্র করে বিতর্কের সৃষ্টি করে। এতে প্রধান ভূমিকা রাখে মাসিক মোহাম্মদী। কাজী আবদুল ওদুদের প্রবন্ধগ্রন্থ 'নবপর্য্যায়' প্রথমখন্ডে (১৩৩৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত) অন্তর্ভুক্ত হজরত মোহাম্মদ (সঃ)কে মহামানব আখ্যায়িত করে মুসলিম সমাজকে অচলায়তন থেকে মুক্তির পথ নির্দেশ সম্বলিত প্রবন্ধ 'সম্মোহিত মুসলমান'কে উপলক্ষ্য করে মাসিক মোহাম্মদী তুমুল বির্তক তুলে। মোহাম্মদী 'নবপর্য্যায় না নবপর্যায়' শীর্ষক ধারাবাহিক (ফাল্গুন, চৈত্র ১৩৩৪, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫) বিরূপ সমালোচনা প্রকাশ করে। সমালোচনার এক পর্যায়ে লেখা হয়, “তিনি আলেম সমাজ সম্বন্ধে নীচ আক্রমণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, নিতান্ত ধৃষ্টের ন্যায় অতীত ও বর্তমানের সমস্ত মুসলমানকে পৌত্তলিক বা মোশারেক বলিয়া বর্ণনা করিতে লজ্জিত হন নাই; হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার এবং তাঁহার শিক্ষাও চরিত্রের প্রতি প্রকারতঃ বা প্রকাশ্যতঃ খৃষ্টান, আর্য-সমাজী এমন কি আবু জেহেল ও আবু লাহাব অপেক্ষাও নিকৃষ্টতম আক্রমণ করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই,....।”[১৯]একইভাবে আবুল হুসেন-এর 'তরুণের সাধনা (সওগাত, আষাঢ় ১৩৩৬ সংখ্যায় প্রকাশিত) প্রবন্ধের কঠোর সমালোচনা করে।

আবুল হুসেন উক্ত প্রবন্ধে মুসলিম সমাজের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করে বৃটিশ প্রবর্তিত হিন্দু মুসলমানের পৃথক স্কুল-কলেজ ব্যবস্থাকে ভেঙে দিয়ে শিক্ষা কেন্দ্র থেকে হিন্দু মুসলমান বিরোধ দৃঢ়হস্তে দূরীকরণের মাধ্যমে হিন্দু মুসলিম মিলন কামনা করেছেন। কিন্তু মাসিক মোহাম্মদী 'তরুণের সাধনা' প্রবন্ধের মর্ম কথার ভুল ব্যাখ্যা করে লিখে, "সোজা বাঙলায় আবুল হুসেন সাহেবের যুক্তির মর্ম্ম হচ্ছে, ভারতেই এই বিপুল বিরাট এবং জটিল সমস্যার সমাধান করতে হলে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী লোকদের নিজ নিজ ধর্ম্ম ত্যাগ করে রাজা রামমোহন রায় প্রবর্ত্তিত ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গ্রহণ করতে হবে, কেন না রাজা রামমোহনের হিন্দু মুসলিম সমন্বয় সাধনে এক জাতি গঠনের স্বপ্ন ছিল। রাজা রামমোহন রায় যে ভারতীয় জাতি বা Nation গড়বার স্বপ্ন দেখেছিলেন, আমার যতদূর জানা আছে, সে কথা তিনি কোথাও বলেননি। তবে এটা যে তাঁর অব্যক্ত স্বপ্নের মধ্যে ছিল, সে কথাটা মৌলবী আবুল হুসেন সাহেবের ফতওয়া মত, এখন মেনে নেওয়া দরকার। রামমোহন রায়কে করতে হবে আমাদের জাতীয়তার Posthumas Prophet। সেই Posthumas Prophet-এর কী বলা উচিত ছিল, সেটা মৌলবী আবুল হোসেন সাহেবের কাছ থেকে দরিয়াফত করে, মুসলমানকে তাঁর কোরান এবং পয়গম্বর ত্যাগ করতে হবে, হিন্দুকেতার বেদ এবং বেদান্ত ত্যাগ করতে হবে, আর খৃষ্টানকে তার যীশুখৃষ্ট এবং বাইবেল ত্যাগ করতে হবে।"[২০] বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের অন্যতম দিশারী কাজী মোতাহের হোসেন এর সমুচিত জবাব দেন। তিনি বলেন, "হযরত মোহাম্মদ জগতে যে বিশ্বভ্রাতৃত্বের আদর্শের প্রচার করে গেছেন... তাঁর এই মহৎ আদর্শ কোন সম্প্রদায় বিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খৃষ্টান সকলের সঙ্গেই বিশ্ব-মানবতার ক্ষেত্রে এই সমন্বয় সাধিত হতে পারে। এই সমন্বয়ের জন্য কোন সম্প্রদায়কে তার বিশেষ কালচার বা আদর্শানুগত্য বিসর্জ্জন দিতে হয় না, অন্য সম্প্রদায় যে আদর্শের পূজা করে, তাকে সদম্ভে উপহাস না করে, কোটি কোটি লোকের হৃদয় বৃত্তির দিকে লক্ষ্য রেখে তাকে শ্রদ্ধা করা, প্রেমপ্রবণ হৃদয়ে তার ত্রুটি নির্দেশ করা, অন্ততঃপক্ষে তাকে সহ্য করাই এর জন্য যথেষ্ট; আমি হিন্দু, আমি মুসলমান, আমি খৃষ্টান এই ভাবগুলি উগ্রভাবে সর্ব্বদা উঁচিয়ে না রেখে আমরা সকলেই মানুষ, পৃথিবীতে সকলকেই সুন্দরভাবে বেঁচে থাকতে এসেছি, শুধু বিবাদ-বিসম্বাদ করতে আসিনি, এই ভাবগুলিকে প্রাধান্য দেওয়াই এর জন্য যথেষ্ট।"[২১]

উপরোক্ত আলোচনায় এটা পরিষ্কার যে 'বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনে'র চিন্তা-বিদগণ সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে রক্ষণশীল আলেম এবং তৎ পরিচালিত সংবাদ সাময়িকীর আক্রমণের শিকার হয়েছিলেন। কিন্তু এটা স্বীকার্য যে এই

আন্দোলন বাঙালি মুসলিম সমাজে প্রগতিশীল ধ্যান-ধারণা বিকাশে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। অন্যদিকে তৎকালীন বাঙালি মুসলিম সমাজের রক্ষণশীল অংশ ধর্মকে বিচার বুদ্ধি ও যুক্তি তর্কের মাধ্যমে বিচার করে গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

সূত্র নির্দেশ

১. কাজী আবদুল ওদুদ, বাংলার জাগরণ, কলিকাতা ১৩৬৩, পৃঃ ১৯৪-৯৫
২. এ সকল রচনার জন্য দেখুন— বাংলা একাডেমী (ঢাকা) থেকে প্রকাশিত আবদুল ওদুদ রচনাবলী, কাজী মোতাহের হোসেন রচনাবলী, মোহম্মদ ওয়াজেদ আলীর রচনাবলী ও কাজী মোতাহের হোসেন রচনাবলীর বিভিন্ন খণ্ড
৩. সাপ্তাহিক আল-মুসলিম, ১লা কার্তিক ১৩৩৬, পৃ. ৩
৪. হানাফী ৫ই কার্তিক ১৩৩৫, উদ্ধৃত সাপ্তাহিক আহলে হাদিস ১লা নভেম্বর ১৯২৮, পৃ. ৫
৫. ঐ
৬. সাপ্তাহিক হানাফী ২৩ জুলাই ১৯২৮, পৃ. ৫
৭. লায়লা জামান, সওগাত পত্রিকার সাহিত্যিক অবদান ও সামাজিক ভূমিকা, ঢাকা ১৯৮৯, পৃঃ ২৩৭
৮. ঐ, পৃ. ২৩৮
৯. ঐ, পৃ. ১২০
১০. ঐ, পৃ. ২৫২-৫৩
১১. সাপ্তাহিক আহলে হাদিস ২৪ অক্টোবর ১৯২৯, পৃ. ৮
১২. সাপ্তাহিক সওগাত, ৩০ আগষ্ট ১৯২৯, পৃ. ১৬
১৩. ঐ
১৪. ঐ, ১৮মে ১৯২৯, পৃ. ৩-৪
১৫. লায়লা জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩
১৬. এস. রজব আলী, মোল্লা ও বাংলার মুসলমান, শরিয়তে এসলাম মাঘ ১৩৩৮, পৃ. ৬-৮
১৭. মওলানা আবদুল কাদের সিদ্দিকী, মৌল্লার দৌরাত্ম্য (প্রতিবাদ) শরিয়তে এসলাম বৈশাখ ১৩৪২, পৃ. ৮৬
১৮. সাপ্তাহিক আহলে হাদিস, ৫ ডিসেম্বর ১৯২৯, পৃ. ১০
১৯. মাসিক মোহাম্মদী, চৈত্র ১৩৩৪, পৃ. ৩৪৮
২০. ঐ, পৌষ ১৩৩৬, পৃ. ১৬৭-৬৮
২১. ঐ, চৈত্র ১৩৩৬ পৃ. ৪৫৫-৫৬

বালকবন্ধু : প্রথম বাংলা কিশোর পাঠ্য সাময়িক পত্রিকা

অর্চনা মণ্ডল

১৮৬০ সনে ক্রিশ্চান ভার্ণাকুলার এডুকেশন সোসাইটির বঙ্গীয় শাখা 'সত্যপ্রদীপ' নামে একখানি শিশুদের মাসিকপত্র প্রচার করে। এরই অনুসরণে ১৮৬৯ সনে মিশনারিদের কল্যাণে 'জ্যোতিরিঙ্গন' আবির্ভূত হয়।[১] এই দুটি পত্রিকা কেশবচন্দ্র সেনকে 'বালকবন্ধু' (১৮৭৮) নামে একটি উচ্চশ্রেণীর শিশু পাক্ষিক প্রকাশে প্রেরণা দেয়।

কেশবচন্দ্র সেন বিলেত যান ১৮৭০ সনের ১৫ই ফেব্রুয়ারি। সেখানে শিশু ও কিশোরদের উপযোগী সাহিত্যসম্ভার ও শিশুদের জীবনে সেগুলির শুভ প্রভাব তাঁকে উৎসাহিত করেছিল। তিনি এ ধরনের প্রকাশনার প্রয়োজনীয়তা বুঝেছিলেন ও বংলাদেশে বাংলাভাষায় অনুরূপ প্রযাসের কথা ভেবেছিলেন তিনি আসার সময় (১৮৭০ সনের ১৬ই অক্টোবর) কয়েকটি পত্রিকা নিয়ে আসেন। সম্পাদকীয় অভিজ্ঞতায় তিনি বুঝেছিলেন, শুধু ধর্ম নয়, সমাজের ভিত শক্ত করতে হলে শিশুদের হৃদয়রাজ্য জয় করতে হবে, শিশুমন গঠন করতে হবে। সেই উদ্দেশ্যেই ১৮৭৮ সনের ১৮ই এপ্রিল (২০শে বৈশাখ ১৮০০ শক) 'বালকবন্ধু' নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করেন।[২] কেশবচন্দ্র নিজে এটি সম্পাদনা করতেন। সেকালের শিক্ষানুরাগীরা আগে শিক্ষা পরে আনন্দ দান চেয়েছিলেন। কেশবচন্দ্র 'বালকবন্ধু'তে নীতিশিক্ষা ও ধর্মপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গে শিশুদের আনন্দ দানের ব্যবস্থা করলেন।

'বালকবন্ধু'র আয়তন ছিল আট পৃষ্ঠা। এটি কলকাতায় ইণ্ডিয়ান মিরর প্রেস - ৬ নম্বর কলেজ স্কোয়ার থেকে মুদ্রিত ও এম. এম. রক্ষিত দ্বারা বৃহস্পতিবার প্রকাশিত হত। বিজ্ঞাপন রেট ছিল প্রতি ছত্রে ২ আনা (১২ পয়সা)। পত্রিকাটির দাম ছিল এক পয়সা। কেশবচন্দ্র ১৮৭০ সনের ১৫ই নভেম্বর (১২৭৭ বঙ্গাব্দের ১লা অগ্রহায়ণ) 'সুলভ সমাচার' নামে এক পয়সা দামের একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন।[৩] 'সুলভ সমাচার'-এর আগে এক পয়সা দিয়ে কাগজ পড়ার কথা কেউ কল্পনা করেনি। অবশ্য উনিশ শতকের ষাটের দশকে ইংল্যাণ্ডে পেনি পেপার খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।[৪] 'সুলভ সমাচার'-এর প্রচার ছিল খুব বেশি। আট-দশ হাজার পর্যন্ত বিক্রি হত— সব সংবাদপত্রের চেয়ে বেশি।[৫]

. পত্রিকাটিকে আকর্ষণীয় করার জন্য কেশবচন্দ্র গল্প, উপকথা, প্রবন্ধ, কবিতা, সঙ্গীত হেঁয়ালী, অঙ্ক ও নানা ধরনের পন্থা উদ্ভাবন করেছিলেন। তাছাড়া প্রতি সংখ্যায় বাংলা অনুবাদসহ চার লাইনের একটি সংস্কৃত শ্লোক থাকত। তার চারপাশে সুন্দর নক্‌শা পত্রিকাটির ঔৎকর্ষ বাড়িয়ে তুলেছিল।

দেয মার্ত্তস্য শয়নং
পরিশ্রান্তস্য চাসনম্‌
তৃষিতস্য চ পানীয়ং
ক্ষুধিতস্য চ ভোজনং।

(রোগীকে শয্যা, শ্রান্তকে আসন, তৃষ্ণার্তকে পানীয় এবং ক্ষুধিতকে ভোজ্যবস্তু দান করিবে।[৬]) সেই সঙ্গে কিশোরেরা যাতে সহজ, স্বচ্ছ বাংলাভাষা শিখতে পারে তারও চেষ্টা করেছিলেন। পত্রিকার ৮ম সংখ্যা 'ভাষাশুদ্ধি'তে লিখেছিলেন :

> বালকগণ, এখন হইতে যে রূপ বর্ণোচ্চারণ করিবে সেই রূপই অভ্যাস হইযা যাইবে। অধিক বয়সে সহজে সেই অভ্যাস ত্যাগ করিতে পারিবে না। তাই বলি বালকগণ ভুল উচ্চারণ কহিও না, ভুল লিখিও না।[৭]

পত্র লেখার সময সাধারণত কতকগুলি সংস্কৃত শব্দ বা সাধু ভাষা দিয়ে আরম্ভ করা এখনও প্রচলন আছে। তিনি ১২ সংখ্যায লেখেন :

> পত্র লিখিতে গেলে "বহব প্রণামা নিবেদনঞ্চাগে মহাশয়ের আশীর্ব্বাদে এ জনাব প্রাণগতিক সমস্ত মঙ্গল" প্রভৃতি সংস্কৃত বাঙ্গালা মিশ্রিত কথা লিখিও না। সরল, সাধু ও সুখবোধ্য বাঙ্গালায ভাব প্রকাশ করিবে। শিরোণামেও বড় বড় অনর্থক বিশেষণ পদ যুড়িয়া দিবে না।[৮]

পত্রিকাটিতে বালকেরাও লিখত। যেমন কলকাতার হিন্দু স্কুল, নর্মাল স্কুলের ছাত্ররা, চন্দননগরের স্কুলের ও সালিখার এ.এস. স্কুলের ছাত্ররাও লিখত। এরা নাম প্রকাশ করত না, সংক্ষেপে 'মৃ. না. বাক্‌চি', 'শ্রী রা. চ. দেব', 'শ্রী শ. চ', 'শ্রীপ্যা' লিখত। যাঁরা এতে লিখতেন সম্পাদক তাঁদের পত্রিকার মারফৎ জানান :

> যাঁহারা রচনা পাঠান তাঁহাদিগকে জানাইতেছি যে যখন যে সময় নহে সে বিষয়ে না লেখা ভাল। যেমন গ্রীষ্মকালে শীতকালের বিষয় লেখা এবং শীতকালে গ্রীষ্মকাল অথবা বর্ষাকালের বিষয় লেখা উত্তম নহে। আমাদিগের আরও একটি বক্তব্য এই যে লেখা ভাল বিবেচনা না করিলে আমরা তাহা ছাপাইব না এবং যে সকল ছাপাইব না তাহা আমরা ফিরাইয়া দিতে পারিব না। যাঁহারা লেখা পাঠাইবেন তাঁহারা পরিষ্কার এবং একটু একটু বড় অক্ষরে লিখিবেন। লেখার ভাষাও অতি সহজ হওয়া চাই। পদ্য অপেক্ষা গদ্য লিখিতে চেষ্টা করিবেন।[৯]

এই পত্রিকার ছোট ছোট গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা প্রভৃতিতে সম্পাদকের যথেষ্ট নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন ৭ম সংখ্যায় ছোট রচনাটি 'কি পড়িতে কি পড়িলেন' :

পশ্চিমাঞ্চলের মহাজনেরা মুড়িয়া নামক একপ্রকার অক্ষর পত্রাদি লিখিতে ব্যবহার করিয়া থাকেন। এ অক্ষরে ইঁহারা মাত্রা বা অ-কার, ই-কার, উ-কার প্রভৃতি যোগ করেন না। বব লিখিলে চাই কি তাঁহারা বাবা, বিবি, বাবু, বোবা যাহা ইচ্ছা তাহাই পড়িতে পারেন। ...কোন মহাজনের বাটীতে এই মুড়িয়া অক্ষরে একদা একখানি পত্র আইসে। তাহাতে এই লেখা ছিল—" বড় ভই আজমর গয় বড় বহক ভজ দও" "বড়ে ভাই আজ মের গেয়ে বড়ী বহী কো ভেজ দেও"। বড় ভাই আজমির গিয়াছেন বড় বহি (খাতা) পাঠাইয়া দিবেন। পাঠকের তেমন বিদ্যা ছিল না, তাতে আবার তিনি সম্পর্কে জামাই। তিনি পড়িলেন " বড়ে ভাই আজ মর গেয়ে বড়ী বহু কো ভেজ দেও'—বড় ভাই আজ মরিয়া গিয়াছেন বড বৌকে পাঠাইযা দিবেন। এই সমাচার শুনিবামাত্র সকলে বিলাপ ও রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন এবং সকল প্রতিবাসী তাঁহাদের বাটীতে আসিতে লাগিলেন। এমন সময এক ব্যক্তি সবিশেষ অবগত হইয়া পত্রখানি দেখিতে চাইলেন এবং দেখিয়া তাহার ঠিক অর্থ প্রকাশ করিয়া সকলকে সান্ত্বনা ও সুস্থ করিলেন। পাঠক বড়ই লজ্জিত হইলেন, কিন্তু যেমন লেখার শ্রী তাহাতে তাঁহাকে দোষ দিলে কি হইবে?[১০]

কালের ব্যবধানে চিন্তার পরিবর্তন, দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন তো স্বাভাবিক। নিতান্ত কৈশোরের উচ্ছল চিন্তার সঙ্গে পরিণত বয়সের প্রশান্তি ও স্থিরতার তফাৎ অনেকখানি।

গল্প (যেমন-'এক পাগলের গল্প', 'পাতিহাঁস', 'দয়ালু হস্তী' ইত্যাদি), উপকথা (যেমন-'চাকর', 'জেলে-জেলিনী' ইত্যাদি), কবিতা (যেমন-'মাতৃস্নেহ' 'চড়াই পাখির উক্তি' ইত্যাদি) প্রভৃতি শিক্ষামূলক রচনা প্রকাশিত হত। গল্প বা কবিতা উপদেশমূলক হলে সাধারণত সাহিত্যিক উৎকৃষ্ট হয় না। কিন্তু এই রচনাগুলিতে সাহিত্যিক গুণের কোন ত্রুটি নেই। ইংরেজি কবিতা ও গল্পের অনুবাদও প্রকাশিত হত।

বাংলা ভাষায় ব্যাকরণ প্রকাশিত হলেও শিশু ও কিশোরদের উপযোগী সেরূপ কিছু ছিল না। কেশবচন্দ্র এই পত্রিকায় ব্যাকরণের যে বিধিগুলি দিয়েছেন সেগুলি একত্রে মুদ্রিত করলে একটি কিশোর-পাঠ্য বাংলা ব্যাকরণ প্রকাশিত হতে পারে। যেমন-পত্রিকার ৬ সংখ্যায় ণত্ব বিধানের নীতি :

বিধি : ভিন্নপদে নকার ণকার রূপী নয়। নর-যান, হরি-নাম, ত্রি-নেত্র, নিলয়।। ব্যাখ্যা—যেখানে দুটি শব্দ মিলিত হইয়া একটি শব্দ হইয়াছে, সেখানে যদি এমন হয় যে পূর্ব্বশব্দে ঋ, র, ষ আছে পরের শব্দে ন আছে, তাহা হইলে ভিন্ন পদ জন্য সেখানে মূর্দ্ধণ্য হইবে না। যেমন 'নরযান' শব্দে 'নর' একটি শব্দ, 'যান' একটি শব্দ। এই দুই শব্দ মিলিত হইয়া 'নরযান' একটি শব্দ

হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী. নর শব্দের অন্তে র আছে পরবর্ত্তী যান শব্দের অন্তে. ন আছে। এখানে র বিধি অনুসারে মূর্দ্ধণ্য হইতে পারে। অথচ ভিন্ন পদ জন্য মূর্দ্ধণ্য হইল না। এইরূপে 'হরিদাস', 'ত্রিনেত্র' 'নিলয়' প্রভৃতি শব্দেও বুঝিতে হইবে।[১১]

সম্পাদক এই পত্রিকার মাধ্যমে কিশোর বয়স থেকে যাতে কুসংস্কার ত্যাগ করতে পারে সেজন্য পত্রিকার ৯ম সংখ্যায় লেখেনঃ

কুসংস্কার ত্যাগ করিতে হইবে। ভূত-পেতনী নাই, অন্ধকারে ভূত-পেতনীর ভয়ে কেঁচর মত জড়সড় হইবে না। দক্ষিণ অঙ্গ নাচিলেও আশায় ভুলিয়া উঠিবে না। হাঁচিকেও দোষের মনে করিবে না।[১২]

'পড় দেখি' - এই শিরোনামে কিছু শব্দকে এলোমেলোভাবে সাজানো থাকত। পরের সংখ্যায় সেটি বাক্যে পরিণত করে প্রকাশিত হত। 'বালকবন্ধু'র ৯ম সংখ্যায় প্রকাশিত :

আমি বন্ধু প্রাণের ভালবাসি প্রতিবারই বালক কাগজকে সহিত একখানি এক দিয়া চেষ্টা এবং কিনিতে পয়সা কিনিতে করিব। সকলকে অনুরোধ করিব।[১৩]

সমাধান : আমি বালকবন্ধু কাগজকে প্রাণের সহিত ভালবাসি। প্রতিবারই একখানি এক পয়সা দিয়া কিনিতে চেষ্টা করিব এবং সকলকে কিনিতে অনুরোধ করিব।

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পাক্ষিক পত্রিকা 'আনন্দমেলা'তেও এরূপ প্রচলন আছে।

পত্রিকাতে অঙ্ক, মানসাঙ্ক, নামতা শেখানোর পদ্ধতি প্রভৃতি আলোচিত হয়েছে। সেগুলি উনিশ শতকে বাংলায় গণিত বিষয়ক রচনায় সাহায্য করবে। অঙ্কের মত বিষয় কিশোর-কিশোরীদের আকর্ষণ করার জন্য নানা পদ্ধতির উদ্ভাবন করা শ্রম ও বিস্তর চিন্তাসাপেক্ষ। যেমন— ১১ সংখ্যায় :

চারি একে চার
বনফুলের হার।
চার দুগুণে আট।
ঘর জোড়া খাট।[১৪]

বা ২১ সংখ্যায় ৬৫র যাদুঘর

১১	২৪	৭	২০	৩
৪	১২	২৫	৮	১৬
১৭	৫	১৩	২১	৯
১০	১৮	১	১৪	২২
২৩	৬	১৯	২	১৫

১ হইতে ২৫. পর্য্যন্ত এই সংখ্যাগুলিকে এমন করিয়া সাজান হইল যে সোজা অথবা কোণাকোনী যে দিকে ঠিক দিবে সেই দিকেই ৬৫ হইবে।[১৫]

'বালকবন্ধু'র ৬ষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত অঙ্কগুলি কিশোরদের চিন্তাশক্তি বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করবে।

যদি ছয়টা বিড়াল ছয়টা ইঁদুরকে ছয় মিনিটে মারে, তাহা হইলে ১০০টি ইঁদুরকে ৫০ মিনিটে মারিতে কয়টা বিড়াল লাগিবে?[১৬]

গণিত নিয়ে আলোচনা কিশোর-পত্রিকায় করা অত্যন্ত দরকার। 'বালকবন্ধু'তে সেটি অত্যন্ত সুন্দরভাবে পরিবেশিত হয়েছে। এখন পড়ানোর রীতি পাল্টে গেছে, ধারাপাতও নেই, সুর মিলিয়ে মুখস্থ করাও উঠে গেছে। নতুন প্রজন্ম ও গণিত ঐতিহাসিকদের কাছে এই পত্রিকার অঙ্কগুলি এক নতুন সংযোজন।

এই পত্রিকায় এমন কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির কথা বলা হয়েছে যাতে কিশোরেরা সহজেই আকৃষ্ট হয়। যেমন ১১'সংখ্যায় 'আশ্চর্য্য' এই শিরোণামে :

আমেরিকাতে একজন একটি যন্ত্র করিযাছেন তাহার ভিতর দিয়া বিদ্যুতের আলো যাইবে দুই শত ক্রোশ দূরে যদি একজন লোক থাকেন, বিদ্যুতের আলো পাঠাইয়া দিযা তাঁহার মুখখানি অনায়াসে দেখিয়া লওয়া যাইবে। বাপ মা ছেলে বিদেশে থাকিলে এই নূতন যন্ত্র দিয়া তাঁহাদিগের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হইবে এবং টেলিফোন যন্ত্র দ্বারা কথাবার্ত্তাও চলিবে।[১৭]

আবার পত্রিকার ১২ সংখ্যায় চিত্রসহ টেলিগাস্ট্রোগ্রাফ যন্ত্রটিও কিশোরদের পক্ষে বেশ আকর্ষণকারী।[১৮]

পত্রিকাটিকে আরও মনোজ্ঞ ও আকর্ষণীয় করার জন্য নানারকম চিত্রও প্রকাশিত করেন। 'বকেশ্বর' নামে অদ্ভুত একটি ছবি ১৩ সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল। সম্পাদক লিখেছেন :

এবারকার বালকবন্ধু আর একখানি ছবি দিবার কথা ছিল। কিন্তু ছবি সময়ে প্রস্তুত না হওয়াতে আমরা আর কোন উপায় না দেখিয়া অবশেষে আমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা 'সুলভ সমাচারের' বাটীতে গিয়া তাড়াতাড়ি বকেশ্বরকে ধরিয়া আনিলাম।[১৯]

আবার, একটি মোটাসোটা ছেলের ছবি, সার্ট ও ধুতি পরেছে। তার নাম ফটিক চাঁদ। বয়স প্রাস ১৫/১৬। ছবির নীচে লেখা :

স্কুলের নাম করলেই ...দেশছাড়া হয়। তাঁহার মতে স্কুল আর বাঘ দুইই সমান। মা ধরিয়া জোর করিয়া স্কুলের কাপড় পরাইয়া দিয়াছেন তা ফটিক চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া পাড়ার লোক যড় করিতেছেন।[২০]

চিত্রগুলি প্রথম শ্রেণীর কৌতুকচিত্র। প্রথম জাতের কৌতুকচিত্রীরা তাঁদের রসিকতা দিয়ে জীবনের বেদনার দিক ও ক্ষোভের দিক ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা করেন। কিন্তু

কৌতুক ও ব্যঙ্গচিত্রের খোরাক সংগ্রহ করতে হলে সূক্ষ্ম ও বিশেষ পর্যবেক্ষণ শক্তির প্রয়োজন হয়। এগুলিতে চিত্রকরের দূরদর্শিতার ও বাস্তববাদিতার প্রমাণ পাওয়া যায়।

কেশবচন্দ্রের বালকবন্ধুতে এমন কতকগুলি ধাঁধা প্রকাশিত হত যেগুলির সমাধানে মেধা, যুক্তি, বুদ্ধি ও তৎপরতার সমন্বয় ঘটত। যেমন—পত্রিকার ১১ সংখ্যায়:

প্রথম অক্ষর ছেড়ে দিলে টলে পড়ে যায়।
মাঝের অক্ষর ছেড়ে দিলে কালাংশ বুঝায়।
শেষের অক্ষর ছেড়ে দিলে ছবি হয় ভাই।
তিন অক্ষর যোগে তাহা রেঁধে রেঁধে খাই।[২১]

'প্রশ্ন' এই শিরোনামে কিছু কিছু মজার ব্যাপার থাকত। যেমন ১৭ সংখ্যায়:

তিন সহোদরা ভগিনী ছিল। তাহাদের প্রত্যেকের এক একজন সহোদর ভাই ছিল। তাহারা সমুদয়ে কয় জন ছিল?[২২]

বা ১৩ সংখ্যার 'মজার কথা'য়

কলকাতার কোন স্থান পরকালের খুব নিকট? উত্তর: নিমতলার ঘাট[২৩]।

'বালকবন্ধু'র ছুটির সংখ্যাও কেশবচন্দ্র প্রকাশ করেন। পূজা সংখ্যাটি বুধবারে প্রকাশিত হয়েছিল। বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল:

আগামী বুধবার কার্ত্তিকের রঙের কাগজে 'ছুটির বালকবন্ধু' বাহির হইবে। ভাল ভাল ছবি এবং নানাপ্রকার আমোদ থাকিবে।...যে সকল বালক 'বালকবন্ধু'র জন্য রচনা পাঠাইবেন তাঁহারা নামধামের সঙ্গে বয়সও লিখিয়া পাঠাইবেন।[২৪]

এই সংখ্যাটিতে বালকদের আকর্ষণ করার জন্য লেখা হয়েছিল:

চাই, ছুটির বালকবন্ধু চাই! এস ভাই, দৌড়ে এস! ভাল ভাল ছবি, বড় মজার গল্প। মূল্য নগদ এক পয়সা।[২৫]

সম্পাদক যেন শিশুদের সঙ্গে ভাব জমাবার চেষ্টা করেছেন।

পত্রিকার ২২ সংখ্যায় একটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের নাটিকা "জাতে জাতে লড়াই" প্রকাশিত হয়েছিল।

ভোলানাথ, তিলকরাম, শ্যামকৃষ্ণ, ফটিকচাঁদ প্রভৃতির প্রবেশ।

ফঃ আর রেখে দে তোর বামন জাতি, আমরা কায়স্থ, কায়স্থের কাছে লাগে কে।

শিক্ষকের প্রবেশ

শিঃ আরে এ চতুস্পদের লড়াই কোথা হইতে ঘটিল?

চারিজনেই আসিয়া নালিশ করিল।

তোমরা ভিন্ন জাতি হইলেও তোমরা আপাততঃ— তোমরা মনুষ্যজাতি। পশুজাতি নহে।....সুতরাং, মনুষ্য বলিয়া তোমাদের সকলকেই আমি ভালবাসি।

চারিজনেই বলিয়া উঠিল :

তা বটে ত! তা বটে ত! আমরা ত বাঁদর নহে যে পরস্পর বিবাদ করিয়া মরিব। মনুষ্য আমরা—সুতরাং ভাই এই, আমরা কোলাকুলি করি।[২৬]

পরস্পরের কোলাকুলি এবং প্রস্থান।

কেশবচন্দ্র সেন প্রতিষ্ঠিত ভারত সংস্কার সভার পাঁচটি শাখার মধ্যে অন্যতম ছিল সুরাপান নিবারণী শাখা। বালকবন্ধুতেও তিনি কিশোরেরা যাতে মদ্য-পানে আসক্ত না হয়ে ওঠে সেজন্য আলবার্ট স্কুলের ছাত্রদের কাছে যে বক্তৃতা দেন সেটি 'বালকবন্ধু' পত্রিকায় প্রকাশ করেন।

আলবার্ট স্কুলের ক্ষুদ্র যোদ্ধাসকল। সত্যের জয়পতাকা উড্ডীয়মান কর। আজ তোমাদের আনন্দের দিন। তোমাদিগকে একটি সম্বাদ দিই। ইংলন্ড হইতে এই দেশে একটি ভয়ানক দানব আসিয়াছে। তাহার নাম সুরাপান। সেই দানব সামান্য আলু, পটল এবং অন্যান্য জীবজন্তু খাইয়া সন্তুষ্ট হয় না। সে যুবাদিগকে খায়।...সেই রাক্ষস এই দেশে এক একটি কেল্লা স্থাপন করিযাছে। এক একাটি মদের দোকান তার এক একটি কেল্লা। সেই এক একটি কেল্লায তাহার কাল কাল সহচর অনুচরদিগকে দাঁড় করাইয়া রাখিয়াছে। সে সকল সহচরের নাম বোতল।...এই রাক্ষস এক একটি মানুষকে নাশ করে। পিতা পুত্র স্বামী স্ত্রী সকলকে গ্রাস করিয়া এক একটি গৃহকে এক একটি শ্মশান করিয়া তোলে। তোমরা ছোট ছোট বীর। তোমাদের হাতে সত্যের জয় পতাকা, ধর্ম্মের পতাকা। তোমরা সৈন্য, তোমাদের সেনাপতি ঈশ্বর।

...তাঁহার আশীর্ব্বাদে তোমরা কুল-পাবন সৎ-পুত্র হইয়া তোমাদের দেশ এবং পৃথিবীকে উজ্জ্বল কর।[২৭]

একশো বছরেরও বেশী আগে কেশবচন্দ্র নেশার মারাত্মক দিকটি উপলব্ধি করেছিলেন। যে আদর্শের ডালি সাজিয়ে তিনি পত্রিকাটি প্রকাশ করেছিলেন তা কিন্তু রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। মাত্র এক বছর পরে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। যদিও এর প্রচার খুব কম হয়নি। সানডে মিরর (১১ই এপ্রিল ১৮৮০ খ্রীঃ) থেকে জানা যায়, দু হাজার কপি বিক্রি হত। পত্রিকাটির প্রথম ও চতুর্থ সংখ্যাটি পুনর্মুদ্রিত হয়। ১৮৮১ সনের ১৫ই ডিসেম্বর থেকে এটি মাসিক আকারে পুনঃপ্রকাশিত হয়। এবারও কিছুদিন পরে বন্ধ হয়ে যায় ও ১৮৮৩ সনে আবার প্রকাশিত হয়। ১৮৯১-এর এপ্রিল নামে 'বালকবন্ধু' "নূতন প্রকরণ" মাসিক আকারে আবির্ভূত হয় কিন্তু পত্রিকাটি চালানো সম্ভব হয়নি।[২৮]

পত্রিকাটির মূল্য অস্বীকার করা যায় না। এটি প্রমদাচরণ সেনের 'সখা' নামক মৌলিক পত্রিকা রচনা করতে সাহায্য করেছিল।

সূত্র নির্দেশ

১. সুশীল দাস: 'সংবাদপত্রের সম্পাদক কেশবচন্দ্র সেন', আনন্দবাজার পত্রিকা লাইব্রেরি। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন সার্দ্ধশততম জন্মবার্ষিক আলোচনা চক্র। ১১ই এপ্রিল ১৯৮৯ কলিকাতা। পৃ. ৫.।
২. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়: বাংলা সাময়িক পত্র (দ্বিতীয় খণ্ড)। ১২৭৫ (১৮৬৮)-১৩০৭ (১৯০০)। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ। কলকাতা। পৃ. ২৫।
৩. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ পৃ. ৫।
৪. The Hindoo Patriot, January 4, 1864.
৫. যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সংকলিত: সুলভ সমাচার ও কেশবচন্দ্র সেনেরো রাষ্ট্রবাণী। দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৯৬। কলকাতা। পৃ. খ।
৬. বালকবন্ধু, ১৩ই আষাঢ় ১৮০০ শক। ৬ সংখ্যা।
৭. ঐ, ১০ই শ্রাবণ ১৮০০ শক। ৮ সংখ্যা।
৮. ঐ, ৪ঠা আশ্বিন ১৮০০ শক। ১২ সংখ্যা।
৯. ঐ, ৭ই ভাদ্র ১৮০০ শক। ১০ সংখ্যা।
১০. ঐ, ২৮শে আষাঢ় ১৮০০ শক। ৭ সংখ্যা।
১১. ঐ, ১৩ই আষাঢ় ১৮০০ শক। ৬ সংখ্যা।
১২. ঐ, ২৪শে শ্রাবণ ১৮০০ শক। ৯ সংখ্যা।
১৩. ঐ,
১৪. ঐ, ২১শে ভাদ্র ১৮০০ শক। ১১ সংখ্যা।
১৫. ঐ, ৭ই চৈত্র ১৮০০ শক। ২১ সংখ্যা।
১৬. ঐ, ১৩ই আষাঢ় ১৮০০ শক। ৬ সংখ্যা।
১৭. ঐ, ২১শে ভাদ্র ১৮০০ শক। ১১ সংখ্যা।
১৮. ঐ, ৪ঠা আশ্বিন ১৮০০ শক। ১২ সংখ্যা।
১৯. ঐ, ১০ই আশ্বিন, ১৮০০ শক। ১৩ সংখ্যা।
২০. ঐ, ৫ই বৈশাখ ১৮০১ শক। ২২ সংখ্যা।
২১. ঐ, ২১শে ভাদ্র ১৮০০ শক। ১১ সংখ্যা।
২২. ঐ, ১৩ই অগ্রহায়ণ ১৮০০ শক। ১৭ সংখ্যা।
২৩. ঐ, ১০ই আশ্বিন ১৮০০ শক। ১৩ সংখ্যা।
২৪. ঐ, ৪ঠা আশ্বিন ১৮০০ শক। ১২ সংখ্যা।
২৫. ঐ, ১০ই আশ্বিন ১৮০০ শক। ১৩ সংখ্যা।
২৬. ঐ, ৫ই বৈশাখ ১৮০১ শক। ২২ সংখ্যা।
২৭. ঐ, ৯ই ফাল্গুন ১৮০০ শক। ২০ সংখ্যা।
২৮. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়: বাংলা সাময়িক-পত্র, দ্বিতীয় খণ্ড। কলিকাতা। পৃ. ২৫।

বঙ্গ সংস্কৃতিতে 'যাত্রা'

নির্মল বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঙালীর খাঁটি নাট্য, আপন নাট্য বলতে বোঝায় 'যাত্রা'। বাংলার নাট্যসংস্কৃতির একটা অচ্ছেদ্য অঙ্গ যাত্রা। যাত্রা আবহমান বাঙালী সংস্কৃতির অন্যতম ও প্রধানতম বাহন। যাত্রা আমাদের সুপ্রাচীন কালের লোকজ ও মৌলিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। দীর্ঘকাল বিচিত্র প্রতিকূলতা, চড়াই-উৎরাই পার হয়ে যাত্রাকে পথ চলতে হয়েছে। কিন্তু যাত্রা নামক আবহমানকালের বাঙালী লোকজীবন উৎসারিত, নৃত্যগীতাদি সমন্বিত লোকরঞ্জক শিল্পধারাটি তার উত্তরের কাল থেকে ক্রমবিকাশের প্রবাহে যে বিচিত্র বিন্যাসে বর্তমান সময় পর্যন্ত বিভাসিত হয়েছে সেই ধারাটিকে পর্যবেক্ষণের পূর্ণাঙ্গ কোন আলোচনা ধারা গড়ে ওঠেনি এ পর্যন্ত, বিশেষ করে 'ঐতিহাসিক-সমাজতাত্ত্বিক-নৃতাত্ত্বিক' দৃষ্টিকোণ থেকে। যেটুকু হয়েছে, দু-একটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে তা নিছকই সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে। বস্তুত ভারতীয় নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস যাঁরাই আলোচনা করেছেন, তাঁদের আলোচনায় একেবারে অনুষঙ্গ হিসেবে যাত্রা নামক বিষয়টি এসেছে মাত্র। অথচ যাত্রা শিল্পটি আবহমান বাংলার লোকজ সংস্কৃতিজাত প্রতিপাদিত শিল্প— যার সঙ্গে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিপাদিত বিভিন্ন শিল্পধারার ঐক্যসূত্র কেবল বিস্ময় উদ্রেককারীই নয়, অভাবনীয়ও বটে। এ অর্থে যাত্রা নিজস্ব শিল্প আঙ্গিকে যেমন বহমান, তেমনি তার ঐতিহাসিক বিবর্তন ধারা আলোচনা ও গবেষণার দাবিদার।

বঙ্গ সংস্কৃতির প্রবহমানতায় যাত্রার গুরুত্ব নির্ণয়ের ক্ষেত্রে পণ্ডিত, ঐতিহাসিক বা বিশেষজ্ঞগণ যথাযথ গুরুত্ব দেননি। সাহিত্যের ইতিহাসকাররা একে সাহিত্যের অংশ হিসেবে দেখে এর গুরুত্ব বিবেচনা করে কখন উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা করেছেন বা কখন অশ্লীল, নিম্নরুচির বলে এড়িয়ে গেছেন। আবার অন্যদিকে সংস্কৃতির ঐতিহাসিকরাও এ নিয়ে বিক্ষিপ্ত আলোচনা করলেও প্রয়াত ঐতিহাসিক হিতেশ রঞ্জন স্যান্যাল মহাশয় তাঁর 'বাঙ্গালা কীর্তনের ইতিহাস' গ্রন্থে যেভাবে কীর্তনের মধ্যে হিন্দু বাঙালীর ধর্মীয় তথা সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ইতিহাস বিবৃত করেছেন, যা গ্রামীণ তথা সংস্কৃতির নানা ধারাকে পুষ্ট করেছিল, সেরূপ কোন প্রচেষ্টা দেখা যায়নি। যদিও এই 'যাত্রা' নিয়ে অনেকেই বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে বিক্ষিপ্ত চিন্তা করেছেন। ১৮৮২ খ্রীঃ নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের 'যাত্রা: বাংলার লোকনাট্য' শীর্ষক গবেষণাপত্র থেকে ১৯৯৫ খ্রীঃ প্রকাশিতব্য মধু গোস্বামীর 'যাত্রাকোষ'

গ্রন্থেও এ বিষয়ে যথার্থ 'ঐতিহাসিক-সমাজতাত্ত্বিক-নৃতাত্ত্বিক' দৃষ্টিকোণের অভাব লক্ষ্য করা যায়। ১৮৮২ খ্রীঃ 'যাত্রা: বাংলার লোকনাট্য' শীর্ষক গবেষণার জন্য শ্রী নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি.এইচ.ডি পান এবং ঐ সালেই লণ্ডন থেকে গবেষণাটি মুদ্রিত হয়।[১] পঞ্চাশ পৃষ্ঠার ইংরেজীতে লেখা এই পুস্তিকাটি কোন বাঙালীর 'যাত্রা' নিয়ে বিদেশে বসে গবেষণা এই প্রথম। বলা যায় তিনিই বাঙালীদের মধ্যে কোনও ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট্ ডিগ্রী লাভ করে এই ব্যাপারে প্রথম হলেন। নিশিকান্ত যেভাবে বাঙলা যাত্রা সম্বন্ধে গবেষণা করেছিলেন, তাঁর আগে সেভাবে আর কেউ গবেষণা করেননি। নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় ঢাকার বিক্রমপুরে জন্মগ্রহণ করেন। বিচিত্র তাঁর কর্মজীবন। গ্রাম থেকে কলকাতা, সেখান থেকে ইংল্যাণ্ড, পরে জার্মানী ও রুশ দেশ ঘুরে বহু অভিজ্ঞতা, বিদ্যা ও ভাষাজ্ঞান আহরণ করে ১৮৮৩ খ্রীঃ ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি ইংরেজী, ফরাসী ও জার্মান ভাষা অত্যন্ত পারদর্শিতার সঙ্গে আয়ত্ব করেছিলেন। নিশিকান্তের গবেষণা আকারে ক্ষুদ্র। কিন্তু আলোচনা বড় না হলেও যথেষ্ট অর্থবহ। তার তিনটি অংশ আছে। একটি অংশে তিনি ইউরোপে, ভারতে এবং বঙ্গে জনপ্রিয় নাটকের প্রাচীনতা বিচার করেছেন। দ্বিতীয় অংশে বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস সংক্ষিপ্তভাবে পর্যালোচিত হয়েছে। তৃতীয় অংশের বিষয়বস্তু কৃষ্ণকমল গোস্বামী বিরচিত কৃষ্ণযাত্রা।

নিশিকান্তের গবেষণা কিছুটা বিস্তৃত আলোচনার দাবি রাখে। হোরেস হেম্যান্ উইলসন ১৮২৭ খ্রীঃ তাঁর 'The -Theatre of the Hindius' নামক গ্রন্থের ভূমিকায় যাত্রার উল্লেখ করেন।[২] নিশিকান্তের অধ্যয়ন ছিল তুলনামূলক। বহু জার্মান পণ্ডিতের মতের ও মন্তব্যের বিচার তিনি করেছেন। তার কারণ ছিল এই যে, ইউরোপে নাটকের তুলনামূলক আলোচনায় জার্মান পণ্ডিতদের বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। জার্মান পাণ্ডিত্য অন্য একটি কারণে নিশিকান্তকে আকর্ষণ করে। তিনি মনে করতেন যে, ইউরোপে ও ভারতে প্রধানত 'ইন্দো-ইউরোপীয়' অথবা 'আর্য' নাটক প্রাচীনকালে ও আধুনিক যুগে বিকশিত হয়েছে। বাংলা 'যাত্রা'-কে তিনি ইন্দো-ইউরোপীয় 'আর্য' নাটক রূপেই দেখেছেন। মনে হয় নিশিকান্ত তাঁর কালে প্রচলিত 'আর্যামী' দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। 'আর্যামী'-র তত্ত্ব অনুসারে ইউরোপের মানুষ এবং ভারতের মানুষ ছিল সমানভাবে 'আর্য'। নিশিকান্তের মতে ভারতীয় আর্যরা ছিল প্রাচীনতর। আধুনিক গবেষণায় এই তত্ত্ব দাঁড়ায়নি।[৩] যাত্রা বিষয়ক আলোচনায় নিশিকান্ত একদিকে যেমন ইন্দো-ইউরোপীয় সাংস্কৃতিক একতার উপরে জোর দিয়েছিলেন, তেমনই জোর দিয়েছিলেন ভারতের 'আর্য জাতীয়তার উপরে। তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন যে, ইউরোপে প্রচলিত খ্রীষ্টান 'মিস্ট্রি' নাটকের সঙ্গে 'যাত্রা'-র অন্তত পাঁচটি ক্ষেত্রে সাদৃশ্য রয়েছে।

তাঁর মতে পেড্রোকালের.কোন [১৬০০–১৬৮১] এবং মিগুয়েল গেরভাণ্ডেজ [১৫৪৭–১৬১৬] প্রভৃতি লেখকদের আবির্ভাবের পূর্বে স্পেনিশ্ নাটকের সঙ্গে বাঙলা 'যাত্রা'-র সাদৃশ্য দেখা যায়। নিশিকান্তের মতানুসারে ১৭৫৪ খ্রীঃ বঙ্গে ব্রিটিশ অধিকার স্থাপিত হওয়ার পরে বাঙলা সাহিত্যের 'আধুনিক' যুগের সূত্রপাত হয়। তিনি ভেবেছিলেন যে সাহিত্যের অগ্রগতির কিংবা উন্নতির সঙ্গে সর্বদাই কোন ধর্মীয় সংস্কারের সংযোগ থাকে। ভারতীয় নাটকের ধর্মীয় অনুষঙ্গ নিশিকান্তের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। লোকনাটকের উপরে কৃষ্ণ-শিব-দুর্গা পূজার প্রভাব তিনি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন। পাণিনির কাল থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত এইরূপ ধর্মীয় প্রভাব দেখা যায। নিশিকান্তের এইরূপ চিন্তার সঙ্গে মিল দেখা যায আরও অনেকের।[৪] কৃষ্ণকমল গোস্বামীর নাট্যকলা সম্বন্ধে নিশিকান্তের আলোচনা সুবিস্তৃত। তিনিই ঢাকা-নিবাসী কৃষ্ণকমলের যাত্রাকে কলকাতার বিদগ্ধ পরিমণ্ডলে বিশিষ্ট স্থান দেন। চৈতন্যের ধর্মান্দোলনেরে প্রেক্ষিতে কৃষ্ণযাত্রার এইরূপ বিচার ছিল ইতিহাস সম্মত এবং সে কারণে অভিনব। কিন্তু নিশিকান্ত বাঙলার কৃষ্ণযাত্রার সুপ্রাচীন ঐতিহ্য সম্বন্ধে সঠিক তথ্য দিতে পারেননি। আধুনিক গবেষণা অন্য কথা বলে। এ প্রসঙ্গে আমরা অন্যত্র আলোচনা করব।

এছাড়া আর যাঁরা 'যাত্রা' বিষযে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যম অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৪–১৮৮৯) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি 'যাত্রা' সম্বন্ধে 'বঙ্গদর্শন' ও 'ভ্রমর' সাময়িকপত্রে তিন কিস্তিতে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। প্রথম কিস্তি 'যাত্রা' নাম নিয়ে 'বঙ্গদর্শন'-এর পৌষ, ১২৭৯ [১৮৭২ খ্রীঃ] সংখ্যায ছাপা হয। দ্বিতীয় কিস্তি ঐ একই নামে 'ভ্রমব' পত্রিকার ২খণ্ড ১সংখ্যা, বৈশাখ ১২৮২-র [১৮৭৫ খ্রীঃ] সংখ্যায় এবং তৃতীয় কিস্তি 'নৃত্য' শিরোনামে 'বঙ্গদর্শন'-এ আশ্বিন, ১২৮২ [১৮৭৫ খ্রীঃ] প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধগুলি এক করে ১৮৭৫ খ্রীঃ 'যাত্রা-সমালোচনা' নামে সঞ্জীবচন্দ্রের প্রথম গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এরপর 'যাত্রার ইতিবৃত্ত' নামে আর একটি লেখা ১২৮৯ [১৮৮২ খ্রীঃ] ফাল্গুন সংখ্যার 'বঙ্গদর্শনে' ছাপা হয়েছিল। এটি একটি পৃথক প্রবন্ধ—লেখা হয়েছিল নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের 'The Jatra or the Popular Dramas of Bengal' গ্রন্থের সমালোচনা হিসেবে। এই প্রবন্ধ কখনও গ্রন্থবদ্ধ হয়নি, 'বঙ্গদর্শন'-এর পুরনো সংখ্যাতে এটি প্রাপ্য। সম্ভবত সঞ্জীবচন্দ্রই প্রথম 'যাত্রা' বিষয়ে এমন তথ্য সমৃদ্ধ এবং সরস প্রবন্ধের রচয়িতা।

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর রচনায় কিছুটা সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছিলেন। যেমন তাঁর মতে— "*.....যে নাটক বা যাত্রা জনসমাজের প্রিয়, সে নাটক বা যাত্রার দ্বারা ঐ সমাজের রসজ্ঞতা অনুভব করা যাইতে পারে।*

যদি একথা সত্য হয়, তাহা হইলে আমাদের রসগ্রাহিণী শক্তি কতদূর পরিমার্জিত হইয়াছে তাহা এখনকার প্রচলিত যাত্রাদি দ্বারা অনুভব হইতে পারে।"[৫] আবার তিনিও যে তৎকালীন অন্যান্য অনেক লেখকের মত উচ্চবর্গীয় সংস্কৃতি চেতনা বা 'আর্যামী'-তত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন তারা প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন,— '.....পূর্বকালের কীর্তন কি যাত্রা এখনকার অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ ছিল। উহার প্রণেতাগণ কবি ছিলেন এবং শ্রোতৃগণ অপেক্ষাকৃত রসজ্ঞ ছিলেন। ক্রমে উভয়েরই এক্ষণে অধঃপতন হইয়াছে। অধিক কি, পূর্বে যাত্রার যে স্থলে দেবতা এবং দেবতুল্য ঋষি রাজা হইত, এক্ষণে সেই স্থলে মেথর-মেথরানী সাজিয়া শ্রোতাদিগের মনোরঞ্জন করা হয়।'[৬]

এছাড়া বিশ্বকোষ প্রণেতা নগেন্দ্রনাথ বসু,[৭] অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ,[৮] অমৃতলাল গুপ্ত,[৯] ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়,[১০] আশুতোষ ভট্টাচার্য[১১] প্রমুখ এবং সাম্প্রতিককালে অজিতকুমার ঘোষ, হংসনারায়ণ, অমলেন্দু ভট্টাচার্য্য, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য, ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে, বমাকান্ত চক্রবর্তী, মধু গোস্বামী, নন্দদুলাল বণিক, প্রভাতকুমার দাস, ক্ষেত্র গুপ্ত, কৃষ্ণপদ ভূঁইয়া, তরুণকুমার দে, বিনয় ঘোষ, বাঙলাদেশের কামাল লোহানী, নাজমুল আহসান ও সুশান্ত সরকার প্রমুখ যাত্রা নিয়ে আলোচনা করেছেন। এছাড়া অনেক বিদেশী গবেষকও এ বিষয়ে চর্চা করেছেন। কিন্তু কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে তাঁরা প্রায় প্রত্যেকেই কবে থেকে যাত্রার শুরু যাত্রার অধিকারী কারা এবং যাত্রার বিষযবস্তু জনিত বিভিন্ন সাহিত্যগত আলোচনায় ব্যস্ত থেকেছেন। কিন্তু যে বিষয়গুলি তাঁদের আলোচনায় আসে নি, তা হল যথার্থ ঐতিহাসিক-সমাজতাত্ত্বিক পরিপ্রেক্ষিত। যেমন বাঙালী জাতি তথা সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা, সাফল্য ও ব্যর্থতা; কী করে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সেই সংস্কৃতির প্রসার, সঙ্কোচন আর বিপর্যয় ঘটেছে; বাঙালী জাতি তথা সংস্কৃতির আত্মপ্রতিষ্ঠার এবং মার খাবার কাহিনী; শিল্পায়ন আর তথাকথিত নাগরিক আধুনিকতার প্রতিপক্ষে গ্রাম সমাজের সংঘশক্তি, লোকশক্তি আর দেশজ সংস্কৃতির জোরকে তুলে ধরার ইতিহাস, গ্রাম সমাজের মধ্যে পুনর্গঠনের উদ্যমের সূত্রকে খুঁজে বের করার ইতিহাস— প্রভৃতির চেষ্টা হয়নি। ঠিক এই কারণেই 'যাত্রা' বিষয়ক যথার্থ আলোচনা তাই অবশ্যম্ভাবী। কারণ এই 'যাত্রা'-র মাধ্যমেই জন্ম নিত সংঘশক্তি, মানুষের আত্মমর্যাদা আর আত্মপ্রতিষ্ঠাবোধ।

প্রথমে আসা যাক 'যাত্রা' কথাটির অর্থ প্রসঙ্গে। নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় তাঁর গ্রন্থে[১২] 'যাত্রা' কথাটির অর্থ ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে 'যাত্রা' কথাটির প্রথম অর্থ হল 'গমন করা' অর্থাৎ স্থান পরিত্যাগ। যেমন উষাযাত্রা অর্থাৎ উষাকালে নিজের বাড়ি থেকে রওয়ানা হওয়া, মহাযাত্রা অর্থাৎ মৃত্যু, তীর্থযাত্রা ইত্যাদি। 'যাত্রা'-র দ্বিতীয় অর্থ শোভাযাত্রা, যেমন—দোল, জন্মাষ্টমী, রাস—

যেগুলি বসন্ত, বর্ষা ও শরতে অনুষ্ঠিত হয় প্রতি বছর। তৃতীয় অর্থ জনপ্রিয় নাট্য অভিনয়কে বোঝায়। আমরা বঙ্গ সংস্কৃতির প্রবহমানতায়, ঐতিহাসিকতায়, ঐতিহ্যে 'যাত্রা' বলতে যা বুঝি তা উপরোক্ত তিনটি অর্থ নিয়েই বোঝায়। 'যাত্রা' হল ভারতবর্ষের বিশেষ করে বাঙালীর নিজস্ব 'নাট্য'; ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির আবির্ভাবের পূর্বে এই 'যাত্রা'-ই ছিল বঙ্গ সংস্কৃতির সবচেয়ে শক্তিশালী ধারা। সুতরাং 'যাত্রা'-র একটি সুসংবদ্ধ সংজ্ঞা নির্ধারণের প্রয়াস করা যেতে পারে—রাজাদের পৃষ্ঠপোষিত নাট্যশালায় সংস্কৃত নাটকের অভিনয়ের পাশে দূরবর্তী গ্রামাঞ্চলে সাধারণ লোকদের দ্বারা মুক্ত অঞ্চলে প্রাকৃত ভাষায় যে লোকাভিনয়ের ধারা প্রচলিত ছিল তাকেই যাত্রাভিনয় বলা যেতে পারে। কিন্তু এই যাত্রাভিনয়ের কোন ভাষাবদ্ধ নিদর্শন নেই বললেই চলে।

এরপর আসা যেতে পারে 'যাত্রা'-র উদ্ভব ও বিস্তার প্রসঙ্গে। এ বিষয়ে বিভিন্ন গবেষক ও পণ্ডিত বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। তাঁদের বক্তব্যগুলিকে সারসংক্ষেপ করলে এইরূপ দাঁড়ায়—পূর্বকালে দেবপূজা উপলক্ষ্যে দেববিগ্রহ নিয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাত্রা অর্থাৎ গমন করা হত। যেমন স্নানযাত্রা, রথযাত্রা, দোলযাত্রা ইত্যাদি। দেববিগ্রহের পেছনে পূজারী ও ভক্তবৃন্দ শোভাযাত্রা করে যেতেন। সেই শোভাযাত্রায় দেববন্দনা গানের সঙ্গে মানবিক সমাজ প্রসঙ্গ, রঙ তামাসা, অঙ্গভঙ্গি ইত্যাদি চলত। নৃত্যের ভঙ্গিতে বাহু সঞ্চালন, পদচারণা এবং মৌখিক অভিব্যক্তিও চলত। এমনিভাবে দেব শোভাযাত্রায় ভক্তিরসের সঙ্গে কৌতুকরস, দেবপ্রসঙ্গের সঙ্গে মানবপ্রসঙ্গ এবং গীতের সঙ্গে নৃত্যভঙ্গির সংযোগ ঘটেছিল। প্রাচীনকালে বিভিন্ন প্রকার দেবশোভার বিবরণ পাওয়া যায়। বৈদিক সমাজে যজ্ঞের শেষে স্নান-উৎসবের অনুষ্ঠান নিয়ে শোভাযাত্রা করবার প্রথা প্রচলিত হয়। বৌদ্ধযুগে রথযাত্রার আয়োজন করা হত। এছাড়া শিবযাত্রা, রথযাত্রা, কৃষ্ণযাত্রা, চণ্ডীযাত্রা প্রমুখের উল্লেখও পাওয়া যায। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পরে এই যাত্রা নবরূপ লাভ করে এবং বঙ্গ সংস্কৃতির প্রধান ধারা হিসাবে পরিগণিত হয়। তখন কালীয়দমন যাত্রার উদ্ভব হয়, যা রামমোহন রায়ের যুগ পর্যন্ত চলেছিল। তারপর ঔপনিবেশিক শক্তির আগমনেব পর তার রূপ বদল হতে থাকে, সে অন্য ইতিহাস।

বেশীর ভাগ পণ্ডিতের মতে 'যাত্রা'-র সূত্রপাত প্রাচীন বৈদিক যুগ থেকে। দেবপূজা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে চিরকাল যাত্রা অথবা অমন একটা অপরিহার্য অঙ্গ ছিল। এই যাত্রা হল দেববিগ্রহ এবং দেববিগ্রহের অনুসরণকারী শোভাযাত্রীদের একস্থান থেকে অপর স্থানে গমন। বৈদিক সমাজে যজ্ঞান্তে স্নান উৎসবের অনুষ্ঠান নিয়ে একটা শোভাযাত্রা ও উৎসবের আয়োজন করতেন। ক্রমে ক্রমে এই শোভাযাত্রা বিবিধ উৎসবের অঙ্গীভূত হয়ে যায়। কিন্তু বিশিষ্ট ঐতিহাসিক

নীহাররঞ্জন রায় এ প্রসঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁর মতে—"ধ্বজা বা কেতনপূজার মত নানাপ্রকারের যাত্রাও বাঙলার আদিবাসী কোমগুলির অন্যতম প্রধান উৎসব বলিয়া গণ্য করা হইত। রথযাত্রা, স্নানযাত্রা, দোলযাত্রা প্রভৃতি ধর্মোৎসব মূলত তাঁহাদেরই; পরে ক্রমশ ইহাদের আর্যীকরণ নিষ্পন্ন হইয়াছে। লৌকিক ধর্মোৎসবে এই ধরনের যাত্রা বা সচল নৃত্যগীতসহ সামজিক ধর্মানুষ্ঠানের বিবরণ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ও প্রাচীন বৌদ্ধ সংযুক্তনিকায়-গ্রন্থে জানা যায়। আর্য ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ উচ্চকোটির লোকেরা বোধহয় এই ধরনের সমাজোৎসব ও যাত্রা খুব পছন্দ করতেন না, সেই জন্যই সম্রাট অশোক সমাজোৎসবের বিরুদ্ধে অনুশাসন প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু কোনও রাজকীয় অনুশাসনই লোকায়ত ধর্মের এই লৌকিক প্রকাশকে চাপিয়া রাখিতে পারে নাই; জনসাধারণের ধর্মোৎসব ক্রমশ বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য সমাজে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল এবং তাহারই ফলে রথযাত্রা, স্নানযাত্রা, দোলযাত্রা প্রভৃতি ধর্মোৎসবের প্রচলন আজও অব্যাহত। প্রাচীন বাঙলাদেশে প্রচলিত স্নানযাত্রাগুলির মধ্যে অগস্ত্যর্ঘ্যযাত্রা (দশহরার স্নান), অষ্টমী স্নানযাত্রা, মাঘীসপ্তমী স্নানযাত্রা প্রভৃতির কথা কালবিবেক-গ্রন্থে জানা যায়।"[১৩]

বিনয় ঘোষও প্রায় অনুরূপ মত পোষণ করেছেন। তাঁর মতে—"যাত্রা করার অর্থ 'প্রসেশন', যেমন শোভাযাত্রা, শবযাত্রা ইত্যাদি। উৎসব পার্বনের সময় গ্রামের সমস্ত লোক, স্ত্রী-পুরুষ, ছেলে-মেয়ে মিলে নৃত্যগীত রঙ্গভঙ্গি করে গ্রামের মধ্যে এবং গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যে প্রদক্ষিণ করে তার নাম 'যাত্রা'। আজও সাঁওতাল, হো, মুণ্ডাদের মধ্যে এই ধরনের উৎসব-যাত্রা হতে দেখা যায়। সুতরাং যাত্রার ইতিহাস দু-এক শতাব্দীর ইতিহাস নয়, তার দিগন্তরেখা সুদূর প্রাগৈতিহাসিক যুগের আদিম লোকসংস্কৃতির ধারাকে পর্যন্ত স্পর্শ করেছে। তারপর এই যাত্রা থেকেই চণ্ডী-যাত্রা, ভাসান-যাত্রা, গম্ভীরা প্রভৃতির বিকাশ হয়েছে এবং ক্রমে রাম-যাত্রা, কৃষ্ণ-যাত্রা ইত্যাদির ভিতর দিয়ে বিদ্যাসুন্দর যাত্রার যুগ অতিক্রম করে আমরা থিয়েটারের যুগে পদার্পণ করেছি।"[১৪]

বিশ্বকোষও বলছে—'যাত্রা মূলত লোকসংস্কৃতির এক বিশেষ শাখা।'[১৫] সুতরাং এরূপ সিদ্ধান্তে আসতে আমাদের অসুবিধা নেই যে 'যাত্রা' লোকসংস্কৃতির অন্তর্গত এক বিশেষ ধরনের লোকনাট্য এবং তা বৈদিক যুগের পূর্বেই, আর্য আগমনের পূর্বেই আনার্যদের মধ্যে এর প্রচলন ছিল। বাঙালাদেশে সঙ্গীত ও নৃত্যাশ্রিত লোকনাট্যের উদ্ভব কীভাবে হল তা আলোচনা করা যেতে পারে। গ্রীক দেবতা ডায়োনিসাসের শোভাযাত্রার মত আমাদের দেশেও দেববিগ্রহ নিয়ে শোভাযাত্রা করা হত। শোভাযাত্রায় সঙ্গীত, নৃত্য ও কৌতুকজনক অঙ্গভঙ্গি দেখা যেত। কালক্রমে এই সব উপাদানের সঙ্গে কিছু কিছু কথা ও কাহিনী যুক্ত হল

এবং তখন লোকনাট্যের উদ্ভব হল। কিন্তু ডায়োনিসাসের শোভযাত্রা যেমন সিটি ডায়োনিসিয়াতেও যখন পৌঁছাত তখনই সেখানে নাটক শুরু হত; আমাদের দেশেও ধর্মীয় শোভাযাত্রা যখন নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছাত তখনই সেখানে লোকনাট্য অথবা যাত্রার আসরে অভিনয় শুরু হত। নাটকের জন্য নির্দিষ্ট লোক বেষ্টিত স্থান বা আসর দরকার, চলমান শোভাযাত্রার মধ্যে চরিত্রের কথা ও পর পর ঘটনা উপস্থাপন করা সম্ভব নয়। অভিনয়ের জন্য দরকার হল সঙ্গীত-নৃত্য-অভিনয় পটু শিল্পীর দল এবং তাদের দর্শকমণ্ডলী। একই জায়গায় দর্শকদের কাছে বারবার একই অভিনয় দেখান চলে না, সেজন্য নতুন নতুন জায়গায় কৌতুহলী দর্শকদের কাছে যাওয়া দরকার। সেজন্য নাট্যদল ছিল অবিরাম ভ্রাম্যমাণ। এই রকম নাটুযা বা নেটোর দল বহু প্রাচীনকাল থেকে বাঙলাদেশে চলে আসছে। নেটোর নাচ, গান ও কাচ অর্থাৎ সাজসজ্জা, মুখে মুখে রচিত পালা আশ্রয় করে গ্রাম্য জনগণেব সম্মুখে অনুষ্ঠিত হত। সম্ভবত তারা সজ্জার পেটিকা নিয়ে গ্রামে-গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়াত। তারই ইঙ্গিত পাওযা যায় ১০নং চর্যাপদে 'তোহোর অন্তরে কাড়ি নড় এড়্রা'—তোমার জন্য আমি নটপেটিকা ত্যাগ করলাম। নেটোর নাচ, গান ও কাচের আর এক প্রকারের ভ্রাম্যমাণ কৌতুক অভিনয়দলের কথা বলা যেতে পারে। তাদের বলা হয় 'সঙ'। বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের পোষাক পরে অঙ্গভঙ্গিসহ গান ও ছড়াকাটা প্রভৃতির দ্বারা ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের কৌতুকরসাত্মক অনুকৃতিতে সমাঙ্গ বা সঙ বলা হত। চড়ক, গাজন প্রভৃতি উৎসব উপলক্ষে নানা প্রকার সঙের মিছিল বার করা হত। তাতে ছোট ছোট কৌতুকনাটিকার অভিনয় চলত। বাঙলাদেশের বেশ কয়েকটি লোকসঙ্গীত ও লোকনৃত্যের মধ্যে যাত্রা বা লোকনাট্যের উপাদান দেখা যায়। যেমন—মনসার ভাসান, পাঁচালী গান, গাজন উৎসব উপলক্ষে মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের বোলান ও আলকাপ এবং কাকার কালীকাচ নৃত্যনাট্য, ছৌ-নাচ, গম্ভীরা উৎসব প্রভৃতি।

যখন সঙ্গীত প্রধান নয়, সহযোগী অঙ্গ হয়ে ওঠে, যখন নৃত্য সার্বিক প্রাধান্য না পেয়ে শুধু রমণীয় স্পর্শ ও সুকুমার ভাবব্যঞ্জনা সৃষ্টিতে সাহায্য করে এবং সংলাপও অবিচ্ছিন্ন কাহিনীর মধ্য দিয়ে একটি গতিশীল নাট্যক্রিয়া দর্শকদের কৌতুহলী ও উৎসাহিত করে রাখে তখনই জন্ম হয় লোকনাট্যের। 'যাত্রা' এইরূপ একটি লোকনাট্য। আমাদের দেশে এই লোকনাট্যের ধারা প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে চলে এসেছে। প্রাচীন যুগে সঙ্গীত ও নৃত্যের সঙ্গে ভাবপ্রকাশক অঙ্গভঙ্গি ও অনুকরণমূলক অভিনয় প্রচলিত ছিল। নৃত্য, সঙ্গীত, অঙ্গসঞ্চালন এবং পরে সংলাপ ও কাহিনী যুক্ত হওয়ার পরে নাটকের সৃষ্টি হয়েছিল। আমাদের দেশে সুগঠিত নাটকের পাশে মুখে মুখে প্রাকৃত ভাষায় রচিত লোকনাট্যের অভিনয় ধারা প্রচলিত ছিল। দশম শতাব্দী পর্যন্ত প্রবহমান

সংস্কৃত নাটকের ধারার পাশে এই গীতনৃত্যময় লোকনাট্য তথা যাত্রা গ্রামীণ জনসাধারণকে আনন্দ ও শিক্ষা দিয়ে এসেছে। এই নৃত্যগীতময় লোকনাট্যগুলি ভরতের পরবর্তী নাট্যশাস্ত্রবিদগণ উপরূপক বলে নির্দেশ করেছেন। বাঙলাদেশে এই নৃত্যগীতময় নাটককে নাটগীতি বা গীতিনাট বলা হত। জয়দেবের গীতগোবিন্দ এই গীতিনাট শ্রেণীর রচনা। সংস্কৃতে রচিত হলেও বাংলাদেশে প্রচলিত লৌকিক ভাষায় রচিত গীতিনাট্যের রূপই যে এর মধ্যে পরিস্ফুট সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই গীতিনাটের পূর্ণতর নাট্যরূপ দেখা যায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে। শ্রীচৈতন্যদেব চন্দ্রশেখরের গৃহে যে যাত্রাভিনয় করেছিলেন তারা পালা রচনা করেছিলেন স্বয়ং চন্দ্রশেখর। তিনিই যাত্রাপালার সর্বপ্রথম রচয়িতা। শ্রীচৈতন্যদেবের পরবর্তী কালীয়দমন বা কৃষ্ণযাত্রার মধ্য দিয়ে লোকনাট্যের ধারা প্রবহমান ছিল। তারপর যাত্রার ধারাকে লোকনাট্যের অন্তর্ভূক্ত করা চলে না। এই যাত্রা তথা লোকানাট্যের কতগুলি লক্ষণ নির্দেশ করা যেতে পারে। যথা: (১) গ্রামীণ লোকসমাজের মধ্যে উদ্ভুত, গ্রামীণ শিল্পীদের দ্বারা অভিনীত এবং গ্রামীণ জনগণের সম্মুখে উপস্থাপিত নাটকই লোকনাট্য। (২) লোকনাট্য সঙ্গীত সম্বলিত নৃত্য থেকে উদ্ভুত হয়। সেজন্য গীত ও নৃত্য এই নাটকের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ। (৩) লোকনাট্য আঞ্চলিক ভাষাশ্রয়ী আঞ্চলিক পটভূমি ও ঐতিহ্য এর মধ্যে থাকে। (৪) বিষয়বস্তু প্রধানত ধর্মমূলক ও গীতিমূলক। মানুষের বিশ্বাস, ত্যাগ ও ভক্তি জাগিয়ে তোলাই এর উদ্দেশ্য। (৫) লোকনাট্য চারিদিকে দর্শক পরিবেষ্টিত খোলা আসরে অভিনীত হয়। এখানে অভিনেতা, বাদ্যযন্ত্রী, অভিনয়ে সহায়ক কর্মী ও দর্শকমণ্ডলী সকলেই অভিনয়ে অংশগ্রহণ করে। অতিশায়িত অঙ্গ সঞ্চালন, কণ্ঠস্বরের উচ্চতা এবং আবেগপ্রকাশের প্রবলতা এখানে অপরিহার্য। (৬) মৌখিক ঐতিহ্যবাহী লোকসংস্কৃতির ধারার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে লোকনাট্য মুখে মুখে রচিত হয় এবং স্মৃতিবাহিত পরম্পরের ধারা এতে রক্ষিত হয়।

নগরায়নের সঙ্গে সঙ্গে লোকসংস্কৃতি ও নাগরিক সংস্কৃতি এই দুই ধারায় যেমন সংস্কৃতি বিভক্ত হল, তেমনি নাটক ও লোকনাট্য ও সুগঠিত শিল্পসম্মত মঞ্চে অভিনয়যোগ্য নাগরিক নাটকে বিভক্ত হল। সে অন্য এক ইতিহাস। কিন্তু রঙ্গালয় নির্মাণের আগে যে মুক্ত স্থানে প্রথম লোকধর্মী নাটকের অভিনয় হয়েছিল তার বর্ণনা নাট্যশাস্ত্রে রয়েছে। সম্ভবত সেই লোকধর্মী অভিনয় প্রাকৃত ভাষা আশ্রয় করে লোকপরম্পরায় স্মৃতিবাহিত ধারায় চলে এসেছে এবং বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার উদ্ভবের পরে সেই ভাষার মাধ্যমে লোকনাট্য বা যাত্রারূপে লোকরঞ্জন করে এসেছে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এই লোকনাট্য বিভিন্ন নামে অভিহিত হয়; যেমন, রাজস্থানে রাসধারী, উত্তর প্রদেশে নৌটঙ্কী, বিহারে

বিদেসিয়া, মহারাষ্ট্রে তামাসা ইত্যাদি। উড়িষ্যায় ও বাংলায় এই লোকনাট্যের নাম হল যাত্রা।

গবেষক নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় ভারতীয় নাটকের উৎস ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তাও প্রাণিধানযোগ্য। তাঁর মতে "যে কোন নাটকের মতই, ভারতীয় নাটকের উৎসও নিহিত আছে দেশের ধর্মধারার মধ্যে এবং তাও আবার তিনটি নির্দিষ্ট পর্যাযভুক্ত; প্রথমটি গ্রন্থিক বা কথকতা, দ্বিতীয়টি যাত্রা এবং তৃতীয়টি নাটক বা যথার্থ-নাট্য। ......প্রথম স্তরটিতে কথকতা ছাড়াও আধুনিককালের পরিহাস ও প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক গান যেমন, হুলি, পাঁচালি, কবি, টপ্পা ইত্যাদি ও অন্তর্ভুক্ত করা যায়— যাদের সঙ্গে প্রাচীন গ্রীক অথবা ফারসী ফার্সের তুলনা করা যেতে পারে। .....দ্বিতীয়টিতে অন্তর্ভুক্ত করা যায় গ্রীক এলুসিনীয় মিষ্ট্রি ও খ্রীষ্টানদের মধ্যযুগীয় মিষ্ট্রিকে; আর তৃতীয় বর্গের অন্তর্ভুক্ত প্রাচীন বা আধুনিক নাটক।"[১৬]

আমাদেরে যাত্রার পালাকার, অভিনেতা, বাদ্যযন্ত্রী কোন শ্রেণীর মানুষ ছিলেন যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখব যে অভিনেতা, বাদ্যযন্ত্রীদের মধ্যে অনেকেই অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষ ছিলেন। যথা কৃষক, ডোম, বাগদী, ধোপা, নাপিত, চর্মকার, কিন্তু আসরে তারাই দেবদেবী কিংবা রাজারাণী— সকলেব প্রশংসা ও ঈর্ষার পাত্র। কালক্রমে স্বল্পশিক্ষিত ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, ব্যবসায়ী, দোকানদার ইত্যাদি শ্রেণীর মানুষও যাত্রা দলের সঙ্গে যুক্ত হল। কিন্তু এই নিম্নবর্গের মানুষদের বঙ্গ সংস্কৃতির প্রধানতম ধারায় যুক্ত থাকাকে অনেকে ব্যঙ্গের চোখে দেখেছেন। সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন—"আমাদের যাত্রাকারেরা ইতর লোক। যাত্রাওয়ালা না হইলে তাহারা হয়ত ভূমিকর্ষণ করিত বা নৌকা চালাইত কিংবা ভারবহন করিত, তাহাদের নিকট উৎকৃষ্ট কিছুরই প্রত্যাশা করা যায় না।"[১৭] এইরকম চিন্তার কারণ তৎকালীন 'আর্যতন্ত্রের' প্রভাবের ফল বলেই আমাদের মনে হয়।

যাত্রার আধিকারী অর্থাৎ পালাকারদের ইতিহাস আলোচনা করতে গেলে আমরা দেখব—যে চন্দ্রশেখরের গৃহে চৈতন্যদেব অভিনয় করেছিলেন তিনিই সর্বপ্রথম যাত্রার পালা রচনা করেছিলেন, এরপর ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদের সময়ে শিশুরাম অধিকারী কৃষ্ণযাত্রার ধারা প্রবর্তন করেন, তার নাম ছিল কালীয়দমন যাত্রা। শিশুরামের শিষ্য ছিলেন পরমানন্দ অধিকারী। পরমানন্দের পরে শ্রীদাম-সুবল, বদন ও লোচন অধিকারী কালীয়দমন পালা রচনা করেন। তবে সবচেয়ে জনপ্রিয় যাত্রাওয়ালা ছিলেন গোবিন্দ অধিকারী। গোবিন্দর পরে কালীয়দমনের শেষ উল্লেখযোগ্য অধিকারী হলেন নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়। গোবিন্দ অধিকারীর সমসাময়িক যাত্রাওয়ালা কৃষ্ণকমল গোস্বামী তাঁর 'রাই-উন্মাদিনী', 'বিচিত্রবিলাস', 'স্বপ্নবিলাস'

এবং 'নিমাইসন্ন্যাস' প্রভৃতি ভক্তিরসাত্মক যাত্রাপালা দ্বারা সমগ্র পূর্ববঙ্গ মাতিয়ে তুলেছিলেন। মধুসূদন কালের ঢপ্ কীর্তন তৎকালীন জনগণের মধ্যে বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। কৃষ্ণযাত্রা তখন অধিক প্রচলিত হলেও রামযাত্রা, চণ্ডীযাত্রা, মনসার ভাসানযাত্রা প্রভৃতিও কিছু কিছু প্রচলিত ছিল, বাঁকুড়ার অন্তর্গত রামজীবনপুরবাসী আনন্দ ও জয়চন্দ্র অধিকারীর রামযাত্রা, ফরাসডাঙ্গার গুরুপ্রসাদ বল্লভের চণ্ডীযাত্রা এবং লাউসেন বড়ালের মনসার ভাসান এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে সখের যাত্রা দলের উদ্ভব হল। এই সখের যাত্রা প্রধানত কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলেই বেশী জনপ্রিয় হয়েছিল। কলকাতায় আমোদপ্রিয় বাবুদের দ্বারাই এ যাত্রা প্রধানত পৃষ্ঠপোষিত হত। এই সময়ের আগে পরে যাঁরা পালাকার বা অধিকারী বা অভিনেতা হিসেবে খ্যাতিলাভ করেছিলেন তাঁরা হলেন— গোপালচন্দ্র দাস, কাশীনাথ ওরফে কেশে চাগাধোপা, পানিহাটি নিবাসী মোহন মুখোপাধ্যায়, বিদ্যাসুন্দর যাত্রার জন্য বিখ্যাত গোপাল উড়ে, মতিলাল রায়, ঠাকুরদাস দত্ত, নীলকমল সিংহ, নারায়ণ দাস, দুর্গাচরণ ঘড়িয়াল, লোকনাথ দাস, কালীনাথ হালদার, মদন মাস্টার, নবীন মাস্টার, রামচাঁদ মুখোপাধ্যায়, নবীন গুঁই, ব্রজমোহন রায়; আশুতোষ চক্রবর্তী, শ্রীঝড়ুদাস অধিকারী, বেণীমাধব পাত্র, গোপীনাথ দাস, রসিকলাল চক্রবর্তী, চয়ে পাগলা, তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় এবং আরও অনেকে।

আমাদের এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার পরিশেষে বলতে পারি যে সাম্প্রতিক ইতিহাসচর্চায় যখন নিম্নবর্গীয় সংস্কৃতি ও উত্তর-আধুনিক চিন্তা আর উপরে সবিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে তখন আমাদের সুপ্রাচীনকালের লোকজ ও মৌলিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য 'যাত্রা' সম্পর্কে গভীর অনুধ্যান ও গবেষণা অত্যন্ত প্রয়োজন। আমাদের এই রচনা তারই এক ক্ষুদ্র প্রয়াসমাত্র। আমরা এই আলোচনায় উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর প্রসঙ্গ আনিনি। আমাদের উদ্দেশ্য যাত্রার ধারাবাহিক ইতিহাস আলোচনা নয়। বঙ্গ সংস্কৃতির প্রবহমানতায় আমাদের শিকড়, আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, আমাদের লোকনাট্য 'যাত্রা'-র গুরুত্ব নিরূপণ করা।

গ্রামবাংলার সাংস্কৃতিক জীবন এবং গ্রামবাসীদের মানসিকতা যাত্রার মধ্যে প্রতিফলিত হত। গ্রামবাসীদের ধর্ম বিশ্বাস, দৈব বিধানের প্রতি আনুগত্য, আধ্যাত্মিক মুক্তির জন্য লোভ তাদের 'যাত্রা'-র মধ্যে প্রতিফলিত হত। তারা যাত্রার মধ্যে তাদের আশা ও আদর্শের পূর্ণতাই লক্ষ্য করত। 'যাত্রা'-র অযাত্রিক গতি শুরু হল কলকাতায় প্রবেশের পর থেকে। কলকাতায় আসার পর সে ধন পেল বটে, কিন্তু মান হারাল। উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে ইংরেজী শিক্ষা, পাশ্চাত্য দর্শন চিন্তা, বাস্তববাদ, আধুনিক সমাজ-ভাবনা ও কাল-প্রভাব জনিত ইতিহাসবোধ দ্রুত সংক্রমণের ফলে, বাঙালির চৈতন্যের পরিবর্তন দ্রুত হত

শুরু করে। আধুনিকতার অভিঘাতে গ্রামীণ সমাজ ওলট-পালট হয়ে যায়, গড়ে ওঠে নব্য নাগরিক বাবুসম্প্রদায়। প্রচলিত এই ঐতিহ্যগত সাংস্কৃতিক ধারা নব্য শিক্ষিত বাবু সমাজের মনোরঞ্জনে সমর্থ হল না। বিংশ শতকে 'যাত্রা' শিল্পরীতি হিসেবে বিকাশের ক্ষেত্রে আধুনিক জীবন চেতনাকে আত্মীকরণ করেছে। আধ্যাত্মিকতার স্থানে ধর্মবোধ নিরপেক্ষ আনন্দ কৌতুক ও লোকশিক্ষার বিষয় যাত্রায় ঠাঁই করে নিয়েছে। ফলে সাধারণ লোকজীবনে যাত্রা বিনোদন হিসেবে যেমন ভূমিকা রেখেছে, আধুনিক মননশীলতা ও নাট্যধারার ক্রমবিকাশের যে যুগপ্রভাব তা থেকেও যাত্রা মুক্ত থাকেনি। ফলে সংস্কৃতির সহজাত বিবর্তনে, খুব সহজে যাত্রায় চলে এসেছে ইতিহাস সচেতনতা এবং দেশাত্মবোধ, বিশেষ করে ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনের সময় স্বদেশী আন্দোলনের গতিকে বেগবান করতে যাত্রা একটি বিরাট ভূমিকা পালন করেছিল।

এইভাবে দীর্ঘকাল বিচিত্র প্রতিকূলতা, চড়াই-উৎরাই পার হয়ে যাত্রাকে পথ চলতে হয়েছে। কালের বিবর্তনে পাশ্চাত্য নাট্যকলার প্রভাবে আত্মরক্ষার কারণে, গ্রহণ-বর্জনের ভেতর দিয়ে যাত্রা তার ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুত হয়নি। সমকালীন আধুনিকতাকে কালপ্রভাবে যতটুকু প্রয়োজন সেটুকু অন্তর্জগতে বহিরঙ্গে আত্মীকৃত করে, যাত্রা তার স্বতন্ত্র ঐতিহ্যকে বিলুপ্ত. করেনি, বরং লালন করে চলেছে। কালচক্রের বিপাকে যাত্রার দুর্নাম হলেও মহাকালের যাত্রাপথে ঐতিহ্যকে ধারণ করে যাত্রা এগিয়ে যাবে, এ প্রত্যাশা বোধ করি অমূলক নয়, কারণ জনমাধ্যম ও জন-জাগরণের ক্ষেত্রে-এর চেয়ে বলিষ্ঠতর কোন শিল্প নেই। তাই আনন্দের ও লোকশিক্ষার মাধ্যম রূপে একে গড়ে তোলা দরকার।

সূত্র নির্দেশ

১. নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় (১৮৫২—১৯১০) ১৮৮২ খ্রীঃ 'যাত্রা: বাংলার লোকনাট্য' শীর্ষক **[The Jatras or Popular Dramas of Bengal]** গবেষণার জন্য জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি.এইচ.ডি পান। নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর গবেষণাকর্ম সম্পর্কে বিশদ জানতে হলে দ্রষ্টব্য: **Nisikanta Chattopadhyay, The Yatras or the Popular Drams of Bengal, 'Introduction', Ramakanta Charaborty [Calcutta, Riddhi, 1976]**

২. হোরেস হেম্যান উইলসন্: **The Theatre of the Hindius, Calcutta, London; in 3 vols., Calcutta 1827; in two vols., Londaon 1985. ভূমিকা: Vol I Preface, xv.**

৩. গর্ডন চাইল্ড: 'দ্য এরিয়ানস্', লন্ডন, ১৯২৮; অধ্যাপক ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের, 'ইতিহাসের আলোকে আর্যসমস্যা', কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ১৯৯৫ ।

৪. A.B. Keith, **The Sanskrit Drama in its origin, Development, Theory and Practice**, Oxford, 1924
Sten Konow, **Das Indische Drama**, Berlin, 1890
A.A. Mcdonnel, **History of Sanskrit Literature**, London, 1900
Moris Binternivs, **Geschichte der Indischer Literature**, 3 Vols.
Leppziq, 1905 1922; এর ইংরেজী অনুবাদ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯২৭, ১৯৩৩, ১৯৫৯
S.N. Dasgupta, ed. **A History of Sanskrit Literature**, Classical Period, Vol. I, University of Calcutta, 1962.

৫. সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'যাত্রা', প্রথম কিস্তি, বঙ্গদর্শন, পৌষ, ১২৭৯, পৃ. ৪০৯–৪১৫।

৬. ঐ

৭. নগেন্দ্রনাথ বসু (১৮৬৬–১৯৩৮) দীর্ঘ সাতাশ বছর অক্লান্ত পরিশ্রমে ২২ খণ্ডে 'বিশ্বকোষ' প্রকাশ করেন (১৯১১)। এই গ্রন্থের ১৫শ খণ্ডে 'যাত্রা' বিষয়ক আলোচনা আছে।

৮. অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ (১৮৭৭-১৯০৪) স্বনামখ্যাত পণ্ডিত এবং এন্‌সাইক্লোপিডিক জ্ঞানেব অধিকারী ছিলেন। তাঁর পাণ্ডিত্যেব গভীরতা ও পরিধি ছিল বিস্ময়কর। তাঁর 'যাত্রা' বিষয়ক প্রবন্ধ ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ন সংখ্যার 'প্রবাসী'-তে প্রকাশিত হয়েছিল।

৯. অমৃতলাল গুপ্ত সম্বন্ধে বিশেষ তথ্য সংগ্রহ পাওয়া যায় না। তবে তিনি ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন এবং 'প্রবাসী' পত্রিকায় 'সেকালের ও একালের যাত্রা' শিরোনামে ১০ ও ১১ সংখ্যায় (মাঘ-ফাল্গুন, ১৩০৯) এটি প্রকাশিত হয়।

১০. ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় সম্বন্ধেও বিশেষ তথ্য জানা যায় না। তাঁর 'যাত্রা' শিরোনামে প্রবন্ধ রঙ্গালয় সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা 'নাট-মন্দির'-এর ২বর্ষ ৫ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ, ১৩১৮-তে প্রকাশিত হয়।

১১. আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্বন্ধে বিস্তৃত পরিচয়ের প্রয়োজন নেই। তিনি ১৯৬৪ খ্রীঃ লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগে আমন্ত্রিত হয়ে বঙ্গ সংস্কৃতি ও সাহিত্য বিষয়ে কয়েকটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সেগুলি পরে তাঁর 'সোভিয়েত বঙ্গ সংস্কৃতি' (১৩৭১) গ্রন্থে সংবদ্ধ হয়। এখানেই 'যাত্রা' বিষয়ক তাঁর রচনা সন্নিবেশিত আছে।

১২. নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় (১৮৫২-১৯১০), **'The Yatras or the Popular Dramas of Bengal**, 'Introduction' রমাকান্ত চক্রবর্তী, কলকাতা, ঋদ্ধি, ১৯৭৬।

১৩. নীহাররঞ্জন রায়: 'বাঙালীর ইতিহাস', আদিপর্ব; দে'জ পাবলিশিং, প্রথম দে'জ সংস্করণ, বৈশাখ ১৪০০, পৃ. ৪৮৩। স্থূল অক্ষর আমার।

১৪. বিনয় ঘোষ: 'কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত', প্রথম খণ্ড: বাক্ সাহিত্য, দ্বিতীয় সংস্করণ, এপ্রিল, ১৯৮১, পৃ. ৪১৮। স্থূল অক্ষর আমার।

১৫. বিশ্বকোষ, বিংশ খণ্ড; বিশ্বকোষ পরিষদ, প্রথম প্রকাশ ১ জুন ১৯৮৭, পৃ. ৩৩।

১৬. সূত্র, ১২ দ্রষ্টব্য।

১৭. সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'নৃত্য', বঙ্গদর্শন, আশ্বিন, ১২৮২, পৃ. ২৭৯–২৮২।

পাশ্চাত্য অভিঘাত, ঔপনিবেশিকতা ও বাঙালীর বিজ্ঞান ভাবনার কয়েকটি মুহূর্ত

শান্তনু চক্রবর্তী

বাঙালী মনে পশ্চিমের Positivist (প্রত্যক্ষবাদী বা দৃষ্টবাদী) ভাবধারার প্রভাব আজও কোন পূর্ণাঙ্গ আলোচনার বিষয় হল না। ফোরব্‌সের Positivism in Bengal[১] একটি ব্যতিক্রমী ধারার সূত্রপাত হতে গিয়েও হয়নি, কারণ ফোরব্‌স 'প্রত্যক্ষবাদ'কে সংকীর্ণ অর্থে— কোঁৎ-দর্শন অর্থে— গ্রহণ করে একটি আকর্ষণীয় সম্ভাবনাকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করেছেন। এ কথা বলছি কারণ:

১. Positive Philosophy শব্দটি অগস্ত্ কোঁৎ-ই সর্বপ্রথম ব্যবহার করলেও আধুনিক দার্শনিক সাহিত্যে[২] Positivism (প্রত্যক্ষবাদ) ব্যাপকতর অর্থে— সাধারণভাবে অভিজ্ঞতাবাদী (Empiricist), সংজ্ঞাবাদী (Nominalist), দৃষ্টবাদী (Phenomenalist) ইত্যাদি প্রবণতা সম্বলিত একটি দার্শনিক মত অর্থে— ব্যবহৃত, যে অর্থে এই দার্শনিক ধারাটি কোঁৎ-দর্শনের চেয়ে ঢের বেশি প্রাচীন, তাৎপর্যবহ ও প্রভাবশালী। এবং এই ব্যাপকতর অর্থে 'প্রত্যক্ষবাদী' দর্শনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মূলগত ঐক্যে।[৩]

২. এবং ঔপনিবেশিক যুগের ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালী মনের ওপর কোঁৎ-দর্শনের প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ নিশ্চয়, কিন্তু ব্যাপকতর অর্থে যে প্রত্যক্ষবাদী দর্শন যার প্রতিনিধি হিসেবে বাঙালী চিনেছে বেকন, হিউম, জেম্‌স্ মিল্, জন্ স্টুয়ার্ট মিল্, বেইন্ (Bain), স্পেন্সর ও হক্‌স্‌লিকে— তার প্রভাবের সঙ্গে কোঁৎ-দর্শনের প্রভাবের কোন তুলনাই চলে না। পশ্চিমের প্রভুত্বদায়ী মতাদর্শের মূল ভিত্তি হিসেবে পশ্চিমের এই প্রত্যক্ষবাদী-বিজ্ঞাননিষ্ঠ প্রতিমূর্তির ভূমিকা অপরিসীম। আর যে থীম্-টি এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে ইউরোপের এই প্রতিমূর্তিকে বিশেষ তাৎপর্যবহ করে তুলেছে তা হল ভারতীয় ট্র্যাডিশনের ধাতুগত অবৈজ্ঞানিকতার থীম্।

চিন্তার এই ঝোঁকের সর্বপ্রথম দলিল অবশ্যই রামমোহনের লর্ড আমহার্স্টকে ১৮২৩ সালের লেখা চিঠি। চিঠিটি সহজলভ্য ও বহুল উদ্ধৃত তাই এখানে কোন উদ্ধৃতি দেওয়া হল না। চিঠির মূল থীম্‌গুলি নিম্নরূপ:

ক. বিজ্ঞানচর্চার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত থেকে যে পদ্ধতি-সচেতন বৈজ্ঞানিক-অভিজ্ঞতাবাদী ধারা ইউরোপে বিকশিত হয়েছিল তাকেই কাম্য

জ্ঞানতাত্ত্বিক মার্গ হিসেবে চিহ্নিত করা। কিন্তু চিঠিতে রামমোহনের প্রত্যক্ষবাদী / অভিজ্ঞতাবাদী পদ্ধতিচেতনা স্পষ্ট— বেকনের উল্লেখ তিনবার, ও রয়েছে বেকনীয় দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতি জোরদার সমর্থন।

খ. বেকনীয় মতাদর্শালোকিত জ্ঞান তথা বিজ্ঞানচর্চাকে ইউরোপীয় 'নেশন'গুলির 'উন্নতি'র কারণ হিসেবে দেখা।

গ. দেশজ জ্ঞানতাত্ত্বিক পরম্পরাকে প্রত্যক্ষধর্মিতা ও জাগতিক কাণ্ডজ্ঞানের বিরোধী ধারা হিসেবে নির্দিষ্ট করা ও তাকে স্পষ্ট ভাষায় প্রত্যাখ্যান করা।

ঘ. ভারতবর্ষের ঐতিহ্যগত ও জ্ঞানতাত্ত্বিক এই দুর্বলতার স্বীকৃতির অবস্থান থেকে ইউরোপের কাছে শিক্ষানবিশীর প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরা।

ঙ. উপরোক্ত অবস্থানগুলির ফলশ্রুতি হিসেবে ঔপনিবেশিক শাসনকে বাঞ্ছিত ও আবশ্যক হিসেবে দেখা।

চ. বিজ্ঞানশিক্ষার প্রয়োজনীয় উপাদান হিসেবে শুধু বিদেশী বিজ্ঞান শিক্ষক ও বিজ্ঞানপুস্তক নয়, বিদ্যালয়ে সমস্ত রকম প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের ব্যবস্থার ধারণা। রামমোহন স্বাভাবিকভাবেই তুলে ধরেছেন পরীক্ষাগার ভিত্তিক বিজ্ঞানশিক্ষার আদর্শ।

উল্লিখিতের মধ্যে ঙ এবং চ পয়েন্ট বিশেষভাবে প্রণিধানের দাবি রাখে। বিজ্ঞানের আলোকবর্তিকার বাহন হিসেবে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থাকে দেখা হল এবং বিজ্ঞানশিক্ষার অন্যতম পূর্বশর্ত হিসেবে তুলে ধরা হল পরীক্ষাগারভিত্তিক শিক্ষাব আদর্শ। কিন্তু ভবিষ্যতে ম্যাকলে অনুপ্রাণিত যে পশ্চিমী শিক্ষা ভারতীয়দের ভাগ্যে জুটল তাতে গণিতবিদ্যার প্রাচুর্য থাকলেও পরীক্ষাগারভিত্তিক বিজ্ঞানশিক্ষার সুবিধা বিশেষ ছিল না।

আমহার্স্টকে রামমোহনের চিঠি ১৮২৩ সালে। এর পরবর্তী যুগে— উনিশ শতকের ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালীর চিন্তার মূলস্রোতে— রামমোহনের চিঠির থীম্‌গুলি আমরা ফিরে ফিরে পাই।

১২৮০-র কার্তিকে প্রকাশিত হয় বঙ্কিমচন্দ্রের 'জৈবনিক' রচনাটি। এর প্রথম অংশে বঙ্কিম প্রাচীন ভারতীয় দর্শন ভাবনার সঙ্গে আধুনিক ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিকতার তুলনামূলক আলোচনা করেন, "(ভারতীয়) দার্শনিকেরা, কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া বলেন, ক হইতে খ হইয়াছে, গ-র মধ্যে ঘ আছে ইত্যাদি। তাঁহারা কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। যদি কখন প্রমাণ নির্দেশ করেন না; কোন প্রমাণের অনুসন্ধান করিয়াছেন, এমত কথা বলেন না, সন্ধান করিলেও কোন প্রমাণ নির্দেশ করেন, সে প্রমাণও আনুমানিক বা কাল্পনিক, তাহার আবার প্রমাণের প্রয়োজন, তাহাও পাওয়া যায় না। অতএব

আজন্ম মূর্খ হইয়া থাকিত হয়, সেও ভাল, তথাপি দর্শন মানিব না। এদিকে বিজ্ঞান আমাদিগকে বলিতেছেন, 'আমি তোমাকে সহসা বিশ্বাস করিতে বলি না, যে সহসা বিশ্বাস করে, আমি তাহার প্রতি অনুগ্রহ করি না; সে যেন আমার কাছে আইসে না। আমি যাহা তোমার কাছে প্রমাণের দ্বারা প্রতিপন্ন করিব, তুমি তাহাই বিশ্বাস করিও, তাহার তিলার্দ্ধ অধিক বিশ্বাস করিলে তুমি আমার ত্যাজ্য। আমি যে প্রমাণ দিব, তাহা প্রত্যক্ষ। একজনে সকল কান্ড প্রত্যক্ষ করিতে পারে না, এজন্য কতকগুলি তোমাকে অন্যের প্রত্যক্ষের কথা শুনিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে। কিন্তু যেটিতে তোমার সন্দেহ হইবে সেইটি তুমি স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিও। সর্ব্বদা আমার প্রতি সন্দেহ করিও। দর্শনের প্রতি সন্দেহ করিলেই, সে ভস্ম হইয়া যায়, কিন্তু সন্দেহেই আমার পুষ্টি। আমি জীব-শরীর সম্বন্ধে যাহা বলিতেছি, আমার সঙ্গে শবচ্ছেদ গৃহে, ও রাসায়নিক পরীক্ষাশালায় আইস। সকলই প্রত্যক্ষ দেখাইব।"...[৪]

এই উদ্ধৃতিটিতে টি এইচ হক্স্লির প্রত্যক্ষবাদী বিজ্ঞান ভাবনার মেজাজ, এবং শুধু মেজাজ কেন, প্রতিধ্বনি, আমরা পাই।[৫]

১২৮১-র ফাল্গুনে প্রকাশিত 'জ্ঞান সম্পর্কে দার্শনিক মত' প্রবন্ধে বঙ্কিম কান্টীয় 'আ প্রয়োগই' (প্রাক-অভিজ্ঞতা, বা সহজ) জ্ঞানের স্পেন্সরীয় প্রত্যক্ষবাদী বিচার / ব্যাখা উপস্থিত করলেন।

"শেষ মত, হর্বর্ট স্পেন্সরের। তিনিও প্রত্যক্ষবাদী, কিন্তু তিনি বলেন যে, প্রত্যক্ষমূলক জ্ঞান সকলটুকু আমাদিগের নিজ প্রত্যক্ষজাত নহে। প্রত্যক্ষজাত সংস্কার পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমার পূর্ব্বপুরুষদিগের যে প্রত্যক্ষজাত সংস্কার, আমি তাহা কিয়দংশে প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি যে সে সকল সংস্কার লইয়া জন্মিয়াছি এমত নহে— তাহা হইলে সদ্যপ্রসূত শিশুও সংস্কার বিশিষ্ট হইত, কিন্তু তাহার বীজ আমার শরীরে (মন, শরীরের অন্তর্গত) আছে, প্রয়োজনমত সময়ে জ্ঞানে পরিণত হইবে। এইরূপে, যাহা কান্তীয় মতে আভ্যন্তরিক বা সহজ জ্ঞান, স্পেন্সরের মতে তাহা পূর্ব্বপুরুষ পরম্পরাগত প্রত্যক্ষজাত জ্ঞান।"[৬]

কিন্তু এই রচনাতেই আমরা পাই ভারতীয় ট্র্যাডিশনকে সামগ্রিকভাবে প্রত্যক্ষ ও বিজ্ঞান বিমুখ হিসেবে দেখাবার যে প্রবণতা তার বিপরীত ধর্মী ঝোঁক। প্রত্যক্ষবাদী বঙ্কিম, যিনি এই রচনায় প্রত্যক্ষকেই সকল যথার্থ জ্ঞানের ভিত্তিভূমি হিসেবে নির্দেশ করেছেন, তিনি ভারতীয় চার্বাক মতকে আধুনিক Empirical philosophyর পূর্বসুরী হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।[৭]

১৮৭২-এর মে মাসে প্রকাশিত The Study of Hindu Philosophy-তে আমরা দেখাতে পাই যে বঙ্কিম স্টুয়ার্ট মিল্-এর 'লজিক'-এ আলোচিত কার্য-কারণ তত্ত্বের তুল্যতা নির্দেশ করছেন।[৮] এখানে মনে রাখতে হবে উনিশ শতকীয়

বৈজ্ঞানিক-অভিজ্ঞতাবাদী জ্ঞানতত্ত্ব ও যুক্তিতত্ত্বের প্রায় সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি মিল্-এর 'লজিক'। বঙ্কিমের মতে ভারতীয় / হিন্দু ট্র্যাডিশনে 'সঠিক' জ্ঞানতাত্ত্বিক অবস্থানের উপাদান ছিল, কিন্তু সাধারণভাবে ধর্মতাত্ত্বিক— জল্পনামূলক— অবরোহী পদ্ধতির দাপটে এই ধরনের 'সঠিক' জ্ঞানতাত্ত্বিক অবস্থান কোন সুদূরপ্রসারী প্রভাব রাখতে পারেনি।[৯] অর্থাৎ তাঁর পূর্বসুরীদের অধিকাংশের মত ভারতীয় জ্ঞানতাত্ত্বিক ঐতিহ্যকে বঙ্কিম পুরোপুরি অবৈজ্ঞানিক বলে উড়িয়ে দিতে প্রস্তুত নন। "What is in fact the real place of Hindu philosophy in the history of Science?"[১০] জানতে চেয়েছেন তিনি। এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে ইউরোপীয়দের মুখাপেক্ষী না থেকে ভারততত্ত্বের গবেষণা ভারতীয়দের নিজেদের হাতে তুলে নেওয়ার ডাক দিয়েছেন তিনি।[১১] পশ্চিমী জ্ঞানার্জন পদ্ধতির শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিয়েই জ্ঞানরাজ্যে পশ্চিমী একাধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ জানানোর ভাবনায় মহেন্দ্রলাল সরকার, রাজেন্দ্রলাল মিত্র ইত্যাদির সঙ্গে বঙ্কিম এক নতুন বৌদ্ধিক যুগের পথিকৃৎ।

পরবর্তী জীবনে প্রত্যক্ষবাদের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটিয়েছেন বঙ্কিম। অভিজ্ঞতাবাদের কান্টীয় সমালোচনাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন।[১২] বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির আবশ্যকতা সম্পূর্ণভাবে মেনে নিয়েও তার সর্বত্রগামিতাকে অস্বীকার করে তার অধিকারের ক্ষেত্রকে সংকুচিত কবতে চেয়েছেন তিনি। আধ্যাত্মিক সত্যকে রেখেছেন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির আওতার বাহিরে,[১৩] কিংবা বলা ভাল, আওতার ঊর্দ্ধে। সর্বোপরি হের্স্টির সঙ্গে বিতর্কে তিনি যে জ্ঞানতাত্ত্বিক সূত্রায়ন করেছেন তাকে প্রত্যক্ষবাদী সমাজবিজ্ঞানের বিশশতকীয় সমালোচনার উনিশ শতকীয় পূর্বসুরী হিসেবে দেখা চলতে পারে।[১৪] এক্ষেত্রেও স্থানাভাব। তাই বিশদ আলোচনার সুযোগ থাকল না, কতগুলো মন্তব্যের সঙ্গেই বঙ্কিম অধ্যায়ের ইতি টানতে হল।

জ্ঞানতাত্ত্বিক স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার জন্য বঙ্কিমের প্রয়োজন হয়েছিল প্রত্যক্ষবাদ থেকে মুক্তি। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা অন্যরকম দেখি। ব্রাহ্মণ সংস্কৃতির ধ্বজাধারী ও স্মৃতিশাস্ত্রে অপরিসীম শ্রদ্ধাশীল এই মানুষটি কিন্তু পশ্চিমের প্রত্যক্ষবাদকে সম্পূর্ণ আপন করে নিয়েছিলেন। ঔপনিবেশিক শিক্ষাপ্রণালীর সমালোচনা ও বাঙালীর বৌদ্ধিক ঔপনিবেশিকরণের বিরুদ্ধে তার বিদ্রোহ প্রত্যক্ষবাদী বৈজ্ঞানিকতাকে অবলম্বন করেই। এর সম্যক পরিচয় পাই তাঁর 'সামাজিক প্রবন্ধ' গ্রন্থের (গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ ১৮৯২ সাল) 'বৈজ্ঞানিকতা' অংশে।

আর পাঁচজন ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালীর মত ভূদেবও ইউরোপীয় প্রাধান্য ও সাফল্যের মূল ভিত্তি আবিষ্কার করেছেন ইউরোপীয়দের বিজ্ঞাননির্ভর শিক্ষা ও কল-কৌশলের মধ্যে, লিখেছেন:

"ফলতঃ ইউরোপের যে প্রাধান্য তাহা উহার শিক্ষা এবং কল-কৌশল হইতে জন্মে। সেই শিক্ষা এবং কল-কৌশল সমস্তই বিজ্ঞানমূলক, সুতরাং বিজ্ঞান

অতিশয় আদরের ও গৌরবের বস্তু। যত্নপূর্বক উহার প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক। যদি ইংরাজের সংস্রবে আমাদিগের প্রকৃত প্রস্তাবে বিজ্ঞান-বিদ্যালাভ হইয়া থাকে, এমন হয়, তবে অনেক লাভই হইয়াছে, স্বীকার করা যায়।"

এরপর ভূদেব চলে আসছেন তাঁর বক্তব্যের মোক্ষম জায়গায়। "প্রথমে দেখা যাউক, বিজ্ঞানটি কি, পরে দেখিব উহা আমরা পাইতেছি কি না।"[১৫]

"শরীরের পোষণ যেমন ভক্ষ্যগ্রহণের দ্বারা হয তেমনি জ্ঞানের পোষণও প্রত্যক্ষের দ্বারা হয়। সর্ব্বতোভাবে প্রত্যক্ষকে ছাড়িযা জ্ঞানের উপায়ান্তর কিছুই নাই। প্রত্যুত অনুমানাদি অপর যে সকল প্রমাণ বা জ্ঞান সাধনোপায়ের নাম শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়া থাকে, তাহার একটিও বিনা প্রত্যক্ষ কার্য্যকারী নহে। প্রমাণের সংখ্যা দর্শন এবং শাস্ত্রকারেরা জনগণের বোধসৌকর্য্যার্থ বিস্তৃত করিয়াছেন, প্রত্যুত সকলগুলিরই ভিত্তি প্রত্যক্ষ এবং সকলগুলিরই নির্ভর একমাত্র প্রত্যক্ষের উপর।"[১৬]

এরপর ভূদেব প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রে এমন 'বৈজ্ঞানিক' প্রত্যক্ষনির্ভবতার ও তৎপববর্তীকালে এই প্রত্যক্ষ নির্ভরতা থেকে বিচ্যুতির কথা বলেছেন, অর্থাৎ প্রাচীন উৎকর্ষ ও তৎপরবর্তী অবক্ষযের চালু থীমেরই পুনরাবৃত্তি করেছেন।

"কিন্তু যদিও মূল দার্শনিকদিগের বিবেচনা এইরূপ যথাযথ হইয়াছিল বোধ হয়, তথাপি তাঁহাদের পরবর্তী টীকাকার এবং নব্য ব্যাখ্যাতৃগণ যেন বিভিন্ন সংজ্ঞক প্রমাণগুলিকে পরস্পর স্বতন্ত্র বলিযাই মনে করিয়াছেন। তাঁহারা প্রত্যক্ষের বিরোধী প্রমাণকেও গ্রহণ করিতে তেমন সঙ্কুচিত হয়েন নাই।"[১৭]

এর পরেই ভূদেব লিখছেন:

"সাধারণতঃ ইউরোপীয দার্শনিকেরা ওরূপ করেন না। প্রকৃতরূপ প্রত্যক্ষের বিরোধী কোন প্রমাণই তাঁহারা প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন না। অপব একটি রূপেও ইউরোপীয় পণ্ডিতবর্গ প্রত্যক্ষের প্রতি সমাদর প্রদর্শন করেন। তাঁহারা সামান্য ইন্দ্রিয়বোধকেই প্রত্যক্ষ বলিয়া গ্রাহ্য করেন না। যেমন মোকদ্দমায় সর্ব্বপ্রধান সাক্ষীর একটিমাত্র কথা শুনিয়াই মীমাংসা করিলে অর্থাৎ তাঁহাকে বিশেষ করিয়া জিজ্ঞাসা না করিলে এবং অন্য সাক্ষীর কথার সঙ্গে মিলাইয়া না বুঝিলে যেমন বিচার ঠিক হয় না, সেইরূপ জ্ঞানের মৌলিক এবং সর্ব্বপ্রধান প্রমাণ যে প্রত্যক্ষ, তাহাকেও বিশিষ্টরূপে জিজ্ঞাসা করিয়া এবং সিদ্ধান্তের সহিত মিলাইয়া লওয়া আবশ্যক।"

"ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকেরা এই কার্য্যে অতিশয় পটু। তাঁরা সর্ব্বদা সমূহ যত্নে প্রত্যক্ষরূপ সর্ব্বপ্রধান সাক্ষীর স্থানে তৎকর্ত্তৃক বক্তব্য সমস্ত কথা শুনিয়া লন, এবং বহু প্রকারে তাহার প্রতি জেরা করেন। এই কার্য্যপ্রণালীকে পরীক্ষাবিধান

বলে। ইহাতেই প্রত্যেকের স্থানে সদুত্তর প্রাপ্তি হয়, এবং ইহা হইতেই বৈজ্ঞানিকতা জন্মে।"[১৮]

বঙ্কিমের প্রত্যক্ষধর্মী বৈজ্ঞানিক ধারণার (যার নমুনা আগেই উদ্ধৃত হয়েছে) তুলনায় ভূদেবের দৃষ্টিভঙ্গী ঢের বেশি আকর্ষণীয় ও সতেজ। প্রত্যক্ষের অন্ধ অনুসরণ নয়-- পরীক্ষাবিধানমূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রত্যক্ষের সাক্ষ্য গ্রহণ— এখানে জ্ঞাতার সক্রিয়তার ধারণা জোরের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু আমরা এক্ষুণি দেখব যে ভূদেবের এই জ্ঞানতত্ত্বচিন্তা নিছক দার্শনিকতাপ্রসূত নয়।

প্রত্যক্ষবাদী বৈজ্ঞানিকতার সাহায্যে চিত্তবৃত্তির উন্নতি সম্পর্কে ভূদেব লিখেছেন:

"বুদ্ধিবৃত্তির এইরূপ শিক্ষা হইলে চিত্তেরও কতকটা বিশিষ্টতা ঘটে। যাহা তাহাতে বিশ্বাস হয় না, দ্রব্যগুণে হইল অথবা কালমাহাত্ম্যে হইল অথবা দেবাবির্ভাবে হইল এরূপ বন্ধ্যা কারণের কল্পনাও হয় না, আর অদ্ভুত রসাস্বাদনের সুখানুভূতিও অতি প্রবল থাকে না, এবং স্বাবলম্বনজনিত সাহসিকতা বাড়ে। বৈজ্ঞানিক চিত্তের এইগুলি অতি সুস্পষ্ট লক্ষণ।"[১৯]

এরপর ভূদেবের প্রশ্ন যে ঔপনিবেশিক শিক্ষাপ্রণালী মানুষের মধ্যে এই ধরনের বৈজ্ঞানিকতা তৈরিতে সাহায্য করছে কিনা? লিখছেন:

"ভারতবর্ষের ইংরাজী শিক্ষিত দলের লোকেরা কি প্রণালীতে ইংরাজী শিক্ষা লাভ করিতেছেন, তাহাই প্রথমে বিচার্য্য। যদি তাঁহাদিগের শিক্ষার রীতি এমন হয় যে তদ্দারা বস্তুবোধ এবং ভাবসংগ্রহ সুপরিস্ফুট হইয়া উঠে, তবে ঐ শিক্ষা বৈজ্ঞানিকতা জননেব অনুকূল বলিযা গণ্য হইতে পারে। দেখা যাইতেছে যে, এখানকার লোকেরা অতি শৈশবাবধি অতি কঠিন এবং বৈয়াকরণ নিয়মে অসম্বদ্ধপ্রায় বিজাতীয় ইংরাজী ভাষায় সমুদয় শিক্ষা করেন। মাতৃভাষার শিক্ষায় বস্তুজ্ঞান যেমন পরিস্ফুট হয, বিজাতীয ভাষার শিক্ষায কখনোই তেমন হইতে পারে না।"[২০] কারণ, বলেন ভূদেব, বিদেশী ভাষায় লেখা বিদেশী পাঠ্যপুস্তক "অপরিজ্ঞাত বস্তু" এবং "অপ্রচলিত বিজাতীয় ভাব"— এ ঠাসা, যা যথার্থ জ্ঞানের অন্তরায়। "অতএব ইংরাজী শিক্ষিত নব্য সম্প্রদায়েব লোকগুলির বাল্যাবধি সুপরিস্ফুটরূপে বস্তু এবং ভাবগ্রহণ করা অনভ্যস্ত। উঁহারা যাহা কিছু শিখেন তাহার কিয়দ্ভাগ আন্দাজি বুঝিয়াই রাখেন। এইটি বড়ই কুঅভ্যাস এবং ইহা বৈজ্ঞানিকতা প্রাপ্তির পরম অন্তরায়।"[২১]

এরপর ভূদেব লেখেন:

"... বযোধিক হইলে কালেজগুলিতে যে শিক্ষা হয়, তাহাতে বৈজ্ঞানিকতার বিশেষ সহায়তা করে না। কালেজগুলিতে ইংলন্ডের কেম্ব্রিজাদি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আসিয়া যে সকল ব্যক্তি অধ্যাপকতায় নিযুক্ত হয়েন, তাঁহারা অধিকাংশই বিজ্ঞানবিদ্যায় তেমন বিদ্যাবান নহেন। যদিও কেহ কেহ গণিতবিদ্যায় মন্দ না হয়েন; তথাপি

পরীক্ষাবিধান কার্য্যে প্রায় কেহই পটু নহেন। পরীক্ষাবিধান ব্যতিরেকে বিজ্ঞানের শিক্ষা বিড়ম্বনা মাত্র। শিক্ষার অবস্থা এইরূপ হওয়াতে অধীত ইউরোপীয় বিজ্ঞানের সূত্রগুলি বার্ষিক পরীক্ষার সময় অবধি কণ্ঠস্থ থাকিতে পারে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক অন্তর্দৃষ্টি জন্মিতে পারে না। বিশেষতঃ এদেশে বিজ্ঞান-প্রসূত শিল্পাদির কলকারখানাও নাই বলিলে হয়; সুতরাং বৈজ্ঞানিক তথ্যের এবং উহার প্রয়োগজাত বস্তুর প্রত্যক্ষ কি কালেজে, কি বাহিরে, কোথাও হয় না... ফলকথা, ইউরোপীয় পুস্তক এবং ইউরোপীয় শিক্ষকের বাক্যের উপরেই নির্ভর করিয়া এতদ্দেশীয়দিগের ইউরোপীয় বিজ্ঞানের শিক্ষা হইয়া থাকে।"

"ফলও তদনুরূপ হয়। ইউরোপীয় পুস্তকাদির বাক্যই আপ্তবাক্য বলিয়া পরিগৃহীত, কণ্ঠস্থ এবং ক্রমে হৃদ্গতপ্রায় হইযা যায়। সুতরাং বুদ্ধি এবং চিত্তবৃত্তির প্রতি বিজ্ঞানানুশীলনের যে বিশেষ প্রভাব আছে তাহা অতি অল্পমাত্রাতেই দেখিতে পাওয়া যায়। তবে সামান্যতঃ বিদ্যাচর্চ্চার যে সাধারণ ফল তাহা ইংরাজী শিক্ষাতেও ফলিত হইয়া থাকে। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেব এবং আরবীতে কৃতবিদ্য মৌলবীর অশিক্ষিত প্রাকৃত জনসমূহ হইতে যে প্রভেদ, ইংরাজী শিক্ষিতদিগেরও তাহা কিযৎপরিমাণে হইয়া থাকে' এবং ভূগোল ইতিহাসাদি পাঠ নিবন্ধন একটু কুপমণ্ডুকতাও ন্যূন হয়, কিন্তু বিজ্ঞানচর্চ্চার বিশেষ কোন ফলই ফলে না।...."[২২]

"তবে কি ইংরাজী শিক্ষিত এবং স্বদেশীয় বিদ্যায় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন প্রভেদ হয় নাই? হইয়াছে। কিন্তু সে প্রভেদ, বুদ্ধি এবং চিত্তবৃত্তি সম্বন্ধে নয়— শব্দ প্রমাণের ভেদ সম্বন্ধে। পূর্ব্বে ছিল দেশী শাস্ত্রাদি আপ্তবাক্য, এখন হইয়াছে ইউরোপীয় শাস্ত্রাদি আপ্তবাক্য।....."[২৩]

এতক্ষণে বোঝা গেল পরীক্ষাবিধানের ও জ্ঞানের সক্রিয়তার ধারণা সম্বলিত প্রত্যক্ষবাদী বিজ্ঞান ভাবনার তাৎপর্য। এর মূলে নিছক জ্ঞানতাত্ত্বিক আগ্রহ নয়, কাজ করেছে চিত্তবৃত্তির দাসত্ব থেকে মুক্তির তাগিদ। বৌদ্ধিক ঔপনিবেশিকরণের বিরুদ্ধে এই জেহাদের থীম্ তৃতীয় দুনিয়ার বুদ্ধিজীবি মস্তিষ্কের জন্য আজও প্রাসঙ্গিক।

কিন্তু ভূদেবের রচনায় অন্য যে ইঙ্গিতটি আমরা পাই সেটাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়— ঔপনিবেশিক শিক্ষাপ্রণালীতে এক্স্পেরিমেন্টাল বিজ্ঞান শিক্ষার অবহেলা। আমহার্স্টকে লেখা চিঠিতে রামমোহনের যে আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন আমরা পাই সে আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন উনিশ শতকের শেষে এসেও হয়নি, ভূদেব সেই তথ্যটিই অত্যন্ত তাৎপর্যবহভাবে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। এই একই কথা— ঔপনিবেশিক শিক্ষায় বিজ্ঞানবিদ্যা শিক্ষার সীমাবদ্ধতার কথা— আমরা শুনি তৎকালীন যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত রামেন্দ্রসুন্দরের বক্তব্যে। ১৮৯৯-এর তাঁর এক রচনায় আমরা পড়ি:

"বিজ্ঞান শিখিতে যে যন্ত্র তন্ত্র কারখানা আবশ্যক তাহা বিশ্ববিদ্যালয় যোগাইতে পারেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের সে ক্ষমতা নাই। গবর্ণমেন্ট এ সম্বন্ধে অর্থব্যয়ে পরান্মুখ। লর্ড কেলবিনের ন্যায় বড় বড় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের অনুরোধ সত্ত্বেও প্রেসিডেন্সি কালেজে ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরি স্থাপনের ব্যয়ভার গ্রহণ করিতে আমাদের গবর্ণমেন্ট অক্ষমতা স্বীকার করিয়াছেন। অথচ এই প্রেসিডেন্সি কালেজেই যা সামান্য উপকরণ আছে, তাহার অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও প্রমাণ হইয়াছে যে, বাঙলীর মস্তিষ্ক খেলিবার অবসর পাইলে খেলিতে না পারে এমন নহে। এই প্রেসিডেন্সি কালেজ হইতেই দুই জন বাঙ্গালী বিজ্ঞানবিদের নাম ভারতবর্ষের চতুঃসীমা ছাড়াইযা বহু দূর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিযাছে। গবর্ণমেন্টের পরিচালিত মফস্বলের কালেজগুলির ও আমাদের দেশীয় লোকদিগের পরিচালিত কালেজগুলির অবস্থা অতিশয শোচনীয, সেখানে বিজ্ঞান শিখাইবাব যেরূপ ব্যবস্থা আছে, তাহা স্মবণ কবিলে চক্ষে জল আসে। এইরূপ মশলা লইযা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয বঙ্গদেশে বৈজ্ঞানিক বানাইবার চেষ্টা করিতেছেন। এরূপ অস্বাভাবিক শিক্ষাব ফল যে স্বভাব সঙ্গত হইবে, তাহাব আশা এককরূপ নাই বলিলেই চলে।"[২৪]

ঔপনিবেশিক শিক্ষাপ্রসূত ইংবেজী শিক্ষিত ভদ্রলোকের চিত্তবৃত্তিব পরাধীনতা ও অবৈজ্ঞানিকতা সম্পর্কে ভূদেবেব মতন রামেন্দ্রসুন্দবও অতিমাত্রায সজাগ।

"(ইংরেজী শিক্ষায) আমবা শিখিয়াছি অনেক ও পাইযাছি অনেক; কিন্তু তাহাতে আমাদের বাহ্য ব্যতীত আভ্যন্তরিক উন্নতি বিশেষ কিছু হয় নাই। আমাদের মজ্জা বা শোণিত হয় নাই; আমাদের শরীরে বল জন্মায় নাই।... আমবা জানিযাছি অনেক ও শিখিযাছি অনেক; কিন্তু কিরূপে জানিতে হয ও কিরূপে শিখিতে হয়, তাহা শেখা আবশ্যক বোধ করি নাই। মনুষ্যজাতির জ্ঞানের রাজ্য আমাদের কর্তৃক এক কাঠা, কি এক ছটাক পরিমাণেও বিস্তার লাভ করে নাই।"

"রাজ্য বিস্তার দূরের কথা; কিরূপে নিজের পরিচিত সীমানা পার হইয়া পা ফেলিতে হয়, তাহা আমরা জানি না, আমাদের সাহসেও কুলায় না। ....."[২৫] (মনে রাখতে হবে যে এটা ১৮৯৫ সালে লেখা যখন প্রফুল্লচন্দ্র রায় কিংবা জগদীশ বসুর গবেষণা পরিচিতি পায়নি।)

ইংরেজী শিক্ষিত হিন্দু বাঙালী সম্প্রদায়ের পশ্চিমের অনুকরণশীলতাকে ভূদেব ও রামেন্দ্রসুন্দর দুজনেই অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক স্বভাবচ্যুতি ও খাঁটি স্বাধীনমনস্ক বৈজ্ঞানিকতার বিপরীতধর্মী হিসেবে দেখেছেন। লিখেছেন রামেন্দ্রসুন্দর:

"... আমরা গুরু উপদেশ গ্রহণে অতিশয় মজবুত; সে বিষয়ে আমাদের তুলনীয় কে আছে, জানি না। আমরা বালকের হাতে কর্দম; কাঠিন্যমাত্র

বর্জিত। আমরা একদিনের মধ্যে তেত্রিশ কোটি দেবতা ভাঙ্গিয়া একেশ্বরবাদী বা নাস্তিকবাদী হইয়া দাঁড়াই, আবার এক বক্তৃতায় আমাদিগকে নিয়সফিস্ট করিয়া তুলে।....”[২৬]

“... পাদরি সাহেব জাতিভেদের নিন্দা করিলেই আমরা পৈতা ছিঁড়িয়া ফেলি, আবার রিসলি সাহেব নাক মাপিযা জাতিভেদের মূল আবিষ্কার করিয়াছেন শুনিলেই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া নেত্র বিস্ফারিত করিয়া থাকি। এমন স্নায়ুহীন পেশীহীন জাতি কি আর আছে।... দেশী হউক আর বিলাতী হউক, গুরুবাক্য যতদিন আমরা দ্বিধাহীনচিত্তে গ্রহণ করিব, ততদিন আমাদের বৈজ্ঞানিকতা উৎপত্তির সম্ভাবনা নাই।”[২৭]

প্রত্যক্ষবাদী বৈজ্ঞানিকতার ভাষায় ঘোষণা করেছেন রামেন্দ্রসুন্দর “বস্তুতঃ বিজ্ঞানের পদ্ধতি যে কি, তাহা আমরা জানি না ও জানা আবশ্যক বোধ করি না।”[২৮] প্রত্যক্ষবাদী বৈজ্ঞানিক অবস্থানের পথ ধরে বৌদ্ধিক ঔপনিবেশিকরণের বিরোধিতার সূত্রাযন আমরা দেখলাম। প্রত্যক্ষবাদী দর্শনের অন্তর্নিহিত কিছু সমস্যার মৌলিক পর্যালোচনা রামেন্দ্রসুন্দরের পরবর্তী রচনায় আমরা পাই কিন্তু এ প্রবন্ধে সে সম্পর্কে আলোচনার অবকাশ নেই। রাজনৈতিক ঔপনিবেশিকরণের সঙ্গে বৌদ্ধিক ঔপনিবেশিকরণের বিরুদ্ধে তাঁর জেহাদ ভীষণ তাৎপর্যবহ। “আমাদের রাজনৈতিক পরাধীনতা হীন; আমাদের জ্ঞানজীবনে পরাধীনতা শোকাবহ।”[২৯]

জ্ঞানজীবনে স্বপ্রতিষ্ঠার কর্মসূচীর রূপায়ণ রামেন্দ্রসুন্দর ও সমকালীন অন্যান্যের জীবন ও কর্মে কিভাবে ও কতখানি হয়েছিল সে অন্য আলোচনা।

সূত্র নির্দেশ

১. G. H. Forbes, **'Positivism in Bengal'**, Calcutta 1975.

২. উদাহরণস্বরূপ Leszek Kolakowski 'Positivist Philosophy From Hume to the Vienna Circle,' Pelican Books 1972 এবং **'The Fontana Dictionary of Modern Thought'** London 1988 দ্রষ্টব্য।

৩. L. Kolakowski **'Positivist Philosophy'**— পৃ. ১৭-১৯।

৪. বঙ্গদর্শন— পুনর্মুদ্রণ ২য় খণ্ড, পৃ. ২৫০।

৫. T. H. Huxley **'On the Advisablencess of Natural Knowledge' in "Lectures, Critiques & Addresses"** London 1870।

৬. বঙ্গদর্শন— ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪০৪।

৭. তদেব— পৃ. ৪০২।

৮. **Bankim Rachanavali**, Calcutta 1990, pp. 147 8.

৯. তদেব— পৃ. ১৪৬।
১০. তদেব— পৃ. ১৪৭।
১১. তদেব— পৃ. ১৪৩ ও ১৪৭।
১২. বঙ্কিমচন্দ্র, শ্রীমদ্ভগবদগীতা, বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য গ্রন্থাবলী। বসুমতী, কলকাতা ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৪-২৫।
১৩. তদেব— পৃ. ২৩।
১৪. **Bankim Rachanavali**, Sahitya Samsad, pp. 203 18।
১৫. ভূদেব রচনাসম্ভার, কলকাতা ১৩৬৪ পৃষ্ঠা।
১৬. তদেব।
১৭. তদেব— পৃ. ১০১।
১৮. তদেব— পৃ. ১০১-২।
১৯. তদেব— পৃ. ১০৪।
২০. তদেব— পৃ. ১০৫-৬।
২১. তদেব— পৃ. ১০৬।
২২. তদেব— পৃ. ১০৬-৭।
২৩. তদেব— পৃ. ১০৭।
২৪. রামেন্দ্র রচনাবলী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, চতুর্থ খণ্ড, কলকাতা ১৩৫৭, পৃ. ১০৮।
২৫. তদেব— পৃ. ১৫-১৬।
২৬. তদেব— পৃ. ১৭।
২৭. তদেব— পৃ. ১৮।
২৮. তদেব।
২৯. তদেব— পৃ. ১৯।

জর্জ টমসন এবং ইয়ং বেঙ্গলের রাজনৈতিক চেতনা

ভবতোষ কুণ্ডু

দ্বারকানাথ ঠাকুরের আমন্ত্রণে জর্জ টমসন কলকাতায় এসেছিলেন ১৮৪২ সালের শীতকালে। দ্বারকানাথ ঠাকুর ছিলেন একজন জমিদার ও ব্যবসায়ী। ইতিপূর্বে তিনি সরকার কর্তৃক নিষ্কর জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে ভূম্যধিকারী সভার (১৮৩৭) আন্দোলনে জর্জ টমসনের ন্যায় ভারতপ্রেমিক ইংরেজদের সহযোগিতার সদ্ব্যবহার করেছিলেন। কোম্পানীর অপশাসনের বিরুদ্ধে এদেশের আন্দোলনে ভারতবন্ধু ইংরেজদের সহযোগিতা স্থায়ীভাবে লাভ করার উদ্দেশ্যে তিনি চেয়েছিলেন যে টমসন কলিকাতার শিক্ষিত যুবক এবং ইয়ং বেঙ্গলের সহায়তায় একটি রাজনৈতিক সংস্থা গড়ে তুলুন[১] ১৮৪৩ সালের জানুয়ারী-এপ্রিল মাসের মধ্যে টমসন ফৌজদারী বলাখানাসহ কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতার মাধ্যমে ইয়ং বেঙ্গল এবং এদেশীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়কে এ দেশবাসীর অভাব ও অভিযোগ দূরীকরণে এদেশে এবং ইংল্যাণ্ডে সাংবিধানিক উপায়ে আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য এক রাজনৈতিক সংস্থা স্থাপন করতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। তার ফলে ১৮৪৩ সালের ২০শে এপ্রিল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি।

কোন কোন লেখক জর্জ টমসনকে এদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের অগ্রদূত বলে অভিহিত করেছেন[২]। আবার কোন কোন লেখকের মতে তিনি এদেশের রাজনৈতিক শিক্ষার জনক[৩]। কিন্তু স্মরণ রাখা দরকার যে ১৮৩২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায় রাজনৈতিক স্বার্থে হিন্দুদের মধ্যে যে ঐক্যের কথা বলেছিলেন[৪] তার মধ্যে রাজনৈতিক সংস্থার একটি অস্ফুট ধারণা নিহিত ছিল বলে মনে হয়। ১৮৩৮ সালে গোবিন্দ বসাককে লিখিত এক চিঠিতে রামগোপাল ঘোষ দেশীয় বিষয় আলোচনার জন্য একটি টাউনহলের এবং উইলিয়াম আদমের সহযোগিতায় ইংল্যাণ্ডে রাজনৈতিক আন্দোলনের যে পরিকল্পনার ধারণা লিপিবদ্ধ করেছিলেন[৫] তা টমসনের ভারতে এবং ইংল্যাণ্ডে এ দেশবাসীর স্বার্থে রাজনৈতিক আন্দোলনের ধারণাকেই অনেকাংশে Anticipate করেছিল।

টমসনের কৃতিত্ব হচ্ছে যে তিনি ইয়ং বেঙ্গল ও কলকাতার বুদ্ধিজীবীদের সাথে মিলিত হয়ে রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্য এক রাজনৈতিক সংস্থা স্থাপন করেছিলেন। তিনি পতনোন্মুখ সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার সদস্যদেরকে এবং ইয়ং বেঙ্গলকে তাত্ত্বিক এবং সাহিত্যিক আলোচনার পরিবর্তে কিছু Issue ভিত্তিক বাস্তবে এক রাজনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমে দেশের উন্নয়নের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন[৬]।

ইংল্যাণ্ডের দাস প্রথা বিরোধী আন্দোলনের নেতা ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির (১৮৩৯) প্রতিষ্ঠাতা এবং ব্রিটিশ free Traders-এর মিত্র জর্জ টমসন চেয়েছিলেন কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যের অবসান ঘটিয়ে ভারতের দরজা ব্রিটিশ শিল্পপতিদের নিকট অবাধে উন্মুক্ত করতে। তিনি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির উদ্বোধনের প্রাক্কালে[৭] এবং ফৌজদারী বলাখানায় ১৮৪৩ সালের ৬ই মার্চ যে বক্তৃতা দিয়ে ছিলেন[৮] তার মর্মার্থ হল যে এদেশবাসীর অবস্থার উন্নতির সাথে ইংল্যাণ্ডের শিল্পজাত দ্রব্যেব বাজার সৃষ্টির বিষযটি ওতপ্রতভাবে জড়িত। এইভাবে তিনি শাসক ইংল্যাণ্ড এবং শাসিত ভারতের মধ্যে Natureal Identity of Interest-এর তত্ত্ব তুলে ধরে ছিলেন। ইযং বেঙ্গল বিনা সমালোচনায এই তত্ত্ব গলধকরণ করেছিল এবং ইহা ১৮৪৪ সালে বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিযা সোসাইটি প্রকাশিত "The Efficiency of Native Ageney In Government Employ" নামক পুস্তিকায় প্রতিফলিত হয়েছিল[৯]। ঐ তত্ত্ব প্রকৃতপক্ষে ইয়ং বেঙ্গলের ঔপনিবেশিক ইংল্যাণ্ড ও উপনিবেশ ভারতের মধ্যে মূলগত সম্পর্কের ধারণাটিকে ভোঁতা করে দিয়েছিল।

অবশ্য টমসন ইয়ং বেঙ্গলকে কোম্পানীব শাসনের ত্রুটিগুলি তুলে ধরতে শিখিয়েছিলেন। তিনি কোম্পানীর শাসনকে "Blind and selfish" বলে অভিহিত করেছিলেন[১০]।

কিন্তু তিনি মনে করতেন যে কোম্পানীর শাসনের ত্রুটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও ঐ শাসন মুসলিম শাসন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ[১১]। তাঁর এই ধারণা উনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় নূতন নয়। তাঁর আগে ১৮৩০ সালে হিন্দু কলেজের হেয়ার অনুরাগী ছাত্রদের মাধবচন্দ্র মল্লিকের বাড়ীতে এক সম্বর্ধনা সভায় ডেভিড হেয়ার বলেছিলেন যে, ইউরোপীয় শিক্ষা ও বিজ্ঞান বহুযুগের অপশাসন ও স্বৈরাচারিতা হেতু মানুষের মনের অন্ধকারের বদ্ধদশা ঘোচাবে।[১১(এ)] এ দেশের ইতিহাস এবং সংস্কৃতির উপর অনেক ব্রিটিশ লেখকের পক্ষপাতমূলক রচনা পাঠ করে এবং হেয়ারের ন্যায় ভারত প্রেমিক ইংরেজদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ইয়ং বেঙ্গল (যাদের গুরু ডিরোজিও মুসলিম শাসন সম্পর্কে সমকালীন ইংরেজদের ঘৃণাসূচক ধারণার উর্দ্ধে ছিলেন না) মুসলিম শাসন অপেক্ষা ব্রিটিশদের শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভায় ১৮৪৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ঝাঁঝালো সমালোচনা সত্ত্বেও দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন রিচার্ডসনের সাথে সুর মিলিয়ে ঐ ধারণাই তার আলোচনার শেষে ব্যক্ত করেছিলেন[১২]। তবে বলা যায় যে টমসনের বক্তৃতার পরে ইয়ং বেঙ্গলের মনে ঐ ধারণা আরও বদ্ধমূল হয়েছিল। ১৮৪৩ সালের ২০শে এপ্রিল ফৌজদারী বলাখানায জর্জ টমসনের এক সভায় রামগোপাল ঘোষ বলেছিলেন যে তিনি উচ্চ চাকুরির ক্ষেত্রে ব্রিটিশ শাসন অপেক্ষা মুসলিম শাসনের উদারতার কথা মেনে নিলেও কখনই তারা মনে কবে না যে মুসলিম, শাসন ব্রিটিশ শাসন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট[১২এ]। এইরূপে জর্জ টমসনের প্রভাবে ইয়ং বেঙ্গল ইতিহাসের বিকৃত ও বিতর্কিত ধারণাই বহন করেছিল।

টমসন চেযেছিলেন ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব এবং ন্যায়সঙ্গত ও শান্তিপূর্ণ পথে আন্দোলন। তিনি চান যে কোন বৈপ্লবিক উদ্যোগের দ্বারা ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটুক[১৩]। তাঁব সহযোগী এম.ক্রো. দ্ব্যর্থহীন ভাষায বলেছিলেন যে আন্দোলন হবে— "Not by violence and popular appeals but by calm and respectful presentation to government "[১৪] এই ধারণাব দ্বারা অণুপ্রাণিত হযেছিলেন তাঁরাচাঁদ চক্রবর্তী ও রামগোপাল ঘোষের ন্যায ইযং বেঙ্গলের সদস্যরা[১৫]। বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিযা সোসাইটি এই ধারণার উপরই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।[১৬]।

টমসনের মূল কথা ছিল এদেশবাসীর অভাব অভিযোগ সম্পর্কে প্রথমে ভারত সরকারের কাছে এবং পবে ব্রিটিশ সরকারের নিকট আবেদন করতে হবে। তিনি ঘোষণা করে ছিলেন যে, অধিকাংশ ইংরেজ ভারতবাসীর প্রতি সহানুভূতিশীল এবং ইংরেজ জনমতের দ্বরা প্রভাবিত ব্রিটিশ পার্লামেন্ট হল "Final Tribunal", যা ভারতবাসীর অভাব অভিযোগ পূরণ করবে।[১৭] তিনি স্বভাবতই ইংল্যাণ্ডের ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির ধাঁচেই এই আন্দোলন চেযেছিলেন।

কিন্তু তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছিলেন যে ইংল্যাণ্ডে যে, ধরনের আন্দোলন বিদ্যমান তার জন্য এদেশের যুবকরা প্রস্তুত নয়। তিনি মূলত চেয়েছিলেন যে, তারা কোম্পানীর শাসনের দোষ-ত্রুটিগুলির বিবরণ লিপিবদ্ধ করে Indophil Britishers-এর মাধ্যমে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে সেগুলি পেশ করাক।[১৮] এক্ষেত্রে স্মরণীয় যে দেশহিতৈষণী সভার (১৮৪১) উদ্বোধনী ভাষণে শারদাপ্রসাদ ঘোষ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির ধাঁচে সাংবিধানিক আন্দোলনের যে ধারণা ব্যক্ত করেছিলেন[১৯] তা থেকে টমসন সরে এসেছিলেন। বস্তুত টমসন আন্দোলনকে একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে নিয়ন্ত্রিত করতে চেয়েছিলেন।

অবশ্য টমসন চেয়েছিলেন প্রস্তাবিত সোসাইটির মাধ্যমে সমস্ত শ্রেণীর জনগণের অবস্থার উন্নতি ঘটাতে।[২০] ইহাই ছিল বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির অন্যতম

লক্ষ্য।[২১] উল্লেখ্য যে .ভূম্যধিকারী সভার জন্ম হয়েছিল সরকার কর্তৃক নিষ্কর জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে আন্দোলনের মাধ্যমে[২২] এবং ঐ সভার মূল লক্ষ্য ছিল জমিদারদের স্বার্থ রক্ষা করা।[২৩]

কিন্তু টমসন কখনই ভূম্যধিকারী সভার বিকল্প হিসাবে বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত করতে চাননি। অন্যদিকে জমিদারদের স্বার্থে ভূম্যধিকারী সভার প্রযোজনীযতা আছে তিনি মনে করতেন এবং ঐ সভার উদ্দেশ্যের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ছিল। যা তিনি চেয়েছিলেন তা হল ভারতের শাসন সংক্রান্ত সাধারণ ব্যাপারে দুটি সভার মধ্যে দ্বন্দ্বের পরিবর্তে সহযোগিতা।[২৪] তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে প্যারীচাঁদ মিত্র উপরিউক্ত দুটি সংস্থার মধ্যে সহযোগিতার সম্ভাব্য বিষয় বিবেচনার জন্য একটি কমিটি গঠনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। প্যারীচাঁদের প্রস্তাব অনুযায়ী ঐ ব্যাপারে একটি কমিটি গঠিত হয়েছিল।[২৫]

উল্লেখ করা প্রযোজন যে টমসনের প্রভাবে ভূম্যধিকারী সভার কয়েকজন সদস্য নূতন রাজনৈতিক সংস্থাব উদ্যোগের সাথে যুক্ত হযেছিলেন।[২৬] সুতরাং সামাজিক ভিত্তি আলোচনা করতে গিযে "Aristocracy of intellect"[২৭] বলে যে মন্তব্য করেছেন তা পুরোপুবি সঠিক নয়। প্রকৃতপক্ষে নূতন সংস্থাকে Intellect এবং wealth-এর combination বলা চলে।

অবশ্য হিন্দু ও মুসলিমদের নিযে গঠিত ভূম্যধিকারী সভার যে secular চরিত্র ছিল তা কিন্তু বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির গঠনে প্রতিফলিত হযনি। শেষোক্ত সোসাইটির কমিটি গঠিত হয়েছিল হিন্দুদেরই নিযে।[২৮] অথচ ভূম্যধিকাবী সভা ও বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিযা সোসাইটির মধ্যে সম্ভাব্য সহযোগিতার বিবেচনার জন্য গঠিত কমিটিতে দুজন মুসলিম ছিল[২৮(এ)] এবং টমসন জাতি ধর্ম্ম নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের সহযেগিতার ভিত্তিতে নূতন সংস্থা গড়তে চেয়েছিলেন এবং এ সম্পর্কে ইয়ং বেঙ্গল ও দেশীয় শিক্ষিত শ্রেণী এক সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল।[২৮(বি)]

মনে রাখা প্রয়োজন যে টমসন আন্দোলনের স্বার্থে কলিকাতার শিক্ষিত এবং উদার মনোভাবাপন্ন দেশবাসীর মধ্যে একতা চেয়েছিলেন।[২৯] কিন্তু প্যারীচাঁদ মিত্রের প্রস্তাবে এবং রামগোপাল ঘোষের সমর্থনে এক সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে সরকারি প্রতিষ্ঠানে পাঠরত ছাত্রদের সোসাইটি আন্দোলন থেকে বাদ দেওয়া হোক। আর টমসন সেই প্রস্তাব সমর্থন করেছিলেন।[৩০] ইয়ং বেঙ্গল ছাত্রজীবনে রাজনৈতিক বিষয়ে মাথা গলিয়েছিলেন। সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার (যে সভায় রাজনৈতিক বিষয় আলোচনা বাদ যায়নি।) সদস্যদের মধ্যে হিন্দু কলেজের ও মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা ছিল।[৩০(এ)] অথচ রামগোপাল ঘোষ ঘোষণা করেছিলেন যে প্রস্তাবিত সংস্থার আন্দোলন যেহেতু কোন কোন সরকারী ব্যবস্থা

বিরোধী সেহেতু সেই সরকার বিরোধী আন্দোলনে সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠরত ছাত্রদের অংশগ্রহণ করা উচিত নয়। সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার এক অধিবেশনে (১৮৪৩ সালের ফেব্রুয়ারীতে) দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের কোম্পানীর পুলিশ ও বিচার ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনামূলক বক্তৃতার মাঝে হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ রিচার্ডসন সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের সরকারের সমালোচনার অর্থ অকৃতজ্ঞতা বলে যে সতর্কবাণী[৩১] উচ্চারণ করেছিলেন তা ইয়ং বেঙ্গলের মনে প্রভাব ফেলেছিল বলে মনে হয।

বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটিব Social Base ছিল অত্যন্ত সীমিত। মাত্র ২১ জন এদেশবাসী এবং ১০ জন ইউরোপীয় নিযে গঠিত হয়েছিল এই সোসাইটি। কমিটির মধ্যে ইযং বেঙ্গলের প্রাধান্য লক্ষনীয। কিন্তু কমিটির প্রেসিডেন্ট প্রথমে জর্জ টমসন[৩২] এবং পবে উইলিযাম থিওবোল্ড—অর্থাৎ কমিটির প্রেসিডেন্ট পদে ছিলেন একজন ইংরেজ।

কোন কোন লেখকের মতে টমসন প্রস্তাবিত নূতন সোসাইটির অনুসন্ধান বা আলোচনাব ক্ষেত্র শুধুমাত্র বাংলাদেশের অবস্থার মধ্যেই সীমিত ছিল না।[৩৩] একথা সত্য যে টমসন এবং তাঁব সহযোগীদের কোন কোন বক্তৃতার মর্মার্থ সাধারণ বিষয় সম্পর্কিত—-যেমন ভারতীযদের সম্পর্কে ইংরেজদের জাত্যাভিমানজনিত অবজ্ঞা এবং ভারতে ইংরেজ সরকার জনগণের উন্নয়ন অপেক্ষা বাজস্ব সংগ্রহে আগ্রহী ইত্যাদি। কিন্তু টমসন ও তাঁর সহযোগীরা মূলত বাংলাদেশ সম্পর্কিত Topics নিয়েই নিবিষ্ট ছিলেন—যেমন বাংলার পুলিশ ও জমিদারী ব্যবস্থা বা বেনামে জমি বিক্রয ইত্যাদি।[৩৪]

কোন কোন লেখকের মতে ভূম্যধিকারী সভার সাথে বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির একটি লক্ষনীয পার্থক্য হল চাষীদের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন।[৩৫] উল্লেখ্য বিভিন্ন শ্রেণীর চাষীদের অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান চালাবার জন্য ঐ সোসাইটি ৩০টি প্রশ্ন ইয়ং বেঙ্গলের মুখপত্র দি বেঙ্গল স্পেকটেটরে প্রকাশ করেছিল।[৩৬] কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে সোসাইটি স্থাপনের প্রাক্কালে জি.টি.এফ. স্পিড প্রস্তাবিত হরচন্দ্র লাহিড়ী সমর্থিত এবং সর্বসম্মতভাবে গৃহীত এক সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে জমিদার ও চাষী উভয় শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার জন্য একটি কমিটি গঠিত হোক।[৩৭]

সোসাইটির আন্দোলনের আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল উচ্চ চাকুরীর ক্ষেত্রে ভারতীয়করণের দাবি। ভারতীয়করণ শব্দটিকে এখানে অত্যন্ত সীমিত অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। ইয়ং বেঙ্গল মূলত শিক্ষিত হিন্দু যুবকদের চাকুরী নিয়েই চিন্তিত ছিল। যাই হোক, কোর্ট অফ প্রপ্রাইটরের সভায় জন মুলিভান এদেশবাসীর উচ্চ চাকুরীর দাবীকে সমর্থন করে ছিলেন। মুলিভানের বক্তৃতার

সমর্থনে এবং তাঁকে লেখা এক প্রশংসা পত্র গ্রহণের জন্য টাউন হলে ১৮৪৩ সালের ১৮ই এপ্রিল এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ঐ সভায় টমসন এবং ইয়ং বেঙ্গল সহ অনেক দেশীয় যুবক উপস্থিত ছিলেন।[৩৮]

সোসাইটি স্থাপনের প্রাক্কালে টমসনের বক্তৃতা সভায় বাংলার পুলিশ ব্যবস্থা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছিল। টমসন দাবী তুলেছিলেন যে জনগণের উন্নতিকল্পে পুলিশী ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন হোক। জি.টি.এফ. স্পীড মফঃস্বলের থানাদারী ব্যবস্থার দুর্নীতিগুলি তুলে ধরেছিলেন।[৩৯] শ্যামাচরণ সেন ও হরচন্দ্র লাহিড়ী বাটাবন্দি ব্যবস্থার (কোর্টে হাজির হওয়ার নির্দেশ অমান্য করলে পুলিশ দ্বারা বাড়ী ঘেরাও রাখার ব্যবস্থা) ত্রুটিগুলি তুলে ধরেছিলেন।[৪০] জি.এফ. রামফ্রে পুলিশের উপর দক্ষ তত্ত্বাবধানের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন।[৪১]

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আদালতের কোন কোন বিচারকের যে দেশীয় ভাষায় সম্যক জ্ঞানের ভাব ছিল তা নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে বিচারে রায সেই ভাষাতেই দিতে হবে যে ভাষা মামলার যুক্ত party-রা বুঝতে পাবে।[৪২]

কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির পরিচালনার বিষয়ও ১৮৪৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আলোচিত হয়েছিল।[৪৩]

Home Public Department-এর রেকর্ডে দেখা যায় যে ১৮৪৪ সালের ২৫শে মে বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির সভাপতি ছিলেন উইলিয়াম থিওবোল্ড।[৪৪] স্বভাবতই অনুমেয় যে জর্জ টমসন তার আগেই কলকাতা ছেড়ে ইংল্যাণ্ডে চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি চলে যাওয়ার পরেও ঐ সোসাইটির আন্দোলন চলতে থাকে। ১৮৪৪ ও ১৮৪৫ সালে চাষীদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, সোসাইটির প্রেসিডেন্ট বলেছিলেন যে জমিদার ও চাষী উভয় শ্রেণীরই কতকগুলি "Vices" রয়েছে। অর্থাৎ চাষীদের প্রতি সোসাইটির সমর্থন unqualified ছিল না।[৪৫] ১৮৪৬ সালে প্যারীচাঁদ মিত্র দি ক্যালকাটা রিভিউ পত্রিকায়— "The Zamindar and the Ryot" নামক এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এই প্রবন্ধে তিনি জমিদারদের অত্যাচার সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। কিন্তু চাষীদের "ধর্ম্মঘট" বা খাজনা বন্ধের আন্দোলনকে (কলকাতার নিকটস্থ কোন কোন এলাকায়) তিনি সমর্থন জানাননি। তিনি চেয়েছিলেন আইনের পথে জমিদারদের অত্যাচার বন্ধ করতে। তিনি ভেবেছিলেন যে ইংরেজী শিক্ষার ফলে জমিদাররা আপনা হতেই উদার হবে। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে তিনি জমিদারদের জন্য ইংরাজী শিক্ষা ও সাধারণ কৃষক ও মানুষের জন্য বাংলাভাষায় শিক্ষার সমর্থক ছিলেন।[৪৬] যাইহোক, ১৮৪৫ সালে ইংরাজী শিক্ষা ও মাতৃভাষায় চাষীদের শিক্ষা দেবার বিষয় নিয়ে সোসাইটির

তরফে সরকারকে চিঠি দেওয়া হয়েছিল।[৪৭] ১৮৪৪ সালে সোসাইটির তরফে ভারতীয়দের উচ্চ চাকুরীতে নিয়োগের দাবী জানিয়ে দুটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছিল।[৪৮] ১৮৪৪—৪৫ সালে কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটির পরিচালনা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছিল। ১৮৪৫ সালে কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটিতে করদাতাদের অংশগ্রহণ সম্পর্কে সরকারে নিকট সোসাইটির তরফে পত্রালাপ হয়েছিল।[৪৯] ১৮৪৪ সালে কলিকাতার রাস্তায় মাতলামি বন্ধ করার জন্য সরকারের নিকট আরও একটি চিঠি লেখা হয়েছিল।[৫০] ১৮৪৪ সালে মফঃস্বলের পুলিশ এবং ১৮৪৫ সালের কলকাতার পুলিশ সোসাইটির আলোচনায় স্থান পেয়েছিল।[৫১] উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১৮৪৫ সালের কলিকাতা পুলিশ কমিটিতে রামগোপাল ঘোষ সদস্য ছিলেন। এই কমিটির তরফে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্যারীচাঁদ মিত্রের ন্যায় অনেক ব্যক্তিকে কলিকাতার পুলিশ ব্যবস্থা সম্পর্কে মতামত জ্ঞাপন করতে অনুরোধ করা হয়েছিল। প্যারীচাঁদ ও কৃষ্ণমোহনের সুচিন্তিত কিছু মতামত এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য। রামগোপাল ঘোষ ও মিঃ এ. রোজার্থ পুলিশ কমিটির সদস্য হয়েও আলাদাভাবে এক দীর্ঘ রিপোর্ট পেশ করে ছিলেন। এই রিপোর্টে তাঁরা কলিকাতা পুলিশের বিভিন্ন সংস্থার প্রস্তাব লিপিবদ্ধ করেছিলেন।[৫২]

কিন্তু ১৮৪৬ সালের পর সোসাইটি মৃতপ্রায় ছিল। সোসাইটির আন্দোলন শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে উৎসাহ জাগাতে ব্যর্থ হয়েছিল।[৫৩] তাছাড়া ইয়ং বেঙ্গলের সদস্যরা বৈষয়িক বিষয়ে লিপ্ত ছিল। ফলে আন্দোলন একটানা চলেনি এবং আন্দেলনে ক্রমে ক্রমে ভাঁটা পড়ে। "ব্লাক" এ্যাক্টের (১৮৪৯) ব্যর্থতার পর এবং চার্টার এ্যাক্টের ১৮৫৩ সালে নবীকরণের প্রাক্কালে বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি ও ভূম্যধিকারী সভা একসাথে মিলিত হয়েছিল। ফলে ১৮৫১ সালে জন্ম নিয়েছিল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন। ইয়ং বেঙ্গলের আন্দোলন অনেকাংশে তার স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলে।

সূত্র নির্দেশ

১। পালিত চিত্তব্রত, **নিউ ভিউ পয়েন্টস অন নাইনটিস্থ সেনচুরী বেঙ্গল**, কলিকাতা, ১৯৮০, পৃঃ ৭৪—৭৬, ৮৮

২. **দি ক্যালকাটা রিভিউ**, ১৯০৯, পৃঃ ১০৮

৩. মিত্র, রাজ যোগেশ্বর, **স্পিচেস অফ জর্জ টমসন**, কলিকাতা, ১৮৯৬, প্রিফেস

৪. **দি এনকোয়ারার** Quoted in **দি ইণ্ডিয়া গেজেট**, ফেব্রুয়ারী ৪, ১৮৩২

৫. গোবিন্দ বসাককে রামগোপাল ঘোষের লেখা চিঠি, আগষ্ট ১২, ১৮৩৮, Quoted in সান্যাল, রামগোপাল, **এ জেনারেল বায়োগ্রাফি অফ বেঙ্গল সেলিব্রিটিজ**, বোথ লিভিং এ্যাণ্ড ডেড, কলিকাতা ১৮৮৯, পৃঃ ১৭৫—১৭৬

৬. দি বেঙ্গল স্পেকটেটর, মার্চ ১, ১৮৪৩ Quoted in চট্টোপাধ্যায়, গৌতম, বেঙ্গল: আর্লি নাইনটিস্থ সেনচুরি, কলিকাতা, ১৯৭৮, পৃঃ ১৮৬; দি বেঙ্গল স্পেকটেটর, মার্চ ৮, ১৯৪৩

৭. Quoted in মেহরোত্রা, এস, আর, দি ইমারজেন্স অফ দি ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেস, দিল্লী, ১৯৭১, পৃঃ ১৫

৮. টমসন জর্জ, এ্যাড্রেসেস ডেলিভার্ড এ্যাট দি মিটিংস অফ দি নেটিভ কমিউনিটি অফ ক্যালকাটা, কলিকাতা, ১৮৪৩, পৃঃ ৮৩

৯. "দি এফিসিয়েন্সি অফ নেটিভ এজেন্সি ইন গভর্ণমেন্ট এমপ্লয়" (১৮৪৪) পৃঃ ৩

১০. টমসন, জর্জ, এ্যাড্রেসেস, পৃঃ ৭৯–৮০

১১. টমসন, জর্জ, ঐ পৃঃ ৮০–৮১

১১(এ). মিত্র, প্যারীচাঁদ, ডেভিড হেয়ারের জীবনচরিত (১৮৭৮) Cited in বন্দোপাধ্যায, অমিত কুমার, প্যারীচাঁদ রচনাবলী, কলিকাতা, ১৯৭১, পৃঃ ৪৬৩

১২. দি বেঙ্গল হরকারু, ফেব্রুয়ারী ১৩, ১৮৪৩

১২(এ) টমসন, জর্জ, এ্যাড্রেসেস Cited in নাইনটিস্থ সেনচুরি স্টাডিস, নং ৪, অক্টোবর, ১৯৭৩, পৃঃ ৪৪৮–৪৪৯

১৩. দি বেঙ্গল স্পেকটেটর মার্চ ১, ১৮৪৩, চট্টোপাধ্যায়, গৌতম ঐ, পৃঃ ১৯৩–৯৯৪

১৪. টমসন, জর্জ, এ্যাড্রেসেস, পৃঃ ১৩৫

১৫. টমসন জর্জ, এ্যাড্রেসেস, Quoted in নাইনটিস্থ সেনচুরি স্টাডিস, অক্টোবর, ১৯৭৩, পৃঃ ৪৪৮–৪৪৯

১৬. দি বেঙ্গল স্পেকটেটর, মে ১৭, ১৮৪৩

১৭. দি বেঙ্গল স্পেকটেটর, মার্চ ১, ১৮৪৩, Quoted in চট্টোপাধ্যায, গৌতম ঐ, পৃঃ ১৮৯–৯২, ১৯৪

১৮. Quoted in মেহরোত্রা এস আর, ঐ পৃঃ ৩০

১৯. দি বেঙ্গল হরকারু, নভেম্বর ৬, ১৮৪১, cited in দি ক্যালকাটা মান্থলি জার্নাল নভেম্বর ১৮৪১, cited in চট্টোপাধ্যায় গৌতম, ঐ পৃঃ ২৭৫

২০. দি বেঙ্গল স্পেকটেটর, মার্চ ১, ১৮৪৩, Quoted in চট্টোপাধ্যায়, ঐ পৃঃ ১৯৮ ও ২০০, পালিত চিত্তব্রত, ঐ পৃঃ ৮৪

২১. টমসন জর্জ, এ্যাড্রেসেস পৃঃ ১৩৬–১৩৭; দি বেঙ্গল স্পেকটেটর এপ্রিল ১৭ ও ২৫, ১৮৪৩

২২. দি সমাচার দর্পণ নভেম্বর ১৮, ১৮৩৭ ও মার্চ ২৪, ১৮৩৮, cited in বন্দোপাধ্যায়, বি. এন সম্পাদিত, সংবাদপত্রে সেকালের কথা, দ্বিতীয় খণ্ড, কলিকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, ১৩৮৪ সাল, পৃঃ ৪০৫–৪০৮

২৩. পালিত চিত্তব্রত, পারসপেকটিভ অন এগ্রিকালচারল বেঙ্গল, কলিকাতা, ১৯৮২, পৃঃ ২১

২৪. দি বেঙ্গল স্পেকটেটর (নং ৪ ও ৫) ফেব্রুয়ারী ও মার্চ ১৮৪৩ Cited in. ঘোষ, বিনয়, সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ৬ষ্ঠ খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৮৩, পৃঃ ১৭৯; পালিত, চিত্তব্রত, নিউ ভিউ পয়েন্টস অন নাইনটিন্থ সেনচুরি বেঙ্গল, পৃঃ ৮৫—৮৬

২৫. ঘোষ, বিনয়, ঐ পৃঃ ১৭৯

২৬. পালিত, চিত্তব্রত, ঐ পৃঃ ৮৪

২৭. চন্দ্র ভোলানাথ, রাজা দিগম্বর মিত্র, কলিকাতা, ১৮৯৩, পৃঃ ৩৬

২৮. সোসাইটির কমিটিতে কারা সভ্য ছিলেন তার জন্য দি বেঙ্গল স্পেকটেটর, এপ্রিল ২৫, ১৮৪৩

২৮(এ). ঘোষ, বিনয়, ঐ পৃঃ ১৭৯

২৯. দি বেঙ্গল স্পেকটেটর, মার্চ ১, ১৮৪৩ Cited in চট্টোপাধ্যায়, গৌতম, ঐ, পৃঃ ১৮৪

৩০. টমসন জর্জ, এ্যাড্রেসেস, Quoted in নাইনটিন্থ সেনচুরি স্টাডিস, অক্টোবর, ১৯৭৩, পৃঃ ৪৪৯--৪৫১

৩০(a) সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার গঠনের সামাজিক স্তর বিশ্লেষণের জন্য চট্টোপাধ্যায় গৌতম এ্যাকোয়েনিং ইন বেঙ্গল ইন আর্লি নাইনটিন্থ সেনচুরি, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৬৫, ভূমিকা, পৃঃ ৩৯—৪০

৩১. দি বেঙ্গল হরকারু, ফেব্রুয়ারী ১৩, ১৮৪৩, Quoted in চট্টোপাধ্যায়, গৌতম, ঐ পৃঃ ৩৯৩—৩৯৪

৩২. দি বেঙ্গল স্পেকটেটর, মে ১৭, ১৮৪৩

৩৩. পালিত, চিত্তব্রত, ৯ পৃঃ ৮৬ ও ৮৮

৩৪. দি বেঙ্গল স্পেকটেটর মার্চ ১, ৮ ও ২৪, ১৮৪৩

৩৫. সরকার সুমিত "দি কম্প্লেক্সিটিস অফ ইয়ং বেঙ্গল" নাইনটিন্থ সেনচুরি স্টাডিস, অক্টোবর, ১৯৭৩, পৃঃ ৫২১

৩৬. দি বেঙ্গল স্পেকটেটর, জুলাই ২১, ১৮৪৩, পৃঃ ২১৫—২১৬

৩৭. ঐ, এপ্রিল ১৭, ১৮৪৩

৩৮. ঐ এপ্রিল ২৫, ১৮৪৩, পৃঃ ১৯৯—২০২

৩৯. ঐ মার্চ ২৪, ১৮৪৩

৪০. ঐ এপ্রিল ১৭, ১৮৪৩

৪১. ঐ জুন ২৪, ১৮৪৩, পৃঃ ১৮২—১৮৩

৪২. ঐ জুলাই ১৬, ১৮৪৩, পৃঃ ২০৬—২০৭

৪৩. ঐ, সেপ্টেম্বর ১০, ১৮৪৩, পৃঃ ২৭৫—১৭৬

৪৪. হোম পাবলিক ডিপার্টমেন্ট, মে ২৫, ১৮৪৪, পৃঃ ২৭৫—২৭৬

৪৫. দি ইংলিশম্যান এ্যাণ্ড মিলিটারি ক্রনিক্যাল, সেপ্টেম্বর ১২, ১৮৪৪; ফেব্রুয়ারী ৭, ১৮৪৫

৪৬. মিত্র, প্যারীচাঁদ, "দি জমিন্দার এ্যাণ্ড দি রায়ত", দি কালকাটা রিভিউ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৮৪৬, পৃঃ ৩১৩—৩৫১

৪৭. এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট (জেনারেল), প্রসিডিংস ভলুম, জানুয়ারী ৩—মার্চ ২৬, ১৮৪৫, পৃঃ ১২০-১২১

৪৮. "এভিডেন্সেস রিলেটিং টু দি এফিসিয়েন্সি অফ দি নেটিভ এজেন্সিস ইন দি এ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ দি এফেয়ারস অফ দি কান্ট্রি" (১৮৪৪), প্রিফেস, পৃঃ ৪

"দি এফিসিয়েন্সি অফ নেটিভ এজেন্সি ইন গভর্ণমেন্ট এমপ্লয়" (১৮৪৪) পৃঃ ২৬—২৭

৪৯. দি ইংলিশম্যান এ্যাণ্ড মিলিটারি ক্রনিক্যাল, অক্টোবর ১২ ও নভেম্বর ১২, ১৮৪৪; দি ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া, মে ১৫, সেপ্টেম্বর ২৫ ও ডিসেম্বর ২৫, ১৮৪৫; জুডিশিয়াল ডিপার্টমেন্ট, ভলুম ৮০, সেপ্টেম্বর ১১, ১৮৪৪

৫০. জুডিসিয়াল ডিপার্টমেন্ট, ভলুম ৮০, নভেম্বর ২০, ১৮৪৪ পৃঃ ১৯৩—১৯৫

৫১. দি ইংলিশম্যান এ্যাণ্ড মিলিটারি ক্রনিক্যাল, ডিসেম্বর ১০, ১৮৪৪, দি ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া, জুলাই ২৪, ১৮৪৫

৫২. জুডিসিয়াল ডিপার্টমেন্ট, ভলুম ৮২, সেপ্টেম্বর ৩, ১৮৪৫, পৃঃ ১৮৫—১৮৬, ২৬৩—২৬৬, ৩৬৩—৩৮৪

৫৩. মজুমদার, বি.বি., হিস্ট্রি অফ পলিটিক্যাল থট: ফ্রম রামমোহন টু দয়ানন্দ, কলিকাতা, ১৯৩৪, পৃঃ ২৪৮;

বাগল, যোগেশচন্দ্র, হিস্ট্রি অফ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোশিয়েসন কলিকাতা, ১৯৫৩, পৃঃ ৩।

কলকাতা ট্রামের সামাজিক প্রভাব

কিশোরকুমার দাস

ঊনবিংশ শতকের সত্তরের দশকে একটি আধুনিক পরিবহন ব্যবস্থা হিসাবে কলকাতায় ট্রামগাড়ি প্রচলনের পর থেকে সাধারণ মানুষের সেবা করে চলেছে সে যুগের গণপরিবহন ব্যবস্থার মধ্যে অন্যতম ট্রাম। ঘোড়ার গাড়ি মুষ্টিমেয় কয়েকজন যাত্রীকে বহন করতে পারত। আবার তাও ছিল সাধারণ মানুষ নিম্নপদস্থ সরকারী, বেসরকারী চাকুরিজীবীদের আয়ত্ত্বের বাইরে। তাদের কাছে এটি ছিল বিলাসিতা। ট্রামই ছিল জনসাধারণের এক বৃহৎ অংশের একমাত্র পরিবহন ব্যবস্থা। ট্রাম সমগ্র কলকাতা ব্যাপী ছড়িয়ে পড়ায় কলকাতাবাসীদের পক্ষে অল্প সময়ে, স্বল্প ব্যয়ে যাতায়াতের পথকে সুগম করে[illegible] কলকাতা তথা সমগ্র বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করে [illegible]ছে ট্রাম। বলা বাহুল্য ভারতীয় সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে ট্রাম। কিন্তু ক[illegible]তা ট্রামে নেটিভ ও ইংরাজদের সকলের জন্য সমান প্রবেশাধিকার ছিল না। এর দুটি বগির মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণীতে নেটিভদের প্রবেশ অধিকার ছিল। আর প্রথম শ্রেণীতে অন্য একটি বিশেষ সামাজিক শ্রেণীর জন্য ভ্রমণের অধিকার ছিল। ঐ শ্রেণীর প্রতিনিধিরা ছিল সেই সব ইউরোপীয়ান— যারা পদস্থ সরকারী কর্মচারী ছিলেন।[১]

এবার দেখা দরকার কলকাতা ট্রামে চাপত কারা? অর্থাৎ কোন্ কোন্ সামাজিক শ্রেণীর প্রতিনিধিরা ট্রামকে পছন্দ করত। অন্য যে কোন পরিবহনের চাইতে ট্রামের ভাড়া ছিল সবচেয়ে কম। যেখানে দুজন ভদ্রলোকের চৌরঙ্গিতে অফিস করার জন্য মাসিক ভাড়া পড়ত পনের টাকা সেখানে ট্রামে পড়ত মাত্র তিন টাকা। স্বাভাবিক ভাবেই যাদের ঘোড়ার গাড়ি রাখা বিলাসিতা ছিল সেইসব নিম্ন পদস্থ সরকারী ও বেসরকারী কর্মচারি, যাদের মধ্যে দেশীয় ও ইউরোপীয় উভয় জনগণ অন্তর্ভুক্ত ছিল, তারা ট্রামকে পছন্দ করত। এরা দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করত।[২]

কলকাতা ট্রাম পরিবহন ব্যবস্থা ধনী শ্রেণীর লোকেদের এবং কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কমিশনারদের যাদের ব্যক্তিগত ঘোড়ার গাড়ি ছিল সেই সব শ্রেণীর মানুষেরও সমর্থন লাভ করেছিল। অন্যথায় এর অবলুপ্তি ঘটত। কিন্তু কলকাতার ঘোড়ার গাড়ির মালিকরা চাইত না কলকাতায় ট্রাম চলুক। Hackney Carriage-মালিকরা ৫০০০ অতিরিক্ত গাড়ি নামানোর প্রতিশ্রুতি

দিয়েছিল। টিককাগাড়ির মালিকরা ট্রাম তুলে দেবার চক্রান্তও করেছিল। কিন্তু কলকাতার কমিশনারদের সমর্থন লাভে ব্যর্থ হওয়ায় তাদের অপপ্রয়াস ব্যর্থ হয়। কমিশনাররা দরিদ্র নেটিভ ও ইউরোপীয় কর্মচারীদের কথা চিন্তা করে ট্রামগাড়ি অব্যাহত রাখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। কারণ দিনে দুবার টিককা গাড়ি ভাড়া করা দরিদ্র নেটিভ ও ইউরোপীয়ানদের পক্ষে কষ্টসাধ্য ছিল।[৩]

ট্রামে ওঠা-নামা সহজ। রাস্তার ঝাঁকুনি ও একসিডেন্ট অপেক্ষাকৃত কম। ফলে শিশু, মহিলা ও বৃদ্ধ শ্রেণীর লোকেরা এবং প্রতিবন্ধীরা ট্রামে ভ্রমণ পছন্দ করত। তখনকার দিনে ট্রামের একমাত্র প্রথম শ্রেণীর কামরায় ফ্যানের ব্যবস্থা ছিল। ফলে হার্টের রোগী ও হাঁপানীর রোগীরা ট্রাম পছন্দ করত।[৪]

দুর্গাদূজা ও কালিপূজা উপলক্ষে কলকাতার ট্রাম কোম্পানি বিভিন্ন রুটে ট্রামের সংখ্যা বৃদ্ধি করত। বিশেষত কালিপূজার সময় কালিঘাট গামী ট্রাম ছাড়া হত। সুতরাং কলকাতা ট্রাম বাঙালির সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসবের সঙ্গে যুক্ত ছিল।[৫]

ভোর চারটার সময় গঙ্গাস্নান যাত্রীদের সুবিধার জন্য কলকাতার বিভিন্ন ট্রাম ডিপো থেকে ট্রাম ছাডা হয়। পুণ্যবান বাঙালিরা গঙ্গাস্নানকে ধর্মীয় জীবনের অঙ্গ বলে মনে করে। তাই পুরুষানুক্রমে নিষ্ঠাবান বাঙালি হিন্দুরা গঙ্গা স্নান ও গঙ্গা জল আনার জন্য ট্রামকে বেছে নেয়। ধর্মপ্রাণ হিন্দুদের এই সামাজিক রীতি-নীতিকে বাঁচিযে রাখতে সাহায্য করছে ট্রাম।[৬]

কলকাতা ট্রামে কর্মীদের মধ্যে তিনটি শ্রেণীর মানুষ ছিল— ইউরোপীয়ান, বাঙালি এবং অবাঙালি ভারতীয়। পরিচালকমণ্ডলী ও পদস্থ সরকারি কর্মচারীরা ছিল ইউরোপীয়ান। সরকারী অফিসে কর্মরত কেরানীদের মুষ্টিমেয় ছিল ইংরেজ, অধিকাংশ ছিল বাঙালি। আর ড্রাইভার এবং কন্ডাকটর ইত্যাদিতে অবাঙালি শ্রেণীর মানুষ কাজ করত— যার অধিকাংশ ছিল বিহারী, ওড়িয়া, পাঞ্জাবী, গাড়োয়ালী শ্রেণীর মানুষ। ট্রাম লাইন পাতা, মেরামতি ইত্যাদির কর্মচারী বা শ্রমিকরা ছিল বিহারী, ওড়িয়া ও হিন্দুস্থানী।[৭]

ট্রাম কর্মচারীরা সামরিক কর্মচারীদের তুলনায় অধিক সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন ছিলেন। ফলে একজন কনষ্টেবল হওয়া অপেক্ষা একজন ট্রাম ড্রাইভার হওয়াকে লোকে পছন্দ করত। তাছাড়া ড্রাইভারের বেতন কাঠামোও ছিল অপেক্ষাকৃত বেশি। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার পুলিশ রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, চারজন গাড়োয়ালী সৈনিক কনষ্টেবলের চাকরি ছেড়ে দিয়ে ২৮ টাকা বেতনের ট্রামের ড্রাইভারের চাকুরী গ্রহণ করে।[৮]

কলকাতা ট্রাম শুধু পরিবহনের অঙ্গ নহে, ইহা কলকাতাবাসীদের জীবনেরও অংশ। বিস্তীর্ণ অঞ্চল ব্যাপী রয়েছে "পায়ের তলে লিকলিকে ট্রামের লাইন—মাথার উপরে অসংখ্য জটিল তারের জাল", এই লাইন, এই তারের জালকে অস্বীকার

কবাব উপায় নেই। উপায় নেই ট্রামে না চেপে কিম্বা ট্রাম লাইন না মাডিযে কলকাতায় টিকে থাকা। সত্যজিৎ রায মহানগব ছবিতে, বিষ্ণু দে তাব কবিতায়, জীবনানন্দ দাশ তাব অসংখ্য কবিতায ট্রামকে উল্লেখ কবেছেন। প্রতিদিন ১/২ মিলিয়ন যাত্রী বহনকাবী ট্রাম কলকাতাবাসীদেব ধর্মীয, সামাজিক জীবন প্রবাহকে সচল বাখতে সাহায্য কবছে।[৯]

সূত্র নির্দেশ

১. সন্তোষ চট্টোপাধ্যায· পালকি থেকে পাতাল বেল, কলকাতা, ১৯৯০, পৃষ্ঠা ৫৪
২. দি অমৃতবাজাব, ১১ই এপ্রিল, ১৮৯৩, কলকাতা
৩ তদেব, ১৪ই এপ্রিল, ১৮৯৩
৪. আনন্দবাজাব পত্রিকা, ১৯শে মে, ১৯৯০, জাতীয গ্রন্থাগাব, কলকাতা
৫. টি.ভি. বানেকেলস: ট্রান্সপোর্ট ইন ক্যালকাটা ইন মডার্ণ ট্রামওয়ে, জুলাই ১৯৭৭
৬. আনন্দবাজাব পত্রিকা, ১৯শে মাঘ ১৯৯০
৭. কলকাতা ট্রামওযেজ কোম্পানীব সিনিযব ইঞ্জিনিযাব এ.কে. বাগচিব সাক্ষাৎকাব
৮. বিপোর্ট অন পুলিশ এ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ বেঙ্গল, ১৯২৬; এ.ই.ও. সুলিভান, আই.জি., ১৯২৭, ক্যালকাটা
৯. বিমলকুমাব পাল: "কলিকাতা ট্রাম ও কবিব মৃত্যু" পুবশ্রী, তৃতীয বর্ষ, পঞ্চদশ সংকলন, অগ্রহাযণ ২৭, ১৩৮৭, পৃ. ৩৬০

বাংলার বনিক, ব্যবসায়ী ও বয়নশিল্পী: ১৮৬৬ সালের দুর্ভিক্ষের খণ্ডচিত্র

মৃণালকুমার বসু

ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের কাঠামোয় আধুনিক কালের রাষ্ট্রনীতি ও প্রজানীতির প্রতিফলন বাংলার ১৮৬৬ সালের দুর্ভিক্ষে লক্ষ্য করা যায়নি। শুধু তাই নয়, সবকারি স্তরে ব্যক্তিমালিকানা ও স্বাধীন ব্যবসায়িক তৎপরতার প্রতি অবিচল শ্রদ্ধা ও মমত্ববোধ কী ভাবে আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি করে তা বোঝার জন্য এই আলোচনা প্রয়োজনীয়।

দুর্ভিক্ষে সবচেযে ক্ষতিগ্রস্ত হয উড়িষ্যা। অন্যদিকে পূর্ব বাংলায় এর ছাপ পড়েনি। পশ্চিমবঙ্গে অনেকবেশি ক্ষতিগ্রস্ত হলেও সব. জেলা সমান প্রভাবিত হয়নি। খাদ্যশস্যের দাম ক্রমাগত বাড়ার ফলে যেসব এলাকায় শ্রমজীবী মানুষের আয় বাড়েনি সেখানেই দুর্ভিক্ষ সবচেয়ে ভয়াবহ রূপে দেখা দিযেছিল। অন্যদিকে খাদ্যশস্য ব্যবসায়ীদেব কাছে বিপুল লাভের অভূতপূর্ব সুযোগ এসেছিল। তবু সব ব্যবসায়ী সমান সুযোগ পায় নি। সরকারি শ্লথতার সঙ্গে তাল মিলিয়েছিল বেসরকারি উদ্যমহীণতা ও সীমাহীন লোভ। উড়িষ্যায় বহিরাগত বাঙালি জমিদার ও স্থানীয় চাষীর হাতে বাড়তি কাঁচা টাকা আমদানি হলেও তার চেয়ে অনেক বেশি মুনাফা লুঠেছিল আরো দক্ষিণের উদ্যমী তেলিঙ্গা কামতি ব্যবসায়ীরা। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের বিনিয়োগের ক্ষমতা ও উৎসাহ কোনওটাই ছিল না। তাই চাষীদের পড়তে হয়েছিল একদিকে জমিদার ও অন্যদিকে মুনাফা শিকারী ব্যবসায়ীদের মাঝে। এর ফলে নিজেদের এলাকায় সত্যিকারের সঙ্কট দেখা দিলে তা ঠেকাবার ক্ষমতা আমজনতার ছিল না, বিশেষত আয় বাঁধা ও পড়তির দিকে তাদের পক্ষে প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকার সম্ভাবনা ছিল কম। এধরনের শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে বয়নশিল্পে যুক্ত দেশীয় মানুষের অবস্থা ছিল সবচেয়ে অসহায়। শুধু উড়িষ্যায় নয় পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য তাঁতী অধ্যুষিত এলাকায় তাই নেমে এসেছিল উনিশ-শতকের সবচেয়ে মারাত্মক আঘাত। কি ধরনের সমস্যা দেখা গিয়েছিল তা বোঝার জন্য দু-একটা প্রাসঙ্গিক তথ্য খেয়াল করা দরকার। ১৮৫৯-৬০ সালে বালেশ্বর জেলা থেকে ৫,৩৬,৩৮২ মণ ধান ও চাল বাইরে রপ্তানি হল। ১৮৬৪-৬৫ সালে ব্যবসা বেড়ে দাঁড়াল ৮,০৫,৫৭৩ মণে। এর প্রভাব প্রতিবেশী এলাকায় এমনকি মেদিনীপুরেও পড়েছিল। তার পরে

রেলপথের অভাব, রাস্তাঘাটের বেহাল অবস্থা, দুর্বল ও লোভী ব্যবসায়ী গোষ্ঠী সমস্যাকে জটিলতর করে তুলেছিল।

দুর্ভিক্ষের সূত্রপাত হবার পরে ভারত সরকারের কিছু সদিচ্ছা থাকলেও বাংলা সরকার যথেষ্ট তৎপরতার সঙ্গে নৌকা ও ছোট জাহাজের সহায়তায় চাল পাঠানো হয়নি বলেই অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। তখন কলকাতা থেকে মেদিনীপুর পর্যন্ত মোটামুটি পাকা রাস্তা ছিল।[১] কিন্তু দাঁতন বা জঙ্গল-মহলে রাস্তা-ঘাটের অবস্থা উড়িষ্যার থেকে আলাদা নয়। এর ওপর ১৮৬৪ সালের ভয়াবহ ঝরের ক্ষতি চব্বিশ-পরগনা, নদীয়া ও অন্য এলাকা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। তাই ১৮৬৬ সালের দুর্ভিক্ষ জনজীবনকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছিল।

১৮৬৫ সালের গোড়ায় মেদিনীপুরের ঘাটাল এলাকায় টাকায় ৩১—৩২ সেরের বদলে ২৫সের চাল বিক্রি হচ্ছিল। কিন্তু ১৮৬৬ সাল পড়তেই চালের দর অসম্ভব দ্রুত গতিতে বাড়ল। মেদিনীপুরে তখন রাজনারায়ণ বসু প্রধান শিক্ষকের কাজ করছিলেন কিন্তু তাঁর আত্মচরিতে এসবের বর্ণনা নেই।

মেদিনীপুরে চালের দাম ১৮৬৬ সালে বর্ষার পর অভাবিত বেড়ে যায় যা কমে বছরের শেষে। নিচের তালিকা থেকে এর হিসেব পাওয়া যায়।[২]

সময়	এক টাকায় কত চাল পাওয়া যায়
জানুয়ারী ১৮৬৬	১২ ১/৪ সের
ফেব্রুয়ারি	১১ ”
মার্চ	১০ ৩/৫ ”
এপ্রিল	১০ ৩/৮ ”
মে	৯ ৩/১৬ ”
জুন	৮/ ১/১০ ”
জুলাই	৭ ৬/১০ ”
আগষ্ট	৬ ১/৪ ”
সেপ্টেম্বর	৭ ১/৪ ”
অক্টোবর	৯ ”
নভেম্বর	১৭ ১/৪ ”
ডিসেম্বর	২৪ ”

অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার ভারত সরকার বিভিন্ন প্রদেশকে যে ১৮৬৬-তেই সতর্কবানী উচ্চারণ করে সাহায্যের জন্য বলেন।

জেলাস্তরে সরকারি আমলারা জন সাধারণের দুর্গতি সম্পর্কে কী রকম ওয়াকিবহাল ছিল তা বোঝা যায় জেলা শাসকদের কাছ থেকে। ১২ লক্ষ অধিবাসী যুক্ত মেদিনীপুর জেলা শাসক হার্শেল সাহেব মে মাসে ময়ূরভঞ্জ গিয়েছিলেন। তবু দুর্ভিক্ষ বিষয়ে কোনও আলোচনা করেননি। বাংলার লেফটেনান্ট গভর্ণরের পাঠানো ৫,০০০, টাকায় লঙ্গরখানা খুলে খাবার দেবার ব্যবস্থা করা হয়। আসলে যেসব এলাকায় বা শহরে ক্ষয়িষ্ণু বন্দোবস্ত বলবৎ ছিল নতুন শিল্প ও সরকারি সাহায্য আসেনি সেখানেই দুর্গতির মাত্রা ছিল বেশি। বীরভূম জেলায় পুরনো রাজধানী নাগর নতুন শহর সিউড়ির তুলনায় বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। ঠিক তেমনি ইংরেজদের সামান্য দাক্ষিণ্যপুষ্ট বাঁকুড়ার অবস্থা পুরনো ঐতিহ্যবাহী বিষ্ণুপুর শহরের চেয়ে ভাল ছিল[৩]। তাই দুর্গতির প্রকোপ উড়িষ্যার চেয়ে কম হলেও ভয়াবহ ছিল।

বাঁকুড়ায় একদিকে পুরনো জমিদার পরিবারের পতন দুর্বল করেছিল সামন্ততান্ত্রিক বন্দোবস্তকে। বর্ধমানের রাজপরিবারের সাফল্য কায়েম করেছিল নতুন পত্তনী ব্যবস্থার। একই সঙ্গে ঐতিহ্যাশ্রয়ী বস্ত্র শিল্পের পক্ষে বিলিতি কাপড়ের সঙ্গে লড়াই করার ক্ষমতা ছিল'না। ফলে, ১৮৬৬ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের মোকাবিলা করা সহজ হয়নি। ম্যাজিস্ট্রেট ওয়েলস ফেব্রুয়ারি মাসে জিনিসপত্রের দাম অস্বাভাবিক হারে বাড়ার ও মজুরের অভাব লক্ষ্য করেন। অনাহারে মৃত্যু শুরু হলেও কলেরাকে দায়ী করার চেষ্টা করা হয়। এপ্রিল মাসে কিছু চাঁদা তোলা হলেও কাজ তেমন হয়নি। ওয়েলস চলে গেলে টাকার সাহেব এসে কলকাতা থেকে ৫০০০ টাকা পেয়ে খাদ্যশস্য কেনার বন্দোবস্ত করেন। কিন্তু স্থানীয় ব্যবসায়ীরা খাদ্য আমদানীতে সাহায্য করতে পারেনি বলে কলকাতা থেকে শস্য আনান। বড ব্যবসায়ী বা উদ্যমী ব্যবসায়ী গোষ্ঠীই ছিল না। ক্ষতিগ্রস্থ মানুষদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল তাঁতী যাদের জাতব্যবসা সস্তা বিলিতি কাপড়ের দাপটে কোন ঠাসা হয়ে গেছে। এসব তাঁতীরা শুধু বিষ্ণুপুরে নয়, মেদিনীপুর ও হুগলীতেও "বিষ্ণুপুরী তাঁতী" বলে পরিচিত ছিল।[৪] সরকারি তরফে ঔদাসীন্য, ব্যাপক খয়রাতি সাহায্যের অভাব একদিকে তাদের বাধ্য করল কুলধর্ম বিসর্জন দিতে অন্যদিকে শুরু হল জেলা ছেড়ে কলকাতা বা বর্ধমানের দিকে যাবার হিড়িক। বিষ্ণুপুরী তাঁতীরা কায়িক শ্রমের কাজ করতে রাজি ছিল যদিও হুগলীর তাঁতীরা ছিল না। সেপ্টেম্বর মাসে সরকারি তুলনায় বর্ধমানের মহারাজা অনেক ব্যাপক সাহায্য করে ভূখা মানুষদের বাঁচাবার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু উড়িষ্যা, মেদিনীপুর, হাওড়া ও হুগলীর তাঁতী অধ্যুষিত এলাকায় চাষীরা উলুবেড়িয়ার পথে কলকাতার দিকে যেতে শুরু করে। কলকাতার কর্তাব্যক্তিদের টনক নড়ে। ঘাটাল, চন্দ্রকোণা ও জাহানাবাদ এলাকার ভূখা মানুষ বিশেষত তাঁতীদের ঠেকাতে সরকার তৎপর

হয়ে ওঠে। সুবিধেজনক বলে উলুবেড়িয়ায় জনস্রোত ঠেকাবার ব্যবস্থা করা হয়। পাদ্রী পাইন সাহেব সাইকস সাহেবের সহযোগিতায় লঙ্গরখানা খোলেন। সেচ কাজের সঙ্গে যুক্ত স্কট সাহেব এর দায়িত্ব নেন। কিন্তু রাস্তার ধারে মৃত মানুষের সংখ্যা ১২৩৫জন বলা হলেও সরকারি তরফেই এ তথ্য নির্ভুল দাবি করা হয়নি।[৫] সরকারি কর্তাদের নজর এড়িয়ে অনেকেই কলকাতা চলে যেতে পেরেছিল বলে রাজধানীতে ভূখা মানুষের সংখ্যা দাঁড়াল ১৫০০০ থেকে ১৮০০০ জন।

রাজধানীতে ত্রাণকমিটির হাতে যথেষ্ট টাকা দেওয়া হল যদিও অন্যত্র তার সঠিক প্রয়োগ হয়েছিল বলা যায়না।

কলকাতা কমিটির টাকা ছিল	৬,০১,৮৬১
কলকাতায় খরচ হল	১,৬৫,৭৬৮
হগ সাহেবের কাছে খুচরো খরচের জন্য ছিল	৫০,০০০
অন্য খরচের জন্য ছিল	১০০,০০০
জেলায় ত্রাণের জন্য হাতে ছিল	২,৮০,৫৫০[৬]

জেলাশাসকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি তৎপর ছিলেন নদীয়া জেলাশাসক লর্ড ইউনিক ব্রাউন যিনি জেলার জন্য একলক্ষ টাকা চেয়েছিলেন। অন্যত্র এ ধরনের উৎসাহ কম ছিল। এর ওপরে খাদ্যশস্য বাইরে থেকে আমদানী করে কষ্ট লাঘব ও সহজবোধ্য লাভ করার চেষ্টা ব্যবসায়ীদের ছিল না বললেই চলে। আবার পণ্য পরিবহনের ব্যবস্থা কার্যত না থাকায় সংকট তীব্র হয়েছিল। মেদিনীপুরে রাস্তার ঝামেলায় বলদের পিঠে চালা পাঠাবার ব্যবস্থা করা হয়। এতে খরচের মাত্রা বাড়লেও কাজ খুব হয়নি। মুর্শিদাবাদের রায় ধনপৎ সিং-এর মত ব্যবসায়ী মেদিনীপুর বা বাঁকুড়ায় না থাকায় সমস্যা বেড়েছিল। ফলে, ত্রাণকার্যের বন্দোবস্ত হয়। উড়িষ্যার তিনটি জেলায় ৫৩,৭০৬ টাকার কাজের ব্যবস্থা করা হলেও মেদিনীপুর জেলায় ১০৫৬১, বর্ধমানে ২৭৪৩ টাকার ও নদীয়ায় ৯৪৩৫ টাকার কাজের বন্দোবস্ত করা হয়। তখন সরকার দীর্ঘমেয়াদী সমস্যার বিশেষত বড় রাস্তার সঙ্গে সংযোগকারী রাস্তার কথা ভাবেন। মেদিনীপুরের হিজলী ও তমলুক ১৮৬৪ সালের ঝড়ের ধাক্কা সামাল দিতে পারেনি তবু বাইরে চাল চলে যাচ্ছিল। এ সমস্যার প্রকৃতি প্রথম অনুভব করলেন নগুয়া পরগণার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। তিনি বিপদের মোকাবিলা করার জন্য মাসিক চাঁদা তোলার ব্যবস্থা করেন। অনুমান করা যেতে পারে এঁর নাম বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তমলুকের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও মেদিনীপুরের সরকারি আমলারা একই পন্থা নেন। মেদিনীপুরের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট ট্রেভর গ্র্যান্ট ও তাঁর স্ত্রী প্রথমে ৬০ জন দুঃস্থদের থাকার

ব্যবস্থা ও খাবারের ব্যবস্থা করেন মার্চ মাসে। এ জেলার সাবং এলাকায় চালের দাম আরো চড়া। জেলার সবচেয়ে বড় জমিদারী বিদেশি ওয়াটস কোম্পানির হাতে। তাঁরা কাজে হাত লাগান। জুন মাসের হিসেবে দেখা যায় সাহায্যপ্রার্থী ২৩৪২ জনের মধ্যে ২০৮৫ জন লোকই স্থানীয়। বোঝা যায়, বাইরের লোক আসেনি। জুলাই মাসে মেদিনীপুরে চালের দাম টাকায় ৬ $\frac{১}{২}$ সের আর জঙ্গলমহলের মত আদিবাসী এলাকায় টাকায় ৭সের। দাঁতন, কেশিয়াড়া, নগুয়া ও রোহিনীতে চাল পাঠাবার ব্যবস্থা হয়। মেদিনীপুর থেকে নারায়ণগড় পর্যন্ত চাল গাড়িতে নিয়ে গেলেও পরে বলদের পিঠে চাল পাঠানো হয়। কিন্তু এ বিপদের মধ্যে সম্পন্ন চাষীদের বা জমিদারদের হাতে কিছু চাল ছিল কেননা নভেম্বর মাসেও পুরনো চাল বিক্রির খবর পাওয়া যায়।[৭] মেদিনীপুরে প্রতিদিন দশহাজার লোক খাওয়াবার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু কাঁচা অবস্থায়, কেননা রান্নাখাবার খেতে লোকের আপত্তি ছিল। মাথা পিছু বয়স্ক লোক পেত ৪ ছটাক বা একপোয়া চাল, আর শিশুরা পেত ২ ছটাক। হার্শেল সাহেব এ মাপ ঠিক বলে মনে করলেও ওযাটসন কোম্পানির কর্তারা যাদের কাজ দিয়েছিলেন তাদের দিতেন ১২ ছটাক চাল ও ৪ ছটাক ডাল আর প্রতিদিন ২ বা ৩ পয়সা। ফলে, টেবী সাহেব সরকারি বন্দোবস্ত অপ্রতুল মনে করেন। সরকারি কর্তৃপক্ষ বিচক্ষণতার সঙ্গে ভেবেছিলেন ভূখা মানুষেরা শহরে ভিক্ষা করে বাকিটা পুষিয়ে নেবে। মেদিনীপুর কমিটি মনে করে আড়াই মাস ত্রাণের জন্য ২২৫০০ টাকা লাগবে। কিন্তু ত্রাণ প্রার্থীর সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে থাকে। মেদিনীপুরের চেয়ে পাঁশকুড়ার অবস্থা অনেক ভাল। তবু ব্যবসায়ীরা লুঠের ভয়ে চাল আনতে উৎসাহী নয়। খুন, ডাকাতি, লুঠ বাড়ছিল। মেদিনীপুর জেলে ৬০০ বন্দীর থাকার কথা হলেও ছিল ৮৪৬ জন। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হেমচন্দ্র করকে দাঁতনে গিয়ে ত্রাণ দেবার জন্য বলা হয়। নগুয়াতেও ত্রাণ শিবির খোলা হয়। জেলার বিভিন্ন জায়গায় নভেম্বর মাসে চালের দাম কি রকম ছিল তা নীচের সারণি থেকে বোঝা যাবে।

গোপীবল্লভপুরে টাকায়	৯ সের
দাঁতনে ”	১১ সের
কেশিয়াড়ায় ”	১৬ সের
আর মেদিনীপুরে ”	১১ থেকে ১৪ সের।

সুবিধের জন্য চালের বদলে সরকার লঙ্গরখানা খোলার ব্যবস্থা করলে আপত্তি ওঠে। তাদের দিয়ে কাজ করাবার ব্যবস্থা করা ছিল শক্ত কেননা বেশিরভাগই ছিল বাচ্চা অথবা বুড়ো। বাকিরা কলকাতার দিকে চলে গিয়েছিল। সেপ্টেম্বর

মাসে জাহাজে করে ডায়মণ্ডহারবারে চাল এলে কয়লাঘাট (আধুনিক কোলাঘাটের এটিই আসল নাম) দিয়ে মেদিনীপুরের দিকে চাল পাঠাবার ব্যবস্থা হলেও আমজনতার তাতে সুবিধে হয়নি।

বাঁকুড়া জেলায় মার্চ মাসে কালেক্টর এক সভা ডেকে অবস্থার পর্যালোচনা করেন। স্থানীয় মানুষেরা ব্যবসাদারদের বিরুদ্ধে কথা বলেন। সরকারি তরফে ব্যবসাদারদের বাইরে থেকে চাল আমদানী করার কথা বলা হলে একজন ছাড়া কেউ এ প্রস্তাবে রাজি হয়নি। অথচ কলকাতা থেকে সহজেই টাকায় দশ সের দরে চাল নিয়ে আসা হয়। বিষ্ণুপুর শহরে ১৫০৬ টাকা চাঁদা দেবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও ৫০৬ টাকা চাঁদা ওঠে। সে টাকাও বছরের শেষে খরচ হয়নি।[৮] জজ টাকার সাহেব সরকারি ৫০০০ টাকা পেয়ে কলকাতা থেকে চাল আনার ব্যবস্থা করেন। ম্যাকিলপ স্টুয়ার্ট এণ্ড কোম্পানী ও গিলাণ্ডার্স আরবুথনট কোম্পানী পরিবহনের টাকা না নিয়ে চাল পাঠান। পূর্বরেল কর্তৃপক্ষ অর্ধেক ভাড়ায় রাণীগঞ্জ পর্যন্ত চাল পৌঁছে দেন।

বাঁকুড়ায় চালের দর ছিল—

জুন মাসে টাকায় ৭ $\frac{১}{২}$ সের, জুলাই মাসে ৬ $\frac{১}{২}$ সের ও আগষ্ট মাসে ৬ সের, সেপ্টেম্বরে ৫ $\frac{১}{২}$ অক্টোবরে বেড়ে দাঁড়ায় ১৫ $\frac{১}{২}$ সেরে।

তাই বর্ধমানের বিভাগীয় কমিশনার বাঁকুড়ার জন্য দিলেন ১০,০০০ টাকা, বিষ্ণুপুরের জন্য ২০০০ এবং রানীগঞ্জের জন্য ২০০০ টাকা

দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার কথাও ভাবা হল। গন্ধেশ্বরী নদীতে পুল করার কথা ভাবা হল আর রাধানগর ও বিষ্ণুপুরের মধ্যে রেল যোগাযোগের মাধ্যমে দ্রুত পরিবহন ব্যবস্থার কথা চিন্তা করা হল, কাজ কিছু হয়নি। বিষ্ণুপুরের দুহাজার লোককে সাহায্য দেবার ব্যবস্থা হয়। বাঁকুড়ার পুলিশ কর্তার যুবক সন্তান দু মাসের জন্য বিষ্ণুপুরে স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করেন। পুলিশের ইন্সপেক্টার বগলানন্দ মুখার্জী প্রশংসনীয় সাহায্য করেন। উদার সাহায্য দেন স্থানীয় নাগরিক গদাধর বন্দোপাধ্যায় ও রাধাবল্লভ সিং।

অবস্থা সঙ্গীন দেখে বেশির ভাগ দুঃস্থ মানুষ বর্ধমানে চলে যায়। বর্ধমানের মহারাজা প্রতিদিন ছ হাজার লোক খাওয়াবার ব্যবস্থা করেন ও তিন হাজার লোকের কাজের ব্যবস্থা করেন। পাদ্রী নীল সাহেব মেমারীর কাছে ঈশাপুরে দড়ি ও ঝুড়ি বোনার কেন্দ্র খুলে সাহায্যের ব্যবস্থা করেন। অক্টোবরে বর্ধমান মহারাজার অন্নছত্রে লোক কমে গেলেও ডেম্পিয়ারসাহেব একহাজার লোককে প্রতিপালিত হতে দেখেন। বর্ধমানের বন্যা কষ্ট আরো বাড়িয়ে দেয় বিশেষত দামোদর নদের ডান দিকে যেখানে বাঁধ নেই, তাই ত্রাণ শিবির খোলা হয়

রায়না ও খণ্ডঘোষে। রাযনার অনাবাসী জমিদার. চকদীঘির সারদাপ্রসাদ রায় যথেষ্ট সাহায্য করেন। খণ্ডঘোষ ও ঈশাপুরে সাহায্য দেওয়া হত তিনপাই করে যা প্রয়োজনের তুলনায় খুব কম। অন্যদিকে বুদবুদ চটিতে সরকারি ম্যাজিস্ট্রেট ক্লার্ক সাহেব নিজের খরচে দৈনিক ৬০ থেকে ১০০ জনের খাবার ব্যবস্থা করেন। তেমনি মানকর গ্রামে হীরালাল মিশ্র ৩০০ থেকে ৪০০ জনের খাবার ব্যবস্থা করেন।

হুগলীর অবস্থা অনেক জটিল ছিল। জাহানাবাদ (আধুনিক আরামবাগ) দিয়ে প্রতিদিন আগনিত লোক কলকাতার দিকে যেতে শুরু করলে উদ্বিগ্ন প্রশাসন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র জানান যে ২৫০০ জন পুরুষ লোক ও ১১৭০ জন স্ত্রীলোক একেবারে মৃতকল্প। শিবনারাযণ রায় নিজের খরচে ত্রাণের ব্যবস্থা করলে ব্যাপক সরকারি ত্রাণ শুরু হয়। বিভিন্ন কেন্দ্রে চাঁদা তোলার ব্যবস্থা করে লোকদের সাহায্য দেওয়া হয়।

স্থান	চাঁদার পরিমাণ	প্রতিদিন কতজন
চন্দ্রকোণা	২১৩৪ টাকা	৫০০
রামজীবনপুর	২২৫০ ,,	৫০০
শ্যামবাজার	১০০০ ,,	২৫০
ক্ষীবপাই	১৯৮৯ ,,	৫০০

সবগুলোই পুরনো বয়নশিল্পের এলাকা যেখানে ব্যবসা খুব কমে গেছে। ত্রাণের ব্যবস্থা হয়েছে বলে ঘাটালে ও অন্যত্র দূর থেকে এত বেশি লোক হাজির হন যে ওয়াটসন কোম্পানির টার্নবুল সাহেব রান্নাকরা খাবার দেবার ব্যবস্থা করেন। তবু অবস্থা সামাল দেওয়া শক্ত হবে বলে নৌকা ভাড়া করে ২৩৫ জন স্ত্রীলোক ও ১৪৯জন শিশুকে কলকাতায় পাঠানো হয়। কিন্তু এ সিদ্ধান্ত সকলের মনঃপূত ছিল না। জাহানাবাদে ভিড় করা দুর্গত মানুষেরা বেশির ভাগই তাঁতী। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ঈশানচন্দ্র মিত্র শুধু ত্রাণের জন্য নিযুক্ত হন। হুগলির কালেকটার জাহানাবাদের তাঁতীদের চূড়ান্ত দুর্গতির কথা শুধু জানতেন তাই নয় তার কারণ সম্পর্কেও অবহিত ছিলেন। বিলিতি কাপড়ের আমদানীর ফলে তাঁতীদের দুর্গতির স্বরূপ বোঝা যায় ক্রমবর্ধন বিলিতি কাপড়ের ব্যবসার কথা মনে রাখলে। ১৮৬৪ সালে দেশি কাপড় বিক্রি হয় ৭৬৫,০০০ টাকার কিন্তু ১৮৬৫-৬৬ সালে বিক্রি কমে দাঁড়ায় ৬২৫,৮১২। অন্যদিকে বিদেশি কাপড়ের বিক্রি অভাবিত রকম বাড়ে। ১৮৬৪-৬৫তে ৪৮,৬৪৮ গুলো কাপড় বিক্রি হয়। পরের বছর বিক্রি বেড়ে দাঁড়ায় ৫৭,৩৭১টিতে। অথচ খাদ্যশস্যের দাম বাড়ে। তাই, দুর্ভিক্ষের শুরুতেই পরিবারের হাত ধরে তারা রাস্তায় নামে।

হুগলীর জেলাশাসক হিসেব করে দেখান যে ৫০০০ থেকে ৬০০০ জন লোক কলকাতার দিকে চলে গেছে। কলকাতার ত্রাণ কর্তৃপক্ষ এ ধরনের লোককে নৌকায় ফেরৎ পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। তাঁতী অধ্যুষিত হুগলির অধিকাংশ এলাকা ছিল উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত। সেজন্য সরকারি সিদ্ধান্ত তাঁকেও জানানো হল। এই ভূখা মানুষদের ঘাটাল পাঠানো হল বেনারস রোড মেরামত করার কাজে। কিন্তু তাঁতীরা এ ধরনের কাজ করতে অস্বীকার করে, তারা কলকাতায় পালিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল[৯]। জাহিনাবাদের আটটি কেন্দ্রে প্রতিদিন ৫৬৯৪ জনের খাবার ব্যবস্থা করা হয়। রাস্তা তৈরির বরাদ্দ অর্থ বেশির ভাগ খরচ হয়নি। জাহানাবাদে আর একটি রাস্তা তৈরির জন্যও তিন হাজার টাকা খরচ করা হয়। রাস্তা তৈরিতে হাত না লাগালে সরকারি কর্তারা তাঁতকেন্দ্র খোলেন কিন্তু সেখানে মাথা পিছু আয়ের পরিমাণ ছিল এত কম যে একবেলার খাবার কেনাও সম্ভব ছিল না। বিরক্ত সরকার সিদ্ধান্ত করলেন যে তাঁতীদের চাষের কাজে যোগ দেওয়া উচিত। জমি জোগাড় কবা সহজ কাজ নয় তাই সরকার তাদের ইঁট তৈরির কাজে অথবা চাকরের কাজে নেমে পড়তে পরামর্শ দিলেন। বিলিতি কাপড়ের সঙ্গে দেশি তাঁতের লড়াই নিরর্থক বলে সরকার সুনিশ্চিত ছিলেন বলে তাদের অন্য পেশায় যুক্ত হতে পরামর্শ দিয়ে কর্তব্য পালন করলেন। অন্যদিকে সুদূর নাগপুরে কমিশনার দুর্গত চাষীকে সেখানে জমি দেবার ব্যবস্থা করলে জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সরকারকে জানান যে, চাষীরা চাষ করে এত লাভ করছে যে তারা অতদূরে যাবেনা। অন্যদিকে গরীব তাঁতীরা এত উৎসাহহীন হয়ে পড়ছে যে তারা সেখানে যেতে অগ্রহী নয়।[১০]

সরকার শুধু অত্যল্প সাহায্য দিতেই ক্ষান্ত থাকেনি তারা সহৃদয় দেশি মানুষদের বিশেষত হিন্দুদের আর্ত মানুষদের প্রতি উদারতাকে সুনজরে দেখেনি। সাহেব কর্তৃপক্ষ এর মধ্যে কুঁড়েমিকে প্রশয় দেওয়ার মানসিকতা খুঁজে পেয়ে ভর্ৎসনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে হুগলি জেলায় বেসরকারি ত্রাণকাজে যুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরে কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। দুঃখে কাতর বিদ্যাসাগর লেফটেনান্ট গভর্ণরের কাছে অভিযোগ করেন যে জাহানাবাদের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট কালেক্টরেটের .ছে বেশি টাকা চাইতে সাহস করেন না। সরকার এ ধরনের সমালোচনায় আপত্তি করে ৭ই সেপ্টেম্বর ১৮৬৬ সালের চিঠিতে জানান যে, অর্থিক ব্যাপারে চিন্তা না করে আপনি প্রয়োজনীয় অর্থের জন্য দাবি জানান। অন্যদিকে হুগলীর ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ করতে গিয়ে জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় অভিযোগ করেন যে, হুগলির ১০,০০০ লোক অথবা শতকরা ২ ভাগ দুর্ভিক্ষে মারা গেছে। সরকার এ তথ্য অস্বীকারও করেনি বা মেনেও নেয়নি। বেসরকারি

মানুষদের মধ্যে জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, জাড়ার শিবনারায়ণ রায়, শ্যামগঞ্জের মাধবলাল খান, বৈচীর বিহারীলাল মুখোপাধ্যায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর দুর্ভিক্ষপীড়িতদের সেবায় উদার সাহায্য দেন। চুঁচুড়া শহরে সাহায্য দেবার ব্যাপারে জীবনকৃষ্ণ পাল, শিবচন্দ্র দাস ও দুর্গাচরণ লাহা (কলকাতার বিখ্যাত ধনী যাঁদের আদি বাড়ি চুঁচুড়া) খুবই উল্লেখযোগ্য। এসব এলাকা ছাড়া পাণ্ডুয়ার মত তাঁতী অধুষিত এলাকা ও মহানাদ-এ ত্রাণশিবির খোলা হয়।

এ সব ত্রাণ শিবিরে বা লঙ্গরখানায় সকলেই ত্রাণ পাবার জন্য উপযুক্ত ছিল না। চুঁচুড়া পুরসভার কুলীরা কাজে ফাঁকি দিয়ে ত্রাণ শিবিরের খাবার খাচ্ছিল জানা যায়। এদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল কিছু চাষী।[১১] পাণ্ডুয়ায় ইংরেজেরা লক্ষ্য করেছিলেন যে সেখানের বেশ্যারা এমনকি কিছু পরিবারের গরীব আত্মীয়রা দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের খাবারে ভাগ বসাচ্ছে। এর থেকে সামগ্রিক ভাবে সরকারি বন্দোবস্তের অপ্রতুলতা ও দূরদৃষ্টির অভাবের ছবিটা বদলে যায়না। বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর ও নদীয়ায় ছোট ছোট ব্যবসায়ীরা নির্লোভ এ কথা বলা যায় না কিন্তু তারা যে দুর্বল ছোট ব্যবসাদার তা বেশ বোঝা যায়। পুরনো ব্যবস্থা ও ব্যবসা ভেঙ্গে যাবার ফলে কৃষ্ণনগরের পাশে নদী দিয়ে চাল নিয়ে যাওয়া হয় কিন্তু বিক্রি হয় না যদিও শহবে খুবই অভাব। একেবারে পাশাপাশি জায়গায় চালের দামের প্রচুর তফাৎ তবুও চাল আনার ব্যবসায়ী উদ্যম নেই। কুষ্টিয়াতে চালের দাম ২ টাকা ৪ আনা ৩ পাই আর কৃষ্ণনগরে মন প্রতি ৩ টাকা ৪ আনা। মনপ্রতি ৪ আনা মাত্র আনার খরচ ছিল। কিন্তু ব্যবসায়ীরা তবু কৃষ্ণনগরে চালের দাম বাড়িয়ে রাখতেই ব্যস্ত ছিল। সে ইচ্ছা সর্বত্রই ছিল। সরকার ক্ষতিগ্রস্ত তাঁতীদের জাত ব্যবসা ছেড়ে মজুর হবার উপদেশ দিয়েই ক্ষান্ত হননি, পুরনো শ্রমের কাঠামো ভেঙ্গে দেওয়াই যথেষ্ট। অবশ্য ক্ষিদের জ্বালায় সবাই যে জাতব্যবসা আঁকড়ে রাখতে পেরেছে তা নয়। বাঁকুড়ার পুলিশ কর্তা জানান যে, অনেক হতভাগ্য কাছাড় ও আসামের চা বাগানে কাজের লোভে চলে গেছে।[১২] সরকার দীর্ঘমেয়াদী চমৎকার পরিকল্পনা করলেও কাজে লাগাননি কিন্তু রোড সেস চালু করে কষ্ট বাড়াবার ব্যাপারে যথেষ্ট ব্যগ্রতা দেখান।

সরকারী নানা ব্যাখ্যা সত্ত্বেও ভারত সচিব ভাইকাউন্ট ক্রেনবোর্ন সিদ্ধান্ত করেন যে সরকার পরিস্থিতি বিচারে ব্যর্থ হয়ে ছিলেন। শুধু তাই নয়, ৯ই অক্টোবর ১৮৬৬-এর চিঠিতে বলেন যে পরপর অজন্মা ও বাইরের ব্যবসায়ীদের চড়া দামে চাল বিক্রি করার জন্য দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল কিন্তু আসল কারণ ছিল অন্য। তাঁর মতে সরকারের বড় ভুল হয়েছিল 'Political Economy-কে অভাবিত গুরুত্ব দিয়ে ব্যবসায় স্বাধীনতা বা মুনাফা করার স্বাধীনতার চেয়ে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ ছিল প্রজার স্বাস্থ্য ও জীবন। মুনাফা কেন্দ্রিক আর্থিক

নীতির জয় দীর্ঘায়িত করেছিল দুর্ভিক্ষ। তবু, বিভিন্ন বেসরকারি কিছু মানুষের অসাধারণ উদ্যম ছিল খুবই প্রশংসনীয় হলেও বাংলার তাঁতীদের দুর্ভাগ্য নিরসনের কোনও সম্ভাবনাই ছিল না।

সূত্র নির্দেশ

১. অ্যানুয়াল রিপোর্ট অন দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অব বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি, ১৮৬০-৬১, পৃ. ২৫৮
২. রিপোর্ট অব দ্য কমিশনার্স অ্যাপয়েন্টেড টু এনকোয়ার ইন টু দ্য ফেমিন ইন বেঙ্গল এ্যাণ্ড ওড়িশা, ১৮৬৬, পৃ. ১০৭
৩. সুকুমার সিংহ ও হিমাদ্রি বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্ট লেটার্স ইসুড ১৮০২ ১৮৬৯, কলকাতা ১৯৮৯, পৃ. ৬৯,৭৬
৪. রিপোর্ট..... ইনটু দ্য ফেমিন, পৃ. ১১০
৫. ঐ, পৃ. ১১৩
৬. ঐ, পৃ. ১১৭
৭. ঐ, পৃ. ২৮৯
৮. ঐ, পৃ. ৩০৯
৯. ঐ, পৃ. ৩২৮
১০. ঐ, পৃ. ৩৩১
১১. ঐ, পৃ. ৬৩২
১২. ঐ, ১২৭ নং সাক্ষ্য

উনিশ শতকের বাঙালী পর্যটকদের চোখে পাশ্চাত্ত্য নারী ও গৃহধর্ম

সীমন্তী সেন

উনিশ শতকে ঔপনিবেশিকতার বাতাবরণে বাংলাদেশে যে 'আধুনিকতা'র প্রকল্প সূচিত হয়েছিল তাতে 'নারীমুক্তি'র প্রসঙ্গ ছিল কেন্দ্রীয়—এই বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। বর্তমানকালে ভারতীয় নারী সংক্রান্ত গবেষণায় বাঙালী মধ্যবিত্ত নারীপ্রসঙ্গ বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। উনিশ শতকের সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক ডিসকোর্সের একটি প্রভাবশালী বিষয়ে হিসেবে ঐতিহাসিকরা বাঙালী 'ভদ্রলোকে'র অনুরূপ বাঙালী 'ভদ্রমহিলা' কিংবা 'নোতুন নারী'র সূত্রায়ণকে তুলে ধরছেন। তৎকালীন সাহিত্যাশ্রিত গবেষণায় (চ্যাটার্জী ১৯৯০, সরকার ১৯৮৭, বর্থ উইক ১৯৮৪ প্রমুখ) বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে বিশ্লেষিত হচ্ছে 'নোতুন নারী'র এক নোতুন পিতৃতন্ত্রে অধীনতার প্রসঙ্গ। পাশ্চাত্যের স্বনির্মিত ভাবমূর্তির প্রভাবকে তৃণগ্রাহ্য করে যেহেতু ঔপনিবেশিকতা প্রসূত প্রায় কোন মতাদর্শেরই বিশ্লেষণই সম্ভব নয় সেহেতু 'নোতুন নারী'র আলোচনাতেও বারবার এসে পড়ছে ভিক্টোরীয় মর‍্যালিটি এবং তৎসম্পৃক্ত গৃহধর্মের বিষয়। এই সূত্রেই বর্তমান আলোচনার উপস্থাপনা।

উনিশ শতকের গোড়া থেকেই 'আধুনিকতা'র পাঠ গ্রহণে শিক্ষিত বাঙালী ইউরোপ যাত্রা করেছেন। কিন্তু ওই শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে, জাতীয়তাবাদী মতাদর্শের সূচনার প্রেক্ষিতে এই প্রবণতা এক বিশেষ সামাজিক প্রয়োজনীয়তা লাভ করে। পাশ্চাত্যের প্রগতি, আধুনিকতা এবং গণতন্ত্র সম্পর্কে সম্যক ধারণা সম্ভব একমাত্র বিদেশ ভ্রমণ করলেই এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা প্রসূত জ্ঞানই হতে পারে দুই সভ্যতার আপেক্ষিক গুণাগুণ বিচারের প্রকৃত মাপকাঠি—এই বক্তব্য বিভিন্নভাবে উপস্থাপিত হয়েছে সমসাময়িক কালের বহু রচনায়। এবং এই অনুপ্রেরণাতেই প্রকাশিত হয়েছে ভ্রমণবৃত্তান্তে। বর্তমান প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য হল এই ভ্রমণবৃত্তান্তের পর্যালোচনার মাধ্যমে তৎকালীন 'ভদ্রমহিলা' ও গৃহধর্ম ভাবনার মূল্যায়ণ।

কৃষ্ণভাবিনীদাস তাঁর 'ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা'[১] গ্রন্থে পাঠকদের জানান যে ইংল্যাণ্ডে মেয়েদের দেখে এযাবৎকাল ধরে ভারতবাসী 'মেমসাহেব'রা তার মনে সমগ্র ইংরাজ নারী জাতি সম্পর্কে যে বিরূপতার সঞ্চার করেছিল তা দূর হয়েছে। এদের ধৈর্য, কর্মক্ষমতা ও বুদ্ধিমত্তায় তিনি মুগ্ধ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে কৃষ্ণভাবিনীর উদ্দিষ্ট কিন্তু কেবল ইংরাজ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মেয়েরাই। তৎকালীন বাঙালী পর্যটকদের অনুসন্ধিৎসার

ক্ষেত্র থেকে ঠিক যতখানি বহির্ভূত ছিল অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণীর মেয়েরা, ঠিক ততখানিই ছিল উচ্চশ্রেণীর 'আধুনিক'রা। এর প্রমাণ মেলে কখনো তাদের নীরবতায় কখনো বা তাদের সরব প্রত্যাখানে।

একটি বিষয়ে সমস্ত পর্যটকরাই একমত ছিলেন যে ধৈর্য, কর্মক্ষমতা, বুদ্ধিমত্তা প্রভৃতি গুণ হল শিক্ষার আশীর্বাদ। ১৮৭০-এ 'লণ্ডন সোসাইটিতে কেশব সেন ইংরাজ মহিলাদের কাছে যে আবেদন জানান তাতে এই শিক্ষার একটি পরিস্কার রূপরেখা পাওয়া সম্ভব—

"At the present moment a thousand Hindu houses are open to receive & welcome English governessess—well trained accomplished English ladies capable of doing good to their Indian sisters, both by instruction & by personal example. And what sort of education do we expect & wish from you? An unsectarian, liberal, social, useful education that will not be subservient or subordinated to views of any community, an education, free & liberal & comprehensive in character, an education calculated to make Indian women good wives, mothers, sisters & daughters."[২]

সহজেই অনুমান করা যায় যে কেশবের ইঙ্গিত এই উদার, সামাজিক ও ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা, লিঙ্গ নিরপেক্ষ ছিল না। উপযুক্ত স্ত্রী, মাতা, ভগিনী এবং কন্যা হয়ে ওঠার জন্য নারীর যে সঠিক শিক্ষার প্রয়োজন তা হবে বিশিষ্ট এবং 'নারীস্বভাবে'র উন্নতিসাধক। অন্যত্র কেশব স্পষ্টতই নারী ও পুরুষ শিক্ষার বিভাজিত পরিসরের ধারণাকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। শিক্ষার এই বিভাজন কিন্তু সব পর্যটক সমানভাবে গ্রহণযোগ্য মনে করেননি। কৃষ্ণভাবিনীর মধ্যেই আমরা এর বিরোধিতা দেখতে পাই। তিনি জানান যে লণ্ডনে উপাধিধারী পুরুষের মতোই উপাধিধারী নারীর সংখ্যা কম নয়। নারীরা পুরুষের সঙ্গে শিক্ষার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পিছিয়ে নেই। এবং সামাজিক প্রতিবন্ধকতার বিচারে অসম অবস্থান থেকে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা তার উৎকৃষ্ট বুদ্ধিমত্তারই পরিচয়। সে শিক্ষায় সাম্যের দাবী তুললেও তা কিন্তু নারী পুরুষের সামাজিক ভূমিকার বিভাজন পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে নি। ফলত নারীর বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে আস্থাবান কৃষ্ণভাবিনীর পাঠকদের নিশ্চিত করবার প্রয়োজন হয় যে শিক্ষার সামাজিক ভূমিকা লঙ্ঘনের হেতু হতে পারে এ ভীতি অমূলক :

"আমাদের দেশের অনেক লোকে এ দেশের অধিকাংশ স্ত্রীলোককে অসচ্চরিত্র বলিয়া ভাবেন। তাহার কারণ ইহারা পথে, ঘাটে ও বাগানে স্বাধীনভাবে বেড়ায় এবং পুরুষদের দেখিয়া ঘোমটা টানিয়া অবনতমুখী হয় না। এখানে আসিলে

তাহাদের এ ভ্রম দূর. হইয়া যাইবে। ইংরাজ মহিলার যদি ধর্মভয় না থাকিত, তাহা হইলে ইংল্যাণ্ডের উন্নতি ও গৌরব হইত না এবং ইংরাজরা অন্যান্য সভ্যজাতির আদৃত বা সম্মানিত হইত না। কেবল অসভ্য ও বন্যজাতিই সতীত্বের আদর বা গৌরব জানে না, সভ্য ও উন্নত জাতিরাই সতীত্বকে স্ত্রী লোকের প্রধান বলিয়া স্বীকার করে। এখানে যে বিপথগামী নারী নাই তাহা নয়; কিন্তু সচ্চরিত্রের ভাগ অনেক বেশী....”[৩]

স্পষ্টতই যে পিতৃতান্ত্রিক অনুশাসনের সুর ধ্বনিত হয় কেশবের বক্তব্যে তার অনুরণনই শুনি আমরা কৃষ্ণভাবিনীর কণ্ঠে। নতুন শিক্ষার বলে বলীয়ান ‘স্বাধীন’ নারী যে কেবল সামাজিক বিধি লঙ্ঘন করবে না তাই নয়, নবলব্ধ শিক্ষার ফলে তারা তাদের নির্ধারিত ভূমিকা আরও সুচারুরূপে পালন করতে সক্ষম হবে — এই বক্তব্যকে নতুন করে তুলে ধরবার দায় ছিল পর্যটকদের। ত্রৈলোক্যনাথের ইংরাজ নারীর গুণ বর্ণনা এই রকমই এক প্রচেষ্টা—

“ In England wives take upon themselves far greater responsibility than they do here. The husband there only earns money & does all heavy work, all details are taken care of by the wife. She manages the household, looks after the family property, does the marketing, keeps the accounts, cleans the house, cooks the food, looks after washing, tightens loose buttons, keeps a vigilant eyes on the health of the family...In brief, an English wife is a helpmate of her husband in the strictest sense of the term.”[৪]

ত্রৈলোক্যনাথের বক্তব্যে পরিস্ফুট হয় একটি ভিক্টোরীয় লিঙ্গীয় ছাঁচ। এ প্রসঙ্গে মনে আসে ‘Daughters of England’ (১৮৪৫) গ্রন্থে ইংরেজ স্ত্রীদের প্রতি Sarah Ellis-এর নির্দেশ—

“husband is he who goes out day by day in all weathers to toil with business & endure its cares ...showing such loving care & faith in her, that the wife should strain every nerve to be worth of that care...to fulfil the holy & beautiful task that her Greater assigned to her to be the helpmeet of man & the highest, the most loving & the most responsible of positions that her nature contains.”[৫]

শিক্ষিত, জাগরিত এবং পরিশীলিত নারীর জন্য তৈরি হল না কোন নতুন সামাজিক পরিসর। তার গৃহকেন্দ্রিক ভূমিকাই রয়ে গেল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু পুরাণ গৃহ ও গৃহধর্মের পরিসরে নতুন নারীর উপস্থাপনা সম্ভব ছিল না। ফলত প্রয়োজন হল গৃহ ও গৃহধর্মের নতুন ব্যাখ্যা। এ ক্ষেত্রেও বাঙালী

পর্যটকরা তাঁদের আদর্শকে আবিষ্কার করলেন ইংরেজ মধ্যবিত্ত গৃহজীবনে। কৃষ্ণভাবিনীর আলোচনায় পাশ্চাত্য ও বাঙালী গৃহধর্মের তফাৎ আমরা জানতে পারি—

"এ দেশের দাম্পত্যজীবন আমাদের দেশের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন বলিলেই হয়। এখানে স্বামীর কর্মের সময় ছাড়া দুইজনে একসঙ্গে থাকে, খায়, বেড়ায় এবং লেখাপড়া, সংসার ধর্ম— এমনকি সমস্ত সংসার জগৎ সম্বন্ধে নানা প্রকার আলাপ করে। লোকে বিবাহ করে কেন? সকলেই—স্বদেশীয, বিদেশীয় সমস্বরে উত্তর দিবেন, পৃথিবীতে জীবনের একজন সমদুঃখভাগিনী, সহধর্মিনী, সহকারিণী, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই। স্ত্রী পুরুষ সমভাবে সুখদুঃখ ভোগ করেন, একসঙ্গে ঈশ্বরের উপাসনা করেন....

আমাদের দেশের দম্পতীর জীবন কি কষ্টকর তাহা বুঝিতে না পারিলে মনে ভয়ঙ্কর বিষাদ উপস্থিত হয়। অবরুদ্ধ স্ত্রী, স্বামী কি প্রকার সমস্ত দিন কাটান তাহা জানে না, এবং স্ত্রী কিরূপে কালযাপন করেন তাহাও স্বামী জানেন না। বাবুদের নামে বাড়ির গৃহিণীরা ভয় পান। বাবুরা সুন্দর সাজানো বৈঠকখানায় বসিয়া হুঁকা টানেন, তাস পেটেন কিম্বা ইয়ারবর্গের সহিত গল্প আমোদ করেন ও বেড়াইতে যান,.....স্ত্রী স্বামীকে ভালোবাসেন, তিনি কি প্রকারে ভাল খাইবেন ও সুখ স্বাচ্ছন্দে থাকিবেন তাহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন, কিন্তু স্বামী তাহার প্রতি যথার্থ ব্যবহার করে না ......স্ত্রী পুরুষে যথার্থ কি সম্পর্ক তা আমাদের দেশে অতি অল্প লোকেই বোঝে।"[৬]

এই বিষাদ ধ্বনি কিন্তু কেবল নারীকণ্ঠস্বরেই ব্যঞ্জিত নয়, তৎকালীন পুরুষকণ্ঠ স্পষ্টতই প্রতিবাদী। রবীন্দ্রনাথের 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্রে' আমরা পড়ি—

"পুরুষেরা বাইরের সমস্ত আমোদ প্রমোদে লিপ্ত রয়েছে আর মেয়েরা তাদের নিজস্ব সম্পত্তি একটি পোষা প্রাণীর মত অন্তঃপুরের দেয়ালে শৃঙ্খলে বাঁধা আছে। একদল বুদ্ধিমান বিবেচনা বিশিষ্ট জীবকে শত শত শতাব্দী হতে নির্দয় লোকাচারের শাসন পীড়ন দমন বন্ধন করে পোষা জন্তুর চেয়ে নির্জীব বশীভূত সঙ্কুচিত সংকীর্ণ মন করে তোলা হয়েছে, সে একবার ভালো করে কল্পনা করে দেখতে গেলে সর্বাঙ্গ শিউরে ওঠে। ....মেয়েদের সমাজ থেকে নির্বাসিত করে দিয়ে আমরা কতটা সুখ ও উন্নতি থেকে বঞ্চিত হই তা বিলেতের সমাজে এলে বোঝা যায়।"[৭]

কেবল দেশজ নির্দয়তা নয়, 'বিলেতের সমাজে'র উদারতার ছবিও রবীন্দ্রনাথ তুলে ধরেন পাঠকের সামনে।

"দেখা যাচ্ছে, এখানে পুরুষদের প্রতি মেয়েরা অনেকটা দূর পর্যন্ত রূঢ়াচরণ করতে পারেন। তাতে ততটা সামাজিক নিন্দার কারণ হতে হয় না। ভেবে দেখতে গেলে ইংরাজ সমাজের স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে উচ্চনীচ ভেদ আছে বলেই এটা সম্ভব হতে পেরেছে। যেমন বালকের কাছ থেকে উপদ্রব অনেক সময়ে

আমোদজনক লীলার মতো মনে হয, স্ত্রীলোকদের অত্যাচারের প্রতিও পুরুষেরা সেইরকম স্নেহময় উপেক্ষা প্রদর্শন করে, এবং অনেক সময় সেটা ভালবাসে।"[৮]

ভিক্টোরীয় কেতাবী নীতি নৈতিকতার পাতা উল্টোলে আমরা জানতে পাই যে সেই স্বামীই যথার্থ স্বামী "who treats his wife with delicacy as women, with tenderness as friend, he attributes her follies to her weakness, her imprudence to her inadvertancy; he passes them over, therfore, with good nature, & pardons them with indulgence All his care & indsustry are employed to her welfare, & all his strength, & power are exerted for her support & protection "[৯]

রবীন্দ্রনাথেব ভারতীয নারীর উপর সামাজিক শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্পষ্টতই, নাবীর স্বতন্ত্র স্বাধীন সত্তার স্বীকৃতির ভিত্তিতে পরিস্থাপিত নয়। সমগ্র নারী জাগবণেব প্রশ্নটি বিদ্ধৃত হয ভিক্টোরীয পিতৃতান্ত্রিক মতাদর্শের পরিসীমার মধ্যে। নারী-পুরুষেব সামাজিক বিনিময়ের প্রশ্নে যেমন উত্তর জোগায় ভিক্টোরীয় পিতৃতান্ত্রিক আর্দশ, ঠিক তেমনই ঈপ্সিত গৃহজীবনের সন্ধান মেলে পাশ্চাত্য মধ্যবিত্ত গার্হস্থ্য জীবনে।

"বিলিতি বাঙালিরা সে দেশে ফিরে গিযে খুঁৎ খুঁৎ করেন ও বলেন আমাদের দেশে 'home' নেই, বিলেতেই যথার্থ 'home' আছে, তাঁরা বোধ হয় তার এই অর্থ করেন যে—বিলাতের পরিবারে একটা স্বাধীন উচ্ছ্বাসের ভাব আছে। বাপ মা ভাই বোন স্ত্রী পুত্র মিলে হাসি গল্প গানে অগ্নিকুণ্ডের চার ধার উচ্ছাসময করে তোলে। সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর বাড়িতে এক ঘরে শ্বশুর তাঁর দুই চারটি বৃদ্ধ বন্ধু জুটিয়ে তামাক খেতে খেতে এখানকার ছেলেপিলেদের অশাস্ত্রীয ব্যবহারে কলির দ্রুত উন্নতির আশঙ্কা করছেন, আর এক ঘরে বউ সাত হাত ঘোমটা টেনে তাঁর শাশুড়ির কাছ থেকে নীরবে দৈনিক তিরস্কার সেবন করছেন, আর এক ঘরে স্বামী তাঁর দুই একটি যুবা বন্ধু জুটিয়ে নিন্দালাপ করছেন—এরকম চিত্র এখানকার কেউ কল্পনা করতে পারে না।"[১০]

এখানে আমরা দুটি বিপরীতধর্মী গৃহজীবনের মডেল দেখতে পাই—একদিকে পাশ্চাত্যের 'home sweet home' এর আদর্শ, অন্যদিকে সনাতন হিন্দুগৃহস্থালীর নারীর অবরুদ্ধতা, স্বামী-স্ত্রীর দূরত্ব এবং শ্বশুর শাশুড়ির অনুশাসনের। উনিশ শতকের দিকে ফিরে তাকালে রবীন্দ্রনাথের পক্ষপাতকে আমাদের বোঝা সম্ভব। পাশ্চাত্যের 'আলোকপ্রাপ্ত' 'আধুনিক মনস্ক', সমাজ জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন উনিশ শতাব্দীর বাঙালীর কাছে বহির্জগৎ স্বপ্রতিষ্ঠার অনুকূল ক্ষেত্র ছিল না। সেখানে ছিল ঔপনিবেশিক শাসনের প্রাত্যহিক প্রতিকূলতা। ফলত বহির্জগতের প্রতিবন্ধকতা গৃহকেই করে তুলেছিল একমাত্র অবলম্বনের কেন্দ্র। কিন্তু সনাতন হিন্দু গৃহ

কাঠামো বহির্জগতের প্রতিকল্প হিসেবে আর গ্রহণযোগ্য ছিল না। নতুন সামাজিক সহযোগিতার ধারণা, নবলব্ধ আদর্শ ও বিশ্বাসের আধার হয়ে উঠতে গেলে প্রয়োজন ছিল সনাতন গৃহের ও তার কেন্দ্রে নারীর আমূল পরিমার্জনা। এই দুটি সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের আপাতত উত্তর মিলেছিল পাশ্চাত্য মধ্যবিত্ত গৃহজীবনে ও সেই গৃহকাঠামোর অভ্যন্তরে নারীর ভূমিকায়।

ভিক্টোরীয় নারী ও গৃহজীবনের মডেলের সরাসরি প্রভাব মেনে নিলেও, কেবল পাশ্চাত্য আদর্শের নির্বিশেষ আত্মীকরণ হিসেবে দেখলে উনিশ শতকীয় দেশজ 'নারী ও গৃহ' ভাবনার জটিল স্তর বিন্যাসের কিন্তু যথার্থ মূল্যায়ণ সম্ভব নয়। তৎকালীন বাঙালী বুদ্ধিজীবী যেমন একদিকে অনুপ্রাণিত ছিলেন পাশ্চাত্য প্রগতি ও আধুনিকতার আদর্শে, অন্য দিকে তেমনভাবেই তাঁর চেতনা জুড়ে ছিল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার বৈপরীত্য বোধ ও দেশজ স্বপ্রতিষ্ঠার দায়। এর ফলে স্বাভাবিকভাবেই নারী ও গৃহ চিন্তার কোন অমিশ্র একমাত্রিক ছাঁচ গড়ে উঠতে পারেনি। এবং এক অর্থে ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে 'নারী ও গৃহ' যেহেতু ছিল জাতীয় স্বপ্রতিষ্ঠাব অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রতীকী ক্ষেত্র, সেহেতু এ প্রসঙ্গে পাশ্চাত্য ভাবধারার থেকে দূরত্ব বজায় রাখার দায়ও ছিল দুর্নিবার। ফলত বিস্তৃতভাবে পাশ্চাত্য আদর্শ মেনে নিয়েও, বাস্তব পাশ্চাত্য জীবনে নারীর অবস্থান ও গৃহধর্মে পর্যটকরা যখন ত্রুটি খুঁজে পান তা আশ্চর্যের বিষয় হয় না। সর্বপ্রথম চোখে পড়ে তাদের 'ফ্যাশান' সম্পর্কে বক্রোক্তি। পর্যটকদের মতে পাশ্চাত্য সভ্যতা কেবল পোষাকের ক্ষেত্রেই 'ফ্যাশানের' দাসত্ব (ত্রৈলোক্যনাথের ভাষায় tyrannical sway) করে না, প্রাত্যহিক আচার ব্যবহারেও এর দৌরাত্ম্য প্রবল। সামাজিক লৌকিকতার বিদ্রুপাত্মক বর্ণনা আমরা পড়ি গিরিশচন্দ্র বসুর 'বিলাতের পত্র'তে — "আমাদের দেশের নিমন্ত্রণ খাওয়ার প্রথা এ দেশের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমাদের দেশের প্রথা নিজ পরিবারের মধ্যেই হউক আর পরের বাড়ির সামাজিক নিমন্ত্রণেই হউক, পুরুষদের খাওয়া হইলে তবে স্ত্রীলোকের খাওয়া হইয়া থাকে.....কিন্তু এদেশের নিয়ম কি রূপ মনে কর? সব উল্টা। মনে কর, এখানে যদি কেহ সন্ধ্যার পর ৮টা মেয়ে এবং ৬টা পুরুষকে নিমন্ত্রণ করিল.....তাহা হইলে সেই ১৪টা নরনারী আসিয়া প্রথমে একত্রে গান করিবেন, পিয়ানো বাজাইবেন, সাধুভাষায়, সাধুভাবে রসিকতা করিবেন......

এইরূপে আমোদ প্রমোদের পর ক্ষুধার উদ্রেক হইতে লাগিল। তখন বাটীর যিনি চাকরানী তিনি চা, দুধ, চিনি, পিঠে, মদ ইত্যাদি আনিয়া দিয়া গেলেন।.....মেয়েরা সব নিজের নিজের চৌকিতে গিয়া বসিলেন। তখন পুরুষগণের মধ্যে মহা হুলস্থুল পড়িয়া গেল, কেহ চায়ের পিয়ালা, কেহ পিঠার রেকাব, কেহ বিস্কুট-এর থালি, কেহ মদের গেলাস লইয়া রমনীগণের কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন...

will you please have it...মেয়েদের যখন চর্বচোষ্যলেহ্যপেয়রূপে আকণ্ঠ আহার হইল, তখন তোমার আমার খাইবার অবসর উপস্থিত....।"[১১]

সাধারণভাবে নারী পুরুষের সহজ সামাজিক বিনিময়ের সমর্থক গিরিশচন্দ্রের কাছে পাশ্চাত্য লৌকিকতায় নারী পুরুষের এই ভূমিকার পরিবর্তন অস্বাভাবিক ফলত অসামাজিক হিসেবে দেখা দিয়েছে। এর বিপরীতে ভারতীয় সহজ সামাজিকতার ইঙ্গিত লেখক করেছেন। প্রায় সমস্ত ভ্রমণ বৃত্তান্তেই তথকথিত 'polite behaviour' এর বাহুল্য সম্পর্কে আমরা পর্যটকদের বক্রোক্তি দেখতে পাই। কিন্তু তাঁদের মতে সব থেকে সমস্যাসঙ্কুল হ'ল পাশ্চাত্য বিবাহ প্রথা। কৃষ্ণভাবিনীর রচনায় বিবাহযোগ্যা মেয়েদের উপযুক্ত স্বামীর জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতার যে বর্ণনা পাই, বিবেকানন্দর তির্যক লেখনীতে তাই হয়ে ওঠে সরস—

"ছোঁড়া ব্যাটাবা ইয়ার্কী দিতে বড়ই মজবুত— ধরা দেবার বেলায় পগারপার। ছুঁড়িরা নেচেকুঁদে একটা স্বামী জোগাড় করে ছোঁড়া ব্যাটবা ফাঁদে পা দিতে নারাজ। এইবকম কবতে কবতে একটা love হয়ে পড়ে পড়ে, তখন সাদী হয়।"[১২]

এই ভাবতীয বিচ্ছিন্ন সমালোচনার সামগ্রিক সূত্রাযণ আমরা দেখতে পাই ববীন্দ্রনাথের দ্বিতীযবার বিলাত ভ্রমণের পর রচিত পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারিতে। প্রথম যৌবনের মুগ্ধতা হারিযে পরিণত রবীন্দ্রনাথ এবার সমগ্র নারী মুক্তি ও গৃহধর্মের প্রশ্নটি উপস্থিত করেন। তাঁর দুই সভ্যতার বিপরীতধর্মী গতিপ্রকৃতির বিশ্লেষণেব প্রেক্ষিতে। এখানে আমরা দুটি বিপরীতগামী সভ্যতার মডেল পাই—একদিকে, ধ্যানমগ্ন, শান্তিপূর্ণ, স্থিতধী প্রাচ্য, অন্যদিকে প্রবল, দ্বন্দ্বপূর্ণ, অশান্ত পাশ্চাত্য। এই পটভূমিতে নারীপ্রশ্ন এক সম্পূর্ণ ভিন্ন আলোয় ধরা পড়ে।

"স্ত্রীলোক সমাজের কেন্দ্রানুগ (Centri petal) শক্তি, সভ্যতার কেন্দ্রাতিগ শক্তি সমাজকে বহির্মুখে যে পরিমাণ বিক্ষিপ্ত করে দিচ্ছে, কেন্দ্রানুগ শক্তি অন্তরের দিকে সে পরিমাণ আকর্ষণ করে আনতে পারছে না। পুরুষেরা দেশে বিদেশে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। অভাববৃদ্ধির সঙ্গে নিয়ত জীবিকা সংগ্রামে নিযুক্ত হয়ে রয়েছে।...স্ত্রীলোকের রাজত্ব ক্রমশ উজার হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। কুমারী পাত্রের অপেক্ষায় বসে থাকে, স্বামী কার্যোপলক্ষে চলে যায়, পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হলে পর হয়ে পড়ে। প্রখর জীবিকা সংগ্রামে স্ত্রীলোকদেরও একাকিনী যোগ দেওয়া আবশ্যক হয়েছে অথচ তাদের চিরকালের শিক্ষা, স্বভাব এবং সমাজ নিয়ম তার প্রতিকূলতা করছে। য়ুরোপে স্ত্রীলোক পুরুষের সঙ্গে সমান-অধিকার প্রাপ্তির যে চেষ্টা করছে সমাজের এই সামঞ্জস্য নাশই তার কারণ বলে বোধ হয়।"[১৩]

যে আদর্শবোধ ইউরোপ সূত্রে প্রাপ্ত, ইওরোপের বাস্তবতাই আজ সেই আদর্শকে ক্ষুণ্ন করছে। ভিক্টোরীয় বিভাজিত পরিসরের তত্ত্ব যেখানে স্ত্রী পুরুষের ভূমিকা

হয়ে একে অপরের পরিপূরক, তা আজ টলায়মান। নারীপুরুষের সমানাধিকারের দাবি লেখকের কাছে কেবল সামাজিক সামঞ্জস্য নাশেরই সঙ্কেত সূচক নয়, তা নারী স্বভাব ও সহজাত প্রবৃত্তির বিচ্যুতি। তুলনায় ভারতীয় বাস্তবতা অনেক বেশি আশাব্যঞ্জক—

"আমরা তো দেখতে পাই আমাদের দেশের মেয়েরা তাঁদের সুগোল কোমল দুটি বাহুতে দুগাছি বালা পরে সিঁথের মাঝখানটিকে সিঁদুরের রেখা কেটে সদা প্রসন্নমুখে স্নেহপ্রেম কল্যাণে আমাদের গৃহ মধুর করে রেখেছেন।... আমাদের গৃহলক্ষ্মীদের নিয়ে আমরা তো বেশ সুখে আছি এবং তাঁরা যে বড়ো অসুখী আছেন এমনতরো আমাদের কাছে তো কখনো প্রকাশ করেননি, মাঝের থেকে সহস্র ক্রোশ দূরে লোকের অনর্থক হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যায় কেন"[১৪]

রবীন্দ্রনাথের চোখে ইউরোপের তুলনায় ভারতীয় বাস্তবতা নারীর সহজাত ভূমিকা পালনের পক্ষে অনেক বেশি অনুকূল। এখানে 'বাহির' ও 'অন্দরের' বিভাজনের অক্ষুণ্ণতা নারীকে তার নির্ভরতার আশ্রয় থেকে বিচ্যুত করেনি। ফলত সে 'গৃহলক্ষ্মী' হিসেবে তার স্বরূপে প্রকাশিত। কিন্তু এর মানে ইউরোপীয় বাস্তব থেকে সর্বোতভাবে সরে আসা নয়। 'গৃহলক্ষ্মী'র যথার্থ 'সঙ্গিনী' হয়ে ওঠারও প্রয়োজন আছে। তাই আমরা রবীন্দ্রনাথের একই রচনায় পড়ি—

"...বর্তমান কালে যাঁরা বলেন 'আমরা আর্যশাস্ত্রের মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে বাহিরের শিক্ষা হতে আপনাকে রক্ষা করবার জন্য আপাদমস্তক আচ্ছন্ন করে বসে থাকব।' কিম্বা যাঁরা বলেন 'হঠাৎ শিক্ষার বলে আমরা আতশবাজির মতো এক মুহূর্তে ভারত ভূতল পরিত্যাগ করে সুদূর উন্নতির জ্যোতিষ্কলোকে গিয়ে হাজির হব; তাঁরা উভয়ই অনাবশ্যক কল্পনা নিয়ে অতিরিক্ত বুদ্ধি কৌশল প্রয়োগ করছেন। কিন্তু সহজবুদ্ধিতে স্বভাবতই মনে হয় যে ভারতবর্ষ থেকে শিকড় উৎপাটন করেও আমরা বাঁচব না এবং যে ইংরাজি শিক্ষা আমাদের চতুর্দিকে নানা আকারে বর্ষিত ও প্রবাহিত হচ্ছে তাও আমাদের শিরোধার্য করে নিতেই হবে।...তা ছাড়া এটাও স্মরণ রাখা কর্তব্য এই যে নূতন বর্ষার বারিধারা এতে আমাদের সেই প্রাচীনভূমির মধ্যেই নবজীবন সঞ্চার করছে।"[১৫]

উনিশ শতকের পরিসমাপ্তির মুখে দেশজ জাতীয়তাবাদী ডিসকোর্স 'নারী ও গৃহ' সম্পর্কে এক বিশেষ মনোভঙ্গি গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। পর্যটকদের রচনা অনুসরণ করলে আমরা স্পষ্টতই দেখতে পাই দেশজ 'নারী ও গৃহ' ভাবনার উপর পাশ্চাত্য আদর্শের সরাসরি প্রভাব। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে উপরোক্ত বিষয় যেহেতু ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে স্ব-প্রতিষ্ঠার অন্যতম ক্ষেত্র ছিল সেহেতু প্রতি পদক্ষেপে তার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা ছিল অবশ্য কর্তব্য। ফলত 'ভদ্রমহিলা' স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছে একাধিক স্তরে পৃথকীকরণের ভিত্তিতে। এক দিকে বর্জিত হয়েছে দেশজ সনাতনী বা পুরাতনীর ধারণা অন্যদিকে তার সুস্পষ্ট দূরত্ব তৈরি

হযেছে অপবিশীলিত, অশিক্ষিত নিচুস্তবেব মেযে থেকে। আরেকদিকে সে পৃথক থেকেছে তথাকথিক 'মেমসাহেব' বা 'বিবি'র থেকে।[১৬] কিন্তু মনে রাখতে হবে যে এই সমস্ত উপাদানের বর্জন 'ভদ্রমহিলার'ব কোন একমাত্রিক সংজ্ঞার দিশা দেযনি। 'ভাবতীয নারী' জাতীয চিন্তায সবসময়ই থেকে গেছে বিতর্কিত বিষয়। তাই কখনো সে সঙ্গিনী, কখনো শান্তিব প্রতিমূর্তি গৃহলক্ষ্মী, কখনো বা তেজস্বিনী ববাভয দুর্গা, কখনো বা বিধ্বংসী কালী। কিন্তু সৃজনশীলতার ভিত্তিতে যে সাধাবণ উপাদানগুলো ছিল সেগুলোব সর্বজন গ্রাহ্যতা সম্পর্ক উনিশ শতকের শেষ ভাগে বিশেষ কোন তর্কেব অবকাশ ছিল না। এই ভিত্তি প্রস্তব নির্মাণেব পর্যাযক্রম কতকটা বোঝা সম্ভব ভ্রমণবৃত্তান্তেব মাধ্যমে কারণ পাশ্চাত্যের সঙ্গে লেনদেনেব দলিল হিসেবে এগুলোব গুরুত্ব প্রশ্নতীত।

সূত্র নির্দেশ

১. কৃষ্ণভাবিনী দাস ইংলন্ডে-বঙ্গমহিলা'' (কলকাতা, শ্রীসত্যপ্রসাদ সর্বাধিকাবী দ্বাবা প্রকাশিত, ১৮৮৫)

২. W H Beveridge "India Called them" (London, 1947 p 84) মালবিকা কার্লেকাব বচিত "Voices from within " এ (Delhi, OUP, 1993) পৃষ্ঠা ৮৪তে উদ্ধৃত।

৩. কৃষ্ণভাবিনী দাস 'ইংলন্ডে বঙ্গমহিলা পৃষ্ঠা ১৫৩.

৪. ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, "A visit to England", (কোলকাতা, মুদ্রক ও প্রকাশক, অবণোদয় বায়, ১৯০২), পৃষ্ঠা ১৫৮

৫. Herbert Tingsten 'Victoria & the Victorians', (London, George Allen & Unwin Ltd 1972), পৃষ্ঠা ৪৮.

৬. কৃষ্ণভাবিনী দাস 'ইংলন্ডে বঙ্গমহিলা' পৃষ্ঠা ১৮৩-৪

৭. ববীন্দ্রনাথ ঠাকুব 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র'' (রবীন্দ্ররচনাবলী ১ম খন্ড, কোলকাতা, বিশ্বভাবতী প্রকাশনা ১৯৮৬) পৃষ্ঠা ২৮২

৮. ববীন্দ্রনাথ ঠাকুব—'পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি' পৃষ্ঠা ৪০৩

৯. Herbert Tingsten 'Victoria & the victorians, পৃষ্ঠা—২১

১০. ববীন্দ্রনাথ ঠাকুব—'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র'' পৃষ্ঠা ৩১০.

১১. গিবিশচন্দ্র বসু—বিলাতের পত্র (প্রথম ভাগ) (কোলকাতা, মুদ্রক ও প্রকাশক—শ্রীবিহারীলাল সরকার ১৮৮৭) পৃষ্ঠা ৪৫

১২. বিবেকানন্দ—'শিবের ভূত' (শ্রী তপন বায়চৌধুবী বচিত 'Europe Reconsidered' গ্রন্থে Delhi, OUP, 1988), ৩০১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

১৩. ববীন্দ্রনাথ ঠাকুব 'য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারি' পৃষ্ঠা ৩৬৭

১৪. তদেব পৃষ্ঠা ৩৬৮

১৫. তদেব পৃষ্ঠা ৩৯৪-৫

১৬. দ্রষ্টব্য—পার্থ চট্টোপাধ্যায়—'Nationalist Resolution of women's Qusetion' (Recasting Indian Women, ed. Sangari and Vaid, Delhi, 1989)

জাতীয়তাবাদ ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আলোকে দুটি অনন্য চরিত্র

বিষাণকুমার গুপ্ত

হিন্দু-মুসলমানেব সাম্প্রদাযিকতার সমস্যাটি প্রায ১১৮ বছব ধরে ভারতেব জাতীয জীবনকে ভারাক্রান্ত করে রেখেছে। দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশ ভাগ তার চূড়ান্ত পরিণতি। কিন্তু সমস্যার সমাধান তাতে হযনি। হযত বা বৃদ্ধি পেযেছে। নতুন কাযদায আজও এই সমস্যা সমগ্র উপমহাদেশে ভয়ঙ্করভাবেই তার অস্তিত্ব বজায রেখেছে।

এই সমস্যার গতি-প্রকৃতি নিযে নানা গবেষণা ও চিন্তাভাবনা এবং সমস্যা সমাধানেব নানা ফর্মূলা দেওযা হচ্ছে। ঘিতর্কের শেষ নাই। আলোচনা, গবেষণা ও বিতর্কের মধ্য দিযে আগামী দিনে অনেক নতুন তথ্য উদ্‌ঘাটিত হবে। আলোচ্য প্রবন্ধের অবতারণা তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা নয। এই প্রবন্ধেব প্রতিপাদ্য বিষয হল প্রাক-স্বাধীনতা যুগে ঐ ভযঙ্কর সাম্প্রদাযিকতার বিরুদ্ধে এবং সমস্যা সমাধানের জন্য বাংলার দুই বিশিষ্ট ব্যক্তির বলিষ্ঠ ভূমিকাকে উপস্থাপিত করা— যারা নিষ্ঠাবান মুসলমান হিসাবেই মনে কবতেন যে ইসলাম ও জাতীয়তাবাদের কোন পরস্পর বিরোধিতা নাই। জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার মধ্য দিযেই তারা একথা বুঝেছিলেন এবং বুঝেছিলেন বলেই জাতীয়তাবাদ ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির স্বার্থে দীর্ঘ সংগ্রাম চালিয়েছিলেন। আজ যখন ভারত মুসলমান সম্প্রদায়ের ভূমিকা নিয়ে অনেকে নানা অমূলক প্রশ্ন তুলেছেন ও উত্তেজনা সৃষ্টির চেষ্টা করছেন তখন এই দুজন বিশিষ্ট মুসলিম জন নেতার সংগ্রাম ও জীবনাদর্শের মূল্যায়ন যথেষ্ট প্রয়োজন ও প্রাসঙ্গিক। ব্যক্তিদ্বয় হলেন মুর্শিদাবাদ জেলার শেষ স্বীকৃত নবাব ওয়াসিফ আলী মির্জা (১৮৭৪-১৯৫৯) এবং জেলারই বিশিষ্ট জননেতা ও ব্যবহারজীবী মৌলভী আব্দুস সামাদ। অবিভক্ত বাংলার রাজনৈতিক ও সমাজ জীবনে এদের ভূমিকা, গুরুত্ব ও প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। সে কারণে তারা স্মরণীয় ও অনন্য।

মহম্মদ আলী জিন্নার সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে প্রতিহত করে দ্বিজাতিতত্ত্বের বিরুদ্ধে একই ভারতীয় জাতীয়তাবোধ বিকশিত করার জন্য ইসলামের মূল নীতিকে আশ্রয় করে বাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হক ১৯৪২ সালের ২০শে

জুন কলকাতার টাউন হলে Hindu-Muslim Unity Conference আয়োজন করার অনেক আগেই মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর ওয়াসিফ আলী মির্জা একই উদ্দেশ্যে ১৯৩৭ সালে মুর্শিদাবাদ জেলাতেই Hindu-Muslim Unity Association গঠন করেন।[১] ঐ Association-এর মাধ্যমে ১৯৩৮ সালে মুর্শিদাবাদ শহরের ঐতিহাসিক হাজারদুয়ারীর প্রশস্ত প্রাঙ্গণে ১০ হাজার হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য সমাবেশ সংগঠিত করেন। দুদিন ব্যাপী ঐ সম্মেলনে ফজলুল হক, তুলসী গোস্বামী, সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য নবাব বাহাদুরের নেতৃত্বে আহুত ঐ সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক ছিলেন জেলার অপর এক বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব রায়বাহাদুর সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ নেহালিয়া। সমাবেশে বিপুল সংখ্যক হিন্দু-মুসলমান শ্রমজীবী মানুষ উপস্থিত হন।[২]

মুসলিম লীগ অবশ্যই নবাব বাহাদুরের ঐ ঐক্য প্রচেষ্টার তীব্র বিরোধিতা করেছিল। ফলতঃ সম্প্রীতি সমাবেশের মধ্য দিয়ে যে মহতী প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল তা ব্যর্থ হল। কারণ ১৯৩৭-১৯৪১ বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ফজলুল হক কর্তৃক দ্বিতীয়বার মন্ত্রীসভা গঠিত হবার পর বাংলাদেশে অনেকেই Hindu-Muslim Unity Association-এর প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভব করেছিলেন।[৩]

১৯৪২ সালের ২০শে জুন কলকাতার টাউন হলে অনুষ্ঠিত হয় Hindu-Muslim Unity Conference। ফজলুল হকের সাথে একাত্ম হয়ে নবাব বাহাদুর সভাপতির ভাষণে বললেন, "জাতীয় জীবনের ঐ সঙ্কটজনক মুহূর্তে সকল শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষকে একতাবদ্ধ হয়ে এক নবজীবনের ভিত্তি স্থাপনে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। তিনি হিন্দু ও মুসলমানদের পৃথক অস্তিত্বে কোন গুরুত্ব আরোপ করতে রাজি নন। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন যে এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের সাহায্য ছাড়া কিছুতেই অগ্রসর হতে পারবে না। তাদের শুধু নিজেদের ধর্মের কথা ভাবলেই চলবে না, গোটা জাতির কল্যাণের জন্যও দায়িত্ব পালন করতে হবে। তিনি আশা করেছিলেন যে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যে বিশ্বাসী ব্যক্তিরা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের আদর্শ বিকাশে কর্মরত হবার প্রয়োজনীয়তার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করবেন।"[৪]

তাঁর ভাষণে নবাব বাহাদুর বলেন, "ভারতের সমৃদ্ধি ও জনসাধারণের কল্যাণ সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করছে সকলের স্বার্থে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য প্রতিষ্ঠা করে সহযোগিতার নীতিতে আস্থাবান হওয়ার উপরে। সুদীর্ঘকাল এই দুটি সম্প্রদায় সহোদরার মত পাশাপাশি বাস করছে। তাই আজ ভারতের রাজনীতির এক গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে তাদের উদ্যোগী হয়ে বিভেদের যে প্রাচীর পরস্পরকে খানিকটা আলাদা করেছে তা ভেঙে ফেলতে হবে এবং মিলনের সেতু গড়ে তুলতে

হবে। একতাই ধ্রুবতারার মত তাদের পথ আলোকিত করে পরস্পরের হাত ধরে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে এবং বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে তাদের জীবনকে আনন্দময় করে তুলবে।"[৫]

নবাব ওয়াসিফ আলী সেই সকল নেতৃবৃন্দের সমালোচনা করেন, যারা একদলকে অপর দলের বিরুদ্ধে লাগাচ্ছেন এবং প্রতিনিয়ত বিভেদের বীজ বপন করে চলেছেন। ভারতের মাটিতে তাকেই প্রকৃত নাগরিক বলা চলে যিনি দেশাত্মবোধের দ্বারা পরিচালিত হয়ে সাম্প্রদায়িক মৈত্রী বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর।[৬]

সম্মেলনের উদ্বোধন করে ফজলুল হক বলেছিলেন, "যারা ইসলামের মূল নীতি অনুসরণ করে অন্য সম্প্রদায়ের অধিবাসীদের সাথে শান্তিতে বসবাস করতে চান সেইসব মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করতে পেরে তিনি গর্বিত। একজন প্রকৃত মুসলমানকে তাব প্রতিবেশীর প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন হতেই হবে। প্রয়োজন হলে একই মাতৃভূমির মঙ্গলের জন্য একসাথে প্রাণ বিসর্জন দিতে হবে। যারা মুসলমানদের বোঝাচ্ছেন যে মুসলিম সমাজের মুক্তি অর্জিত হবে বিভেদ এবং অনৈক্যে, ঐক্যে নয়. তাদের চালাকি সাধারণ মুসলমানরা বুঝতে পেরেছিলেন। কারণ ইসলামের শিক্ষা শান্তি প্রতিষ্ঠার পক্ষে সহায়ক।"[৭] নিঃসন্দেহে দেশের সেই সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে নবাব বাহাদুর ও ফজলুল হকের ঐ বক্তব্য মুসলীম লীগ নেতৃত্বের অপপ্রচার ও ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে তীব্র চ্যালেঞ্জ জানাতে সক্ষম হয়েছিলেন। সম্মেলনের অন্যান্য বক্তাগণ হলেন, ঢাকার নবাব হবিবুল্লাহ বাহাদুর, তুলসী গোস্বামী, সৈয়দ বদরুদ্দোজা, এন.সি. চ্যাটার্জ্জী, এ.কে.এম. জ্যাকেরিয়া, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, নৌশের আলী, ডঃ নলিনাক্ষ সান্যাল প্রমুখ। সম্মেলন থেকেই Council of Hindu-Muslim Unity Association নামে একটি স্থায়ী অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠন করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। একটি স্কীমও তৈরি হয় এবং ফজলুল হক Communal Harmony খাতে বাজেটে ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা মঞ্জুর করেন। এই বাবদ প্রথমেই বাংলাদেশ সরকার ১৬ হাজার টাকা মঞ্জুর করেন। এই পরিকল্পনা Modest Scheme নামে পরিচিত।[৮]

নবাব ওয়াসিফ আলী মুসলিম লীগের পাকিস্তান প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেছেন এবং সে কারণে ফজলুল হকের মত তিনিও মনে করতেন যে পাকিস্তান সম্পর্কে অসত্য ধারণা সৃষ্টি করে বাংলার মুসলমানদের প্রতারিত করা হয়েছে। একথা তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন বলেই ১৯৪৬ সালের বীভৎস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পটভূমিতে দাঁড়িয়ে তিনি তার প্রিয় মুর্শিদাবাদ জেলাবাসীদের উদ্দেশ্যে আবেদন জানিয়ে বলেছিলেন—

"আজ আমি মুর্শিদাবাদবাসী হিন্দু-মুসলমানগণকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি যে তাহারা সর্বধর্ম নিষিদ্ধ পরস্পরকে ভীতি প্রদর্শন হইতে সর্বদা বিরত থাকিবেন। ঘৃণ্য ও দুষ্টবুদ্ধি প্রণোদিত উত্তেজনায় অযথা উত্তেজিত হইয়া শান্তি শৃঙ্খলা বিসর্জন দিয়া কদাচ কেহ যেন কোনরূপ হিংসাত্মক নৃশংস কর্মের দ্বারা নিজেকে বা নিজ সম্প্রদায়কে কলুষিত না করেন; পরন্তু তাহারা সকলেই যেন পরস্পর পরস্পরের প্রতি আন্তরিকভাবে আস্থাপন্ন থাকিয়া ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে সুদৃঢ় রাখেন। ইহাই আমার পুণ্যস্মৃতি পূতচরিত্র মহীয়ান পূর্ব পুরুষগণের চিরাচরিত শান্তি ও শৃঙ্খলার সহিত জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে প্রজাপালনের জীবন্ত আদর্শ। আমি তাহাদিগকে আমার আন্তরিক নির্দেশ জানাইতেছি যে উভয় সম্প্রদায় প্রকৃত একতার সূত্রে আবদ্ধ হইয়া বাংলার তথা ভারতের অবশ্যম্ভাবী কল্যাণের পথে অগ্রসর হউন।"[৯]

দ্বিখণ্ডিত বাংলা কোন দিনই ওয়াসিফ আলী চাননি। কিন্তু বাস্তবে যখন ঘটে গেল তা তিনি মেনে নিয়েছিলেন এবং সেই খণ্ডিত ভারতের স্বাধীনতাকেই আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছেন। দীর্ঘ ২০০ বছরের বিদেশী শাসনের অবসানে ঐ স্বাধীনতা লাভের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়ে বিবৃতি দেন। ঐ বিবৃতিতেই তিনি নিজেকে প্রথমেই একজন ভারতীয় হিসাবে মনে করে পরে অন্য পরিচয় দেওয়াটাকেই সর্বস্তরের ভারতীয নিগমের একান্ত কর্তব্য হওয়া উচিত বলে মনে করতেন। সে কারণে সাম্প্রদায়িকতার ঘৃণ্য আবর্ত, যা ভারতবাসীকে বহু মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার সম্মুখীন করেছে বারংবার, তা থেকে দূরে সরে থাকতে আবেদন জানিয়ে বলেন যে স্বাধীনতার পরও পুনরায় সে সমস্যা দেখা দিলে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধভাবেই তা প্রতিরোধ করতে হবে।[১০]

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হল এই যে তিনি যখন এই অসাধারণ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছেন, তার পুত্র কাসেম আলী মির্জা মুর্শিদাবাদ জেলার মুসলিম লীগের একজন বিশিষ্ট নেতা ও বিধায়ক হিসাবে সমগ্র জেলা তথা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়ানোর কাজে ব্যস্ত। কাসেম আলী মুর্শিদাবাদ জেলার পাকিস্তানভূক্তির দাবিতে সোচ্চার ছিলেন। ফলত ১৯৪৭ সালের ১৮ই আগস্ট মুর্শিদাবাদ জেলা ভারতভুক্ত হলে তিনি তা বানচাল করার জন্য জঘন্য ষড়যন্ত্র শুরু করেছিলেন। নতুন করে মুর্শিদাবাদ, মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর প্রভৃতি জেলার মুসলিম লীগ নেতৃত্বের সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে শসস্ত্র মুসলিম অভ্যুত্থান ঘটানোর প্রচেষ্টাও চালান। এমনকি এজন্য অর্থ সংগ্রহ ও অস্ত্রসংগ্রহ করাও শুরু হয়েছিল। সমগ্র জেলা ব্যাপী হিন্দুদের সার্বিক বয়কট করার আহ্বান জানান হয়েছিল। ভারতীয় আদালত বয়কট করে Muslim Arbitration Court গঠন করা হয় এবং জেলার মুসলিম জনগণকে বিচার নিস্পত্তির জন্য সেখানে যেতে প্ররোচিত করা হয়।[১১]

কিন্তু এই মারাত্মক সাম্প্রদায়িক খেলা মুর্শিদাবাদ. এবং পার্শ্ববর্তী জেলাতে সফল হয়নি। অঙ্কুরেই তা বিনাশ প্রাপ্ত হয়। বলার অপেক্ষা রাখেনা যে নবাব বাহাদুর ওয়াসিফ আলী মির্জার অক্লান্ত প্রচেষ্টা এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সে পরম্পরা মুর্শিদাবাদ জেলার সমাজ জীবনে যুগ যুগ ধরে প্রবাহমান তা জেলাবাসীকে সমস্ত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা থেকে অনেক দূরে রেখেছিল।

পাশাপাশি এ ধরনের অপর বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব হলেন মৌলভী আব্দুস সামাদ (১৮৬১—১৯৪৫)। উচ্চশিক্ষিত এবং পেশায় ব্যবহারজীবী মৌলভী আব্দুস সামাদ মুর্শিদাবাদ জেলা তথা বাংলার জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতৃত্বের অন্যতম প্রধান। একবারই বঙ্গীয বিধান পরিষদে তিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন। তবে দীর্ঘদিন মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের (District Board) সহ-সভাপতি ছিলেন। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে বহরমপুরে অনুষ্ঠিত প্রদেশ কংগ্রেসের সম্মেলনেব অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মৌলভী আব্দুস সামাদ সমগ্র জীবন ব্যাপী দ্বি-জাতিতত্ত্বের, মুসলিমদের জন্য পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থার (Separate electorate) এবং সাম্প্রদাযিকতার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন। তারই নিকট আত্মীয ও স্নেহভাজন মন্ত্রশিষ্য অধ্যাপক রেজাউল করীম ঐ একই আদর্শে সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেছেন।[১২]

এই বিশিষ্ট মানুষটির রাজনৈতিক জীবনাদর্শ বুঝতে গেলে সমসাময়িক বাংলার তথা ভারতের রাজনৈতিক পটভূমি জেনে নেওয়া দরকার। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই শহরে অনুষ্ঠিত All India Muslim Conference-এ মহম্মদ আলী জিন্নাহ তার ১৪ দফা নীতি ঘোষণা করলেন, যার অন্যতম প্রধান শর্ত হল মুসলিম ভোটারদের জন্য স্বতন্ত্র ভোটাধিকার ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং মুসলমানদের জন্য আসন সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু করা। ১৯৩০, ১৯৩১, ১৯৩২-এর তিনটি গোল টেবিল বৈঠকেই মিঃ জিন্নাহ ঐ দাবিতে অটল থাকেন। অপরদিকে মহাত্মা গান্ধী বা জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃক গোলটেবিল বৈঠক বর্জন এবং পুনরায় দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান। ১৯২৭ সালে সাইমন কমিশন গঠন এবং তার বিরুদ্ধে সমগ্র দেশব্যাপী উত্তাল গণআন্দোলন ও পুলিশের লাঠির আঘাতে লালা লাজপৎ রাই-এর মৃত্যুবরণ। ১৯৩০ খৃঃ লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু। ১৯৩১ খৃঃ ৫ই মার্চ গান্ধী-আরউইন চুক্তি ও আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুন্ঠন। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দেই ভগৎ সিং, রাজগুরু ও সুকদেবের ফাঁসী। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃক পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী উত্থাপন। অপরদিকে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে শিল্প শ্রমিক ধর্মঘট এবং ইংরাজ সরকার কর্তৃক ভারতীয় কমিউনিষ্ট নেতৃত্বের বিরুদ্ধে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা শুরু। সর্বোপরি ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী স্যার র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড কর্তৃক সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ও

মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থা ঘোষণা। অর্থাৎ ১৯২৭-৩২. এই ছয় বছরের বিভিন্ন ঘটনা সমগ্র দেশকে ও তার রাজনীতিকে এক উত্তাল ও অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির মধ্যে টেনে এনেছিল এবং পরবর্তীকালে তা আরও উত্তাল হয়েছিল।[১৩]

১৯৩১ সালের ২৬শে জানুয়ারি সারা বাংলার মানুষ স্বাধীনতা দিবস পালন করলেন মহাসমারোহে। ঐ দিন কলকাতায় কর্পোরেশনের তৎকালীন মেয়র সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে যখন হাজার হাজার মানুষ মনুমেন্ট ময়দানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করলেন, ব্যাপক পুলিশী লাঠি চার্জ শুরু হল। সুভাষ বসু, জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী প্রমুখ গুরুতর আহত হলেন। ঐ পুলিশী অত্যাচারের নিন্দা করে প্রত্যক্ষদর্শী ও বিশিষ্ট জাতীয়তাবাদী নেতা জালালউদ্দীন হাসেমী বঙ্গীয় বিধান পরিষদে প্রস্তাব উত্থাপন করলে ডঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী এবং জে. এল. ব্যানার্জীর সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে ১৩ই ফেব্রুয়ারি ১৯৩১ আব্দুস সামাদ ঐ প্রস্তাব সমর্থন করলেন।[১৪]

১৯৩১ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে করাচীতে জাতীয় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন বসল। তার কয়েকদিন পূর্বে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত বীর বিপ্লবী ভগৎ সিং, সুকদেব এবং রাজগুরু ফাঁসীকাঠে মৃত্যুবরণ করলেন। জালালউদ্দীন হাসেমী ঐ ফাঁসীর প্রতিবাদে বঙ্গীয় বিধান পরিষদে প্রস্তাব উত্থাপন করলে তার সমর্থনে এগিয়ে এলেন আব্দুস সামাদ, জে. এল. ব্যানার্জী এবং কাজী এমদাদুল হক। যদিও প্রস্তাব গৃহীত হয়নি।[১৫]

১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ৩০শে আগষ্ট চট্টগ্রামের বীর বিপ্লবীরা কুখ্যাত পুলিশ অফিসার খান বাহাদুর আসানুল্লাহকে হত্যা করলে ইংরাজ সরকার চট্টগ্রামে বীভৎস অত্যাচার শুরু করেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ প্রতিবাদে মুখর হলেন। যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের নেতৃত্বে বেসরকারী তদন্ত কমিশন গঠিত হল। ইংরাজ সরকার পুলিশী সন্ত্রাস চাপা দেওয়ার জন্য চট্টগ্রামের ঘটনাকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বলে প্রচার করলেন। কিন্তু তা মিথ্যা বলে প্রমাণিত হল। ঐ পুলিশী অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিধানপরিষদে মুলতুবি প্রস্তাব উত্থাপন করা হলে তাকে বলিষ্ঠ সমর্থন জানান মৌলভী আব্দুস সামাদ। প্রস্তাব ৮৪—৪২ ভোটে অগ্রাহ্য হল।[১৬]

জাতীয়তাবাদী চেতনার পূর্ণ বিকাশের স্বার্থে আব্দুস সামাদ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির স্বপ্ন দেখেছেন সমগ্র জীবনব্যাপী। ধর্মের নামে রাজনীতি এবং রাজনীতির সাম্প্রদায়িকরণকে তিনি চিরকাল ঘৃণা করেছেন। সমন্বয়ের রাজনীতির অগ্রগতি ঘটিয়ে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের দ্বারা ঐক্যবদ্ধ ও স্বাধীন ভারত গঠন করার স্বপ্ন দেখেছেন তিনি। ফলত হিন্দু ও মুসলমানের সংহতি বানচাল করে দেওয়ার

যেকোন প্রচেষ্টা. বা ষড়যন্ত্র তাকে তীব্রভাবে আহত করেছে। তিনি কোন. দিনই তা মেনে নিতে পারেননি। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠী দেশীয সাম্প্রদাযিক শক্তির সাথে হাত মিলিযে যখন মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থা (Separate Electorate) প্রবর্তন করতে উদ্যত হলেন, তা রুখতে মৌলভী আব্দুস সামাদ সচেষ্ট হলেন।

কংগ্রেসী বিধাযক হিসাবে বঙ্গীয বিধান পরিষদে তীব্র ও যুক্তিসংগত ভাষায পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থা ক্ষতিকারক দিকগুলি তুলে ধরে তিনি বলেন, "লক্ষ্ণৌ চুক্তিব ভিত্তিতে রচিত সাইমন কমিশনের প্রস্তাবনার ক্ষতিকাবক দিকটি হল এই যে, ঐ প্রস্তাবনা মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থা চালু করে ভারতে সাম্প্রদাযিকতাকে চিরায়ত করতে চেযেছে।"[১৭] সুতবাং তিনি ঘোষণা করেন, "কতগুলি বাজনৈতিক প্রযোজনে ভাবতে মুসলমানদেব অথবা অন্য কোন সম্প্রদাযেব জন্য কিছু নির্বাচনী কেন্দ্র সংবক্ষিত কবা যেতে পারে, কিন্তু পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থা, অর্থাৎ মুসলমানবা কেবলমাত্র মুসলমানকেই ভোট দেবে এবং হিন্দুরা কেবলমাত্র হিন্দুদেব, এব্যবস্থা কোন অবস্থাতেই মেনে নেওযা যায না। তা যে কোন দাযিত্বশীল সবকারেব নীতি বিরুদ্ধ এবং সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদাযেব স্বার্থ বিবোধী। ঐ নীতি উভয সম্প্রদাযকে আত্মকেন্দ্রিক ও সংকীর্ণ দুটি শিবিরে ভাগ কবে দেবে। তার ফলে এক গোষ্ঠী অন্য গোষ্ঠীব কল্যাণেব কথা কখনই চিন্তা করবে না। পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থা চালু হলে একজন মুসলমান ভোট প্রার্থীকে তার নির্বাচনী এলাকায গিযে সবচেয়ে আগে প্রমাণ করতে হবে যে সে আগে একজন মুসলমান তারপর ভারতীয়। সেইরূপ একজন হিন্দু ভোট প্রার্থীকে প্রমাণ করতে হবে যে তিনি আগে হিন্দু তারপর ভারতীয। অর্থাৎ ভোটদাতাদের কাছে যে নিজেকে যত বেশী করে হিন্দু অথবা মুসলমান বলে জাহির করতে পারবেন তারই জয়লাভের সম্ভাবনা। এর মারাত্মক ফল অবশ্যম্ভাবী। এই নীতির ফলেই দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেখা দিচ্ছে।" সুতরাং মৌলভী আব্দুস সামাদ প্রশ্ন তুললেন, "কেন আমরা নিজেকে প্রথমে ভারতীয় বলে ভাববো না ?"[১৮]

"মুর্শিদাবাদ জেলার District Board-এর সহ সভাপতি হিসাবে দীর্ঘ ১০ বছরের অভিজ্ঞতায় তিনি দেখেছেন যে হিন্দুদের সহযোগিতার ফলে মুসলমানরা উপকৃত হয়েছেন এবং District Board-এর হিন্দু সভাপতি ও অন্যান্য সদস্যবৃন্দদের ন্যায় বিচার ও উদার দৃষ্টিভঙ্গী মুসলমানদের নানা সুযোগ করে দিয়েছে, যা পূর্বে মুসলমানরা পেতো না।"[১৯] সুতরাং "মুসলমানদের একটি ছোট অথচ প্রভাবশালী অংশ"[২০] যখন তা সত্ত্বেও সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে

পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থার সমর্থন করছেন এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের সহযোগিতা থেকে মুসলমানদের পৃথক করে রাখার চেষ্টা করছেন, তা গভীরভাবেই সামাদ সাহেবকে পীড়া দিয়েছিল।

তিনি আন্তরিকভাবেই বিশ্বাস করতেন "ঐ পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থা মুসলমানদের স্বার্থ বিরোধী এবং দেশে সাম্প্রদায়িকতা বৃদ্ধি করবে। এর ক্ষতিকারক দিকটা দেশের রাজনীতির উপর পড়তে বাধ্য। ফলত পিছিয়ে পড়া মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক সংস্কারের কাজ, বা শিক্ষা প্রসারের কাজ, যা বিশেষ প্রয়োজনীয়, তা চূড়ান্ত বাধা প্রাপ্ত হবে।"[২১] তাই মৌলভী আব্দুস সামাদের মতে, "মুসলিম সাম্প্রদায়িক শক্তি ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের শিকারে পরিণত হযে তাদের ভেদ নীতির সহায়তা করছেন। তারা হয়ত মুসলমানদের বন্ধু বলে মনে করছেন, কিন্তু তা নয়। ঈশ্বর দেশের মুসলমান সমাজকে ঐ তথাকথিত বন্ধুদের হাত থেকে রক্ষা করুন"।[২২]

মৌলভী আব্দুস সামাদ পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থার চেয়ে দেশের মুসলমান সমাজকে কুসংস্কার মুক্ত ও শিক্ষিত করে তোলার প্রযোজনীয়তাকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতেন। বিশেষ করে মুসলিম নারীদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার এবং তাদের মুক্তি অনেক বেশি জরুরি বলে তিনি মনে করতেন। তার মতে একমাত্র শিক্ষার প্রসারই লক্ষ লক্ষ অসহায়, অজ্ঞ ও দরিদ্র মুসলমানের অবস্থার উন্নতি ঘটতে পারে। এটাই হল হজরত মহম্মদের নির্দেশ। অথচ প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম রাজনীতিবিদরা হজরৎ মহম্মদের ঐ চিরায়ত ও নির্দেশকে সযত্নে এড়িয়ে চলেন। রক্ষণশীল মোল্লাবৃন্দ নির্বাচনে জয়লাভ করতেই ঐ কাজ তারা করেন।[২৩]

আব্দুস সামাদ নিশ্চিতভাবেই বিশ্বাস করতেন যে ভারতের সকল জাতীয়তাবাদী মুসলমান যারা প্রকৃত অর্থে দেশের অগণিত, অসহায় ও নিপীড়িত মুসলমান শ্রমিক-কৃষকের প্রতিনিধিত্ব করেন, তারা সকলেই ঐ Separate Electorate-এর বিরোধিতা করবেন। সে কারণে তিনি মুসলিম জনমত যাচাই করার জন্য বঙ্গীয় বিধান পরিষদে জোরাল ভাষায় ঐ ইস্যুতে গণভোট গ্রহণের প্রস্তাব দেন। কিন্তু তৎকালীন বাংলার প্রধানমন্ত্রী সোরাবর্দী, আব্দুস সামাদের ঐ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার সাহস দেখাতে পারেননি।[২৪]

শেষ পর্যন্ত আব্দুস সামাদের বেসরকারী প্রস্তাব "এই পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বৃদ্ধিকে অবরুদ্ধ করবে। কারণ ঐ ব্যবস্থার মাধ্যমে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে সাম্প্রদায়িক ও ধর্মীয় প্রশ্নে— রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ইস্যুতে নয়। ফলত তা দেশে ধর্মান্ধতাকেই জিইয়ে রাখবে"— বাতিল হয় ৪৭—৩২ ভোটে। কিছুদিনের মধ্যেই অর্থাৎ ১৯৩২ সালের ১৬ই আগষ্ট Communal Award বা সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার তত্ত্ব ঘোষণা করা হল। পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থা

ঘোষিত হল। অর্থাৎ বঙ্গীয় বিধান পরিষদে মোট ২৫০টি কেন্দ্রের ১১৯টি মুসলিম, ৬০টি বর্ণ হিন্দু, ৩০টি দলিত হিন্দু এবং ২৫টি ইউরোপীয়ানদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হল। ভবিষ্যতে দেশ ভাগের সমস্ত ব্যবস্থা পাকা করে রাখা হল। এর প্রতিবাদে মহাত্মা গান্ধী অনশন শুরু করলেন। শেষ পর্যন্ত পুনা চুক্তির মাধ্যমে ডঃ আম্বেদকর হিন্দু দলিতদের জন্য সংরক্ষণ প্রত্যাহার করলেন তাদের প্রতি বর্ণ হিন্দুদের প্রদত্ত কিছু রক্ষা কবচ প্রদানের শর্তে।

এইভাবেই জাতীয় আন্দোলনে সাম্প্রদায়িকতার অশুভ শক্তি তার বিষাক্ত থাবা ক্রমশ প্রসাবিত করতে লাগলো। মৌলভী আব্দুস সামাদের মত জাতীয়তাবাদী মুসলমানবা আপ্রাণ চেষ্টা করেও তা প্রতিরোধ করতে পারলেন না। দেশভাগ অনিবার্য হয়ে পড়ল।

কিন্তু তাহলেও জাতীয় রাজনীতির সেই সঙ্কটজনক মুহূর্তে এইসব বিশিষ্ট মুসলিম নেতাদেব ঐতিহাসিক ভূমিকা অস্বীকার করা যায় কি? আজকাল অনেকে জাতীয় আন্দোলনে মুসলমান সমাজেব ভূমিকা নিয়ে অনেক প্রশ্ন তোলেন বা কটাক্ষ করে থাকেন, তা কতটা ইতিহাস বিরুদ্ধ ও বিকৃত, নবাব বাহাদুর ওয়াসিফ আলী মির্জা এবং মৌলভী আব্দুস সামাদের মত বিশিষ্ট জাতীযতাবাদী মুসলমান এবং তাদের অগণিত সমর্থকের ভূমিকা চোখে আঙ্গুল দিয়ে তা দেখিয়ে দেয। এ ধরনের বিশিষ্ট মানুষদের ঐতিহাসিক কর্মকাণ্ডকে আরো ব্যাপকভাবে পর্যালোচনা করে জাতীয় ইতিহাস রচনাকে সমৃদ্ধশালী কবা দরকার। তবেই সাম্প্রদায়িক শক্তির যথার্থ মোকাবেলা করা সম্ভব হবে। নতুবা অযোধ্যাকাণ্ডের পুনরাবৃত্তি রোধ অসম্ভব হয়ে পডবে।

সূত্র নির্দেশ

১. দে অমলেন্দু; পাকিস্তান প্রস্তাব ও ফজলুল হক, কলিকাতা, ১৯৮৯, ষষ্ঠ অধ্যায়।
২. গুপ্ত বিষাণ কুমাব; Political Movements in Murshidabad, 1920 1947, Calcutta, 1992, Chapter V
৩. দে অমলেন্দু—পূর্বোক্ত গ্রন্থ
৪. ঐ
৫. ঐ
৬. ঐ
৭. ঐ
৮. ঐ
৯. নবাব বাহাদুর ওয়াসিফ আলি মীর্জা কর্তৃক প্রকাশিত আবেদনপত্র "মুর্শিদাবাদ জিলার হিন্দু-মুসলমান অধিবাসীগণের প্রতি মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুরের বাণী"— দি

প্যালেস, মুর্শিদাবাদ, ১৬ই নভেম্বর, ১৯৪৬। বর্তমানে New Palace, Murshidabad সংগ্রহশালায় রক্ষিত।

১০. Hindusthan Standard, Calcutta, 23.8 1947

১১. Secret Report of the Home Political Dept. West Bengal. Calcutta, 9.10 47/6.11.47/4.12.47.

১২. Gupta Bishan Kumar, Opcit.

১৩. "সংবাদ সকাল", পাক্ষিক পত্রিকা; বহরমপুর, ১৬ই জানুয়ারি, ১৯৯৪। এই সংখ্যায় প্রকাশিত বর্তমান লেখকের প্রবন্ধ।

১৪. Chattopadhyaya Gautam; **Bengal Electoral Politics and Freedom Struggle,** 1862 1947, I.C.H.R., New Delhi, 1984.

১৫. ঐ

১৬. ঐ

১৭. Gupta Bishan Kumar; Opcit

১৮. ঐ, এবং **Bengal Legislative Council Proceedings,** Calcutta.

১৯. ঐ

২০. ঐ

২১. ঐ

২২. ঐ

২৩. ঐ

২৪. ঐ

২৫. Chattopadhyay Gautam; Opcit

চরমপন্থী জাতীয় বিপ্লববাদী আন্দোলন ও চিত্তরঞ্জন দাশ—একটি বিশ্লেষণ

প্রবাল সেনগুপ্ত

১৯১৭ সালে ভবানীপুর প্রাদেশিক সম্মেলনের মাধ্যমে চিত্তরঞ্জন বাংলার রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠা পান। বিশ শতকের বিশের দশকে চিত্তরঞ্জন গান্ধীপন্থী কংগ্রেস আন্দোলনের নেতা হিসাবেই মূলত সুপরিচিত হলেও, তার রাজনৈতিক জীবন কখনই একমাত্রিক ছিল না। বিশ শতকের প্রথম ভাগে চরমপন্থী ও জাতীয় বিপ্লববাদীদেব বাজনীতিব সঙ্গে চিত্তরঞ্জন যথেষ্ট ঘনিষ্ঠভাবেই যুক্ত ছিলেন।

চবমপন্থার উদ্ভব সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিযে প্রায সব ঐতিহাসিকই এই আন্দোলনের অনুপ্রেরণা হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায ও স্বামী বিবেকানন্দর মতাদর্শ ও রচনার প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। চিত্তবঞ্জনেব জীবন আলোচনা কবলে দেখা যায় বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা তার জীবন ও সাহিত্যে যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছিল। চিত্তরঞ্জনের সাহিত্য-জীবনেও এর প্রভাব আমরা দেখি। পরবর্তীকালে ১২২১ বঙ্গাব্দে অগ্রহাযণ মাসে নিজস্ব পত্রিকা 'নারায়ণের' মাধ্যমে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন ধর্মেরই প্রকাশ ঘটিযে ছিলেন। বিপিনচন্দ্র পাল ও চিত্তরঞ্জন উভয়েই নারাযণের মাধ্যমে চরমপন্থীদের ভাবগত দর্শন প্রচার করেছিলেন।[১] চবমপন্থীদের মত জাতীয় আন্দোলনকে তিনিই আধ্যাত্মিক চেতনার অংশ হিসাবে মনে করেছিল। ১৯২৩ সালে গয়া কংগ্রেসের সভাপতির ভাষণেও তাই তিনি মানুষের সমস্ত রকম কাজ, এমনকি স্বরাজ্য লাভের ইচ্ছাকেও ঈশ্বরের লীলার প্রকাশ বলেই মনে করেছেন।[২]

১৮৮৫ থেকে ১৯০৫ অবধি কংগ্রেস অধিবেশনগুলি বৃটিশ সরকারের সাম্রাজ্যবাদী নীতিকে কোনভাবেই পরিবর্তিত করতে পারেনি। এর ফলে সাধারণের চোখে কংগ্রেস অধিবেশনগুলি 'তিন দিনের তামাশা'য় পরিণত হয়েছিল। স্বাভাবিক ভাবেই কংগ্রেসের ক্ষমতাসীন নরমপন্থী গোষ্ঠীর কার্যকলাপের বিরোধী চরমপন্থী গোষ্ঠীটি এই সময় সংহত রূপ গ্রহণ করেছিল। এদেরই একাংশ পরবর্তীকালে হিংসাত্মক কার্যকলাপের মাধ্যমে বৃটিশ শাসন উচ্ছেদের জন্য সচেষ্ট হয়েছিল। নামকরা চরমপন্থী নেতাদের মধ্যে একমাত্র বিপিনচন্দ্র পাল ছাড়া, অরবিন্দ, লাজপত রাই, তিলক প্রত্যেকেই এই হিংসাশ্রয়ী বিপ্লবীদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

বিশ শতকের সূচনাপর্বে লর্ড কার্জনের শোষণ মূলক নীতি সমূহ, করপোরেশন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধিকার হরণ ও বাংলা ভাগের পরিকল্পনা এই চরমপন্থী রাজনীতির প্রসারেই আরো সহায়ক হয়। এর আগেই বাংলাদেশে বঙ্কিমের অনুশীলন ধর্মের উপর ভিত্তি করে ১৯০২ সালে জাতীয় বিপ্লবীদের সংগঠন 'অনুশীলন সমিতি' গড়ে ওঠে। এই সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন প্রমথনাথ মিত্র। বরোদা প্রবাসী অরবিন্দ ঘোষ এবং চিত্তরঞ্জন ছিলেন এই সংগঠনের সহ-সভাপতি। সমিতির অন্যতম কর্ণধার পুলিনবিহারী দাস এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, চিত্তরঞ্জন শুধু এই সমিতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন তাই নয়, সমিতির প্রয়োজনে বহু অর্থও তিনি ব্যয় করেছিলেন।[৩] সাধারণের কাছে অনুশীলন সমিতি দেহ ও মানসিক বলচর্চাকারী একটি সংগঠন হিসেবে পরিচিত হলেও আসলে এটি সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাসী দেশ কর্মীদেরই সংগঠন ছিল।[৪]

এটা ঠিকই যে ব্যক্তি হত্যার রাজনীতি সম্বন্ধে চিত্তরঞ্জনের প্রশ্ন ছিল, কিন্তু সশস্ত্র বিপ্লব মানেই তো ব্যক্তি হত্যার রাজনীতি নয়। তাই চিত্তরঞ্জন সব জেনেই এই বিপ্লবী দলে যোগ দিয়েছিলেন। আমরা দেখি যে চিত্তরঞ্জন, প্রমথ মিত্র, সতীশচন্দ্র, জাপানী চিত্রশিল্পী ওকাকুরা, ভগ্নী নিবেদিতা ও অরবিন্দ ঘোষের মধ্যে যোগাযোগের মধ্যে দিয়েই জাতীয় বিপ্লব সংগঠনের জন্য এই সমিতি গড়ে ওঠে।[৫] চিত্তরঞ্জন সংগঠনের সহ সভাপতি হিসেবে সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সবকিছুই জানতেন কেন না সমিতির সর্ব-উচ্চ নীতি নির্ধারক কমিটির সদস্য ছিলেন তিনি।[৬]

ইতোমধ্যে ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর লর্ড কার্জনের পরিকল্পনা মত বঙ্গ বিভাগ হলে বাংলার আপামর জনসাধারণ এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সোচ্চার হয়ে ওঠে। সেই সময় চিত্তরঞ্জন দার্জিলিংয়ে একটি জনসভায় বাংলা বিভাগের বিরুদ্ধে তীব্রভাবে বলেছিলেন যে, বাঙালিরা এতদিন ইংরেজদের দ্বারা শুধুমাত্র প্রতারিত হয়েছে। এই বক্তৃতায় তিনি নরমপন্থীদের শান্তিবাদীনীতির বিরোধিতা করে বলেছিলেন যে, এই নীতি জাতীয় জীবনকে আরষ্ট ও মৃত্যুমুখীন করে তুলছে।[৭] চরমপন্থী জাতীয়তাবাদীদের মত একই সুরে চিত্তরঞ্জন ঘোষণা করেছিলেন, 'আজ আমরা বুঝিতে পারিয়াছি যে, বঙ্কিমবাবু কমলাকান্তের দপ্তর বর্ণিত শীর্ণকায় কুকুরের মত শুধু করুণ নেত্রে ও প্রার্থনাপূর্ণ দৃষ্টিতে ইংরেজের পানে শত সহস্র বৎসর ধরিয়া চাহিয়া থাকিলেও ইংরাজ তাহার পাতের মাছের কাটাখানি উত্তম রূপে চুসিয়া আমাদের মুখের কাছে ফেলিয়া দিতে পারে, কিন্তু যাহাতে আমাদের জাতীয় জীবন পুষ্ট হয় এমন কিছুই দিবে না।...আপনার চরণে ভর করিয়া আপনি না দাঁড়াইতে পারিলে কোন দিন আমাদের মুক্তির দ্বার উৎঘাটিত

হইবে না।'[৮] বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে নরমপন্থী ও সাংবিধানিক রাজনীতির প্রতি চিত্তরঞ্জনের ঘৃণা প্রকাশ পেয়েছিল।

বাংলাভাগ বিরোধী আন্দোলনের সময় কার্লাইল সার্কুলার জারির প্রতিবাদে সরকারী শিক্ষার বিকল্প হিসাবে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন শুরু হয়। এই শিক্ষা আন্দোলনে সুবোধচন্দ্র মল্লিক, ব্রজেন্দ্রকিশোর আচার্যচৌধুরী প্রভৃতিদের সঙ্গে চিত্তরঞ্জনও অংশ নিয়েছিলেন এবং ১৯০৬ সালে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের নেতৃত্বে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে চিত্তরঞ্জনের আহ্বানে বরোদা রাজকলেজের বেশি মাইনের চাকুরি ছেড়ে অবরিন্দ ঘোষ জাতীয় মহাবিদ্যালযের অধ্যক্ষ হয়ে কলকাতায় এসেছিলেন।[৯] জাতীয় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ পদ গ্রহণ করে বাংলায় এলে তাঁর প্রধান লাভ ছিল অনুশীলন সমিতিকে একটি বিপ্লববাদী দল হিসাবে গড়ে তোলা। প্রথম থেকেই অবরিন্দ 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার সম্পাদনা ও অন্যান্য রাজনৈতিক কাজ নিয়ে এত ব্যস্ত থাকতেন যে কলেজ পরিচালনার মূল দাযিত্ব সুপারিনটেন্‌ডেন্ট সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়েব ওপরই পড়েছিল।[১০]

এখানেই চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে অরবিন্দের তথা জাতীয় বিপ্লববাদী ও চরমপন্থীদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের কথা আরও বেশি করে মনে হয। অরবিন্দের কার্যকলাপ এটাই প্রমাণ করে যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই তিনি এই পদ গ্রহণ করেছিলেন। এর কিছু আগে ১৯০২ সালে অরবিন্দের কাছে ভগ্নী নিবেদিতা গিয়েছিলেন এবং তিনি বাংলায় গুপ্ত বিপ্লবী সমিতির নেতৃত্ব অরবিন্দকে নিতে অনুরোধ করেছিলেন।[১১] এথেকে এই সিদ্ধান্ত টানা যেতেই পারে যে চিত্তরঞ্জন একাধারে অনুশীলন সমিতি ও জাতীয় শিক্ষা পরিষদের কর্মকর্তা রূপে বিপ্লবী আন্দোলনের স্বার্থেই অরবিন্দকে কলকাতায় এনেছিলেন। আমরা দেখি চিত্তরঞ্জন অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা পি. মিত্রের রাজনৈতিক মতবাদকে সর্বান্তকরণে গ্রহণ করেছিলেন।[১২] পরে বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকেও তার সঙ্গে সমিতির যোগাযোগ ছিল এমনকি এই সময় একবার তাকে সমিতির সর্বাধিনায়ক হিসাবেও মনোনীত করা হয়েছিল। যদিও তিনি তা গ্রহণ করেননি।[১৩]

. স্বদেশী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাংলাতেই প্রথম নরমপন্থী চরমপন্থী সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। ১৯০৬ সালে বরিশাল প্রাদেশিক সম্মেলনে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি উচ্চারণ করবার জন্য প্রকাশ্য রাস্তায় বৃটিশ সরকার স্বদেশি মিছিলের উপরে অত্যাচারের ফলে চরমপন্থীদের প্রতি মানুষের সমর্থন বৃদ্ধি পায় এবং চিত্তরঞ্জনও চরমপন্থীদের দিকে আরও বেশি করে ঝুঁকে পড়েন। এর পরে ১৯০৬-এর কলকাতা কংগ্রেসে চিত্তরঞ্জন প্রমুখ চরমপন্থীরা লোকমান্য তিলককে সভাপতি করতে চান। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি নরমপন্থীরা নৌরজীকে কংগ্রেস সভাপতি করেন। ফলে চিত্তরঞ্জন কলকাতা কংগ্রেসে যোগদান করেননি। অবশ্য তিলক,

অরবিন্দ প্রভৃতিরা এই সম্মেলনে যোগদান করে ছিলেন। ১৯০৭-এ সুরাট কেলেংকারীব পর চিত্তরঞ্জন ও অন্যান্য চরমপন্থী নেতাদের মতই কিছুকালের জন্য কংগ্রেসী রাজনীতি থেকে বিযুক্ত হযে পরেন।[১৪]

এই সময় চিত্তবঞ্জন বিভিন্ন স্বদেশী মামলা পরিচালনায় দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছিলেন। অন্যান্য মধ্যশ্রেণীভুক্ত নেতার মতই চিত্তরঞ্জন তার পেশা ও আদর্শগত কাজের মধ্যে এভাবে মেল বন্ধন ঘটিয়েছিলেন এবং নিজ পেশাকে তিনি চরমপন্থী নেতাদের মুক্ত করার স্বার্থে কাজে লাগিয়েছিলেন। ১৯০৬ সালে সুবোধচন্দ্র মল্লিক, চিত্তরঞ্জন দাশ ও রজতনাথ রায়ের অর্থ সাহায্যে এবং অরবিন্দ ও বিপিনচন্দ্র পালের পরিচালনায় চরমপন্থীদের মুখপাত্র হিসাবে 'বন্দেমাতরম্' কাগজ প্রকাশিত হয়। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ২৭শে জুন সংখ্যায় 'পলিটিক্স্ ফর ইন্ডিয়ানস্' এবং ২৮শে জুলাই 'যুগান্তর কেস' সংক্রান্ত প্রবন্ধ লিখবার জন্য সরকার পত্রিকার প্রধান সম্পাদক অববিন্দ ঘোষ ও ম্যানেজার হেমেন্দ্রনাথ বাগচীকে গ্রেপ্তার করেছিল। সবকাব এই মামলার অন্যতম সাক্ষী হিসাবে বিপিনচন্দ্র পালকে সমন প্রেরণ করেছিল। সেই সময় পত্রিকা পরিচালনার নীতি নিযে বিপিনচন্দ্র ও অরবিন্দের মধ্যে বিরোধ দানা বেঁধে উঠেছিল এবং তার ফলে বিপিনচন্দ্রের সাক্ষে অরবিন্দের শাস্তি পাওযার সম্ভাবনা ছিল। বিপ্লবী আন্দোলনের চরম হিতৈষী হিসাবে চিত্তরঞ্জন বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের খাতিরে বিপিনচন্দ্রকে এই মামলার সাক্ষী দিতে নিষেধ করেছিলেন এবং বিপিনচন্দ্র চিত্তরঞ্জনের যুক্তিকে মেনে নিয়েছিলেন।[১৫] চিত্তরঞ্জন এই মামলায বন্দেমাতরমের বিরুদ্ধে এই ধরনের অভিযোগ আনাকে অবিচাবের প্রতীক হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন।[১৬] এই মামলায অরবিন্দ খালাস হয়েছিলেন।

এই সময় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যা' পত্রিকায় বৃটিশ শাসনের অবসানের জন্য খোলাখুলি ডাক দেওয়া হয়েছিল।[১৭] স্বাভাবিকভাবেই বৃটিশ সরকার 'সন্ধ্যা'কে জব্দ করবার জন্য এর সম্পাদক ব্রহ্মাবান্ধব উপাধ্যায়কে রাজদ্রোহের অভিযোগে গ্রেপ্তার করে। এই সময় চিত্তরঞ্জন ব্রহ্মবান্ধবের পাশে এসে দাঁড়ান এবং ব্রহ্মবান্ধব বিদেশি বিচারালয়ের কাছে জবাবদিহি করতে অস্বীকার করে যে বিবৃতি দেন. তারও মুসাবিদা করেন চিত্তরঞ্জন।

এরপরেই বিখ্যাত মানিকতলা বোমা মামলায় অরবিন্দ ঘোষ ও তার ভাই বারীন্দ্রসহ অনেক বিপ্লবীকে বৃটিশ পুলিশ গ্রেপ্তার করে। তাদের বিরুদ্ধে যুগান্তর কাগজের সহায়তায় রাজদ্রোহ প্রচার এবং প্রত্যক্ষভাবে বিপ্লবী কাজকর্মে যুক্ত থাকার অভিযোগ আনা হয়। দায়রা জর্জ চার্লস বিচ গ্রান্ট-এর আদালতে ১৯০৮-এর ১৯শে অক্টোবর এই মাললার শুনানী শুরু হলে, বারীন্দ্র প্রভৃতিরা মূল নেতা অরবিন্দকে বাঁচাবার তাগিদে সমস্ত অভিযোগ মেনে নেন। এই সময়

শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী ও হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের অনুরোধে চিত্তরঞ্জন অরবিন্দ ঘোষের পক্ষে আদালতে দাঁড়ান। চিত্তরঞ্জনের কন্যা অপর্ণাদেবী এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, নামমাত্র পারিশ্রমিকে চিত্তরঞ্জন শুধুমাত্র দেশমাতৃকার প্রতি কর্তব্য বোধে এই মামলায় অংশ গ্রহণ করেন। এবং অরবিন্দকে নির্দোষ প্রমাণ করেন। তার সওয়ালের শেষাংশে যেভাবে তিনি অরবিন্দের বিপ্লববাদী প্রেক্ষাপট জানা থাকা সত্যেও তার কাজ ও ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন তার মধ্য দিয়েই সামগ্রিকভাবে চরমপন্থী বিপ্লববাদীদের প্রতি তার শ্রদ্ধা ও সমর্থন প্রকাশ পেযেছিল। চিত্তরঞ্জন অরবিন্দকে সমস্ত বিতর্কের ঊর্ধ্বে দেশপ্রেমেব কবি, জাতীযতাবাদের উদ্গাতা এবং মানবতাবাদী প্রেমিক বলে চিহ্নিত করেছিলেন।[১৯]

এরপবে পূর্ববঙ্গে অনুশীলন সমিতির প্রধান কর্ণধার এবং বিখ্যাত বিপ্লবী পুলিনবিহারী দাসসহ অন্যান্য ৪৪জন বিপ্লবী ১৯১০ সালে ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় জড়িয়ে পড়লে চিত্তরঞ্জন দাশ তাদেব পক্ষে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এবং পুলিনবিহারী দাসকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য তিনি তাঁকে প্রকৃত মানবিকতাবাদী বলে চিহ্নিত করেছিলেন। পুলিন দাস অবশ্য এই সময়ে মামলা পরিচালনা সূত্রে চিত্তরঞ্জনের অর্থ স্পৃহার কথা তুলেছেন। কিন্তু তা সত্যেও তিনি স্বীকার করতে বাধ্য হযেছিলেন যে চিত্তরঞ্জনের প্রচেষ্টায তাদের বিরুদ্ধে অন্যান্য অভিযোগগুলি বাতিল হযে গিয়েছিল শুধুমাত্র রাজদ্রোহের অভিযোগটি বলবৎ ছিল।[২০] পুলিন দাস অবশ্য এই মামলায় মুক্তিলাভ করেননি। শুধুমাত্র বড় বড় বিপ্লবী নেতার পক্ষে নয সাধারণ বিপ্লবীদের পক্ষেও চিত্তরঞ্জন মামলায় দাঁড়িযেছিলেন। এই প্রসঙ্গে রাজেন্দ্রপুর ট্রেন ডাকাতি মামলা বা কুতুপদিয়া ডেটেনিউ মামলার কথা আমরা উল্লেখ করতে পারি। বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতি তার প্রকৃত ভালবাসা না থাকলে যা কখনই সম্ভব হত না।

১৯১৪-১৫ নাগাদ চিত্তরঞ্জন তিলকের নেতৃত্বে হোমরুল আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন। এবং বাংলায় এই আন্দোলনের নেতা ছিলেন তিনি।[২১] এই সংগঠনকে ব্যবহার করে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ১৯১৬ সালে চরমপন্থীরা কংগ্রেস সংগঠনের উপর ভিত্তি করেই ১৯১৭ সালে ভবানীপুর প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেছিলেন। নরমপন্থীদের চরম নিন্দা করে তিনি এই সময বলেছিলেন 'রাজনীতি বা পলিটিক্স্ শব্দটি শুনিবামাত্র আমাদের দৃষ্টি ইংলণ্ডে গিয়া পৌঁছায়। ......বার্ক-এর বুলি যাহা স্কুলে-কলেজে মুখস্থ পড়িয়াছিলাম তাহাই আওড়াই, গ্ল্যাডস্টোনের কথামৃত পান করি আর মনে করি ইহাই রাজনৈতিক আন্দোলনের চরম।'[২২] এই বক্তৃতাতেই তিনি বাংলার যুবকদের বিপ্লবীবাদী মনোভাবেরও প্রশংসা করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে ইংরেজ সরকারের অন্যায় আচরণের ফলেই এরা হিংসাত্মক

কাজে লিপ্ত হয়েছে। পরিস্থিতি পাল্টানোর জন্য ইংরেজদেরই মনোভাব পাল্টাতে হবে।[২৩]

১৯১৭-তে হোমরুল আন্দোলনের নেত্রী অ্যানি বেসান্তকে কংগ্রেস সভানেত্রী করতে চাইলে চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে চরমপন্থীদের বিভেদ আবার বৃদ্ধি পায়। সুরেন্দ্রনাথ এই সময় চিত্তরঞ্জনের চরমপন্থী মনোভাবের পরোক্ষ নিন্দা করেছিলেন। তার মনে পুরনো দিনের বিভেদ ও ভিন্ন ধরনের কর্ম প্রণালীর প্রতি চিত্তরঞ্জন সহ অন্যান্য নেতাদের আকর্ষণই সেই সময় কংগ্রেস রাজনীতিতে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছিল।[২৪] এই ভিন্ন ধরনের কর্মপ্রণালী বলতে চিত্তরঞ্জনের চরমপন্থী কার্যকলাপের প্রতি ইংগিত করা হয়েছিলা।

ইতিমধ্যে রাওলাট অ্যাক্ট, জালিয়ানওয়ালাবাগ এবং সত্যাগ্রহকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষে যে গণআন্দোলন শুরু হয়েছিল তার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মহাত্মা গান্ধী। কিছু দ্বিধা দ্বন্দ্ব থাকলেও চিত্তরঞ্জন বুঝেছিলেন যে, চরমপন্থীরা যা পারেনি, গান্ধী তা পেরেছেন। তিনি সাধারণ মানুষকে জাতীয় আন্দোলনে সামিল করতে সক্ষম হয়েছেন। চিত্তরঞ্জন তাই কৌশলগত কারণেই গান্ধীপন্থী আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন। কিন্তু তখনও চরমপন্থী ও জাতীয় বিপ্লববাদীদের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান ছিল। নাগপুর কংগ্রেসে নিজ গোষ্ঠীকে শক্তিশালী করবার জন্য তিনি এই বিপ্লববাদীদের প্রত্যক্ষ সহায়তা নিয়েছিলেন।[২৫] আবার গান্ধীজীর সঙ্গে গোপন বৈঠকের পরে তার আহ্বানে সহিংস বিপ্লবীরা কিছুকালের জন্য নিজেদের ধারার আন্দোলন স্থগিত রেখে গান্ধিজীর সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন। সেই সময় বিশেষ করে বাংলার জেলাগুলিতে মূলত যুগান্তর দলের বিপ্লবীরাই এই আন্দোলন সফল করতে প্রাণ পাত করেছিলেন।[২৬] ১৯১৮ সালের পরেও প্রকাশ্য জনসভায় বিপ্লবীদের সন্ত্রাস সৃষ্টির নামকাওয়াস্তে নিন্দা করে চিত্তরঞ্জন বলেছিলেন 'বিপ্লববাদী হইলেও তাহারা এনার্কিষ্ট নহে।'..... কংগ্রেস ও মুসলীম লীগের যে উদ্দেশ্য এই তথাকথিত এনার্কিষ্ট সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য ঠিক তাহাই'।[২৬] আসলে, চরমপন্থী ও বিপ্লববাদীদের সঙ্গে চিত্তরঞ্জনের যোগাযোগ প্রায় সারাজীবনই বর্তমান ছিল। এমনকি তিনি যখন স্বরাজ্য দলের কাণ্ডারী হয়ে সাংবিধানিক রাজনীতির মধ্যে প্রবেশ করেছেন তখনও তার সাহিত্যিক সহযোগী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কাছে তিনি বিপ্লবীদের সম্বন্ধে দুর্বলতা ও কোমলতা প্রকাশ করেছেন।[২৭] জেলে বন্দী বিপ্লবীদের মুক্তি দানের জন্য ১৯২৪ সালের ২৩শে জানুয়ারি বাংলার ব্যবস্থাপক সভার প্রথম অধিবেশনেই স্বরাজ্য দল আটক বন্দীদের মুক্তি দানের প্রস্তাব তোলে, তাছাড়া ১৯২৪ সালের ২৫শে অক্টোবর সরকার বাংলার বিপ্লবীদের দমন করার আদেশ জারি করলে স্বরাজ্য দল তার বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ

করেন। স্বরাজ্য দলের মত মূলত আইনসভা ভিত্তিক দলেও বিপ্লববাদীদের প্রভাব এতটাই ছিল যে ১৯২৪-এর মে মাসে বাংলা প্রাদেশিক কংগ্রেসে সিরাজগঞ্জ সম্মেলনে কুখ্যাত 'ডে' সাহেবের হত্যা প্রচেষ্টায় জড়িত গোপীমোহন সাহার ফাঁসিতে আত্ম বলিদানের প্রশংসা করে চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে একটি প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল।[২৭ক] এবং সেই বছরে সর্বভারতীয় কংগ্রেসে এই বিষয়টি নিয়ে গান্ধীজীর বিরুদ্ধাচারণ করতেও চিত্তরঞ্জন পিছুপা হননি।

স্বরাজ্য দলের অনেক নেতৃস্থানীয সদস্যই বিপ্লববাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এমন কি চিত্তরঞ্জনের সাহায্যে সুভাষচন্দ্র এবং সত্যেন্দ্রচন্দ্রের মাধ্যমে জার্মানী থেকে বিপ্লবীদের অস্ত্র পাওযারও একটি চেষ্টা সেই সময হয়েছিল।[২৮] ১৯২৪ সালের ২৪শে অক্টোবর বেঙ্গল অর্ডিনান্সের দ্বারা অনেক বিপ্লববাদীদের সঙ্গে চিত্তরঞ্জনের ঘনিষ্ঠ অনুগামী সুভাষচন্দ্র বসু, অনিলবরণ বায ও সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্রকে বিনা বিচারে আটক কবা হলে চিত্তরঞ্জন এদেব কাজেব সমস্ত দায়িত্ব নিজের কাঁধে টেনে নিযেছিলেন।[২৯] এমন কি জীবনের উপান্তে ফবিদপুর প্রাদেশিক সম্মেলনে বৃটিশ সবকাব-এব সঙ্গে সহযোগিতার কথা বলে তিনি সমালোচিত হলেও সেই বক্তৃতাযও চিত্তরঞ্জন বিপ্লবীদের উদ্দেশ্যের সততা ও স্বদেশ প্রেমের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন। কোন আদর্শগত বিভেদের জন্য নয, তাদের কর্মপন্থার সমালোচনা তিনি করেছেন শুধু এইজন্য যে এর ফলে বৃটিশ দমননীতি তীব্রতর হবে আর সাধারণ মানুষও জীবন ও সম্পত্তি নাশের সম্ভাবনা জাতীয় সংগ্রাম থেকে দূরে সরে যাবে।[৩০] এই ফরিদপুর সম্মেলনের পরেই চিত্তরঞ্জন অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ১৯২৫শে দার্জিলিংয়ে তার দেহাবসান হয়।

আমরা আমাদের আলোচনার মধ্যে দিয়ে দেখলাম যে চিত্তরঞ্জন জীবনের বিভিন্ন পর্বে স্বায়ত্বশাসন, অহিংস-অসহযোগ আন্দোলন এবং ডোমিনিয়ান স্টেটাস-এর পক্ষপাতী হলেও তার সমস্ত রাজনৈতিক কাজের প্রাথমিক পর্বে চরমপন্থী রাজনীতির একটি ছাপ থেকেই গিয়েছিল। এটা আমাদের আপাতভাবে বিস্মিত করলেও আমাদের মনে রাখা দরকার যে তৎকালীন ভারতীয় রাজনীতির তথাকথিত চরমপন্থী ও নরমপন্থী ও বিপ্লববাদী সমস্ত দলের নেতৃত্বই পাশ্চাত্য শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর হাতে ছিল। এমনকি জনমুখী হলেও গান্ধীপন্থী আন্দোলনেও এর ব্যতিক্রম ছিল না। এই আন্দোলনের ধারাগুলি সেইদিক থেকে পরস্পরের পরিপূরকই ছিল—সমান্তরাল নয়। আন্দোলনের প্রকরণগত বিরোধ সত্বেও এই আন্দোলনের ধারাগুলিও পরস্পরের সঙ্গে সমঝোতা করেছিল। মধ্যশ্রেণীভুক্ত নেতা গান্ধীবাদী চিত্তরঞ্জন ও চরমপন্থী চিত্তরঞ্জনের সংযোগসূত্রটি এর মধ্যেই লুকিয়ে আছে।

সূত্র নির্দেশ

১. সুনীল দাস, নারায়ণ ও চিত্তরঞ্জন, দেশ সাহিত্য সংখ্যা
২. চিত্তরঞ্জন দাশ, গয়া ভাষণ, দেশবন্ধু রচনা সমগ্র
৩. পুলিনবিহারী দাশ, আমার জীবন কাহিনী, (স) অমলেন্দু দে, পৃ. ১০৪—০৫
৪. গণেশ ঘোষ, সি.আর. দাশ, দেশবন্ধু কমেমরেশন ভল্যুম
৫. নীহাররঞ্জন রায়, দা এমারজেন্স অব ফ্রিডম স্ট্রাগল এ্যান্ড অনুশীলন সমিতি, ভল ১—বি. ভট্টাচার্য, পৃ. ২১, ২২, ২৩
৬. ঐ
৭. চি. র. দাশ, ভাষণ, রচনাবলী, পৃ. ১৫২
৮. " " বিবিধ প্রবন্ধ "
৯. প্রহ্লাদ প্রামাণিক, দেশবন্ধু চি. র., পৃ. ২২-২৩
১০. আচার্য সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পত্রাবলী, ভূমিকা
১১. এন আর রর, এমারজেন্স অব্ অনুশীলন সমিতি, পৃ. ২২
১২. পুলিনবিহারী দাশ, আমার জীবন কাহিনী, পৃ. ১০৫
১৩. সবল চট্টোপাধ্যায়, অনুশীলন সমিতি অ্যান্ড এ রেভিলিউশনারী, পৃ. ৫৯
১৪. সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, বাঙালীর রাষ্ট্র চিন্তা, ১ম পর্ব প. ২৬৯
১৫. হরিদাস ও উমা মুখোপাধ্যায়, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ও জাতীয় আন্দোলন
১৬. হরিদাস ও উমা মুখোপাধ্যায়, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ও জাতীয় আন্দোলন, পৃ. ১২
১৭. হরিদাস ও উমা মুখোপাধ্যায়— উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ও জাতীয় আন্দোলন, পৃ. ১৩৫
১৮. অপর্ণা দেবী, মানুষ চিত্তরঞ্জন, পৃ. ৬৬
১৯. চি. র. দাশ, আলিপুর সওয়াল, রচনাবলী, পৃ. ২৫৯
২০. পুলিনবিহারী দাশ, আমার জীবন কাহিনী, পৃ. ৩১০-১১
২১. মৃণালকুমার বসু, রিফট্ অ্যান্ড রি-ইউনিয়ন-কনট্রাডিকশানস ইন দা কংগ্রেস, পৃ. ২৩৮
২২. চি. র. দাশ, ভবানীপুর বক্তৃতা, রচনা সমগ্র, পৃ. ১৬
২৩. চি. র. দাশ, ভবানীপুর বক্তৃতা, রচনা সমগ্র
২৪. সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এ নেশান ইন মেকিং (বঙ্গানুবাদ), পৃ. ৩০৯
২৫. পুলিনবিহারী দাস, পৃ. ৩৬৮-৬৯
২৬. অমলেশ ত্রিপাঠী, স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস, পৃ. ১০৮
২৬ক. চি. র. দাশ, বক্তৃতা, ১৯১৮, চট্টগ্রাম
২৭. শরৎ চট্টোপাধ্যায়— স্মৃতিকথা, রচনাবলী, পৃ. ১৯৭২
২৭ক. উদ্ধৃতি, হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, দেশবন্ধু স্মৃতি, পৃ. ৩৫৩
২৮. নলিনীকিশোর গুহ, বাংলায় বিপ্লববাদ, পৃ. ৩৪১
২৯. চি. র. দাশ, পৃ. ৩০০
৩০. " " , ফরিদপুর বক্তৃতা, পৃ. ১৮০

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সাংস্কৃতিক মতাদর্শ ও তার বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা

অশ্রুরঞ্জন পাণ্ডা

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায (১৮৯৪–১৯৬১) পেশায ছিলেন মূলত অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্বেব অধ্যাপক। লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয থেকে অবসব নেওযাব পব আলিগড বিশ্ববিদ্যালযে একই বিভাগে অধ্যাপনা কবেছেন। আবাব একই সঙ্গে সাহিত্য, ইতিহাস, সঙ্গীতেব ক্ষেত্রে অনলস চর্চা ও মৌলিক অবদান বেখে গেছেন। বামপন্থী ও মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীব অধিকাবী এই সমাজ বিজ্ঞানী আবাব কিছুদিন সবকাবেব ডাইবেক্টব অফ্ ইনফর্মেশন (১৯৩৮, ২৫শে জানুযাবী — ১৯৪০, ৩১শে অক্টোবব) পদেও কাজ কবেছেন। এহেন উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বেব সাংস্কৃতিক আদর্শগুলি যা তত্ত্বে ও বাস্তবেব নিবিখে সমুজ্জ্বল তা সংক্ষেপে তুলে ধবতে প্রযাসী হযেছি।

১

বাংলায 'সংস্কৃতি' শব্দটি ইংবাজী 'Culture' থেকে সাধাবণভাবে গ্রহণ কবা হযেছে। জর্মন ভাষায এটি হল 'Kulture'। ইংবাজী শব্দটি ল্যাটিন 'Cultura' থেকে এসেছে। ল্যাটিন শব্দটি ল্যাটিন 'Col' ধাতু থেকে এসেছে। এই 'Col' -এব অর্থ 'কৃষ', 'চাষ কবা', আবাব যত্ন করা, পূজা করাও হয।

এই সংস্কৃতি নিযে বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী তাঁদের মতামত দিযেছেন—

(ক) সংস্কৃতি বলতে মার্জিত, পরিশীলিত বিষযকেই বোঝান হয়। রবীন্দ্রনাথেব 'শেষের কবিতায়' অমিতের কথায় 'কমল-হীরের পাথরটিকেই বলে বিদ্যে, আর ওব থেকে যে আলো ঠিকরে পড়ে তাকেই বলে কালচার।' অর্থাৎ যা স্থূল, অমার্জিত তাকে সংস্কৃতির বিষয়বস্তু বলা যায় না, নন্দনতত্ত্ব, নাচ, গান, শিল্প, আর্ট, যাত্রা, থিয়েটার এ সবই এর অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ ঝলসানো রুটি নয় পূর্ণিমার চাঁদ এর বিষয়বস্তু।

(খ) আবার ওগবার্ণ ও নিমকফ্ বস্তুগত সংস্কৃতিরও প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ কবেছেন। খাওয়া থাকা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রভৃতির ক্ষেত্রে মনুষ্যের যে নিরন্তর প্রয়াস, যা ঘর্মে ও কর্মে জড়িয়ে আছে এবং অবশ্যই যা একান্ত বস্তুগত সংস্কৃতির চর্চা তাকে বাদ দিয়ে হতে পাবে না।

(গ) মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গির থেকে শ্রেণী চরিত্রের উপর ভিত্তি করে দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মাধ্যমে অর্থনীতিকে ভিত ও অন্যান্য বিষয়কে উপরিকাঠামো হিসাবে গণ্য করে সংস্কৃতির আলোচনা করা হয়েছে।

(ঘ) আবাব তথাকথিত পিছিয়ে পড়া মানুষের জীবনদর্শনকে লোক সংস্কৃতির মাধ্যমে কৃষিবিজ্ঞানীরা দেখেছেন। আলোকপ্রাপ্ত শ্রেণীর প্রভাব এই আদিবাসীদের জীবনে কী প্রভাব বিস্তার করে র‍্যালিনোভস্কি প্রমুখ লেখকগণ তা আলোচনা করেছেন। নীহাররঞ্জন রায় আদিবাসীদের সংস্কৃতি ও আর্য-সংস্কৃতিব পাশাপাশি অবস্থানকে পরিপূরক হিসাবে দেখেছেন।

উপবন্ত বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এটাই বোঝা যায় যে সংস্কৃতির ব্যপ্তি বিরাট এবং তা একই সঙ্গে গতিশীল। এই প্রসঙ্গে ই.বি. টাইলরের সংজ্ঞাটি প্রণিধানযোগ্য — সংস্কৃতি হল সেই সামগ্রিক বহুধা বিযয যাব মধ্যে জ্ঞান, ধারণা, কলা, নৈতিকতা, আইন, প্রথা এবং অন্য যে কোন দক্ষতা ও অভ্যাসগুলি বযেছে এবং মানুষবা সমাজেব সদস্য হিসাবে তা অর্জন কবে।

২

কোন ব্যক্তির সাংস্কৃতিক ভাবনাচিন্তা তার গতিমণ্ডল ও সমসাময়িক সমাজের দ্বারা প্রভাবিত। ধূর্জটিপ্রসাদের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। যে সমস্ত উপাদানগুলি তাঁর মননশীল দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রভাবিত করেছে সেগুলি সংক্ষেপে জানা দরকার।

(ক) ধূর্জটিপ্রসাদের বাড়ীর পরিবেশ ছিল সাংস্কৃতিক চেতনার বিকাশের সহায়ক। বাবা ভূপতিনাথ উকিল ছিলেন, কিন্তু গান বাজনার প্রতি ছিল গভীর অনুরাগ। ধ্রুপদের প্রতি ছিল গভীর টান। সেতার বাজাতেন আবার ইতিহাসের প্রতি যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। ধূর্জটিপ্রসাদের মা রীতিমত ভাল গাইতে পারতেন। ধূর্জটিপ্রসাদের মাতামহের বাড়ীতে সঙ্গীতের আসর প্রায়ই বসতো।

(খ) ছাত্রাবস্থায় কলা ও বিজ্ঞান উভয় বিষয়েই ধূর্জটিপ্রসাদ পড়েছেন। এন্ট্রান্সে ইংরাজী ও সংস্কৃতে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম হয়েও আই.এস.সি. ক্লাসে ভর্তি হন। আই.এস.সি. পাশ করে বি.এ-তে ভর্তি হন। অনার্স ইংরাজীতে, কিন্তু সঙ্গে নিলেন রসায়নশাস্ত্র এবং গণিত। ইংরাজী অনার্সে ফার্স্ট ক্লাস পেলেও গণিতে খুব ভাল করলেও রসায়নশাস্ত্রের প্র্যাকটিকাল পরীক্ষায় সামান্য কয়েক নম্বর কম পান। পরে আবার বি.এ. পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেন। আবার এম. এ. তে নিলেন ইতিহাস ও একই সঙ্গে ল। অবশ্য আইন পড়া সম্ভব হয়নি, কারণ ক্লাসে নিয়মিত যাওয়া হয়ে উঠতো না। পরে আবার অর্থনীতিতে এম.এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় হন। তাঁর পঠনপাঠনের এই বিষয়গুলির দিকে

তাকালেই বোঝা যায় সাহিত্য, সমাজতত্ত্ব, বিজ্ঞান, অর্থনীতির ক্ষেত্রে কিভাবে সাবলীলভাবে বিশ্লেষণমুখী দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করতে পেরেছিলেন।

(গ) স্কুল কলেজের শিক্ষকদের প্রভাবও তাঁর জীবনে গভীর ভাবে পড়েছিল। অনেকগুলি স্কুল, কলেজে পড়েছিলেন। তাঁর ভাষায়, 'তারপর স্কুলে ঈশান ঘোষের ইতিহাস আর নারায়ণবাবুর সাহিত্য পড়ানো; কলেজে ফাদার পাওয়ার, আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর, জানকীনাথ, ক্ষেত্রমোহন, বিপিন গুপ্ত, ললিত বন্দ্যোপাধ্যায়, তার সঙ্গে সতীশ চট্টোপাধ্যায়ের অঙ্ক আর কৈলাস পণ্ডিতমশাই-এর সংস্কৃত পড়ানো, অঘোর চট্টোপাধ্যায়ের কেমেষ্ট্রী; বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টিফেন সাহেব, মনোমোহন ঘোষেব ইংরাজী বক্তৃতা শোনা, তাব উপর ব্রজেন শীল, বিজয় মজুমদার, রমেশ মজুমদার, বিপিন সেন, অজয দত্ত, সতীশ রায়, সেই সঙ্গে প্রমথ চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ, প্যাট্রিক গেডিস এবং দূর থেকে জগদীশচন্দ্র এবং প্রফুল্লচন্দ্র; বাইরে বাইরে অবনবাবু, গগনবাবু আর অর্ধেন্দু গাঙ্গুলী, কুমারস্বামী, রাধিকা গোঁসাই, কেরামৎ খাঁ, বিশ্বনাথ রাও, দুর্লভবাবু, আরো কত। আমার মনে হতো, সকলেই ক্ষুদ্রে মস্তক হতে বারণ করতেন।'

পরবর্তীকালে লক্ষ্ণৌতে গানের ক্ষেত্রে পণ্ডিত ভাতখণ্ডেজী, রতঞ্জনকার, অতুলপ্রসাদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য ধূর্জটিপ্রসাদ পেযেছিলেন। এদের সকলেব প্রভাব ধূর্জটিপ্রসাদের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলটি গড়ে তুলতে অবশ্যই সাহায্য করেছিল।

(ঘ) ধূর্জটিপ্রসাদ যে সময বড হযে উঠেছিলেন তা ছিল ভারতীয় জাতীযতাবাদের উন্মেষ ও বিকাশের যুগ। স্বদেশিকতা, গান্ধীজীর আদর্শ, স্বরাজদলের কার্যকলাপ, হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক, সন্ত্রাসবাদীদের ভূমিকা সবই তিনি দেখেছেন। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর লেখার মধ্যে দেশের কথা, বিপ্লবের কথা প্রভৃতি রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়গুলি এসেছে।

আবার আন্তর্জাতিক ঘটনাগুলিও তাঁর চিন্তাভাবনাকে অবশ্যই প্রভাবিত করেছিল যার মধ্যে ১৯১৭র রুশ বিপ্লব, ১ম বিশ্বযুদ্ধ, লীগ্ অব নেশনসের গঠন, বিশ্বমন্দা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ উল্লেখযোগ্য। একদিকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সৃষ্টি, আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ, অন্য দিকে ফ্যাসীবাদ, নাৎসীবাদ বিশ্বরাজনীতিতে গভীর প্রভাব বিস্তার করে।

(ঙ) 'বঙ্গবাণী', 'সবুজপত্র', 'কল্লোল', 'উত্তরা', 'পরিচয়' প্রভৃতি পত্রিকার সঙ্গে নিয়মিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ এবং লেখা প্রকাশ তাঁকে সাহিত্যের আবর্তে টেনে এনেছিল। বিতর্ক, মজলিশী আড্ডা তাঁর ছিল প্রাণ। প্রমথ চৌধুরী, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, কিরণশংকর রায়, সতীশচন্দ্র ঘটক, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, বিশ্বপতি চৌধুরী, হারীতকৃষ্ণ দেব, বরদাচরণ গুপ্ত, সুনীতকুমার চট্টোপাধ্যায়,

প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়, সুবোধ চট্টোপাধ্যায়, সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, সুশোভন সরকার প্রমুখ বরেণ্য ব্যক্তিদের সান্নিধ্য ধূর্জটিপ্রসাদের মনোভূমিকে স্বাভাবিকভাবেই সিঞ্চিত করেছিল।

(চ) ধূর্জটিপ্রসাদ শিক্ষক হিসাবে ছিলেন অনন্য। ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল অনেকটা বন্ধুর মতো, সেখানে স্নেহ, প্রীতি, মমতা তাঁকে ভালবাসার শিখরে বসিয়েছিল। গতানুগতিক লেকচারের পরিবর্তে কথোপকথন, আলাপ আলোচনা, বিতর্কের মধ্যে প্রাযই তিনি নিমজ্জিত হতেন। পডাতে গিয়ে একই সঙ্গে সমান্তরাল বিষয়ে আলোচনা করতেন, এমন কি রসজ্ঞভাবে বিষয় বস্তুর বাইরেও ঘটনাগুলি নিয়ে আলোচনায মশগুল হতেন। মুল্‌করাজ আনন্দ ধূর্জটিপ্রসাদের এই জনপ্রিয়তার কারণ হিসাবে তাঁর অসামান্য বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য, বহুপঠন, সত্যানুসন্ধিৎসা, সর্বোপরি সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যকর্মের প্রতিভার উল্লেখ করেছেন।

৩

এই অংশে ধূর্জটিপ্রসাদের সাংস্কৃতিক ভাবনাচিন্তার কয়েকটি মৌলিক বিষয় যা মানুষ ও সমাজকে উন্নত, সংস্কৃতিবান করে গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করছি। এইসঙ্গে বর্তমান সময়ে তার প্রাসঙ্গিকতার বিষয়টিরও উল্লেখ করব।

ক) ব্যক্তিত্ব : ধূর্জটিপ্রসাদের কাছে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের সুষ্ঠু প্রকাশ একটি অন্যতম আকাঙ্ক্ষিত বিষয়। অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান ব্যক্তির এক একটি দিকের উপর জোর দিয়েছে। এই ধরনের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি যথার্থ শিক্ষার অভাবেই ঘটেছে। তাঁর ভাষায় 'Liberty, Equality, Fraternity—সব বরবাদ হয়ে গেল, শিক্ষার দোষে, এখন বসে আছি personality-র আশায়। একবার মনে হচ্ছে কার্ল মার্কসের বাণী মর্মে আঘাত করেছে, যদিও আর্থিক স্বার্থের ভিতর দিয়ে আবার দেখছি অত্যাচারী ও প্রপীড়িত দুইয়ে মিলে অন্যের উপর অত্যাচার করছে, ব্যক্তিত্ব বৈচিত্রকে শ্রদ্ধা না করে।'

বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় নব্যশিক্ষাতন্ত্রের ফলে দশ-পনের বছরের মধ্যে চাষাভুষোরা কেমন মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল; ধূর্জটিপ্রসাদ আশা করেছিলেন সেইরকম শিক্ষা গ্রহণ করে আমরাও মাথা তুলবো, শিরদাঁড়া সোজা করে হাঁটবো, ঋজু হব, আমাদেরও মুখশ্রী ফুটে উঠবে।

কিন্তু সতর্ক ধূর্জটিপ্রসাদ দেখেছিলেন রাশিয়ার পটভূমিতে যা সম্ভব হয়েছিল তা ভারতে প্রযুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা কম কারণ ঐ উপায়ের 'ফ্যাসাদ অনেক, দাম অনেক, সে উপায় আমাদের ধাতে বসবে না। সে উপায় অবলম্বন করতে আমরা পারব না।'

. বিপ্লব ঘটানোর যে সমস্ত উপাদান 'ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিজম,' 'ক্লাস কন্‌সাস প্রলেটারিয়েট নেই', 'পিজেন্ট প্রপিয়েটার' বা যারা কৃষিকার্য চালায় তারা আবার গোঁড়া ধার্মিক।' ধূর্জটিপ্রসাদ দেখেছেন আমাদের দেশের গ্রামে, যেমন পাঞ্জাবে এবং অন্যত্র সমবায় স্পিরিট থাকলেও বৈপ্লবিকভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর সম্ভব নয়। ত্রিশের দশকের অভিজ্ঞতায় ধূর্জটিপ্রসাদ বলেছেন বড়জোর পূর্ব ইউরোপের 'গ্রীন রাইজিং'-এর মতন একটা কিছু হতে পারে, কিন্তু রুশ ধাঁচের কমিউনিজম ভারতে সম্ভব নয়।

ধূর্জটিপ্রসাদ মৈত্রীর নামে, সাম্যের নামে, স্বাধীনতার নামে নিজের 'পার্সোনালিটি' বা ব্যক্তিত্বকে বলি দিতে রাজী নন। তাঁর ভাষায়, 'প্রত্যেকের ব্যক্তিত্বের ভ্যালু ইউনিক, নচেৎ পার্সোনালিটির কোন মানে নেই।'

বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে যখন পৃথিবী জুড়ে 'লিবারেলাইজেসেনের' ঢেউ দেখছি তখন নূতন করে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের উপর আস্থা স্থাপন করা হচ্ছে। তবে ধূর্জটিপ্রসাদ যে ব্যক্তিত্বেব বিকাশের কথা বলেছেন তা ব্যক্তির সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকবে না। ব্যক্তি ও সমাজের সাম্রাজ্যের উপর গড়ে ওঠা এই ব্যক্তিত্বের বিকাশকে 'কন্‌টিনাম' (Continuum) বলেছেন। তাঁর ভাষায়, 'স্বরাজ সাধনা মানে একে ব্যক্ত করার সুযোগ দেওয়া, অর্থাৎ প্রত্যেকের মুখশ্রী ফুটিয়ে তোলা।'

এই ব্যক্তিত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান যে বহুত্ববাদকে তুলে ধরে, দর্শন তার সঙ্গে একাত্মবাদের যোগান দেবে এবং এই সংমিশ্রণের ক্ষেত্রে যে ত্রুটিগুলি দেখা দিবে তা এই ব্যক্তিত্বের দ্বারাই দোষ মুক্ত করা হবে। এইভাবে সমাজবিজ্ঞানকে পুনর্গঠন এবং সামাজিক মূল্যবোধের পুনর্মূল্যায়নের মাধ্যমে ব্যক্তিত্বকে যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব।

এই ব্যক্তিত্বের বিকাশের ক্ষেত্রে যে সমস্ত উপাদান অপরিহার্য তা হলো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, দেশাত্মবোধ, সত্যপথ অবলম্বন। এই ব্যক্তিত্বের বিকাশের মাধ্যমে দেশের ব্যক্তিদেরও বিকাশ ঘটবে।

খ) গণনেতৃত্ব : যথার্থ নেতৃত্বের উপরই সমাজ তথা রাষ্ট্রের কল্যাণ নির্ভর করে। এই নেতৃত্ব অর্জন করতে হলে 'ছোট আমি'কে দূর করার কথা ধূর্জটিপ্রসাদ বলেছেন। অনেকটা শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশের মত। ধূর্জটিপ্রসাদের ভাষায়, 'সাধারণের সুবিধা, উপকার এই মানসিকতাই 'ছোট আমি'কে ডুবিয়ে দিতে পারে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে চিন্তা করলে এবং সেই চিন্তার ফলে প্রকৃত দেশাত্মবোধ জাগ্রত হলে 'ছোট আমি' অবান্তরিত হবে।' এইভাবে যে নেতৃত্ব গড়ে উঠবে তা দেশের প্রধান সমস্যা অন্ন সমস্যা ও স্বাস্থ্য সমস্যার সমাধানের দিকে নজর দেবে।

প্রসঙ্গত এই নেতৃত্বের আলোচনায় ইংরেজ রাজত্বের কুফলের একটি সমাজতাত্ত্বিক দিক ধূর্জটিপ্রসাদ তুলে ধরেছেন। ইংরেজ আমলে এই ধারণা সৃষ্টি করা হয়েছিল যে, 'ভারতের সমাজে এক বিশিষ্ট উপায়ে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে হবে; এক বিশিষ্ট উপায়েই কুশিক্ষিত পিতা, অশিক্ষিত মাতা এবং অর্ধশিক্ষিত মাষ্টারের কাছে শিক্ষিত হতে হবে।' বাড়ী ও স্কুলে এই কেরানি তৈরির মানসিকতাকে ধূর্জটিপ্রসাদ পরিহার করতে আহ্বান জানিয়েছেন।

আবার ইংরেজরা থাকার ফলে ঐ সময় তাদের বিরোধিতা করার মধ্যেই শক্তির ক্ষয় হয়েছে। ধূর্জটিপ্রসাদের ভাষায়, 'আজ যদি ইংরেজ রাজ না থাকত তাহলে শুধু গান্ধীজীই মহাত্মা হতেন না, আরও দু-দশ জন হতেন, মহাত্মা না হোন, মানুষের মতন মানুষ হতেন।' রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, অরবিন্দেরও শক্তিক্ষয় এইভাবে ঘটেছিল।

ধূর্জটিপ্রসাদ যাঁদের গুণাবলী বেশী আছে তাঁদের জন্যও যেমন ভেবেছেন তেমনি সাধারণ মানুষের আত্মনির্ভরতায় এ শক্তি অর্জনের কথাও ভেবেছেন। তাঁর ভাষায়, 'আমরা সকলে 'নেবুলার' (nebular) অবস্থায় থাকতাম না।' বস্তুতপক্ষে ধূর্জটিপ্রসাদ মনোমোহনকারী কয়েকজন নেতৃবৃন্দের চেয়ে গতিশক্তির জাগরণকেই বেশী জোর দিয়েছিলেন।

গ) বিপ্লব ঃ বিপ্লব সম্পর্কে ধূর্জটিপ্রসাদ মোহমুক্ত হয়ে সংকীর্ণ গতানুগতিক পথে না হেঁটে তাঁর বক্তব্য স্বভাবসিদ্ধ মানবতাবাদীর দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে ধরেছেন।

প্রায় বছর দুয়েক ডাইরেক্টর অফ্ ইনফরমেশনের পদে কাজ করার সুবাদে ধূর্জটিপ্রসাদ বুঝতে পেরেছিলেন সাধারণ মানুষ যে তিমিরে সেই তিমিরেই। যেখানে একটা আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজন, সেখানে কেবল মন্ত্রীচক্রের ওলট পালটে চলবে না।

বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষ হলো, অথচ এখানে বিপ্লব হলো না, এর খোঁচা অবাঙ্গালীদের কাছ থেকে ধূর্জটিপ্রসাদকে শুনতে হয়েছে। ক্ষুব্ধ, ব্যথিত ধূর্জটিপ্রসাদ বলেছেন সে সময় বাংলার নেতারা জেলে ছিলেন আর ছেলে-ছোকরার দল, কমিউনিস্টরা বাইরে থেকে তাদের ক্ষমতানুযায়ী চেষ্টা করেছিল, যদিও তা যথাযথ ছিল না। কিন্তু এই বিপ্লব আকাশ থেকে আলোর ঝর্ণাধারার মতো ঝরে পড়ে না। 'ছ-হাত লম্বা পাঞ্জাবী, আর সত্তর ইঞ্চি ভূঁড়িদার শেঠজীর মুখে দুর্ভিক্ষের নাম, বিপ্লবের কথা শোভা পায় না।'

ধূর্জটিপ্রসাদ বিপ্লবের নামে হঠকারিতার প্রতিবাদ করেছেন। বাকুনিনের মিথ্যা ভাষণ, হঠকারিতার তিনি সমালোচনা করেছেন। বাকুনিন প্রচার করেছিলেন মধ্য য়ুরোপে একটা প্রকাণ্ড বিপ্লবী দল তৈরী হয়েছে, যে দল প্রত্যেক দেশেই

বিপ্লবীদের সাহায্য করবে দেশীয় রাষ্ট্রকে ধ্বংস করার জন্যে। এই সংগঠনের অস্তিত্ব বাস্তবে ছিল না। আবার ধূর্জটিপ্রসাদ বলেছেন এই বাকুনিন জেলের ভিতর থেকে জারকে একটা চিঠি লিখেছিলেন ক্ষমা চেয়ে।

ধূর্জটিপ্রসাদ ত্রিশের দশকের ঘটনার বিশ্লেষণে যা বলেছিলেন আজও তা সমান প্রযুক্ত এবং তা হল মূর্খতার সাহায্যে শক্তিশালী রাষ্ট্র ও সে রাষ্ট্রের প্রভু ধনিক সম্প্রদায়কে টলানো যায় না। মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিনের আদর্শ কিছুটা পড়তেই হবে। আবার প্রত্যেক দেশের বিপ্লবের ইতিহাস ও বর্ণনা আছে তাও অনুধাবন করা দরকার: 'শৈব হতে গেলে শিবমন্ত্র জানতে ও শিখতে হবে। তুলসীপাতায় আধুনিক আশুতোষও ভুলে না, তার রুচি বদলেছে।'

তবে বিপ্লব সম্পর্কে ধূর্জটিপ্রসাদের একটি ধারণা বিবর্তনবাদীদের মতো এবং যা বির্তকের সূত্রপাত করে। তিনি বলেছেন, 'জীব জগতে যেমন জন্ম, মৃত্যু, উন্নতি, অবনতি, ক্রমবিকাশ এক একটি ঘটনা, যার গঠন আছে, গতি, বৃদ্ধি, হ্রাস আছে, নিয়ম আছে, তেমনি সমাজ জীবনেও আছে সংস্থান, রক্ষণ, সৃষ্টি, ধ্বংস। যেন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর।' প্রশ্ন উঠতে পারে যে এই বিবর্তনের উপর ছেড়ে দিয়ে কি তার স্বাভাবিক পরিবর্তনের জন্য বসে থাকা যায়? যাইহোক না কেন ধূর্জটিপ্রসাদ শিবকে বিস্ময়ের প্রতীক হিসাবে ধরে তার জন্যে প্রস্তুতির কথা বলেছেন। এই প্রস্তুতির ক্ষেত্রে শ্রমিক, কৃষক শ্রেণীকে অবশ্যই এগিয়ে আসতে হবে। কিন্তু তাদের নেতৃত্ব দেওয়ার কাজটি বুদ্ধিজীবী এবং পার্টিকেই দায়িত্ব নিতে হবে। ধূর্জটিপ্রসাদ ত্রিশের দশকে যা বলে দিলেন বিপ্লবের প্রকরণ হিসাবে এখনও তা সমান প্রযোজ্য।

তবে বিপ্লব যে হিংসার মাধ্যমেই কেবল আসবে মার্কসের এই ধারণার পরিবর্তন সম্পর্কে বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে। পার্লামেন্টারির গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচনের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে এই বিপ্লবের লক্ষ্যে যদি পৌঁছানো সম্ভব হয় তা নিশ্চয়ই অধিকতর কাম্য। তবে ক্ষেত্র বিশেষে ব্যালটে যদি তা সম্ভব না হয় তবে বলপ্রয়োগ বা বুলেটের মাধ্যমেই হয়ত তখন তা গ্রহণ করতে হবে।

ঘ) শ্রেণী: মার্ক্সীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ধূর্জটিপ্রসাদ শ্রেণী বিন্যাসের আলোচনা করেছেন। তাঁর কথায়, 'শ্রেণী কথাটিতে একাধিক প্রত্যয় দানা বেঁধেছে, কিংবা বাঁধছে। প্রথমতঃ উৎপাদনের যন্ত্র ও কলকব্জার মালিকানা। দ্বিতীয়তঃ সেই অধিকারের জোরে আয়ের অসম বিভাগ। তৃতীয়তঃ সামাজিক শ্রম থেকে উদ্বৃত্ত অতিরিক্ত মূল্যের স্বাভাবিক ক্রমবৃদ্ধি ও মূলধনে রূপান্তর। চতুর্থতঃ সেই মূলধনে আবার উৎপাদন প্রক্রিয়ার প্রত্যাবর্তন এবং পঞ্চমতঃ পূর্বের সবগুলো পদ্ধতির সমাবেশে একদল পায় মজুরী, অন্যদল লোটে মুনাফা। এই হল শ্রেণীর ব্যাখ্যা। অতএব দুটি শ্রেণীতে সংঘাত হবেই, যতদিন না লুটনেওয়ালারা গতায়ু হন।"

এই মার্ক্সীয় শ্রেণীবিন্যাস যা ধূর্জটিপ্রসাদ গ্রহণ করেছেন তার বিরুদ্ধে কতকগুলি সমালোচনা আমরা জানি। এখন শ্রেণী শোষণের কলাকৌশল পাল্টাচ্ছে, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন গড়ে উঠেছে, শ্রমিকদের কিছু সুযোগ সুবিধা দিয়ে শ্রেণী শোষণকে দীর্ঘায়িত করা হচ্ছে, শ্রমিকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা অব্যাহত আছে।

তবে ধূর্জটিপ্রসাদ এই শ্রেণীর আলোচনায় যে নতুন মাত্রাটি যোগ করেছেন তা হল শোষিত সম্প্রদায়ের সঙ্গে একদিল হয়ে কাজ করতে পারে যারা তার ও Mass-এর অন্তর্ভুক্ত। ধূর্জটিপ্রসাদ বলেছেন তাঁর পরিবেশ, পেশা, আচার ব্যবহার, জীবনযাত্রা বন্ধুবান্ধব উপরোক্ত শ্রেণীর বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে এক না হলেও মনের দিক থেকে তিনি নিপীড়িত জনগণের সঙ্গেই আছেন। অর্থাৎ বহিরঙ্গের বিপ্লবের নামাবলী যারা গায়ে দিয়ে প্রতিবিপ্লবী কাজ করে তারাই আসল শত্রু, শোষিত শ্রেণীর মুক্তির জন্য আন্তরিক আত্মিক সমর্থনই গুরুত্বপূর্ণ।

ঙ) বাস্তব দারিদ্র মোচন অর্থনীতি: ধূর্জটিপ্রসাদ ক্ষোভের সঙ্গে বলেছেন অর্থনীতির মূল কথা হওয়া দরকার দারিদ্র্যের অপসারণ এবং এক একটি অর্থনৈতিক পরিকল্পনা 'দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য করে গ্রহণ করতে হবে।

তাঁর আমলে রাশিয়া, চীনের ইকনমিক্সকে ধূর্জটিপ্রসাদ স্বাভাবিকভাবেই ভারতের ক্ষেত্রে পুরোপুরি গ্রহণ করা অবাস্তব বলেছেন। অর্থাৎ অনুন্নত, উন্নতিশীল অপরিণত অর্থনীতির জন্যে প্রয়োজনভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। বিভিন্ন অবস্থার জন্যে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ প্রয়োজন।

যে অর্থনীতিতে বর্তমান ব্যবস্থা চলছে তাতে জাতীয় আয় বাড়লেও তার সিংহভাগ সংখ্যা লঘিষ্ঠ শ্রেণীরাই ভোগ করছে। এর পরিবর্তন দরকার। ধূর্জটিপ্রসাদ নীচের তলার মানুষের দারিদ্র মোচনকে অগ্রাধিকার দিতে চেয়েছেন। এই প্রসঙ্গে ভারতীয় পরিকল্পনার দায়িত্বে যে সমস্ত অর্থনীতিবিদ রয়েছেন ধূর্জটিপ্রসাদ তাঁদের সমালোচনা করেছেন।

ধূর্জটিপ্রসাদের এই বিশ্লেষণ প্রশংসনীয়। ধূর্জটিপ্রসাদ অর্থনীতির সঙ্গে জীবনের যোগ চান; গাণিতিক বিশ্লেষণেরও প্রয়োজন রয়েছে, কিন্তু বাস্তব সমস্যাকে অস্বীকার করে কোন তত্ত্বই সার্থক হতে পারে না। তাই ধূর্জটিপ্রসাদ যখন আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের দায়িত্ব নেন তখন সেখানে 'ইকনমিক হিস্ট্রির' পরিবর্তে 'ইকনমিক ডেভেলপমেন্ট'কে গ্রহণ করেন। এইভাবে অর্তনীতির চিন্তায় তিনি সোস্যাল ফোর্সকেই বেশী গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

'মনে এলো' গ্রন্থে বলেছেন, 'ইকনমিস্টরা যখন অঙ্কের ধোঁয়া ছাড়েন তখন তাঁদের সামাজিক রিয়ালিটির কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই।' বুদ্ধির চালাকিকে ধূর্জটিপ্রসাদ সমালোচনা করেছেন।

বস্তুত পক্ষে ৮ম পরিকল্পনার যুগেও.ভারতের বেশীর ভাগ মানুষের উন্নতি হয়নি। অথচ জাতীয় আয়ের, শিল্পের, কৃষির উন্নতি মুষ্টিমেয় সংগঠিত গোষ্ঠী ও ধনিক শ্রেণীর ভোগেই যাচ্ছে। ধূর্জটিপ্রসাদের বক্তব্যকে অনুসরণ করেই বলা যায় যতক্ষণ না নীচুতলার মানুষদের ন্যূনতম ভদ্রজীবন যাপনের সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে, ততদিন উপরতলার বাড়ও বন্ধ করতেই হবে। অর্থনৈতিক উন্নতিই সাংস্কৃতিক উন্নতি কেবলমাত্র সার্থক করতে পারে।

চ) সঙ্গীত: ধূর্জটিপ্রসাদের সাংস্কৃতিক ভাবনা চিন্তায় সঙ্গীতের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। এরিস্টটলের একাডেমীতে সঙ্গীতের স্থান ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ধূর্জটিপ্রসাদ নিজ জীবনে এবং সমাজজীবনে শান্তি, সংহতি ও সমন্বয়ের মাধ্যম হিসাবে সঙ্গীতকে গ্রহণ করেছেন।

ধূর্জটিপ্রসাদ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ভক্ত ছিলেন। ধ্রুপদ ছিল তাঁর প্রাণ। এর নীচে তিনি নামতে চাননি। কীর্তন ভাবালুতার প্রকাশ বলে তাঁর অপছন্দ ছিল। রাধিকা গোস্বামী, পরে লক্ষ্ণৌতে পণ্ডিত ভাতখণ্ডেজীর কাছে তালিম নিয়েছেন। লক্ষ্ণৌর সঙ্গীত জগতে ধূর্জটিপ্রসাদ ছিলেন পরিচিত ব্যক্তিত্ব। অতুলপ্রসাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। রবীন্দ্রনাথের একান্ত ভক্ত, সমঝদার আবার সমালোচক। 'সুর ও সঙ্গতি' বইটি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যুগ্ম লেখক, যা নিশ্চয়ই এক ঈর্ষণীয় ব্যাপার।

সঙ্গীত হলো নিবিড় সীমার বিষয়। তাঁর ভাষায়, 'গোড়া থেকে মনকে সজাগ ও সচেতন না রাখলে সঙ্গীত শিক্ষা pedantry হয়ে যায়। মনকে সজাগ রাখতে হয় কান ও স্বরের উপর চৌকিদারী করার জন্য। প্রাণ কিংবা দরদের কথা এখানে উঠে না।'

ধূর্জটিপ্রসাদের গানের যে বিশুদ্ধতার কথা, ব্যাকরণের উপর জোর দিয়েছেন তার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। কিন্তু গানের ব্যাকরণের সঙ্গে দরদে বা প্রাণের সংযোগ তাকে তো আরও আকর্ষণীয় করে তুলবে। জীবনের অনুভূতিকে আরও সতেজ করে তুলবে।

গান মানুষকে প্রাণের শান্তি যোগায়। একঘেয়ে জীবনে বৈচিত্র্য আনে। ধূর্জটিপ্রসাদের অধ্যাপকীয় জীবনে গান তাঁকে সজীব করে রেখেছিল। অধ্যাপনায় তিনি আনন্দ পেতেন, কিন্তু গান তাঁর মনকে আরও আনন্দময় করে তুলেছিল।

ধূর্জটিপ্রসাদ গানকে রাজা, মহারাজা, নবাবের দরবারে বন্দী রাখতে চাননি। গানের বিশুদ্ধতাকে বজায় রেখেই তিনি তা জনগণের দরবারে হাজির করতে চেয়েছিলেন। ধূর্জটিপ্রসাদের পুত্র কুমারপ্রসাদ এই ক্ষেত্রে তাঁর পিতার সঙ্গে কিছুটা ভিন্নমত পোষণ করেছেন যে এতে ঘরাণার বিশুদ্ধতা নষ্ট হবে। কিন্তু

মানবদরদী ধূর্জটিপ্রসাদ সঙ্গীতকে জননারায়ণের কাছে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন কারণ Indian Music এ তিনি বলেছেন, যে গানের ক্ষেত্রে সমাজতাত্ত্বিক ছাপ লাগানোর ক্ষেত্রে তিনি লজ্জিত নন।

৪

সংক্ষিপ্ত পরিসরে ধূর্জটিপ্রসাদের সাংস্কৃতিক মূল্যায়ন সম্ভব নয়। তবে যে বিষয়গুলি প্রণিধান যোগ্য এবং যার প্রাসঙ্গিকতা এখনও সমান গুরুত্বপূর্ণ তা হল-

(ক) ধূর্জটিপ্রসাদ ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বিরোধী কোন ব্যবস্থাকে সমর্থন করেননি। তার এই Individual থেকে Person এবং তা থেকে personality উল্লেখযোগ্য বিশ্লেষণ। তিনি 'personality'' শব্দটি প্রয়োগ করেছেন এবং এর মাধ্যমেই মার্কসবাদ ও মনুষ্য ধর্মের সমন্বয়ে ঘটাতে চেয়েছেন।

(খ) নিজেকে 'Marxologist' বললেও ধূর্জটিপ্রসাদ কিন্তু মার্ক্সের মূল আদর্শকে সমর্থন করেছেন এবং তা হল শোষণহীন সমাজ, সেখানে সব মানুষের মর্যাদা স্বীকৃত। প্রয়োগ প্রকরণে যুগের প্রয়োজনে মার্কসবাদেরও পরিবর্তন হয়েছে। মার্কসবাদ কোন স্থানু মতবাদ নয়, তা গতিশীল।

(গ) ধূর্জটিপ্রসাদ শুদ্ধচিত্ত Tabula rasa-র কথা বলেছেন। অর্থাৎ মনটি হবে পরিষ্কার শ্লেটের মতো। অপরের ভাল জিনিষগুলি বিচার করে গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা নিরপেক্ষভাবে এই মাধ্যমেই সম্ভব।

(ঘ) রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের মতো ধূর্জটিপ্রসাদ ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সামগ্রিক ঐক্যের উপর জোর দিয়েছেন। পি.সি. যোশী এই প্রসঙ্গে বলেছেন ধূর্জটিপ্রসাদের কাছে সংস্কৃতি যেমন একদিকে শিকড় শূন্য আন্তর্জাতিকতাবাদ নয়, তেমনি আত্ম-কেন্দ্রিক বিচ্ছিন্ন জাতীয়তাবাদও নয়। তিনি Elitism-এর যেমন বিরোধী তেমনি Populism-এর বিরোধিতা করেছেন। ঐতিহ্যের সঙ্গে জনকল্যাণ মূলক আদর্শকে তিনি সমর্থন করেছেন।

গোঁড়ামী মুক্ত, বুদ্ধিবৃত্তিতে উজ্জ্বল, হৃদয়বান, সাধারণের সমব্যথী ধূর্জটিপ্রসাদের ভাবনাচিন্তা এই বিংশ শতাব্দীর শেষেও সমান গুরুত্বপূর্ণ এবং বিশেষ করে ভারতের ক্ষেত্রে তা বিশেষ প্রযোজ্য।

সূত্র নির্দেশ

১

১। সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়—সাংস্কৃতিকী
২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—শেষের কবিতা
৩। নীহাররঞ্জন রায়—কৃষ্টি, কালচার, সংস্কৃতি।
৪। Ogburn and Nimkoff A Handbook of Sociology
৫। রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সমাজ সংস্কৃতি প্রগতি
৬। গোপাল হালদার—সংস্কৃতির বিশ্বরূপ।

২

৭। অশোক রায়—ধূর্জটিপ্রসাদ
৮। Edited by T K N Unnithan Towards a Sociology of India ... Yogendra Singh Culture in India
৯। জনার্ক পত্রিকা—ধূর্জটিপ্রসাদ সংখ্যা

৩

১০। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—দেশের কথা
১১। —মনের কথা
১২। " —Personality & the Social Sciences
১৩। " —বিপ্লবের কথা
১৪। " —সঙ্গীতের কথা
১৫। " —Indian Music
১৬। " —Modern Indian Culture
১৭। " —বক্তব্য (মার্কসবাদ ও মনুষ্যধর্ম)
১৮। " —Diversities
১৯। " —Views and Coenterrews
২০। " —A K Saran THe Faith of a modern tullectual, reflections on D.P. Mukherji Diversities, 1959
২১। P C Joshi Economic & Political Weekly Aug 16, 1986 'Founless of lucunow School & their legeing
২২। কুমারপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগে প্রদত্ত বক্তৃতা—ধূর্জটিপ্রসাদের সঙ্গীত চিন্তা (৩০.৩.৯৫).

বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান, নতুন শিল্প ও শ্রমিক সম্পর্ক: বাটা সু কোম্পানীর শ্রমিক আন্দোলনের একটি প্রতিবেদন (১৯৩৮—৪৭)

নির্বাণ বসু

চেক শিল্পপতি কর্তৃক ১৮৯০-এর দশকে প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বহুজাতিক চর্মশিল্পের প্রতিষ্ঠান বাটা কোম্পানী ভারতে প্রথম পঞ্জীভুক্ত হয় ১৯৩১ সালে। এর পর কলকাতার দক্ষিণ উপকণ্ঠে বজবজের কাছে চামড়ার জুতা তৈরীর বিশাল কারখানা স্থাপিত হয় নবনির্মিত বাটানগর শহরে। ১৯৩৬ সালে কারখানার কাজ শুরু হয় প্রায় ৪,০০০ শ্রমিককে নিয়ে। সম্পূর্ণ আধুনিক শিল্পনগরীতে নতুন প্রযুক্তি নির্ভর বৃহদায়তন জুতা কারখানার সঙ্গে সঙ্গে এদেশে এতদিন পর্যন্ত চালু ক্ষুদ্রাকারে ঘরে হাতে তৈরী জুতার ঐতিহ্যে একটা বিরাট পরিবর্তন এসে গেল। ভারতে প্রথম বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান ও সম্পূর্ণ আধুনিক শিল্প প্রযুক্তি এই দু'দিক থেকেই বাটা কোম্পানী বৈশিষ্ট্য দাবী করতে পারে। তাই এখানকার শ্রমিক আন্দোলন গড়ে ওঠার কাহিনীও উল্লেখ্যযোগ্য।

১

সম্ভবত ১৯৩৭ সালের জুন মাসের কোন সময়ে বিশিষ্ট বামপন্থী ব্যক্তিত্ব ও কম্যুনিস্ট লীগ নেতা সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সভাপতি করে প্রথম শ্রমিক ইউনিয়ন "বাটা স্যু ফ্যাক্টরী ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন" গঠিত হয়।[১] এর গোড়ার দিকে সংগঠন বা কার্যাবলী সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। এমনকি ১৯৩৮ সালের মে মাসের একটি পুলিশ রিপোর্ট পাই যে ভালভাবে সংগঠন গড়ে না তোলা পর্যন্ত সৌমেন ঠাকুর বাটা শ্রমিকদের কোনো ভাবে সাহায্য করতে অস্বীকার করছেন এবং দু'জন স্থানীয় সংগঠক নুংগীর এক দর্জি আবদুল আজিজ এবং বাটা কারখানার শ্রমিক বাবু মিঞা তাঁকে শেষবারের মত চেষ্টা চালাতে অনুরোধ করছেন।[২] এর থেকে মনে হয় যে স্থানীয় সংগঠকদের উৎসাহেই ইউনিয়ন গঠিত হয় এবং তাঁরাই সৌমেন ঠাকুরের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

ঐ বছরের শেষের দিকে ইউনিয়ন এক দাবী সনদ তৈরী করে আন্দোলন শুরু করে ও কোম্পানী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তা নিয়ে আলাপ আলোচনা হতে থাকে। দাবীগুলির মধ্যে ছিল স্থায়ী চাকুরী; প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের ব্যবস্থা, বার্ষিক ছুটি, বেতন বৃদ্ধি ও মাসিক ন্যূনতম ২৫ টাকা বেতন, বাড়িভাড়া কমানো ইত্যাদি।[৩] আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পত্তি যখন প্রায় নিশ্চিত, তখন কোম্পানী হঠাৎ একজন শ্রমিককে বরখাস্ত করে এবং আর একজনকে বোম্বাইতে বদলী করে। এরা দুজনেই ছিল ইউনিয়নের সক্রিয় কর্মী।

এর প্রতিবাদে ১৯৩৯ সালের ৪ঠা জানুয়ারী প্রায় ১,০০০ শ্রমিক অবস্থান ধর্মঘট শুরু করে।[৪] নিয়মিত মিটিং-মিছিল হতে থাকে। উত্তেজনা চরমে পৌঁছায় ৯ই জানুয়ারী। ঐদিন সকালে ইউনিয়ন সম্পাদক ও বিশিষ্ট কম্যুনিস্ট লীগ নেতা বিনয় চ্যাটার্জী ১৪৪ ধারা অমান্য করে এক শ্রমিক সমাবেশে যখন ভাষণ দিচ্ছিলেন, পুলিশ তাঁকে গ্রেফ্‌তার করে। এরপরই গণ্ডগোল শুরু হয়। পুলিশ ও মালিকপক্ষের মতে, শ্রমিকরা মারমুখী হয়ে ওঠে। চ্যাটার্জীকে জোর করে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে। অনুগত শ্রমিকদের নিয়ে ফ্যাক্টরী গেটে যে সব লরি যাচ্ছিল তাদের উপর ইঁট মারতে থাকে। এবং জোর করে কারখানায় ঢুকে পড়তে উদ্যত হয়।[৫] তখন পুলিশ লাঠি চালাতে ও শেষ পর্যন্ত গুলি বর্ষণ কতে বাধ্য হয় যাতে ইউনিয়নের সক্রিয় কর্মী মহঃ ইদ্রিস সহ চারজন গুরুতর আহত হন। অন্যদিকে, ইউনিয়নের বক্তব্য ছিল যে, বিনা প্ররোচনায় শান্তিপূর্ণ পিকেটকারীদের উপর পুলিশ গুলি চালিয়েছে। এর প্রতিবাদেই শ্রমিকরা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে ও ধর্মঘট প্রায় সর্বাত্মক হয়।[৬] বাটানগরে কার্ফু জারী করা হয় এবং সন্নিহিত বজবজ ও মহেশতলা থানা অঞ্চলে সৌমেন ঠাকুর ও অন্যান্য ইউনিয়ন নেতাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়।[৭]

বাটানগরে পুলিশী গুলি চালনার প্রতিবাদে বিভিন্ন মহল সরব হয়ে ওঠে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি ১০ই জানুয়ারী এক প্রস্তাবে ধর্মঘটী বাটা শ্রমিকদের ন্যায্য দাবীর প্রতি সমর্থন জানিয়ে গুলি চালনার তীব্র নিন্দা করে এবং সরকারকে দ্রুত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য বোর্ড অফ কনসিলিয়েশন গঠনের ডাক দেয়। শ্রমিকদের দাবী না মেটা পর্যন্ত বাটা কোম্পানীর তৈরী জিনিষ বয়কট করার জন্য জনসাধারণকে আহ্বান জানান হয়। মৃণালকান্তি বসুকে সভাপতি করে একটি শক্তিশালী বাটা ডিসপ্যুটস কমিটি গঠন করা হয়।[৮] রাজনৈতিকভাবে দেখলে কম্যুনিস্ট লীগ পরিচালিত এই ধর্মঘটের সক্রিয় সমর্থনে বি.পি.টি. ইউ. সি.-র ভিতরে এগিয়ে আসে কংগ্রেস সোস্যালিস্ট, রায়বাদী, বেঙ্গল লেবার এসোসিয়েশন প্রভৃতি গোষ্ঠীগুলি। ব্যক্তিগতভাবে কিছু কংগ্রেস নেতা আন্দোলন সমর্থন করলেও সাংগঠনিকভাবে জাতীয় কংগ্রেস এগিয়ে আসেনি।

কম্যুনিস্ট গোষ্ঠী ও লেবার পার্টি লক্ষনীয়ভাবে নিষ্ক্রিয় ছিল।[9] প্রাদেশিক ছাত্র ফেডাবেশন ধর্মঘটেব সমর্থনে প্রচাব চালায়।[10] ধর্মঘটীদেব সমর্থনে ১০ই থেকে ১৪ই জানুয়াবী প্রতিদিন কলকাতাব বিভিন্ন অঞ্চলে জনসভা কবা হয।[11]

এদিকে ১১ই জানুয়াবী থেকেই অল্পে অল্পে শ্রমিকবা কাজে ফিবতে শুরু করে এবং মালিকপক্ষ ও ইউনিযনেব প্রতিনিধিদেব মধ্যেও আলোচনা শুরু হয। শেষ পর্যন্ত ১৩ই জানযাবী কংগ্রেস নেতা জে.সি. গুপ্তব উপস্থিতিতে উভযপক্ষ এক মীমাংসায় উপনীত হয।[12] পরদিন থেকে ধর্মঘট প্রত্যাহৃত হয। চুক্তিব প্রধান শর্তগুলিব মধ্যে ছিল[13]: তিন মাসেব মধ্যে প্রভিডেন্ট ফাণ্ড চালু কবা, কোনো শ্রমিককে ছাঁটাই কবাব আগে সতর্ক কবা, ববখাস্ত শ্রমিকেব পুনর্বহাল, শ্রমিকদেব [illegible] চিকিৎসা খাতে সুযোগ বৃদ্ধি, ন্যূনতম সাপ্তাহিক বেতন [illegible] ধর্মঘটেব জন্য কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না নেওয়া ইত্যাদি। [illegible] জানুয়াবী সন্ধ্যায় কলকাতাব ইউনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুট হলে হেমন্ত সবকাবেব সভাপতিত্বে [illegible] নাগবিক সভায় ধর্মঘট [illegible] সন্তুষ্টি প্রকাশ কবা হয় [illegible] সহযোগিতাব জন্য কংগ্রেস ও [illegible] প্রতি কৃতজ্ঞতা [illegible]

কিন্তু ধর্মঘটেব সময় [illegible] বোঝাবুঝি শুরু হয। কোম্পানী [illegible] তাবা স্বীকাব কবে না, কোন [illegible] বিধ শ্রমিক [illegible] হলেই তাবা তা মানবে।[14] এই সময় মুসলিম লীগ আসবে [illegible] কবে এখানকাব শ্রমিকদেব অধিকাংশই ছিল মুসলমান। তাদেব মধ্যে [illegible] বিভেদ সৃষ্টি কবাব কৌশল হয। মাঝেবহাট [illegible] এক সভায় মুসলিম লীগ ওয়াকার্স ইউনিযন গঠন কবা হয ও তাব সাধাবণ সম্পাদক হন আহমেদুল্লাহ ভুঁইযা নামে বাটা কোম্পানীব এক শ্রমিক।[15] তবে ১৯৩৯ এব [illegible] মাসেব এক পুলিশ বিপোর্টে পবিষ্কাব বলা হয় যে মুসলিম লীগেব চেষ্টা [illegible] হয়েছে এবং ঠাকুবপন্থীবাই শ্রমিকদেব মধ্যে সক্রিয।[16] সবকাবী বিপোর্ট থেকে আমবা অক্টোবব মাসে বাটা সু ফ্যাক্টবী ওয়ার্কার্স র‍্যাডিকাল পার্টি কর্তৃক "বাটা এমপ্লয়িজ ইউনিযন" গঠনেব খবব পাই।[17] কিন্তু এবা কাবা বা এদেব ভবিষ্যৎ কার্যকলাপেব কোনো কথাই জানা যায না। ইতিমধ্যে দ্বিতীয বিশ্বযুদ্ধ শুরু হযেছে। যুদ্ধ বিবোধী মনোভাবে আগাগোড়া অটল থাকাব জন্য কম্যুনিস্ট লীগ কর্মীদেব উপব চবম দমন পীড়ন চলেছে। এব ফলে স্বভাবতই বাটা ওয়ার্কার্স ইউনিযনেব কাজকর্ম প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। এব পাশাপাশি, যুদ্ধেব সময় চর্মশিল্পেব দারুণ চাহিদা বেড়েছে এবং বাটাব শ্রমিক সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে।

২

দ্বিতীয মহাযুদ্ধ শেষ হবাব পব আবাব নতুন কবে বাটা শ্রমিকদেব সংঘবদ্ধ কবাব চেষ্টা হয। কোম্পানীব তবফ থেকে তখনও সুকৌশলে বাধা দেবাব চেষ্টা হয এবং বাইবেব কোনো নামী নেতাকেও সংগঠনেব সঙ্গে যুক্ত হবাব জন্য পাওযা যাযনি। দুটি ছোট বামপন্থী গোষ্ঠী আব.সি.পি.আই (সৌমেন ঠাকুবেব কম্যুনিস্ট লীগেব পবিবর্তিত নাম) এবং ডেমোক্রেটিক ভ্যানগার্ডস বা ডি.ভি এই সময এগিযে আসে। ১৯৪৫ সালেব আগষ্ট মাসে বাটা মজদুব ইউনিযন গঠিত হয, ও পবে তা বোজষ্ট্রীকৃত হয। সভাপতি হন সুধীব মুখোটি ও সম্পাদক শৈলেন পাল (উভযেই ডি.ভি.দলেব)। কার্যকবী সমিতিতে আব.সি.পি আই সহ বিভিন্ন দলেব অনুগামী প্রতিনিধিবা ছিলেন।[১৮] চাকুবীব স্থাযীকবণ ও [illegible] ছাঁটাইযেব বিরুদ্ধে শ্রমিকদেব মধ্যে অনেকদিনেব পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ছি[illegible] ইউনিযন গঠিত হবাব পব তাব বহিঃপ্রকাশ দেখা দেয মাঝে মাঝে কোন কোন বিভাগে শ্রমিকদেব হঠাৎ ধর্মঘট কবাব মধ্যে। ১৯৪৬ সালেব ৫ই মার্চ একটি বিভাগেব শ্রমিকবা অবস্থান ধর্মঘট শুরু কবে। অবশ্য ইউনিযনেব চেষ্টায সেদিনই ধর্মঘট তুলে নেওযা হয।[১৯]

ইউনিযন সংগঠকবা বুঝেছিলেন যে শ্রমিকদেব দীর্ঘদিনেব নানা দাবী দাওযা নিযে সংগঠিত উপাযে লম্বা লডাইযেব জন্য প্রস্তুত হতে হবে। ইউনিযনেব তবফে স্ট্রাইক ব্যালট গ্রহণ কবা হলে বিপুল সংখ্যক শ্রমিক ধর্মঘট সমর্থন কবে।[২০] এব পব ২৯শে মার্চ ইউনিযন ১৮ দফা দাবীব ভিত্তিতে স্ট্রাইক নোটিশ দেয যাব মধ্যে ছিল বোনাস, ছুটি, বেতন ও মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধি, বাসস্থান, চিকিৎসা ভাতা ও ইউনিযনেব স্বীকৃতি সহ নানা বিষয। অধিকাংশ দাবীই কোম্পানী অংশত মেনে নিতে বাজী হয কিন্তু আলোচনা একটি প্রসঙ্গে ব্যর্থ হযে যায;[২১] তা হল ওযার্কার্স ইউনিযনেব মধ্যে উচ্চ পদস্থ অফিসাবদের অন্তর্ভুক্তি কিছুতেই কোম্পানী মানতে রাজী ছিল না। অন্যদিকে, ইউনিয়ন অপরাপব দাবীগুলি মীমাংসার জন্য আর্বিট্রেশনে বাজী হলেও ইউনিযনেব গঠন সক্রান্ত প্রশ্নে কোনো আপোষে যেতেই অস্বীকৃত ছিল।[২২]

এই অবস্থায ১৮ই এপ্রিল থেকে প্রায ৭,৪০০ বাটা শ্রমিকেব ধর্মঘট শুরু হয়। প্রথম থেকেই মজদুর ইউনিযন সমস্ত রাজনৈতিক দল ও জনসাধাবণের সমর্থন লাভ করতে আগ্রহী ছিল। বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিযন কংগ্রেসের উদ্যোগে ২১শে ও ২৬শে এপ্রিল যথাক্রমে কলকাতার শ্রদ্ধানন্দ পার্ক ও হাজরা পার্কে ধর্মঘটের সমর্থনে সভা হয়।[২৩] ৩রা মে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, কম্যুনিস্ট পার্টি, আব.এস.পি. ও ডি.ভির ছাত্রশাখাগুলির যৌথ উদ্যোগে

এক সভা হয়। এই বয়কট আন্দোলন রাজ্যের অন্যত্রও ছড়িয়ে পড়ে।[২৪] প্রসিদ্ধ সমাজবাদী নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ এক বিবৃতিতে বাটার সংগ্রামী শ্রমিকদের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানান।[২৫] প্রাদেশিক কংগ্রেস সমর্থন করে জনসাধারণকে বাটা ওয়ার্কার্স রিলিফ ফাণ্ডে দান করার আহ্বান জানান।[২৬]

অন্যদিকে ধর্মঘটের কিছু সমালোচনাও হতে থাকে। মুসলিম লীগের মুখপত্র "মার্নিং স্টার" এক সম্পাদকীয়তে অভিযোগ করে যে, মাত্র ৮০ জন অফিসারের ইউনিযন সভ্য হওয়ার দাবীকে কেন্দ্র করে যখন ৭,৪০০ শ্রমিককে ধর্মঘটে ঠেলে দেওযা হয়, তখন তার উদ্যোক্তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে সন্দেহ জাগাই স্বাভাবিক।[২৭] মজদুর ইউনিয়নের ভিতরেও কিছু বিভেদ দেখা দেয়। বিশেষত সৌমেন ঠাকুরের অনুগামীরা প্রচাব করতে থাকেন যে ঠাকুরের মধ্যস্থতায় কোম্পানী যখন শ্রমিকদের আর্থিক দাবীর অধিকাংশই মেনে নিয়েছে তখন সামান্য একটি বিষয়কে নিয়ে ধর্মঘট চালিযে যাবার কোনো যুক্তি নেই। তাঁদের মতে, ইউনিযন কর্মকর্তারা নিজেদের আর্থিক বেনিয়ম চাপা দেবার জন্যই আন্দোলনের আশ্রয় নিযেছেন।[২৮] ইউনিযনের কর্মকর্তারা অবশ্য এই জাতীয প্রচারে তীব্র বিরোধিতা করেন। তাছাড়া, অফিসারদের ইউনিযনে অন্তর্ভুক্তির দাবীই ধর্মঘটের একমাত্র কারণ এই কথাও তাঁরা মোটেই মানতে চাননি।[২৯] ঠাকুরপন্থীরা অবশ্য এই সময়ে সাধারণ শ্রমিকদের মধ্যে তেমন কোনো প্রভাব ফেলতে পারেননি।

ধর্মঘট প্রায একমাস চলার পরে সরকার হস্তক্ষেপ করে। ১৬ই মে শ্রমমন্ত্রী সামসুদ্দিন আমেদের ডাকা এক ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে শেষ পর্যন্ত একটি আপোষ মীমাংসা হয়। মজদুর ইউনিয়ন ২৩শে মে থেকে শ্রমিকদের কাজে ফিরে যেতে আহ্বান জানায়। নিষ্পত্তির শর্তগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে বোনাস, ছুটি, বেতন, মহার্ঘভাতা ও বাসস্থানের ব্যাপারে ধর্মঘটের আগে কোম্পানী যা দিতে রাজী ছিল, অনেকগুলি ক্ষেত্রেই এখন তার চাইতে বেশী দিতে রাজী হল। কিন্তু তারা শ্রমিক ইউনিয়নকে স্বীকৃতি দিল এই শর্তে যে তাতে ম্যানেজমেন্ট ও সুপারভাইসরী ষ্টাফ থাকতে পারবে না। এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে কিন্তু ইউনিয়নকে পিছু হঠতে হল।[৩০]

৩

এই ধর্মঘটের সমাপ্তির কিছুকাল বাদেই যে সাম্প্রদায়িক হানাহানি বাংলা তথা সমস্ত ভারতকে জর্জরিত করে ফেলেছিল, তার সামনে দাঁড়িয়ে শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে ঐক্য রক্ষা করা ছিল এক কঠিন কাজ। বিশেষত বাটা কোম্পানীর মত জায়গায় যেখানে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের শ্রমিক প্রায় সমসংখ্যায় কাজ করে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার জন্য মজদুর ইউনিয়ন শ্রমিকদের মধ্যে নিয়মিত প্রচার ও জনসভা চালাতে থাকে।[৩১]

১৯৪৭ সালের জানুয়ারী মাস থেকে ইউনিয়ন এক নতুন রণনীতি স্থির করে। তা হল সাম্প্রদায়িক ঐক্য রক্ষার জন্য অর্থনৈতিক দাবীকে সামনে রেখে আন্দোলন শুরু করা।[৩২] বস্তুতপক্ষে কলকাতা ট্রাম ও বন্দর শ্রমিকদের সংগঠনের ক্ষেত্রেও কম্যুনিস্ট দলের উদ্যোগে এই একই ধরনের কৌশল নেওয়া হয় এবং দীর্ঘস্থায়ী ধর্মঘট ডাকা হয়। বাটা মজদুর ইউনিয়নের কর্মকর্তারা ডেমোক্রেটিক ভ্যানগার্ড দলের হলেও ইউনিযনের মধ্যে এতদিন সব রাজনৈতিক দলের এমনকি মুসলিম লীগের সমর্থকরাও ছিল। কোম্পানীর পরোক্ষ প্ররোচনায় ও মুসলিম লীগের উদ্যোগে মুসলমান শ্রমিকদের মজদুর ইউনিয়নের আততা থেকে সরিয়ে আনার কূট চক্রান্ত শুরু হয়। ইউনিয়ন আন্দোলনের প্রস্তুতি হিসাবে ১৯শে জানুয়ারী এক শ্রমিক সভা ডাকে। সেই দিনই প্রায ১০০ দুষ্কৃতি ইউনিযন অফিস আক্রমণ করে ভাঙচুর করে ও কয়েকজন নেতাকে মারধর করে। পরের দিন কর্তৃপক্ষ গতদিনের গোলমালে যুক্ত থাকার অভিযোগে মজদুর ইউনিয়নেরই কয়েকজন সক্রিয কর্মীকে বরখাস্ত করে। এর প্রতিবাদে ২১শে জানুয়ারী শ্রমিকরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ধর্মঘট করে। শ্রমিক সমাবেশে মজদুর ইউনিযন নেতারা সমস্ত প্ররোচনার সামনে শ্রমিকদের ঐক্য রক্ষা করার আহ্বান জানান।[৩৩] বিভেদপন্থীরা কিছুটা সফল হয যখন সৈয়দ সুজাত আলি নামে বাটা কারখানার একজন শ্রমিক ও মুসলিম লীগ সমর্থক যিনি এতদিন মজদুর ইউনিয়নের কার্যকরী সমিতিতে ছিলেন বেরিযে এসে বাটা ওযার্কার্স ইউনিয়ন গঠন করেন (১৬ই ফেব্রুয়ারী, ৪৭)। ২২শে ফেব্রুয়ারী মজদুর ইউনিয়নের ডাকে নুংগি ময়দান এক বিশাল সমাবেশে সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে উঠে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়। দুই বিশিষ্ট সি পি আই নেতা বি.টি. রণদিভে ও রণেন সেন এই সমাবেশে ভাষণ দেন। মাত্র ১৫০ জন বাদে সমস্ত শ্রমিক ঐদিন কর্মবিরতি পালন করে। কিন্তু পরের দিন কোম্পানী বেছে বেছে ন'জন সক্রিয় ইউনিয়ন সংগঠককে বরখাস্ত করে।[৩৪]

পরিস্থিতি ক্রমশই উত্তেজক হয়ে ওঠে। এই অবস্থায় ৬ই মার্চ মজদুর ইউনিয়ন কোম্পানীকে ধর্মঘটের নোটিশ দেয়। এর মধ্যে ছিল বেতন, মহার্ঘভাতা, ও বোনাস বৃদ্ধি এবং ছুটি-ও গ্রাচুইটির নিয়ম আরও উদার করার দাবী। দাবীগুলির সন্তোষজনক মীমাংসা না হলে ৪ঠা এপ্রিল থেকে ধর্মঘটের কথা বলা হয়।[৩৫] কোম্পানী এবার প্রথম থেকেই অনমনীয় মনোভাব গ্রহণ করে। শ্রমমন্ত্রী ধর্মঘটের নোটিশ প্রত্যাহার করে বিবদমান বিষয়গুলি আর্বিট্রেশনে পাঠানোর আহ্বান জানান। কিন্তু মজদুর ইউনিয়নও আপোষে আগ্রহী ছিল না, তারাও কোম্পানীর সঙ্গে হেস্তনেস্ত চেয়েছিল। ৪ঠা এপ্রিল থেকে প্রায় ৭,৪০০ শ্রমিকের ধর্মঘট শুরু হয়। আজাদ ও ইত্তেহাদের মত মুসলিম লীগ সমর্থক পত্রিকাগুলি দাবী করে যে প্রায় ২,০০০ মত মুসলিম শ্রমিক ধর্মঘটের ডাক অগ্রাহ্য করেছে। স্থানীয়

মুসলিম লীগ সম্পাদক রহমাতুল্লাহ চৌধুরী এক বিবৃতিতে অভিযোগ করেন যে অনুগত মুসলিম শ্রমিকরা কারখানায় ঢুকতে গেলে ইউনিয়ন সমর্থকরা পুলিশের সামনেই তাদের প্রহার করে।[৩৬] মজদুর ইউনিয়ন অবশ্য এসব অভিযোগই অস্বীকার করে। তারা দাবী করে যে ধর্মঘটী এবং স্বেচ্ছাসেবী উভয়ের মধ্যেই মুসলিমদের সংখ্যাই বেশী এবং মাত্র মুষ্টিমেয় মুসলিম শ্রমিকই ধর্মঘটের বিরোধিতা করছে।[৩৭]

বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ধর্মঘটের সমর্থনে এগিয়ে আসে। সব সময়েই কম্যুনিস্ট পার্টি ছিল পুরোভাগে। কংগ্রেস সোস্যালিস্ট, আর.এস.পি এবং ফরোয়ার্ড ব্লকের মত বামপন্থী দলগুলিও আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানায়।[৩৮] বিশিষ্ট ফরোয়ার্ড ব্লক নেত্রী লীলা রায় সমস্ত বিভেদপন্থী ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন চালানোর জন্য ধর্মঘট তিন মাস অতিক্রান্ত হলে বাটা শ্রমিকদের অভিনন্দিত করে দেশবাসীকে তাদের সমর্থনে এগিয়ে আসতে বলেন।[৩৯] আর একটি মহল থেকেও শ্রমিকরা সমর্থন পেয়েছিল, যা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। কলকাতাব বাটার জুতা দোকানের কর্মচারী ও ম্যানেজাররাও ১৭ই এপ্রিল থেকে ধর্মঘটে নামে ও ক্রমশই তা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে।[৪০]

গোড়ায কর্তৃপক্ষ দমন পীড়নের সাহায্যে ধর্মঘট ভাঙাব চেষ্টা করে। ২৬শে এপ্রিল লরি করে লোক এনে ধর্মঘট ভাঙার চেষ্টা হলে, ইউনিয়নের স্বেচ্ছাসেবীরা বাধা দিতে গেলে পুলিশের লাঠির আঘাতে বেশ কয়েকজন গুরুতর আহত হয়।[৪১] এরপর সাম্প্রদাযিক শান্তি রক্ষার নামে ১৪৪ ধারা জারী করে বাটানগরে সভাসমিতি নিষিদ্ধ করা হয।[৪২] ২৮শে মে ইউনিয়ন অফিস তল্লাসী করা হয় ও পরে কয়েকজন নেতৃস্থানীয় সংগঠককে গ্রেফ্‌তার করা হয়।[৪৩] জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে, ইউনিয়ন নেতাদের বাটানগরে প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়।[৪৪] কিন্তু এতসব সত্ত্বেও শ্রমিকরা তাদের সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ থাকে। তখন কর্তৃপক্ষ নতুন কৌশলের আশ্রয় নেয়। কর্তৃপক্ষ ও ধর্মঘট বিরোধী শ্রমিকদের সংগঠন সুজাত আলির ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের মধ্যে ১০ই জুলাই এক সমঝোতা হয। যার শর্ত অনুযায়ী শ্রমিকদের বেশ কিছু নতুন সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়।[৪৫] এর পর মজদুর ইউনিয়নের পক্ষে ধর্মঘট আর চালিয়ে যাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়ে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক ন্যাশনাল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সম্পাদক দেবেন সেনের মধ্যস্থতায় মজদুর ইউনিয়ন, শপ এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন ও শপ ম্যানেজারস ইউনিয়নের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর আলাপ আলোচনার পর ১০৫ দিন ব্যাপী ধর্মঘটের নিষ্পত্তি হয় ১৮ই জুলাই। ২১শে জুলাই থেকে কারখানা আবার চালু হয়।[৪৬]

বেতন, বোনাস, মহার্ঘভাতা প্রভৃতির ক্ষেত্রে কোম্পানী বেশ কিছু বাড়তি সুবিধা দেয়। ছুটি ও গ্রাচুইটির নতুন নিয়ম করতেও তারা রাজী হয়। দোকান কর্মচারীদের এক বছর কাজের পর কোম্পানীর প্রত্যক্ষ কর্মী বলে মেনে নিতেও

তারা রাজী হয়। মজদুর ইউনিযনের স্বীকৃতি বজায থাকে, দোকান কর্মচারী ও ম্যানেজারদের ইউনিয়নকে এক বছর বাদে স্বীকৃতির কথা বিবেচনা করা হবে বলে কোম্পানী প্রতিশ্রুতি দেয। কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না নিতেও কোম্পানী স্বীকৃত হয়। ৪৪ জন বরখাস্ত শ্রমিকের মধ্যে ৭ জনের বিষয়টি বিবেচনার জন্য সুরেন্দ্রমোহন ঘোষের মধ্যস্থতায পাঠাতে উভয়পক্ষ রাজী হয়। বাকীরা সবাই তখনই পুনর্বহাল হয়। কাজে যোগ দেবার পর শ্রমিকদের আর্থিক দুরবস্থা বিবেচনা করে কোম্পানী এককালীন ভাতা মঞ্জুর করে।

কাজেই দীর্ঘ ধর্মঘট চালিযে শ্রমিকরা যে কর্তৃপক্ষ আন্দোলন শুরুর আগে ছিল অনমনীয় তাদের অনিচ্ছুক হাত থেকে বেশ কযেকটি গুরুত্বপূর্ণ দাবী আদাযে সমর্থ হয়। তবে ইউনিযনের সবচেযে বড় সাফল্য ছিল সমস্ত দমন পীড়ন বিভেদ ও ষড়যন্ত্রের মধ্যেও শান্তিপূর্ণভাবে ঐক্যবদ্ধ ও দীর্ঘস্থাযী সংগ্রাম চালিযে সর্বশ্রেণীর শ্রমিকের প্রতিনিধিত্বমূলক সংগঠন হিসাবে নিজের অস্তিত্ব প্রমাণ করা।

উপসংহার

বাটানগরে বাটা জুতা নির্মাণ কারখানা স্থাপন একাধিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলে চিহ্নিত হতে পারে। এটিই বাংলাদেশে প্রথম বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান। দ্বিতীয়ত পাটকল, সূতাকল, বাগিচা, কযলাখনি বা ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প যখন ১৯৩০-৪০-এর দশকে প্রায় অর্ধশতাব্দীর পুরনো 'ট্রাডিশনাল শিল্পে' পর্যবসিত, তখন জুতা তৈরীব তথা চর্মশিল্পের ক্ষেত্রে নতুন আধুনিক প্রযুক্তি নিয়ে বাটা কোম্পানীব আবির্ভাব। বেতনহার ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা, ছুটি, বাসস্থান, চিকিৎসা সব মিলিয়ে অচিরেই বাটা এই রাজ্যের শ্রেষ্ঠ "শ্রমনিয়োগকর্তার" মর্যাদা পায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও এর সৃষ্টির প্রথম এগারো বছরের মধ্যেই তিনবার (১৯৩৯, ১৯৪৬ ও ১৯৪৭) এখানে বড় ধরনের ধর্মঘট হয়। সাংগঠনিক দিক দিয়ে শ্রমিক ইউনিযনের কর্মকর্তাদের মধ্যে কোন একটি রাজনৈতিক দলের প্রাধান্য থাকলেও ইউনিয়নগুলি সমস্ত রকম রাজনৈতিক মতের অনুগামীদের একছত্রতলে আনতে সক্ষম হয়েছিল। দ্বিতীযত ইউনিয়ন আন্দোলনের সময় জাতীয়তাবাদীদের ও সাধারণ মানুষের সমর্থন সংগ্রহে মনোযোগী ছিল। এই কারণেই ধর্মঘটের পাশাপাশি বাটা বয়কট আন্দোলনও শুরু হয়ে যেত। তৃতীয়তঃ বাটা ফ্যাক্টরী ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন (১৯৩৮—৪২) এবং মজদুর ইউনিয়ন (১৯৪৫) সমস্ত রকম সাম্প্রদায়িক প্ররোচনা ও ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও হিন্দু ও মুসলিম শ্রমিকের ঐক্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল। সর্বোপরি, শ্রমিকদের মধ্যে দক্ষ শ্রমিকের উচ্চ আনুপাতিক হার শ্রমিক শ্রেণীর চেতনাবৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছিল।

মালিকপক্ষের দিক দিযে দেখলে ১৯৩৯ ও ১৯৪৬ সাল উভয় ক্ষেত্রেই তারা নমনীয মনোভাবের পরিচয় দেয। ১৯৩৯ সালে হঠাৎ পুলিসী গুলি চালনাব ঘটনা না ঘটলে সম্ভবত অনেক আগেই কোম্পানী মীমাংসায় উপনীত হতে পাবত। ১৯৪৬-এর ধর্মঘটের সময় অফিসারদের ইউনিয়নে অন্তর্ভুক্তির দাবী নাকচ করা ছাডা অন্যান্য বিষয় গোড়া থেকেই সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী নেয়। ধর্মঘট করেও কিন্তু শ্রমিকরা ওই একটি প্রশ্নে কোম্পানীকে নড়াতে পারেনি। কিন্তু এর পর থেকেই কোম্পানী তাদের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন করে। একদিকে দমন পীডন অন্যদিকে কৌশলে বিভেদ সৃষ্টি উভয় প্রচেষ্টাই চলতে থাকে। তাব সামনে দাঁডিযে একশোরও বেশী দিন ধর্মঘট করে ইউনিয়ন তাব সাংগঠনিক ঐক্যেব প্রমাণ রেখেছিল।

সব দিক দিযে দেখলে বাংলাদেশের শ্রমিক সংগঠন ও আন্দোলনের ইতিহাসে বাটা শ্রমিকরা একটি স্মরণসুন্দর স্থান নিঃসন্দেহে অধিকার করেছিল।

সূত্র নির্দেশ

১. ফোর্টনাইন্টলি বিপোর্ট অফ বেঙ্গল, প্রথমার্ধ, জুন, ১৯৩৭ (সংক্ষপে, এফ. আব)
২. স্পেশাল ব্রাঞ্চ, কলকাতা পুলিশ ফাইল নং ৫৪৭/৩৮, বিপোর্ট তাবিখ ১৩.৫.৩৮
৩. এফ. আব, বেঙ্গল প্রথমার্ধ, জানুয়াবী, ১৯৩৯; অমৃতবাজাব পত্রিকা - ৬.১.৩৯
৪. গভর্ণমেন্ট অফ বেঙ্গল, উইকলি বিপোর্ট অফ ইন্ডাস্ট্রিযাল ডিসপিউটস (ডব্ল্যু. আব. আই. ডি) ৬.১.৩৯
৫. ঐ — ১৩.১.৩৯
৬. হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড— ১০.১.৩৯; অমৃতবাজাব পত্রিকা ১১.১.৩৯
৭. ঐ (৮) ঐ
৯. এস.বি কলকাতা পুলিশ, ফাইল নং ৫৪৭/৩৮, বিপোর্ট তাবিখ ১৩.১.৩৯.
১০. হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ১৩.১.৩৯
১১. অমৃতবাজাব পত্রিকা— ১১.১.৩৯, ১২.১.৩৯, ১৪.১.৩৯
১২. অমৃতবাজাব পত্রিকা—১৭.১.৩৯
১৩. অমৃতবাজার পত্রিকা—১৮.১.৩৯
১৪. ডব্ল্যু. আর. আই. ডি—২১.১.৩৯
১৫. স্টার অফ ইণ্ডিয়া— ১৮.২.৩৯
১৬. এস.বি, কলকাতা পুলিশ প্রাগুক্ত, বিপোর্ট তাবিখ ১১.৫.৩৯
১৭. এফ.আর., বেঙ্গল প্রথমার্ধ, অক্টোবর, ১৯৩৯.
১৮. এ.আই.টি.ইউ.সি ফাইল নং ৫০ (নেহরু মেমোবিয়াল মিউজিয়ম লাইব্রেরী): এস.পাল কর্তৃক এ.আই.টি.ইউ.সি সাধারণ সম্পাদককে ৭.৫.৪৬ তারিখে লিখিত চিঠি; ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চ, বেঙ্গল পুলিশ, ফাইল নং— ৩৫/২৬; সি.পি.আই, বেঙ্গল কমিটির টাইপড রিপোর্ট থেকে উদ্ধৃত।

১৯. আই.বি, ফাইল নং—৩৫/২৬, বাটা স্যু ফ্যাক্টরীর শ্রমিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে ২১.৩.৪৬. তারিখের রিপোর্টের অংশ
২০. ঐ
২১. অমৃতবাজার পত্রিকা—১৮.৪.৪৬
২২. হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড— ২০.৪.৪৬
২৩. অমৃতবাজার পত্রিকা—২২.৪.৪৬; হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ২৯.৪.৪৬
২৪. অমৃতবাজার পত্রিকা—৫.৫.৪৬
২৫. ঐ— ১৫.৫.৪৬
২৬. ঐ—১৬.৫.৪৬
২৭. মর্নিং স্টার—২৭.৫.৪৬
২৮. আই.বি.ফাইল নং ৩৫/২৬ সি.পি.আই বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির ৭.৫.৪৬ তারিখের টাইপড রিপোর্টের অংশ
২৯. অমৃতবাজার পত্রিকা— ১৬.৫.৪৬
৩০. ঐ—২১.৫.৪৬; মর্নিং নিউজ— ১৭.৫.৪৬
৩১. আই.বি.রেকর্ডস—বেঙ্গল পুলিশ অ্যাক্ট (বি.পি এ)— ৩০.১১.৪৬; ১৪.১২.৪৬; ১৮.১.৪৭
৩২. ঐ—১.২.৪৭
৩৩. ঐ—১.২.৪৭; ৮.২. ৪৭; স্বাধীনতা—২৫.১.৪৭
৩৪. বি.পি.এ—৮.৩.৪৭
৩৫. হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড— ৭.৩.৪৭
৩৬. ইত্তেহাদ— ৬.৪.৪৭
৩৭. স্বাধীনতা— ৬.৪.৪৭; ৮.৪.৪৭
৩৮. স্বাধীনতা— ২০.৪.৪৭; ২৭.৪.৪৭
৩৯. অমৃতবাজার পত্রিকা— ৯.৭.৪৭
৪০. ঐ—২৫.৪.৪৭
৪১. হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড— ২৮.৪.৪৭
৪২. স্বাধীনতা—৩০.৪.৪৭
৪৩. অমৃতবাজার পত্রিকা— ৩১.৫.৪৭
৪৪. স্বাধীনতা— ৬.৬.৪৭
৪৫. অমৃতবাজার পত্রিকা— ১৩.৭.৪৭; ১৪.৭.৪৭
৪৬. ঐ— ১৯.৭.৪৭

বাংলাদেশের ভাগচাষী আন্দোলন হাওড়া জেলার ভূমিকা (১৯২০—৪০)

ইরা মিত্র

বর্তমান শতাব্দীর বিশের দশক থেকে শুরু করে চল্লিশের দশকের শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশে ধারাবাহিকভাবে কৃষক আন্দোলন চলেছিল। ত্রিশের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে ভাগচাষী আন্দোলনের রূপরেখাও স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তবে এ বিষয়ে ইতিহাস লেখার কাজ বর্তমান শতাব্দীর সত্তরের দশক থেকে এ ব্যাপারে লেখালেখি শুরু হয়েছে[১]।

এক

উত্তরবঙ্গ ও অবিভক্ত বাংলাদেশের সুন্দরবন অঞ্চলেব মত হাওড়া জেলার জমি বড বড় জোতে বিভক্ত না হলেও এখানে ভাগচাষী সংগঠনের পরিবেশগত কিছু সুবিধা ছিল।

প্রথমত, এখানে ভাগচাষীদের সংখ্যাধিক্য থাকায় তারা নানাভাবে শোষিত হত। জমির মালিকরা এদের থেকে দুভাবে খাজনা আদায় করত। প্রথম পদ্ধতি অনুসারে চাষের কোন খরচ বহন না করেই জমির মালিকরা উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক পেত। মালিকরা ওজনে কারচুপি করে আরও বেশি আদায় করত। জমিদারদের খাসজমির ভাগচাষীদের আরও নানারকম বাজে আদায় দিতে হত। একর প্রতি উৎপন্ন ফসলের নির্দিষ্ট পরিমাণ ফসল হোক বা না হোক জমির মালিককে খাজনা হিসাবে দিতে হত। এক্ষেত্রেও ওজনের কারচুপি ছিল। একে বলা হত "ক্ষৎ খামার পদ্ধতি"। জমি নিজে চাষ করার থেকে ভাগচাষীদের সাহায্যে চাষ করা অনেক লাভজনক ছিল বলে জমিদার থেকে জোতদার এবং সম্পন্নচাষী সকলেই ভাগচাষীদের দিয়ে জমি চাষ করাত। অন্যদিকে এক একর থেকে পাঁচ একর পর্যন্ত জমির মালিক চাষীর সংখ্যা অনেক ছিল[২]। এরাও ভূমিহীন ভাগচাষীদের মত অপর জমি ভাগে নিয়ে চাষ করত। এর ফলে এখানে যথেষ্ট সংখ্যক ভাগচাষী ছিল তাই নয়, ছোট চাষী ও প্রান্তিক চাষীদের মধ্যে সামাজিক বৈষম্যও বিশেষ ছিল না।

দ্বিতীয়ত, এই অঞ্চলে কৃষক সংগঠনের আরও একটা বিশেষ সুবিধা ছিল। হাওড়া জেলার শহরাঞ্চলে যেমন ছোট বড় অসংখ্য শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল তেমনি প্রত্যন্ত অঞ্চলেও অনেক ছোট ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়েছিল।

এর ফলে শহরাঞ্চলের কাছাকাছি এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলের গ্রামের কৃষকরা কৃষি কাজের সঙ্গে সঙ্গে শিল্প কারখানায় কাজ করত। অতএব অন্য যে কোন অঞ্চলের তুলনায় এখানকার কৃষকদের মধ্যে শ্রেণী চেতনা বোধ গড়ে তোলা অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল।

তৃতীয়ত, হাওড়া জেলার আমতা ও উলুবেড়িয়া মহকুমার বেশ কিছু গ্রামে মুসলমান চাষীদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব তেমন ছিল না। সরকারী নথিতে হাওড়ার শিল্পাঞ্চল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার খবর পাওয়া গেলেও গ্রামাঞ্চলে তেমন কোন খবর পাওয়া যায় না। ১৯৩২ সালে সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ ঘোষণার পরেও মুসলিম মৌলবাদী গোষ্ঠী এখানে শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারেনি। এইসব গ্রামগুলিতে নিখিল বঙ্গ প্রজাদলের কয়েকটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়।[৩]

দুই

পরিবেশগত এত সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও বিশের দশকে এবং ত্রিশের দশকের প্রথম দিকে হাওড়া জেলায় রাজনৈতিক দলগুলির তরফ থেকে কৃষকদের সংগঠিত করার তেমন কোন প্রয়াস নেওয়া হয়নি। এর সম্ভাব্য কারণ হিসাবে মনে হয় যে যে সমস্যার জন্য অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনের সময় কৃষকদের সংগঠিত করার চেষ্টা করা হয়েছিল এখানে সেই সমস্যাগুলি ছিল না। প্রথমত, হাওড়া জেলার কোন অঞ্চল মেদিনীপুর বা ক্যানিং সাহেবী জমিদারী কোম্পানির অন্তর্ভুক্ত ছিল না। দ্বিতীয়ত, এই অঞ্চলে পাটের চাষ হত না। ফলে পাট উৎপাদনের পরিমাণ কমানোর জন্যে যে আন্দোলন হয়েছিল এখানে তার প্রয়োজন ছিল না। তৃতীয়ত, বহু জায়গাতে সরকারের জমি জরিপের এবং ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপনের প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করার জন্যে অসহযোগ এবং আইন অমান্য আন্দোলনের সময় জাতীয় কংগ্রেসের স্থানীয় সংগঠনগুলির তরফ থেকে কৃষকদের সংগঠিত করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছিল[৪]। অসহযোগ আন্দোলনের সময় অন্যান্য জায়গার মত হাওড়া জেলার বিভিন্ন গ্রামে কংগ্রেস গ্রাম সালিশী-বোর্ড প্রতিষ্ঠা করেছিল। আমতা মহকুমার অন্তর্গত বাঁকুড়া গ্রামের তরুণ সংঘের সদস্যরা অসহযোগ আন্দোলনে অংশ নিয়েছিল। তারা কৃষক সংগঠনের চেষ্টা করেছিল[৫]। তাদের উদ্দেশ্য ছিল নিছক রাজনৈতিক। রাজনৈতিক দলগুলির কৃষকদের উপর প্রভাব না থাকায় ১৯৩৪ সালে কংগ্রেস সমাজবাদী দল হাওড়া জেলাতে শাখা প্রতিষ্ঠার সময় শুধুমাত্র ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীদের নিয়ে গঠন করতে হয়েছিল। শিবনাথ বন্দোপাধ্যায় ছিলেন ঐ শাখার সভাপতি। ১৯২০—২১ সালে গ্রামে স্থাপিত কিছু সংখ্যক কংগ্রেস শাখা, যেমন তরুণ সংঘ, কংগ্রেস সমাজবাদী

দলের গ্রামীণ শাখায় রূপান্তরিত হয়। তরুণ সংঘের সদস্যরাই প্রথম হাওড়া জেলাতে ধারাবাহিকভাবে কৃষক সংগঠন গড়ে তোলার কাজ হাতে নেন।

তিন

১৯৩৫ সালের ভারত সরকারের আইনে শহরের মানুষের তুলনায় বেশি সংখ্যক গ্রামেব মানুষকে ভোটদানের অধিকার দেওয়া হয়েছিল। বাৎসরিক চার আনা হারে চৌকিদারি খাজনা দিলেই গ্রামে বসবাসকারী মানুষ ভোটদানের অধিকার পেয়েছিল[৬]। এই কারণে দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী সব রাজনৈতিক দলেব পক্ষ থেকেই কৃষকদেব সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা হযেছিল। ১৯৩৬ সালে জাতীয় কংগ্রেসের ফৈজপুর অধিবেশন থেকে সমস্ত প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিগুলিকে আলাদা করে কৃষক সমিতি গঠন করার নির্দেশ[৭] দেওয়া হয। সেই অনুসারে কংগ্রেস সমাজবাদী দল পরিচালিত হাওড়া জেলা কমিটি কৃষক সমিতি গঠন করে।

হাওড়া জেলাতে এইভাবে যখন কৃষক সংগঠন গড়ে তোলার প্রস্তুতি চলছিল, ঠিক তখনই; অর্থাৎ ১৯৩৬ সালে জমিদার মন্মথনাথ মান্নার জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত আমতা মহকুমার পানশীলা গ্রামে সরকারের তরফ থেকে জমি জরিপের কাজ শেষ করা হযেছিল। এব ফলে জমিদার কর্তৃক বেদখল করে বাখা অনেকটা জমি ধবা পড়ে। এই জমির স্বত্ব আদায় করার জন্যে সংশ্লিষ্ট কৃষকদের মধ্যে দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি হয। এই অবস্থা কংগ্রেস সমাজবাদী দলকে কৃষকদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের সুযোগ করে দেয়। তরুণ সংঘের সদস্যরা কৃষকদের সাহায্য করার জন্যে স্থানীয এলাকাতে কয়েকটি কৃষক সমাবেশের আযোজন করেন। চাপে পড়ে জমিদার শেষ পর্যন্ত বেদখলী জমির উপর কৃষকদের স্বত্ব ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হন[৮]। একই দাবিতে আশপাশের জমিদারীতে কৃষক সমাবেশ করা শুরু হয়। অনেক জমিদারই বেদখলী জমির উপর দখল ছেড়ে দেন। এতে কৃষকদের মধ্যে দারুণ উৎসাহের সৃষ্টি হয়। প্রায় প্রতিটি গ্রামে কৃষক সমিতি প্রতিষ্ঠা হয় এবং নিয়মিতভাবে তহবিল সংগ্রহ শুরু হয়[৯]। কৃষক সমিতিগুলি কর্তৃক আয়োজিত সমাবেশগুলি ছিল নির্বাচনী প্রচারের নামান্তর। প্রতিটি সমাবেশেই যথেষ্ট পরিমাণে কমিউনিস্ট আদর্শের প্রচার করা হত। এই সব মিছিল ও সমাবেশে যোগদানের ফলে কৃষকদের মধ্যে এমন উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল যে জায়গায় জায়গায় স্বতস্ফূর্তভাবে জমিদারবিরোধী আন্দোলন শুরু হয়ে যায়।[১০]

কয়েকমাস আন্দোলন চলার পরে নেতৃত্বের একটা অংশের তরফ থেকে এবং আন্দোলনকারী কৃষকদের পক্ষ থেকে জমিদারদের খাস জমি যারা আগে চাষ করত তাদের সংঘবদ্ধ করে সক্রিয়ভাবে জমিদারদের বিরুদ্ধে আন্দোলন

গড়ে তোলার দাবি উঠেছিল[১১]। নেতারা সরাসরি এই দাবির বিরোধিতা করেননি বরং আন্দোলন শান্তিপূর্ণ পথ থেকে যে ক্রমান্বয়ে সরে এসে হিংসাত্মক হয়ে উঠছে এটা বুঝতে পেরে নেতৃত্ব যথেষ্ট পরিমাণ সতর্ক হতে শুরু করেছিল। ১৯৩৬ সালের আমন ধান কাটার মরসুমে নেতারা নিজেরা জমিদারদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে ভাগচাষীদের দাবি আদায়ের প্রয়াস নিয়েছিলেন। কিন্তু জমিদাররা ফসল ভাগের ব্যাপারে নেতাদের সঙ্গে কোনরকম সমঝোতায় আসতে রাজি হননি।

এতে নেতাদের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি না হলেও ভাগচাষীদের মধ্যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হযেছিল। ফসল ভাগের সময় অনেক জায়গাতেই ভাগচাষীরা ফসলের ভাগ নেবার জন্যে জমিদারদের খোলানে উপস্থিত হয়নি, শেষ পর্যন্ত জমিদাররা একক ভাবে ফসল ভাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ১৯৩৭ সালের প্রথম দিকে প্রাপ্ত সবকারি নথিতে স্বীকার করা হযেছে যে ভাগচাষীদের সঙ্গে জমিদারদের সম্পর্কের অত্যন্ত অবনতি হয়েছিল।[১২] অপরদিকে কংগ্রেস সমাজবাদী দলের নেতারা সংঘর্ষের পথে না গিয়ে বরং আন্দোলনের মোড় ঘোরানোর চেষ্টা করছিলেন। এই সময হাওডা জেলায় বিদেশীদের পরিচালিত চটকলগুলিতে ধর্মঘটের প্রস্তুতি হিসাবে শিবনাথবাবু চটকলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কৃষি শ্রমিকদের সংঘটিত করার চেষ্টা চালিয়ে ছিলেন। এর ফলে অনেক জায়গাতেই জমিদার বিরোধী আন্দোলন সাময়িকভাবে অনেকটা স্তিমিত হয়ে এসেছিল। এই সম্পর্কে জমিদার মন্মথনাথ মুখার্জীর নাম করা যেতে পারে।

১৯৩৮ সালের প্রথমেই হাওড়া জেলায় ইউনিয়ন বোর্ডের নির্বাচন ছিল। কৃষক বিক্ষোভকে প্রশমিত করার ব্যাপারে এটাকে আরও একটা সুযোগ হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছিল। কংগ্রেস সমাজবাদী নেতারা নির্বাচনের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। নির্বাচনী প্রচারেব উদ্দেশ্যে গ্রামগুলিতে বিশেষ করে যে সমস্ত অঞ্চলে ইতমধ্যে কৃষকরা জমিদারদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রকাশ করতে শুরু করেছিল সেই সব গ্রামাঞ্চলে বড় বড় কৃষক সমাবেশের আয়োজন করা হয। পূর্ববঙ্গ থেকে ২/৪ জন কম্যুনিস্ট নেতাকে এনে নির্বাচনী প্রচার সম্পূর্ণভাবে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে করা হয়।[১৩]

কংগ্রেস সমাজবাদী নেতারা কৃষক আন্দোলনের উপর নিজেদের কর্তৃত্ব বজায় রাখার ব্যাপারে এর পরেও হাল ছাড়লেন না। ইউনিয়ন বোর্ডের নির্বাচন শেষ হলেই তাঁরা আমতা মহকুমার বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত ছোট ছোট শিল্প কারখানায় ধর্মঘট পরিচালিত করার প্রস্তুতি শুরু করেন। ঐ সব কারখানার সঙ্গে যুক্ত স্থানীয় কৃষকদের ধর্মঘটের ব্যাপারে সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে শিবনাথ বন্দোপাধ্যায়ের সঙ্গে যোগযোগ করা হয়। ১৯৩৭ সালে চট শিল্পের ধর্মঘটের সমর্থনে কৃষকদের

সংগঠিত করতে যে সমস্ত কর্মী শিবনাথবাবুকে সাহায্য করেছিলেন তাঁরা অনেকেই ঐ সব গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। কিন্তু এত প্রস্তুতি সত্ত্বেও ধর্মঘট সংঘঠন করা সম্ভব হয় নি[১৪]। বরং নেতাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কৃষকদের মধ্যে ক্রমান্বয়ে সন্দেহ ঘনীভূত হতে থাকে এবং এই সন্দেহ থেকেই বিকল্প নেতৃত্বের প্রতি তারা আকৃষ্ট হতে শুরু করে।

১৯৩৭ সালের শেষের দিকে, ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির হাওড়া জেলা শাখা স্থাপিত হয়। প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের মধ্যে ছিলেন এম. এ. ফারুকী, সজল দাস, সন্তোষ গাঙ্গুলী, পতিতপাবন পাঠক এবং ডাঃ নিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। অল্প কিছুদিন পরে কালি মুখোপাধ্যায, নরেশ দাশগুপ্ত এবং হরিসাধন মিত্র ঐ শাখাতে যোগ দেন। ১৯৩৮ সালে জেল থেকে বেরিয়ে কিছু ছাত্রনেতা যেমন বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, জীবন মাইতি, অমর মুখোপাধ্যায় এবং আরও অনেকে সর্বক্ষণের কর্মী হিসাবে কম্যুনিস্ট পার্টির হাওড়া শাখায় যোগদান করেন। কংগ্রেস সমাজবাদী দল কর্তৃক পরিচালিত কৃষক সমিতিগুলির কিছু বিক্ষুব্ধ নেতাও, যেমন সুরথ পাঞ্চাল, কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন[১৫]।

ইতিমধ্যেই বাংলাদেশে বহু জেলাতে ছোট এবং প্রান্তিক চাষীদের সংগঠিত করার কাজ ব্যাপকভাবে শুরু হযেছিল। যেমন উত্তরবঙ্গের দিনাজপুর, রঙপুর এবং জলপাইগুড়ি জেলায আঁধিয়ার আন্দোলন, মৈমনসিংহে হাজং আন্দোলন, বর্ধমানে দামোদর বাঁধের খাজনার বিরুদ্ধে আন্দোলন, উত্তর চব্বিশ পরগণা এবং খুলনা জেলার অন্তর্ভুক্ত সুন্দরবনে ভাগ চাষীদের আন্দোলন চলছিল। কম্যুনিস্ট পার্টির হাওড়া শাখা গঠিত হওযার পরেই আমতা মহকুমার ভাগচাষীদের সংগঠিত করার কাজে হাত দেওয়া হয়[১৬]। ১৯৩৮ সালে এপ্রিল মাসে বোরো ধান কাটার মরসুমে আমতা মহকুমার জয়পুর, বাহিরঘাট, সাতগাছিয়া, মুখবেড়িয়া ইত্যাদি থানা এলাকাতে কম্যুনিস্টদের নেতৃত্বে ব্যাপকভাবে ভাগচাষী আন্দোলন গড়ে উঠে। জমিদারের খোলানে ধান না তুলে মাঠ থেকেই আধাআধি ভাগ করার দাবিতে ভাগচাষীরা নেতাদের নির্দেশে বিক্ষোভ দেখায়। আমন ধান কাটার মরসুমে অর্থাৎ নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে ঐ সব জায়গাতে আন্দোলন আরও শক্তিশালী আকারে দেখা দেয়। জয়পুর থানার ভাগচাষীরা তাদের শর্ত না মানলে তারা ফসলের কোন ভাগ দেবে না বলে জমিদারদের ভয় দেখায়। সাতগাছিয়া, মুখবেড়িয়া, বাহিরঘাট ইত্যাদি জায়গাতে মাঠে জমা করা কাটা ফসল মাঠে ভাগ না করে লেঠেল বাহিনীর সাহায্যে জমিদাররা নিজ নিজ খোলানে তোলার চেষ্টা করলে ভাগচাষীদের সঙ্গে তাঁদের সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। অবস্থা আয়ত্বে আনার জন্যে শেষ পর্যন্ত জেলা প্রশাসনকে ঐ সব এলাকাতে ১৪৪ ধারা

জারি করতে হয়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ফসলের আধাআধি ভাগের সঙ্গে সঙ্গে ভাগচাষীরা জমির উপর স্বত্ব এবং "ক্ষুৎ খামার খাজনা" ফসলে প্রদান না করে টাকায প্রদান করার দাবিতেও বিক্ষোভ দেখাচ্ছিল[১৭]।

হাওডা জেলা শিল্প প্রধান এবং আগেই বলা হযেছে যে এখানকার কৃষকদের একটা বড অংশ শিল্প কারখানার সঙ্গে যুক্ত ছিল। এর ফলে কম্যুনিস্টদের আদর্শ এখানকার কৃষকদের মধ্যে দ্রুত প্রসার লাভ করতে পারে এই আশঙ্কা করে জেলাশাসক এবং জেলার কালেক্টর জমিদার ও ভাগচাষীদেব বিবাদের মীমাংসা করার জন্যে নিজেরাই দ্রুত হস্তক্ষেপ করেন। তাঁরা ভাগচাষীদের উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক ভাগ জমিদারকে দিতে এবং জমিব স্বত্ব লাভের জন্যে কালেক্টরেব কাছে আবেদন করার পরামর্শ দেন। তবে জমিদারবা নিজেরাই ঐ ব্যবস্থার বিরোধিতা করছিলেন। তারা ববং আন্দোলন যাতে নেতৃত্বহীন হযে পড়ে তাব জন্যে কম্যুনিস্ট নেতাদের বিরুদ্ধে নানা ধরনের অভিযোগ, এমনকি খুনের অভিযোগ পর্যন্ত পুলিশের কাছে দায়ের কবা শুরু করেছিলেন। কিন্তু সমস্ত অভিযোগ মিথ্যা বলে প্রমাণিত হওযায প্রশাসনের পক্ষে কম্যুনিস্ট নেতাদের বিরুদ্ধে এই পর্যায়ে কোনবকম আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয়নি। প্রশাসনের তরফ থেকে চাপ সৃষ্টি করায় জমিদাররা শেষ পর্যন্ত অধিকাংশ জায়গাতে ভাগচাষীদের সঙ্গে বিবাদ মিটিযে নিতে বাধ্য হযেছিলেন[১৮]।

ভবিষ্যতে যাতে এই সব অঞ্চলে নূতন করে গণ্ডগোলের সূত্রপাত না হয তার জন্যে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে আগাম কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয। ব্যাপকভাবে গ্রামোন্নয়নেব কাজ হাতে নেওয়া হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল অবসর সময়ে কৃষকদের ব্যস্ত রাখা এবং তাদের জন্যে কিছু বাড়তি আয়ের ব্যবস্থা করা[১৯]।

কিন্তু এই ব্যবস্থা যে মোটেই যথেষ্ট ছিল না তা অল্পদিনের মধ্যেই প্রমাণিত হয়েছিল। আমতা মহকুমা, যেটা কৃষক আন্দোলনের মূল ঘাঁটি ছিল, তার সব অঞ্চলে এবং উলুবেড়িয়া মহকুমাতে কৃষকদের মধ্যে সংঘবদ্ধ হওয়ার বিপুল উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়। এতে জোতদার ও সম্পন্ন চাষীদের জমিতে যারা ভাগচাষী তারাও ছিল। "ক্ষুৎ খামার খাজনা" প্রথা তুলে দেওয়ার দাবিতে আন্দোলন শুরু করার দাবিও উঠেছিল। কৃষকদের মধ্যে সংগঠিত হওয়ার এতটা উৎসাহ লক্ষ্য করে কম্যুনিস্ট পার্টির হাওড়া শাখা ১৯৩৮ সালে আলাদা করে কৃষক সমিতি গঠন করে। নবগঠিত কৃষক সমিতি আমতা সহ হাওড়া সদর এবং উলুবেড়িয়া মহকুমাতে অল্প কিছু দিন অন্তর অন্তরই কৃষক সমাবেশের আয়োজন করতে শুরু করে, বিপুল উৎসাহ ভরে হাজার হাজার কৃষক দূর দূর গ্রাম থেকে পায়ে হেঁটে এসে ঐ সব সমাবেশে যোগ দিত। ১৯৩৯ সালে হাওড়া

জেলার উলুবেড়িয়া মহকুমাতে ভাগচাষী আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। আমতা ও উলুবেড়িয়া মহকুমার কয়েকটি অঞ্চলে অর্থে "ক্ষুৎ খামার খাজনা" প্রদান শুরু হয়[২০]।

এই সময়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছিল। অন্যান্য জায়গার মত কম্যুনিস্ট পার্টি দ্বারা পরিচালিত কৃষক সমিতিগুলি দলের নির্দেশ অনুযায়ী কৃষকদের দাবী-দাওয়া প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ বিরোধী প্রচারও শুরু করে। এতে সরকারে পক্ষে কৃষক আন্দোলনের নেতা কর্মীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা সহজ হয়। বাইরে যে সমস্ত কম্যুনিস্ট নেতারা আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন এবং কৃষকদের মধ্যে যে সমস্ত সর্বক্ষণের কর্মী তৈরি হয়েছিল সকলের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। আন্দোলনকারী কৃষকদের উপরেও দারুণ পুলিশি নির্যাতন চলতে থাকে। বহু জায়গায় কৃষক সমিতির অফিস পুলিশ ভাঙ্গচুর করে অনেক নথিপত্র বাজেয়াপ্ত করে। সরকারের অকথ্য অত্যাচারে কৃষক আন্দোলনে কর্মী এবং অর্থের অভাব দেখা দেয়। এ বাদে গণ-আন্দোলন সংকুচিত হওয়ায় ক্রমান্বয়ে প্রাদেশিক রাজনীতিতে মৌলবাদীদের প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে। এর ফলে মুসলমান কৃষকরা কম্যুনিস্ট পার্টি পরিচালতি আন্দোলনের প্রতি অনীহা প্রকাশ কতে আরম্ভ করে। সব মিলিয়ে যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় অন্যান্য জায়গার মত হাওড়া জেলায় গড়ে ওঠা ভাগচাষী আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে।

চার

হাওড়া জেলার কৃষক আন্দোলন, যা অচিরেই সুসংগঠিত ভাগচাষী আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়েছিল, বাংলাদেশের অন্যান্য জেলার কৃষক আন্দোলনের ক্ষেত্রে কিছুটা ব্যতিক্রম। বিশের এবং ত্রিশের দশকের প্রথমে সরকারের তরফ থেকে যেখানে যেখানে জমি জরিপ করার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছিল অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনের নাম করে জমিদার ও জোতদার অধ্যুষিত স্থানীয় কংগ্রেস সংগঠন সেখানে সেখানে বিরোধিতা করেছিল। এখানে কংগ্রেস সংগঠন জরিপের কাজে বাধা সৃষ্টি নয়, জরিপের পর বেদখলী জমি যাতে কৃষকরা ফিরে পায় তার জন্যে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিল। হাওড়া জেলায় কৃষক আন্দোলনের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য ছিল শিল্প কারখানার সঙ্গে যুক্ত কৃষকদের সংগঠিত করার ব্যাপারে কংগ্রেস সমাজবাদী দলের পক্ষ থেকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান। কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে হলে শ্রমিক ও কৃষককে এক জায়গায় আনতে হবে এমন কথা অতীতে কম্যুনিস্ট নেতাদের মুখে বার বার শোনা গেছে। এ ব্যাপারে শিল্পসমৃদ্ধ হাওড়া, হুগলী, চব্বিশ পরগণা এবং বর্ধমান জেলাতে যে সুযোগ ছিল বাংলার বাম দলগুলি কিন্তু তা কাজে লাগায়নি।

উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে.হলেও কংগ্রেস সমাজবাদী দল বার বার এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে চেষ্টা করেছে। এতে অবশ্যই শ্রমিক ও কৃষক উভয়ের মধ্যে শ্রেণী চেতনা বৃদ্ধি পেতে সাহায্য করেছে।

তৃতীয়ত, জমিদার থেকে শুরু করে জোতদার, সম্পন্নচাষী সকলেই ভাগচাষীদের সাহায্যে জমি চাষ করাত, এটা হাওড়া জেলার নিজস্ব কোন বৈশিষ্ট্য নয়, অন্য আরও জেলাতে এই অবস্থা ছিল। এরকম অবস্থায় আন্দোলন শুরু হতে দেরি হয় ঠিকই কিন্তু শুরু হলে বেশিদিন জমিদারের বিরুদ্ধে গন্ডিবদ্ধ করে রাখা সম্ভব নয়, এর ফলে নেতৃত্বের প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র সহজেই স্পষ্ট হয়ে উঠে এবং কৃষকদেব শ্রেণী চেতনা বিকশিত হতে সাহায্য করে।

হাওড়া জেলার কৃষক আন্দোলনের ব্যাপারে আরও একটি ব্যাতিক্রম হচ্ছে যে এই জেলাতে দলকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে কৃষক সংগঠন করা ছাড়া কম্যুনিস্ট পার্টির প্রায় আর কোন বিকল্প ছিল না। বৃহত্তর চটশিল্পে কংগ্রেস সমাজবাদী দল বা একক ভাবে শিবনাথ বন্দোপাধ্যায়ের প্রভাব এত বেশি ছিল যে সেখানে কম্যুনিস্টদের প্রভাব বাড়ানো প্রায় অসম্ভবই ছিল। ছোট ছোট ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানার শ্রমিক এবং হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির উপরই কেবলমাত্র কম্যুনিস্টরা প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হযেছিল। এর জন্যে কৃষক সংগঠনের ব্যাপারে তাদের কর্মীর অভাব ছিল না।

সব মিলিয়ে ১৯৪০ সালের মধ্যেই হাওডা জেলাতে শক্তিশালী কৃষক সংগঠন গড়ে উঠেছিল। ১৯৪৬ সালের আমন ধান কাটার মরসুমে আমতা, উলুবেড়িয়া মহকুমাতে ভাগ আন্দোলনের যে ভাবে প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল[২১] তাতে প্রমাণিত হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধাক্কায় কৃষক সংগঠনের ভিত দুর্বল হয়ে পড়লেও একেবারে ধসে যায়নি। অতি সাম্প্রতিক কালে ভারত সরকারের নযা অর্থনৈতিক পদ্ধতির চাপে পড়ে সমগ্র দেশে গণ-আন্দোলন যখন প্রায় স্তব্ধ তখন সাধারণ মানুষ বিশেষ করে স্থানীয় কৃষক এবং শ্রমিকদের সাহায্য পুষ্ট হয়ে উলুবেড়িয়া মহকুমায় অবস্থিত কানোরিয়া চটকলের শ্রমিকরা যেভাবে দীর্ঘদিন ধরে ধর্মঘট চালিয়ে যাচ্ছে তাতে প্রমাণ করে যে শ্রেণী সংগ্রামের কিছুটা আবহাওয়া এখানে পূর্বেই তৈরি ছিল।

সূত্র নির্দেশ

১. Sen, Sunil, **Agrarian struggle in Bengal, 1946-47.** (Delhi, 1982). Cooper Adrienne, **Share Cropping and Share Croppers, Struggle in Bengal, 1930-1950.** (1988) Bose Sugata, **Agrarian Bengal; Economy, Social Structure and politics,** 1919 1947 (1980).
২. রসুল, মহম্মদ আবদুল্লা, **কৃষক সভার ইতিহাস,** পৃঃ ৮০
৩. Home Political (confidential). File No 228/38. Report District Magistrate, Howrah, to Home Secretary G.P.Hogy, Dated June 16th, 1938.
৪. Mitra Ira, **Bengal Politics, 1937-47** (An unpuplished Thesis of the C.U, 1992) Chapter I + II.
৫. Vide foot note 3
৬. Government of India Act, 1935. Provision as to Franchise, Sixth Schedule. Part IV Bengal.
৭. Rasul M.A., History of the All India Kisan Sabha. Chapter II, pp 11 13.
৮. Vide foot note 5
৯. ঐ
১০. ঐ
১১. ঐ
১২. ঐ
১৩. ঐ
১৪. ঐ
১৫. মুখোপাধ্যায় সরোজকুমার, **ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি ও আমরা,** প্রথম খণ্ড, ছত্রিশ পরিচ্ছেদ পৃ ১৪৭-৪৮.
১৬. Vide foot note 3
১৭. ঐ
১৮. ঐ
১৯. Home Pol. (confidential). File No 264/38, 1938. Conference on 13th and 14th June, 1938, held at Darjeeling to discuss what steps should be taken by Divisional Commissioners to counter a no-rent campaign.
২০. Home pol. (confidential). File no 30/40. Fortnightly Report. File no 18/12/1940. Pol. Report for the 1st half of December, 1940.
২১. Land and Land Revenue Department, L.R. Branch File No 6M 38/47. B.December, 48/15-107.

'বর্দ্ধমান বার্ত্তা' (১৯৩৮–৪১) : বর্ধমান জেলার রাজনীতির একটি সমীক্ষা

জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়

১৯৩৫ সাল ভারতবর্ষের রাজনীতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বৎসর। বিশেষত কমিউনিস্ট পার্টি এখন থেকে জনসংযোগ পাবার পথে দ্রুত এগিযে যায। এই অগ্রগতি পথে সপ্তম কমিটার্ণের নির্দেশ কাজ করে থাকে। কমিটার্ণের সম্পাদক, জর্জ টিমিট্রভ, ভারতবর্ষের বাজনৈতিক অবস্থা বিশ্লেষণ কবে বলেন, 'ভাবতবর্ষেব কমিউনিস্ট পার্টি সকল প্রকাব সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করবে অথবা সমর্থন জানাবে। এক্ষেত্রে প্রযোজনে জাতীয সংশোধনবাদী (Reformist) নেতৃত্বের অধীনে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করবে।' তিনি আবো বলেন, 'স্বাধীন অস্তিত্ব যদি বজায থাকে, তাহলে পার্টি স্বতন্ত্রভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলবে।'[১]

এই নির্দেশ ভারতবর্ষে দত্ত ব্যর্ডলি নির্দেশরূপে এলো এবং তা 'দি কমিউনিস্ট" পত্রিকার সেপ্টেম্বর ১৯৩৬-এ ছাপা হয। কংগ্রেসের মধ্যে থেকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য এই পত্রিকায আহ্বান জানানো হয়।[২] এই প্রসঙ্গে CPI-এর সাধারণ সম্পাদক "ন্যাশনাল ফ্রন্ট"-এ লেখেন, "আজকের দিনের বৃহত্তম শ্রেণী সংগ্রাম হচ্ছে জাতীয় সংগ্রাম। 'কংগ্রেস' তার প্রধান মুখপাত্র— তাই কংগ্রেসে কিষাণ ঐক্য রক্ষা করতে হবে"।[৩]

এখন থেকে কমিউনিস্ট পার্টি কংগ্রেসের মধ্য থেকে ট্রেড-ইউনিয়ন, জাতীয় কংগ্রেস, কৃষক ও সাংস্কৃতিক সমস্ত ফ্রন্টে কার্যকরী রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠার কর্মপন্থা গ্রহণ করে এবং তা প্রয়োগের জন্য সচেষ্ট হয়।[৪] প্রকৃতপক্ষে টিমিট্রভের নির্দেশ কমিউনিস্ট পার্টির জনসংযোগ ও সমর্থন বাড়ানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসাবে দেখতে পাই। এখন থেকে বামপন্থীদের মধ্যে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে যারা বিপ্লবী আন্দোলন ও কংগ্রেসের আন্দোলনের অভিজ্ঞতায় কমিউনিস্ট হয়েছিলেন— তাদের মধ্যে উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়।[৫] এরাই জেলাস্তরে কংগ্রেসের সংগঠনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। বিশেষ করে বর্ধমান জেলায়— এদের ভূমিকা উল্লেখের দাবী রাখে। কিন্তু বামপন্থীদের কংগ্রেসের মধ্যে থেকে কাজ করা বর্ধমান জেলায় সহজ ছিল না। জেলার

দক্ষিণপন্থী নেতৃত্ব বার বার বিভিন্ন কারণে কংগ্রেস থেকে বামপন্থীদের দূরে সরিয়ে দেবার প্রচেষ্টা গ্রহণ করে। এই বিষয়ে দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বকে সহায়তার হাত বাড়ায় 'বৰ্দ্ধমান বাৰ্ত্তা'র সম্পাদক— দাশরথি তা এবং তার পত্রিকা।

যদিও বামপন্থীদের উদ্যোগে বর্ধমান জেলার সদর থানার এবং মেমারি থানার পশ্চিমদিকেব গ্রামগুলিতে দামোদর ক্যানাল কর বিরোধী আন্দোলন চলছিল এবং এর জন্য বামপন্থীগণ ব্যাপক জন সমর্থন লাভ করে। বামপন্থীগণ জেলাব গ্রামাঞ্চলের কৃষক দরিদ্রসমূহের এবং সাধারণ মানুষের নিকট কংগ্রেসের গান্ধীবাদী নেতারা গ্রামাঞ্চলে বামপন্থীদের বিস্তার ভালোভাবে মেনে নিতে পারেনি। দামোদর ক্যানাল কর বিরোধী আন্দোলনে বামপন্থীদের নেতৃত্ব তীব্র আকার ধারণ করলেও 'বৰ্দ্ধমান বাৰ্ত্তাব' চিঠিপত্রের কলমে ধনঞ্জয় চৌধুরী লেখেন, "এই কযেকদিন আগে যখন ক্যানাল অঞ্চলে 'খণ্ডযুদ্ধের'র অভিনয় চলছিল, তখন তো কোন বন্ধুকে দেখি নাই।"[৭] এই আন্দোলন বামপন্থীদের উদ্যোগে পরিচালিত হলেও তৎকালীন কংগ্রেস রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রের সমর্থন ছিল[৮]— তা দক্ষিণপন্থী নেতারা ভুলে যান। সেইজন্য বামপন্থী নেতাদের হেয প্রতিপন্ন করার প্রবণতা সেই দিনেব দক্ষিণপন্থী নেতাদের এবং জেলা কংগ্রেসের মুখপাত্র, 'বৰ্দ্ধমান বাৰ্ত্তা'-র মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়। এক্ষেত্রে অনেক সময শিষ্টাচারের সীমা ছাড়িয়ে ব্যক্তিগত আক্রমণ করতে থাকে। এই ব্যক্তিগত আক্রমণ আরো বাড়ে মহকুমা কংগ্রেসের নির্বাচন প্রাক্কালে। 'বৰ্দ্ধমান বাৰ্ত্তা'র সাংবাদিক হরেকৃষ্ণ কোঙারকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করে লেখেন, "শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ কোঙার মুক্ত বন্দীদের অভিনন্দন করিতে উঠিয়া বৰ্দ্ধমান জেলা কংগ্রেস কমিটির কৰ্ম্মকৰ্ত্তাদের উপর অযথা আক্রমণ করিয়াছেন। .....আজকে যাহাদিগকে বক্তৃতা মঞ্চে বা কংগ্রেসের কৰ্ম্মকৰ্ত্তা নির্বাচনে পল্লীর দুয়ারে দুয়ারে দেখছি— এই কয়েকদিন আগে যখন ক্যানাল অঞ্চলে 'খণ্ডযুদ্ধের' অভিনয় চলছিল, তখন তো কোন বন্ধুকে দেখি নাই। .....তখন বোধ হয় মহাজন কাব্য অবলম্বনকারীর মত পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন, 'যঃ পলায়তি স জীবতি'।" বক্তা নিজেকে একজন অগ্রগামী কংগ্রেসকৰ্ম্মী বলে জনসাধারণের কাছে পরিচয় দেন, বর্তমানে কংগ্রেস নিয়মতান্ত্রিক আওতায় পড়ে তাহার বৈপ্লবিক ভাট বৰ্জ্জন করেছেন বলে আক্ষেপ করেন।[৯] 'বৰ্দ্ধমান বাৰ্ত্তা'র সংবাদ পাঠ করলে মনে হয়, কংগ্রেসের মধ্যে বিরোধ জেলান্তর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। শুভানুধ্যায়ীদের পরামর্শক্রমে ধনঞ্জয় চৌধুরীর চিঠির প্রত্যুত্তরে হরেকৃষ্ণ কোঁঙার লেখেন, "সে সম্বন্ধে কোন প্রতিবাদ না করিয়া যাঁহারা আমাকে জানেন, তাহাদের উপরই আমার রাজনৈতিক জীবনের বিচারের ভার দিয়া নিশ্চিন্তে রহিলাম।"[১০] এই চিঠি থেকে একথা বলা যায় জেলার বামপন্থী নেতারা কখন শিষ্টাচারের সীমাকে লঙ্ঘন করেননি।

ইতিমধ্যে ১৯৩৯ সালের জেলা কৃষক সম্মেলন কাছে এসে যায়। জেলা কৃষক সম্মেলনকে সফল করার জন্য গ্রামাঞ্চলে বামপন্থী নেতারা চাঁদা তুলতে যায় এবং গ্রাম্য বৈঠকগুলি ও মিটিং করতে থাকে। এতে জেলা কংগ্রেসের গান্ধীবাদী নেতারা বিচলিত হয়ে পড়েন। জনৈক সভ্যা গ্রামবাসীর উল্লেখ করে 'বর্দ্ধমান বার্ত্তা'র সাংবাদিক লেখেন, ".....শ্রীযুক্ত বিপদবরণ রায, পাহাড়হাটী, গানন্টে, কানপুর এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহে কৃষক সমিতি কংগ্রেস শাখা প্রতিষ্ঠান বলিয়া উক্ত সম্মেলনের জন্য চাঁদা আদায় করিয়াছেন কিন্তু তাহারা কংগ্রেস বিরোধী প্রচার কার্য চালাইয়াছেন।"[১১] কিন্তু অভিযোগের বাস্তব ভিত্তি ছিল কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে।[১২] ১২-এ মুসলমান পাড়া থেকে হরেকৃষ্ণ কোঁঙার 'বর্দ্ধমান বার্ত্তা'র সম্পাদক-এব নিকট 'কংগ্রেসের কোতল'শিরোনাম দিয়ে সংবাদ 'বর্দ্ধমান বার্ত্তা'য় প্রকাশ পায, তার বিরুদ্ধে লেখেন, "কৃষক সম্মেলনে জাতীয় পতাকা ছিল না, বা বন্দোমাতবম বলতে নিষেধ করা হইযাছে— তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রচার।"[১৩]

দক্ষিণপন্থী নেতারা বামপন্থীদের সম্পর্কে মিথ্যা অভিযোগ আনলেও তারা উপলব্ধি করতে পেরেছিল বামপন্থীদের সঙ্গে গ্রামাঞ্চলে ভালো সম্পর্ক রয়েছে। এদের সাহায্যে ইংরাজের অনুগত চকদীঘির জমিদার মণিলাল সিংহ, যিনি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সরব ছিলেন[১৪] তার বিরুদ্ধে এবং জেলায মুসলিম লীগের কার্যক্রম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল[১৫] তা রোধ করা সম্ভব। বিশেষ করে লোকাল বোর্ড নির্বাচনে উপরিউক্ত দুই শক্তিকে রোধ করার জন্য বামপন্থীদের সহাযতা একান্ত প্রয়োজন বলে দক্ষিণপন্থী জেলা নেতৃত্ব উপলব্ধি করে।[১৬] উপরন্তু ব্রিটিশ সরকার মুসলিম লীগকে এই সময় জেলায় দাঙ্গা লাগাবার জন্য উস্কানী দেয়।[১৭] তাকেও দমন করার জন্য বামপন্থী শক্তির সাহায্য একান্তভাবে জরুরী বলে দক্ষিণপন্থী নেতারা মনে করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে লোকাল বোর্ডের নির্বাচনে কংগ্রেসের পক্ষে মনোনয়ন পায় হেলারাম চট্টোপাধ্যায়, ফকিরচন্দ্র রায় প্রমুখ বামপন্থী নেতারা।

কিন্তু লোকাল বোর্ডের নির্বাচনে কংগ্রেসের পক্ষে বামপন্থী দক্ষিণপন্থী নেতারা একসঙ্গে কাজ করলেও সদর মহকুমা কংগ্রেসের সাংগঠনিক নির্বাচনের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় অহিনকুল সম্পর্কের পরিবর্তন বিশেষ ঘটেনি।

ইতিমধ্যে সর্বভারতীয় রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হয়েছে। সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত হয়েছেন। ফরোয়ার্ড ব্লক গঠিত হয়েছে। সুভাষচন্দ্র বিশ্বরাজনীতির প্রেক্ষাপটে ভারতে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে জাতীয় আন্দোলন শুরু করার দাবী জানাচ্ছিলেন। গান্ধীজী ব্রিটিশের দুর্দিনে সুযোগ গ্রহণ করে জাতীয় আন্দোলনে যেতে চাইছিলেন না। জাতীয় রাজনীতির প্রেক্ষাপটে স্মরণ করে ১৯৩৮ থেকে ৪১-এর জেলার অবস্থা বিশ্লেষণ করা বিশেষ প্রয়োজন।

জেলার মধ্যে ফরোয়ার্ড ব্লক কালনা ও কাটোয়া মহকুমায় বেশি শক্তিশালী ছিল। সদর মহকুমা ও আসানসোল মহকুমা এলাকায় বামপন্থীরা বিশেষ শক্তিশালী, তথাপি দক্ষিণপন্থী নেতাদের বিচলিত হয়ে পড়া স্বাভাবিক। কিন্তু উভয় শক্তিকে কিভাবে মোকাবিলা করা যায় যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজার অবধি দ্বন্দ্বে সীমা ছিল না। নিজে দক্ষিণপন্থী নেতাদের অবলম্বিত পন্থা পছন্দ না করলেও সমর্থকদের চাপে পড়ে মেনে নিতে বাধ্য হন। প্রাদেশিক নির্বাচনে বর্ধমান জেলায় সুভাষচন্দ্র বসুর উপস্থিতি বামপন্থী নেতাদের সঙ্গে দক্ষিণপন্থী নেতাদের সমঝোতা হয়। সেই সমঝোতাকে বাঞ্চাল করার জন্য দক্ষিণপন্থী জেলা নেতাদের চাপে যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা বামপন্থীদের প্রার্থী হায়াত সাহেবের নমিনেশন পত্র গ্রহণ করে ও সামান্য রসিদ না নেওয়ার জন্য ঐ নমিনেশন পত্র বাতিল বলে ঘোষণা করেন।[১৮]

২রা জুলাই ১৯৪০ 'বর্দ্ধমান বার্ত্তা'র হালচাল অংশে সম্পাদক লেখেন, "বর্দ্ধমানের বামপন্থীরা কৃষক কর্মীদের মধ্যে কাহারা ফরোয়ার্ড ব্লক কর্মী তাহারা জনসাধারণের নিকট নাম ঘোষণা করুন।" কিন্তু দক্ষিণপন্থী নেতারা বামপন্থীদের শক্তি সম্পর্কে অবহিত থাকা সত্ত্বেও এই দাবী জানিয়েছিল। সেই সঙ্গে দক্ষিণপন্থী নেতারা বামপন্থীদের অচ্ছুৎ ঘোষণা করার অহেতুক প্রচেষ্টা গ্রহণ করে। ২রা জুলাই-এ সম্পাদক-এর লেখার বিরুদ্ধে বিনয় চৌধুরী, হরেকৃষ্ণ কোঙার, দুর্গাপদ নন্দীর স্বাক্ষর যুক্ত প্রতিবাদ পত্র পাঠান। এই চিঠি পড়ে মনে হয় বামপন্থীরা সহযোগিতার জন্য দক্ষিণপন্থী নেতার দিকে সাহায্যের হাত বাড়ান।[১৯] কিন্তু গান্ধীবাদী নেতারা "সমপ্রজাতি কক্ষ"-এর (Homogenious Cabinet) কথা তুলে বলেন, এক যোগে কাজ করা যাবে না। এর পরিপ্রেক্ষিতে সদর মহকুমা নির্বাচনের পর ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে মহকুমা কংগ্রেস কমিটি থেকে সদ্য নির্বাচিত অনেক সদস্য সরে দাঁড়ান। ৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯৪০ সদর মহকুমা নির্বাচনে হরেকৃষ্ণ কোঙার, শান্তশীল মজুমদার, ফকিরচন্দ্র রায়, বিনয় চৌধুরী সমেত ৮০ জন সদস্য নির্বাচিত হয়। কিন্তু জেলায় কংগ্রেস-এর মধ্যের দ্বন্দ্ব অবসান ঘটেনি। জেলা কংগ্রেসের ডিরেক্টর যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা নব-নির্বাচিত সদস্যদের অভিবাদন জানাতে গিয়ে বলেন, "এক্ষণে কংগ্রেসের ভিত্তিগত ব্যাপার লইয়া সংঘর্ষ বাঁধিয়াছে, অনেকের কংগ্রেসের নীতি বিধান সিদ্ধান্ত মানিয়া লইতে প্রস্তুত, আবার কেহ কেহ উহা একেবারে মানিতে প্রস্তুত নহেন, বরং উপেক্ষিত ও অবজ্ঞাত করার জন্য সচেষ্ট .....এই দু শ্রেণীর মধ্যে এক শ্রেণীভুক্ত সদস্যদিগকে নির্বাচিত করিবেন। উভয়ের মধ্যে থেকে সদস্যদের নির্বাচিত করিয়া দ্বন্দ্ব বাধাইবেন না।"[২০] এই অভিবাদনপত্র থেকে পরিষ্কার হয়ে যায় বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থী নেতার মধ্যে দ্বন্দ্বের অবসান ঘটেনি। যাঁর জন্য নবনির্বাচিত কমিটি থেকে ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে ডঃ নন্দদুলাল গাঙ্গুলী, গোবর্দ্ধন পাল পদত্যাগ পত্র দাখিল করেন।

ইতিমধ্যে ২৭শে—৩০শে. সেপ্টেম্বর ১৯৪০ গান্ধীজী ভাইসরয়ের সঙ্গে আলোচনা করে ব্যর্থ হয়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের জন্য ডাক দিলেন। এই আন্দোলনকে সফল রূপ দেওয়ার জন্য সারা দেশের ন্যায় বর্ধমান জেলায় নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয। বর্ধমান জেলা কংগ্রেস কমিটির কার্যালয়ে ১৭ই মে ১৯৪০ আবদুস সাত্তার, শ্রী গোবিন্দপ্রসাদ রায়, গোবর্দ্ধন পাল-এর সঙ্গে সদর মহকুমা সম্পাদক হরেকৃষ্ণ কোঙারসহ কয়েকজন বামপন্থী নেতা সত্যাগ্রহী হবার জন্য সত্যাগ্রহী প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করে জেলা কংগ্রেসের ডিরেক্টরের হাতে পাঠিয়ে দেন। হবেকৃষ্ণ কোঙার ও অন্যান্য বামপন্থী নেতারা এই আন্দোলনের প্রতি আস্থাশীল ছিলেন মনে করলে ভুল হয। অবশ্য অনেক দক্ষিণপন্থী নেতারা এই আন্দোলন এব প্রতি আস্থাশীল মনে করলেও ভুল হয়। বামপন্থী নেতারা ১৯৩০-৩২ সালের আন্দোলন অপেক্ষা সীমাবদ্ধ আন্দোলন হবে বলে আশঙ্কা করে।[২১] কিন্তু তাদের আশঙ্কা অমূলক যে ছিল না তা এই আন্দোলনের সীমাবদ্ধতাব মধ্যেই প্রমাণিত। কিন্তু প্রশ্ন আসে তাহলে কেন বামপন্থী নেতারা 'স্বাধীনতা সঙ্কল্প' পত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন? মনে হয গ্রামাঞ্চলে কংগ্রেস বলতে বামপন্থীদের বোঝাতো। এরাই কংগ্রেসের আদর্শকে গ্রামাঞ্চলে নিয়ে যান। গান্ধীজীর ডাকে সারা না দিলে গ্রামাঞ্চলে বামপন্থীরা আস্থা হারাবেন বলে আশঙ্কা করে। কিন্তু বামপন্থী নেতারা 'স্বাধীনতা সঙ্কল্প' পত্রে স্বাক্ষর করলেও কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতারা ভালোভাবে মেনে নিতে পারেনি। এই জন্য জেলা কংগ্রেসের ডিরেক্টর লেখেন, "সংগ্রাম চলতি থাকাকালে গান্ধীজীর নেতৃত্ব ঘুচাইবার জন্যই আজ বামপন্থীগণ গান্ধীজীর সৈনিক সত্যাগ্রহী হইতেছেন। এই সৈনিক দল লইয়া যদি গান্ধীজী সত্যাগ্রহী সংগ্রামে অবতীর্ণ হন, তাহলে নরওয়ের দক্ষিণভাগে মিত্র শক্তি যেরূপে শোচনীয় পরাজয় হইযাছে, তাহা অপেক্ষা অধিকতর শোচনীয় পরাজয় আমাদের ভাগ্যে ঘটিবে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ।"[২২]

যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজার এই অমূলক আশঙ্কা দূর হয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বামপন্থীদের বিরুদ্ধে দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ১৪ই জুলাই ১৯৪০ কৃষক সভার জেলা অফিস পুলিশ থানা তল্লাসী চালায় এবং সমস্ত কাগজপত্র সঙ্গে নিয়ে যায়। ইতিপূর্বে জেলার মধ্যে হরেকৃষ্ণ কোঙার, বিপদবরণ রায়, বিনয় চৌধুরী, শাহেদুল্লাহ কৃষক সমিতির জেলা কার্যকরী সমিতির ১৯৪০-৪১ সালের জন্য সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। তথাপি ১৪ই জুলাই রাতে ঐ সকল নেতাদের জেলা থেকে বহিস্কার করে।[২৩] ফলে দক্ষিণপন্থী নেতাদের আশঙ্কা দূর হয়।

সেই সঙ্গে সাময়িক কয়েক মাসের জন্য জেলায় দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী নেতাদের দ্বন্দ্বের মাত্রা কিছুটা হ্রাস পায়। এই দ্বন্দ্বে দক্ষিণপন্থীদের পক্ষে 'বর্দ্ধমান বার্ত্তা' বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করলেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে জেলার জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বিস্তারে সহায়তা করে। সেই সঙ্গে জেলা কংগ্রেসের গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি

গ্রামাঞ্চলে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে এই সংবাদপত্রটি বিশিষ্ট ভূমিকা রাখে— তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তথাপি জেলার সার্বিক রাজনৈতিক ইতিহাস জানতে হলে 'বর্দ্ধমান বার্ত্তা' উপর আমাদের অবশ্যই নির্ভর করতে হয়।

সূত্র নির্দেশ ঃ

১. দাশরথি তা সম্পাদিত 'বর্দ্ধমান-বার্ত্তা'

৭—১৪.৮.১৯৩৯	২০—৪.৯.১৯৩৯
৮—৬.৬.১৯৩৮	২১—২৭.৫.১৯৪০
৯—১৪.৮.১৯৩৯	২২—১৭.৫.১৯৪০
১১—৯ই শ্রাবণ ১৩৪৪	২৩—১৪.৭.১৯৪০ এবং
১৩—১০.৭.১৯৪০	২২.৭.১৯৪০

১৯—দুর্গাপদ নন্দী, বিনয় চৌধুরী, হরেকৃষ্ণ কোঙারের স্বাক্ষর যুক্ত চিঠি 'বর্দ্ধমান বার্ত্তা' থেকে গৃহীত—১০.৭.১৯৪০।

২. ১০—হরেকৃষ্ণ কোঙারের চিঠি বর্দ্ধমান-বার্ত্তা থেকে গৃহীত ২১.৮.১৯৩৯.
১৩—হরেকৃষ্ণ কোঙারের ১২ এ. মুসলমান পাড়া কলিকাতা থেকে প্রেরিত বর্দ্ধমান বার্ত্তার সম্পাদককে চিঠি—বর্দ্ধমান বার্ত্তা থেকে গৃহীত ১৬ই শ্রাবণ ১৩৪৪.

৩. ১৭—বর্ধমান জেলা পুলিশ আধিকারিক-এর চিঠি বিভাগীয় কমিশনার চুঁচুড়া কে 'নতুন চিঠি' শারদীয় সংখ্যা ১৯৯২ থেকে গৃহীত— ৭২ পৃষ্ঠা।

৪. ৬—কৃষ্ণপদ হালদার, বর্ধমান-এর সঙ্গে লেখকের সাক্ষাৎকার ১৬ই অক্টোবর ১৯৯৩

৫. কে. শেষাদ্রি—Marxist and Indian Polity
১— ২৪৯ পৃঃ
২— ২৪৯/২৫০ পৃঃ

৬. ৫—মনোরঞ্জন হাজরা— নিবন্ধ বর্তমান পত্রিকা ২৪শে মার্চ ১৯৯৪ থেকে গৃহীত।

৭. ১৩—প্রতিবাদ পত্র— কৃষক সভার জেলা সভাপতির বর্দ্ধমান-বার্ত্তা থেকে গৃহীত ১৬ই শ্রাবণ ১৩৪৫

৮. ১৬—জেলা সভাপতি, মুসলিম লীগ-এর চিঠি জেলা সমাহর্ত্তাকে Ref- ৫৯৪৫/২৫.১১.১৯৪০

৯. সুমিত সরকার—"আধুনিক ভারত" ৩–৩৮০ পৃঃ

১০. সরোজ মুখোপাধ্যায়—"ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা" ১ম খণ্ড। ৪–১০৫ পৃঃ।

১১. ১২—সন্তোষ মণ্ডল, রামনগর; বর্ধমান এর সঙ্গে লেখকের গৃহীত সাক্ষাৎকার ১৪ই মার্চ ১৯৯৩ (নারায়ণ রায়, হাটগোবিন্দপুর, বর্ধমান-এর সঙ্গে লেখকের গৃহীত সাক্ষাৎকার ১৪ই মার্চ ১৯৯৩ দ্বারা সমর্থিত সন্তোষ মণ্ডলের বক্তব্য)

১২. সৈয়দ শাহেদুল্লাহ— বর্ধমান জেলা কমিউনিস্ট আন্দোলনের অতীত প্রসঙ্গ ১৪—৮৬ পৃঃ, ১৫— ৮৬ পৃঃ, ১৮—৭৬/৭৭ পৃঃ

১৩. ৬—উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, বর্ধমান, সঙ্গে লেখকের গৃহীত সাক্ষাৎকার ১৮ই ফেব্রুয়ারী—১৯৯৪ কৃষ্ণপদ হালদারের বক্তব্যের সমর্থন।

চন্দননগরের ছাত্র আন্দোলন : এই শতাব্দীর তিরিশের দশক

মনিরুল ইসলাম

স্বাধীনতা আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গের সময় থেকে হুগলী জেলার শ্রমিক কৃষক আন্দোলন সংগঠিত করার ক্ষেত্রে, এদেশে শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ার সংগ্রামে অগ্রণী কমিউনিস্টদের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে চন্দননগরের ভূমিকা অনস্বীকার্য। শ্রমিক-কৃষক সংগঠনের শক্তি বৃদ্ধির পাশাপাশি এ জেলার ছাত্র আন্দোলনও চন্দননগরকে কেন্দ্র করে বিকশিত হয়েছে। আমাদের আলোচ্য বিষয় তিরিশের দশকের চন্দননগরের ছাত্র আন্দোলন যা স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণের পাশাপাশি সমাজতান্ত্রিক চিন্তাভাবনা দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়।

ব্রিটিশ প্রভাবাধীন না হওয়ায় স্বাধীনতা আন্দোলন সহ ছাত্র আন্দোলন সংগঠিত হওয়ার বাড়তি সুবিধা এখানে ছিল। বহু বিপ্লবী এখানে আশ্রয় নিয়েছেন। চন্দননগরের সাধারণ মানুষ ফরাসী শাসনকে স্বাভাবিকভাবে মেনে নেননি। ১৯২৯-র চন্দননগর তথা হুগলী জেলার ছাত্র আন্দোলনের নেতা এবং পরবর্তী সময়ে শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনের নেতা তুষার চট্টোপাধ্যায়ের লেখা থেকে জানা যায় যে, ফরাসী এলাকা হওয়ায় চন্দননগরে কংগ্রেসের মত কোনো জাতীয় রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে ওঠেনি।

১৯২৮ সালে কলকাতা কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র বসু পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব তোলেন। কিন্তু কংগ্রেস সেই প্রস্তাব গ্রহণ না করায় বিপ্লবী মহলে দারুণ ক্ষোভের সঞ্চার হয়। চন্দননগরের বিপ্লবী দুর্গাদাস শেঠ, বিপ্লবী নেতা জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের পরামর্শে ক্রমে চন্দননগরে একটি বিপ্লবী দল গঠনে প্রয়াসী হন। ১৯২৯ সালে বৈপ্লবিক আদর্শ নিয়ে এখানে 'যুব সমিতি' গঠন করা হয়। পরে তা চন্দননগরের একমাত্র গণপ্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। এর পরিচালনায় ছিলেন বিপ্লবী কালীচরণ ঘোষ, তুষার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। এই যুব সমিতির ডাকে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ এমনকি সুদূর ব্রহ্মদেশ থেকেও বিপ্লবীরা আসতেন। এই সমিতি 'স্ফুলিঙ্গ' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করত—যা লেনিনের 'ইস্ক্রা' থেকে নেওয়া হয়। এর কার্যকলাপে ইংরেজ শক্তি আতঙ্কিত হয়ে ফরাসী সরকারের উপর চাপ দেয়। 'স্ফুলিঙ্গ' পত্রিকা প্রকাশ ফরাসী সরকার বন্ধ করে দেয়।

যুব সমিতিতে সাধারণভাবে চন্দননগরের যুব সমাজ অংশ গ্রহণ করলেও এই সংগঠনে ছাত্ররাও ছিলেন সাধারণ কর্মীর ভূমিকায়। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ভবানী মুখোপাধ্যায, কমল চট্টোপাধ্যায় (এঁরা দু'জনেই তিরিশের দশকের ছাত্র নেতা ছিলেন, বর্তমানে বামপন্থী আন্দোলনের নেতা) ও মহীতোষ নন্দী (গোয়া মুক্তি আন্দোলনের নেতা)।

১৯২৬—'৩০-র সময়কালে বাংলা তথা ভারতে যে সব ঘটনা (যেমন কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলা, আলীপুর জেলে ভূপেন চ্যাটার্জীকে হত্যা, সাইমন কমিশন বর্জন, ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত কর্তৃক দিল্লীর আইন পরিষদে বোমা নিক্ষেপ) ঘটে সে সবেব সুদূর প্রসারী প্রভাব চন্দননগরের ছাত্র যুবকদের অনুপ্রাণিত করে।

প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন গঠিত হবার পর (১৯৩৬) থেকেই হুগলী জেলায় ছাত্র ফেডারেশন গঠনের পরিকল্পনা গৃহীত হয। হুগলী জেলার বামপন্থী আন্দোলনের নেতা কমল চট্টোপাধ্যায তাঁর সাক্ষাৎকারে বলেন — এই দশকের চন্দননগরের ছাত্র আন্দোলন সম্বন্ধে বলতে গেলে একথা স্মরণে রাখতে হবে যে, এই দশকের প্রথম পাঁচ বছর এই শহরে তেমন জোরদার সংগঠিত ছাত্র আন্দোলন গড়ে ওঠেনি। তিরিশের দশকের চন্দননগরের অপর ছাত্র নেতা হরিপদ মুখোপাধ্যায়ও তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে (৯।১১।৯৪) একই কথা বলেন। এই সময় ছাত্ররা 'যুব সমিতি'-র বিভিন্ন কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন।

১৯৩০—৩৫-র সময়কালীন চন্দননগরের ছাত্র আন্দোলন

১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হলে তার প্রভাব পড়ে চন্দননগরে। এই আন্দোলনে যোগদান কবার জন্য যুব সমিতি ব্যাপক প্রচেষ্টা গ্রহণ করে। কালীচরণ ঘোষ তাঁর 'ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে চন্দননগরে ভূমিকা' নামক প্রবন্ধে বলেছেন—"সমিতির আহ্বানে শহরের ছাত্র-যুবরা দলে দলে সাড়া দেন। মেদিনীপুর জেলায় বিভিন্ন স্থানে লবণ সত্যাগ্রহের জন্য জ্যোতিষ সিংহের নেতৃত্বে একটি দল চন্দননগর থেকে প্রেরিত হয়" [প্রগতি-শারদীয়া ১৯৮৩, চন্দননগর-পৃষ্ঠা ৫]। এছাড়া আরো দুটি দল যথাক্রমে ব্রজেন পাল ও কালীচরণ ঘোষের নেতৃত্বে মেদিনীপুরে যায়। যুব কর্মীদের একজন হিসেবে ছাত্র সমিতির পক্ষ থেকে চুঁচুড়ার আইন অমান্য আন্দোলনে তুষার চট্টোপাধ্যায় অংশ গ্রহণ করেন। এভাবে চন্দননগর ছাত্র-যুবদের উদ্যোগে স্বাধীনতা সংগ্রামের অংশীদার হয়। ফরাসী এলাকা হওয়ায় এই সময় চন্দননগরের ভিতর কোন সংগ্রামের কর্মসূচী এ ব্যাপারে ছিল না। ১৯৩২-র শুরুতে নতুন করে আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হলে যুব সমিতির উদ্যোগে ছাত্ররা তাতে সামিল হন।

চন্দননগরের ফরাসী সরকার চন্দননগরবাসীর নির্বাচনী ক্ষমতাকে .দু'ভাগে ভাগ করেন। মুষ্টিমেয় যাঁরা ফরাসী নাগরিকত্ব স্বীকার করতো তাদের বিশেষ অধিকার দেওযা হয়। বাকী অধিকাংশ নাগরিককে ফরাসী প্রজা বলে গণ্য করা হত। এই বিভেদ পন্থার বিরুদ্ধে প্রবল গণআন্দোলনের স্রোতে ছাত্ররাও সামিল হন।

আন্দোলনমূলক কাজ ছাড়াও যুব সমিতির গঠনমূলক কাজেও ছাত্ররা এগিয়ে আসেন।

১৯৩০—৩৫-এর সময়কালে হুগলী জেলার ব্যাপকতর অংশের ছাত্রদের সঙ্গে চন্দননগরের ছাত্ররাও রাজনীতি সচেতন হযে ওঠেন। সেই সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে যুক্ত হন। 'মাতৃভূমি' পত্রিকার ১৯৩০ সালের ২২শে মার্চ তাবিখের সংখ্যা থেকে জানা যায় যে, "১৯৩০ সালের ১২ই মার্চ তারিখে যেদিন মহাত্মা গান্ধী লবন আইন অমান্যেব জন্য যাত্রা করেন সেদিন দুপ্লে কলেজের ছাত্ররা বিদ্যালযে যোগদান করেনি। তারপব শনিবার ১৫ই মার্চ যেদিন কলকাতাব মেযব—বাংলাব অন্যতম নেতা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত রেঙ্গুন পুলিশ কর্তৃক গ্রেপ্তার হন, সেদিনও দুপ্লে কলেজেব ছাত্রবা ধর্মঘট করে।" এই অপরাধের জন্য ফবাসী সরকাব ২৫শে মার্চ পর্যন্ত ঐ কলেজ বন্ধ রাখেন।

চন্দননগরে গোন্দলপাডার এক বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণের বীর বিপ্লবী গণেশ ঘোষ, জীবন ঘোষাল (মাখনলাল) ও আনন্দ গুপ্ত। চন্দননগরের ফরাসী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ব্রিটিশ পুলিশ বিভাগের আঁতাতের ফলে ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৩০ কলকাতার কুখ্যাত পুলিশ কমিশনার টেগার্টের নেতৃত্বে সশস্ত্র ইংরেজ সার্জেন্ট ও শ্বেতাঙ্গ সিপাই গভীররাতে ঐ বাড়ি অবরোধ করে। এই তথ্য পাওয়া যায় ১৯৩০-র ১২ই সেপ্টেম্বর স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায়। এই পত্রিকায় লেখা হয় "....a force of Calcutta Police, acting in co-operation with the French Authorities, made a gallant and skilfully planned raid on a house in chandernagore where certain suspected terrorists were known to be living." ঐ তিনজন বিপ্লবীর সঙ্গে ব্রিটিশ পুলিশ বাহিনীর যুদ্ধে অবশেষে মাখনলাল প্রাণ হারান। মানুষ বিশেষ করে ছাত্র সমাজ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। ফরাসি সরকারের নিষ্ক্রিয়তাকে তারা এজন্য দায়ী মনে করে।

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের সূচনায় ভারতব্যাপী যে তীব্র স্বাধীনতা সংগ্রাম চলেছিল চন্দননগরের ছাত্ররাও তাতে সামিল হন।

১৯৩৬—৪০-র সময়কালীন ছাত্র আন্দোলন

১৯৩৬-৪০ এই সময়কালে হুগলী জেলার ছাত্র আন্দোলনের মূলকেন্দ্র ছিল চন্দননগর। প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন গঠিত হবার পর থেকেই এ জেলার ছাত্র ফেডারেশন গঠনের প্রচেষ্টা শুরু হয়। ১৯৩৭-র মাঝামাঝি সময়ে চন্দননগরে প্রথম জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের উদ্যোক্তা ছিলেন শ্রীরামপুরের কালিপদ ভট্টাচার্য ও অরস্কান্ত চৌধুরী; চুঁচুড়ার অনিল বসু ও চন্দননগরের কয়েকজন ছাত্র। নৃত্যগোপাল স্মৃতিমন্দিরে (বর্তমান চন্দননগর পাঠাগার) সম্মেলন শুরু হয়। জেলার এই সম্মেলনে প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন বিশ্বনাথ দোবে। সম্মেলনেব সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায। তুষার চট্টোপাধ্যায় রচিত সঙ্গীত পরিবেশন করে শচীন চট্টোপাধ্যায় সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। ফরাসী পুলিশ প্রশাসনকে উপেক্ষা করে সম্মেলনের কাজ চলতে থাকে। সম্মেলনে প্রস্তাব গ্রহণের পর জেলা কমিটি তৈরি হয। সভাপতি ও সম্পাদক হন যথাক্রমে কালীপদ ভট্টাচার্য ও অনিল বসু। এভাবে জেলার ছাত্র আন্দোলনের পাশাপাশি চন্দননগরে ছাত্র আন্দোলনও শক্তিশালী হতে থাকে।

১৯৩৮ সালের প্রথম দিকে ছাত্র ফেডারেশনের দ্বিতীয় সম্মেলন হয় চুঁচুড়ায়। এই সম্মেলনের সময় জেলা ছাত্রফেডারেশনের সদস্য সংখ্যা ছিল চার শত (৪০০)-র কিছু বেশী। এই সম্মেলনের মধ্য দিয়ে যে জেলা কমিটি তৈরি হয় তার সভাপতি ও সম্পাদক হন যথাক্রমে ভবানী মুখোপাধ্যায় ও কমল চট্টোপাধ্যায়। এঁরা দুজনেই চন্দননগরের অধিবাসী। জেলা ছাত্র ফেডারেশনের আহ্বানে জাতীয় ও প্রাতিষ্ঠানিক দাবীর ভিত্তিতে ছাত্র ধর্মঘট, বড় বড় সভা মিছিল হতে থাকে। ফরাসী চন্দননগরে মিছিল করার অধিকার না থাকায় চন্দননগরে স্কুলগুলোতে ধর্মঘটের পর ছাত্র-ছাত্রীরা দলে দলে চুঁচুড়া ও ভদ্রেশ্বরে গিয়ে মিছিল করতেন।

১৯৩৭ সালের শেষভাগে চন্দননগরের উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়—কৃষ্ণভামিনী নারী শিক্ষা মন্দিরে ছাত্র ফেডারেশনের সংগঠন গড়ার চেষ্টা শুরু হয়। এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের প্রচণ্ড বিরোধিতা ছিল। কিন্তু কর্তৃপক্ষের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দৈনিক আনন্দবাজার ও ছাত্র ফেডারেশনের প্রচার-পত্র বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা পড়তে শুরু করেন। এই স্কুলে ছাত্রীদের সংগঠিত করার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নেন সন্ধ্যা চট্টোপাধ্যায় (বর্তমানে চন্দননগরের বিধায়িকা), শেফালী চট্টোপাধ্যায়, কৃপা চট্টোপাধ্যায়, আরতি চট্টোপাধ্যায়, রাধারাণী ভক্ত, কমল দাস প্রমুখ। স্কুল কর্তৃপক্ষ অন্যদের কিছু করতে না পেরে রাধারাণী ভক্তকে ছাত্রীনিবাস থেকে তাড়িয়ে দেন। কৃষ্ণভামিনী নারী শিক্ষা মন্দিরে এভাবে ছাত্র সংগঠন গড়ে ওঠার

কথা জানা যায় সন্ধ্যা চট্টোপাধ্যায়ের 'মহিলা আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ের কয়েকটি কথা' নামক প্রবন্ধ থেকে [প্রগতি-শারদীয় ১৩৯০ (সংকলন সংখ্যা) চন্দননগর, পৃষ্ঠা ৩৮]। তৎকালীন জেলার ছাত্রনেতা কমল চট্টোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকারেও এই তথ্য জানা যায়। এভাবে চন্দননগর জেলা ছাত্র ফেডারেশনের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। উত্তরপাড়া, শ্রীরামপুর, রিষড়া ও চুঁচুড়াতে সংগঠন শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ক্রমে গ্রামাঞ্চলেও সংগঠনের শাখা প্রশাখা বিস্তারলাভ করে। এইসব অঞ্চলে জেলার অন্যান্য ছাত্রনেতাদের সঙ্গে সংগঠকের ভূমিকায় ছিলেন চন্দননগরের মোহিত মুখার্জী, মনোজ মুখার্জী, উমেশ নন্দী, সুনীল ঘোষ, শরদিন্দু গাঙ্গুলী, হরিপদ মুখার্জী (পরবর্তী সময়ে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন এবং চন্দননগরে মেয়র হন) প্রমুখ।

আন্দামান বন্দীদের মুক্তির দাবীতে

১৯৩৮—৩৯ সাল জুড়ে হুগলী জেলার সর্বত্র আন্দামান বন্দীদের মুক্তির জন্য আন্দোলন শুরু হয়। বন্দীদের মুক্তির দাবীতে চন্দননগরে ছাত্র ধর্মঘট হয়। ১৯৩৮ সালে হুগলী জেলা ছাত্র ফেডারেশনের সম্পাদক ও বর্তমানে জেলার অন্যতম কমিউনিস্ট নেতা কমল চট্টোপাধ্যায়ের 'এ জেলার ছাত্র আন্দোলন ১৯৩৬—৪০' নামক প্রবন্ধ থেকে জানা যায় যে, ১৯৩৮ সালে আন্দামান বন্দীদের দেশে ফেরানোর দাবীতে স্কুলগুলোর পাশাপাশি চন্দননগর কলেজেও ছাত্রধর্মঘট হয়। কলেজ কর্তৃপক্ষ ধর্মঘটে যোগদানকারী কলেজের চারজন ছাত্রের ফ্রিশিপ কেটে নেয়। ছাত্রফেডারেশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গ্রীষ্মের ছুটির পর কলেজ খোলার দিন থেকেই ঐ শাস্তি প্রত্যাহারের দাবীতে ছাত্রকর্মীদের কলেজ গেটে সমবেত করে ধর্মঘট পালন করা হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে কলেজ কর্তৃপক্ষ ঐ চারজন ছাত্রের ফ্রিশিপ ফিরিয়ে দিতে সম্মত হন। পরে এই আন্দোলন পরিচালনায় যাঁরা অগ্রণী ভূমিকা নেন তাঁদের মধ্যে কমল চট্টোপাধ্যায়কে ফরাসী পুলিশ গ্রেপ্তার করে চুঁচুড়া থানায় প্রেরণ করেন। এই গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ছাত্ররা মিছিল সংগঠিত করেন। বিপ্লবী কালীচরণ ঘোষ বাজারের রাস্তায় দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দেন। পরের দিন চন্দননগরের নৃত্যগোপাল স্মৃতি মন্দিরে এক বড় জনসভা হয়। অসংখ্য ছাত্র এই সভায় উপস্থিত হন।

শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনের শক্তিবৃদ্ধিতে ছাত্রদের ভূমিকা

এই সময় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ফ্যাসিবাদ ভয়ংকর বিপদ রূপে আত্মপ্রকাশ করে। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের প্রগতিশীল মানুষ প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠেন। অন্যদিকে জাতীয় ক্ষেত্রে বামপন্থী কংগ্রেসীদের সমর্থনে সুভাষচন্দ্র বসু দক্ষিণপন্থী প্রার্থীকে পরাস্ত করে কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। স্বাধীনতা অর্জনে গান্ধীবাদী

পথ ও সন্ত্রাসবাদী পথেব অকার্যকারিতা প্রমাণ .হয়, রাজবন্দীদের অধিকাংশ মার্কসবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন। জওহরলাল নেহেরুর কণ্ঠে সমাজতন্ত্রের কথা শোনা যায়। এই পরিস্থিতিতে ছাত্ররাও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে গণসংগ্রামের পথে পথ চলাব প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। শ্রমিক-কৃষক, ছাত্র-যুব ও মেহনতী মানুষের ঐক্যেব সার্থকতা সম্বন্ধে ছাত্র সমাজ সচেতন হয়ে ওঠেন। চন্দননগর তথা হুগলী জেলার ছাত্র ফেডারেশন এই বৃহত্তর, অনুভবের বাইরে ছিল না। চন্দননগবের গোন্দলপাড়ার শ্রমিক ইউনিয়নকে কেন্দ্র করে হুগলী জেলার যে শ্রমিক আন্দোলন বিকাশিত হয তাতে চন্দননগরে ছাত্রদেরও ভূমিকা ছিল। ১৯৩৮ সালে মে দিবস উপলক্ষ্যে 'মজদুর সভা'-র নেতৃত্বে এক বিবাট শোভাযাত্রা বেবোয। এতে শহরের প্রগতিপন্থী প্রতিষ্ঠান সহ শহবেরর 'ছাত্র-যুব সংসদ', হুগলী জেলার ছাত্র ফেডারেশনের কর্মীরা সামিল হন। এই তথ্য জানা যায় 'প্রজাশক্তি' পত্রিকার ১৫ই মে ১৯৩৮-র সংখ্যা থেকে। কৃষক আন্দোলন সম্বন্ধেও শহবে ছাত্ররা সচেতন হযে ওঠেন। গ্রামে গ্রামে নিরক্ষর কৃষকদের সাক্ষর করার যে কর্মসচী সে সময গৃহীত হয — তা প্রমাণ করে যে চন্দননগরের ছাত্র ফেডারেশনের কর্মীরা কৃষক আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন।

এই সময হুগলী জেলার ছাত্রফেডারেশন গ্রামে গ্রামে কৃষকদের মধ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও জনশিক্ষা প্রসারের কর্মসূচী গ্রহণ করে। গ্রামে যাওয়ার আগে নৃত্য গোপাল স্মৃতি মন্দিরে এক জনসভার আয়োজন করা হয়। সভার সভাপতি ভবানী মুখার্জী অর্থ সাহায্যের জন্য সকলকে আবেদন করেন। সভায় নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও জনশিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা হয়। যাইহোক ১৯৩৮ সালের ৩০শে এপ্রিল নয়জন ছাত্রকর্মীর একটি দলকে ভদ্রেশ্বর স্টেশনের পশ্চিমে রাঘবপুর গ্রামে পাঠান হয়। এক মাস থেকে যতগুলো সম্ভব নৈশ বিদ্যালয় খুলে বয়স্ক নিরক্ষর কৃষকদের সাক্ষর করার কর্মসূচী নেওয়া হয়। দেশ বিদেশের খবর কৃষকদের কাছে তুলে ধরা হয়। 'মানবের ক্রমবিকাশ', 'সোভিয়েত ইউনিয়নের নতুন সমাজ ব্যবস্থা' ইত্যাদি সম্বন্ধে ম্যাজিক লণ্ঠন সহযোগে গ্রামে গ্রামে ছাত্রকর্মীরা বক্তৃতা দেন। দয়াল কুমারের লেখা 'মুক্তির পথে' নাটক মঞ্চস্থ করা হয়। অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে ছাত্রকর্মীরা এই সব কাজ ভালভাবে সম্পন্ন করেন। এই সাক্ষরতা কর্মসূচীতে চন্দননগরের যে সব ছাত্র সেদিন এগিয়ে আসেন তাঁরা হলেন কমল চট্টোপাধ্যায়, ভবানী মুখার্জী, মোহিত মুখার্জী, উমেশ নন্দী, মনোজ মুখার্জী, হরিপদ মুখার্জী প্রমুখ। গ্রামে গ্রামে কৃষকদের মধ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণের এই মহান কাজের বিবরণ কমল চট্টোপাধ্যায়ের 'গণশিক্ষার কাজ' নামক প্রবন্ধ থেকে জানা যায়। যা ১৯৪৬ সালের 'ছাত্র অভিযান' পত্রিকার ১১শ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। এই সময় চন্দননগরের ছাত্র সমাজ জেলার ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিভিন্ন কর্মসূচী নেন। এই কর্মসূচীর অন্যতম হল প্রগতি আন্দোলন। চন্দননগরের কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দের দ্বারা উৎসাহিত হয়ে শিল্পী, গায়ক প্রভৃতি ছাত্রদের একটি দলকে গ্রামে পাঠান হয়। এই দলের নাম ছিল 'কালচারাল ব্রিগেড'। গ্রামে গ্রামে গিয়ে ছাত্ররা পোস্টার প্রদর্শনী ও গণসঙ্গীত পরিবেশন করেন। এই সময় ছাত্র ও ছাত্র ফেডারেশনের কর্মীদের জন্য বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। চন্দননগরের বহু ছাত্র-ছাত্রী এই কর্মসূচীতে সাড়া দেন। গড়বাটির কানাই বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্লাবের সদস্যরা, 'সানডে এথলেটিক' ক্লাবের সদস্যা এবং তৎকালীন ছাত্রী নেত্রী সন্ধ্যা চটোপাধ্যায় ও আরতি চট্টোপাধ্যায় লাঠি খেলা এই অনুষ্ঠানে প্রদর্শন করতেন। চুঁচুড়া, বালী, চন্দননগরের ছাত্র জগদীশ ধরের পেশী সঞ্চালন প্রদর্শনের জন্য পেশী সঞ্চালন প্রদর্শনের আয়োজন এই সময় করতেন।

১৯৪০ সালে শ্রীরামপুর ইউনিয়ন স্কুলের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ২রা এপ্রিল জেলা ছাত্রফেডারেশনের পক্ষ থেকে জেলাব্যাপী 'ইউনিয়ন স্কুল ছাত্রদিবস' পালনের যে কর্মসূচী নেওয়া হয় তাতে চন্দননগরের ছাত্ররাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ইতিমধ্যে জেলা ছাত্র ফেডারেশনের নেতৃত্বের অনেকেই কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য পদ লাভ করেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য চন্দননগরের ভবানী মুখার্জী, কমল চট্টোপাধ্যায়, মহীতোষ নন্দী প্রমুখ। বস্তুত এ সময় থেকেই ছাত্র সমাজ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি আস্থাশীল হয়ে ওঠেন।

সূত্র নির্দেশ

১. তুষার চট্টোপাধ্যায় স্বাধীনতা সংগ্রামে হুগলী জেলা ১৯৮৩, নবদ্যোতক প্রকাশন
২. কমল চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত প্রগতি, শারদীয় ১৩৯০ (সংকলন সংখ্যা) চন্দননগর,
৩. ভারতের ছাত্র ফেডারেশন ২৭তম হুগলী জেলা সম্মেলন, স্মারক গ্রন্থ ১৯৯২
৪. শহীদ স্মারক গ্রন্থ (দ্বিতীয় বর্ষ) ১৯৮০; রানীঘাট, চন্দননগর
৫. পূর্ণেন্দু দস্তিদার, স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টগ্রাম
৬. কমল চট্টোপাধ্যায়, সাক্ষাৎকার, ৯ই নভেম্বর ১৯৯৪
৭. হরিপদ মুখার্জী, সাক্ষাতকার, ৯ই নভেম্বর ১৯৯৪
৮. নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি ৪৫তম বার্ষিক সাধারণ সম্মেলন, স্মারকগ্রন্থ ১৯৭০
৯. সমসাময়িক পত্র-পত্রিকা
১০. সাহিত্য সেতু হুগলী: শিক্ষা সাক্ষরতা, ১৯৯৪
১১. ভারতের ছাত্রফেডারেশন পঃবঃ রাজ্য কমিটি, ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার, ১৯৮৬

অসহযোগ আন্দোলন ও নদীয়া

পার্থসারথি রুজ

অসহযোগ আন্দোলন জনসাধারণের আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল। অল্পবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা বঙ্গ ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময় থেকে বাংলাদেশের রাজনীতিতে যোগদান করলেও সামাজিক দিক থেকে চরমপন্থীদের অবস্থান তাঁদের কাছে টানতে পারেনি। [illegible] প্রথম দিকে এই শ্রেণীর লোকেরা গান্ধীজীর কাজের প্রতি সন্দেহভাজন ছিলেন। কিন্তু ১৯২০ সালের পর গান্ধীজী যখন তাঁর আদর্শের ব্যাখ্যা করেন এই শ্রেণীর লোকেরা তখন সেই আদর্শকে গ্রহণ করেন।'

মুসলিম জনসাধারণও এই আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নিয়েছিল। বাংলাদেশের জনগণের ৭৫% লোক কৃষির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তারাও গান্ধীজীর আন্দোলনে সামিল হয়েছিল। কারণ খাজনা বন্ধের যে আহ্বান কংগ্রেস ছড়িয়ে দিতে শুরু করেছিল তা সরাসরি কৃষকদের মর্মে গিয়ে পৌঁছাল। ফলে গ্রামাঞ্চলগুলিও নূতন উৎসাহের প্রাবল্যে প্রাণ চাঞ্চল্য নিয়ে জেগে উঠল। চণ্ডীপ্রসাদ সরকারের মতে, 'of course they were inspired not so much by the appeal of Swaraj or Khilafat, as by the hope of their immediate emancipation from the age long economic exploitation.'[২] বাস্তবিকই এই অর্থনৈতিক মুক্তির আবেদনই বহুলাংশে কৃষক সমাজকে শোষক শ্রেণী বিরোধী করে তুলেছিল। তবে অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে খিলাফৎ আন্দোলনকে যুক্ত করার ফলে আন্দোলন যে ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বস্তুত খিলাফৎ আন্দোলনের প্রভাব বাংলাদেশের উপর কেমন পড়েছিল তা বাংলা সরকারের ১৯২১–২২ সালের রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর পাক্ষিক প্রতিবেদন থেকে জানতে পারি।[৩]

১৯২২ সালের ১২ই জানুয়ারির প্রতিবেদন থেকে জানা যায় বাংলাদেশে কমপক্ষে ২৪০টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই সমস্ত সভাগুলি বীরভূম, নদীয়া, কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল। খিলাফৎ আন্দোলনকারীদের কার্যকলাপ বৃদ্ধির ফলে এই সমস্ত স্থানের মুসলিমরা উত্তেজনার চরম পর্যায় সংগঠিত করেছিল। এই সমস্ত স্থানের আন্দোলনকারীরা পবিত্র স্থানের অপবিত্রকরণ সম্বন্ধে উত্তেজক আবেদন জানিয়ে মিথ্যা গুজব ছড়াতে দ্বিধা করেনি। নদীয়া জেলার মুসলিমরা খিলাফৎ আন্দোলনে কেমন সাড়া দিয়েছিল তা 'Report on the progress of the Non-co-operation Movt. in Bengal, 1922' থেকে জানতে পারি। ঐ প্রতিবেদনে লক্ষ্য

করা যায়, নদীয়া জেলায় এক সভায় ইংরেজদের 'জারজ' বলে উল্লেখ করা হয়। এই সভায় যাঁরা যোগদান করেন তাঁদের বেশির ভাগই ছিলেন মুসলমান এবং সেই সভায় জীবনকে তুচ্ছ করে আন্দোলনে সামিল হবার আহ্বান জানানো হয়েছিল।[৪] কাজেই খিলাফৎ আন্দোলনের প্রভাব নদীয়া জেলাতেও পড়েছিল এবং ইংরেজরাই যে শত্রু তা চিহ্নিত করেছিল এবং অসহযোগ আন্দোলনকে পরিপুষ্ট করেছিল। তলার থেকে চাপ থাকার জন্য আন্দোলন ব্যাপক হয়েছিল।

১৯২১-এর জানুয়ারি থেকে মার্চ অবধি কেন্দ্রীয় গুরুত্বের বিষয় ছিল ছাত্রদের সরকার নিয়ন্ত্রিত স্কুল কলেজ ত্যাগ আর আইনজীবীদের ওকালতি বর্জন। ১৯২১-এর জানুয়ারিতে কলকাতায় কলেজের ছাত্ররা গান্ধীজীর ডাকে স্কুল কলেজ পরিত্যাগ করে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেয়। অসহযোগ আন্দোলনে বাংলদেশের ছাত্র সমাজের ভূমিকা জানা যায় সেই দিনই মির্জাপুর পার্কে বিরাট সভা তিলধারণের স্থান নেই। পরের দিন শুনতে পাওয়া গেল, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা এম. এ. ক্লাসের ১৫।১৬ জন ছাত্র কলেজ ছেড়েছে। এদের মধ্যে কবি সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ছিলেন অগ্রণী। মহাত্মাগান্ধী, মহম্মদ আলি, সৌকত আলি এবং দেশবন্ধুর উপস্থিতিতে স্টার থিয়েটারে যে সভা অনুষ্ঠিত হয় তার সভাপতি হয় সাবিত্রীপ্রসন্ন। এই সভার পরে স্কুল কলেজ বয়কট খুব জোরে চলতে লাগল।[৫] সরকার নিয়ন্ত্রিত স্কুল কলেজ বয়কট Andrew-কেও পর্যন্ত স্তম্ভিত করে দিয়েছিল। যাই হোক, G B. Poll, Dept, Poll. Branch, 395/1924-এর প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে অসহযোগ আন্দোলনের 'ত্রিমুখী বয়কটে'র মধ্যে স্কুল কলেজ বর্জনে মার্চ মাসে যখন এই আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটে তখন ১,০৩,১০৭ জনের মধ্যে ১১,১৫৭ জন ছাত্র স্কুল কলেজ বয়কট করেছিল। এই আন্দোলনের প্রভাব গ্রামাঞ্চলগুলিতেও ছড়িয়ে পড়েছিল। অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাব নদীয়া জেলার ছাত্রসমাজের উপর কেমন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল তা আলোচনা করা যেতে পারে।

নাগপুর কংগ্রেসেই অসহযোগের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়। নাগপুর কংগ্রেসের প্রাক্কালে নিখিল ভারত ছাত্র সম্মেলনে জেলার পক্ষ থেকে শ্রীজ্ঞান সান্যাল, মিহিরলাল চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ প্রতিনিধিরা যোগ দেন। নাগপুরের বাণী বহন করে মিহিরলাল চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ছাত্র নেতারা কংগ্রেসে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্রদের মধ্যে দারুণ চাঞ্চল্য দেখা দেয়। বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্ররা কলেজের পিছনে এক মাঠে সমবেত হয়ে অসহযোগের অনুকূলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।[৬] প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন দেশবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে যিনি প্রথম কলেজ বয়কট করেছিলেন সেই সবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ছিলেন নদীয়া জেলার সুসন্তান। কাজেই নদীয়া জেলার ছাত্র সমাজ

যে এই আন্দোলনে সাড়া দেবে তাতে আর আশ্চর্য কি? যাই হোক, বিজয়লালের নেতৃত্বে ছাত্ররা দ্বিজেন্দ্রলালের 'বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ' গানটি গাইতে গাইতে স্কুলে স্কুলে ঘুরতে লাগলেন। ফলে উঁচু ক্লাসের ছেলেরা দলে দলে স্কুল ছেড়ে বেরিয়ে আসতে থাকে। বাংলা তথা ভারতের ছাত্র সমাজের মতো নদীয়া জেলার ছাত্ররাও অসহযোগের চিন্তাধারা গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে দিয়েছিল। যোশী অসহযোগ আন্দোলনে ছাত্রদের ভূমিকা সম্পর্কে লিখেছেন, 'It was these student workers who carried the message of the congress to all corners of the country, who collected funds, enlisted members, held meetings and demonstrations, preached temperance, established arbitration boards, taught spining and weaving and encouraged the revival of home industries.[৮]'। বস্তুত ছাত্রদের আন্দোলনের জন্যই এই আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। 'Without them all the influence of Mahatma Gandhi would not have carried the country very far[৯]'। নদীয়া জেলার ছাত্রসমাজও অসহযোগের বাণীকে কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, রানাঘাট, শান্তিপুর, নবদ্বীপ প্রভৃতি শহর ছাড়িয়ে গ্রামাঞ্চলেও ছড়িয়ে দিয়েছিল। নদীয়া জেলার গ্রামাঞ্চলে যে এই আন্দোলনের প্রভাব ছাত্রদের মধ্যে পড়েছিল তা জানা যায় যখন করিমপুর থানার অন্তর্গত যমশেরপুর বি.এন. উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্ররা পর্যন্ত স্কুল ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল। সেই সময় 1st class (দশম শ্রেণী)-এর ছাত্র বৈদ্যনাথ চৌধুরী মহাশয়ের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে জানা যায় ১৯২১ সালে শিকারপুর থেকে যে মিছিল এসেছিল সেই মিছিলে যমশেরপুর স্কুলের সব ছাত্রই (ছাত্র সংখ্যা আনুমানিক ১৫০—২০০ জন) স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগ দিয়েছিল। তৎকালীন প্রধান শিক্ষক ছাত্রদের যোগদানকে বাধা পর্যন্ত দিতে পারেননি।[১০]। যাই হোক, নদীয়া জেলার ছাত্র আন্দোলন এতই ব্যাপক হয়েছিল যে, কৃষ্ণনগরে জাতীয় বিদ্যালয় 'গববিনী কটেজ', মুড়াগাছা সাধনপাড়ায় জাতীয় বিদ্যালয়, শান্তিপুরে জাতীয় বিদ্যালয়, এবং মেহেরপুরে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বলা বাহুল্য যেখানে সমগ্র বাংলাদেশে ১৯০টি জাতীয় বিদ্যালয় ও কলেজ খোলা হয়েছিল সেখানে নদীয়া জেলার সংখ্যা ভালই ছিল বলা যায়।

ডা বিশ্বমোহন সান্যালের নেতৃত্বে শান্তিপুরে অসহযোগ আন্দোলনে ছাত্ররা [illegible] বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। শান্তিপুরের প্রায় ৫০ জন ছাত্র ইংরেজদের পরিচালিত বিদ্যালয় ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল। অবশ্য স্কুল কলেজ বয়কট আন্দোলন স্তিমিত হয়ে যাবার পর অনেক ছাত্র যেমন সরকারি বিদ্যালয়গুলিতে ফিরে [illegible]ছিল শান্তিপুরের ছাত্ররাও তেমনি নানা কারণে ফিরে গিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে

পরীক্ষা দিয়েছিল।[১১] কারণ এক বছরের মধ্যে স্বরাজ না আসায় প্রথাগত ডিগ্রী ও চাকরির টান স্বাভাবিক ভাবেই আবার জোরদার হয়ে ওঠে। কিন্তু শান্তিপুরের সাতজন ছাত্র জাতীয় শিক্ষা পরিষদের তত্ত্বাবধানে গড়ে ওঠা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়—'গৌড়ীয় সর্ব বিদ্যায়তন' থেকে পরীক্ষা দিয়েছিলেন এবং সেই পরীক্ষায় প্রভাস রায় ও ধীরানন্দ গোস্বামী সম্মানের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে 'মহামাগুলক' চিত্তরঞ্জন দাশের কাছ থেকে শংসা পত্র পেয়েছিলেন[১২]। তবে ডিগ্রী ও চাকরির টান থাকা সত্ত্বেও কিন্তু জাতীয়তাবাদের মূল্যবান শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে কাজ করার জন্য বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান টিকেও গিয়েছিল। শান্তিপুরের জাতীয় বিদ্যালয়টি সুষ্ঠুভাবে চালানোর দায়িত্ব প্রভাস রায়ের উপর দেওয়া হয়। পুলিশী তৎপরতা ও তল্লাসীর মধ্যে দিয়েও তিনি বিদ্যালযটিকে অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেছিলেন। অধ্যাপক কালিপ্রসন্ন দাশগুপ্ত ১৯২২ সালের ১১ই আগষ্ট এই জাতীয় বিদ্যালয়টি পরিদর্শন করে একটি সুদীর্ঘ রিপোর্টও দিয়েছিলেন। তবে স্থানীয় জনসাধারণের যে এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি ছিল তা ঐ রিপোর্টেই জানা যায়। যাই হোক, শুধুমাত্র কৃষ্ণনগব বা শান্তিপুরের ছাত্ররাই নয নদীয়া জেলার প্রত্যন্ত গ্রামের ছাত্ররা পর্যন্ত অসহযোগের এই ডাকে সাড়া দিয়েছিল। তবে বুদ্ধিজীবী কেন্দ্রিক এই আন্দোলনে অচিরেই ভাটার লক্ষণ দেখা দিতে শুরু করে এবং নদীয়া জেলাতেও এই আন্দোলনে ভাটার টান লক্ষ্য করা যায়। এদিকে গান্ধীপন্থী কংগ্রেসী নেতৃত্ব স্বদেশীর চটজলদি পথের প্রতীক হিসাবে ছাত্র ও সাধারণভাবে শিক্ষিত নাগরিকদের স্বেচ্ছায় চরকা কাটতে উপরোধ করে। নদীয়া জেলার ছাত্রসমাজ ও শিক্ষিত সমাজ চরকা কর্মসূচীতেও অংশ নিয়েছিল। তাই দেখা যায় কৃষ্ণনগর জাতীয় বিদ্যালয় 'গরবিনী কটেজে'র শিক্ষক অনন্তহরি মিত্র, হরিপদ চট্টোপাধ্যায়, বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় প্রমুখেরা চরকা কর্মসূচীতে অংশ নিয়েছিলেন। এছাড়া নবদ্বীপে 'চরকা ভাণ্ডার' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আর শান্তিপুরের চরকা কাটার এক সুন্দর চিত্র দেওয়া যেতে পারে। 'গান্ধীজীর সবরমতী আশ্রমের আদর্শ এদেশে নূতন জোয়ার আনে। বিদেশী বস্ত্র বয়কট ও ঘরে ঘরে চরকা কাটার যে ফর্মূলা তিনি ইংরেজ তাড়ানোয় দিয়েছিলেন, সেই ফর্মূলায় অনুপ্রাণিত হয়ে ঘরে ঘরে বসল চরকা। তুলোর পাঁজ নেওয়া, খেই তোলার কাজ শিখানো শুরু হল ঘরে ঘরে মেয়েদের মধ্যে। এই কাজে অনেকের মতো নেত্রীস্থানীয়া ছিলেন রামসুধা চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী। ঘরে ঘরে তখন মেয়েরা তুলা থেকে সুতো কেটে শান্তিপুরী কাপড়ের সুতোর চাহিদা অনেকাংশে মেটাতেন। এই কাজে ছিলেন শুধুই মেয়েরা। এই সময় এই রমণীরা মজুরীর প্রতি যতটা না আকৃষ্ট ছিলেন, তার থেকে 'স্বদেশের জন্য কিছু আমরাও করছি' — তাঁদের এই মনোভাবটাই বড়ো ছিল।[১৩]

এপ্রিল মাসে সারা ভারত কংগ্রেস কমিটি বিজয়ওয়াড়া অধিবেশনে পরিস্থিতির যে বিশ্লেষণ করে তাতে দেখা যায় যে অসহযোগ চালানোর পক্ষে দেশ এখনও পর্যন্ত যথেষ্ট পরিমাণে নিয়মনিষ্ঠ, সংগঠিত ও পরিণত নয়। এবং এই অধিবেশনেই ঠিক হয় ৩০শে জুনের মধ্যে 'তিলক স্বরাজ তহবিলে'র জন্য এক কোটি টাকা তোলা হবে, এক কোটি কংগ্রেস সদস্যের নামভুক্তি ও কুড়ি লাখ চরকা বসানোর কাজে মনোযোগ দেওয়া হবে। নদীয়া জেলায়ও 'তিলক স্বরাজ তহবিলে'র জন্য যে চাঁদা তোলা হয়েছিল তা জানা যায় 'Later, Deshbandhu Chittaranjan Das visited Krishnagar and other places to raise Fund for the Tilak Swaraj Fund.'[১৪]। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন এই সময় প্রথম যে নদীয়া জেলা কংগ্রেস কমিটি গঠিত হয় তার সভাপতি হন হেমন্তকুমার সরকার, সম্পাদক বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় এবং কোষাধ্যক্ষ হন বিহারীলাল সরকার। কাজেই সর্বভারতীয় আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই নদীয়া জেলার কর্মীরাও ছড়িয়ে পড়েছিল।

তলার থেকে চাপ বাড়ার জন্য ২৮—৩০শে জুলাই বোম্বাই সারা ভারত কংগ্রেস কমিটির সভা জঙ্গি মনোভাব গ্রহণ করে বিদেশী কাপড় বয়কট (প্রকাশ্য বহ্নি উৎসব সমেত) ও প্রিন্স অব ওয়েলসের সফর বর্জনের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। প্রিন্স অব ওয়েলসের ভারত পরিদর্শনকে উপলক্ষ্য করে যে বয়কট সংগঠিত হয় তার সাফল্যও ছিল চমকপ্রদ। এই উপলক্ষে বোম্বাই-এ হরতাল পালিত হয়। সেখানে সমুদ্রতটে যে জনসভা অনুষ্ঠিত হয় সেই সভায় গান্ধীজী পর্যন্ত বিদেশী কাপড়ের বহ্নুৎসবে যোগ দেন। বাংলাতেও যুবরাজের সফর উপলক্ষে বর্জন আন্দোলন শান্তিপূর্ণ ও স্বতঃস্ফূর্ত হয়েছিল। নদীয়া জেলাতেও বিদেশী কাপড় বয়কট (প্রকাশ্য বহ্ন্যুৎসব সমেত) ব্যাপক আকারই ধারণ করেছিল বলা যায়। 'অসহযোগ ও বিলাতী বর্জন' আন্দোলন উপলক্ষে কৃষ্ণনগর টাউন হলের ময়দানে যে সভা অনুষ্ঠিত হয় সেই সভায় মণীন্দ্রনাথ গুপ্ত ও তাঁর ছেলে শিবরাম গুপ্ত উপস্থিত ছিলেন। বিলাতী বস্ত্র পোড়াবার জন্য মতিলাল মাল্লা (মতি মাঝি) যে আহ্বান জানান তাতে অনেকের সঙ্গে শিবরাম গুপ্তও যোগ দিয়েছিলেন। শিবরাম তাঁর জামাটি বিলাতী কাপড়ে প্রস্তুত হওয়ায় সেটি আগুনে নিক্ষেপ করেন[১৫]। কাজেই নদীয়া জেলার জনসাধারণও যে আন্দোলনে চাপ রাখতে পেরেছিল এবং জঙ্গি আন্দোলনে অংশ নিয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

আবার ১৯২১-এর জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় গুরুত্বের বিষয় ছিল আইনজীবীদের ওকালতি বর্জন। চিত্তরঞ্জন, মোতিলালের মতো শীর্ষস্থানীয় আইনজীবীরা ওকালতি ছেড়েদেন। নদীয়া জেলার সুসন্তান পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র ১৯২১ সালে গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিলে আলিপুরে

জজ কোর্টে ওকালতি ত্যাগ করে শান্তিপুরে চলে আসেন। এখানে 'স্বদেশী ভাণ্ডার ও শিল্পাশ্রম' প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হন এবং নানা ভাবে আন্দোলনকে সহায়তা করতে থাকেন।[১৬] তবে জেলার আইনজীবীরা ওকালতি না ছাড়লেও বিভিন্ন ভাবে যে আন্দোলনকারীদের সাহায্য করেছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। কৃষ্ণনগর বারের বিশিষ্ট উকিল দ্বিজেন্দ্রনাথ সরকার মদ, গাঁজার দোকানে পিকেটিং করেছেন এবং ১০৭ ধারায় গ্রেপ্তারও হয়েছেন। অবশ্য মামলায় প্রমাণাভাবে মুক্তি পেয়েছেন।[১৭]

সামাজিক বিন্যাস: অসহযোগ আন্দোলন যে প্রথম জনআন্দোলন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। একথা সত্যি এই প্রথম বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। তা সত্ত্বেও বলা প্রয়োজন উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাছে আত্মত্যাগের যে আবেদন করা হয়েছিল তা আদৌ খুব একটা সফল হয়নি। কারণ ৫১৮৬টি খেতাবের মধ্যে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল মাত্র ২৪টি। আসলে খেতাবধারী শ্রেণী নিজেদের আর্থনীতিক কারণেই খেতাব ত্যাগ করতে চায়নি। রায়বাহাদুর বা অন্যান্য খেতাবগুলি একদিকে যেমন তাঁদের সামাজিক প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করেছিল অন্যদিকে ইংরেজদের ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগে অর্থনৈতিক লাভের সম্ভাবনাও কম ছিল না। আদালতে কাজকর্ম ছেড়ে ছিলেন এমন আইনজীবীর সংখ্যা ছিল, ১৯২১ খ্রীঃ মাত্র ১৮০ জন। নদীয়া জেলায় যে সমস্ত আইনজীবী নানাভাবে আন্দোলনকে সহায়তা করেছেন তাঁদের মধ্যে বেচারাম লাহিড়ী, মৌলভী সামসুদ্দিন আমেদ, ইন্দুভূষণ চক্রবর্তী, বঙ্কেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

১৯২০ সালের নভেম্বর মাসের নির্বাচন কংগ্রেস বয়কট করায় নদীয়া জেলাতেও কংগ্রেস এই নির্বাচন বয়কটে সামিল হয়েছিল। তবে নির্দল প্রার্থীরা এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে, সেসময় প্রাপ্তবয়স্কের সার্বজনীন ভোটদানের অধিকারী ছিল। কাজেই একদিকে কংগ্রেসের বয়কট অন্যদিকে গ্রাজুয়েট ছাড়া ভোটদানের অধিকার না থাকায় ভোটগ্রহণ প্রহসনে পরিণত হয়েছিল।

তবে নদীয়া জেলায় শিক্ষাক্ষেত্রে বয়কট ছিল অনেক বেশি কার্যকরী। তবে শুধুমাত্র বিদ্যালয় বয়কট নয় নদীয়া জেলার সুসন্তানরা নিজের নিজের কাজ ছেড়ে বেরিয়ে এসে সর্বভারতীয় আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেছিলেন। হেমন্তকুমার সরকার, যিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্রই ছিলেন না, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা ও P.R.S-এর গবেষণা ছেড়ে নেমে আসেন স্বাধীনতা সংগ্রামের যুদ্ধ ক্ষেত্রে।[১৮] শুধুমাত্র হেমন্ত সরকারই নন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগার ত্যাগ করে অসহযোগের বন্যায় হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ও ঝাঁপিয়ে পড়েন।[১৯] ১৯২১ সালে গান্ধীজী ব্রিটিশের অফিস, আদালত ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্জনের যে আহ্বান জানান সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাংলা তথা সারা ভারতে দলে দলে সরকারী

চাকুরেরা যেমন বাংলার সুভাষচন্দ্র বোস, প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ প্রমুখেরা সরকারী চাকুবী ত্যাগ করেন, নদীয়া জেলাতেও তেমনি সরকারী চাকুরী ত্যাগ করে গান্ধী আন্দোলনে যোগ দিযে ইতিহাস হযে আছেন প্রভাসচন্দ্র সরকার। ১৯২২ সালে সবকাবী চাকুরী ছেড়ে আন্দোলনে যোগ দেন প্রভাসচন্দ্র।[২০] ঠিক অসহযোগ আন্দোলনে না হলেও অসহযোগেব আদর্শে অনুপ্রাণিত হযে প্রফুল্লকুমার ভট্টাচার্যের সবকাবী চাকুরী ত্যাগ এক অনন্য নজিব হয়ে আছে। তিনি স্কটিশ চার্চ কলেজের সুপারিশে ইম্পিরিযাল ব্যাঙ্কে একটি উচ্চপদে নিযোগপত্র লাভ করেন। কলকাতা থেকে এই সুসংবাদ নিযে কৃষ্ণনগব ফেরার পথে একই ট্রেনে ভ্রমণবত দেশবন্ধু ও সুভাষচন্দ্রেব সাথে হেমন্তকুমাব সবকার তাঁকে পরিচয করিযে দেন। এই পরিচযেব ফলে তিনি চাকুবী গ্রহণ না করে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।[২১]

তবে অসহযোগেব নানা মাত্রা ও বিবোধ সবচেযে ভালো বোঝা যাবে প্রদেশ ও অঞ্চলভিত্তিক সমীক্ষা দিযে।[২২] বস্তুত নদীযা জেলাব অসহযোগের সমযে আন্দোলনকে ভালভাবে বুঝতে গেলে নদীযা জেলায সেই সময গণআন্দোলনকে শুধুমাত্র সর্বভাবতীয বা সামাজিক বিন্যাসেব মাধ্যমে বিশ্লেষণ করে নয অসহযোগ আন্দোলনের সমযকালে নদীযা জেলার জনসাধারণের আন্দোলনকে নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে বিচাব করলে এই আন্দোলনের স্বরূপ বোঝা সম্ভব। 'Non-co-operation had begun in earnest and its message had reached the remotest village. A host of Congress workers in each district went about the rural areas with the new message to which they often added, rather vaguely a removal of Kisan grievances. Swaraj was an all-embracing word to cover everything. Yet the two movements — non-co-operation and the agrarian — were quite separate though they overlapped and influenced each other greatly....'[২৩]। বস্তুত নদীয়া জেলাযও বিভিন্ন গ্রামে অসহযোগের বার্তা পৌঁছে দিয়েছিল কংগ্রেস কর্মীরা। কিন্তু অসহযোগ ও কৃষি আন্দোলন দুটি পৃথক যদিও তা পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। নদীয়া জেলাতেও দেখা যায় অসহযোগ আন্দোলনের সময়কালে এক ব্যাপক কৃষক আন্দোলন, যা অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছিল, যদিও সেই আন্দোলন ছিল সম্পূর্ণ পৃথক এবং স্বতন্ত্র এক আন্দোলন। এই আন্দোলন যে স্বতন্ত্র আন্দোলন ছিল তা জানা যায়। ১৯২২ সাল নাগাদ করিমপুর থানা, দৌলতপুর থানা, ভেড়ামারা থানা ইত্যাদি এলাকায় নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে এক সংঘবদ্ধ কৃষক আন্দোলন হয়। এই আন্দোলন যদিও প্রত্যক্ষভাবে

কংগ্রেসের নেতৃত্বে হয়নি তথাপি এর নেতৃত্ব করেন বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা সোমেশ্বর চৌধুরী।[২৪] অবশ্য ১৯২২ সালের কৃষক আন্দোলনের সূত্রপাত হযেছিল ১৯১৮ সালে। গান্ধীজীর নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন গণসংগ্রামে পবিণত হয। সর্বভাবতীয স্তবে ১৯১৮ ১৯ থেকে মুসলিম সমাজেব একটা উল্লেখযোগ্য অংশ আন্দোলনেব এই মূলস্রোতে সামিল হয। বাংলাদেশেও এর ব্যতিক্রম হযনি। এখানেও সাম্প্রদাযিক ও সামাজিক বিভাজনেব উর্দ্ধে উঠে একটা সংঘবদ্ধ আন্দোলনেব সম্ভাবনা গডে ওঠে। তবে এই প্রতিবাদী আন্দোলনকে কেবল জাতীযতাবাদের মূল নিবিখে বিচার কবা ঠিক হবে না। ববং মূল স্রোতেব আন্দোলন যখনই ব্যাপক হযেছে তখনই নীচের তলার প্রতিবাদ গান্ধীব নির্দিষ্ট সীমাকে বারংবাব অতিক্রম কবেছে। আসলে বাংলাদেশের সমাগেজব একেবাবে নীচু তলার মানুষবা জাতীয সংগ্রামেব মূল প্রবাহেব সঙ্গে যুক্ত হযে তাঁদেব বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক দাবি দাওযা নিযে সংগঠিত আন্দোলন গডে তুলেছিল।[২৫] Proceedings of the Bengal Legislative Council থেকে জানা যায যে ১৯২১ সালের জুলাই-আগষ্ট মাসে নদীযা জেলাব অন্তর্গত শিকারপুরের প্রজাবা মেদিনীপুব জমিদারী কোম্পানীকে নীল চাষের অবলুপ্তি ঘটাতে এবং তাঁদের শর্তে জমিগুলিকে বিলি করাব দাবি জানায়।[২৬] মৌলভী ইসমাইল হুসেন সিবাজী প্রজাদেব অভিযোগগুলি তুলে ধবেন এবং Mrs Watson & Co -এর বিরুদ্ধে ২৪ দফা অভিযোগ পেশ কবেন। কিন্তু কংগ্রেস যে তখনো প্রজাদের উপর অত্যাচারকে হাতিযার করে মেদিনীপুর জমিদারী কোং এর বিরুদ্ধে আন্দোলনে রাজি নয় তা জানা যায় সোমেশ্বর চৌধুরী যখন মেদিনীপুর জমিদার কোং অধীন প্রজাদের উপর অত্যাচারের চিত্র চিত্তবঞ্জনের নিকট তুলে ধবেন। তখন চিত্তরঞ্জন তাঁকে জানিয়েছিলেন, 'ব্রিটিশ সরকার থাকতে ঐ সাহেব কোং-এর অত্যাচার নিবারণ করা একরকম অসম্ভব। বর্তমানে ঐ কাজে হাত দিলে জমিদার ও প্রজাদের মধ্যে একটা বিশ্রী আন্দোলনের সৃষ্টি হবে। সাহেবদের অত্যাচার নিবারণ করতে গিয়ে যদি দেশীয জমিদারদেব কিছু ক্ষতি হয় তাতেও আমি তোমার সঙ্গে আছি, তবে কংগ্রেস তোমার সঙ্গে থাকবে না'।[২৭] যাই হোক, কংগ্রেসের কর্মপন্থার বাইরেও এই আন্দোলন কী ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল তা সোমেশ্বর চৌধুরীর লেখা থেকে জানতে পারি।

১৮৫৯—৬০ সালের নীল আন্দোলনের পর বাংলাদেশে নীল চাষ প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বলা হলেও কিন্তু তার পরেও নদীয়াতে নীলচাষের ব্যাপক প্রবর্তন ছিল তা জানা যায়, নদীয়ার মেহেরপুর ইংরেজ নীলকরদিগের প্রধান আড্ডা ছিল। কাথুলী, কাজলা, শিকারপুর, সিন্দুরগঞ্জ, আমঝুপি, কাপাসডাঙ্গা প্রভৃতি স্থানের নীলকুঠিতে তাহাদের নীল প্রস্তুত হতো। মেদিনীপুর জমিদারী

কোং-এর তখনও সৃষ্টি হয় নাই। নিশিন্তপুর কনসার্নের ইংরেজ কুঠিয়াল কোম্পানি তখন মেহেরপুরের জমিদার; প্রকৃত পক্ষে তাঁরা ইজারাদার ছিলেন।[২৮]

তবে ১৮৫৯—৬০ সালে কৃষক সম্প্রদায়ই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিল। শুধু তাই নয় নীল আন্দোলনের সময়কালে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে 'রায়ত সভা' গঠিত হয়েছিল। নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে 'রায়ত সভা'র মিটিং-এ ২০,০০০ এবং কুষ্টিয়াতে ১৫,০০০ লোক যোগ দিয়েছিল।[২৯] সেই আন্দোলনে কৃষকরা যখন সাফল্যের নজির রেখেছিল তখন ১৯২১—২২ সালে কৃষকরা আন্দোলনে সামিল হবে তাতে আর সন্দেহ কি? তবে ১৮৫৯-৬০ সালের নীল আন্দোলনের সঙ্গে ১৯২১—২২ সালের নীল আন্দোলনের পার্থক্য বিদ্যমান ছিল। ১৮৫৯ ৬০ সালের আন্দোলনে চাষীরা শোষণের হাত থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিল, ইংরেজ শাসন থেকে মুক্তির কল্পনাও তারা করতে পারেনি। পক্ষান্তরে ১৯২১—২২ সালে নীলকর সাহেবদের অত্যাচার থেকে মুক্তির আন্দোলনই নয়, গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেস কর্মীরা স্বরাজের যে ধারণা দিয়েছিল তা স্পষ্টভাবে না হলেও বিদেশী শাসন থেকে মুক্তির একটা আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে ছিল। তারই প্রতিধ্বনি শুনতে পাই, 'এরা বুঝতে শিখেছে, এদের (কৃষক) মানুষের মত বাঁচতে হবে, এর চেয়ে প্রাণ রাখা বড় কথা নয়।'[৩০] আবার ১৮৫৯—৬০ সালের নীল বিদ্রোহের সঙ্গে এই বিদ্রোহের মূলগত পার্থক্য ১৮৬০খ্রীঃ নীল বিদ্রোহের নেতৃত্ব বাংলাদেশের বিদ্রোহী কৃষক জনসাধারণই সৃষ্টি করেছিল। 'উহার নিমিত্ত যে কত গ্রাম্য বীর ও নেতার উদয় হইয়াছিল, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাঁহাদের নাম নাই'।[৩১] পক্ষান্তরে ১৯২১ খ্রীঃ নীল আন্দোলন একজন নেতার অপেক্ষায় ছিল। অত্যাচারিত কৃষকেরা তখনো পর্যন্ত সাহেব কোম্পানির বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনে সামিল হতে পারেনি।

যাই হোক, ১৯২১—২২ সালে কৃষকদের উপর অত্যাচারের চিত্র বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। হারাণচন্দ্র চাকলাদারের লেখা থেকে নীলকর সাহেবদের শোষণ ও উৎপীড়নের চিত্র পাওয়া যায়। বিংশ শতাব্দীতেও গৃহস্থের দাদন বা মজুরী, রেকাব দল, শ্যামচাঁদ, বেগারের জন্য জুলুম, রাস্তা মেরামত, হাঁস মুরগীর ডিম আদায় জুলুম, জমি পাস, টিনি পাস, ফসল জাত ও কুঠিজাত করা ইত্যাদি পুরোদমে চলতে থাকে। খাজনা আদায়ের পদ্ধতি ও বিচার ব্যবস্থা ছিল বিচিত্র ও অদ্ভুত ধরনের।

আবার ১৮৫৯—৬০ সালের নীল আন্দোলনের সংগঠন ও কৌশল থেকে ১৯২১—২২ সালের সংগঠন ও কৌশল সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। ১৯২১—২২ সালে কৃষকদের আন্দোলনে যিনি নেতৃত্ব দিতে আসেন তিনি কংগ্রেসী নীতি ও কর্মপন্থার মধ্যে থেকেই আন্দোলনকে অহিংসভাবে পরিচালিত করতে চেয়েছিলেন।

কৃষক আন্দোলন 'কংগ্রেসী কর্মসূচী'র অন্তর্ভুক্ত কিনা তা ছিল স্বতন্ত্র বিষয়। কিন্তু গান্ধীপন্থী আন্দোলনেব যে আদর্শ—হিন্দু-মুসলিম একতা, ধর্মঘট ইত্যাদি এই আন্দোলনের কৌশল ও সংগঠন হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল। প্রতি শুক্রবার নামাজের দিনে মসজিদে গিযে কংগ্রেসের বার্তা এবং দেশের অবস্থা ব্যাখ্যা কবা, হাটেব মধ্যে সভা কবে কংগ্রেসের বাণী প্রচাব করা, মাঝে মাঝে রাত্রিতে সভা অনুষ্ঠিত কবা সবই কৌশল হিসাবে গ্রহণ কবা হযেছিল। তবে আন্দোলন সংগঠনের জন্য বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করা হলেও সাহেবদের বিরুদ্ধে সরাসরি আঘাতের জন্য 'ধর্মঘটকেই' গ্রহণ করা হযেছিল। অত্যাচারিত নিবস্ত্র চাষীদেব কাছে 'ধর্মঘটেব মূল্য' সম্বন্ধে প্রথমদিকে উন্নাসিকতা থাকলেও পববর্তীতে 'ধর্মঘটেব' মাধ্যমেই আন্দোলন সফলকাম হয়েছিল।

তবে আন্দোলনের সবচেযে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হিন্দু-মুসলমান একতা এবং সংকীর্তনেব মাধ্যমে জনগণকে সামিল কবা। যাই হোক, ১৮৫৯-৬০ সালের নীল আন্দোলনে ৬০ লক্ষাধিক কৃষক যোগ দিয়েছিল। ১৯২১-২২-এর আন্দোলনে যোগদানকারী কৃষকের সংখ্যা নগন্য ছিল না।

১৮৫৯—৬০' সালের নীল আন্দোলনকে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে এই ভাবে, নীল বিদ্রোহ দুটি প্রাথমিক স্তর অতিক্রম করে অবশেষে সশস্ত্র অভ্যুত্থানে পবিণত হয। প্রথম স্তর ছিল শাসক গোষ্ঠীর মানবিকতা ও ন্যায বোধের নিকট আবেদনের স্তর আর দ্বিতীয় স্তর ধর্মঘটের স্তর অর্থাৎ নীল চাষে অস্বীকৃতির স্তর। এর পর পূর্ণ সামরিক ও পুলিশ বাহিনীর সহায়তায় কৃষককে বলপূর্বক নীলচাষে বাধ্য কবানোর চেষ্টা হলে আরম্ভ হয় সশস্ত্র অভ্যুত্থান।[৩২] কিন্তু ১৯২১—২২ সালের আন্দোলন দ্বিতীয স্তরেই সফলকাম হয়েছিল। সবচেয়ে বড কথা গান্ধীজী পরিকল্পিত অসহযোগের যে ধারণা গঠনমূলক কর্মসূচী ও সত্যাগ্রহ তার থেকে কিন্তু এই আন্দোলন ব্যতিক্রম ছিল না। গঠনমূলক কর্মসূচীর মধ্যে হিন্দু-মুসলমান একতা, সালিশী ও চরকার প্রচার এই আন্দোলনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আর সত্যের প্রতি আগ্রহ থাকার জন্য যে আন্দোলন সফলকাম হয়েছিল তা জানা যায় 'চতুর্দিকে জনগণ লক্ষ্য করছে ধর্মের জয় হয় কি না? খুন করলেও যাব না, গায়ের চামড়া খুলে নিলেও যাব না, কাজে যাব না' ইত্যাদি বক্তব্যে।[৩৩]

১৯২১—২২ সালের আন্দোলনে বিভিন্ন শ্রেণীর ভূমিকা বিশ্লেষণ করার পূর্বে বলা প্রয়োজন যে কৃষক আন্দোলন কংগ্রেসী কর্মসূচীর তালিকাভুক্ত ছিল না। তাছাড়া আন্দোলনের নেতারাই দেশীয় জমিদারদের বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনা করতে দ্বিধান্বিত ভাব লক্ষ্য করা যায়। 'যখন শুনলাম, বাগচী বাবুরাই এখানকার জমিদার, প্রতি পদক্ষেপেই আমার ভয় হতে লাগলো, যদি আমার বক্তৃতার দ্বারা বাগচীবাবুদের কোন ক্ষতি করে ফেলি'।[৩৪]

এত দ্বিধা দ্বন্দ্ব থাকার পরও ১৯২১—২২ সালের নদীয়া জেলার নীল আন্দোলন বা কৃষক আন্দোলন সফলকাম হয়েছিল। শিকারপুর কনসার্নের চিফ্ ম্যানেজার M N Cowford কুঠি ছেড়ে পালালে নীলের চাষের অস্তিত্ব ও লোপ পায়। এ ব্যাপারে সাহেবদের ক্ষতির পরিমাণ লক্ষাধিক টাকার উপর হয়ে ছিল।[৩৫] এইভাবে নীলকর সাহেবদের শোষণ ও উৎপীড়নের হাত থেকে নদীয়া জেলার কৃষক সমাজ মুক্তি লাভ করেছিল।

যাইহোক, সমগ্র ভারতে অসহযোগ আন্দোলনকে যে প্রেক্ষাপটে বিচার করা সহজ, আঞ্চলিক স্তরে তার বিচার সব সময় একইভাবে করা যায় না। তবে একথা ঠিক অসহযোগ আন্দোলনই কংগ্রেসের সাংগঠনিক কাঠামোতে বিরাট পরিবর্তন আনতে সমর্থ হয়েছিল। তাছাড়া কংগ্রেস কর্মীরা গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে যেভাবে আন্দোলনকে ছড়িয়ে দিয়েছিল তাতে জনসাধারণের মনোভাবের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। 'It gave to the country a set of professional freedom fighters who by their spirit of sacrifice and strength of character earned respect of the public in general.[৩৬]। বস্তুত সোমেশ্বরপ্রসাদ চৌধুরীর এই অঞ্চলে এমনই প্রভাব পড়েছিল যে ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থীকে জয়ী করানোর জন্য তাঁর আবেদন বিশেষ সহায়ক হয়েছিল।

সূত্র নির্দেশ

১. **Elite conflict in a Plural Society**—Broomfield p ১৬৫

২. **Bengal Past & Present,** V 103 p 1 2 (Bengali Muslim Politics, Society and culture during the Khilafat non co-op. Movt.)

৩. **The Indian Economic and Social Hist. Review**-Vol II (Article Masses in politics: The Non co op. Movt. in Bengal 1920 22) p 394-95.

৪. পূর্বোক্ত পৃ. ৩৯৪ : ৯৫

৫. **মাসিক বসুমতী,** চৈত্র, ১৩৫৩, পৃ. ৬৩১

৬. **স্বাধীনতা সংগ্রামে নদীয়া** (রজত বর্ষ) পৃ. ১৩১

৭. পূর্বোক্ত : পৃ. ১৩১

৮. **Student Revolts in India**—P. C. Joshi p 21.

৯. পূর্বোক্ত পৃ. ২১

১০. বৈদ্যনাথ চৌধুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার, তারিখ- ৭।৮।৯৪

১১. **পদক্ষেপ :** শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৮২, পৃ. ২

১২. **পিতৃদেব স্মরণে,** মৃণাল রায় (জন্মাষ্টমী, ১৩৯১/পৃ. ৫ অপর সূত্র : **পদক্ষেপ** পৃ. ২

১৩. জনতাব মুখ, পৃ. ২৭ (শান্তিপুব থেকে প্রকাশিত)
১৪. **West Bengal Dist Gazettiers, Nadia - Majumder p 71,**
১৫. স্বাধীনতা সংগ্রামে নদীয়া পৃ. ৩৩৭
১৬. প্রতিবাদী চেতনা (পঞ্চদশবর্ষ: বিংশ সংখ্যা) পৃ. ৩
১৭. স্বাধীনতা সংগ্রামে নদীয়া, পৃ. ২৫৮—৫৯
১৮. পূর্বোক্ত পৃ. ৩৮৩
১৯. পূর্বোক্ত পৃ. ৩৭৬
২০. পূর্বোক্ত পৃ. ২৮৪
২১. পূর্বোক্ত পৃ. ২৮৩—৮৪
২২. আধুনিক ভারত: সুমিত সবকাব, পৃ. ২১১
২৩. **Autobiograply, Nehru** p ৫৮—৫৯
২৪. স্বাধীনতা সংগ্রামে নদীয়া পৃ. ১৩৩
২৫. শতাব্দীর প্রতি বাংলা, সুবঞ্জন দাস (গণশক্তি, ১৪ই এপ্রিল ১৯৯৪) পৃ. ৪
২৬. **Bengal Past & Present** V 103 P 1 2
২৭. নীলকর বিদ্রোহ: সোমেশ্বব চৌধুবী, পৃ. ১২
২৮. মাসিক বসুমতী, চৈত্র, ১৩৪৫: পৃ. ৯৩০
২৯. স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা—নবহবি কবিবাজ, পৃ. ১৯২ কলি: ১৯৬১।
৩০. নীলকর বিদ্রোহ: পৃ. ১১৫
৩১. যশোহর খুলনার ইতিহাস: সতীশ চন্দ্র মিত্র, পৃ. ৭৭৯
৩২. ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, সুপ্রকাশ বায়, পৃ. ৩৯১—৯২
৩৩. নীলকর বিদ্রোহ, পৃ. ৫৭
৩৪. পূর্বোক্ত পৃ. ৭৯
৩৫. পূর্বোক্ত পৃ. ১১৮
৩৬. **Freedom struggle and Anushilan Samiti,** vol 1 p 163.

মহিষবাথান গ্রাম ও লবণ সত্যাগ্রহ: দ্বিতীয় পর্ব

পুষ্পরঞ্জন সরকার

বর্তমানের খ্যাতনামা সল্টলেক তখন অখ্যাত গ্রাম্য অঞ্চল মহিষবাথান। একদিকে মহিষবাথানের অর্থনৈতিক দূরবস্থা, খ্রীষ্টান মিশনারীদের ধর্মান্ত:করণের প্রচেষ্টা, অন্যদিকে শহরে জাতীয় জাগরণের জোয়ার।

মহিষবাথান গ্রাম অজানা, অখ্যাত হলেও গান্ধীজীর লবণ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে তিরিশের দশকেই এই গ্রাম বিখ্যাত হয়ে ওঠে। স্থানটি কলকাতার নিকটবর্তী হওয়ায় কলকাতা বা নিকটবর্তী অঞ্চলের সত্যাগ্রহীরা এই অঞ্চলকে তাদের লবণ আইন ভঙ্গের জায়গা হিসাবে বেছে নেয়। মূলত চব্বিশ পরগণা কংগ্রেস কমিটির নির্দেশে মহিষবাথানে এই লবণ তৈরির মাধ্যমে লবণ আইন ভঙ্গ করা হয়।

ঐ সময়ে (৬ই মার্চ, ১৯৩০) কংগ্রেস সভাপতি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু জাতির উদ্দেশ্যে বলেন:

"On March 12 Gandhiji begins his great march and Satyagraha or Independence commences. The eye of all India will be upon him on that historic day and the prayers and good wishes of millions of her sons and daughters will follow him and his gallant band.

I suggest that all over the country we should celebrate the great day by meeting and suitable demonstrations by reiterating our pledge of Independence and wishing 'God speed' to the soldiers of freedom.

In particular, I hope that on that day volunteers for Satyagraha will be enrolled everywhere."[১]

১৭৩৭ খ্রীঃ—১৭৫৭ খ্রীঃ বাদ দিলে দেখা যায় ভারতে লবণশিল্পের ওপর ট্যাক্স ছিল না। বৃটিশ সরকার লবণের ওপর ট্যাক্স চালু করেন। লবণ থেকে সরকার ১৯২৫—২৬ খ্রীষ্টাব্দে ৬,৩৭,০৩,৫৬০ টাকা ও ১৯২৬—২৭ খ্রীষ্টাব্দে ৬,৭২,৮৬,২২৩ টাকা ট্যাক্স পায়।[২]

ভারতই একমাত্র দেশ যেখানে লবণের ওপর ট্যাক্স রয়েছে। গরীব দেশবাসীর প্রতিটি গ্রাসাচ্ছাদন ট্যাক্সে বাঁধা। এই সময়ে ১৮ই মার্চ, ১৯৩০ কলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচনে কংগ্রেস লবণ আইনভঙ্গের প্রস্তাব রাখে।

জওহবলাল নেহরুব আবেদনে বাংলা সাড়া দেয। ১২ই মার্চ মহাত্মাজীব ডাণ্ডি অভিযানেব সাথে সকাল থেকেই সাবা কলকাতায উৎসাহ-উদ্দীপনাব সঞ্চাব হয। বি.পি.সি.সি.-এব হবিকুমাব চক্রবর্তী ও ললিতমোহন দাস এ-ব্যাপাবে বিশেষ উৎসাহ দেখান। বিকালে সদানন্দ পার্ক ও হ্যালিডে পার্কে সভা হয়। আইন অমান্যেব জন্য একশতেবও বেশি স্বেচ্ছাসেবক শ্রদ্ধানন্দ পার্কে নিজেব নাম তালিকাভুক্ত কবেন।

১৪ই মার্চ গান্ধীজী 'ইযং ইণ্ডিযা' পত্রিকায লেখেন যে, এক টুকবো রুটি চেযে তিনি পাথবে। টুকবো পেলেন।

২৫শে মার্চে ডাযমণ্ডহাববাবেব অধিবাসীগণ লবণ প্রস্তুত কবে আইনভঙ্গেব জন্য তৈবি হন। ইতিমধ্যে দুজন স্ত্রীলোকসহ সতেব জন গ্রামবাসী ডাযমণ্ডহাববাবে গ্রেপ্তাব হন। তাবা নির্ভযে বলেন যে, মুক্তি লাভেব পবেও তাবা লবণ তৈবি কববেন।

ইতিমধ্যে আন্দোলনেব নেতৃত্ব নিযে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ও সুভাষচন্দ্র বসুব উপদলেব মধ্যে বিবোধ উপস্থিত হয। অবশেষে উভয দল সতীশ দাশগুপ্তকে লবণ আন্দোলনেৰ সভাপতিরূপে পেতে আগ্রহী হন। আবাব সতীশবাবু জানান যে, উভয দল যদি ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ কবতে অনিচ্ছুক হন তবে তিনি দাযিত্বে থাকবেন না। মহাত্মা গান্ধী সতীশবাবু ও তাঁব এই প্রস্তাবকে সমর্থন কবেন। তিনি তাঁব নিকট প্রেবিত প্রতিনিধিকে আবও বলেন যে, এই বিবোধ যেন বাসন্তীদেবীব মাধ্যমে মিটিযে ফেলা হয। বাংলাব প্রতি সর্বদাই তাঁব আশীর্বাদ থাকবে।[৩]

বিপিনবিহাবী গাঙ্গুলী ছিলেন চব্বিশ পবগণা কংগ্রেস কমিটিব সভাপতি এবং প্রফুল্লনাথ ব্যানার্জী ছিলেন চব্বিশ পবগণা সত্যাগ্রহ কমিটিব সভাপতি। চব্বিশ পবগণা কংগ্রেস কমিটি লবণ আইন ভঙ্গেব জন্য (১) দমদম থেকে পাঁচ মাইল দূবে মহিষবাথান ও (২) ডাযমণ্ড হাববাবেব নিকটবর্তী 'নীল' (হুগলী পযেন্ট) অঞ্চল নির্বাচন কবেন।

সত্যাগ্রহ কমিটিতে ছিলেন: (১) প্রফুল্লনাথ ব্যানার্জী—সভাপতি, (২) সত্যনারাযণ চ্যাটার্জী—সম্পাদক, (৩) কালীচবণ সেন, (৪) ক্ষিতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত, (৫) হরিপদ মুখার্জী, (৬) অশ্বিনীকুমার দে সরকাব, (৭) নরেন্দ্রনাথ সরকার, (৮) অনিলকুমাব সরকাব, (৯) লক্ষীকান্ত প্রামাণিক।

এদের ওপব আবও তিনজন সদস্যকে Co-opt করাব দায়িত্ব দেওয়া হয়।[৪]

চব্বিশ পরগণায় চার দলে আন্দোলন

প্রথম দল

৪ঠা এপ্রিল নৈহাটী কাঁঠালপাড়াব বঙ্কিম ভবন থেকে সত্যাগ্রহীবা মহিষবাথান অভিমুখে যাত্রা কববে। ৫ই এপ্রিল গোববডাঙ্গায এসে হাবড়াব মধ্য দিযে যাবে। ৬ই এপ্রিল চাতডা ও বামচন্দ্রপুব হযে ৭ই এপ্রিল বাদুড়িযাতে এবং ৮ই এপ্রিল বসিবহাটে আসবে। শেষে বাজাবহাটেব মধ্য দিযে ১১ই এপ্রিল মহিষবাথানে পৌঁছুবে।

দ্বিতীয় দল

৫ই এপ্রিল বড়িষা থেকে বিকেল ৬টাব সময যাত্রা শুরু কববে। বেহালা, মহেশতলা, বজবজ, বাংকবা, অক্ষমানিক, কোদালিযা, চম্পাহাটি, চন্দনগড, ভাঙগোবা, কুলালবেড়িযা হযে ১২ই এপ্রিল মহিষবাথানে পৌঁছবে।

তৃতীয় দল

ডাযমণ্ডহাববাব থেকে বওনা হযে নীল-এ পৌঁছবে।

চতুর্থ দল

আড়িযাদহ থেকে বওনা হযে ৬ই এপ্রিল মহিষবাথানে পৌঁছুবে।

প্রত্যেক দলে কমপক্ষে পঁচিশ জন স্বেচ্ছাসেবক থাকবে।[৫]

লবণ আইন ভঙ্গ

৩বা এপ্রিল গান্ধীজী জানান: "Swaraj is in my pocket and I could advise (Boycott should be done in all respect)"

৬ই এপ্রিল গান্ধীজী ডাণ্ডীতে লবণ আইনভঙ্গ করেন। ঐদিনই মহিষবাথানের নারকেলতলা চকে সতীশ দাশগুপ্তের নেতৃত্বে সোদপুরেব চৌত্রিশ জন সত্যাগ্রহী সকাল ৮টা ২৪ মিনিটে বেআইনী লবণ তৈবি করে লবণ আইন ভঙ্গ কবেন। দুঘন্টাব চেষ্টায তাবা এই লবণ তৈরি কবেন। সাংবাদিকদের এই লবণ দেখান হয।

দুটি উপাযে সত্যাগ্রহীরা লবণ প্রস্তুত করে। (১) পাত্রে হ্রদের জল ফুটিয়ে, (২) কাদা জল পাত্রেব মধ্যে বেখে পরিশোধন পদ্ধতির মাধ্যমে।

"হ্রদের পাড়ে ক্যাম্পে তিন ফুট উঁচু ও বারো ফুট ব্যাস বিশিষ্ট একটি মাটির ফিল্টার রাখা হয়। সত্যাগ্রহীরা হলদেটে কাদামাটি এই ফিল্টারে ঢালছিলেন।"[৬]

"অনেক আগ্রহ নিযে অপেক্ষা, তিতিক্ষা ও উত্তেজনার পর ক্যাম্পের অভ্যন্তর থেকে সোল্লাসে বেআইনী লবণ নিয়ে বেরিয়ে এলেন একজন সত্যাগ্রহী। এই

সেই লবণ যা তৈরি করার জন্য গান্ধীজী দেশবাসীকে আহ্বান করেন। উপস্থিত সকলে দেখল বাংলায় কিভাবে সর্বপ্রথম লবণ আইন ভঙ্গ হলো।"[৭]

সাধারণ জনতাকে লবণ উৎপাদন স্থলে যেতে দেওয়া হয়নি। তারা লক গেটের কাছে অপেক্ষা করে। চব্বিশ পরগণার জেলাশাসক, দু'জন এস.ডি.ও. এবং অন্যান্য পুলিশ কনস্টেবল ও চৌকিদারসহ ঘটনাস্থলে যান।

এদিন কলকাতা থেকে শ্রী ও শ্রীমতী অখিলচন্দ্র দত্ত, শ্রীমতী মোহিনী দেবী ও তার কন্যা, শ্রীমতী সতীশ দাশগুপ্ত ও তার কন্যা, শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ এখানে লবণ আইন ভঙ্গ পর্যবেক্ষণে আসেন।[৮]

ঐদিনই নর্থ সুবারবান বরানগর ও আঁড়িয়াদহ সত্যাগ্রহ কমিটির পঞ্চাশ জন সত্যাগ্রহী খগেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী ও ব্যোমকেশ চ্যাটার্জীর নেতৃত্বে সকাল ৬টা ৩০ মিনিটে মহিষবাথানের উদ্দেশ্যে রওনা হয। মিছিলটি শঙ্খধ্বনি ও উলুধ্বনির মধ্য দিযে সৎচাষী পাড়া, সিঁথি, ঘুঘুডাঙ্গা, দমদম হযে কেষ্টপুর আসে। সৎচাষী পাডায় বেণীমাধব চ্যাটার্জীর বাড়িব সম্মুখে তাদের মাল্যভূষিত করা হয। পথিমধ্যে আরও পঁচিশজন পদযাত্রী ও সাইকেল যাত্রী সত্যাগ্রহী তাদেব সাথে মিলিত হন। বেলা ৮টা ২৪ মিনিটে মিছিলটি কেষ্টপুরে আসে। এখানে স্বল্পকালীন প্রার্থনা ও খগেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জীর পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে জাতীয সপ্তাহ পালন করা হয়। মতিলাল চ্যাটার্জী স্বেচ্ছাসেবকদের কাছে ভাষণ দেন। সত্যাগ্রহীরা জাতীয় পতাকায় অভিবাদন করে আবাব চলতে থাকেন। তারা দ্বিতীয দল হিসাবে সকাল ১০টায় মহিষবাথানে লবণ তৈরিব কেন্দ্রস্থলে পৌঁছান। বেলা ১২টায খগেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী, ব্যোমকেশ চ্যাটার্জী, খগেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, গিরিজাভূষণ মিত্র, কানাইলাল দাস এবং অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবকবা লবণ তৈরি করেন।[৯]

৬ই এপ্রিল সুভাষচন্দ্র বসু মান্দালয জেলে বন্দী ছিলেন। এই সময় তার স্বাস্থ্য ভাল ছিল না।

বরানগর স্বেচ্ছাসেবকদের তৈরি প্রথম এক ছটাক লবণ বন্দেমাতরম ধ্বনির মধ্যে দশ টাকায় বিক্রয় হয়। ৬ই এপ্রিলের তৈরি লবণ কলকাতায় বিনামূল্যে বিতরণ হয়। বর্ধমান কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা ৬ই এপ্রিল পদব্রজে বর্ধমান থেকে সোদপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হন এবং তথায় ১৩ই এপ্রিল পৌঁছবেন।[১০]

৭ই এপ্রিল লক্ষ্মীকান্ত বাবু ও রায়চাঁদ দুগার গ্রেপ্তার হন। সতীশ দাশগুপ্ত সত্যাগ্রহীদের লবণ তৈরির কাজ পরিচালনা করতে থাকেন।

৯ই এপ্রিল শ্রী ও শ্রীমতী যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত মহিষবাথানে আসেন। সতীশ দাশগুপ্তের সাথে লবণ তৈরির বিষয়ে আলোচনা হয়।[১১]

কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, কলকাতায় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের নেতৃত্বে প্রকাশ্যে মহিষবাথানের লবণ বিক্রি করা হবে। মহিষবাথানে তৈরি আধমন কনট্রাব্যাণ্ড লবণ কলেজ ষ্ট্রীটে নিয়ে আসা হয়। প্রতি প্যাকেটে চার ছটাক লবণ এক পয়সা হিসাবে হ্যারিসন রোড ও কলেজ স্ট্রীটের সংযোগস্থলে, এবং কলেজ স্কোয়ারে বিক্রি করা হয়। এই লবণ যথারীতি স্বল্প সময়ে নিঃশেষ হয়ে যায়।[১২]

১২ই এপ্রিল খগেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী, দেবীপ্রসাদ ভাদুড়ী এবং বড়বাজারে দুই মাড়োয়ারী খাংগড়াপট্টীতে গ্রেপ্তার হন। বরানগর, কাশীপুর, আলমবাজার, টালা ও দমদমে হরতাল পালিত হয়।

১৩ই এপ্রিল যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ও চারজন ছাত্রকে কলকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার মিঃ গর্ডন হেদুয়াতে জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগীর 'দেশের ডাক' পুস্তিকা পাঠ করার জন্য গ্রেপ্তার করেন।[১৩]

১৮ই এপ্রিল বরানগর, আড়িয়াদহ, বড়বাজারে কংগ্রেস কর্মীরা লবণ আইন ভঙ্গ করেন। পুলিশ খুবই অত্যাচার করে। প্রভুদয়াল হিম্মৎসিংহিকা, সুধীর বোস, বসন্তলাল মুরারকা প্রভৃতির সামনেই এই অত্যাচার হয়।

২৩শে এপ্রিলও মহিষবাথানে লবণ তৈরি পূর্ণ উদ্যমে চলতে থাকে। ঐদিন যুগোলকিশোর বরাট সবচেয়ে বেশি অত্যাচারিত হলেন।

২৫শে এপ্রিল লক্ষ্মীকান্তবাবু বিচারালয়ে আত্মপক্ষ সমর্থনে অস্বীকার করেন। তার নিজের ভাষায়:

"সত্যাগ্রহী হিসাবে বিচারালয়ের কাজে অংশগ্রহণ করতে চাই না, চব্বিশ পরগণার অন্যান্য সত্যাগ্রহীদের সাথে নির্জন সেলে ছিলাম। অত্যন্ত খারাপ খাবার দেওয়া হয়। যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ও সুভাষচন্দ্র বসু আমাদের ওপর অত্যাচারের প্রতিবাদ করেন। আমাদের সাধারণ কয়েদীদের থাকার স্থানে রাখা হয়।"[১৮]

২৫শে এপ্রিলই রায় বের হবার সম্ভাবনা ছিল।

বিভিন্ন স্থানে মহিষবাথানের লবণ

কলকাতা

উত্তর কলকাতায় হেমন্ত বসুর নেতৃত্ব লবণ সত্যাগ্রহের একটি কেন্দ্র ছিল। দক্ষিণ কলকাতায় বীরেন্দ্র শাসমলের নেতৃত্বে ছিল আর একটি কেন্দ্র। শরৎ বসু- সুভাষচন্দ্র বসুর বাড়ি, জে.সি.গুপ্তের বাড়ি, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের বাড়ি, প্রতাপচন্দ্র গুহরায়ের বাড়ি, সরস্বতী প্রেস, আনন্দবাজার পত্রিকা প্রভৃতি স্থানে বিভিন্ন কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবক রাখা হত। খাদিমণ্ডল, অভয় আশ্রম, খাদি প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি স্থানেও এক একটি কেন্দ্র ছিল। কলেজ স্ট্রীটে বুক কোম্পানীর পাশের

বাড়ীতে 'আইন অমান্য পবিষদ' নামে একটি সবকাবি কেন্দ্র প্রতিষ্টিত হয়। এব দাযিত্বে ছিলেন সেনগুপ্ত গোষ্ঠী। এই গোষ্ঠীতে ছিলেন সতীশ দাশগুপ্ত, প্রফুল্ল সেন, প্রফুল্ল ঘোষ প্রভৃতি। অপব গোষ্ঠীব নেতা ছিলেন আপোষহীন সংগ্রামী সুভাষচন্দ্র বসু। তবে উভয গোষ্ঠীই সক্রিযভাবে আইন অমান্য আন্দোলনে কাজ কবেন।

দলে দলে গ্রাম শহবেব ছেলেমেযেবা আইন অমান্য পবিষদ থেকে বেআইনী লবণ কিনে তাদেব অঞ্চলে আইন অমন্য কবত। সবোজ মুখার্জী ও বিনয চৌধুবী বর্ধমানেব নেতৃত্বে ছিলেন। তাবা এখান থেকে বর্ধমানে লবণ নিযে গিযেছেন।[১৫] বর্ধমানেব ডিবেকটব ছিলেন যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা।

রাজসাহী

"সোদপুব থেকে আগত স্বেচ্ছাসেবক ফণিভূষণ সেনগুপ্ত এবং অপব এক স্বেচ্ছাসেবক শবৎচন্দ্র দাস ১৩ই এপ্রিল, ১৯৩০ এ মহিষবথানেব বেআইনী লবণ পঞ্চাশ টাকাব মত বিক্রয কবেন।"[১৬]

মালদা

"১৩ই এপ্রিল, ১৯৩০-এ মহিষবাথানে তৈবি নিষিদ্ধ লবণ প্রতি পাঁচ তোলা চাব আনা হিসাবে বিক্রয হয। এই লবণ কেনাব জন্য স্থানীয জনগণেব মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ ছিল।"[১৭]

ঢাকা

"১৪ই এপ্রিল, ১৯৩০-এ স্থানীয কবোনেসন পার্কে স্থানীয সাপ্তাহিক 'বাংলাব বাণী' পত্রিকাব সম্পাদক নলিনীকিশোব গুহ ও ঢাকা জেলা কংগ্রেস সম্পাদক মহিষবাথানেব দেড সেব লবণ পঞ্চাশ টাকায বিক্রয কবেন।

এ ছাড়া স্থানীয গাণ্ডাবিযাব ব্রাহ্মমোহন ঘোষ নাবকেল পাতা থেকে বেআইনী লবণ প্রস্তুত কবে আঠাশ টাকায বিক্রয কবেন।

সিরাজগঞ্জেও মহিষবাথানের লবণ বিক্রয হয।"[১৮]

এইভাবে দেখা যায় অখ্যাত মহিষবাথান কলকাতা ও বাংলা কেন্দ্রিক লবণ আন্দোলনে এক বিরাট অনুঘটকরূপে কাজ করে। অখ্যাত এই গ্রামটি তিরিশের দশকে মানুষেব মুখে মুখে উচ্চারিত হতো। কিন্তু পরে কয়েক দশকেব মধ্যে বিস্মৃতির গহ্বরে আচ্ছাদিত হয়। জেগে উঠল এরই আঙিনা ধবে কলকাতা সংলগ্ন নতুন নগর প্রকল্প— লবণ হ্রদ! বিধাননগর! সল্টলেক সিটি!

সূত্র নির্দেশ

১. **Liberty**, 8 March, 1930, p.7
২. ঐ 8 March, 1930, p.9
৩. ঐ 27 March 1930, p.7
৪. ঐ 28 March, 1930, p.5
৫. ঐ 2 April, 1930, p.5
৬. The **Pioneer**, 9 April, 1930, p.1
৭. ঐ ঐ p.1
৮. **The Mussalman**, 8 April, 1930, p. 5
৯. **Liberty**, 6 April, 1930, p.7
১০. **The Mussalman**, 9 April, 1930, p.5
১১. ঐ ঐ p 5
১২. **Liberty**, 9 April, 1930, p.7
১৩. **Liberty**, 13 April, 1930,
১৪. **Liberty**, 25 April, 1930,
১৫. সরোজ মুখোপাধ্যায়, **ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা**, ১ম খণ্ড, কলিকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, ১৯৮৫, পৃ. ৩১ পৃঃ
১৬. **The Mussalman**, 13 April, 1930, p.6
১৭. ঐ ঐ p.6
১৮. ঐ 15 April, 1930
১৯. বসন্ত কুমার মণ্ডল, **অগ্নিগর্ভ মহিষবাথান**, মহিষবাথান, স্বর্ণময়ী, ১৯৮৭
২০. ভূপেশকুমার প্রামাণিক, **লবণহ্রদের উপকথা**, কলিকাতা।

বাংলায় ভারত ছাড়ো আন্দোলন—ফিরে দেখা

কমলা সরকার

৪২-এর আন্দোলন বা "ভারত ছাড়ো আন্দোলনে"র ডাক দিয়েছিলেন স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী— যে গান্ধী বিশ্বযুদ্ধকালীন ভারতবর্ষে যে কোন ধরনের বৃহৎ গণআন্দোলন গড়ে তুলে ইংরেজ সরকারকে অসুবিধাজনক অবস্থায় আনার সবরকম প্রস্তাব দীর্ঘদিন ধরে প্রত্যাখ্যান করে চলছিলেন। সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে গান্ধীর সংঘাত মূলত গড়ে উঠেছিল দেশব্যাপী ব্রিটিশ বিরোধী গণআন্দোলন গড়ে তোলার সময়ক্ষণ নিয়েই। ত্রিপুরী কংগ্রেস ও তার ঘটনা পরম্পরায় কংগ্রেস থেকে সুভাষ বসুর বহিষ্কার কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ডের বিরুদ্ধে বাংলার প্রতিরোধ অনেকখানিই পর্যুদস্ত করেছিল নিঃসন্দেহে। কিন্তু অন্য দিকে বসু ও তাঁর ফরওয়ার্ড ব্লক কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ডকে অগ্রাহ্য করে দেশব্যাপী আন্দোলন গড়ে তোলার খানিকটা স্বাধীন ক্ষেত্র পেয়ে গিয়েছিলেন। ১৯৩৯-এর জুলাই-এ ফরওয়ার্ড ব্লক কংগ্রেসের মধ্যে থেকেও একটা পৃথক গোষ্ঠী রূপে অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির কিছু ঘোষিত নীতির বিরুদ্ধে সর্বভারতীয় আন্দোলন শুরু করে। "ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির পলিটব্যুরো"ও ঐ বছরের অক্টোবরে দেশের স্বাধীনতা লাভের জন্য বিশ্বযুদ্ধজনিত পরিস্থিতির সুযোগ নেবার প্রস্তাব নেয়। তবে একটা ক্ষেত্রে ফরওয়ার্ড ব্লক ও কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যে মতভিন্নতা ছিল। কম্যুনিস্টরা কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে আন্দোলনের পথে এগোতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁদের কৌশল ছিল কংগ্রেসকেই ক্রমশ গণঅভ্যুত্থানে সামিল করা। কম্যুনিস্ট সমর্থনের ওপর নির্ভরশীল বসুকে এইজন্যই সে সময় আইন অমান্য আন্দোলনের চিন্তা ছাড়তে হয়। ঘটনা পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৩৯-এর নভেম্বরে গান্ধী, কংগ্রেসশাসিত রাজ্যগুলিতে মন্ত্রিসভার পদত্যাগের নির্দেশ দেন। এই পদক্ষেপ ছিল অত্যন্ত সুচিন্তিত। এর ফলে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে কোন সক্রিয় ভূমিকা না নিয়েও কংগ্রেস দেশের বামপন্থী দলগুলির মনোভাবকে খানিকটা সংযত রাখতে পেরেছিল। কিন্তু ঘটনাস্রোত দ্রুত পাল্টে যাচ্ছিল। ১৯৪০-এর মার্চের কংগ্রেস অধিবেশনে আর.এস.পি.-র আত্মপ্রকাশ এবং মানবেন্দ্রনাথ রায়ের Radical Democratic— উদ্ভবে গান্ধী দেশের বামপন্থী শক্তির প্রতিক্রিয়া বিষয়ে চিন্তিত হচ্ছিলেন।

অন্যদিকে ১৯৪০-এর প্রথমে কলকাতা কর্পোরেশনের প্রশাসনে বসুপন্থী কংগ্রেসের সঙ্গে লীগের, বিশেষত সিদ্দিকি ও ইস্পাহানির সমঝোতা এবং বাংলার

মন্ত্রিসভা নিয়ে ফজলুল হকের মন্ত্রিত্বে বসুপন্থী কংগ্রেস ও অসাম্প্রদায়িক মুসলমানদের মধ্যে একটা চুক্তির সম্ভাবনা জিন্নাকে শঙ্কিত করে তুলেছিল এবং ১৯৪০-এর মার্চে লাহোর লীগ অধিবেশনে জিন্না "পাকিস্তান প্রস্তাব" উত্থাপন করিয়ে মুসলিম লীগের প্রতি সাধারণ মুসলমানের আনুগত্য টেনে রাখতে চেয়েছিলেন। "পাকিস্তান প্রস্তাবে" কংগ্রেস বিশেষ গুরুত্ব না দিলেও তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল হিন্দু মহাসভা এবং তাৎক্ষণিক পরিস্থিতিতে কংগ্রেসের দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাব হিন্দু মহাসভাকে দ্রুত বিপুল জনপ্রিয়তার দিকে নিয়ে যাচ্ছিল।

গান্ধী বুঝতে পারছিলেন কংগ্রেসকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য কিছু একটা করা দরকার। কিন্তু দেশের বাস্তব পরিস্থিতি বিষযে তাঁর বোধ ছিল পরিণত। তিনি জানতেন "আপৎকালীন সদ্ব্যবহার" বা Policy of non-embarrassment"-ই কংগ্রেসের রক্ষাকবচ। যুদ্ধের সময় কংগ্রেসের অন্য যে কোন নীতি ব্রিটিশ সরকারকে উন্মত্ত করে তুলবে। গান্ধী বুঝেছিলেন ইংরেজ সরকারের অসুবিধাকে স্বাধীনতা লাভের অনুকূলে নিতে হলে প্রযোজন ভারতে সশস্ত্র গণঅভ্যুত্থান। সে চিন্তা গান্ধী করেননি—সেটা বাস্তবানুগত ছিল না। অন্য দিকে অহিংসা সত্যাগ্রহ নিযে ইংবেজের সঙ্গে সংঘর্ষে গেলে সেটা আত্মহননেরই পথ হবে বলে গান্ধী বুঝেছিলেন।

সব দিক ভেবেই ১৯৪০-এর শেষে গান্ধী "ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ" অনুমোদন করলেন। এই আন্দোলনে ছটা সতর্কতা ছিল। সত্যাগ্রহীরা ছিলেন বিশেষভাবে গান্ধী-নিবার্চিত যাঁরা শুধুমাত্র যুদ্ধবিরোধী ধ্বনি তুলে বিনা প্রতিরোধ গ্রেপ্তার বরণ করবেন। এতে অন্তত খানিকটা যুদ্ধ বিরোধী মনোভাব দেখিয়ে বামপন্থীদের ঠেকান গেল। অন্য দিকে ফরওয়ার্ড ব্লক ও অন্যান্য উগ্র বামপন্থীদের সহযোগিতা প্রত্যাখ্যান করে গান্ধী এই আন্দোলনকে অত্যন্ত সীমিত, সঙ্কীর্ণ ও নিয়ন্ত্রণাধীন রাখলেন। জনবিচ্ছিন্ন ও নির্বিরোধ এই একক আন্দোলন কংগ্রেসকর্মীদেরও হতাশাগ্রস্ত করে তুলছিল, কারাবন্দীরা নিজেদের প্রতারিত ভাবছিলেন এবং সর্বোপরি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মুখোমুখী হবার শক্তি কংগ্রেসের আছে কিনা— এ সন্দেহ জাগছিল। সম্ভবত গান্ধী বুঝছিলেন জনতার প্রতীক্ষা অবনিত প্রায়।

১৯৪২-এর ৮ই আগষ্ট কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি গান্ধীর "ইংরেজ ভারত ছাড়ো" প্রস্তাব অনুমোদন করে। এই প্রস্তাবে সুস্পষ্ট ভাষায় দেশের স্বার্থে ও নাৎসী আগ্রাসন অবসানের স্বার্থে ব্রিটিশ শক্তিকে অবিলম্বে ভারত ছাড়তে বলা হয়। জানান হয় ব্রিটিশ শাসনমুক্ত স্বাধীন ভারতবর্ষ তার স্বাধীন মতামত নিয়ে ইউনাইটেড নেশনের শান্তি প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করবে এবং বিশ্বের নিপীড়িত জনসাধারণের আন্দোলনে সার্বিক অংশ নেবে। এই প্রস্তাবে জনসাধারণকে উদ্দীপ্ত করে "গান্ধীর নেতৃত্বে" একত্র থেকে "অহিংস" পথে আন্দোলন চালাতে আহ্বান

জানান হয়। গণ আন্দোলনের সূচনা মুহূর্তে "ভারত ছাড়ো" প্রস্তাব জানিয়ে যায় যে নির্দেশ পাঠানোর সুযোগ আর যদি না আসে ভারতের প্রতিটি আন্দোলনকারী মানুষ যেন এই প্রস্তাবের মধ্য থেকেই তার নিজের কার্যসূচী বেছে নেন এবং স্বাধীনতা লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যান।

৪২-এর ৯ই আগষ্টের প্রত্যুষে আন্দোলনের সূচনা করার আগেই অধিকাংশ কংগ্রেস নেতাই গ্রেপ্তার হন। সরকারী রিপোর্টে দেখা যায় ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেসের প্রতিটি পদক্ষেপ বিষয়েই গোপনে ওয়াকিবহাল ছিলেন এবং তাদের প্রস্তুতি ছিল দীর্ঘকালীন।

বাংলা ৪২-এব আন্দোলনকে গ্রহণ কবেছিল বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিনের সঞ্চিত ক্ষোভ ও অসন্তোষ প্রকাশ কবার মাধ্যম পেয়ে গান্ধী আদর্শের প্রতি আনুগত্যের জন্য নয। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে একক ভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ হযেও কংগ্রেস দল বাংলায বিরোধী পক্ষের ভূমিকা নিতে বাধ্য হযেছিল কেন্দ্রীয নেতৃত্বের অদূরদর্শী অনুশাসনে— যাব ফলশ্রুতি ছিল বাংলার রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িক মুসলীম লীগের অনুপ্রবেশ। তখন থেকেই গান্ধী নেতৃত্বের সঙ্গে বাংলার মানসিক ব্যবধান। বাংলার দীর্ঘদিনের বিপ্লবী ইতিহাস আগষ্ট আন্দোলনের প্রকৃতিকে প্রভাবিত করেছিল। বাংলায ৪২-এর আন্দোলনে ইতিহাস গড়েছিল যে মেদিনীপুর জেলা, যেখানে গণ-অভ্যুত্থানের সূচনা হযেছিল ২৯শে সেপ্টেম্বর "ভারত ছাড়ো" প্রস্তাব গৃহীত হবার ৫০ দিন পরে মহিষাদল থেকে ধান ও অন্যান্য খাদ্যশস্য অন্যত্র পাঠানোর প্রতিবাদে।

"বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কংগ্রেস কমিটি"র বাংলার আন্দোলনের বিস্তৃতির প্রতিবেদনে জনসাধারণের ক্ষোভের অগ্নুৎপাতই দেখা যায়। বিদেশী শাসনের যে কোন প্রতীককে আন্দোলনকারীরা আঘাত করেছেন। তাঁরা গান্ধীর অহিংস সত্যাগ্রহের আগষ্ট প্রস্তাব থেকে সরে গিয়ে নিজেদের ভূমিকা নিজেরাই স্থির করেছিলেন। মেদিনীপুরের থানা দখলের কাহিনী আজ বহু পরিচিত। বহু নিরস্ত্র সত্যাগ্রহীর সঙ্গে ৭৫ বছরের বৃদ্ধা মাতঙ্গিনী হাজরা ও ১৫ বছরের কিশোর লক্ষ্মীনারায়ণ দাস ও পুরী মাধব প্রামাণিকের মৃত্যু হয়েছিল পুলিশের গুলিতে কিন্তু তার পরে মেদিনীপুর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। মেদিনীপুর-কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করেছিল "তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার" যা ইংরেজ সরকারের দমননীতির মধ্যে স্বাধীনভাবে কাজ চালিয়ে গেছে ১৯৪৪ সালের ৮ই আগষ্ট পর্যন্ত। এদের বিদ্যুৎসেনা, ভগিনী বাহিনী— এসবের মধ্যে অহিংস আদর্শ ছিল না— ছিল আসন্ন রণপ্রস্তুতি। বিপ্লবী নেতারা আশা করছিলেন অতি শীঘ্রই সুভাষ বসুর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজ সমুদ্রপথে মেদিনীপুর পৌঁছে যাবে এবং সমগ্র মেদিনীপুর তাঁর সঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রামে

যোগ দেবে। শেষ পর্যন্ত গান্ধীর আবেদনে সাড়া দিয়ে মেদিনীপুর কংগ্রেস জাতীয় সরকার অবলুপ্ত করে।

"ভাবত ছাড়ো" আন্দোলনের সময়ক্ষণ নির্ণয়ে সংশয় আসে। এশিয়াতে জাপানের ক্রম-আগ্রাসনের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের তাৎক্ষণিক স্বাধীনতার যে দাবি যুদ্ধকালীন পবিস্থিতিতে ব্রিটিশ সরকার কোনমতেই মেনে নেবে না সেই দাবি নিযে গান্ধী কেন গণ-আন্দোলনে সামিল হলেন তা বিতর্কের বিষয়, সমকালীন অকংগ্রেসী নেতারা একে নির্বুদ্ধিতা বলেছেন। কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ডেও এর বিরোধিতা ছিল। সম্ভাব্য জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে মিলিত প্রতিরোধের চেযে গৃহযুদ্ধকে শ্রেয মনে করে ব্রিটিশ সরকারকে গান্ধীর চরমপত্র দেওয়ার মধ্যেও বাস্তববিমুখতা ছিল।

"ভারত ছাড়ো" আন্দোলনের আকস্মিকতা বাংলাব রাজনীতিকে খানিকটা বিপর্যস্ত করেছিল। ১৯৪০-এর স্তিমিত ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ ও কংগ্রেস মন্ত্রীসভার অনুপস্থিতির সুযোগ নিযে জিন্না অসাম্প্রদাযিক কৃষক নেতা ফজলুল হককে বাংলাব রাজনীতি থেকে অপসৃত করার জন্য সক্রিয হয়ে ওঠেন। ১৯৪১-এর ডিসেম্বরে নাজিমুদ্দিনের "মুসলিম লীগ" মন্ত্রীসভাকে সরিযে শরৎ বসু-শ্যামাপ্রসাদ ও ফজলুল হকের "প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশন" বাংলার রাজনীতিকে সাম্প্রদাযিকতার গ্রাস থেকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা সবে মাত্র শুরু করেছিল ব্রিটিশ সরকারের প্রতিকূলতাকে অগ্রাহ্য করে মাত্র কযেক মাসের মধ্যে। ৪২-এর আকস্মিক আগষ্ট আন্দোলন ফজলুল হককে বিপন্ন কবে তুলল। সেই সঙ্গে গান্ধী নেতৃত্বের নির্দেশে বাংলা কংগ্রেসের বা গান্ধী-অনুগামী গোষ্ঠী আইনসভা ছেড়ে চলে যাওযায হক দুর্বল হযে পড়েন। আগষ্ট আন্দোলনকে কঠোরভাবে দমন করার জন্য লীগ ও ব্রিটিশ সরকার ফজলুল হকের ওপর চাপ সৃষ্টি করে এবং অবশেষে ১৯৪৩-এ বাংলার দুর্ভিক্ষের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলার গভর্ণর স্যার জন হারবার্ট ফজলুল হককে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেন।

ফজলুল হকের প্রস্থান ও কংগ্রেসী নেতাদের দীর্ঘ রাজনৈতিক অনুপস্থিতিতে বাংলা মুসলিম লীগের অবাধ প্রচারক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগ ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টিকে সম্পূর্ণ ভাবে বিধ্বস্ত করে। বাংলায় হিন্দু-মুসলমানের বিভাজন সম্পূর্ণ হয়।

৪২-এর আন্দোলন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রধান প্রতিরোধ ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টিকেও বিপর্যস্ত করে। ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনাতে শ্রমজীবি মানুষদের সঙ্গে নিয়ে ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে "সামাজিক বিপ্লব" গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখছিল। ১৯৪১ সালে জার্মানী রাশিয়া আক্রমণ করার সঙ্গে সঙ্গে কম্যুনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের নির্দেশে ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি

ফ্যাসিস্ট বিরোধী যুদ্ধকে 'Peoples' war' বা জনযুদ্ধ বলে স্বীকৃতি দেয় এবং ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সর্বক্ষেত্রে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সাময়িক এই সহযোগিতা ভারতীয় কম্যুনিস্টদের কাছে হয়ে উঠেছিল নিজের বিবেকের সঙ্গে সংঘাত, নিজের অস্তিত্বের সংকট। ব্রিটিশ সরকার সে কথা জানতেন, তাঁদের গোপন ফাইলে তাঁরা তাঁদের যুদ্ধে সহযোগী ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টিকে সে সময় কংগ্রেসের চেয়ে অনেক বেশি উগ্র ব্রিটিশ বিরোধী পার্টি বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু স্বভূমিব তাৎক্ষণিক ঘটনাস্রোত ৪২-এর আন্দোলনে প্রকাশ্যে সামিল না হয়ে তাঁর জনসমর্থন হারিয়েছেন। ১৯৪৩-এ কারামুক্ত কংগ্রেসী নেতারা সহজেই ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টিকে ব্রিটিশের দালাল বলে প্রচার চালাতে পেরেছেন। বাস্তবে এর চেয়ে বড় মিথ্যা আর কিছু ছিল না।

৪২-এর আন্দোলন এ ভাবে পুঁজিবাদের সবচেয়ে বড় বাধাকে দুর্বল করে দিয়েছিল তীর্যকভাবে— যা প্রকট হয়ে উঠেছিল ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে।

৪২-এর আন্দোলন তাহলে কি বাংলায় গড়েনি কিছুই? "ভারত ছাড়ো"র উন্মাদনায় বাংলায় নতুন করে ফিরিয়ে এনেছিল কংগ্রেস। ১৯৩৭ সাল থেকে বাংলার বিচিত্র পটভূমিকায় যে কংগ্রেস পার্টি অক্ষম বিরোধীর ভূমিকায় দুর্বল ও হতমান হয়ে পড়েছিল, বিশ্বযুদ্ধ শেষে দীর্ঘকাল কারা অন্তরালে থেকে কংগ্রেস নেতারা নতুন করে তার ভাবমূর্তি গড়তে পেরেছিলেন। ৪২-এর আগষ্টে নেতাহীন জনগণের "স্বতস্ফূর্ত আন্দোলনে"র গতিপ্রকৃতি ব্রিটিশশাসকদের নতুন করে ভাবিয়েছিল। জন-সমর্থনের নিরিখে কংগ্রেসের দাবী তখনই স্থির হয়ে গিয়েছিল। এছাড়া কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে গণ অভ্যুত্থানের আশঙ্কা—৪২-এর আন্দোলনের মধ্যেও যা প্রচ্ছন্ন ছিল— তার সফল প্রতিরোধ হতে পারত একমাত্র গান্ধী-কংগ্রেস। কংগ্রেস নেতারা কারারুদ্ধ হবার পরে বাংলার গভর্ণর ক্যেথি অন্য কোন মন্ত্রীসভা গড়তে দেননি। যুদ্ধশেষ হওয়া মাত্র ব্রিটিশ কম্যুনিস্টদের বর্জন করেছে, হিন্দু মহাসভা ও কৃষক প্রজাপার্টির দাবি অগ্রাহ্য করেছে। ১৯৪৬-এর প্রকাশ্য সাধারণ নির্বাচনের অনেক আগেই কংগ্রেস ছিল ব্রিটিশ ঐতিহ্যের অঘোষিত উত্তরাধিকারী।

ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ভাবমূর্তির জন্যই ১৯৪৫ থেকে ১৯৪৬ সালের মধ্যে কম্যুনিস্ট সংগঠিত শ্রমিক ও ছাত্র আন্দোলনগুলির ব্রিটিশ বিরোধিতা এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচারের বিরুদ্ধে উত্তাল জনমত কংগ্রেসেরই জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করে—যে কংগ্রেস এই আন্দোলনকে অনুমোদন করেনি।

"ভারত ছাড়ো" আন্দোলন ভারতের তাৎক্ষণিক স্বাধীনতা আনতে পারে নি। কিন্তু ভারতকে স্বাধীনতার পথে অনেকটা এগিয়ে দিয়েছিল। আর উত্তাল

জনসমর্থন নিয়ে ফিরে এসেছিল কংগ্রেস। ১৯৪৬-এর সাধারণ নির্বাচনে বাংলায় কংগ্রেসের নিরঙ্কুশ প্রাধান্যের পেছনে ছিল ৪২-এর আগষ্ট বিপ্লব।

সূত্র নির্দেশ

১. সুভাষচন্দ্র বসু—ক্রস রোডস
২. গভর্ণমেন্ট ফাইল সংখ্যা ৪।৮।৪১, ৩২।১৪।৪১, ৩।৫০।৪১, ২২০।৪২, ৩।২৩।৪৫, ৩।৮৭।৪৩, ৫।২২।৪৬
৩. ম্যানসার্গ এন সম্পাদিত, ট্রান্সফার অফ পাওয়ার, ভল্যুম-২, প্রাসঙ্গিক চিঠিপত্র।
৪. সতীশ সামন্ত, আগষ্ট রেভোলুশন অ্যাণ্ড টু ইয়ারস ন্যাশনাল গভর্ণমেন্ট ইন মিদনাপুর
৫. অমৃতবাজার পত্রিকা।

কলকাতা মহানগরী ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ১৯৪২ সালের ভারত ছাড়ো আন্দোলনে ছাত্র এবং যুবকদের ভূমিকা

কল্লোল বন্দ্যোপাধ্যায়

"শঙ্খধ্বনি। এত শঙ্খ বাজে কেন? চারিদিক তোলপাড় করে তুলেছে।.... শবযাত্রা চলেছে।.... আজকাল রোজই প্রায় যাচ্ছে এইরকম দুটো একটা দল। রাস্তার দুপাশে একটা প্রাণীও বোধহয় ঘরের ভেতরে নেই। বউ মেয়েরা উলু দিচ্ছে, খই আর ফুল ছড়াচ্ছে, মায়েরা চোখ মুছ্ছেন আর শঙ্খ বাজাচ্ছেন। মৃত্যু নিয়ে মহোৎসব পড়ে গেছে। এমৃত্যু প্রলুব্ধ করে তোলে। যাদের বয়স কম আর রক্ত চঞ্চল, ঘরে পড়ে থাকা দায় হয়ে পড়েছে তাদের পক্ষে।"

(মনোজ বসু, 'আগস্ট ১৯৪২')

'যাদের বয়স কম আর রক্ত চঞ্চল'—কলকাতার সেই ছাত্রসমাজ ১৯৪২-এর 'মৃত্যু নিয়ে মহোৎসবে' ঋত্বিকের ভূমিকা পালন করেছিল। আগস্টের অগ্নিরথকে তারাই কলকাতার রাজপথে নিয়ে আসেন এবং দীর্ঘদিন তা মহানগরী প্রদক্ষিণ করে।

ভারত ছাড়ো আন্দোলনে কলকাতা তথা বাংলাদেশের ছাত্রসমাজকে নেতৃত্ব দিয়েছিল ১৮, মির্জাপুর স্ট্রীটের বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন (B.P.S.F.)। রেভেলিউশনারি সোস্যালিষ্ট পার্টি, কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টি, ফরওয়ার্ড ব্লক, রেভেলিউশনারি কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া, বলশেভিক-লেলিনিষ্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া—ইত্যাদি রাজনৈতিক দলের ছাত্রকর্মীরা এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।[১]

৯ই আগষ্ট প্রভাতী সংবাদপত্রে মহাত্মা গান্ধীসহ জাতীয় নেতাদের গ্রেপ্তারের খবর বের হবার পর স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাশ থেকে ছাত্রছাত্রীরা বের হয়ে মিছিল করে বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। বিকেলে শ্রদ্ধানন্দ পার্কের সভায় ছাত্রনেতারা অগ্নিবর্ষী ভাষায় বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ জানায়। কিছু পরেই পুলিশ এসে সভা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে নির্বিচারে লাঠি চালায় এবং ছাত্রকর্মীদের গ্রেপ্তার করে।[২]

১৩ই আগষ্ট কলকাতার প্রায় সমস্ত স্কুল কলেজের ছাত্ররা ধর্মঘট করে; বিরাট ছাত্রমিছিল বের হয়। প্রধান সভাস্থল ওয়েলিংটন স্কোয়ার পার্কের মধ্যে

ও চারপাশে শ্যামবাজার, যাদবপুর, বালীগঞ্জ, ভবানীপুর, খিদিরপুর এমনকি হাওড়া ও দূববর্তী অঞ্চলগুলো থেকে পতাকা সজ্জিত মিছিলগুলো আসতে থাকে। পুলিশ বেপরোয়া লাঠি চার্জ করে ও গুলি ছুঁড়ে সমাবেশ ভেঙে দেয়।

বেলা দুটো থেকে প্রায় চারটে পর্যন্ত পুলিশের এই পাশবিক অত্যাচার অব্যাহত থাকে। বহু ছাত্র গুরুতর আহত হয়। ইতিমধ্যে সরকারী শাসননীতির সংবাদ শহরেব সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রায় সমস্ত দোকানপাট ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়।

১৪ই আগস্ট কলকাতার ছাত্রদের নেতৃত্বে গণ আন্দোলন ব্যাপক রূপ নেয এবং সরকাবী রুদ্রনীতিও তীব্রতর হয। বৃটিশ সৈন্য ও পুলিশ সার্জেন্টরা শহরের বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে বিডন ষ্ট্রীট ও সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ-এর সংযোগস্থল, আপার সার্কুলার রোড, নিমতলা ঘাটের কাছে, মেছুয়া বাজারে এবং ভবানীপুরে বিক্ষোভকারীদের ওপর গুলিবর্ষণ করে এবং এব ফলে ছযজন নিহত হয় ও তেত্রিশজন আহত হয।

কর্নওযালিশ ষ্ট্রীটে দুপুর দুটো থেকে পুলিশ গুলি চালাতে শুরু করে। সেইসময সিটি কলেজের বি.এ. চতুর্থ বর্ষের ছাত্র দিলীপকুমার ঘোষ বোনের বিয়ের জন্য বাজার করতে বেরিয়েছিল---কর্নওযালিশ ষ্ট্রীটে গুলিচালনা শুরু হলে সে তাডাতাডি ভুবন সরকার লেনে ঢুকে পডে। একজন সার্জেন্ট তাকে তাডা করে তার বুকে গুলি করে। তৎক্ষণাৎ তাব মৃত্যু হয়। তার পিতা, পুত্রের মৃত্যুসংবাদ শুনে সেখানে এসে পুত্রেব মৃতদেহ জডিয়ে ধরে যখন বিলাপ করছিলেন, তখন একটি সৈন্য বোঝাই লরি এসে নির্বিচারে গুলি চালালে তিনিও গুলিবিদ্ধ হন। দিলীপকুমার ঘোষ হলেন আগষ্ট আন্দোলনে কলকাতার ছাত্রদের মধ্যে প্রথম শহীদ।

১৫ই আগষ্ট থেকে বেশ কয়েকদিন কলকাতা মহানগরী যুদ্ধক্ষেত্রের চেহারা নিয়েছিল। চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, কর্নওয়ালিশ ষ্ট্রীট এবং শহরের অন্যত্র অসংখ্যবার গুলি চালানো হয়। ১৫ই আগষ্ট থেকে শহরের বিভিন্ন রাস্তায় সৈন্যবাহিনী টহল দেয়। পরদিন থেকে সেনাবাহিনীর সাজোয়া গাড়ি সকাল সন্ধ্যা শহরে টহল দেয়।

রক্তক্ষয়ী রাস্তায় লড়াইতে প্রধান শক্তি ছিল ছাত্র সমাজ। ১৮ই আগষ্ট সরকারী রিপোর্টেও মন্তব্য করা হয়েছে এখনও পর্যন্ত এই 'গান্ধীযুদ্ধ'তে ছাত্ররা এবং কিছু ভিখারী ও ইতর ছেলেরাই অংশ গ্রহণ করছে। সম্ভবত ২১শে আগষ্ট সংবাদপত্রগুলো যুদ্ধ ঘোষণা করাবার পর (অর্থাৎ প্রস্তাবিত সংবাদ পত্র ধর্মঘট) প্রকৃত কংগ্রেস শক্তি আন্দোলনে নামবে।

কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ভাবতছাড়ো আন্দোলনের দুটো উৎসমুখ—প্রকাশ্য ও গোপন। প্রকাশ্য আন্দোলনেও দুটো ধাবা—একদিকে বিক্ষোভ প্রদর্শন ও মিছিল সংঘটিত করা এবং অন্যদিকে রাস্তায় ব্যারিকেড তৈবি করে পুলিশ-মিলিটারিব সঙ্গে সম্মুখ লড়াই। গোপন আন্দোলনের ক্ষেত্রে অন্তর্ঘাতমূলক কাজেব মাধ্যমে প্রশাসনযন্ত্রের ক্ষতিসাধনের চেষ্টা হয। আন্দোলনের সমস্ত স্তবেই ছাত্র ও যুবকরাই দধীচির ভূমিকা পালন করেছে। ১৯৪২ সালেব ৮, ৯ এবং ১০ই সেপ্টেম্বর স্কটিশ চার্চ স্কুল ও কলেজ, রিপন কলেজ, আশুতোষ কলেজ, প্রেসিডেন্সী কলেজ, বিদ্যাসাগর কলেজ, সিটি কলেজ, সেন্ট পলস্ কলেজ, সাযেন্স কলেজ ইত্যাদি কলেজেব ছাত্রদের জঙ্গী মনোভাব সরকারী বিপোর্টে বাববার উল্লেখ করা হযেছে— যাবা কলেজে এসেও ক্লাশ না করে কংগ্রেসেব পতাকা তুলতে ব্যস্ত থাকে, কলেজ চত্বব থেকে পুলিশ সার্জেন্টদেব দিকে পাথব ছোঁড়ে এবং পুলিশেব অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার কলেজে ঢুকলেও তাবা ক্রমাগত শ্লোগান দিতে থাকে।

১১ই সেপ্টেম্বব কলকাতা বিশ্ববিদ্যালযেব আশুতোষ বিল্ডিং এব ছাদে "ন্যাশনাল ফোর্ট, বেঙ্গল' লেখা একটি ব্যানাবসহ ত্রিবর্ণ বঞ্জিত পতাকা ছাত্ররা উড়িযে দেয।

কলকাতার পার্শ্ববর্তী জেলা হাওড়াতেও ছাত্ররাই আন্দোলনেব মশাল বহন করে আনে। ১১ই আগষ্ট বালি, বাঁটরা ও হাওড়া শহরেব সমস্ত স্কুলেব ছাত্ররা রাস্তায মিছিল বের করে এবং পুলিশী জুলুম চলবে না ইত্যাদি শ্লোগান দেয। বিভিন্ন ছাত্রসভাতে আন্দোলনের কর্মসূচী গৃহীত হয়। হাওড়া শহর ছাড়াও উলুবেড়িয়া, আমতা, বাগনান, পাঁচলা, বালি, বেলুড়, শিবপুর ইত্যাদি অঞ্চলের ছাত্ররাও ক্লাস বযকট করে। ১৫ই আগষ্ট শত শত ছাত্র ও যুবকরা ট্রামবাসের ওপর আক্রমণ চলায়।

হাওড়ার আন্দোলনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল ছাত্র ও শিল্প শ্রমিকদের যৌথ উদ্যোগে আন্দোলনের কর্মসূচী গ্রহণ। ১৭ ও ১৮ই আগষ্ট ছাত্রদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বিভিন্ন কারখানার শ্রমিকরা কাজ বনধ করে দেয় এবং ছাত্রদের বিক্ষোভ মিছিলে অংশগ্রহণ করে। ১১ই সেপ্টেম্বর বেলিলিয়াস ইনষ্টিটিউশনের ছাত্ররা স্থানীয যে সমস্ত লোহার কারখানাগুলোতে সরকারের অর্ডার অনুসারে কাজ হচ্ছে—সেই কারখানাগুলোর কাজ বন্ধ রাখবার সফল উদ্যোগ নেয়।

মাসের পর মাস ধরে কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় ছাত্রসমাজ তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্লাস না করে ভারত ছাড়ো আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছে—এমনকি ১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চ-মাসেও হাজার হাজার ছাত্রদের মিছিল-মিটিং-এর সংবাদ সরকারি রিপোর্টেই পাওয়া যায়।

প্রকাশ্য আন্দোলন কেবলমাত্র ক্লাস বয়কট, ধর্মঘট, মিছিল আর সভাসমিতির অহিংস চত্বরেই আবদ্ধ থাকেনি; হিংসা আর প্রতিহিংসার রক্তক্ষরণের দিনগুলোতে ছাত্রদের নেতৃত্বে কলকাতার সংগ্রামী মানুষ রাস্তায় ব্যারিকেড তৈরি করে বৃটিশ বুলেটের মুখোমুখি হয়েছে। অসংখ্য লেটারবক্স, ইলেকট্রিক ফিউজ বক্স, ফায়ার অ্যালার্ম বক্স, ল্যাম্পপোস্ট ইত্যাদি ভেঙে ফেলে, ইলেকট্রিকের তার ও টেলিফোনের তার কেটে এবং বড় বড় পাথর, জলের পাইপ, ডাস্টবিন, ঠেলাগাড়ী ইত্যাদি দিয়ে রাস্তায় ব্যারিকেড তৈরি করা হয় এবং এর আড়াল থেকে পুলিশ ও মিলিটারির সঙ্গে ছাত্রদের নেতৃত্বে জনতা দীর্ঘদিন ধরে খন্ডযুদ্ধ চালায়। ব্যারিকেডের লড়াইতে ছাত্ররা পেয়েছিল গরীব খেটে খাওয়া মানুষদের। উত্তর কলকাতার শ্রীমানী বাজারের দোকানদারেরা রাস্তায় লড়াইতে ছাত্রদের পাশে দাঁড়িয়ে অংশগ্রহণ করত। তারা কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের দুপাশের বাড়িগুলোর ছাদ ও বারান্দা থেকে আগুয়ান পুলিশ বাহিনীর দিকে সোডার বোতল ও ইঁট ছুঁড়তো।

১৩ থেকে ১৬ই আগষ্ট কলকাতার দুর্বার গণ আন্দোলনের পর সরকারী দমননীতি তীব্রতর হলে এবং সামরিক বাহিনী রাস্তায় রাস্তায় টহল দেওয়া শুরু করলে প্রকাশ্যে বিক্ষোভ মিছিল অপেক্ষাকৃত হ্রাস পায়, অন্যদিকে গুপ্ত অন্তর্ঘাতমূলক কাজ যথা ট্রামে অ্যাসিড ছোড়া, অ্যাসিড দিয়ে লেটারবক্স নষ্ট করা, রাস্তায় বোমা ছোঁড়া, সিনেমা হলে অগ্নিসংযোগ ও মিলিটারিদের প্রতি অ্যাসিড ছোড়ার ঘটনা দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং এক্ষেত্রেও ছাত্র ও যুবকরাই প্রধান ভূমিকা নেয়। ২৯শে আগষ্ট বিদ্যাসাগর কলেজের ল্যাবরেটরি থেকে প্রচুর পরিমাণে অ্যাসিড চুরি করা হয় এবং পুলিশ অফিসারদের লক্ষ্য করে অ্যাসিড বোমা ছুঁড়ে মারবার একটি পরিকল্পনা পুলিশ জানতে পারে। ২৬শে সেপ্টেম্বর মেট্রো ও লাইট হাউস সিনেমাহলে বোমা ছোঁড়া হয়। ১৪ই ডিসেম্বর আট-দশজন বাঙালি যুবক বিডন স্ট্রীটের পোস্টঅফিসে বোমা ফাটিয়ে ডাকাতি করে।[৯]

কলকাতার ভারত ছাড়ো আন্দোলনে ছাত্রীসমাজও সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। মির্জাপুর স্ট্রীটের ছাত্র ফেডারেশনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অল বেঙ্গল গার্লস স্টুডেন্টস্ সাব কমিটি—যার প্রেসিডেন্ট ছিলেন নির্মলা রায় এবং জেনারেল সেক্রেটারি ছিলেন বনলতা সেন; আগষ্ট আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। ছাত্র ফেডারেশনের মিছিলে ছাত্রীরাও অংশগ্রহণ করতো— সরকারী রিপোর্টে বহুবার যার উল্লেখ আছে। এছাড়া বৃটিশ গোয়েন্দা তৎপরতাকে এড়িয়ে বিভিন্ন এলাকার বিপ্লবীদের হাতে লিফলেটের বান্ডিল এমনকি পিস্তল পৌঁছে দেবার দুরূহ দায়িত্বও ছাত্রীরাই পালন করতো। বনলতা সেন, নির্মলা রায়, সুষমা রায়, হেলেনা দত্ত, ছায়া গুহ, আভা মজুমদার এবং আরো অনেক ছাত্রীরা কলকাতার আন্দোলনে অংশগ্রহণের অপরাধে কারাবরণ করেছিলেন।[১০]

ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির অনুগামী ভবানী দত্ত লেনের বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন আগষ্ট আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেনি। ১৯৪২ সালের ১৬ই আগষ্ট অল ইন্ডিয়া ষ্টুডেন্টস্ ফেডাবেশনেব পক্ষ থেকে কলকাতায প্রচারিত একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জাতীয নেতাদের মুক্তিদান এবং কবিনেমেব সঙ্গে সবকাবকে আলোচনায বসার জন্য দাবি তোলার সাথে সাথেই ছাত্রদের উদ্দেশ্যে আহ্বান জানানো হয যে তারা যেন প্ররোচনাব ফাঁদে পা না দেন—কারণ হিংসা জাতিকে আত্মহত্যার পথেই নিযে যাবে।[১১]

অবশ্য কমিউনিস্ট ছাত্র এমন অনেকেই ছিলেন— কলকাতার আগষ্ট আন্দোলন যাদের অন্তরে উত্তাপ জাগিয়েছিল—শুধুমাত্র কমিউনিস্ট পার্টির নিষেধাজ্ঞা থাকায় তাবা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে পাবেনি। তদানীন্তন কমিউনিস্ট ছাত্রনেতা কমল চ্যাটার্জ্জী জানিযেছেন—'কলকাতায আগষ্ট আন্দোলনের চেহারা দেখে আমি অভিভূত। হাজাব হাজাব ছেলে পথে নেমেছে। প্রেসিডেন্সী কলেজের সামনে ছাত্রদের উপর লাঠিচার্জ হলো— ছেলেদেব মাথা থেকে রক্ত ঝরছে। আমাদের কথা ছেলেরা শুনছে না। আমরা আটকাতে পাবলাম না। পার্টি লাইন দেশপ্রেমের তোড়ে ভেসে গেল। এত ছেলেকে পথে নামতে আগে কখনো দেখিনি। ছাত্র ফেডারেশনের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ আমি, নাহলে আমিও আগষ্ট আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পডতাম।'[১২]

আন্দোলনের কর্মসূচী নিযে আন্দোলনপন্থী ছাত্রদের সঙ্গে কমিউনিস্ট ছাত্রদের বিতর্ক, আন্দোলন শুরু হবার সময় থেকেই বিভিন্ন কলেজে দেখা দিয়েছিল। বিভিন্ন কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মির্জাপুর ষ্ট্রীটের ছাত্র ফেডারেশনের উদ্যোগে ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হতো—যেখানে জনযুদ্ধপন্থী রাজনীতির তীব্র সমালোচনা করা হয়। ভবানীদত্ত লেনের ছাত্র ফেডারেশনের সদস্যরাও সেই সভাগুলোতে উপস্থিত থাকতেন—বাদ প্রতিবাদের মধ্যে দিয়ে সভা উত্তপ্ত হয়ে উঠতো—অনেক সময় দুপক্ষে সংঘর্ষও ঘটতো।[১৩] যেমন ১৯৪৩ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারি প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির ওয়ার্কিং কমিটি এবং ওয়ার কাউন্সিল অফ স্টুডেন্টদের যৌথ আহ্বানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে একটি সভা আহূত হয়—ছাত্র তথা সাধারণ মানুষদের পরবর্তী আন্দোলনের কর্মসূচি স্থির করবার জন্য। সভা শুরু হবার পূর্বমুহূর্তে কমিউনিস্ট গোষ্ঠী ও কংগ্রেস গোষ্ঠীর মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়—সবশেষে হাতাহাতির মধ্যে দিয়ে সভা ভেঙে যায় এবং কোন প্রস্তাব গৃহীত হতে পারে না।[১৪]

কমিউনিস্ট পার্টির উত্তর কলকাতা শাখা সম্পাদক অমিয় মুখার্জী, উত্তর কলকাতার টাউন স্কুলের গেটে ছাত্রদের ঠেকাতে গিয়ে প্রহৃত হয়েছিলেন।[১৫]

আপ্রাণ চেষ্টা করেও কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টি এবং তার অনুগামী ছাত্র ফেডারেশন, কলকাতা তথা বাংলার ছাত্র সমাজকে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের অগ্নিকুন্ড থেকে সরিয়ে আনতে পারলো না। ১৯৪৩ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির তৃতীয় বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের প্রতিনিধিদের কাছে পেশ করা তার প্রতিবেদনে ভবানী সেন স্বীকার করেছেন যে, ছাত্রদের আগুনের মুখ থেকে রক্ষা করা গেল না। তারা ঝাঁপ দিল।[১৬]

অগ্নিকুণ্ড স্পর্শ না করেই যারা আগুনের গান গাইত, সেই ছাত্রদের সঙ্গে অগ্নিকুন্ড অতিক্রমকারী ছাত্রদের মতাদর্শগত সংঘাত পরবর্তী বছরগুলোতেও ছিল। ভবানী দত্ত লেনের ছাত্র ফেডারেশন কর্মী নৃপেন ব্যানার্জ্জী জানিয়েছেন—'আগস্ট আন্দোলন ঝিমিয়ে এলো। কিন্তু স্কুলে স্কুলে, কলেজে কলেজে কমিউনিস্ট ছাত্রদের কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হলো। আমরা যখন গঠনমূলক আন্দোলনের চেষ্টা করছি, তখন আর.এস.পি, ফরওয়ার্ড ব্লকের ছাত্ররা চেষ্টা করছে ছাত্রদের মধ্যে বিয়াল্লিশের স্পিরিটকে জিইয়ে রাখার। কংগ্রেস নেতাদের মুক্তির দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয় লনে ছাত্রসভা। ১৯৪৪ সালের ৯ই আগস্ট। সেই সভাতে নাটকীয়ভাবে হাজির তথাকথিত আন্ডারগ্রাউন্ড থেকে সি.এস.পি-র অবনীশ্বর মিশ্র ওরফে কমরেড গুপ্ত। সে বললো আগের বক্তার মনোভাবের সঙ্গে আমি একমত। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কোন পথে সেই মুক্তি। তাঁরা চাইছেন ভিক্ষে করে মুক্তি আর আমরা চাইছি জেল ভেঙে মুক্তি আদায় করতে।

ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে আমরা ছাত্র কনভেনশন ডেকেছি ছাত্রদের আশু দাবীর ওপরে। কাগজ চাই— বই চাই—খাতা চাই। বক্তৃতা চলছে। এমন সময় তড়াক করে লাফ দিয়ে একজন ডায়াসে উঠে দাঁড়াল। চাই-চাই-চাই, চাইতো অনেককিছু। কিন্তু দিচ্ছে কে? চাইতে গেলে লড়তে হয় এবং সেটা এখানে নয়, সেটা রাস্তায়।'[১৭]

ছাত্ররা ছাড়া কলকাতার বিভিন্ন ক্লাবে এবং ব্যায়াম সমিতির যুবকরাও আগস্ট আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন। দক্ষিণ কলকাতার আন্দোলনের ক্ষেত্রে মুদিয়ালী রোড বা লেকটেম্পল রোডের কালচার ক্লাব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ১৯৪২ সালের আগে থেকেই এখানকার কিছু বাছাই করা ছেলেকে ঢাকুরিয়া লেকের দক্ষিণদিকের জঙ্গলে, আসন্ন বৃটিশ বিরোধী কংগ্রেসের জন্য অস্ত্রশিক্ষা দেওয়া হতো। আগস্ট আন্দোলন শুরু হলে কালচার ক্লাবের অরুণ দত্ত ও পৃথ্বীশ চন্দ্র— যারা আশুতোষ কলেজের ছাত্র ছিলেন—তারা মির্জাপুর স্ট্রীটের ছাত্র ফেডারেশনের সঙ্গে সংযোগ রেখে দক্ষিণ কলকাতার বিভিন্ন স্কুল কলেজের ছাত্রদের সংঘবদ্ধ করে একটি অ্যাকশন কমিটি গঠন করেন—যারা স্কুল কলেজে ধর্মঘট করা, রাস্তা অবরোধ করা এবং পরবর্তীকালে ট্রামে অগ্নিসংযোগ

ইত্যাদি কর্মকাণ্ডে অংশ নেয। কালচাব ক্লাবেব অজিত সেন—বথীন সেনবা বেললাইন তুলে ফেলবাব দাযিত্বে ছিলেন। এজন্য প্রায ছফুট লম্বা বিভিন্ন শাবল, বেললাইনেব বল্টু খোলবাব জন্য ডগবেঞ্চ, চেনবেঞ্চ, পেট্রল ইত্যাদি বেললাইন তোলবাব যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হতো—যেগুলো বেলেব গ্যাংম্যানদেব কাছ থেকে সংগ্রহ কবা হতো এবং অনেক সময তাবা এক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ সাহায্য কবতো। বালীগঞ্জ, কালীঘাট, জযনগব ইত্যাদি বেলস্টেশনে তাবা আক্রমণ চালায এবং বিভিন্ন স্থানে ফিসপ্লেট তোলে। এছাডা বালীগঞ্জ ট্রামডিপো, কালীঘাট ট্রামডিপো এবং দক্ষিণ কলকাতাব বাস্তাব বিভিন্ন ট্রামেব তাবে অগ্নিসংযোগ কবে।[১১]

উত্তব কলকাতাব সিমলা ব্যাযাম সমিতি (সংগঠক অমব বসু - ফবওযার্ড ব্লক), বাজবল্লভ পাডা ব্যাযাম সমিতি (সংগঠক হেমন্তকুমাব বসু — ফবওযার্ড ব্লক), কলেজ স্কোযাব সংলগ্ন একটি ক্লাব (সংগঠক ববেন দাঁ - আব.এস.পি.), বাগবাজাবে Poor Brother's Club (সংগঠক জগমোহন বসু — কংগ্রেস) বাগবাজাবেব বোসপাডা অঞ্চলেব তকণ ব্যাযাম সমিতি (সংগঠক জিতেন পাল—ফবওযার্ড ব্লক এবং অজিত চ্যাটার্জী আব.এস.পি.), দেশবন্ধু পার্ক সংলগ্ন একটি ক্লাব (সংগঠক মিহিব গাঙ্গুলী) ইত্যাদি ক্লাব ও ব্যাযাম সমিতিব যুবকবা নিজ নিজ এলাকাব আগস্ট আন্দোলনে সক্রিয অংশগ্রহণ কবেছিলেন এবং নেতৃস্থানীয সদস্যবা কাবাববণ কবেছিলেন।[১২]

এইভাবে বৃটিশসিংহেব বিরুদ্ধে খালিহাতে লডাই কবেছিল কলকাতাব ছাত্র ও যুবকবা। যুদ্ধে তাবা জযেব মালা পেল না। কিন্তু প্রাণেব আহুতিতে, বক্তেব অক্ষবে তাবা সেদিনেব বক্তসন্ধ্যায, মৃত্যুহীন বিদ্রোহবহ্নিব শপথ বাক্য লিখে গিযেছিল।

সূত্র নির্দেশ

১. শ্রীমতী সুষমা বায (চক্রবর্তী), শ্রীমতী নির্মলা বায (সান্যাল) শ্রী রূপক গুহ, শ্রী বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য এবং শ্রী শচীন সেন-এব সঙ্গে সাক্ষাৎকাব
নির্মলা বাযচৌধুবী 'যুগসন্ধির স্মৃতি', লেখক সমবায সমিতি, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ. ৬৮
রূপক গুহ 'আগষ্ট বিপ্লব ও ছাত্র সমাজ: একটি স্মৃতি' গণবার্তা পত্রিকা, আগষ্ট বিপ্লব বিশেষ সংখ্যা, ১২ আগষ্ট ১৯৮৯

২. শ্রী মধুসূদন চক্রবর্তী সঙ্গে সাক্ষাৎকাব।
মধুসূদন চক্রবর্তী, '৪২ স্বাধীনতার শেষ সংগ্রাম' আনন্দবাজাব পত্রিকা ৫ আগষ্ট, ১৯৯২

৩. গোকুলেশ্বর ভট্টাচার্য, স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম, দ্বিতীয় খণ্ড। সুপ্রকাশ রায়, ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস। তারিণীশঙ্কর চক্রবর্তী, আগষ্ট বিপ্লব (১৯৪২) বাংলা ও আসাম, প্রথম খণ্ড।
মাসিক বসুমতী পত্রিকা, শ্রাবণ ১৩৪৯, ২১ বর্ষ
কুমুদ দাশগুপ্ত 'আগষ্ট বিপ্লবে অবিভক্ত বাংলার গৌরবময় ভূমিকা', শারদীয়া গণবার্তা, ১৩৯৯
শ্রী পূর্ণেন্দু সেনগুপ্ত, শ্রী প্রভাত বসু, ডঃ শিশিরকুমার বসু এবং শ্রীমতী সুষমা রায় (চক্রবর্তী)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

৪. গোকুলেশ্বর ভট্টাচার্য—স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম, দ্বিতীয় খণ্ড
তারিণীশঙ্কর চক্রবর্তী—আগষ্ট বিপ্লব (১৯৪২) বাংলা ও আসাম, প্রথম খণ্ড।
সুপ্রকাশ রায়, ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস
মাসিক বসুমতি পত্রিকা, শ্রাবণ, ১৩৪৯, ২১ বর্ষ
Satyen Sengupta **'1942 Revolution in Bengal'**, Amrita Bazar Partika, Special Number, 15 August 1947

৫. District Officer's Chronicle of events of disturbances, Calcutta

৬. ঐ

৭. District Officer's Chronicle of events of disturbances, Howrah

৮. শ্রীমতী সুষমা রায় (চক্রবর্তী)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকার
District Officer's Chronicle of events of disturbances, Calcutta

৯. ঐ

১০. District Officer's Chronicle of events of disturbances, Calcutta
শ্রীমতী সুষমা রায় (চক্রবর্তী) এবং শ্রীমতী নির্মলা রায় (সান্যাল)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

১১. **The Modern Review**, September 1942

১২. অমলেন্দু সেনগুপ্ত **'উত্তাল চল্লিশ অসমাপ্ত বিপ্লব'**, পার্ল পাবলিশার্স, কলকাতা ১৯৯০ পৃ. ১০

১৩. শ্রী বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য ও শ্রী শচীন সেন-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকার।
রূপক গুহ, 'আগষ্ট বিপ্লব ও কলকাতার ছাত্রসমাজ: একটি স্মৃতি', গণবার্তা পত্রিকা ১২ আগষ্ট ১৯৮৯

১৪. District Officer's Chronicle of events of disturbances, Calcutta

১৫. অমলেন্দু সেনগুপ্ত, **'উত্তাল চল্লিশ, অসমাপ্ত বিপ্লব'** পৃ. ২০

১৬. ঐ, পৃ. ৯–১১

১৭. ঐ, পৃ. ৩৩

১৮. কালচার ক্লাব-এর সদস্য শ্রী মনোরঞ্জন ব্যানার্জীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

১৯. শ্রী বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য এবং শ্রী শচীন সেন-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

আর সি পি আই এবং 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন

অমিতাভ চন্দ্র

মুখবন্ধ ও সূত্রপাত

'কমিউনিস্ট লীগ থেকে আর সি পি আই: সমান্তরাল কমিউনিস্ট সংগঠনের বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়' শিরোনামযুক্ত পূর্ববর্তী একটি প্রবন্ধে বর্তমান প্রবন্ধ লেখক কর্তৃক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দুই পর্যায়ে এই যুদ্ধ সম্পর্কিত রেভলিউশনারী কমিউনিস্ট পার্টি অভ্ ইণ্ডিয়া (সংক্ষেপে আর সি পি আই) নামক সমান্তরাল কমিউনিস্ট সংগঠনটির দৃষ্টিভঙ্গী ও নিজস্ব বিশ্লেষণ এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উভয় পর্যায়ে এই দলের ভূমিকা ও ক্রিয়াকলাপ বিস্তারিতভাবে আলোচিত ও বিশ্লেষিত হয়েছে।[১] পূর্ববর্তী এই প্রবন্ধে উক্ত আলোচনার অংশ হিসাবে ঐতিহাসিক 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন সম্পর্কিত আর সি পি আই নামক সমান্তরাল কমিউনিস্ট সংগঠনটির দৃষ্টিভঙ্গী এবং ঐ আন্দোলনে এই দলের ভূমিকা অতি সংক্ষেপে ছুঁয়ে যাওয়া হয়েছে। 'আর সি পি আই এবং "ভারত ছাড়ো" আন্দোলন' শীর্ষক বর্তমান প্রবন্ধে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন সম্পর্কিত আর সি পি আই-এর দৃষ্টিভঙ্গী ও বিশ্লেষণ এবং ঐ আন্দোলনে আর সি পি আই-এর ভূমিকা ও ক্রিয়াকলাপ আলোচিত ও বিশ্লেষিত হয়েছে। 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী এবং এই আন্দোলনের বিরোধিতায় অবতীর্ণ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং এই আন্দোলনকালীন তাদের ভূমিকা সম্পর্কিত আর সি পি আই-এর দৃষ্টিভঙ্গী ও মূল্যায়নের আলোচনা এবং বিশ্লেষণও বর্তমান প্রবন্ধের পরিধিভুক্ত হয়েছে।

আর সি পি আই এবং 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন সম্পর্কিত মূল আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন সম্পর্কে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের অনুবর্তী মূল কমিউনিস্ট সংগঠন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির (সি পি আই) দৃষ্টিভঙ্গী এবং কমিউনিস্ট পার্টির তরফে এই আন্দোলনের বিরোধিতা সম্পর্কে একটি অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যেতে পারে। 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনকালীন সি পি আই এবং আর সি পি আই-এর ভূমিকার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণের প্রয়োজনেই এটি করা দরকার।

'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন এবং কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা

ক্রিপস্ মিশনের ব্যর্থতা কংগ্রেসকে নিয়ে গেল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে চরম ও চূড়ান্ত মোকাবিলার পথে। ১৯৪২ সালের ৮ অগস্ট বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত এক গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশনে অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি (এ আই সি সি) গ্রহণ করল ঐতিহাসিক 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব। 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব গ্রহণেব প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নেমে এল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের আঘাত। পরের দিন ৯ অগস্ট ১৯৪২ ভোরের মধ্যেই গান্ধী, নেহ্রু, আজাদ, প্যাটেল প্রমুখ জাতীয় নেতাদের গ্রেফ্তাব করা হল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণের নাগপাশে আবদ্ধ ভারতবাসী এই সংবাদ জানার সঙ্গে সঙ্গেই ফেটে পড়ল উত্তাল বিক্ষোভে, শুরু হল সাম্রাজ্যবাদী শৃঙ্খল থেকে মুক্তির আগ্রহে স্বতঃস্ফূর্ত ও ব্যাপকতম এক দেশজোড়া গণ আন্দোলন, যা ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হযে আছে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন বা অগস্ট আন্দোলন বা বিয়াল্লিশের আন্দোলন নামে। প্রায আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষই যোগ দিয়েছিল স্বাধীনতার জন্য এই মরণপণ সংগ্রামে। আক্ষরিক অর্থেই হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত বিস্তৃত ভাবতবর্ষের প্রায় সবকটি প্রদেশেই ছড়িয়ে পড়েছিল এই বিদ্রোহের আগুন। ব্যাপকতায়, বিস্তারে, গভীরতায ও তীব্রতায় বিয়াল্লিশের এই সংগ্রাম অতিক্রম করে গিয়েছিল পূর্ববর্তী সব আন্দেলনকেই, এমনকি ১৮৫৭ সালের সেই মহাবিদ্রোহকেও। এর স্বীকৃতি মেলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্তম্ভরূপ শাসকবর্গের গোপন চিঠিপত্রে-দলিলে। ১৯৪২ সালের ৩১ অগস্ট ভারতের তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড লিনলিথগো এক গোপন টেলিগ্রামে ব্রিটিশ্ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিলকে জানিয়েছিলেন যে, এই আন্দোলন ছিল ১৮৫৭-এর মহাবিদ্রোহের পর সবচেয়ে 'সিরিয়াস রিদ্রোহ', 'সামরিক নিরাপত্তার স্বার্থে যে কথা এতদিন দুনিয়ার সামনে প্রকাশ করা হয়নি': 'I am engaged here in meeting by far the most serious rebellion since that of 1857, the gravity and the extent of which we have so far concealed from the world for reasons of military security.'[২] চরম নিপীড়ন-নির্যাতন-সন্ত্রাস চালিয়ে একমাত্র রক্তবন্যায় ভাসিয়ে দিয়েই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ শেষ পর্যন্ত দমন করতে সমর্থ হয়েছিল এই 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন।

১৯৩৯ সালের ৩ সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের অনুবর্তী ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (সি পি আই) তার সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের ঐতিহ্য ও সুদৃঢ় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী অবস্থান থেকেই তীব্র ফ্যাসিবিরোধী ও নাৎসিবিরোধী মনোভাব সত্ত্বেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে 'দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ' হিসাবে অভিহিত করে সর্বতোভাবে ব্রিটিশ

সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধপ্রচেষ্টার বিরোধিতার পথ গ্রহণ করেছিল, স্লোগান্ তুলেছিল—'এই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে একটি পয়সাও নয়, একজন ভাইও নয ("না এক পাই, না এক ভাই")', এই যুদ্ধের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী প্রচার অভিযানও শুরু করেছিল, 'সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ'-এর পরিস্থিতিতে যুদ্ধের সংকটকে পরিপূর্ণ ব্যবহার করে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গণ সংগ্রামেব মাধ্যমে ভারতেব স্বাধীনতা অর্জনের ডাকও দিয়েছিল, আহ্বান জানিয়েছিল 'সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ'-এর পরিস্থিতিতে জাতীয় স্বাধীনতা লাভের জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদেব বিরুদ্ধে চরম ও চূড়ান্ত আঘাত হানার। যুদ্ধবিরোধী প্রচার-অভিযান সংগঠিত করা এবং যুদ্ধকালীন সময়ে স্বাধীনতা সংগ্রাম চালানোর চেষ্টার অভিযোগে বেআইনী কমিউনিস্ট পার্টির উপব নেমে এসেছিল চরম সাম্রাজ্যবাদী সন্ত্রাস, সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ নিষ্পেষণেব শিকার হযেছিলেন কমিউনিস্টরা।

১৯৪১ সালেব ২২ জুন নাৎসি জার্মানি সোভিযেত ইউনিযন আক্রমণ করল। আক্রান্ত সোভিযেত ইউনিযন বাধ্য হযে মিত্রশক্তিব পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করল। আক্রান্ত সোভিযেত ইউনিযন মিত্রশক্তির পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করায় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকেব অনুগামী পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলির চোখে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চরিত্রে একটি মৌলিক পরিবর্তন ঘটে গেল। এই যুদ্ধ তাদের চোখে আর 'সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ' বইল না, এই যুদ্ধ তাদের কাছে পরিবর্তিত হল 'ফ্যাসিবাদবিরোধী জনযুদ্ধ' এ। সোভিয়েত ইউনিযন নাৎসি জার্মানি কর্তৃক আক্রান্ত হযে যুদ্ধে যোগদানের সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের অনুগামী ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি তার লাইন ও যুদ্ধ সম্পর্কিত অবস্থান পাল্টায় নি। এই যুদ্ধ তাদের চোখে 'দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ'-ই রয়ে গেল, এবং কমিউনিস্ট পার্টিও তার যুদ্ধবিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী কাজকর্ম অব্যাহত রেখেছিল। কিন্তু পার্টির মধ্যে বিতর্কও শুরু হয়ে গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত সব আন্তঃ-পার্টি বিতর্কের- অবসান ঘটিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রান্ত হওয়ার প্রায় ছয় মাস পর ১৯৪১ সালের ১৫ ডিসেম্বর কমিউনিস্ট পার্টি তার যুদ্ধ সম্পর্কিত অবস্থান পরিবর্তিত করে এই যুদ্ধকে 'ফ্যাসিবাদবিরোধী জনযুদ্ধ' বলে ঘোষণা করল ·এবং ফ্যাসিবাদ ও নাৎসিবাদের পরাজয় সুনিশ্চিত করতে এই 'জনযুদ্ধ'-এ তার নিঃশর্ত সমর্থনের কথাও জানিয়ে ছিল। সঙ্গে সঙ্গেই সাময়িকভাবে স্থগিত রাখল তার সমস্ত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী কাজকর্ম।

'জনযুদ্ধ'-এর সাফল্যের প্রয়োজনে যুদ্ধে নিঃশর্ত সমর্থন প্রদানের কমিউনিস্ট লাইন 'জনযুদ্ধ'-এর যুগে কমিউনিস্ট পার্টিকে করে তুলেছিল 'ধর্মঘটবিমুখ' ও 'সংগ্রামবিমুখ', আর 'জনযুদ্ধ'কালীন কমিউনিস্ট পার্টির এই 'ধর্মঘটবিমুখতা' ও

'সংগ্রামবিমুখতা' ক্রমশ রূপ নিয়েছিল 'ধর্মঘটবিরোধিতা'র ও 'সংগ্রামবিরোধিতা'র। কমিউনিস্ট পার্টির যুক্তি ছিল 'জনযুদ্ধ'-এর যুগে আপাতত ধর্মঘট ও সংগ্রাম স্থগিত বাখাই বাঞ্ছনীয়, কারণ যুদ্ধের এই সঙ্কটপূর্ণ পরিস্থিতিতে ধর্মঘট ও সংগ্রম ব্যাহত কববে ফ্যাসিবাদ-বিরোধী যুদ্ধ উদ্যোগকে, আর তার দ্বারা পরোক্ষ সাহায্য কবা হবে আগ্রাসী ফ্যাসিবাদী শক্তিসমূহকে, কারণ এর ফলে লাভবান হবে তাবাই। যুদ্ধে সহযোগিতার সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়ায ব্রিটিশ সরকারও অনেক চিন্তাভাবনাব পর কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি বহু বছর ধরে অনুসৃত দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটিয়ে কমিউনিস্ট পার্টিকে বৈধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। দীর্ঘ আট বছর নিষিদ্ধ থাকাব পর ১৯৪২ সালের ২৩ জুলাই কমিউনিস্ট পার্টি আইনী ঘোষিত হল। ঠিক সতের দিন পরে শুরু হল ঐতিহাসিক 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন। ভারতে 'জনযুদ্ধ' তত্ত্বের প্রয়োগ এবং যুদ্ধে নিঃশর্ত সমর্থন কমিউনিস্ট পার্টিকে ক্রমশ নিয়ে গিয়েছিল এক 'ধর্মঘটবিরোধী' ও 'সংগ্রামবিরোধী' অবস্থান গ্রহণেব পথে এবং এই অবস্থানেব এক অনিবার্য পরিণতি ছিল কমিউনিস্ট পার্টিব 'ভাবত ছাড়ো' আন্দোলনের বিরোধিতা।

১৯৪২ সালের ৯ অগস্ট 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন শুরু হওয়ার সময় থেকেই কমিউনিস্ট পার্টি এই আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিল, কিন্তু আন্দোলনের একেবারে প্রাথমিক পর্যাযে কমিউনিস্ট পার্টির এই বিরোধিতার লাইন ছিল 'সফ্‌ট্ (soft) বিরোধিতা'র বা 'নরম বিরোধিতা'র লাইন। কিন্তু 'ভারত ছাড়ো আন্দোলনের অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়েই ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছিল এই আন্দোলনের প্রতি কমিউনিস্ট পার্টির বিরূপ মনোভাব, ক্রমশ তীব্র হয়ে উঠেছিল এই আন্দোলন সম্পর্কে কমিউনিস্ট পার্টির বিরোধিতা। ক্রমে ক্রমেই 'সফ্‌ট্ বিরোধিতা' বা 'নরম বিরোধিতা' রূপ নিয়েছিল আন্দোলনের 'কড়া বিরোধিতা'র। কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য ছিল ফ্যাসিবাদের পরাজয় সুনিশ্চিত করে তুলতে এবং ফ্যাসিবাদবিরোধী যুদ্ধ-উদ্যোগকে অক্ষুণ্ন ও অব্যাহত রাখতে যুদ্ধের এই সঙ্কটমুহূর্তে কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে এই আন্দোলনের বিরোধিতা করা। কমিউনিস্ট পার্টির ক্ষেত্রে ভারতে 'জনযুদ্ধ' তত্ত্বের প্রয়োগের এই পরিণতি অনিবার্যই ছিল। আর এই বিরোধিতার কারণেই কমিউনিস্ট পার্টি ক্রমশ কড়া মনোভাব গ্রহণ করে এই জাতীয় সংগ্রামকে 'জাতীয় সঙ্কট' ('national crisis') হিসাবে অভিহিত করে তার তীব্র নিন্দা করেছিল। 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের বিরোধিতা করতে গিয়ে কমিউনিস্ট পার্টি যে লাইন নিয়েছিল, তা ছিল শ্রেণীসংগ্রাম পরিহারের লাইন, শ্রেণীসমন্বয়ের লাইন, 'দক্ষিণপন্থী-সংস্কারবাদী' বিচ্যুতির লাইন। কিন্তু পার্টি লাইনের বিরোধিতা করে বেশ কিছু কমিউনিস্ট কর্মী ও সমর্থক অংশগ্রহণ

করেছিলেন 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে, ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গণসংগ্রামের জোয়ারে। যে সমস্ত জায়গায় 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন ব্যাপক গণ চরিত্র আহরণ করেছিল, সেই সমস্ত জায়গাতেই স্থানীয় কর্মী ও সমর্থকদের এক উল্লেখযোগ্য অংশকে এই আন্দোলনে যোগ দিতে দেখা গেছে, সেই সমস্ত জায়গায় আন্দোলনকে ব্যাপক গণচরিত্র দিতে এই কমিউনিস্ট কর্মী ও সমর্থকরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। এই আলোচনা প্রসঙ্গেই উল্লেখ করা দরকার, যুদ্ধে সহযোগিতার সিদ্ধান্তের পরিণতিতে কমিউনিস্ট পার্টিকে আইনী ঘোষণা করলেও সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকার কমিউনিস্ট পার্টির যুদ্ধে সহযোগিতার সিদ্ধান্তে বিশেষ আস্থা স্থাপন করতে পারেনি, কমিউনিস্ট পার্টিকে ঠিক বিশ্বাসও করেনি, তৎকালীন বিভিন্ন সরকারি নথিপত্রে ও পুলিস রিপোর্টে এই অবিশ্বাসের ও অনাস্থার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। ব্রিটিশ সরকারের চোখে কমিউনিস্ট পার্টির 'ব্রিটিশ বিরোধিতার মাত্রাটা ছিল ফ্যাসিবাদ-বিরোধিতার চেয়ে বেশি', কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন কার্যকলাপ যতই এর বিপরীত সাক্ষ্য দিক না কেন। 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের সর্বাত্মক বিরোধিতা করলেও কমিউনিস্টদের সেই যুগে বিভিন্নভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের দমন নিপীড়ন-নিষেধাজ্ঞার শিকার হতে হয়েছিল, আর তার প্রধান কারণই ছিল কমিউনিস্ট পার্টি কখনই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের যথেষ্ট আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করেনি, ব্রিটিশ সরকারের কাছে সেভাবে গ্রহণযোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠেনি। বেশ কয়েকজন কমিউনিস্টকে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে গ্রেফতার করে এই আন্দোলনের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল, যদিও এই আন্দোলনের সঙ্গে তাঁদের কোনও সংস্রব ছিল না।[৪]

'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন এবং আর সি পি আই-এর ভূমিকা

১৯৩৯ সালের ৩ সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে একইসঙ্গে একদিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং অপরদিকে ফ্যাসিবাদ ও নাৎসিবাদের প্রবল বিরোধী সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বাধীন সমান্তরাল কমিউনিস্ট সংগঠন কমিউনিস্ট লীগ (পরবর্তীকালে এই দলের নাম হয়েছিল আর সি পি আই) বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে সঙ্গে সঙ্গেই এই যুদ্ধকে 'সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ' হিসাবে অভিহিত করে এই যুদ্ধের তীব্র বিরোধিতা শুরু করেছিল।

১৯৪১ সালের ২২ জুন নাৎসি জার্মানি কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন মিত্রশক্তির পক্ষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যোগদান করা সত্ত্বেও সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বাধীন কমিউনিস্ট পার্টি (পূর্বতন কমিউনিস্ট লীগ, পরবর্তীকালে নাম হয়েছিল আর সি পি আই) তার যুদ্ধ সম্পর্কিত অবস্থানে পরিবর্তন সাধনের

কোনও প্রয়োজন অনুভব করেনি। ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এই সমান্তরাল কমিউনিস্ট সংগঠনটিব চোখ 'সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ'ই থেকে গিয়েছিল, 'জনযুদ্ধ'-এ পরিণত হয়নি। ১৯৪২ সালের মার্চ মাসে 'Red Front' পত্রিকায় প্রকাশিত সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা 'Imperialist War or People's War?' নামে একটি প্রবন্ধে এই দলের তরফ থেকে কেন এই যুদ্ধ এখনও 'সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ', 'জনযুদ্ধ' নয়, তার ব্যাখ্যা দিযে ও কারণ বিশ্লেষণ করে লেখা হয়েছিল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে উভয় পক্ষে অংশগ্রহণকারী শক্তিগুলি হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী এবং যুদ্ধটি উভয তরফেই লড়া হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্যসাধনের জন্যই, তদুপরি স্ট্যালিনের নেতৃত্বে সোভিযেত সবকার আর আদৌ 'জনগণেব সরকার' নেই, বরং 'জনগণের বিরোধী সরকার'-এ পবিণত হয়েছে এবং 'সোভিয়েত ইউনিয়নের জনগণেব উপব চরম সন্ত্রাসের রাজত্ব চালাচ্ছে', ফলে এই যুদ্ধ অবশ্যই এখনও 'সাম্রাজ্যবাদী যৃদ্ধ', এমতাবস্থায় এই যুদ্ধকে 'সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ' ব্যতীত অপর কোনও আখ্যায় ভূষিত করা সম্ভবপর নয়, এই যুদ্ধ কোনও মতেই 'জনযুদ্ধ' নয়।[৫]

আক্রান্ত সোভিয়েত ইউনিযন মিত্রশক্তির পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করার পরও সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বাধীন কমিউনিস্ট পার্টি (পূর্বতন কমিউনিস্ট লীগ) এই যুদ্ধকে 'সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ' হিসাবে চিহ্নিত করে বিরোধিতা করা অব্যাহত রাখলেও আক্রান্ত সোভিয়েত ইউনিয়নকে সর্বতোভাবে সাহায্যদানের স্লোগান্ তুলেছিল ও আহ্বান জানিযেছিল ('All aid to the Soviet Union'), কিন্তু একইসঙ্গে এই দল সুস্পষ্টরূপে ঘোষণা করেছিল, একমাত্র বৈপ্লবিক অর্থেই এই স্লোগান্‌কে অনুধাবন করতে হবে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত আঘাত হেনে তাকে ধ্বংস করে কেবলমাত্র স্বাধীন ও সোভিয়েত ভারত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই সোভিয়েত ইউনিয়নকে সর্বশ্রেষ্ঠভাবে সাহায্য করা সম্ভব।[৬]

১৯৪২ সালের ৯ অগস্ট ঐতিহাসিক 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন শুরু হলে সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বাধীন সমান্তরাল কমিউনিস্ট সংগঠনটি (তখন এই দল নিজেদের কমিউনিস্ট পার্টি নামেই অভিহিত করত) তার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী এবং যুদ্ধবিরোধী অবস্থানের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতি রেখেই এই আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিল এবং স্বীয় শক্তিসামর্থ্য অনুযায়ী আঞ্চলিকভাবে এই আন্দোলনে নেতৃত্বও দিয়েছিল। 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের বিরোধিতায় অবতীর্ণ কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের অনুবর্তী মূল কমিউনিস্ট সংগঠন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির থেকে নিজেদের পৃথক্ সত্তা সুস্পষ্টরূপে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্যই 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বাধীন এই সমান্তরাল কমিউনিস্ট সংগঠনটি (যার তখন নাম ছিল কমিউনিস্ট পার্টি) 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন শুরু হওয়ার

কয়েক মাস পর ১৯৪৩ স্যালের মার্চ মাসে দ্বিতীয়বার নাম পরিবর্তন করে রেভলিউশনারী কমিউনিস্ট পার্টি অভ্ ইণ্ডিয়া (আর সি পি আই) নাম গ্রহণ করেছিল।[৭]

১৯৪২ সালের এপ্রিল মাসে সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর আবার ভারত রক্ষা আইনে গ্রেফ্তার হয়েছিলেন। তাঁকে নিরাপত্তা বন্দী (security prisoner) হিসাবে রাখা হয়েছিল লক্ষ্মৌ সেন্ট্রাল জেলে। ১৯৪৩ সালের এপ্রিল মাসে তাঁকে সেখান থেকে ফতেগড়ের বিশেষ নিরাপত্তা জেলে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। ১৯৪৪ সালে তাঁকে নিযে আসা হয়েছিল দমদম সেন্ট্রাল জেলে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ১৯৪৫ সালের অক্টোবর মাসে সৌম্যেন্দ্রনাথ দমদম সেন্টাল জেল থেকে ছাড়া পেয়েছিলেন।[৮] ফলে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের উত্তাল দিনগুলিতে তিনি ছিলেন কারাপ্রাচীরের অন্তরালে। তিনি নিজে জেলে থাকলেও তাঁর দল 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিল।

আর সি পি আই ছিল সম্পূর্ণ ব্যক্তি-কেন্দ্রিক দল। সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে কেন্দ্র করেই এই সমান্তরাল কমিউনিস্ট সংগঠনটি আবর্তিত হত। তিনিই ছিলেন এই দলের কেন্দ্রীয় চরিত্র, এই দলের মস্তিষ্ক। জেলের ভিতর থেকেই সৌম্যেন্দ্রনাথ গোপনে নির্দেশ পাঠাতেন বাইরে, সেই অনুযায়ী এই দল পরিচালিত হত, বা চলার চেষ্টা করত।

১৯৪২ সালের জুলাই মাসে 'Red Front' পত্রিকায় প্রকাশিত হল জেলের ভিতর থেকে গোপনে প্রেরিত সৌম্যেন্দ্রনাথের লেখা 'For a Revolutionary Struggle Against All Imperialists'[৯] নামক একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এই দলিলে লেখা হয়েছিল, ভারতীয় জনগণ ক্রমশ বিপ্লবী চেতনায় অধিকতর সমৃদ্ধ হয়ে উঠে বিপ্লবী সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত। আর এই বিপ্লবী সংগ্রাম করতে হবে মিত্রশক্তিভুক্ত এবং অক্ষশক্তিভুক্ত সব সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধেই। অস্ত্র শিল্পে, বস্ত্র শিল্পে, চট শিল্পে, স্বর্ণ খনিতে, কয়লা খনিতে, যানবাহন শিল্পে এবং আরও অন্যান্য কলকারখানায় শ্রমিক ধর্মঘট নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। সংগ্রামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ কৃষকেরাও জমিদারদের গুণ্ডাবাহিনী এবং পুলিস বাহিনীর সঙ্গে নিত্য সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছে। ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর মধ্যেই দেখা দিয়েছে অসন্তোষ। বৈপ্লবিক পরিস্থিতি প্রায় প্রস্তুত। শ্রমিকদের সাধারণ ধর্মঘট এবং কৃষকদের গণবিদ্রোহ বৈপ্লবিক কাজকর্মের এবং প্রোগ্রামের দুটি প্রধান অঙ্গ। বিপ্লবী কমিউনিস্টদের আশু কর্তব্য হচ্ছে এই সমস্ত বিচ্ছিন্ন সংগ্রামগুলিকে ঐক্যবদ্ধ ও এক সূত্রে গ্রথিত করে সাম্রাজ্যবাদী এবং ফ্যাসিবাদী উভয় ধরনের দৈত্যের বিরুদ্ধেই বৈপ্লবিক গণসংগ্রাম গড়ে তোলা।

এই দলিল প্রকাশিত হওয়ার কিছু দিনের মধ্যেই শুরু হয়ে গেল 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন। জেলের ভিতর থেকে সৌম্যেন্দ্রনাথ লিখে চললেন একের পর এক অতি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। গোপন পথে সেগুলি জেলের বাইরে এসে দলীয় ইংরেজি মুখপত্র 'Red Front' পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকল। এই দলিলগুলিতে ছিল 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন সংক্রান্ত সৌম্যেন্দ্রনাথের নিজস্ব মূল্যায়ন, ছিল 'বুর্জোয়া সংগঠন' কংগ্রেস (সৌম্যেন্দ্রনাথ এবং আর সি পি আই-এর বিশ্লেষণ অনুযায়ী) এবং বিভিন্ন 'তথাকথিত বামপন্থী সংগঠন' (সৌম্যেন্দ্রনাথ এবং আর সি পি আই-এর বিশ্লেষণ অনুযায়ী) অর্থাৎ সি এস পি, সি পি আই (কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের অনুবর্তী মূল কমিউনিস্ট দল), রায়পন্থী, আর এস পি ও ফরওয়ার্ড ব্লক সম্পর্কিত সৌম্যেন্দ্রনাথের নিজস্ব মূল্যায়ন, যার পুরোটাই ছিল তীব্র বিধ্বংসী সমালোচনা, এবং এই গণআন্দোলনে বিপ্লবী কমিউনিস্টদের অর্থাৎ আর সি পি আই-এর কর্তব্য ও ভূমিকা সম্পর্কিত নির্দেশ। যেহেতু আর সি পি আই-তে সৌম্যেন্দ্রনাথের কথাই ছিল প্রথম ও শেষ কথা, সেহেতু সৌম্যেন্দ্রনাথের সমস্ত রাজনৈতিক বিশ্লেষণ, মূল্যায়ন ও দৃষ্টিভঙ্গীই ছিল আর সি পি আই এর বিশ্লেষণ, মূল্যায়ন ও দৃষ্টিভঙ্গী। 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন সংক্রান্ত সৌম্যেন্দ্রনাথের জেল থেকে লিখে গোপনে বাইরে পাঠানো তিনটি দলিল এই প্রসঙ্গে সব থেকে উল্লেখযোগ্য, যাতে বিধৃত হয়ে আছে এই আন্দোলন এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক শক্তি সংক্রান্ত আর সি পি আই-এর মূল্যায়ন ও দৃষ্টিভঙ্গী। প্রথম দলিলটি প্রকাশিত হয়েছিল 'Red Front' পত্রিকায় ১৯৪২ সালের অক্টোবর মাসে, দলিলটির নাম ছিল 'Revolution and Quit India'.[১০]। দ্বিতীয় দলিলটি প্রকাশিত হয়েছিল 'Red Front' পত্রিকায় ১৯৪৩ সালের মার্চ মাসে, দলিলটির নাম ছিল 'Onward From '42.'[১১]। তৃতীয় দলিলটি লেখা হয়েছিল ১৯৪৫ সালের অগস্ট মাসে, দলিলটির নাম ছিল "Quit India" in Retrospect'.[১২]। ১৯৪৪ সালের ডিসেম্বর মাসে আর সি পি আই-এর কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরোর দ্বারা সম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল 'Historical Development of Communist Movement in India' নামে আর সি পি আই-এর দলিল,[১৩] দমদম সেন্ট্রাল জেল থেকে এই দলিলটি লিখে গোপনে বাইরে পাঠিয়েছিলেন সৌম্যেন্দ্রনাথ, দলিলটি পুস্তিকাকারে বেআইনীভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। এই দলিলটিরও অনেকটাই অংশ জুড়ে ছিল 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন এবং তৎকালীন বিভিন্ন রাজনৈতিক শক্তি সম্পর্কিত সৌম্যেন্দ্রনাথের তথা আর সি পি আই-এর মূল্যায়ন, এবং এই আন্দোলনে আর সি পি আই-এর ভূমিকা।[১৪]

এখন বিশ্লেষণ করে দেখা যাক, এই দলিলগুলির মূল বক্তব্য কি ছিল। এই দলিলগুলিতে আলোচিত হয়েছিল কেন অকস্মাৎ ১৯৪২ সালেই কংগ্রেস

'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের ডাক দিল, কেনই বা এই ডাক ১৯৩৯ সালে দেওয়া হয়নি। ১৯৩৯ সালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ নাৎসি জার্মানির আঘাতে ১৯৪২ সালের মত বিধ্বস্ত হয়ে পড়েনি, তখনও সে প্রবল শক্তিশালী। তদুপরি ১৯৩৯ সালের ৩ সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন তখন প্রবল শক্তিধর। বৈপ্লবিক পদ্ধতির মাধ্যমে যা করা সম্ভবপর হয়নি, 'নীতিহীন কূটনীতি' ('unprincipled diplomacy')-র সাহায্যে এবং পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের মধ্যে সংঘর্ষের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে স্ট্যালিন নেতৃত্বাধীন সোভিয়েত ইউনিয়ন তার শক্তি ও ক্ষমতার পরিধি বাড়িয়ে চলেছিল। স্ট্যালিন নেতৃত্বাধীন সোভিয়েত ইউনিয়ন আর কোনও বৈপ্লবিক শক্তি না হলেও ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী ছিল সোভিয়েত ভয়ে ভীত। ১৯৪২ সালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদও বিধ্বস্ত, নাৎসি জার্মান আক্রমণে সোভিয়েত ইউনিয়নও বিধ্বস্ত, শক্তিহীন, ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির উপর নির্ভরশীল। (যদিও এর কিছুদিন পরেই শুরু হয়ে গিয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের পাল্টা মার এবং লাল ফৌজের বিজয়যাত্রা, আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে সোভিয়েত ইউনিয়নের আবির্ভাব ঘটেছিল দুই বৃহৎ শক্তির অন্যতম হিসাবে --- লেখক)। ফলে ১৯৪২ সালে কোনও আন্দোলন শুরু হলে দুর্বল, পরনির্ভরশীল সোভিয়েত ইউনিয়ন সেই আন্দোলনকে সাহায্য করে কোনও বিপ্লবী আন্দোলনে পরিণত করতে পারবে না। ফলে আন্দোলন শুরুর জন্য বেছে নেওয়া হয়েছিল ১৯৪২ সাল। কিন্তু ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর নিজস্ব সংগঠন কংগ্রেস এই আন্দোলনের ডাক দিয়েছিল শুধুমাত্র ব্রিটিশ সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর রাজনৈতিক প্রতিনিধি কংগ্রেসের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য, কোনও বৈপ্লবিক উপায়ে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের জন্য নয়। তাই 'ভারত ছাড়ো' এবং 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে' এই দুই উত্তেজনা সৃষ্টিকারী ডাক ছেড়ে গান্ধীসহ সমস্ত কংগ্রেস নেতারা চলে গেলেন জেলের নিরাপদ আশ্রয়ে। সর্বময় কর্তৃত্বসম্পন্ন নেতা গান্ধীর নিরাপদ আশ্রয় হল আগা খাঁর প্রাসাদের চার দেওয়ালের মধ্যে। আন্দোলন পরিচালনার কোনও দায়িত্বই আর নেতাদের রইল না। জনগণ থেকে গেল 'করবার' অথবা 'মরবার' জন্য। কিন্তু 'কি করা' এবং 'কিসের জন্য মরা'? উত্তর দেওয়ার কোনও দায়ই গান্ধীসহ কোনও কংগ্রেস নেতারই ছিল না। আন্দোলনের কোনও প্রোগ্রাম ছিল না, ছিল না কোনও কর্মসূচী। আন্দোলন ছিল সম্পূর্ণ নেতৃত্ববিহীন বিকেন্দ্রীভূত, স্বতঃস্ফূর্ত। কোনও নেতৃত্ববিহীন, বিকেন্দ্রীভূত, স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন কখনই সাফল্য লাভ করতে পারে না, রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে পারে না। আর ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী এবং তার বিশ্বস্ত রাজনৈতিক সংগঠন কংগ্রেস ঠিক এটাই চেয়েছিল। জনগণ সংগঠিত হোক, আন্দোলন

বৈপ্লবিক চরিত্র নিক, এটা তারা চায়নি, তারা চেয়েছিল ব্রিটিশ সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে দর কষাকষি করতে। আর জেল থেকে বেরিয়েই গান্ধী ও গান্ধীর দেখাদেখি অন্যান্য কংগ্রেস নেতারা আন্দোলনের দায় অস্বীকার করলেন, শুরু করে দিলেন হিংসাত্মক হওয়ার কারণে এই ঐতিহাসিক গণআন্দোলনের সমালোচনা। তবুও নেতৃত্ববিহীন ভাবেই অসম লড়াই লড়েছিলেন ভারতের বীর জনগণ, তাঁদের ছিল না নেতৃত্ব, সংগঠন, অস্ত্র, কিন্তু ছিল দুর্জয় সাহস, মনোবল এবং স্বাধীনতার অদম্য স্পৃহা। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আর সি পি আই সরাসরি অভিযোগ এনেছিল এই ঐতিহাসিক গণ আন্দোলনের সঙ্গে 'বিশ্বাসঘাতকতা'র এবং 'সাবোটাজ' এর। সি এস পি, আর এস পি এবং ফরওয়ার্ড ব্লক— এই তিন বামপন্থী শক্তিই আর সি পি আই এর চোখে ছিল কংগ্রেস 'বামপন্থী' দল, এবং সেই কারণেই তারা আর সি পি আই-এর চোখে পরিচিত ছিল 'মেকি বামপন্থী শক্তি' হিসাবেই। এই তিন 'মেকি বামপন্থী শক্তি'র বিরুদ্ধেই আর সি পি আই অভিযোগ এনেছিল বুর্জোয়া সংগঠন কংগ্রেসের লেজুড় বৃত্তির, আর সেই কারণেই আর সি পি আই-এর মতে এই দলগুলির 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে প্রকৃতপক্ষে কোনও ভূমিকাই ছিল না। আর অপরদিকে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে অংশগ্রহণ না করে এই আন্দোলনের বিরোধিতায় অবতীর্ণ হওয়ার কারণে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের অনুবর্তী কমিউনিস্ট পার্টির এবং রায়পন্থীদের বিরুদ্ধে আক্রমণে আর সি পি আই তার তূণের প্রায় সব তীরই নিঃশেষ করে দিয়েছিল। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের 'তল্পিবহনে'র এবং দালালির, এখানেই শেষ হয়নি, হেন অভিযোগ নেই, যা তাদের বিরুদ্ধে করা হয়নি। কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে আর সি পি আই সত্য-মিথ্যা মিলিয়ে যা যা অভিযোগ করেছে এবং যা যা কটূক্তি-গালিগালাজ করেছে, একসূত্রে গ্রথিত করে দিলে তাই একটি পৃথক প্রবন্ধের বিষয় হতে পারে। আর সি পি আই-এর বক্তব্য অনুযায়ী একমাত্র এই দলই একটি সঠিক বৈপ্লবিক উদ্দেশ্য ও দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল এবং অসংগঠিত বিপ্লবী জনতাকে সঠিক নেতৃত্ব দিয়ে এবং বৈপ্লবিক সচেতনতা দিয়ে এক বৈপ্লবিক পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে সচেষ্ট হয়েছিল। সাংগঠনিক শক্তির অভাবে আর সি পি আই-এর সেই চেষ্টা সফল হয়নি।[১৫]

সীমিত শক্তি ও সাংগঠনিক দুর্বলতা নিয়েই আর সি পি আই যোগ দিয়েছিল 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে। নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, ২৪ পরগণা, খুলনা এবং বীরভূম জেলায় এবং কিছুটা পরিমাণে কলকাতায় 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে এই দলের ছিল সক্রিয় অংশগ্রহণ। আঞ্চলিক স্তরে নেতৃত্বও এসেছিল এই দলের কাছ

থেকে। আব সেই কাবণেই সেই যুগে চরম সাম্রাজ্যবাদী নিপীড়ন ও সন্ত্রাসেব শিকাব হতে হয়েছিল আব সি পি আই এব সদস্য ও কর্মীদেব।[১৬]

জাতীয় পবিস্থিতিব বিশ্লেষণ সি পি আই এব তুলনায় সঠিকভাবে কবে সেই পবিস্থিতিতে তুলনামূলকভাবে সঠিক ভূমিকা গ্রহণ কবলেও যান্ত্রিক মার্কসবাদী এবং অতীব সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীব কাবণেই আব সি পি আই ভাবতীয় বামপন্থী বাজনীতিব প্রান্তসীমাতেই থেকে গিয়েছিল, এই বাজনীতিব কোনও কেন্দ্রীয় চবিত্র হয়ে উঠতে পাবেনি।

সূত্র নির্দেশ

১ বর্তমান প্রবন্ধকাব লেখক কর্তৃক লিখিত কমিউনিস্ট লীগ থেকে আব সি পি আই সমান্তবাল কমিউনিস্ট সংগঠনেব বিকাশেব বিভিন্ন পর্যায় নামক প্রবন্ধটি অধ্যাপক আবদুল ওয়াহাব মাহমুদ কর্তৃক সম্পাদিত 'ইতিহাস অনুসন্ধান' গ্রন্থটিব নবম খণ্ডেব অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। গ্রন্থটি কলকাতাব কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী কর্তৃক ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত।

২. Viceroy Lord Linlithgow's Telegram to Prime Minister Winston Churchill, 31 August 1942, in Nicholas Mansergh (ed in chief), **The Transfer of Power: 1942–7**, Volume II (30 April 21 September 1942), Her Majesty's Stationery Office, London, Vikas Publications, New Delhi, 1971 p 853 also quoted in Sumit Sarkar, **Modern India: 1885–1947**, Macmillan India Limited, Madras, 1986, (First published 1983) p 391, also quoted in **'Introducton', Against the Stream: An Anthology of Writings of Saumyendranath Tagore**, Volume II, edited with an inroduction by Sudarshan Chattopadhyaya, published by Sarojini Hutheesing on behalf of the Saumyendranath Memorial Committee, Shahibag, Ahmedabad, August, 1984, p XIV

৩. **'ভাবত ছাড়ো' আন্দোলন এবং ভারতেব কমিউনিস্ট পার্টিব ভূমিকা সম্পর্কিত বিস্তাবিত আলোচনা এবং বিবরণ-বিশ্লেষণেব জন্য দ্রষ্টব্য: অমিতাভ চন্দ্র, "ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, 'জনযুদ্ধ' এবং 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন," 'অনীক', বর্ষ ৩১, সংখ্যা ২, আগস্ট, ১৯৯৪, কলকাতা, পৃ. ১২–৩৩।**

এই বিষয়ে বিস্তাবিত সূত্রনির্দেশেব জন্য অর্থাৎ এই বিষয় সম্পর্কিত গ্রন্থাবলী ও প্রবন্ধাবলীব বিস্তাবিত বিববণেব জন্য দ্রষ্টব্য: উক্ত প্রবন্ধেব 'সূত্রনির্দেশ': তদেব, পৃ. ২৭–৩৩।

৪. **তদেব, পৃ. ১৭–২৭, ৩০–৩৩।**

৫. 'Imperialist War or People's War?', in **Against the Stream,** Volume II, pp 86 90 এবং সঙ্গেই দ্রষ্টব্য: 'Introduction', ibid,. pp. Xi Xii; **Historical Development of Communist Movement in India,** (Hereafter Historical **Development).** edited and published by the Politbureau, CC, Revolutionary Communist Party of India, Calcutta, December, 1944, pp. 43 49.

৬. 'Imperialist War or People's War?', **in Against the Stream,** Volume II, p 88, **Historical Development,** pp 46 47.

৭. Historical Development, pp 58 59, 64

৮. 'Introduction', **Against the Stream,** Volume II, pp. Xiii, Xvi, XVii, XViii

৯. **'For a Revolutionary Struggle Against All Imperialists',** in **Against the Stream,** Volume II, pp 99 107, 'Introduction', Ibid, pp. xiii xiv.

১০. **'Revolution and Quit India',** in **Against the Stream,** Volume II, pp 108 24

১১. **'Onward From '42',** Ibid, pp 125 33.

১২. **'"Quit India" in Retrospect',** Ibid, pp 159 69.

১৩. **Historical Development,** op cit, pp 1 67

১৪. Ibid, pp 53 67

১৫. **'Revolution and Quit India',** in **Against the Stream,** Volume II, pp. 108 24: **'Onward From '42',** Ibid, pp. 125 33, **"Quit India" in Retrospect',** Ibid, pp 159 69, 'Introduction', Ibid., pp. Xiii Xviii, **Historical Development,** pp. 53 67; Saumyendranath Tagore, **The Soviet State—Its Character,** edited with an introduction by Binayak Halder, Ganabani Publishing House, Calcutta, October, 1991, 'Introduction', pp. Xiii XX.

১৬. সূত্রনির্দেশ (১৫)-এর অনুরূপ; তৎসহ Home/Poll./F.No. 29/10/1942; **IB,** File No. 1045/1940; **SB,** File Nos **SR 506/1942, SR 506/1942 (Part II), SR 506/1943 (Part II), SR 506/1943 (Part IX) and SR 506/1944.**

কমিউনিস্ট পার্টি ও চল্লিশের দশকের বাঙলায় নারী আন্দোলন : একটি তুলনামূলক পর্যবেক্ষণ

সুস্নাত দাশ

প্রশ্ন-টা মনে জেগেছিল অবিভক্ত বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন নিয়ে কাজ করার সময় গোয়েন্দা পুলিশের (এস.বি) রেকর্ড ফাইল ঘাঁটতে গিয়ে। অবিভক্ত বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের অবিসংবাদী মহিলানেত্রী মণিকুন্তলা সেন-এর ১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে লেখা ঢাকার শান্তিসুধা ঘোষ নাম্নী জনৈকা তরুণী রাজনৈতিক কর্মীকে লেখা একটি চিঠির (যা কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা শাখা রাসবিহারী এ্যাভেন্যু পোস্ট অফিস থেকে ১৯ সেপ্টেম্বর,'৪২-এ হস্তগত করে) প্রতিলিপি পাঠ করেই সন্দেহ নেই প্রশ্নটা এসেছিল! আজ পর্যন্ত অপ্রকাশিত পত্রটি গবেষণার প্রয়োজনেই প্রকাশ করা প্রয়োজন মনে করলাম। চিঠিটির ঠিকানা ইংরাজিতে লেখা : শ্রীমতি শান্তিসুধা ঘোষ, প্রযত্নে প্রয়াত অবিনাশচন্দ্র ঘোষ, ডাকঘর : বজ্রযোগিনী, নর্থ-নাহাপাড়া ; দুর্গাবাড়ি ; জেলা : ঢাকা।[১]

প্রিয় শান্তি,

শ্রীযুক্ত গোপালবাবুর নিকট আমরা তোমার কথা জানলাম। শুনেছি কিছু কাজ করার ইচ্ছাও তোমার আছে। কিন্তু তুমি ওখানে কাদের সঙ্গে যুক্ত আছ। কাজকর্ম বিষয়ে সে সব না জানতে পারলে—আমরা এখান থেকে কিছু সুবিধা করে দিতে পারছি না। অবশ্য যদি কারো সঙ্গে তোমার আলাপ পরিচয় না থাকে তাহলে আমরা জিলা কমরেডদের কাছে চিঠিপত্র লিখে যাতে তোমার সঙ্গে যোগ হতে পারে তার ব্যবস্থা করবো।

অবশ্য মেয়েদের কাজকর্ম বিষয়ে ওখানকার কমরেডরা কিছু করছেন কিনা, অথবা করতে চেষ্টা করছেন কিনা জানি না। তোমাকেই ওখানকার মহিলাদের কাজকর্ম বিষয়ে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবো। যা তোমার জানা আছে পত্রোত্তরে লিখো। তারপরে কিভাবে আমরা কাজ করে থাকি তোমাকে জানাবো।

(১) ওখানে কোন মহিলা সমিতি আছে কিনা।

(২) কংগ্রেসের কোন মহিলা বিভাগ আছে কিনা।

(৩) ছাত্রীদের মধ্যে কোন কাজকর্ম হয় কিনা।

(৪) মেয়েদের স্কুল আছে নাকি।

(৫) গ্রামে লেখাপড়া জানা মেয়েদেব সংখ্যা কিরকম।

(৬) কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান আছে নাকি মেয়েদের জন্য।

(৭) মেয়েদেব এ বাড়ী ও বাড়ী যাওযা বা রাস্তায় বার হওযাতে খুব নিন্দা হয নাকি?

(৮) জাযগাটা মুসলমান প্রধান নাকি!

(৯) ওখানকাব সাধারণ বাজনৈতিক আন্দোলনের অবস্থা কি? বর্তমান আন্দোলন সম্পর্কে মত কি?

(১০) আগেকার স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন তেমন মহিলা আছেন নাকি?

এগুলি গেল ওখানকার স্থানীয সংবাদ। তারপরে ওখানে কম্যুনিস্ট কর্মীদের মধ্যে তোমার আলাপ বা যোগাযোগ আছে কিনা তাও লিখবে। তাদের কাজকর্ম বিষযে তুমি কি জানো লিখবে।

তাবপরে তোমাব ব্যক্তিগত কথা জিজ্ঞাসা করি। বাড়ীতে তোমাব স্বাধীনতা কতটুকু। কাজকর্মে ঘরেব বাইরে বেরোলে গোলমাল হবে না তো? কতটা সময দিতে পার। ওখানকার মেয়েদের তোমার মেলামেশা বা জানাশোনা কেমন আছে? বাজনৈতিক বইপত্র কিছু পড়েছ কি? ওখানে তেমন বই পড়ার সুবিধা হবে কি? জনযুদ্ধ-অরণি এসব কাগজ পাও! মেয়েদের সঙ্গে রাজনৈতিক আলাপ, আলোচনা করতে হলে তুমি পারবে কি?

কিছু মনে করো না এতসব জিজ্ঞেস করলাম বলে। গোপালবাবু আমাকে তোমার কথা বলেছেন এবং কাজকর্ম বিষয়ে যাতে তোমাকে আমাদের সঙ্গে নিতে পারি তার জন্য বলেছেন। আমার সঙ্গে তোমার পরিচয় বা দেখা নাই। গোপালবাবুর কাছে শুনে এবার চিঠির মারফতেই আলাপ করি—এরপরে সুযোগ মতো সাক্ষাৎ পরিচয় নিশ্চয়ই হবে। .....এখানে কলেজে পড়তে শুনলাম। গীতা, কল্যাণী এদের চেন কি? আমার নাম তোমার জানা আছে কিনা জানিনা তবে আমি গোপালবাবুর বিশেষ পরিচিত লোক এবং এখানকার একজন মহিলা কর্মী। গোপালবাবুকেও চিঠি লিখলে তুমি আমার পরিচয় পাবে। আজ আর নয। এব পরের পত্রে পুনরায। প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিও।

ইতি

স্বঃ মণিকুন্তলা সেন

১৯৪২ সালে দাঁড়িয়ে অগ্রসবমনা ও বাজনীতি-সচেতন একটি তরুণীব সামনে যে প্রশ্ন ও সমস্যাসমূহ একজন বাজনৈতিক নেত্রী উত্থাপন কবেছিলেন তাতে নাবী আন্দোলনেব আজকেব গবেষকদেব কাছেও চিন্তাব নতুন উপাদান আত্মপ্রকাশ করে। চিন্তা বা প্রশ্নগুলি হল এবকম :

(১) কমিউনিস্ট পার্টিব উদ্যোগে ঔপনিবেশিক বাংলায় মেযেদেব সংগঠিত কবাব যে উদ্যোগ চলছিল তাব বাজনৈতিক চবিত্রটি ঠিক কেমন ছিল? জাতীয় আন্দোলনের মূল ধারার সঙ্গে যোগ ছিল কিনা?

(২) কমিউনিস্ট পার্টি পবিচালিত নাবী আন্দোলনেব কর্মীদেব কাছে ঐ সময়ে সামাজিক সমস্যাগুলি কীবকম বাধাব সৃষ্টি কবতো?

(৩) নাবী আন্দোলনেব পূর্ববর্তী ধাবাগুলিব সঙ্গে এব মিল বা অমিলগুলি কোথায়? কমিউনিজমেব মতাদর্শ অবিভক্ত বাংলায় নাবী আন্দোলনে স্বতন্ত্র কোনো বিষযমূলক উপাদান সংযুক্ত কবতে পেবেছিল কি না?

আলোচনাব শুরুটা কবা যেতে পাবে শেষ প্রশ্নটিব উত্তব অনুসন্ধানেব প্রযাসেব মধ্যমেই। একথা ঠিক যে ১৮৮৫ সালে জাতীয় কংগ্রেসেব সূচনা ঘটেছিল ভাবতবর্ষেব উদাবনৈতিক বুর্জোযাদেব আনুকূল্যেই। কিন্তু এব মধ্যে সক্রিয শক্তিরূপে অবস্থান করা বক্ষণশীল সামন্ততান্ত্রিক শক্তি দীর্ঘদিন ধবে জাতীয় কংগ্রেসেব বাজনৈতিক মঞ্চে ভাবতীয নাবীকে তাঁব যথাযোগ্য ভূমিকা নিয়ে উপস্থাপিত হতে দেযনি। স্পষ্ট কবে বললে, বাধাই দিযেছিল। ১৮৮৯ সালে বোম্বাই শহবে অনুষ্ঠিত জাতীয কংগ্রেসেব পঞ্চম অধিবেশনে যে ছযজন মাত্র মহিলা উপস্থিত ছিলেন (বাঙালী দু'জন কাদম্বিনী গাঙ্গুলি ও স্বর্ণকুমাবী দেবী) তাদেবকে বক্তব্য বাখাব সুযোগ দেওযা হযনি। কাদম্বিনী গাঙ্গুলীকে শুধু একটি ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাব উত্থাপন কবতে দেওযা হয। অ্যানি বেসান্ত এটুকু ঘটনাকেই সেসময যুগান্তকারী ঘটনা বলে উচ্ছ্বাস প্রকাশ কবেন।[২]

জাতীয় কংগ্রেসেব মঞ্চে যথাযোগ্য মর্যাদা লাভ কবতে এবপবেও ভাবতীয নারীসমাজকে আরো অন্তত তিন দশক প্রায অপেক্ষা করতে হযেছিল। ১৯১৭-এব ১৮ নভেম্বব, সবোজিনীব নেতৃত্বে বিভিন্ন প্রদেশ থেকে চোদ্দজন মহিলা প্রতিনিধির ডেপুটেশনে আবেদন করে বলেছিলেন যে, ভাবতীয নারীদের যেন মানুষ বলে মনে করা হয় এবং পুরুষদের মতো তাদেরও যেন প্রতিনিধিত্বের সুযোগ দেওয়া হয়।[৩] এর পরে অ্যানি বেসান্তের সভাপতিত্বে কলকাতা কংগ্রেস প্রস্তাব নিযেছিল, মেয়েদেরও সার্বজনীন ভোটাধিকার দেওয়া হোক।

ইতিমধ্যে অবশ্য ঠাকুরবাড়ির মহিলারা 'সখী সমিতি' জাতীয় মহিলা সংগঠন স্বর্ণকুমারী দেবীর নেতৃত্বে (১২৯৩ বঙ্গাব্দ) এবং 'ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল' সরলা দেবীচৌধুরাণীর উদ্যোগে (১৯১০) গড়ে তোলেন। ১৯১৭-তে 'উইমেনস্ ইণ্ডিয়া

এ্যাসোসিয়েশন' সারা ভারত জুড়েই সংগঠিত হয়। অর্থাৎ উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত, সুপ্রতিষ্ঠিত সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলারা নানাভাবে সংগঠিত আকারে সমাজ সংস্কার ও নারী উন্নতিমূলক নানা কাজে সেসময় অংশগ্রহণ করতে থাকেন।[৪] বলাই বাহুল্য রাজনৈতিক ক্ষমতার আধিপত্য অর্জন বা শ্রেণী রাজনীতির সঙ্গে সংযোগ তাদের কার্যসূচীর মধ্যে ছিলই না; এমনকি জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের প্রয়াসেও সংগঠিতভাবে নারী আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়াস তাদের মধ্যে দেখা যায়নি। বিষয়টা একেবারেই ছিল অভিজাত মহিলাদের সেবামূলক মানসিকতা ও কিছুটা অসংগঠিত দেশপ্রেম।

১৯০৫ সালে বাংলায় বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শিক্ষিত মহিলাদের একাংশের বেশ চোখে পড়ার মতো যোগদান ছিল এই দেশপ্রেমেরই আকৃতি এবং অনেকটা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যক্তিগত উদ্যোগের আকর্ষণ। তাছাড়া বঙ্গ বিহারের ফলে এই অর্থনৈতিক স্তরের পরিবারগুলির বৈষয়িক ক্ষতির আশঙ্কাটাও মহিলাদের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে গৌণ ছিল না। এ বিষয়ে সুমিত সরকারের পর্যবেক্ষণ সঠিক।[৫] কিন্তু বাংলা তথা ভারতীয় রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণ গণরূপ লাভ করে নিঃসন্দেহে গান্ধীজীর উত্থানের পরবর্তীকালে। বাস্তবিক পক্ষেই ১৯২০-তে গান্ধীজীর নেতৃত্বে প্রত্যক্ষ আন্দোলনের দিকে মুখ ফেরানোর সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় রাজনৈতিক কর্মসূচীতে সমাজের নানা স্তরের ব্যাপক জনসাধারণের অংশগ্রহণ। মহিলাদের সংখ্যাও বৃদ্ধি ঘটে উল্লেখযোগ্যভাবে। ১৯২১ সালে জাতীয় কংগ্রেসের আহ্‌মেদাবাদ অধিবেশনে তাই দেখা যায় ১৩১ জন মহিলা স্বেচ্ছাসেবী, ১৪ জন সাবজেক্ট কমিটি সদস্য, ১৪৪ জন প্রতিনিধির বিপুল অংশ গ্রহণ। ফলশ্রুতিরূপে দেখা যায় ১৯২১ থেকে ১৯২৯-এর মধ্যে ব্রিটিশ ভারতের সকল প্রদেশেই মহিলাদের ভোটাধিকার প্রাপ্তি সম্পূর্ণ হয়। ভোটে দাঁড়ানোর অধিকার মেলে ১৯২৬ সালে।[৬]

১৯২২ সালে চৌরিচৌরায় গান্ধীজীর অপসারণের পর আবার তিনি জাতীয় কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে ১৯৩০-এর মার্চে ডাক দেন লবণ আইন অমান্য আন্দোলনের। ১৯৩০—৩১ সালের এই ঐতিহাসিক আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী মেয়েদের সংখ্যা ছিল সংখ্যায় অধিক। বিশের দশক অপেক্ষা ত্রিশের দশকের সূচনায় জাতীয় আন্দোলনে মহিলাদের অংশগ্রহণের যে পার্থক্যটা বিশেষভাবে নজরে পড়ে, তা হলো ১৯৩০-এ আর শুধু রাজনীতি সচেতন পরিবারের শিক্ষিত মেয়েরাই নয়, সাধারণ মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত এবং বিশেষ করে গ্রামের সরল নিরক্ষর নারী সমাজ। কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায় তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন : "যেন আকস্মিক এক রাতে তাদের সংকীর্ণ গার্হস্থ্য প্রাচীর ভেঙে পড়ল, খুলে গেল এক নতুন বিস্তীর্ণ জগৎ যেখানে তাদের জন্য এক উচ্চ স্থান নির্দিষ্ট।"[৭] হিতেশরঞ্জন

সান্যাল এবং বুদ্ধদেব ভটাচার্য। তাঁদের "মহিষবাথান লবণ সত্যগ্রহ" সংক্রান্ত গবেষণায় দেখিয়েছেন কীভাবে একেবাবে অজ পাড়াগাঁর মেয়ে বউরা দলে দলে এতে সামিল হয়েছিল। পশ্চাদ্‌পদ সমাজ অধ্যুষিত মেদিনীপুরেও ছিল এই চিত্র।[৮] নিঃসন্দেহে এই চেতনা জাগ্রত হয়েছিল 'লবণ' প্রতীকটিকে গ্রহণ করে। নুন চাই নুন—যা না হলে প্রতিদিনের অন্ন রুচবে না! মানুষের বাস্তব প্রয়োজন ও রাজনীতিকে গান্ধীর মতো আর কেউ এভাবে মিশিয়ে ফেলতে পেরেছিলেন বলে জানা নেই।

শোনা যায় গ্রেপ্তার হবার পূর্বে ধরশোনা অভিযানের নেতৃত্ব দেবার জন্য গান্ধীজী যাঁকে মনোনীত করে গিয়েছিলেন সেই জন্মসূত্রে বাঙালী ললনা সরোজিনী নাইডু ধরশোনা অভিযানের মুখে বলেছিলেন, "সময় এসেছে যখন মেয়েরা আর তাদের স্বতন্ত্র আশ্রয়ের আরক্ষা চাইতে পারে না, যখন দেশের মুক্তির জন্য পুরুষ সহযোদ্ধাদের সঙ্গে সব বিপদ ও ত্যাগ তাদের সমানভাবে ভাগ করে নিতে হবে।"[৯] দেশের মুক্তির চেতনা অবশ্যই তখন একটা ব্যাপক অংশের ভারতীয় নারীসমাজে উদ্বেলতা সৃষ্টি করেছিল কিন্তু লবণ আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী গ্রামীণ মহিলাদের ঘরকন্নার কাজের বস্তুটির (নুন) আকর্ষণই ছিল অধিক যা তাদের ঔপনিবেশিকতা বিরোধী আন্দোলনের ময়দানে টেনে নিয়ে আসে।

সুতরাং সাধারণ বা নিম্নবিত্ত স্তরের গ্রাম নগরের নারী সমাজ কোনো নারীবাদী (লিঙ্গ বৈশিষ্ট্য সূচক) আন্দোলনে বা জাতীয়তাবাদী সংগ্রামে সচেতন সক্রিয়ভাবে সামিল হননি, একটি সংগঠিত প্রবহমান সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের স্রোতে পা মিলিয়ে ছিলেন মাত্র। শ্রেণী (অর্থনৈতিকভাবে) চেতনা ও নারীবাদী (শারীরিকভাবে) স্বাতন্ত্র্য সূচক কোনো আন্দোলনের শরিক অন্তত সাধারণ নারী সমাজ ছিলেন না। তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে সংগঠিত প্রবহমান ঔপনিবেশিকতা বিরোধী চলিষ্ণু স্রোতের নেতৃত্বে যারা ছিলেন সেই বাসন্তী দেবী (দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের পত্নী), কস্তুরবা গান্ধী (গান্ধীজীর পত্নী), পেরিন (দাদাভাই নৌরজীর নাতনী), মরিবেন (বল্লভভাই প্যাটেলের কন্যা), কমলা নেহেরু (জওহরলালের পত্নী), প্রভাবতী দেবী (সুভাষচন্দ্রের মাতা), সরোজিনী নাইডু-র ভূমিকা জাতীয় রাজনীতিতে বিশেষ করে স্মরণীয়। বাংলাতেও 'নারী সত্যগ্রহ কমিটি', 'রাষ্ট্রীয় মহিলা সংঘ' এবিষয়ে সক্রিয় ছিল ঊর্মিলা দেবী, লতিকা ঘোষ, জ্যোর্তিময়ী গাঙ্গুলী, হেমপ্রভা দাশগুপ্ত, আশালতা দাস, নেলী সেনগুপ্ত, হেমপ্রভা মজুমদার প্রমুখ নেতৃত্বদানকারী মহিলাদের শিক্ষা-চেতনা-সামাজিক অবস্থান ও প্রতিষ্ঠা ছিল অত্যন্ত উন্নত স্তরের। তাঁরা চেষ্টা করতেন সমাজের ব্যাপক অংশের মহিলাদের জাতীয় আন্দোলনের স্রোতধারায় সামিল করতে।[১০] কিন্তু কাজটা মোটেই

সহজ হয়নি প্রস্তুত 'বিয়াল্লিশের ভারত ছাড়ো আন্দোলনের' আগে পর্যন্ত। ১৯৪২-এর সর্বপ্রথম সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণসংগ্রামের উত্তাল তরঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন মার্তাঙ্গনী হাজরা-র মতো পাড়াগাঁ-র মা-বোনেরা। সেদিন তাঁদেব কাছে কাঙ্ক্ষিত আর ১৯৩০-র মতো একমুঠো লবণ ছিল না, ছিল পরমপ্রার্থিত দেশের স্বাধীনতা।

এই কারণেই ১৯২৬ সালে জাতীয় কংগ্রেসের পৃষ্টপোষকতায় ১৯২৬ সালে যে 'নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলন (AIWC)' ১৯২৬ সালে গড়ে উঠেছিল বা পরবর্তীকালে সংগঠিত 'কংগ্রেস মহিলা সংঘ' (১৯৩৮)—এরা কেউই কিন্তু কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ নারীসমাজ, আদিবাসী ও শিল্পাঞ্চলের শ্রমজীবী নারীদের প্রতিনিধিত্ব- দানকারী ভূমিকায় সার্বজনীনভাবে কখনোই পৌঁছাতে পারেনি। তবে অভিজাত সুলভ দৃষ্টিভঙ্গি ও সেবামূলক চরিত্র কাটিয়ে উঠে রাজনৈতিক গণ সংগঠনে পরিণত হতে এঁদের চল্লিশের দশক পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

শ্রমিক আন্দোলনে বা ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের ক্ষেত্রে অবশ্য ত্রিশের দশক থেকেই কিছু মহিলা নেত্রীর অংশগ্রহণের প্রচেষ্টা ছিল উল্লেখযোগ্য। সন্তোষকুমারী দেবী, প্রভাবতী দাশগুপ্তা, সাকিনা বেগম, ডাঃ মৈত্রেয়ী বসু, সুধা রায় এবং বিমলপ্রতিভা দেবী-র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সমাজতান্ত্রিক চেতনায় এই শ্রমিক সংগঠনেব নেত্রীরা উদ্বুদ্ধ হলেও এবং কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে কারো সম্পর্ক নিবিড় হলেও এঁদের কর্মসূচীর মধ্যে শ্রেণী সংগ্রামের বলিষ্ঠতার স্থলে প্রায়শই সেবাব্রতে দীক্ষিত একধরনের মিশনারী ঝোঁক যেন দেখা যেত। অধ্যাপিকা মঞ্জু চট্টোপাধ্যায়-এর সঙ্গে এ প্রসঙ্গে অবশ্যই সহমত পোষণ করা উচিত যে তৎকালীন নারী আন্দোলনের অন্যান্য ক্ষেত্রের তুলনায় ট্রেড ইউনিয়ন নেত্রীদের রাজনৈতিক প্রয়াসে উন্নত চেতনার স্বাক্ষর ছিল প্রদীপ্ত। তবে আলম বাজারের দুখমৎ দিদিরা ছিলেন সেই শ্রমিক নেত্রী যারা কমিউনিস্ট শ্রেণী রাজনীতির প্রত্যক্ষ সন্তান।[১১]

১৯৩০-এর দশকের ঔপনিবেশিকতা বিরোধী আন্দোলনের অপর ধারাটি অর্থাৎ জাতীয় সশস্ত্র বিপ্লববাদী (বা তৎকালীন সরকারি পরিভাষায় 'সন্ত্রাসবাদী') আন্দোলনেও যোগদান করেছিলেন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের বেশ কিছু তরুণী। এঁরাই সক্রিয় ছিলেন বিশ ও ত্রিশ দশকের ছাত্র সংগঠনগুলিতেও। ১৯৩০ সালের পর গান্ধী ও জাতীয় কংগ্রেস নেতৃত্বর আপোষ নীতি স্বাধীনতাকামী রাজনীতি সচেতন এই শিক্ষিত তরুণীদের সশস্ত্রবিপ্লববাদী সংগঠনে ঝাঁপিয়ে পড়তে অনুপ্রাণিত করেছিল। ১৯৩০ সালে চট্টগ্রাম যুববিদ্রোহের পরেই ১৯৩২-এ শহীদ হয়েছিলেন প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার। এই সময়েই হাতে ব্রিটিশ নিধনকারী রিভলবার তুলে নিয়ে ছিলেন শান্তি ঘোষ, সুনীতি চৌধুরী, কল্পনা দত্ত, বীণা দাস, উজ্জ্বলা মজুমদার, কমলা চ্যাটার্জী প্রমুখ বীরনায়িকারা। কিন্তু গণসংগঠন বা নারী আন্দোলন গড়ে তোলা

এঁদের রাজনৈতিক কর্মসূচীতে ছিল না।[১২] উপরন্তু হাতে অস্ত্র তুলে নিলেও 'সন্ত্রাসবাদী' গোষ্ঠীগুলিতে পুরুষতন্ত্র বা পুরুষপ্রাধান্য বজায় ছিল। বিশের দশকে তো অনুশীলন-যুগান্তর গোষ্ঠীরা মেয়েদের দলে ঢুকতেই দিতে চায়নি ব্যাতিক্রমী দৃষ্টান্ত ছাড়া। ত্রিশের দশকেও কোনো কোনো নেতার মনোভাব ছিল মেয়েদের 'ব্যবহার' করার দিকে, তাঁদের সংগ্রামের সাথী করার দিকে নয়। প্রয়াত শ্রমিক নেতা মনোরঞ্জন রায়ের পর্যবেক্ষণ এদিক থেকে সঠিক বলেই মনে হয়।[১৩] রবীন্দ্রনাথের মতো স্পষ্ট করে আর কেইবা দেখাতে পেরেছেন যে 'বিপ্লববাদী' দলগুলিতে মেয়েদের কোন্ চোখে দেখা হতো। 'চার অধ্যায়ে' অন্তুকে পাঠানো হয়েছিল এলাকে খুন করতে। 'ঘরে বাইরে'তে জাতীয়তাবাদী নেতার দ্বারা বিমলা কিভাবে ব্যবহৃত হয়েছিল তা মনে হয় রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা সত্যজিৎ রায়ই যথাযথভাবে প্রমাণ করতে পেরেছিলেন।

মোট কথা কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হবার বিভিন্ন ধারার আন্দোলনে নারী সমাজ সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করলেও যে দুর্বলতাগুলি তাদের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য ছিল সেগুলি হল :

(১) পরিণত রাজনৈতিক চেতনা ও শ্রেণীদৃষ্টিভঙ্গির অভাব
(২) ইস্যুভিত্তিক আন্দোলনে পথে নামলেও ধারাবাহিক গণসংযোগের অভাব এবং সর্বক্ষণের রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে কাজ না করা।
(৩) রক্ষণশীল ও পশ্চাদমুখী সামাজিক বন্ধনগুলির সঙ্গে আপোষ।
(৪) সামগ্রিকভাবে নারী আন্দোলনকে স্বতন্ত্র ও স্বাবলম্বী গণভিত্তিক আন্দোলন রূপে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা বা অনীহা।

বাংলার শিক্ষিতা মেয়েদের কমিউনিস্টদের আদর্শে দীক্ষিত হওয়ার পর্বান্তরটি ঘটে বামপন্থী ছাত্র আন্দোলনের মাধ্যমে। ১৯৩৬ সালে গঠিত নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন প্রধানত পরিচালিত হতে থাকে কমিউনিস্ট ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ তরুণ ছাত্রদের উদ্যোগে। জওহরলাল নেহেরু-র সমাজতন্ত্র-র স্বপক্ষে উচ্চকণ্ঠ, রবীন্দ্রনাথের 'রাশিয়ার চিঠি' এবং ব্রিটিশ সেন্সর ব্যবস্থার ছিদ্রপথে আসা রাশিয়ার শ্রমিকরাজের সংবাদ, কৃষক ও নারী সমাজের মধ্যে জাগরণ-এর বার্তা বাঙলা তথা ভারতের মেয়েদেরও জাগিয়ে তুলেছিল নতুন ভাবনায়। এই ভাবনার সঙ্গে জাতীয় কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী আবেদন-নিবেদন নীতি কিংবা অনুশীলন-যুগান্তর-শ্রী সংঘ-র ব্যক্তি সন্ত্রাসের রাজনীতির কোনো মিল নেই। ছাত্রসমাজের পাশাপাশি তাই বাংলার ছাত্রীরাও 'গণবিপ্লব' এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে নিজেদের স্বতন্ত্র গণসংগঠন গড়ে তোলার কাজে উদ্যোগী হয়। ১৯৩৯ সালে বাংলার বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের নিয়ে একটি ছাত্রীসঙ্ঘ বা Girl-Students Association গড়ে ওঠে। ছাত্র

ফেডারেশনের উদ্যোগে বিভিন্ন রাজনৈতিক পার্টির মেয়ে কর্মীরাও সমাজতান্ত্রিক আদর্শবোধ নিয়েই মিলিত হন ছাত্রীদের মধ্যে সংগঠন গড়ে তুলবার কাজে।

কমিউনিস্ট পার্টির কনক দাশগুপ্ত (মুখার্জী), শান্তি সরকার (বসু), কল্যাণী মুখার্জী (কুমারমঙ্গলম), চিনু ঘোষ, প্রীতি লাহিড়ি (ব্যানার্জি); লেবর পার্টির উমা ঘোষ, গীতা ব্যানার্জী (মুখার্জী), কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির অণিমা ব্যানার্জী (চক্রবর্তী); রায়বাদী পার্টির শোভা মজুমদার (গাঙ্গুলি) প্রমুখকে নিয়ে প্রথম গার্ল স্টুডেন্টস এ্যাসোসিয়েসন-এর কমিটি গঠিত হয়। কনক মুখার্জী তার প্রথম সম্পাদিকা হন। পরবর্তীকালে শান্তি সরকার, কল্যাণী মুখার্জী ও অলকা চট্টোপাধ্যায় পর পর সংঘঠনের সম্পাদিকা হয়েছিলেন। বাংলার মতো রাজনীতিতে অগ্রগণ্য দুটি প্রদেশ বোম্বাই এবং পাঞ্জাবেও গার্ল স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন গড়ে উঠেছিল যথাক্রমে কমিউনিস্ট ছাত্রীনেত্রী নারগিস বাটলিওয়ালা ও পেরিন ভারুচার নেতৃত্বে। বলা বাহুল্য কমিউনিস্ট প্রভাবিত নারী আন্দোলন বা মহিলা সমিতির সংগঠনে প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন ছাত্রীসংঘর ছাত্রী তরুণীরা যারা মার্কসবাদ-লেনিনবাদে দীক্ষিত একটি সঙ্ঘবদ্ধ রাজনৈতিক শক্তিরূপে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল।[১৪]

আমার অনুসন্ধানের দ্বিতীয় পর্ব বা প্রশ্নটির উত্তর খোঁজার প্রয়াস এখান থেকেই শুরু। যে সকল মেয়েরা কমিউনিস্ট আন্দোলনের ধারায় নিজেদের সামিল করলেন তাদের যে সামাজিক রক্ষণশীলতার প্রাচীরের সম্মুখীন হতে হয়েছিল তার চরিত্র কংগ্রেসে বা সশস্ত্রবিপ্লববাদী সংগঠনে অংশ্রগ্রহণকারী মেয়েদের তুলনায় কিঞ্চিৎ কঠিনই ছিল।

১. প্রথম সামাজিক বাধাটি ছিল আদর্শগত। কমিউনিজম্, মার্কসবাদ, লেনিনবাদ, বলশেভিক, বিপ্লবী রাশিয়া শব্দগুলিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এমন ভয়ঙ্কর-ভয়াল রূপে চিত্রিত করতো তা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারে রীতিমতন আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল। অভিভাবকরা মনে করতেন কমিউস্টদের সঙ্গে মিশে তাঁদের বাড়ির মেয়েরা বোধ হয়, জাতধর্ম সবই হারাতে বসেছে। বিশেষ করে কমিউনিস্টরা ধর্ম মানে না, নারীদের তারা সামাজিক সম্পত্তি বলে মনে করে, রাশিয়ায় কমিউনিজমের নীতি অনুযায়ী 'নারীপুরুষের যথেষ্ট যৌন স্বেচ্ছাচার' চলে ইত্যাদি কুৎসা ও অপপ্রচারের সম্মুখীন হতে হতো কমিউনিস্ট নারী কর্মীদের।

২. শ্রমিক কৃষক বা সর্বস্তরের অর্থনৈতিক শ্রেণীভুক্ত নারীদের মধ্যে মতাদর্শগত প্রচার করতে গিয়ে কমিউনিস্ট ছাত্রী বা মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সংগঠকদের ব্যাপকভাবে জেলায় জেলায় ও নগর কলকাতার বিভিন্ন প্রান্তে ট্রামে, বাসে বা পদব্রজে চলাচল করতে হতো। এটা ছিল সারা বৎসরের একটা রুটিন ওয়ার্ক। কংগ্রেস-এর ইস্যুভিত্তিক আন্দোলনে বা সশস্ত্র

জাতীয়বাদীদের ব্যক্তি প্রচেষ্টামুখী সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী মহিলাদের এইভাবে দৈনন্দিন সাংগঠনিক কাজে সম্বৎসর সতত সচলতা নিয়ে সাধারণভাবে অংশগ্রহণ করতে হতো না। কমিউনিস্ট নারী কর্মীরা এর ফলে অনেক সময়ে সামাজিক লাঞ্ছনার শিকার কিংবা ব্যক্তিগতভাবে নিন্দিত হতেন। এমনকি আজ ভাবলে শিউরে উঠতে হয় যে তাদের 'সতীত্ব' নিয়েও এক শ্রেণীর বিকৃত রুচির কুচক্রী প্রশ্ন তুলতে পিছপা হতো না।[১৫]

৩. কমিউনিস্ট বিরোধীরা জনমানসে কমিউনিস্ট পার্টি ও তার নেতৃত্বে পরিচালিত মহিলা ফ্রন্টে কর্মরতা কমিউনিস্ট মহিলাদের হেয় করার জন্য উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে কুৎসা রটাতো। তারা এটা এই কারণে করতে পারতো যে তখনও মেয়েদের ঘরের বাইরে বেরিয়ে এসে হোস্টেলে বা পার্টি কমিউনে বসবাস করে রাজনীতি করার ঘটনা ছিল খুবই বিরল ও অভাবনীয়। গান্ধী চরকাকেন্দ্রিক যে আশ্রমগুলি গড়ে তুলেছিলেন সত্যাগ্রহী মেয়েদের থাকার জন্য—সেখানে একটি ধর্মীয় বাতাবরণ সৃষ্টি করার ফলেই হোক বা জাতীয়তাবাদী আবেগের জন্যই হোক—তা নিয়ে খুব বেশি প্রশ্ন উঠতে দেখা যায় না। কিন্তু কমিউনিস্ট মেয়েরা অনেকে সম্ভবত তাঁদের পুরুষ কমরেডদের বিবাহ করে তিন চারটি সংসার এক হাঁড়িতে রান্না অন্নগ্রহণের জন্যই কুৎসাকারীদের পক্ষে সুবিধা হয়ে গিয়েছিল। ভারতবর্ষীয় সনাতন সমাজের মধ্যে এই কমিউন প্রথা নিয়ে অপপ্রচার চালানোর অবশ্য ১৯৪৩ সালে বাঙলার মহামন্বন্তরে ঘর-বার যখন সব একাকার হয়ে গেল, কুলবধূর লাজলজ্জা, সমস্ত আব্রু যখন নিষ্ঠুরভাবে খসে গেল সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের দানবীয় থাবায়, তারপরে অবশ্য এই কুৎসা-অপপ্রচার আর খুব বেশি দানা বাঁধতে পারেনি যুগ পরিবর্তনের চাপেই। সনাতন সমাজ তখন দু'হাতে অনেক কদর্যতার, অনেক গ্লানির পঙ্কই ঘেঁটে ফেলেছে।[১৬]

এবার শেষপর্যায়ে প্রথম ও সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটির উত্তর খোঁজার প্রয়াস নেওয়া যেতে পারে। স্পষ্টতই বলা চলে ঔপনিবেশিক বাংলায় কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে নারীসমাজকে সংগঠিত করার যে উদ্যোগ চলছিল তার ভিত্তিই ছিল শ্রেণী রাজনীতি। যদিও সাম্রাজ্যবাদী শাসন থেকে মুক্তি লাভ ও জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি' সহ কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত নারী (ছাত্রীসহ) আন্দোলনেরও অন্যতম প্রধান ও আশু লক্ষ্য ছিল, কিন্তু চরম উদ্দেশ্যরূপে মহিলা নেত্রীবৃন্দ দেশের শ্রমজীবী, কৃষক, নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মেয়েদের মধ্যে ধারাবাহিকভাবে সমাজতান্ত্রিক আদর্শবোধ ও গণবিপ্লবের রাজনৈতিক চেতনাই সঞ্চার করতে প্রেরণা দিয়েছেন। এক্ষেত্রে সাধারণ ঘরের

মেয়েদের কাছে পৌঁছানোর প্রতিযোগিতায় কমিউনিস্ট মহিলা নেত্রীরা সি.এস.পি; আর.এস.পি; ফরোয়ার্ড ব্লক; রায়বাদী; আর.সি.পি.আই প্রভৃতি অন্যান্য বামপন্থী রাজনৈতিক দলের মহিলা কর্মীদেব অপেক্ষা অধিক সফল বলেই মনে হয়। কমিউনিস্ট ছাড়া অন্য পার্টির নারী কর্মীরা অনেকেই (এবং মহিলা কংগ্রেসের অনুগামীরাও) ১৯৪২-এব ভারত ছাড় আন্দোলনে ব্যাপক মহিলাদের অংশগ্রহণ ঘটাতে পারলেও কমিউনিস্ট নারীকর্মীরাও 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'র নিশান ও কর্মসূচীর (দুর্ভিক্ষত্রাণ, ফ্যাসিস্ত বিরোধী প্রচার, নারীদের আত্মরক্ষা ও অধিকার অর্জনের সংগ্রাম) নীচে ব্যাপকতর মহিলাদেরই সমবেত করতে পেরেছিল।

জাতীয় কংগ্রেসের আহ্বানে তিন দশকের তিনটি আন্দোলনে (১৯২০-অসহযোগ; ১৯৩০-আইন অমান্য; ১৯৪২—ভারত ছাড়ো) ক্রমান্বয়ে নারী সমাজের এবং নীচুতলার অংশগ্রহণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হযেছিল সন্দেহ নেই—কিন্তু তাদের ধারাবাহিক রাজনৈতিক কর্মসূচী এবং নারীর অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার (আজকের 'ফেমিনিস্ট' আন্দোলন নয়) সংগ্রামে অংশগ্রহণ করানোর ক্ষেত্রে 'মহিলা কংগ্রেসের ভূমিকা তেমন উজ্জ্বল নয।

ছাত্র-ফেডারেশনের উদ্যোগে ১৯৪০-এর জানুযারিতে লক্ষ্ণৌ শহরে যে সারা ভারত ছাত্রী সম্মেলন হয সেই সম্মেলনে সরোজিনী নাইডু হন প্রধান অতিথি এবং লন্ডন থেকে সদ্য কমিউনিজমে দীক্ষিত হয়ে আসা রেণু রায় (চক্রবর্তী) সভানেত্রী হন। লক্ষ্ণৌ ছাত্রী সম্মেলনের বিশেষ উল্লেগযোগ্য বিষয় এই ছিল যে এখানে শুধু ছাত্রীদের দাবি-দাওয়া, শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ই আলোচিত হয়নি, সমাজে নারী পুরুষের বৈষম্য, বিবাহ ও বিবাহ-বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমান অধিকার, সর্বক্ষেত্রে নারীর আইনত সমান অধিকার প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির পরেও আলোচনা হয় ও প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।[১৭]

ছাত্রীসংঘর এই সংগঠকরাই পরবর্তীকালে 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'র অন্যতম প্রধান সংগঠক রূপে জেলায় জেলায় নারী অধিকার অর্জনের সংগ্রামকে জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন ও ফ্যাসিবাদ বিরোধী সংগ্রামের সঙ্গে মিলিয়ে এক ব্যাপক মাত্রা যুক্ত করতে পেরেছিল। কমিউনিস্ট নারী আন্দোলনের এই অগ্রগতি ও যুগোপযোগী দায়বদ্ধতা বহু অকমিউনিস্ট এমনকি কমিউনিজম বিরোধী মহিলা সংগঠনের কর্মীকেও ব্যক্তিগত পর্যায়ে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে পেরেছিল। তাই দেখা যায় বরিশালের মনোরমা মাসীমার মতো সর্বজন শ্রদ্ধেয়া সেবাব্রতী, কিংবা ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, নেলী সেনগুপ্তা, রাণী মহলানবীশ, এলা রীড, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, মঞ্জুশ্রী দেবী-র মতো বিদুষী মহিলা বা জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলি বা বিমল প্রতিভা দেবীর মতো রাজনৈতিক নেত্রীরাও প্রত্যক্ষভাবে কমিউনিস্ট নারী আন্দোলনের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে চলতেন।

বস্তুতপক্ষে ১৯৪২-এর ১৩ এপ্রিল কলকাতায় কমিউনিস্ট পার্টির মহিলা কর্মীদের উদ্যোগে, ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট লাইব্রেরি হলে মহিলাদের যে সর্বদলীয় সভা থেকে (মূলত তা ছিল ফ্যাসিবাদ বিরোধী মঞ্চ) 'কলকাতা মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি গঠিত হয় এলা রীডকে আহ্বায়িকা করে [কার্যকরী কমিটির অন্যান্য সদস্যারা ছিলেন জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলি, সাকিনা বেগম, রেণু চক্রবর্ত্তী, সুধা রায়, মণিকুন্তলা সেন, নাজিমুন্নেসা আহমেদ, বিয়াট্রিস টেরান, অপর্ণা সেন, ফুলরেণু দত্ত (গুহ)] মাত্র ১ থেকে ২ বছরের মধ্যে তা বাংলার জেলায় জেলায় প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়েছিল। শহরে নিম্ন-মধ্যবিত্ত এবং গ্রামাঞ্চলে কৃষক রমণীদের ব্যাপক অংশের সমাবেশ এই সংগঠনে ঘটেছিল প্রধানত আত্মউৎসর্গকারী একদল পরিশ্রমী কমিউনিস্ট নারী সংগঠকের প্রচেষ্টায়। ১৯৪৩ সালের মে মাসের মধ্যেই এই সংগঠনের সদস্য সংখ্যা প্রায় ২৫ হাজার হয়। বাংলার বাইরে মালাবার ও অন্ধ্রেও বিপুল সংখ্যায় কৃষক রমণী 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'র সদস্য হয়েছিলেন।[১৮]

বলাবাহুল্য কমিউনিস্ট পার্টির সব থেকে শক্তিশালী গণসংগঠন চল্লিশের দশকে (শ্রমিকদের পরেই) ছিল মহিলা সংগঠন। জনযুদ্ধর যুগে কমিউনিস্ট পার্টি সারা দেশে যখন জাতীযতাবাদী আবেগের তীব্র চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন, তার জনপ্রিয়তায় যখন ভাঁটার টান তখন তার মহিলা সংগঠন কিন্তু জনপ্রিয়তার শীর্ষচূড়ায় আসীন। শুধু ত্রাণকার্য চালিয়ে এটা অর্জন করা সম্ভব ছিল না। প্রকৃতপক্ষে গ্রাম শহরের সাধারণ মেযেদের অবরুদ্ধ চেতনার দ্বারটিকে মুক্ত করে দিতে পেরেছিলেন কমিউনিস্ট নারী সংগঠকরা—তাদের বাঁচার, অধিকার অর্জনের পথ চিনিয়ে ছিলেন, নেতৃত্ব দিতে পেরেছিলেন বলেই কমিউনিস্ট পার্টির পরিচালিত নারী আন্দোলনের সংগঠিত শক্তি অন্য যে কোনো রাজনৈতিক দল অপেক্ষা ছিল অধিক।[১৯]

'নারী সেবা সঙ্ঘ' গড়ে সমাজের উচ্চ ও অভিজাত শ্রেণীর মহিলাদের সহযোগিতায়। একদিকে যেমন শহর অঞ্চলে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি সক্রিয় ছিল, তেমনি এর গণভিত্তি প্রসারিত ছিল জেলার গ্রামঞ্চলগুলিতে সাধারণ কৃষক মহিলাদের মধ্যে। বিশেষ করে ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষর (পঞ্চাশের মন্বন্তর) পর অন্নহীন বস্ত্রহীন গ্রামীণ কৃষক রমণীদের অত্যন্ত আপনাব সংগঠন ও আশ্রয় ছিল 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'। এই প্রসঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্রে প্রকাশিত "১০,০০০ নর-নারীর খাদ্য সম্মেলন" শীর্ষক রিপোর্টের বর্ণনা উল্লেখ্য:" ২০ শে জুন (১৯৪৩) রবিবার। হাজার হাজার বুভূক্ষু নারী কলিকাতা টাউন হলের দিকে চলিয়াছে। কলিকাতার সমস্ত অঞ্চলের বস্তি হইতে মেয়েরা আসিতেছে। আশেপাশের গ্রাম হইতে মেয়েরা আসিতেছে। টুপটাপ বৃষ্টি পড়িতেছে, তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই......টাউন হলে বসবার তিলমাত্র স্থান নাই। বাইরের প্রাঙ্গণে

জনসমুদ্র, জনতার ঢেউ রাস্তায় আসিয়া পড়িয়াছে। শত শত মেয়ে-পুরুষ ভলান্টিয়ার শৃঙ্খলা রাখিতেছে।[২০]

বস্তুতপক্ষে বাংলার সেই তীব্র খাদ্য সংকট, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর বিরুদ্ধে ১৪টি মহিলা সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে সংযুক্ত রিলিফ কাজের জন্য গঠিত 'বেঙ্গল উইমেন্স ফুড কমিটি'র প্রদান সংগঠন ছিল মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি। তবে সমিতির এই গণমুখী ঝোঁককে এক শ্রেণীর সমিতির নেত্রী স্থানীয় এলিট মানসিকতার মহিলার তেমন পছন্দ ছিল না। কৃষক ও শ্রমজীবী নিম্নবর্ণ ও বিত্ত-ব মেয়েদের নিয়ে মাতামাতি এই উন্নাসিক মহিলারা পছন্দ করতেন না। তাই দেখা যায় ১৯৪০ সালে নারী সংগঠনের ব্যাপক বিস্তৃতির জন্য গ্রামে গ্রামে শাখা ও পাড়া কমিটি গঠন করার ও বার্ষিক মাত্র ১ আনা সদস্যা চাঁদার প্রস্তাব আনা হলে সমিতির অনেক নেত্রীস্থানীয় মহিলাই সংগঠন ছেড়ে দেন সাধারণ নারীদের কাছে নেতৃত্ব হারানোর ভয়ে।[২১] বস্তুতই জেলায় জেলায় কমিউনিস্ট মহিলা সংগঠকদের যে পরিচয় সরোজ মুখার্জ্জী ও কনক মুখার্জ্জী দিয়েছেন তাতেই দেখা যায় একদিন যে সংগঠন শিক্ষিতা সম্পন্ন মহিলাদের নেতৃত্বে অভিজাত অন্দরমহলে শুরু হয়েছিল তার গণভিত্তি গ্রাম শহরের পর্ণকুটিরে (এমনকি শহর কলকাতার ফুটপাতের ঝুপড়িতে) পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে। সাধারণ ঘরের মেয়েদের রাজনীতি সচেতন, আত্মনির্ভর, স্বাবলম্বী করে তুলেছে। মূল ধারার জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত নারী সংগঠনের সঙ্গে, কমিউনিস্ট নারী আন্দোলনের পার্থক্য এখানেই।

মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির মাধ্যমে বাঙলার কমিউনিস্টরা গ্রামাঞ্চলে কৃষক রমণীদের রাজনৈতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার অর্জনের চেতনা ও দাবিকে কতদূর পর্যন্ত উন্নীত ও সংগঠিত করতে পেরেছিল তার প্রমাণ ইতিহাস সৃষ্টিকারী তেভাগা কৃষক আন্দোলন। পিটার কাস্টার্স এ বিষয়ে পৃথক গবেষণা করেছেন মহিলাদের ভূমিকা নিয়ে।[২২] তাঁর মতে ১৯৪৬—৪৯-এর তেভাগা কৃষক সংগ্রামের প্রধানতম সংগ্রামী ব্যক্তিরূপে কাজ করেছে কৃষক রমণী। তবে কৃষক বা কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা এ প্রসঙ্গে কিছুটা মেনে নিলেও এ্যাড্রিয়েন ক্যুপার[২৩] তেভাগা আন্দোলনের কৃষকদের একটি স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ রূপে দেখিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির সামন্ততন্ত্র ও ঔপনিবেশিকতাবিরোধী সংগ্রামকে প্রায় উপেক্ষাই করেছেন যা ইতিহাসের সঠিক বিচার নয়। এ বিষয়ে বিনয়ভূষণ চৌধুরী অন্যত্র বিস্তারিত সমালোচনা করেছেন।

বস্তুত ঔপনিবেশিক বা স্বাধীন ভারতে কমিউনিস্ট নেতৃত্বে পরিচালিত কৃষক সংগ্রামগুলিতে তা বাংলা-অন্ধ্র-মণিপুর-মালাবার যেখানেই হোক না কেন—পুলিশ ও সশস্ত্র রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলনকে রক্ষার প্রশ্নে বীরাঙ্গনা কৃষক রমণীরাই

সবসময়ে বন্দুকের নলের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। এ এক অভূতপূর্ব শ্রেণীচেতনা যা কমিউনিস্ট আন্দোলনেরই ফলশ্রুতি। জমির লড়াই—ফসলের লড়াইয়ে ১৯৪৭ থেকে '৪৯ সালের মধ্যে অসংখ্য নারীকৃষক পুলিশ জোতদার জমিদারের অস্ত্রাঘাতে শহীদ হয়েছিলেন। দিনাজপুরের খাঁপুর হাজং অঞ্চল, কাকদ্বীপ চন্দনপীড়ি, হাওড়ার আন্দুল এমন অনেক শহীদ ক্ষেত্রের মাত্র কয়েকটি যেখানে কৃষক মা-বোন-অন্তঃসত্ত্বা রমণী পুলিশের বেয়নেটে জীবন দিয়েছিলেন। ব্রিটিশরাজ বাংলায় আর ক'জন মাতঙ্গিনী হাজরার জীবন নিয়েছিল! স্বাধীনভারতে কংগ্রেসরাজ এমন কত মাতঙ্গিনীর রক্ত ঝরিয়েছে। 'গণআন্দোলন' কার্যত জাতীয় কংগ্রেসেব কর্মসূচীতে কতকগুলি অর্থহীন ফাঁকা শব্দ মাত্র ছিল। গান্ধীসহ কংগ্রেসের বুর্জোয়া নেতৃত্ব গণআন্দোলন তৈরি করতো যাতে ঔপনিবেশিক শক্তি সঙ্গে দরকষাকষিতে সুবিধাজনক অবস্থান নেওয়া যায়। ১৯২০, ১৯৩০, ১৯৪৬ একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। অর্থাৎ জনগণ বিপ্লবমুখী হলেই সন্ত্রস্ত মধ্য ও দক্ষিণপন্থী প্রভাবিত কংগ্রেস নেতৃত্ব তার কণ্ঠরুদ্ধ করেছে। শুধুমাত্র ১৯৪২ সালের আন্দোলনকেই স্বতঃস্ফূর্ততার উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। কিছুটা রাজনৈতিক কৌশলের খাতিরে আর বেশির ভাগটাই এই আন্দোলনের নেতৃত্ব কংগ্রেসের হাতের বাইরে চলে গিয়েছিল বলে।

১৯৪৬ সালে যখন বাংলা তথা ভারতবর্ষের গণজাগরণ শুধুমাত্র ইঙ্গিতের আর নেতৃত্বের অপেক্ষায় তখন কংগ্রেস নেতৃত্ব হাত গুটিযে বসে। কমিউনিস্টদের সেই সংগঠনী শক্তি ছিল না যাতে তারা দেশব্যাপী গণসংগ্রাম পরিচালনা করতে পারে। তবুও কলকাতার রাজপথে রশিদ আলি দিবসে, আই-এন-এ সেনানীদের মুক্তির দাবিতে, ডাক ও তার ধর্মঘটের সমর্থনে, নৌবিদ্রোহীদের সমর্থনে যেটুকু দাপাদাপি তা অন্যান্য বামপন্থী শক্তির সঙ্গে সুসংগঠিত শক্তিরূপে কমিউনিস্টরাই করেছিল। কমিউনিস্ট মেয়েদের ভূমিকা (বিশেষ করে ডাক ও তার ধর্মঘটে আকাশবাণী ভবনের সংগ্রাম) আজ ইতিহাস হয়ে গেছে। কমিউনিস্ট নেত্রী গীতা মুখার্জির মতে '৪৬-এই বোঝা গিয়েছিল নারীসমাজের শৃঙ্খল মোচনের আর দেরি নেই।

বস্তুতই রাজনৈতিক চেতনা ছাড়াও ঘরে বাইরে, শহর-গ্রামে সর্বস্তরের মেয়েদের মধ্যেই চারিত্রিকভাবে এমন বৈপ্লবিক কিছু পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল যা নিঃসন্দেহে কমিউনিস্ট নারী আন্দোলনের অবদান। প্রমথ গুপ্ত লিখেছেন, হাজং কন্যা সরস্বতীকে পুলিশ যখন গ্রাম থেকে তুলে নিয়ে যায় হাজং কৃষক রমণী রাসমণি ধারালো কাটারি হাতে ছুটে যায় এই কথা বলতে বলতে, 'ময় তিমাৎ, তিমাতের ইজ্জৎ রক্ষা করিব, নাতে মরিব, তরা নীতি লইয়া বইয়া থাক্।' রাসমণির শানিত অস্ত্রের আঘাতে ধর্ষক দুই পুলিশ কর্মীর বলি হল। গুলিতে প্রাণ দিলেন রাসমণি ও কৃষককর্মী সুরেন্দ্র।[২৪]

রেণু চক্রবর্তী লিখেছেন, "পশ্চিম ঠাকুরগাঁওয়ের আতোয়ারী গাঁয়ে সমিতির স্থানীয় অফিসে সাধারর সভা হচ্ছিল। সম্ভবত সেটা ১৯৪৪ সন। ভাষণ দিচ্ছিলেন সম্পাদক। তাঁর বক্তৃতার মাঝখানেই হঠাৎ যেন একটা বোমা ফাটল; স্থানীয় একজন কমরেডের স্ত্রী তাঁর স্থানীয় কথ্য ভাষায় বলে ওঠেন, "কোন আইনে বৌগরে মারন যায়, কও দেখি কমরেড। আমার মরদ আমারে মারব ক্যান্? আমি বিচার চাই।" স্ত্রীদের গায়ে হাত তোলা নিষেধ বলে সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তাব পাশ হয়ে গেল।"[২৫]

এইভাবে কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত নারী আন্দোলন নিরক্ষর কৃষিজীবী রমণীদের শুধু অর্থনৈতিক দাবি আদায়ের প্রেরণাই দেয়নি, তাঁদের মাথা উঁচু করে আত্মপরিচয় নিয়ে বাঁচতে, বাঁচার সংগ্রাম চালিয়ে যেতে শিক্ষা দিয়েছিল। আজকে নারী আন্দোলন সারা দেশে নানাভাবে বিস্তারলাভ করেছে, পৃথক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সন্দেহ নেই কমিউনিস্ট আন্দোলন এর পশ্চাতে অন্যতম প্রধান একটি ভূমিকা পালন করেছিল। কিন্তু বিদেশী গবেষকের এই প্রশ্ন বিশ্বের সকল প্রগতিশীল মানুষের মস্তিকেই ধাক্কা দিতে বাধ্য—"হোয়াই ডাজ্ মেল ড্যমিন্যান্স রিমেইন আনব্রোকেন্, ইন্ স্পাইট অব উ্যমেন'স্ ডেমনস্ট্রেটেড্ ক্যাপাসিটি টু অর্গানাইজ, স্ট্রাগল অ্যান্ড লীড?"[২৬]

সূত্র নির্দেশ ঃ

১. স্পেশাল ব্রাঞ্চ, ফাইল নং এস.আব-৫০৬/১৯৪২-পার্ট ৩
২. দেশ; কংগ্রেস শতবর্ষ সংখ্যা; কংগ্রেস ও নাবী আন্দোলন, বমা কুণ্ডু, পৃ. ৯৬।
৩. আব. কে. শর্মা, ন্যাশনালিজম, সোস্যাল বিফর্ম এন্ড ইন্ডিয়ান উ্যমেন, পৃ. ৮০।
৪. 'ভাবত ইতিহাসে নারী', বত্নাবলী চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, কে. পি. বাগচী প্রকাশিত সংকলন গ্রন্থে ভারতী রায়ের নিবন্ধ দ্রষ্টব্য।
৫. দ্রঃ সুমিত সরকার; 'স্বদেশী মুভমেন্টস্ ইন বেঙ্গল'।
৬. দেশ; কংগ্রেস শতবর্ষ সংখ্যা; পূর্বোক্ত প্রবন্ধ; পৃঃ ৯৮
৭. আর. কে. শর্মা-ব পূর্বোক্ত গ্রন্থ দ্রষ্টব্য; পৃ. ৬৬
৮. বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য রচিত 'সত্যাগ্রহস্ ইন বেঙ্গল' এবং শারদীয়া পরিচয়ে রচিত হিতেশরঞ্জন সান্যাল রচিত মহিষবাথান সত্যাগ্রহ সম্পর্কে বচিত সাক্ষাৎকার ভিত্তিক গবেষণা নিবন্ধ।
৯. টাইমস্ অব ইন্ডিয়া, ৮ মে, ১৯৩০
১০. দ্রষ্টব্য 'ভারত ইতিহাসে নারী', পূর্বোক্ত, কে.পি. বাগচী এবং কমল দাশগুপ্ত, 'স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙলার নারী'।
১১. শ্রমিক আন্দোলনে মহিলা নেত্রীদের ভূমিকা বিষয়ে মঞ্জু চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধগুলির জন্য দ্রষ্টব্য ইতিহাস অনুসন্ধান, পঃ বঙ্গ ইতিহাস সংসদের প্রকাশিত 'ইতিহাস অনুসন্ধান' খণ্ডগুলি।

১২ সশস্ত্র বিপ্লববাদে বাঙলার ছাত্রীদের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে (সুস্নাত দাশ এর নিবন্ধ দ্রষ্টব্য) বরুণ দে সম্পাদিত 'মুক্ত সংগ্রামে বাঙলার ছাত্রসমাজ' গ্রন্থে।

১৩. কল্পনা দত্ত লেখকের সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে 'মেয়েদের কমগুরুত্ব প্রদানে'র বিষয়টিকে (বিপ্লবী গোষ্ঠীতে) খেদ এর সঙ্গে উল্লেখ করেন। অধ্যাপিকা মঞ্জু চট্টোপাধ্যায়ও এবিষয়ে সহমত পোষণ করেন। প্রয়াত শ্রমিকনেতা মনোরঞ্জন রায় এক নিবন্ধে (দ্রঃ শারদ 'নিশান' ১৩৯৭) এ বিষয়ে লিখেছেন, "সূর্য সেন দ্বারা গঠিত চট্টগ্রামের বিপ্লবীদলে তদানীন্তন অন্যান্য বিপ্লবী দলের মতোই দলে কোনো মেয়েকে নেওয়া নিষিদ্ধ ছিল।" ইত্যাদি। এ সংক্রান্ত তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য সুস্নাত দাশের পূর্বোক্ত নিবন্ধের ফুট নোট নং ১০।

১৪. দ্রষ্টব্য— কনক মুখোপাধ্যায়, 'নারীমুক্তি আন্দোলন ও আমরা' এবং বেণু চক্রবর্তী, 'ভারতীয় নারী অন্দোলনে কমিউনিস্ট মেয়েরা (১৯৪০-৫০)'।

১৫. মনিকুন্তলা সেন এর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার জন্য দ্রষ্টব্য তাঁর রচিত স্মৃতিকথা 'সেদিনের কথা', নবপত্র।

১৬. পার্টি কমিউন ও তৎসংক্রান্ত সমস্যা উল্লেখ করেছেন সরোজ মুখোপাধ্যায়, 'ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা (১ম ও ২য)' গ্রন্থে।

১৭. কনক মুখোপাধ্যায় পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১৪

১৮/১৯. ১৯৪৫ এর নভেম্বর মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সদস্য ৩৫ হাজার হয়। দ্র. সরোজ মুখোপাধ্যায় পূর্বোক্ত গ্রন্থের ২য খণ্ড। জেলার সমিতির সাংগঠনিক বিবরণও এখানে পাওয়া যাবে।

২০. জনযুদ্ধ, ২৩ জুন, ১৯৪৩।

২১. 'একসাথে' সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা, বৈশাখ ১৪০১, জ্যোতি দেবীর স্মৃতিকথা।

২২. পিটার কার্স্টাস্, 'উমেন ইন দি তেভাগা আপরাইজিং', কলকাতা।

২৩. অ্যাড্রিয়েন কুপার্স, 'শেয়ারক্রপিং এ্যাণ্ড শেয়ার ক্রপার্স স্ট্রাগলস্ ইন বেঙ্গল (১৯৩০-৫০)', কলকাতা।

২৪. প্রমথ গুপ্ত, 'যে সংগ্রামের শেষ নেই', কলকাতা।

২৫. বেণু চক্রবর্তী পূর্বোক্ত গ্রন্থ।

২৬. পিটার কার্স্টাস্, পূর্বোক্ত গ্রন্থ।

বাঙালি নৌ-বিদ্রোহী বলাইচাঁদ দত্ত

সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়

সাল্টা ১৯৪৬। ভারতবর্ষেব পবিস্থিতি উত্তাল। একদিকে মহাযুদ্ধ শেষে দুর্ভিক্ষের কবাল ছাযা, অপরদিকে আজাদ হিন্দ ফৌজের বীর নাযকদের প্রকাশ্য বিচার দেশের পরিস্থিতিকে করে তুলেছিল অগ্নিগর্ভ। ভাবতীয সেনাবাহিনীতে তীব্র অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হযেছিল। এই অসন্তোষেব চরম বহিঃপ্রকাশ ঘটে ১৯৪৬-এ বোম্বাই-এর 'নৌ বিদ্রোহে'। '৪৬ এর ফেব্রুযাবি মাসে ভারতীয নৌবাহিনী বোম্বাই-এ এইচ. এম. আই. এস. "তলোযার", রযেল ইন্ডিযান নেভির সিগন্যাল স্কুলে চলছিল বিক্ষোভ।

সরকারীভাবে ১৮ই ফেব্রুযারি শুরু হলেও নৌ-বিদ্রোহের ক্ষেত্র প্রস্তুত হতে শুরু করেছিল আবও আগে থেকে। নৌ বিদ্রোহের পটভূমি অনুসন্ধানে আরও পিছনে ফেরা প্রযোজন।

জাপানীদের হাত থেকে রেঙ্গুন উদ্ধার করতে গিয়ে বর্মা ফ্রন্টে ব্রিটিশ 'আর. আই. এন.'-এব ভারতীয নৌ সেনারা আজাদ হিন্দ বাহিনীব বীরত্বের কথা জানে এবং তখনই তাদেব মনে প্রশ্ন জাগে, আমরা তো ভারতীয। পরাধীন ভারতীয়, কাদেব বিরুদ্ধে লডছি? কার হয়েই বা লড়ছি? ১৯৪৬-এ নেতাজীর আজাদ হিন্দ বাহিনীর তিনজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী শাহ নওযাজ খান, ধীলন এবং সেহগালের প্রকাশ্যে বিচারের প্রতিবাদে এই উপমহাদেশে প্রবল গণবিক্ষোভের যে জোয়ার উঠেছিল তারই প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি হল নৌ-বিদ্রোহ। '৪৬-এর ১৮ই ফেব্রুয়ারি এই বিদ্রোহেব সূচনা বোম্বাই-এ হলেও তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে করাচি, কলকাতা, মাদ্রাজ, বিশাখাপত্তনমে। শ্রমিক-কৃষক সাধারণ মানুষ বন্ধ, হরতাল, ব্যারিকেডের মাধ্যমে কলকাতা, পাটনা, এলাহাবাদ, দিল্লী, লাহোর, পেশোয়ার, করাচি প্রভৃতি শহরে জনতার সঙ্গে পুলিশ সৈন্য বাহিনীর সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন সৃষ্টি করে এক গণঅভ্যুত্থান।

বার্মা ফ্রন্ট থেকে ফিরে আসা নৌ-সেনা বলাইচাঁদ দত্ত 'আই. এন. এ.'-র আদর্শে অনুপ্রাণিত হযে ব্রিটিশ নৌ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র "তলোয়ার" জাহাজে গোপনে এক সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন। বলাইচাঁদ দত্ত ছিলেন "তলোয়ার" জাহাজের একজন সাধারণ "ওয়ারলেস টেলিগ্রাফিস্ট"—বাড়ি বর্ধমান জেলার রায়না থানার মেড়াল গ্রামে। একটি সাক্ষাৎকার বলাইচাঁদ দত্ত বলেছেন, "আমরা কয়েকজন করে একটি গ্রুপে থাকতাম এবং যার কাছে গোপন তথ্য পাওয়া যাবে বুঝতাম

তার সঙ্গে বেশি বেশি করে মিশতাম। তাকে ড্রিঙ্কস দিতাম। আমরাও নিতাম। দলের মধ্যে দু-একজন ড্রিঙ্ক করত না; তারা গোপন তথ্য নোট করত। আমরা খুব গোপনে এবং নানা কলাকৌশলে মিটিং করতাম। ওরা আমাদেব নেতা ধরার চেষ্টা করত। কিন্তু কোনও হদিস পেতনা। আমাদেব মধ্যে কঠিন শৃঙ্খলাবোধ ছিল। কোথা থেকে ঘটনার সূচনা হচ্ছে, কারা নেতৃত্ব দিচ্ছে তাও তারা ধরতে ব্যর্থ হতো। আমরা বলেছিলাম আমরা দেশীয় নেতা ছাড়া কারও নির্দেশ মানব না।'

বলাইচাঁদ দত্ত ১৯২৩ সালের ২৩শে আগস্ট জন্মগ্রহণ কবেন। তাঁর পিতার নাম ৵প্রফুল্লচন্দ্র দত্ত রায় ও মাতার নাম বিজনবালা দেবী। বলাইচাঁদ দত্ত পিতামাতার চতুর্থ সন্তান। তাঁব প্রাথমিক পড়াশুনো মেড়ালের এম. ই. স্কুলে। পরে মেমারী স্কুল থেকে পাশ করে এই সদ্যযুবক পা বাড়ান অজানার উদ্দেশ্যে। প্রথমে যান পাটনা। সেখানে টেলিগ্রাফি সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করেন ও পবে Royal Indian Navy-তে টেলিগ্রাফিস্টের চাকুরি গ্রহণ করেন। নৌ বাহিনীর পাঁচ বছরের চাকরিতে নানা দেশ পরিভ্রমণের মধ্যে একটি জিজ্ঞাসা তাঁকে উদ্বেলিত করে তোলে। সেই জিজ্ঞাসা হল কেন আমরা পরাধীন? সর্বোপরি আজাদ হিন্দ ফৌজের কীর্তিকলাপ ও নেতাজীর কার্যাবলী ঘৃতাহুতি দেয় তাঁর বিপ্লবী চেতনায়। '৪৬ সালের ১৫—১৮ই ফেব্রুযারি ঐ সময়টার মধ্যে "তলোয়াব" জাহাজে ছিল ৭০০ জন কমিউনিকেশান রেটিং; ৩০০ জন ড্রাফট রিজার্ভ। এদের মধ্যে কিছু রেটিং ছিল 'ডিমব'-এব অপেক্ষায। '৪৫ সালের নভেম্বরের প্রথমদিকে "তলোয়ারের" বিভিন্ন জায়গায় রাজনৈতিক ও ব্রিটিশ বিবোধী স্লোগান দেখা যায়। এইগুলি আবার দেখা যায ১লা ও ২রা ফেব্রুয়ারি। ১৯৪৫ সালের ১৭ই ডিসেম্বর নৌ-বাহিনী দিবসে, R.I.N.-এর সর্বাধিনায়ক যে মঞ্চে দাঁড়িয়ে সেনাদের কাছে থেকে অভিবাদন গ্রহণ করবেন সেখানে ভারত ছাড়ো ও 'জযহিন্দ' এই কথা দুটি নির্ভীকচিত্তে লেখেন বি. সি. দত্ত। এর জন্য তাঁকে শাস্তি পেতে হয় ১৭ দিনের নির্জন কাবাবাস। ৮ই ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬, তলোযার জাহাজের রেটিংরা ব্ল্যাকবোর্ডে নেতাজীর ছবি এঁকে তার নীচে 'জয়হিন্দ' ও 'ব্রিটিশ তুমি ভারত ছাড়ো' লিখে রাখায় কমাণ্ডার অফিসার কমোডর কিং তাদের গালিগালাজ করেন এবং দলনায়ক বলাই দত্তকে বরখাস্ত ও গ্রেপ্তার করেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বি. সি. দত্তের মুক্তির দাবিতে কমান্ডিং অফিসারের গাড়িতে স্লোগান লেখা দেখা যায়।

রেটিংরা ১৮ ফেব্রুয়ারি R.I.N. অধিকার করে জাতীয় নেতাদের হাতে তুলে দেবার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। বিদ্রোহের অজুহাত হিসাবে তারা নীচু মানের খাবার ও কিং-এর বর্বরোচিত ব্যবহারের ঘটনাটিকে খাড়া করেন। তাছাড়া

প্রতিবাদ স্বরূপ ঐদিন থেকেই একযোগে অনশনও শুরু করেন তাঁরা। বৃটিশদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহের সূচনা হয় তলোয়ার জাহাজের নৌ-সেনাদের সম্মিলিতভাবে প্রাতঃরাশ প্রত্যাখ্যানের মাধ্যমে। এই বিদ্রোহের সংবাদ দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ে সারা দেশ তথা উপমহাদেশে। ১৮ই ফেব্রুয়ারি সব যুদ্ধ জাহাজ ও নৌ-প্রতিষ্ঠানে বিদ্রোহীরা একসঙ্গে উড়িয়ে দিয়েছিলেন কংগ্রেস, মুসলিম লিগ ও কম্যুনিস্ট পার্টির পতাকা। ঐ পাঁচদিন (১৮—২২ ফেব্রুয়ারি) ইউনিয়ন জ্যাক একেবারে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। ১৯শে ফেব্রুয়ারি সন্ধের মধ্যে বিদ্রোহী নৌ-সেনাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে চলে আসে ব্রিটিশ ভারতের তিন সামরিক বাহিনীর অন্যতম শাখা R.I.N বিদ্রোহের সময় বিদ্রোহী নাবিকেরা দেশবাসীর উদ্দেশ্যে ঘোষণা করেছিলেন—এখন থেকে তাঁরা জাতীয় নেতৃত্বের নির্দেশ পালন ক'রবেন। আর তাঁরা R.I.N এর নাম পরিবর্তন করে রেখেছিলেন Indian National Navy বিদ্রোহীরা সুসংহতভাবে তাঁদের I.N.N -কে পুরোপুরি পাঁচদিন নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রেখেছিলেন। এই কটা দিনে জাতীয় আন্দোলনের কোনও নেতাই তাদের সমর্থনে তাদের কাছে এগিয়ে আসেননি। কমিউনিস্টদের মধ্যেও একমাত্র অরুণ আসফ আলি ছাড়া কেউ বিদ্রোহীদের কাছাকাছি আসেননি। ১৯শে ফেব্রুয়ারি বোম্বাই-এর বিভিন্ন যুদ্ধজাহাজ থেকে পদাধিকারী রেটিংরা নেমে আসেন। কাছের বিশাল নৌ প্রতিষ্ঠান ক্যাসল ব্যারাক থেকে হাজারে হাজারে নৌ-সেনা বেরিয়ে এসে যোগ দেয় বিদ্রোহী রেটিংদের সঙ্গে সংখ্যাটা প্রায় ২০,০০০ ছুঁয়েছিল। ঐ দিনই সেন্ট্রাল নেভাল স্ট্রাইক কমিটি গঠিত হয়। সভাপতি হন পাঞ্জাবের তরুণ মুসলিম ওয়্যারলেস টেলিগ্রাফিস্ট এম. এস. খান; সহ-সভাপতি পেটী অফিসার মঙ্গল সিং, চিফ পেটী অফিসার-মাস্টার নওয়াজ—কমিটির সদস্য; লিডিং অফিসার বেদী, সিগন্যাল এম. এস. সেনগুপ্ত, স্টোকার, গোমেজ, লিডিং সিগন্যাল বসন্ত সিং, লিডিং সিম্যান নূরুল ইসলাম, লিডিং সিগন্যালার আস্রফ খান, স্টোকার মহম্মদ হোসেন আর সামগ্রিক পরিকল্পনা ও পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন বলাইচাঁদ দত্ত।

ঐদিনই তাঁরা নৌ-বাহিনীর কর্তৃপক্ষের কাছে তুলে ধরলেন কয়েকটি দাবি—

(১) কমোডর কিং-এর প্রকাশ্য বিচার চাই;

(২) অবিলম্বে বিনা শর্তে ভারতের বিভিন্ন বন্দীশালা ও দুর্গে আটক আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসার ও সৈনিকদের মুক্তি দিতে হবে;

(৩) এখন থেকে সবক্ষেত্রে কেবলমাত্র ভারতীয়দেরই নিয়োগ করতে হবে;

(৪) রেশনে উপযুক্ত মানের ভারতীয় খাদ্য সরবরাহ করতে হবে;

(৫) ভারতীয় নাবিকদের প্রতি ব্রিটিশ অফিসারদের ভদ্র ব্যবহার করতে হবে,

(৬) ইন্দোনেশিয়া ও ইন্দোচীনে ভারতীয় সৈনিকদের প্রেরণ বন্ধ করতে হবে;

(৭) ইংরেজ নাবিকদের সমান হারে ভারতীয নাবিকদের বেতন ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দিতে হবে;
(৮) কালবিলম্ব না করে ক্ষমতা হস্তান্তর করে ব্রিটেনকে ভারত ছেড়ে যেতে হবে।

স্বভাবতই দাবিগুলি মানা বৃটিশ অফিসারদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। দাবিগুলি শুধু রেটিংদের সমস্যা নয়। এর মধ্যে অনেক রাজনৈতিক দাবিদাওয়াও ছিল। বিদ্রোহের সময জাতীয কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে নৌ-বিদ্রোহীরা, কী তাদের লক্ষ্য তা বোঝানোর আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। তাদের লক্ষ্য ছিল, এই উপমহাদেশ থেকে বৃটিশ বিতাড়ন, চাকরিরত বৃটিশ ও ভারতীয় সেনাদের মধ্যে খাদ্য, ব্যবহার ও পদোন্নতিতে বৈষম্যের অবলুপ্তি; সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের, আই. এন. এ. কর্মীদের মুক্তিদান; আর ইন্দোনেশিযা থেকে ভারতীয় সৈন্যদের প্রত্যাহার।

বিদ্রোহীরা আশা করেছিলেন আগস্ট আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী অরুণা আসফ আলি তাঁদের নেতৃত্ব দেবেন। কিন্তু তাঁদের সে আশা পূরিত হয়নি। কোনও জাতীয় নেতাই তাঁদের নেতৃত্ব দিতে এগিযে আসেননি। বদলে সাংবাদিকদের মাধ্যমে শুনিয়েছিলেন কিছু উপদেশবাণী। বৃটিশ রাজের সঙ্গে সংঘর্ষের মুখোমুখি না হয়ে জাতীয় নেতারা ক্ষমতার সম্ভাব্য-হস্তান্তরের জন্য প্রাধান্য দেন তাদের সঙ্গে আলোচনা বৈঠককে। মেনে নেন নৌ-বিদ্রোহের ব্যাপারে বৃটিশ বক্তব্যকে।

জাতীয় নেতৃবৃন্দের ক্ষমতালোভী মনোভাব তাদের মানসিকতার পরিচয দেয়। তাঁরা বিদ্রোহীদের উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন—"শান্ত থাক, আমরা শীঘ্রই ক্ষমতায আসছি, এখন শৃঙ্খলা প্রযোজন।"

বিদ্রোহীরা কংগ্রেস ও লীগ নেতাদের কাছে আবেদনের পর আবেদন করেও তাঁদের নেতৃত্ব লাভে অসমর্থ হয। এই বিদ্রোহের প্রান্ত ছিল জাতীয় নেতাদের সন্দিগ্ধ দৃষ্টি ও অসহযোগিতা, অপরপক্ষে দেশপ্রেমে স্নাত হয়ে বিদ্রোহীর চেয়েছিল জাতীয় নেতারা যেন তাদের সশস্ত্র বিদ্রোহীকে যোগ্য নেতৃত্ব দিয়ে দেশব্যাপী এক সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের রূপ দেন। বিদ্রোহীরা ছিলেন বয়সে তরুণ, নিষ্পাপ ও রাজনীতিতে অনভিজ্ঞ, তাঁরা হিন্দু-মুসলমান মিলিতভাবে দেশকে স্বাধীন করার ঐক্যবদ্ধ শপথ নেন। কিন্তু জাতীয় জীবনের চাপে পড়ে শেষপর্যন্ত বিদ্রোহীরা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন। একটি সাক্ষাৎকারে বি. সি. দত্ত বলেছেন, "১৯৪৬ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি মহম্মদ আলি জিন্না বলেন, 'মুসলিম ভাইরা তোমরা সারেন্ডার করো'। আর সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল বলেছিলেন, 'উঠতি বয়সের ছেলেরা স্বাধীনতার কি বোঝে।' .....সত্যি কথা বলতে কি আমাদের নৌ বাহিনীতে কোনও নেতা ছিল না। উভয় নেতার নির্দেশ মানতে গিয়ে হিন্দু-মুসলমান ভাগ হয়ে বিভেদের সৃষ্টি হয়"।

বিদ্রোহের পর ১৯৪৬ সালের এপ্রিলের ভারত সরকারের যুদ্ধ বিভাগ থেকে এই নৌ বিদ্রোহের ওপর একটি ইনকোয়ারি কমিশন গঠিত হয়। পাটনা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যর সৈয়দ ফজল আলি এই কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। কমিশনের ৫৯৮ পৃষ্ঠার রিপোর্ট স্বাক্ষরিত হয় ১০ই জুলাই।

কোনও কোনও মহল ও ইংরেজদের পক্ষ থেকে প্রচার করা হয়েছিল এই বিদ্রোহ ছিল নিছক নাবিকদের খাদ্য, পোশাক ও নিজেদের আর্থিক দাবি নিয়ে অর্থাৎ এই বিদ্রোহের রাজনৈতিক তাৎপর্যকে লঘু করে দেখানোর চেষ্টা হয়েছিল। অবশ্য ইতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার ১৯৫০ সালে নৌ-বিদ্রোহকে স্বাধীনতা সংগ্রামেরই অংশ হিসাবে চিহ্নিত করেন। '৮০র দশক থেকে অন্যান্য ঐতিহাসিককেরা তাঁকে অনুসরণ করতে শুরু করেন।

নৌ-বিদ্রোহের রজত জয়ন্তী বর্ষপূর্তি উপলক্ষে বিদ্রোহের দলিল হিসাবে বি. সি. দত্ত ১৯৭১-এ লিখেছিলেন জাতির উদ্দেশে একটি বই—Mutiny of the Innocents.

স্বাধীনতা লাভের তেতাল্লিশ বছর পর কেন্দ্রের অকংগ্রেসী সরকারের অর্থমন্ত্রী প্রফেসর মধু দন্ডবতের চেষ্টায় বি.সি. দত্ত স্বাধীনতা সংগ্রামীর স্বীকৃতি লাভ করেন সরকারীভাবে। ইতিমধ্যেই বি. সি. দত্ত অল ইণ্ডিয়া রেডিও, বোম্বাই; জাপান সরকারের দূরদর্শন বিভাগ ও বি.বি.সি. তে সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন।

বর্তমানে বি. সি. দত্ত মহারাষ্ট্র সরকারের সহায়তায় মহারাষ্ট্রের রাযগড় জেলার বাবিপোদার নয়দায় 'ইউসুফ মেহের আলি সেন্টারে' সমাজসেবামূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন।

সূত্র নির্দেশ

১. প্রবন্ধ—"নৌবিদ্রোহ এবং এক বাঙালী তরুণ"—সুনীল দত্তরায়। সাপ্তাহিক বর্তমান। ১১-ই জুন ১৯৯৪, কলকাতা।

২. সাক্ষাৎকার—"নৌ বিদ্রোহের অন্যতম নেতা বলাইচাঁদ দত্ত"—কাজী মহঃ রফিক, দৈনিক মুক্তবাংলা, ১২ই নভেম্বর, ১৯৯২, বর্ধমান।

৩. "১৯৪৬—নৌ-বিদ্রোহ"—রবীন সেন। গণশক্তি ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪ কলকাতা।

৪. বলাইচাঁদ দত্তের অনুজ ভ্রাতা গৌর দত্তের সাক্ষাৎকার।

৫. Muntiny of the Inocents"—B. C. Dutta—Sindhu Publication. Bombay (1971).

৬. R C. Majumder H. C. Raychaudhuri and K. K. Datta:—"An Advanced History of India" London 1950 Edn.

৭. বলাইচাঁদ দত্তের সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ও রাজশাহী বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি

হীবেন্দ্র নাবায়ণ সরকার

বঙ্গদেশে যাঁবা প্রথম ইতিহাসচর্চা আবম্ভ কবেন তাঁদেব অন্যতম হলেন অক্ষযকুমাব মৈত্রেয (১৮৬১–১৯৩০)। বাজশাহীতেই শুরু হয অক্ষযকুমাবেব ইতিহাস চর্চা। এই চর্চাব ফলশ্রুতি হলো তাঁব "গৌড লেখমালা"। গ্রন্থখানিতে পালবাজগণেব তাম্রশাসন ও শিলালিপি বাংলা অনুবাদসহ প্রকাশ কবে তিনি বাংলাব ইতিহাস গবেষণাব পথ সুগম কবেন। ঐতিহাসিক বমেশচন্দ্র মজুমদাব বলেন, "বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে ইতিহাস বচনাব তিনিই পথপ্রদর্শক।" যোগেশচন্দ্র বাগল মহাশয এক প্রবন্ধে বলেন, "অক্ষযবাবু সত্যসত্যই ছিলেন বাংলা তথা বাঙালী সম্পর্কীয ঐতিহাসিক গবেষণাব পথিকৃৎ"।

অক্ষযকুমাব মৈত্রেযেব "গৌড লেখমালা" প্রকাশিত হয ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে। তাবই পদাঙ্ক অনুসবণ ক'বে বমাপ্রসাদ চন্দ লিখলেন "গৌডবাজমালা" ১৩১৯ বঙ্গাব্দে। দুটি গ্রন্থই প্রকাশিত হয বাজশাহী ববেন্দ্র বিসার্চ সোসাইটি কর্তৃক। এই বিসার্চ সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয বাজশাহীতে ১৯১০ সালে প্রধানত অক্ষযকুমাবেব উদ্যোগে। অর্থ সাহায্য কবেন দিঘাপাতিযাব বাজা শবৎকুমাব বায।

এই সোসাইটিব চিত্রশাল ভবনটি হিন্দু স্থাপত্যেব আদর্শে নির্মিত। এই ভবনটিব মধ্যে রয়েছে উত্তববঙ্গেব সবচেয়ে বডো পুবাবস্তুব সংগ্রহশালা। পুবাবস্তুব সংগ্রহেও অক্ষযকুমারেব দান অনস্বীকার্য। বেসবকাবি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য ববেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতিই প্রথম আবম্ভ কবে।

এখানে বযেছে ৫ খানি দামোদবপুব তাম্রলিপি; এগুলি কুমাবগুপ্ত ও বুধগুপ্তেব। এগুলি পাওযা গেছে ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে দিনাজপুব জেলাব দামোদবপুব . মব গ্রামে। পাঠোদ্ধার কবেন অধ্যাপক বাধাগোবিন্দ বসাক। আব আছে বৈগ্রামলিপি, মনহলি লিপি। এছাডা, মেষবাহনা সবস্বতী মূর্তি কযেকটি; কাশী থেকে আনা এক দুর্গামূর্তি, ষড়ভুজা, ছোটোধাতুনির্মিত ও নৃত্যবতা। গ্রন্থাগাবে বযেছে সংগৃহীত প্রাচীন পুঁথি। বাংলাদেশেব ইতিহাস বচনাব পক্ষে এগুলি অমূল্য উপাদান।

অক্ষযকুমার মৈত্রেয় ছিলেন সমিতির আজীবন ডিরেক্টব। এখানে গবেষণাধর্মী কাজে নানা সমযে যুক্ত হন বমাপ্রসাদ চন্দ, বাধাগোবিন্দ বসাক, দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, গোলাম ইযাজদানী।

অক্ষয়কুমারের রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে গৌড় লেখমালা (১৯১২), গৌড়ের কথা, উত্তরবঙ্গের পুরাতত্ত্ব সংগ্রহ, সিরাজদৌল্লা (১৮৯৮), সীতারাম রায় (১৮৯৮), সমর সিংহ (১৮৮৩), মীরকাশিম (১৯০৬), ফিরিঙ্গি বণিক (১৯২২) বিশেষ প্রসিদ্ধ। গৌড়ের কথা-গ্রন্থের ভূমিকায় দীনেশ সরকার মহাশয় লিখেছেন : "অক্ষয় কুমারের এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানির বিশেষ মূল্য এই যে, এতে ৭০।৮০ বৎসর পূর্বেকার অর্থাৎ বাঙালীর ইতিহাস চর্চার প্রথমযুগের উচ্চশ্রেণীর ঐতিহাসিক গবেষণার নমুনা পাওয়া যায়।"

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের ঐতিহাসিক বইগুলি রচিত হয়েছে প্রাচীন লেখমালা, মুদ্রা ও দস্তাবেজের উপর নির্ভর করে। এছাড়া, অক্ষয়কুমার ইতিহাস বিষয়ক বহু প্রবন্ধ বচনা করেছেন। যেমন—রাণীভবানী, পৌণ্ড্রবর্ধন, বলীদ্বীপের হিন্দুরাজ্য, যবন, ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ প্রভৃতি। এসব প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় ভারতী, বঙ্গদর্শন, সাহিত্য, প্রবাসী, মানসী পত্রিকায়। অক্ষয়কুমারের ইতিহাসচর্চাকে রবীন্দ্রনাথ ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি লিখেছিলেন : "বর্তমান-সংখ্যক (বৈশাখ ১৩০৫) 'ভারতী'তে 'ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ'—নামক ক্ষুদ্র প্রবন্ধটি যিনি লিখিয়াছেন, তিনি আধুনিক বাঙালী ইতিহাস লেখকগণের শীর্ষস্থানীয়"। রবীন্দ্রনাথ অক্ষয়কুমারকে একটি চিঠিতে লেখেন।

শান্তিনিকেতন
বোলপুর

আমি বঙ্গদর্শন হাতে লইয়া অবধি বলিতেছি, ভারতবর্ষের পরিচয় লাভ করিতে হইবে ইহাই ভারতবাসীর সর্বপ্রধান কাজ।

যদি কোন সুযোগে দেখা হয় তবে আপনাকে ইহা লইয়া অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করিব। আপনি ওকালতিটা ছাড়ুন। চুপচাপ বসিয়া পড়ুন। মাঠের কোণে আসিয়া একটি কুটির বাঁধুন। তারপরে হবিষ্যান্ন খাইয়া খাগড়ার কলম ধরিয়া তালপাতে ভারতবর্ষের ইতিহাসের কথা লিপিবদ্ধ করুন; ত্রিশকোটি নর-নারীর আশীর্বাদভাজন হইবেন। ইতি—

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৬ই ভাদ্র ১৩০৯।

ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার পাহাড়পুরের (রাজশাহী জেলা) বিরাট বৌদ্ধমঠ আবিষ্কারে যথেষ্ট পরিশ্রম করেন। তাঁর অমরকীর্তি হলো "ঐতিহাসিক চিত্র" নামে এক ত্রৈমাসিক পত্রিকার প্রকাশ, তাঁরই সম্পাদনায় (১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে)। একাজে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে সহায়তা করেন। বাংলাভাষায় এরূপ চেষ্টা এই প্রথম।

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ছিলেন বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির মেম্বার এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিশিষ্ট সদস্য। উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে (১৩১৫ বঙ্গাব্দ) তিনি সভাপতির আসন অলংকৃত করেন। কলিকাতায় বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের সপ্তম অধিবেশনে ইতিহাস শাখার সভাপতি হয়েছিলেন। তাঁর স্মৃতি রক্ষার্থে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহশালার নাম দেওয়া হয়েছে 'North Bengal University Akshay Kumar Maitreya Museum.'

অক্ষযকুমার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয কর্তৃক আমন্ত্রিত হযে পালবাজগণের ইতিহাস সম্বন্ধে ধারাবাহিক বক্তৃতা করেন। তাঁর সবচেযে বড়ো কীর্তি হলো অন্ধকূপ হত্যাকে মিথ্যা প্রমাণ করা। তাঁর সিরাজদৌল্লা গ্রন্থে এই কথা তিনি প্রথম বলেন। 'অন্ধকূপ' নামক কক্ষটি ছিল ১৮ ফুট দীর্ঘ এবং ১৪ ফুট ১০ ইঞ্চি প্রশস্ত। বন্দী ছিল ১৪৬ জন ইংরেজ। ১২৩ জন শ্বাসরুদ্ধ হযে মারা যায বলে রটনা করেন হলওয়েল নামে এক সাহেব।

ক্যালকাটা হিস্টোরিক্যাল সোসাইটির আহ্বানে এশিযাটিক সোসাইটি হলে (১৯১৬ সালের ২৪ মার্চ তাবিখে) এক বিতর্ক সভায অক্ষযকুমাব যোগদান করেন ও সারগর্ভ বক্তৃতা দেন। ইংরেজদের রটনা অন্ধকূপ হত্যা মিথ্যা প্রমাণ করেন। অক্ষয়কুমারের এই অভিমত দেশী-বিদেশী ঐতিহাসিক মহলে বেশ একটা আলোড়ন সৃষ্টি করে। পরে সিরাজদৌল্লার কলঙ্ক অন্ধকূপ হত্যার স্মৃতিস্তম্ভটি (হলওয়েল মনুমেন্ট) সরানো হয় সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে।

তিওয়ারি কমিটি থেকে গোস্বামী কমিটি : রুগ্ন শিল্পের নাভিশ্বাস

পঙ্কজ কুমার রায়
ও
শ্বেতা রায়

১৯৬৭ সালের পূর্বভারতের ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের মন্দা রুগ্নতাকে সূচিত করে। ১৯৭০ সালের জুলাই মাসে কেন্দ্রীয সরকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, আই ডি বি আই, এল আই সি ও অন্যান্য ব্যাঙ্ক সমূহ রুগ্নশিল্পের পুনর্গঠন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৯৭১ সালে এপ্রিল মাসে ভারতের শিল্প পুনর্গঠন কর্পোরেশন গঠনের মধ্যে দিযে সরকারি স্তরে প্রথম রুগ্নশিল্প পুনরুজ্জীবনের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। জাতীয়করণের শ্লোগান বহু রুগ্নশিল্প সংস্থাকে অধিগ্রহণ করে রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থায় পরিণত করে। কিন্তু পুনরুজ্জীবনের প্রক্রিয়ার অভাবে অধিগৃহীত সংস্থার বেশির ভাগই রুগ্নতার করালগ্রাস থেকে মুক্ত হতে পারেনি। ১৯৭৫ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের স্টাডি গ্রুপ (ট্যাণ্ডন কমিটি) রুগ্নশিল্পের মূলগত পুনর্গঠনের কথা ব্যক্ত করে। ১৯৭৬ সালের মে মাসে এইচ এন রাযের (সচিব, অর্থদপ্তর, ভারত সরকার) নেতৃত্বে একীকরণের মাধ্যমে পুনর্গঠনের সম্ভাবনার কথা বলা হয়। ১৯৭৭ সালের শিল্পনীতিতে (জনতা সরকারের) পুনরুজ্জীবনের সম্ভাবনা থাকলেই অধিগ্রহণের কথা বলা হয়। ১৯৭৮ সালের ১৫ই মে সংসদে তৎকালীন কেন্দ্রীয় শিল্পমন্ত্রী জর্জ ফার্ণাণ্ডেজ রুগ্নশিল্প অধিগ্রণের জন্য স্ক্রীনিং কমিটি গঠন করার কথা বলেন।

১৯৮১ সালের ১৪ই মে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আই আর পি আই-এর তৎকালীন চেয়ারম্যান টি তিওয়ারির নেতৃত্বে এক সদস্যের কমিটি গঠন করে, যা তিওয়ারি কমিটি নামে খ্যাত। ১৯৮৪ সালে তিওয়ারি কমিটি 'Report of the Committee to examine the legal and other difficulties faced by Banks and Financial Istitutions in Rehalitation of sick Industrial undertakings and suggest remedial measures including changes in Law' শীর্ষক প্রতিবেদন পেশ করে। কমিটি পুনরুজ্জীবন পর্ষদ (Board for Industrial Revival) গঠনের সুপারিশ করে। ১৯৮৫—৮৬ সালের বাজেট পেশকালে অর্থমন্ত্রী সিক ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কোম্পানি (স্পেশাল প্রভিশন) বিল আনেন।" সিকা ১৯৮৫-র জন্ম হয়। যাতে শিল্প পুনর্গঠন পর্ষদ (BIFR)

গঠনের কথা বলা হয়। ১৯৮৭ সালের ১৫ই মে থেকে শিল্প পুনর্গঠন পর্ষদ কাজ শুরু করে। ১৯৯১ সালের সিকা'৮৫ সংশোধনী অনুযায়ী রাষ্ট্রায়ত্ত্ব রুগ্নশিল্প সংস্থা পুনর্গঠনের ভারও শিল্প পুনর্গঠন পর্ষদের উপর ন্যস্ত করা হয়। ২৪শে ডিসেম্বর রাষ্ট্রায়ত্ত্ব শিল্প পুনর্গঠনের কাজ পুনর্গঠন পর্ষদ শুরু করে। ১৯৯১ সালের ২৪শে জুলাইয়ের নতুন শিল্পনীতির সুপারিশ মেনেই সিকার এই সংশোধনী করা হয়েছিল। ১৯৯৩ সালের শুরুতে ডঃ ওঙ্কার গোস্বামীর নৈতৃত্বে শিল্প পুনর্গঠন পর্ষদের কাজকর্ম পর্যালোচনাব জন্য কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক একটি কমিটি গঠন করে। ১৯৯৩ সালের জুন মাসে ডঃ গোস্বামী 'Report of the Committee on Industrial sickness and corporate Restructuring' নামে প্রতিবেদন কেন্দ্রীয় অর্থদপ্তরে জমা দেন।

রুগ্নশিল্প সম্পর্কিত তিওযারি কমিটি থেকে গোস্বামী কমিটির ব্যবধান এক যুগের। ভারতের শিল্পের রুগ্নতার প্রাবল্য বৃদ্ধি সম্পর্কে কোন দ্বিমত নেই। সরকারি বা বেসরকারি যে কোন ধরনের শিল্প, যে কোন রাজ্যেই অবস্থিত হোক না কেন, যে কোন আয়তনের শিল্প (ছোট, মাঝারি, বা বৃহৎ) রুগ্নতার করাল গ্রাস থেকে মুক্ত নয় যেকোন উন্নত বা উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় আমাদের দেশের রুগ্নশিল্পের সমস্যার গভীরতা অনেক বেশি। প্রথমত ক্রমবর্দ্ধমান ক্ষতিতে চলা সংস্থায় প্রচুর পরিমাণ আর্থিক ও স্থাবর সম্পত্তি আটকে আছে। দ্বিতীয়ত বিরাট পরিমাণ কর্মহীন মানুষের লাইন আরও দীর্ঘতর হবে রুগ্নশিল্প বন্ধ হয়ে গেলে। তৃতীয়ত উন্নত দেশে দীর্ঘকালে কোন রুগ্ন সংস্থাকে চলতে দেওয়া হয় না। হয দ্রুত পুনরুজ্জীবিত কবা হয় না হয় বন্ধ করে দেওয়া হয়। ১৯৯১ সালের নতুন শিল্পনীতিতে শিল্পের বিদায় নীতি ও শ্রমিকের স্বেচ্ছা অবসর প্রকাশকে রূপায়নে সুপারিশ করা হয়েছে। তিওয়ারি কমিটি গঠনের পিছনে জনতা সরকারের গৃহীত শিল্পনীতির ছায়া রূপে কাজ করেছে। অন্যদিকে গোস্বামী কমিটি নতন শিল্পনীতির অনুগামী হিসেবেই কাজ করেছে। গোস্বামী কমিটি সেই বক্তব্যই রেখেছে যা ডঃ মনমোহন সিং অর্থমন্ত্রীরূপে বলতে চেয়েছেন।

রুগ্ন শিল্প সম্পর্কে দু'দুটি কমিটি গঠিত হয়েছে, আইন হয়েছে এবং তার একাধিক সংশোধন হয়েছে। কিন্তু রুগ্নতার সংজ্ঞা এখনও পর্যন্ত নির্ধারিত হয়নি। তিওয়ারি কমিটি রুগ্নশিল্পের সংজ্ঞা দিয়েছিল এইভাবে:

১. নগদ ক্ষতি

২. বিপরীত তরল অনুপাত

৩. শেয়ার হোল্ডার ফাণ্ডের ৫০ শতাংশ বা বেশি হ্রাস অথবা আদায়ীকৃত মূলধনে যে কোন ধরনের হ্রাস ১৯৮৫ সালের সিকাতে তিনটি শর্তসাপেক্ষে রুগ্ন শিল্প বলা হাচ্ছল:

১. সাত বছরের নিবন্ধিত সংস্থা
২. গত দু'বছর নগদ ক্ষতি
৩. ক্রমপুঞ্জীভূত ক্ষতি শেয়ার হোল্ডার ফাণ্ডের সমান বা অতিক্রম করে গেছে

১৯৯২ সালের সিকার সংশোধনী অনুযায়ী রুগ্ন শিল্পের সংজ্ঞা পুনর্নির্ধারিত হল :

১. পাঁচ বছরের নিবন্ধিত সংস্থা
২. ক্রমপুঞ্জীভূত ক্ষতি শেয়ার হোল্ডার ফাণ্ডের সমান বা অতিক্রম করে গেছে।

গোস্বামী কমিটি মনে করে রুগ্নতাব সংজ্ঞাই রুগ্নতা নির্ণয়ের প্রধান অন্তরায়। কমিটির মতে রুগ্নতার সংজ্ঞা হওয়া উচিত :

১. ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানকে ১৮০ দিন বা বেশি সময় ঋণ ফেরতের অক্ষমতা
২. নগদ ধার বা কার্যকরী মূলধনের ১৮০ দিন বা বেশি সময়ের অভাব।

তিওয়ারি কমিটি থেকে গোস্বামী কমিটিতে ব্যর্থতার দায়ভার ব্যবস্থাপক থেকে শ্রমিকের উপর বর্তেছে। তিওযারি কমিটি ৫২% ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনাকে দায়ী করেছে। মন্দা ও পরিবেশগত কারণে ২৩ শতাংশ ক্ষেত্রে রুগ্নতা দেখা দিয়েছে। যান্ত্রিক ও পরিকল্পনাগত কারণে ১৪ শতাংশ, পরিকাঠামোগত কারণে ৯ শতাংশ ও শ্রমিক অসন্তোষের জন্য ২ শতাংশ ক্ষেত্রে রুগ্নতা ঘটেছে। গোস্বামী কমিটির মতে সুদ ও মজুরী (এই দুই স্থির ব্যয়) রুগ্নতার উল্লেখযোগ্য কারণ। রুগ্নশিল্প সংস্থার দেনা মালিকানা অনুপাত (Debt Equity Ratio) ও মোট দায় মালিকানা অনুপাত (Total Liability Ratio) মুনাফাভোগী সংস্থা থেকে অনেক বড়।

তিওয়ারি কমিটির প্রতিবেদনে আইনের কতগুলি ত্রুটি তুলে ধরা হয়েছিল :

১. শিল্পের রুগ্নতা ক্রমবর্ধমান
২. আইনের জটিলতা
৩. পুনর্গঠনের প্রক্রিয়ায় নিযুক্ত বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়ার অভাব
৪. বর্তমান শিল্পের পরিকাঠামো রুগ্নশিল্প বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরিপন্থী।

গোস্বামী কমিটি শিল্প পুনর্গঠন পর্ষদকে কতগুলি কারণে অভিযুক্ত করেছে :

১. শিল্প পুনর্গঠন পর্ষদ (বি আই এফ আর)-এর প্রক্রিয়া অত্যন্ত সময় সাপেক্ষ। সিদ্ধান্ত নিতে কোন কোন ক্ষেত্রে তিন বছরের বেশি সময় লাগে।

২. শিল্প পুনর্গঠন পর্ষদের উপ-আইনি (Quasi Judicial) অবস্থান।

৩. শিল্প পুনর্গঠন পর্ষদ সংস্থা বন্ধ করার চাইতে পুনর্গঠনে গুরুত্ব দেয়।

অন্যদিকে শিল্প পুনর্গঠনের অভিযোগ হল

১. অপারেটিং এজেন্সি (ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান) থেকে দেরিতে পুনরুজ্জীবনেব / বিলুপ্তির সুপারিশ পাওয়া

২. কেন্দ্রীয় সরকার বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে দেবিতে পুনরুজ্জীবনের অর্থপ্রাপ্তির প্রতিশ্রুতি

৩. উদ্যোক্তার ঢিলেঢালা মনোভাব

৪. এ এ আই এফ আর বা হাইকোর্টে অভিযোগ জানিযে প্রক্রিযাকে শ্লথ করবার উদ্যোক্তার প্রচেষ্টা।

ব্যাঙ্ক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টিভঙ্গী।

৫. শিল্প পুনর্গঠন পর্ষদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় ৭০০ দিন থেকে ১০০ দিনে নেমে এসেছে। আবার নথিভুক্ত রুগ্নশিল্পের সংস্থা ক্রমহ্রাসমান কিন্তু মীমাংসিত রুগ্নশিল্পেব সংখ্যা যথেষ্ট বেড়েছে। বি আই এফ আর-এর প্রতিবেদন থেকে এই সত্য প্রতীযমান হয়।

বছর	নথিভুক্ত শিল্পের সংখ্যা	মীমাংসিত শিল্পের সংখ্যা	গড় সময় (কেস প্রতি দিন)
১৯৮৭ মধ্যবর্তী সময থেকে	৩১১	১৬	৭৩১
১৯৮৮	২৯৮	১০৮	৭০৮
১৯৮৯	২০২	২১৭	৬১৩
১৯৯০	১৫১	২১৯	৫৭৫
১৯৯১	১৫৫	১৮২	৪৮০
১৯৯২	১৭৭	১৫১	১২৯
১৯৯৩ অক্টোবর পর্যন্ত	১১৫	১৯৯	৯৪
	১৪০৯	১০৯২	৬৩৫

সূত্র: বি আই এফ আর—এ রিভিউ, ৩১শে অক্টোবর ১৯৯৩

অন্যদিকে মাঝারি ও বৃহৎ রুগ্নশিল্পের সংখ্যাও ব্যাঙ্ক ঋণের পরিমাণ রুগ্নশিল্পের করুণ অবস্থান তুলে ধরতে সাহায্য করবে :

	১৯৮৭ মার্চ	১৯৮৯ মার্চ	১৯৯১ মার্চ	১৯৯২ সেপ্টেম্বর
মাঝারি রুগ্নশিল্প	১১১৭	১৪৫৫	১৪৬২	১৫৯৯
বৃহৎ রুগ্নশিল্প	৭২০	৮১৪	৮৭৬	৮২৮
	১,৮৩৭	২,২৬৯	২,৩৩৮	২,৪২৭

ব্যাঙ্ক ঋণের পরিমাণ (কোটি টাকায়)

মাঝারি রুগ্নশিল্প	২৮০১.৭০	৪৫৩৮.৫২	৫১০৫.৫৭	৬৮০৫
বৃহৎ রুগ্নশিল্প	১৬৫৭.৩০	২৩৮৬.৭৭	২৮৭০.২১	২৪৩৬
	৪,৪৫৯.০০	৬৯২৫.২৯	৭,৯৭৫.৭৮	৯,২৪১

সূত্র: ইকনমিক সার্ভে ১৯৮৯—৯০ থেকে ১৯৯৪—৯৫

১৯৮৭-র মে থেকে রুগ্নশিল্প পুনর্গঠন পর্ষদ কার্যকরী হওযা সত্ত্বেও মাঝারি ও বৃহৎ রুগ্ন শিল্পের (বেসরকারি) সংখ্যা সাড়ে পাঁচ বছরে ৩২.১১ শতাংশ বেড়েছে এবং ঐ সময়ে রুগ্ন শিল্প সংস্থার ব্যাঙ্ক ঋণ সৃষ্টি বেড়েছে ১০৭.২৪ শতাংশ। কোন রুগ্ন শিল্প সংস্থা নথিভুক্ত হলে পুনরুজ্জীবন বা মৃত্যু পরোয়ানা ঘোষণার জীয়নকাঠি-মরণকাঠি রুগ্নশিল্প পুনরুজ্জীবন পর্ষদের হাতে। পুনরুজ্জীবনের প্রক্রিয়া চলেছে তা সত্ত্বেও প্রকৃত অর্থে পুনরুজ্জীবন হয় কার্যকর হয়েছে বা হবে মাত্র ৩৭.৬৮ শতাংশ ক্ষেত্রে কিন্তু যে সংস্থাগুলিকে আর রুগ্ন বলা যাবে না তাঁর হার অতি সামান্য (১.৬ শতাংশ)। তাই লক্ষ্য করা যাচ্ছে একদিকে রুগ্নশিল্প পুনর্গঠন পর্ষদ জাতীয় সম্পদ রক্ষা করতে ব্যর্থ, অন্যদিকে শ্রমিকদের রক্ষা করতে পারেনি (শ্রমিকের অনাহারে, অর্ধাহারে মৃত্যু ও অভাবে আত্মহত্যা কখনও সপরিবারে প্রায়ই ঘটছে)। আমেরিকার মত ধনবাদী দেশেও রুগ্নতা মালিক, উদ্যোক্তা, ব্যবস্থাপক, কর্মচারী, বিনিয়োগকারী, ঋণদাতা, ক্রেতা ও স্থানীয় জনসাধারণকে স্পর্শ করে অবর্ণনীয় কষ্টে নিমজ্জিত করে। কিন্তু ভারতের মত দেশে রুগ্ন শিল্প, রুগ্ন ব্যাঙ্ক, রুগ্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও মজুরী না পাওয়া শ্রমিক আছে। কিন্তু কোন রুগ্ন মালিক নেই। এইখানেই ভারতীয়

রুগ্নশিল্পের স্বাতন্ত্র্য। এই সত্য গোস্বামী কমিটিও অস্বীকার করতে পারেনি। ভারতীয় রুগ্ন শিল্পের নাভিশ্বাস দুটি কমিটির অন্তবর্তী সময়ে এতটুকু কমেনি বরং বেড়েছে। ব্যঙ্গ করছে রুগ্নশিল্প পুনর্গঠন পর্ষদের কাজকর্ম, সরকারি নীতি আর কমিটি সর্বস্ব প্রক্রিয়াকে।

সূত্র নির্দেশ

১. Report of the Committee to examine the legal and other difficulties faced by Banks and Financial Institutions in Rehabilitation of sick Industrial Undertakings and suggest Remedial measures including changes in the law, RBI, 1984

২. Report of the Committee on Industrial Sicknees and Corporate Restructuring, June 1993.

৩. Board for Industrial and Financial Reconstruction A Review as on 31st October, 1993

৪. Economic Survey, 1989 90 to 1994 95, Government of India.

৫. Corporate Collapse—the causes and symptoms--John Argenti, McGraw Hill Book Co (UK) Ltd, 1976

৬. ভারতের অর্থনৈতিক বিকাশের ইতিহাস: প্রসঙ্গ রুগ্নশিল্প (১৯৫০–১৯৯০), পঙ্কজ কুমার রায়, ইতিহাস অনুসন্ধান ৮।

আসানসোল শিল্পাঞ্চলের জনজীবন : একটি আর্থ-সামাজিক অনুসন্ধান

অরবিন্দ সামন্ত

প্রস্তাবনা

সম্প্রতি নগরায়ণ এবং শিল্পায়ন সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে ঔৎসুক্য সৃষ্টি হয়েছে। শিল্পায়ন তথা নগরায়ন কিংবা নগরায়ণ তথা শিল্পায়ন পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত। নগরে নাগরিক-জীবন কিংবা শিল্প-লগ্ন শ্রমিক-জীবন নগরায়ণের কিংবা শিল্পায়নের অনিবার্য অভিঘাত অস্বীকার করতে পারে না। কোন্ পরিস্থিতিতে শিল্পায়ন শুরু হয়, এই শিল্পাযনের স্বরূপ কী, শিল্পাযনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কযুক্ত মানুষের সামগ্রিক জীবনচর্যা কীভাবে পরিবর্তিত হয়— এ-সবই সমাজবিজ্ঞানীদের সংগত অনুসন্ধান ক্ষেত্র। কলকাতা ঔপনিবেশিক ভারতের রাজধানী বলেই সম্ভবত অনুসন্ধানের প্রাথমিক ইচ্ছাটি কলকাতাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছিল। কলকাতা এবং সংলগ্ন অঞ্চলের, বিশেষত হাওড়ার শিল্প সমৃদ্ধি, নগরায়ণ এবং নাগরিক জীবনে অপরিহার্য যানবাহন, বাসস্থান, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং এ-সমস্ত কিছুর সঙ্গে সংযুক্ত মানুষদের জীবনশৈলী সমাজবিজ্ঞানীদের প্রিয় বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে।

কিন্তু শুধু কলকাতাই নয়, উত্তরস্বাধীনতা যুগে, সারা ভারতবর্ষেই সাধারণভাবে শিল্পায়নের এক সামগ্রিক তোড়জোড় শুরু হয়। বাংলায় কলকাতার মতোই অনেক মফঃস্বল শহরই শিল্পের অগ্রসরতায় এবং অবশ্যম্ভাবী নগরায়ণে বিশিষ্টতা অর্জন করে। আর এ-ব্যাপারে আসানসোল সম্ভবত নানা কারণে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। লোহা এবং কয়লার মতো আকরিকের সহজ লভ্যতা, রেল ও সড়ক যোগাযোগের সুবিধা, অজয়-বরাকর-দামোদরের জল এবং জল বিদ্যুতের প্রতুলতা, স্থানীয় এবং সংলগ্ন বিহারের শ্রমিকের যোগানের সুবিধা এবং কলকাতারী নিকটবর্তী হওয়ায় আভ্যন্তরীণ বাজারে সুযোগ ইত্যাদি কারণে আসানসোলের অন্তর্গত শর্ত পূরণ করতে কিভাবে শিল্প-প্রধান শহর-অঞ্চলে রূপান্তরিত হল তা আমাদের কৌতূহলের বিষয় হতে পারে। শিল্পায়নে সংশ্লিষ্ট মানুষজন শিল্পায়নের অভিঘাত কীভাবে গ্রহণ করেছে, তাদের আর্থ-সামাজিক জীবন কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছে, তাদের সামগ্রিক চৈতন্যে এই শিল্পায়ন কোন বিশিষ্ট মাত্রা এনেছে কিনা— এ সবই একটি সঙ্গত অনুসন্ধানের বিষয়। কিন্তু

আশ্চর্যের বিষয়, এ-ব্যাপারে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য গবেষণা হয়নি। বর্তমান প্রবন্ধে আসানসোল শিল্পাঞ্চলের জনজীবন সম্পর্কে সমীক্ষা-নির্ভর একটি আলোচনার চেষ্টা করা হবে। এটি মূলত একটি প্রাথমিক খসড়া, তাই নিশ্চিত সিদ্ধান্ত কিংবা সুস্থির প্রত্যয় এ-আলোচনায় আশা করা উচিত হবে না।

অনুসন্ধানের স্বরূপ ও সীমাবদ্ধতা

এই প্রবন্ধে আসানসোল শিল্পাঞ্চল বলতে আসানসোল মিউনিসিপ্যালিটির ১৬টি সার্কেল বা ২৫টি ওয়ার্ডের ভৌগোলিক সীমাকে ধরা হয়েছে। যেসব তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যবহার করা হয়েছে তার ভিত্তিবর্ষ সাধারণত ১৯৮৪ সাল। ১৯৮৪ সালে আসানসোল মিউনিসিপালিটি অঞ্চলে প্রায় ৪৪,৪২৫টি পরিবার ছিল। বর্তমান সমীক্ষায় ঐ পরিবার সংখ্যার সঙ্গে বার্ণপুর নোটিফায়েড এরিয়া, সেন র‍্যালে টাউনশিপ এবং আসানসোল-জামুরিয়ার আরও ৭টি মৌজা ধরা হয়েছে। এর ফলে পরিবারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ৪৫,৬০২টি। এই আঞ্চলিক সীমাবদ্ধতায় সংশ্লিষ্ট পরিবার-পরিজনের মধ্যে সমীক্ষা চালিয়েছিলেন আসানসোল-দুর্গাপুর ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (ADDA) বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে। বর্তমান প্রবন্ধে ব্যবহৃত অধিকাংশ তথ্যই ADDA-এর বিভিন্ন সমীক্ষা থেকে সংগৃহীত হয়েছে।

শিল্পাঞ্চলের শিল্প

আসানসোল শিল্পাঞ্চলে বড় বড় শিল্প-উদ্যোগ ছাড়াও আছে কম করে ২৫ রকমের ছোট ও মাঝারি মাপের শিল্প-উদ্যোগ। এখানে আছে ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প, সেরামিক কারখানা, সাবান শিল্প, প্রিন্টিং প্রেস, জেরক্স কপিযার প্রতিষ্ঠান, স'মিল। আছে আটাকল, তেল কল, আইসক্রিম কল, ইঁট ভাটা, চুনের ভাটি। আছে খনি, বেকারী, কন্‌ফেকশনারী, ফার্ণিচার ও সোডা ওয়াটার তৈরির কারখানা, তাছাড়া আছে ওষুধের কারখানা, কাঁচের কারখানা, সুতোকল, চামড়ার কারখানা, কেরোসিন ল্যাম্প তৈরির কারখানা, আলতা তৈরির কারখানা। শিল্প-উদ্যোগের বিভিন্নতা, উৎপাদন-প্রক্রিয়ার বৈচিত্র্য ও কর্মপ্রণালীর রকমফের সংশ্লিষ্ট মানুষদের জীবনযাত্রাতেও বৈচিত্র্য এনেছে। এই শিল্পনগরীর নাগরিক জীবন তাই একমাত্রিক ছন্দ-শৈলীতে পরিকল্পিত হয়নি। মানুষজনপদে জাত-ধর্ম-ভাষাও বিভিন্ন। শিল্পায়ন এই বিভিন্নতাকে অপসারিত করতে পারেনি।

গৃহ ও গৃহস্থ: পরিবার ও পারিবারিক বৃত্তান্ত

আসানসোল শিল্পাঞ্চলে প্রতি একশ'টি গৃহস্থ-আবাসনের মধ্যে ৭৮টির সংগঠন মোটামুটি সন্তোষজনক। আধুনিক স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপনের উপযোগী প্রয়োজনীয়

শর্তপূরণে এগুলি সমর্থ। কিন্তু ১৮ শতাংশের অবস্থা তত ভাল নয়। আর বাকি ৪ শতাংশের অবস্থা রীতিমতো উদ্বেগজনক। এখানে শতকরা ৬৯টি বাড়ি পাকা, ১০টি বাড়ি কাঁচা বা মাটির তৈরি, ১৭টি কাঁচা-পাকার মিশ্রণ আর ৪টি বাড়িকে যথার্থ কুঁড়ে ঘর বলা যেতে পারে।

এই শিল্পাঞ্চলে শতকরা ৫৬টি বাড়িতে আধুনিক স্বাস্থ্যসম্মত স্নানাগার আছে, ২১টি বাড়িতে আছে 'খাটা' পায়খানা আর বাকি ২৩টি বাড়িতে কোন পায়খানাই নেই। এরা স্নানাদি সারেন রাস্তার কলে, প্রাতঃকৃত্যাদি সারেন মাঠে, রাস্তার ধারে, রেললাইনে বা ঝুপড়ির আশে-পাশে নালানর্দমায়। দুই-তৃতীয়াংশ গৃহস্থের বাড়িতে আলাদা রান্নাঘরের সংস্থান আছে, আর বাকি বাড়িতে রান্নার জন্য ব্যবহার করা হয় সংলগ্ন বারান্দা কিংবা শোবার ঘরের একাংশ। শতকরা ৮৭টি বাড়িতে পানীয় জলের জন্য নিজস্ব ট্যাপকলের ব্যবস্থা আছে, বাকি ১৩টি গৃহস্থ-পরিবার পরিজনদের জন্য খাওয়ার জল আনেন কাছে-পিছে কুয়ো বা রাস্তার বারোয়ারী জলের কল থেকে।

আসানসোল শিল্পাঞ্চলের মানুষজনের ৪৪ শতাংশ গৃহস্থ বাস করেন ভাড়াবাড়িতে। বাকি ৫৬ শতাংশ গৃহস্থের বাসের জন্য নিজস্ব বসতবাড়ি আছে। হিসেব করে দেখা গেছে, ভাড়াটে গৃহস্থ আসানসোল শিল্পাঞ্চলের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪০ শতাংশ। আর নিজস্ব বাড়ি আছে এমন পরিবারের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৬০ শতাংশ। ভাড়াটে বাড়ির গৃহস্থের পারিবারিক সদস্য সংখ্যা গড়ে প্রায় ৫ জন। আর বাড়ির মালিক পরিবারের পরিজন সংখ্যা গড়ে ৬ জন। এ অঞ্চলের ৬৮ শতাংশ গৃহস্থ আছেন ছোট পরিবার নিয়ে, বাকি ৩২ শতাংশ গৃহস্থের যৌথ পরিবার। ছোট পরিবার মানে স্বামী-স্ত্রী আর তাদের অবিবাহিত পুত্রকন্যা নিয়ে যে গৃহস্থ। ভাড়াটে বাড়ির গৃহস্থদের মধ্যে ছোট-পরিবার শতকরা প্রায় ৮০। অন্যদিকে, নিজস্ববাড়ির গৃহস্থদের ছোট পরিবার শতকরা প্রায় ৬০।

গৃহ ও গৃহস্থের এই ছবির পাশাপাশি ঘর ও ঘরণীর ছবিটি মিলিয়ে নেওয়া যেতে পারে। এ-অঞ্চলে শতকরা ২৮টি পরিবার হল এক-কক্ষের গৃহস্থ, ৩৮.৫ শতাংশ দ্বি-কক্ষের বাসিন্দা, ১৮.৬ শতাংশ হল তিনঘরের ঘরণী আর বাকি ১৫.৩ শতাংশ চার বা তারও বেশি ঘরের বাড়ির বাসিন্দা। এক-ঘরের ভাড়াটে বাড়ির ঘরণীকে পরিবারের আর চার-পাঁচজন পরিজনের সঙ্গে ঘরটি ভাগাভাগি করে বাস করতে হয়। পক্ষান্তরে, একঘরে নিজস্ব-বাড়ির মালিকের অবস্থা আরও খারাপ। তিনি তাঁর একমাত্র শোয়া-কাম-রান্না-কাম-ড্রইংরুমটি শেয়ার করেন গৃহস্থের আরও পাঁচ-ছয় জনের সঙ্গে। আমরা যদি এক ঘরে দুই বাসিন্দাকে জনঘনত্বের স্বাভাবিক অবস্থা বলে মেনে নিই, তাহলে হিসেব করে দেখা গেছে আসানসোল শিল্পাঞ্চলে মোট গৃহস্থের ২২.৫ শতাংশ বাড়িতে জনঘনত্ব অত্যধিক।

ভাড়াটে বাড়ির গৃহস্থের ক্ষেত্রে এই অনুপাত ১৯.৫ শতাংশ আর নিজস্ব বাড়ির পরিবারে ক্ষেত্রে এটি ২৪.৫ শতাংশ।

এ-শিল্পাঞ্চলে যারা ভাড়া বাড়িতে থাকেন, ১৯৮৪ সালের হিসেব মতো দেখা গেছে, তারা বাড়ি-ভাড়া দেন গড়ে মাসে ১০৯.৫ টাকা। আর এটি তাদের গড় মাসিক আয়ের প্রায় দশ শতাংশ। ADDA এই তথ্যটি সম্ভবত সংগ্রহ করেছেন মৌলিক প্রশ্নোত্তর সূত্রে এবং উত্তরদাতা নিশ্চিত প্রকৃত তথ্য গোপন করেছেন। কারণ বর্তমানে (১৯৯৪) এ-অঞ্চলে মধ্যবিত্তের মোটামুটি মাথাগোঁজার ব্যবস্থার জন্য হাজার টাকা গুনতে হয়। দশ বছর আগে বাড়িভাড়া দশগুণ কম ছিল এ সংবাদ মেনে নেওয়া শক্ত। যাইহোক, এ-শিল্পাঞ্চলে ৫ শতাংশ পরিবার বাস করেন হাজার বর্গফুট মেঝের বাড়িতে, ১৬.৯ শতাংশ ১০১—৩০০ বর্গফুট জায়গায়, ২১.২ শতাংশ ৩০১—৫০০ বর্গফুট, ৪৩.২ শতাংশ ৫০১—৮০০ বর্গফুট আর বাকি ১৪.১ শতাংশ বাস করেন ৮০১ বর্গফুট বা তদুর্ধ মেঝের বাড়িতে।

বিগত ১৯৮৪ সালের হিসেব মতো, এ-অঞ্চলের এক-চতুর্থাংশ গৃহস্থের মাসিক আয় গড়ে ৫০০ টাকা বা তারও কম। ৪৫.২ শতাংশ পরিবারের আয় মাসে ৫০১—১০০০ টাকা, ১৪.২ শতাংশের ১০০১—১৫০০ টাকা, ৮.৭ শতাংশের ১৫০১—২০০০ টাকা আর বাকি ৮.৪ শতাংশের মাসিক আয় ২০০১ বা তদুর্ধ্ব। এই সমস্ত শ্রেণীর সম্মিলিত গড মাসিক আয় ১০৫৭ টাকা।

জন্ম-মৃত্যু-বিয়ে: তিন সত্যি নিয়ে

আসানসোল শিল্পাঞ্চলে স্থায়ী আবাসিক মায়েদের মধ্যে সমীক্ষা করে দেখা গেছে, গত ১৯৮২ সালের দেওয়ালী থেকে ১৯৮৩ সালের দেওয়ালী পর্যন্ত এক বছরে এ অঞ্চলে ২০১টি শিশুর জন্ম হয়েছে। অন্যভাবে বলতে গেলে, প্রতি হাজারে এ-অঞ্চলে জন্মহার ১৮.০৩। সর্ববঙ্গীয় পরিপেক্ষিতে এই জন্মহার রীতিমতো কম, কারণ পশ্চিমবঙ্গে প্রতি হাজার জনসংখ্যায় নবজাতকের গড় ৩২.০। অবশ্য এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, কারণ শিল্পাঞ্চল প্রধানত শহুরে মানসিকতায় পরিপুষ্ট। তাই সন্তানকামনা বা জনসংখ্যাবৃদ্ধি পারিপার্শ্বিক আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। যাই হোক, এই ২০১টি শিশুর মধ্যে ১০৫টি বা ৫২.২% ছেলে আর ৯৬টি বা ৪৭.৮% মেয়ে। ২০১টি নবজাতকের মধ্যে ৬৮টি ভূমিষ্ঠ হয়েছে বাড়িতে, ২৮টি জন্মেছে নার্সিংহোমে, আর ১১৫টি হাসপাতালে। যে ৬৮টি শিশু বাড়িতে জন্মেছে তাদের মধ্যে ১৫টি ডেলিভারি হয়েছে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নার্সের সাহায্যে। সুতরাং বলা যেতে পারে যে সর্বসাকুল্যে ৭৮.৬ শতাংশ মা সন্তানের জন্ম দিয়েছেন পেশাদারী

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ধাত্রীব দ্বারা। আর প্রায় ২২ শতাংশ শিশু জন্মেছে এমনসব ধাত্রীদেব সাহায্যে যাদের কোন পেশাগত প্রশিক্ষণ নেই।

আসানসোল শিল্পাঞ্চলে যাবতীয় মহিলাদের ৪০ শতাংশের সন্তানধারণের বয়স অতিক্রান্ত। সমীক্ষায প্রকাশ, মহিলারা এখানে গড়ে ৩.৫টি সন্তানের জননী হন। এই সন্তানদের মধ্যে ৩.১টি সুস্থ স্বাভাবিক আয়ু নিয়ে বেঁচে থাকে। অর্থাৎ গড়ে ১০০০টি নবজাতকের মধ্যে ৭০টি মারা যায় জন্মের অনতি বিলম্ব পরেই। এ অঞ্চলে মেয়েরা মা হন গড়ে ২০.৫ বছর বয়সে, অর্থাৎ বিয়ে হবাব পর গড়ে ২ বছর ৩ মাসে মধ্যেই। সন্তানের জন্মহার সর্বোচ্চ গড মুসলমানদের মধ্যে, গড়ে ৫.৪ টি। এরপর ক্রিশ্চান ৪.৭ টি, তারপর শিখ ৪.৬ ও হিন্দু ৪.৫। শিক্ষিত স্বামী নিযে সংসার করেন এমন মহিলাদের মধ্যে শিশুর সর্বোচ্চ জন্মহার গড়ে ৩.৫ টি। আর স্বামী-স্ত্রী দুজনেই নিরক্ষর এমন দম্পতিদেব মধ্যে শিশুর জন্মহারের গড় ৫.১ টি।

এই শিল্পাঞ্চলের জনসংখ্যার ১১,১৪৫ জন মানুষের মধ্যে সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে যে এদের মধ্যে ৫৪.৩ মানুষ অবিবাহিত, ৪২.৮ শতাংশ বিবাহিত আর প্রায় ৩ শতাংশ মানুষ হয় বিপত্নীক, বিধবা কিংবা বিবাহবিচ্ছিন্ন। নারী-পুরুষের সমানুপাতিক হার বিবেচনা ক্ষেত্রে দেখা গেছে ৬,০৬৫ জন পুরুষের মধ্যে ৫৭.৮ শতাংশ অবিবাহিত, ৪১.২ শতাংশ বিবাহিত আর বাকি প্রায় ১ শতাংশ বিপত্নীক কিংবা বিবাহবিচ্ছিন্ন। পক্ষান্তরে, সমীক্ষায় ৫,০৮০ টি মহিলার মধ্যে ৫০.২ শতাংশ অবিবাহিত, ৪৪.৭ শতাংশ তাদের স্বামীর সঙ্গে বসবাস করেন এবং বাকি ৫.১ শতাংশ হয বিবাহবিচ্ছিন্ন কিংবা বিধবা।

জাতি বা ধর্মবিশ্বাসের পটভূমিতে এই জনসংখ্যার বৈবাহিক অবস্থান বিবেচনা করা যেতে পারে। দেখা গেছে, হিন্দুদের ক্ষেত্রে শতকরা ৪৪ জন পুরুষ এবং ৫০ জন মহিলা বিবাহিত। মুসলমানদের ক্ষেত্রে বিবাহিতের অনুপাত পুরুষদের মধ্যে শতকরা ৩১.৪ এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে ৪৪.৭; ক্রিশ্চানদের ক্ষেত্রে পুরুষ শতকরা ৩৫.১ এবং মহিলা ৪৬.১, আর শিখদের ক্ষেত্রে পুরুষ শতকরা ৩৭.৭ আর মহিলা ৪১.৭। আবার, ২.২ শতাংশ হিন্দু-পুরুষ এবং ১৭.৪ শতাংশ হিন্দু-মেয়ের বিয়ে হয়ে যায় ১৫ বছর বয়সের আগেই। মুসলমান মেয়েদের মধ্যে ১৫ বছর বয়সের আগেই বিয়ে হয় ১৩.৬ শতাংশের আর শিখ মেয়েদের ক্ষেত্রে এই অনুপাত ১৪.৬ শতাংশ। কিন্তু সমীক্ষায় ১৫ বছরের আগে কোন মুসলমান, শিখ কিংবা ক্রিশ্চান ছেলের বিয়ের তথ্য জানা যায়নি।

সমীক্ষায় দেখা গেছে, হিন্দু, মুসলমান কিংবা শিখদের মধ্যে ১৫ থেকে ১৯ বছ বয়স হল মেয়েদের বিয়ের সবচেয়ে মনোমত সময়। কিন্তু ক্রিশ্চান মেয়েদের ক্ষেত্রে সবচেয়ে পছন্দসই বিয়ের বয়স হল ২০ থেকে ২৪ বছর। আবার পুরুষদের ক্ষেত্রে, সব ধর্মের মানুষদের মধ্যেই বিয়ের মনপসন্দ বয়স

হল ২৫ থেকে ২৯ বছর। ৩০ বছরে উর্দ্ধে বিয়ে করে এমন মেয়ে এ-অঞ্চলে হিন্দুদের মধ্যে অত্যন্ত নগণ্য, সমীক্ষায় ২,৫৩০ জনের মধ্যে মাত্র ১৬ জন পক্ষান্তরে, পুরুষদের ক্ষেত্রে ৩০ বছর বয়সের উর্দ্ধে বিয়ে করে এমন মানুষের সংখ্যা প্রায় ১৫ থেকে ২০ শতাংশ। অবশ্য শিখদের ক্ষেত্রে এই অনুপাত ৫.৮ শতাংশ। ৩৫ বছরের উর্দ্ধে বিয়ে করেন এমন পুরুষদের অনুপাত হিন্দুদের ক্ষেত্রে একেবারেই নগণ্য, মাত্র ১.৪ শতাংশ কিন্তু ক্রিশ্চানদের ক্ষেত্রে ৫ শতাংশ।

হিসেব করে দেখা গেছে, পুরুষদের মধ্যে বিয়ের বযসেব সর্ব্বোচ্চ গড় হিন্দু পরিবারে সবচেয়ে বেশী, ২৬.৮ বছর। এরপর ক্রমান্বয়ে ক্রিশ্চান পরিবারে ২৫.৭ বছর, মুসলমান পরিবারে ২৫ বছর, শিখ পরিবারে ১৮ বছর। মেয়েদের ক্ষেত্রে হিন্দু পরিবারে সর্ব্বোচ্চ বিয়ের বয়সের গড হল ১৮.১ বছর, শিখদের মধ্যে ১৫.৫ বছর, মুসলমানদের মধ্যে ১৯.৫ বছর, সবচেয়ে বেশী হল ক্রিশ্চান মেয়েদের মধ্যে, ২২.২ বছর। এ বিষযে সবচেযে কৌতুকময ব্যাপার হল, হিন্দু মেয়েদের ৪৮.৬ শতাংশ, শিখ মেয়েদের ৪৫.৮ শতাংশ আব মুসলমান মেয়েদের ৩৩.৬ শতাংশ বিয়ের জন্য সরকার অনুমোদিত ন্যূনতম বয়সের আগেই বিয়ে-শাদি সেরে ফেলেন। কিন্তু ক্রিশ্চানদের ক্ষেত্রে সমীক্ষায় একজন মহিলাকেও ১৮ বছর বয়সের আগে বিয়ে করতে দেখা যায়নি। আবার, হিন্দু পুরুষদের ২৩ শতাংশ, শিখ ও মুসলমানদের ক্ষেত্রে ১৬ শতাংশ আর ক্রিশ্চানদের ক্ষেত্রে মাত্র ৮.৭ শতাংশ বিয়ে করেন ২১ বছর বয়সের আগে।

আসানসোল শিল্পাঞ্চলে বছরে গড়ে ৫৯ জনের মৃত্যু হয। এদের মধ্যে ২৯ জন পুরুষ আর ৩০ জন মহিলা। অন্যভাবে বলতে গেলে, এ অঞ্চলে প্রতি হাজারে মৃত্যুহার ৫.৩ জন। সর্ববঙ্গীয় অনুপাতের হিসেবে, এই মৃত্যুহার যথেষ্ট কম। সারা বাংলায় মৃত্যুহার প্রতি হাজার জনসংখ্যায ১১.৮ জন। মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা গেছে, অধিকাংশ মৃত্যুই (৫৯ জনের মধ্যে ২১ জন) হয়েছে বার্ধক্যজনিত কারণে। অন্য কারণের মধ্যে হার্টের গণ্ডগোল, ক্যান্সার, লিভারের অসুখ, ডায়েরিয়া, দুর্ঘটনা ইত্যাদিকে দাযী করা হয়েছে। বিস্তৃত সমীক্ষায় প্রকাশ, ৫৯ জনের মধ্যে ৪টি শিশু মৃত্যু ঘটেছে। এদের মধ্যে ৩টি শিশুর মৃত্যুর ডায়েরিয়ায় এবং একটি অপরিণত প্রসবজনিত কারণে।

জনসমাগম : কত এল, কারা এল

ভারতের পূর্বাঞ্চলের এই শিল্প-শহরে বিভিন্ন কলকারখানা আর কয়লাখনিতে কাজের লোভে আশ-পাশের প্রদেশ থেকে মানুষ ভিড় করেছে। এ জনসমাগমের শুরু সম্ভবত ১৯৩১ সালে। তারপর ১৯৫১-৬১ সালের মধ্যে এ-অঞ্চলে

জনসংখ্যা যা বেড়েছে তার অর্ধেক এসেছে বাইরে থেকে। মানুষ এসেছে কাজের নেশায়, পেশাগত দক্ষতা নিয়ে বিশেষ কেউ আসেনি প্রথমে। খাদান থেকে কয়লা তোলার কাজে অবশ্য তাগদই যথেষ্ট। তারপর যারা এসেছে তাদের কাছ থেকে দাবি করা হয়েছে দক্ষতার প্রমাণপত্র। গড়ে উঠেছে ক্রমে ক্রমে নতুন নতুন কল-কারখানা, ছোট-বড়, অনেক। কারখানার কাজে, বিশেষত আধুনিকতার হাওয়া-লাগা উদ্যোগে কারিগরি দক্ষতাই বিবেচ্য হয় চাকুরির শর্তে। তাই লোকাগমনের জোয়ারে এল ভাটার টান।

১৯৭১ সাল থেকে ১৯৮৩ সালের মধ্যে এ-অঞ্চলে নবাগত এসেছে ৯৫৪ জন। এদের মধ্যে ৫৩৩ জন পুরুষ আর ৪২১ জন মহিলা। আবার এই ৯৫৪ জনের মধ্যে ৮২৪ জন এসেছে সত্তরে দশকে। বাকি ১৩০ জন এসেছে দু'বছরে, ১৯৮১—৮৩ সালে। সত্তরের দশকে যা জনাগম ঘটেছে তা বর্তমান এই শিল্পাঞ্চলের জনসংখ্যার প্রায় সাড়ে-সাত শতাংশ। এই নবাগতদের প্রায় ৮০ শতাংশ হল কর্মক্ষম যুবক যুবতী। কিন্তু কর্মক্ষম হলেও সকলেই কাজ পায়নি এখানে। পরিসংখ্যানে প্রকাশ, ৮২৪ জন নবাগতের ২৪৩ জন, বা প্রায় ৩০ শতাংশ মাত্র কাজ পেয়েছে। তবুও এখানে স্থায়ী নিবাসীদের চেয়ে বহিরাগতদের মধ্যেই কর্মীর অনুপাত বেশি। আদি-নিবাসীদের মধ্যে ২৪ শতাংশ চাকুরীজীবী। ২৪২ জন বহিরাগত পুরুষকর্মীর মধ্যে দেখা যায় প্রায় ৪৫ শতাংশ বৃহদায়তন শিল্পে নিযুক্ত, ব্যবসাবাণিজ্যে প্রায় ২০ শতাংশ, ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পে নিযুক্ত প্রায় ১৫ শতাংশ, খনি শিল্পে প্রায় ৬ শতাংশ ইমারতি কাজকর্মে বা যানবাহনে নিযুক্ত ১ শতাংশ। মেয়েদের মধ্যে ৮০ শতাংশ এসেছে বৈবাহিক সূত্রে, বরের সঙ্গে, আর ২০ শতাংশ এসেছে বাবা-মায়ের সঙ্গে, কর্মসূত্রে। পুরুষদের মধ্যে ৪৫ শতাংশ এসেছে কাজের খোঁজে, আরও ৪৫ শতাংশ এসেছে বাবা-মায়ের কর্মসূত্রে আর বাকি ১০ শতাংশ ব্যবসার ধান্দায় বা পড়াশুনার স্বার্থে।

এ-শিল্পাঞ্চলে নবাগতদের মধ্যে ৫৭ শতাংশ এসেছে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে, ৩৯ শতাংশ এসেছে বাঙলার প্রতিবেশি রাজ্য থেকে, ৪.২ শতাংশ এসেছে বাংলাদেশ আর নেপাল থেকে। পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার মধ্যে কলকাতা থেকে আগতের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি, যাবতীয় নবাগতের প্রায় ২৫ শতাংশ। বর্ধমান থেকে এসেছে প্রায় ২৩ শতাংশ আর বাকি ৫২ শতাংশ এসেছে বঙ্গের অন্যান্য জেলাগুলি থেকে। প্রতিবেশী রাজ্যের মধ্যে বিহার থেকে এসেছে ৫২ শতাংশ, তারপর উত্তরপ্রদেশ থেকে ১৪.১ শতাংশ, উড়িষ্যা থেকে ১১ শতাংশ, পাঞ্জাব থেকে ৬.৬ শতাংশ, মধ্যপ্রদেশ থেকে ৬ শতাংশ আর কেরালা, অন্ধ্র, তামিলনাড়ু থেকে মোট ১০.৭ শতাংশ।

বহির্গমন : কারা গেল, কেন গেল

গত ১৯৭১—৮৩ সালের মধ্যে, ১২ বছরে, এই শিল্পাঞ্চল থেকে বাইরে গেছে মাত্র ১৪১ জন অর্থাৎ বছরে গড়ে একজন করে। এদের মধ্যে ১০২ জন পুরুষ আর ৩৯ জন মহিলা গত সত্তর দশকের আগমন-বহির্গমন সমানুপাতিক হিসেবে আসানসোল শিল্পাঞ্চল লাভ করেছে ৬.৩২ শতাংশ মানুষ। বহির্গামী ১০২ জন পুরুষের মধ্যে ৭০ শতাংশ গেছে চাকুরী সূত্রে আর বাকি ৩০ শতাংশ উচ্চশিক্ষার জন্য শহর কলকাতায় কিংবা বাংলার বাইরে। মেয়েদের মধ্যে ৮৫ শতাংশ বাইরে গেছে বিবাহসূত্রে আর মাত্র ১৫ শতাংশ উচ্চশিক্ষার আশায়।

বেকার ও কর্মী বৃত্তান্ত : কাজ চাই, কাজ

সমীক্ষায় দেখা গেছে, এই শিল্পাঞ্চলে মোট জনসংখ্যার ২৪.২ শতাংশ মানুষ নানা পেশা ও কর্মে নিযুক্ত আছেন, আর বাকি ৭৫.৮ শতাংশ মানুষ কর্ম হীন। স্ত্রী-পুরুষ বিচারে, ৪০ শতাংশ পুরুষ আর ৫.৪ শতাংশ মহিলা কর্ম নির্ভর। সর্ববঙ্গীয় বিচারে এখানে পুরুষের কর্ম নিযুক্তির হার অপেক্ষাকৃত কম, মহিলাদের বেশি। শহুরে বঙ্গীয় পুরুষদের কর্মনিযুক্তির হার ৪৮.৪ শতাংশ, মহিলাদের ৫.১ শতাংশ।

এ-অঞ্চলের মোট জনসংখ্যার ৭৫.৮ শতাংশ মানুষ কর্মহীন বললে বেকারত্বের যে ভয়াবহ ছবিটি আমাদের মনে ভেসে ওঠে, পরিস্থিতি ততটা ভয়াবহ নয়। কারণ এই বেকারদের মধ্যে কর্মপ্রার্থী বেকার, ছাত্র, শিশু, অবসরপ্রাপ্ত মানুষজন, ভবঘুরে, ভিখারি সকলকেই ধরা হয়েছে। ADDA-র সমীক্ষায় দেখা গেছে, ২,৭০১ কর্মীর মধ্যে ৬০ শতাংশ ১৫ থেকে ৩৯ বছর বয়সের মধ্যে, ৪০—৫৯ বয়ঃক্রমের মধ্যে আছেন ৩৭.৭ শতাংশ আর ২৩ শতাংশ কর্মী ৬০ কিংবা তদুর্ধ বয়সের মধ্যে। ADDA ৮,৪৪৪ বেকার মানুষের মধ্যে সমীক্ষা চালিয়ে দেখেছেন, এদের প্রায় ৪০ শতাংশ শিশু এবং স্কুলের পড়ুয়া, প্রায় ২০ শতাংশ গৃহস্থালীর কাজে ব্যস্ত গৃহবধূ, ৯ শতাংশ পরনির্ভর, প্রায় ৬ শতাংশ বৃদ্ধ এবং অবসরপ্রাপ্ত আর প্রকৃত অর্থে বেকার এবং কর্মপ্রার্থী হল ২৬.৫ শতাংশ।

কর্মী ও কর্মহীনতার ছবিটি ধর্ম ও জাতিগত পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করা যেতে পারে। দেখা গেছে, খৃষ্টানদের মধ্যে ৩৯ শতাংশ চাকুরিরত, শিখদের ৩০ শতাংশ, হিন্দুদের মধ্যে ২৪ শতাংশ আর মুসলমানদের ২১.৩ শতাংশ কর্মরত। চাকুরিরত মানুষদের অধিকাংশই শিল্পে নিয়োজিত (secondary sector)।

তারপর সেবামূলক কর্মে বা Tertiory sector-এ কৃষিকর্মে (primary sector) নিযুক্ত কর্মীর সংখ্যা এখানে নিতান্তই নগণ্য এবং তা স্বাভাবিক কারণেই। সমীক্ষায় প্রকাশ, কর্মীদের ৫১.১ শতাংশ শিল্পে, ৪১.৫ শতাংশ সেবাপ্রকল্পে আর ৭.৪ শতাংশ কৃষিকর্মে নিযুক্ত।

আয়-ব্যয়ের হিসেব

১৯৮৪ সালের পরিসংখ্যান মতে, আসানসোল শিল্পাঞ্চলে শিল্পে নিযুক্ত কর্মীদের সর্বোচ্চ মাসিক গড় আয় হল ৮৩৩.৫ টাকা, ব্যবসায় ৮৪৬.৮ টাকা আর সেবামূলক কর্মে আয ৭৬৩.৩ টাকা। সর্বোচ্চ গড আয়ের কর্মীরা কয়লাখনিতে নিযুক্ত (টাঃ ৮৪৭.৪) আর সর্বনিম্ন আযের মানুষরা (টাঃ ৫০০ বা তারও কম) চাষবাস বা ইমারতি কাজে নিযুক্ত। এখানে ট্রান্সপোর্ট কর্মীদের গড আয় ৭২২.৫ টাকা, আর স্বযম্ভর কুটির শিল্পে নিযুক্ত মানুষদের গড় মাসিক আয ৬৩৬.৭ টাকা। আযের হিসেব যা পাওয়া গেছে তা অধিকাংশই মৌখিক প্রতিবেদন সূত্রে। তাই এই সংখ্যাতত্ত্বের যথার্থতা সন্দেহাতীত নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উত্তরদাতা তার প্রকৃত আয় গোপন করেছেন বলে মনে হয।

তার মানে অবশ্য এই নয় যে এ-অঞ্চলের মানুষজন রীতিমতো আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যে আছেন। কয়লাখনিতে নিযুক্ত শ্রমিকদের মাসিক বেতন গড হিসেবে এখানে সবচেয়ে বেশি। তাই কয়লাখনির শ্রমিকদের আর্থিক অবস্থানের প্রকৃত ছবিটি ধরার চেষ্টা করা থাক। একথা সত্যি যে গত ১৯৭৪, ১৯৭৯ ও ১৯৮৩ সালেব বেতন বোর্ডের সুপারিশক্রমে খনি মজুরদের আর্থিক সুরাহা অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছে; কিন্তু সেই বেতন বৃদ্ধির পরিমাণ এমন নয় যে খনি শ্রমিকরা ভালভাবে সঞ্চয় কবতে পারছেন। ১৯৮৫ সালের একটি সমীক্ষা থেকে জানা যাচ্ছে, মাত্র ২৪ শতাংশ লোকের ব্যাঙ্কে আমানত প্রকল্প আছে, ১৭ শতাংশ মানুষের আছে CTD অ্যাকাউন্টস্, ৪৭ শতাংশের আছে LIC পলিসি। CTD আর LIC বেতন থেকেই কাটা হয়। তাই এই সঞ্চয় প্রকল্প অনেকটাই বাধ্যতামূলক।

ফলত অধিকাংশ খনি মজুরকেই সময়ে অসময়ে ঋণ করতে হয়। বছর দশেক আগে ৫০০টি খনি মজুর পরিবারে সমীক্ষা চালিয়ে ADDA দেখেছেন, প্রায় ৪০ শতাংশ পরিবার কোন-না কোন ঋণে বিপর্যস্ত। এদের সামগ্রিক ঋণভারের পরিমাণ ৮,৩৫,৮৭০ টাকা। অর্থাৎ প্রত্যেকে গড়ে প্রায় ৪,০৯৮ টাকা ঋণী। এই সব ঋন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মহাজনের কাছ থেকে নেওয়া যারা সুদ নেন মাসে ১০ থেকে ১২.৫ শতাংশ। ঘুসিক কোলিয়ারির তিন নম্বর পিটের এক খালাসি জানাচ্ছে, যে সে অবস্থান্তরে এক মহাজনের কাছ

থেকে ১৪ বছর আগে ৪০০০ টাকা ঋণ নিয়েছিল মাসিক ১০ শতাংশ সুদে। এ পর্যন্ত সে মহাজনকে শুধুমাত্র সুদ পরিশোধ করেছে ৬৭,২০০ টাকা (৪০০ x ১২ x ১৪)।

পরিবেশ : স্বাস্থ্য-অস্বাস্থ্য

১৯৮১ সালের হিসেব মতে, আসানসোল সাব-ডিভিসনের ২৮৫টি গ্রামে মোট লোক বাস করেন ৪,০৪,৯৯৫ জন। এই ২৮৫টি গ্রামের মধ্যে মাত্র ৪৬টি গ্রামে মোটামুটি চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা আছে। অন্যভাবে বলতে গেলে, ২৩৯টি গ্রামে চিকিৎসা বা স্বাস্থ্যরক্ষার কোন ব্যবস্থাই নেই। আবার ৫৬টি গ্রামের লোককে ডাক্তারী সুযোগ-সুবিধা নিতে কম করে ৫ কিলোমিটার হাঁটতে হয। চারলাখের উপর লোকের জন্য ২১টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে বেড আছে মাত্র ১৮৯টি।

পক্ষান্তরে, শহর শিল্পাঞ্চলে, আমাদের সমীক্ষা এলাকায়, স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা ততটা ভয়াবহ নয়। শহরাঞ্চলে, ১৬টি হাসপাতালে, বেড আছে ২,৩১৪টি, ডাক্তার আছেন ৩৬৫ জন। কিন্তু এইসব হাসপাতালের মধ্যে মাত্র ৪টি হল সরকারি হাসপাতাল। বাকি হাসপাতালগুলি হয় রেলের কিংবা কোলিযারির অধীন যেখানে চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা পান শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট কর্মীবাই।

আসানসোল এবং সংশ্লিষ্ট দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলে কয়লাখনি আছে একশ'রও বেশি। বড কারখানা আছে কমপক্ষে ৬০টি। সাম্প্রতিক সমীক্ষায দেখা গেছে, এ-অঞ্চলের শিশুদের মধ্যে asthma, bronchial trouble, septic tonsillities, throat trouble, cancer প্রভৃতি রোগ বাড়ছে। দূষিত পানীয় জল বাড়াচ্ছে কলেরা, টাইফয়েড এবং আরও অনেক আন্ত্রিক ব্যাধি। এ-শিল্পাঞ্চলে বিশুদ্ধ পানীয় জলের সমস্যা, বিশেষত কোলিযারি অঞ্চলে, অত্যন্ত ভয়াবহ। Eastern Coalfields Limited-এর আসানসোল অঞ্চলে সবচেয়ে বড় হাসপাতাল হল কল্লা। কল্লা হাসপাতাল বছরে গড়ে দেড় লক্ষ রুগী চিকিৎসিত হয় যাদের মধ্যে প্রায় ১৫ শতাংশ হল Indoor patients.।হাসপাতালের সংবাদসূত্রে জানা যাচ্ছে, কলকারখানার ধোঁয়া, বিশেষ করে Reckitt Colman & Co-র বর্জ্য পদার্থ, এ অঞ্চলে বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটাচ্ছে। তাছাড়া কয়লাখনির ধুলো-ধোঁয়া পরিবেশ দূষণে যথেষ্ট দায়ী।

পার্শ্ববর্তী রাণীগঞ্জের MCM Eye Hospital-এর সংবাদসূত্রে প্রকাশ, গত ১৯৮৮ সালে তিন হাজার চক্ষুরুগীর মধ্যে বার'শ রুগীর চোখ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে কোন-না-কোন খনিজ কর্মসূত্রে। এ-অঞ্চলের অধিকাংশ Allergic Bronchitis, Tuber Culosis, Silicosis রোগের কারণ হিসেবে হাসপাতাল-সূত্র কয়লা আর পাথুরে ধুলোময়লাকে দায়ী করেছে।

সূত্র নির্দেশ

১. **Socio-Economic and Demographic Profile of Urban Asansol:** Asansol-Durgapur Development Authority (ADDA). Asansol. Dec. 1984.

২. **Facts and Problems of the Small-scale and Cottage Industries of the Asansol-Durgapur Region:** ADDA Asansol. March. 1986.

৩. **Medical Facilities in the Asansol-Durgapur Region and the estimated future needs:** ADDA. Asansol. Feb. 1989.

৪. **Industrial Pollution and Health hazards in Asansol-Durgapur Region:** ADDA. Asansol. March, 1989.

৫. **Survey of Coal Mine Workers, 1985:** ADDA. Asansol. March, 1989.

৬. **Study on the Demand of Residential land in the proposed Mangalpur Satellite Township, Ranigainj:** ADDA. Asansol. Dec, 1989.

৭. **Census of India, District Census Hand Book, Barddhaman,** 1981

দার্জিলিং পার্বত্য অঞ্চলের মাড়োয়ারী সমাজ: একটি সমীক্ষা

নারায়ণচন্দ্র সাহা

প্রথমেই একটা কথা বলে নেওয়া ভাল যে, ইতিহাস সংসদের নবম বার্ষিক সম্মেলনে (১৯৯২) আমি "দার্জিলিং তরাই অঞ্চলের মাড়োযাবী সমাজ: একটি সমীক্ষা" শীষক প্রবন্ধটি পাঠ করেছিলাম উক্ত প্রবন্ধটি "ইতিহাস অনুসন্ধান" ৮ম সংখ্যায প্রকাশিত হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধটি উক্ত প্রবন্ধের পরিপূরক হিসেবে ধরা যেতে পারে। আবার পার্বত্য অঞ্চলকে আলোচনার গণ্ডি হিসেবে নির্বাচন করা হলেও, তরাই অঞ্চল মাঝে মাঝে আলোচনা প্রসঙ্গে এসে যাবে। কারণ দুই অঞ্চলের সাযুজ্য না ঘটলে অনেক সময পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যাবে না।

আঞ্চলিক বা জেলাভিত্তিক এবং অভিজ্ঞতা লব্ধ গবেষণা আধুনিক ইতিহাস চর্চার একটি বৈশিষ্ট্য। আলোচ্য প্রবন্ধে এই ধরনের একটি বিনীত প্রযাস নেওয়া হয়েছে এবং এই দিক থেকে বিচার করলে প্রবন্ধটির যথেষ্ট যৌক্তিকতা এবং প্রাসঙ্গিকতা রযেছে। দার্জিলিং পার্বত্য অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে মাড়োয়ারী সম্প্রদায়ের স্বকীয ভূমিকার চালচিত্র তুলে ধরাই আলোচ্য প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য।

ভূ-প্রাকৃতিক কারণে দার্জিলিং জেলাকে পার্বত্য এবং তরাই অঞ্চলে ভাগ করা হয়। কার্সিয়াং, দার্জিলিং জেলা শহর, এবং কালিম্পং পার্বত্য অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত এবং শিলিগুড়ি ও তৎ-সন্নিহিত এলাকা তরাই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। ১৮৩৫ সালে ৩০০০ টাকা ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে বৃটিশ-রাজ স্বাস্থ্য নিবাস স্থাপন এবং সামরিক কারণে সিকিম রাজার কাছ থেকে ২৪ মাইল লম্বা এবং ৫—৬ মাইল চওড়া যে বিস্তীর্ণ পার্বত্য খণ্ডটি লাভ করেছিলেন তাই দার্জিলিং নামে পরিচিত। ১৮৫০ সালে তরাই অঞ্চল (মোরং), যা একদা পূর্ণিয়ার অন্তর্ভুক্ত ছিল, তা এর সঙ্গে যুক্ত হয় এবং জেলার সর্বশেষ সংযোজন হল কালিম্পং (১৮৬৬)। কিন্তু দার্জিলিং যখন বৃটিশের দখলে আসে, তখন ইহা ছিল প্রায় জনমানব শূন্য এক ঘন জঙ্গলাবৃত দুর্গম পাহাড়ী অঞ্চল। তখন ১৩৮ স্কোয়ার মাইল পাহাড়ে মাত্র ১০০ জন লোকের বাস ছিল। ঘন জঙ্গল, দুর্গম পাহাড় এবং উপযুক্ত যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবহেতু জনপ্রবেশ এখানে ঘটত না বললেই। চলে কেবলমাত্র তারাই আগত যারা অরণ্য কবলিত পাহাড়ী জমিতে কোনরকমে চাষ করে এবং বুনো ফল-মূলকে সম্বল করে জীবিকা নির্বাহের দুঃসাহস দেখাত।

এখন প্রশ্ন হ'ল এই "Worthless uninhabited mountain"-এ এমন কি ঘটল, যার জন্য ধীরে ধীরে দুর্গম পাহাড়ে লোকবসতি বাড়তে লাগল এবং ভিন্ন দেশী বণিকরা বিশেষ করে মাড়োয়ারীরা জীবিকার সন্ধানে এখানে ভিড়তে লাগলেন। নেহাত স্বাস্থ্য নিবাস নির্মাণ এবং সামরিক কারণে (As the key of a pass into the Nepal territory) বৃটিশরা দার্জিলিং অধিগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু শীঘ্রই তাঁরা এখানে কয়েকটি অর্থনৈতিক সম্ভাবনা আবিষ্কার করেন যথা (১) আন্তর্হিমালয় বাণিজ্যিক সম্ভাবনা এবং সিকিম ও ভুটানের মধ্যদিয়ে তিব্বতের সঙ্গে এবং সেই সূত্রে চীন হয়ে মধ্য-এশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য পথ আবিষ্কার, এবং (২) এখানে চা, কফি, সিনকোনা, কমলালেবু ইত্যাদি উৎপাদনের উপযুক্ত আবহাওয়া এবং পরিবেশ আবিষ্কার। সুতরাং এই অর্থনৈতিক সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করার জন্য প্রয়োজন দেখা দিল জায়গাটিকে বাসযোগ্য এবং যোগাযোগের উপযুক্ত করে তোলা।

অতএব শুরু হল পাহাড়ের সঙ্গে সমতলের যোগাযোগ স্থাপনের জন্য নতুন নতুন রাস্তা নির্মাণ, পাহাড়ে বাংলো এবং হোটেল নির্মাণ, বেসরকারী বাড়ী নির্মাণে মদতদান এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে পাহাড়ী অধিবাসীদেব আকর্ষণ করে এখানে বসতি স্থাপনে উৎসাহ দান, হাট-বাজার স্থাপন, বন পরিষ্কার করে চাষাবাদে উৎসাহ দান, দেশী-বিদেশী বণিকদের আকৃষ্ট করা, স্বাস্থ্য নিবাস এবং বিদ্যালয় নির্মাণ, নগরায়ণ ডাক ও তার যোগাযোগ স্থাপন এবং সর্বোপরি রেললাইন স্থাপন। এইভাবে আধুনিক দার্জিলিং-এর জন্ম হয়। আগে দার্জিলিংএ যেতে হলে বৈদেশিক রাষ্ট্র সিকিমের মধ্য দিয়ে যেতে হতো। কিন্তু তরাই ও কালিম্পং দার্জিলিং-এর সঙ্গে যুক্ত হলে দার্জিলিং সমতলের বৃটিশ জেলা পুর্ণিয়া এবং রংপুরের সঙ্গে বরাবর যুক্ত হয়। ফলে সমতলের ব্যবসা-বাণিজ্য এমন সীমান্ত-পাহাড়ী বাণিজ্যের সঙ্গে মিশে যায়। পার্শ্ববর্তী জেলাগুলির যথা কুচবিহার, জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর ইত্যাদির ব্যবসা-বাণিজ্যও আন্তর্হিমালয় বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়। ফলে ভিনদেশী বণিকদের আনাগোনা শুরু হয় আর এই সূত্রে মাড়োয়ারী 'বানিয়ারা'ও পাহাড়ে এসে বাণিজ্য শুরু করেন। তবে এসবের মূলে যে তিনজন বৃটিশ সিভিলিয়ানের অসামান্য কৃতিত্ব তাঁরা হলেন Mr. Grant, Mr. Lloyd এবং Dr. Campbell. L. SS O' Malley যথার্থই মন্তব্য করেন, "To Grant and Lloyd, Darjeeling is indebted for the discovery of the possibilities of this bracing climate to reinvigorate the worried workers of the plains; to Lloyd for the cession of the hill territory, ...and to Campbell for the introduction of the tea plant and for his unceasing and successful

efforts to develop the resources of the district." এঁদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় পাহাড়ের জনসংখ্যা যেমন দিনে দিনে বাড়তে থাকে তেমনি শুরু হয় চা, কফি এবং বিভিন্ন ফলের পরীক্ষামূলক চাষাবাদ। ১৮৩৯ সালে পাহাড়ের লোক সংখ্যা ছিল ১০০। ১০ বছর পর এই সংখ্যা ১০,০০০-এ এবং ১৮৬৯ সালে ২২,০০০-এ পৌঁছায়। সেই সঙ্গে বৃদ্ধি পায় বাড়ী-ঘর, নতুন নতুন রাস্তা, বাজার এবং পাহাড়ী জমি চাষ। ক্যাম্পবেলের সময় দার্জিলিং-এ অন্তত ৭০টি ইওরোপীয় বাংলো নির্মিত হয়েছিল এবং সরকারের রাজস্ব আদায় ৫০,০০০ টাকায় উন্নীত হয়েছিল।

ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে দার্জিলিং-এ মাড়োয়ারী বণিকদের পদার্পন হয়। ১৮৪৫ সালে দার্জিলিং-এ, ১৮৬৫ সালে কালিম্পং-এ এবং উনিশ শতকের ৫—৬-এর দশকে কার্সিয়াং-এ এঁদের অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। Mr C.F. Magrath-এর District Census Compilation (1872) অনুসারে তখন জেলায় ৮৯৭২ জন রাজপুত জাতির লোক বাস করত। এঁদের মধ্যে পাহাড়ে বাস করত ১৭৫৪ জন। মাড়োয়ারীরা আদিতে রাজপুত নামে পরিচিত ছিলেন। আবার ঐ রিপোর্টে দেখানো হয়েছে যে, দার্জিলিং হেড কোয়ার্টার্সে ১০ জন মাড়োয়াড়ী এবং ১৮ জন আগরওয়ালা পদবীধারীর মধ্যে ৯ জন পার্বত্য মহাকুমায় এবং ৩৪ জন ওসওয়াল পদবীধারীর মধ্যে ১৩ জন পাহাড়ে বাস করতেন। বাকীরা তরাই অঞ্চলে ছিলেন।

১৮৭২ সালের H. Beverley'-র পরিসংখ্যান মতে, ঐ সময় বাংলায় সর্বমোট ৪৯১০ জন মাড়োয়ারী বাস করতেন। এঁদের মধ্যে ২৮ জন ছিলেন দার্জিলিং-এ। ১৮৮১—১৮৯১ সালে প্রকৃত অর্থে (Bengal proper) বাংলায় ৪৬৭৯ জন মাড়োয়ারী রাজপুতানা অঞ্চল থেকে আসেন। এঁদের মধ্যে আবার দার্জিলিং-এ অভিবাসন করেন ৮০ জন। ১৮৯১—১৯০১ সালে সঠিক বাংলায় আসেন ২৫,৭৪১ জন যাঁদের মধ্যে দার্জিলিং-এ অভিবাসন করেন ৬৪৭জন। তেমনি ১৯০১—১৯১১ সালে বাংলায় আসেন ৩৬৬৫৯ জন, তাঁদের মধ্যে দার্জিলিং-এ অভিবাসন করেন ৮৫৫ জন। একইভাবে ১৯১১—১৯২১ সালের মধ্যে বাংলায় অভিবাসিত ৪৭৮৬৫ জন মাড়োয়ারীর মধ্যে ৯২৫ জন আসেন দার্জিলিং-এ। ১৯২১—৩১ সালে রাজপুতানাজাত ৩২৯০৬ জন ব্যক্তি বাংলায় অভিপ্রয়াণ করেন, যাঁদের মধ্যে দার্জিলিং-এ প্রবেশ করেন ৮০১ জন। উপরিউক্ত পরিসংখ্যান থেকে লক্ষ্য করার বিষয় হল যে, দার্জিলিং-এ মাড়োয়ারী অভিবাসন সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছেছিল ১৯১১—১৯২১ সালে। এই বৃদ্ধির পশ্চাতে কিছু কারণ দেখানো যেতে পারে জেলার যোগাযোগ এবং নগরায়ণের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি, রেল যোগাযোগ স্থাপন এবং ব্যবসা ভিত্তিক চা-শিল্পের উন্নতি।

১৯৪১ সালে ধর্মীয় ভিত্তিতে দেখানো হয়েছে যে, সে সময় দার্জিলিং-এ ৫৪ জন জৈনের বাস ছিল এবং সর্বমোট জেলায় মাড়োযারীর সংখ্যা ছিল ২৪১৬। তবে সবাই শহরে বাস করতেন না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে, সদর মহকুমায় ১০০২ জনের মধ্যে মাত্র ৫৫৯ জন শহরে বাস করতেন, বাকীরা গ্রামে। আবার কার্সিয়াং মহাকুমার চা-বাগান অঞ্চলে ছিলেন ৬৬ জন এবং কালিম্পং মহাকুমায় শহরের বাইরে বাস করতেন ১৪০ জন মাড়োয়ারী। ১৯৫১ সালের জনগণনায় দেখানো হয়েছে যে, সে সময় দার্জিলিং-এ ৯৮১ জন রাজস্থানীর বাস ছিল। অবশ্য এই পরিসংখ্যান জাতিগত ভাবে করা হযেছে। একই জনগণনায়, ভাষাগত দিক দিযে বিচার করে ২০০৮ জন মাড়োয়ারী এবং ১০৫৩ জন রাজস্থানীর অবস্থান দেখানো হয়েছে। এক্ষেত্রে মাড়োয়ারীদের ভাষা যে হিন্দি ছিল সে কথা ধরে নেওয়া যায়।

দার্জিলিং পার্বত্য অঞ্চলের অর্থনৈতিক জীবনে মাড়োয়ারী বণিকদের উদ্যোগ অপ্রতিহত। যে সমস্ত ক্ষেত্রে এই উদ্যোগ বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় সেগুলি হল মহাজনী, আড়তদারি, কমিশন এজেন্সী, আমদানি এবং রপ্তানী, পাইকারী এবং খুচরা, ইত্যাদি ব্যবসা। বর্তমানে চা-শিল্পে তাঁদের উদ্যোগ নজিরবিহীন। তবে সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে দার্জিলিং তরাই অঞ্চলে মাড়োযাবীগণ যে ভূমিকা পালন করে চলেছেন তা পাহাডী অঞ্চলে তেমনভাবে চোখে পড়ে না। অবশ্য এখানে "অখিল ভারতীয় মাড়োয়ারী যুব মঞ্চ"-এর শাখা অফিস এখানে জনকল্যাণকর এবং সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত আছে।

যাইহোক, পার্বত্য অঞ্চলের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মাড়োয়ারী সম্প্রদায়ের ভূমিকা আলোচনার পূর্বে এখানকার কৃষি অর্থনীতির উপর এক ঝলক চোখ বুলিযে নেওয়া প্রযোজন। দার্জিলিং-এর ভৌগোলিক প্রকৃতি বৈচিত্র্যময়। সর্বত্র কৃষিযোগ্য জমির প্রকৃতি এক নয়। ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন শস্যের চাষ হয় যেমন ধান, গম, বালি, জোয়ার, ভুট্টা, আলু, এলাচ, সর্ষে, পাট, তামাক, কমলালেবু, সিনকোনা এবং সর্বোপরি চা এবং কফি। তবে দার্জিলিং পাহাড়ে মূলত ধান, ভুট্টা, আলু, এলাচ, কমলালেবু, কফি, সিনকোনা এবং চা ভালো জন্মে। বাকী শস্যগুলি সাধারণত তরাই অঞ্চলে জন্মে। এছাড়া তো পাহাড়ের অমূল্য অরণ্য সম্পদ ছিলই। শুধু প্রয়োজন ছিল উপযুক্ত সংরক্ষণের। আর এ ব্যাপারে বৃটিশরা অগ্রণী, সে কথা বলাই বাহুল্য। ১৮৫৬ সালের মধ্যেই চা শিল্প বাণিজ্যিক উদ্যোগ হিসেবে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

তিস্তা, রামবি এবং পানিঘাটার সংযোগ স্থলে গড়ে ওঠা বাণিজ্য কেন্দ্র হল কমলালেবুর আমদানি স্থল। এখান থেকে আবার সেগুলি কলকাতা সহ ভারতের বিভিন্ন জায়গায় রপ্তানী হয়। আলুচাষীরা আলু আমদানি করেন বিজনবাড়ীর

গঞ্জে। সেখান থেকে পাইকারী বণিকরা আবার সেগুলি বিক্রীর জন্য দার্জিলিং, ঘুম প্রভৃতি অঞ্চলে আমদানি করেন। সেখান থেকে সেগুলি আবার পশ্চিমবঙ্গ এবং ভারতের অন্যান্য রাজ্যে রপ্তানী হয়। এলাচ প্রাথমিকভাবে আমদানি হয় সুখিয়াপোকরি বাজারে। সেখান থেকে চালান হয় সোনাদা এবং কালিম্পং বাজারে। নেপাল থেকেও এলাচ আমদানি হয়। এখানে আমদানিকৃত সমস্ত এলাচের প্রায় ৪০ শতাংশ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় এবং ৬০ শতাংশ দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব এবং মহারাষ্ট্রে রপ্তানী হয়। ১৯৬৬—৬৭ সালের এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ঐ সময় ঘুম এবং জোড বাংলোয় ৪০ লাখ টাকার আলু, কালিম্পং-এ ২৯ লাখ টাকার এলাচ, আদা, কমলালেবু এবং ভুট্টা, তিস্তাবাজারে ৬ লাখ টাকার কমলালেবু, রাম্বিতে ৫ লাখ টাকার কমলালেবু এবং পানিঘাটায ৪৫ হাজার টাকার কমলালেবু আমদানি হয়েছিল। তবে জেলার সবচেযে লাভজনক ব্যবসা হল চায়ের। শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা এবং উত্তরভারতের রাজ্যগুলিতে নয, ভারতের বাইরে ইংল্যাণ্ড, পশ্চিম জার্মানী, রাশিয়া এবং ইরানে দার্জিলিং চাযের বিপুল চাহিদা ছিল। এই চাযের বিশেষত্ব হল এর সুগন্ধী flavour যা জলপাইগুড়ি এবং আসামের চাযে পাওয়া যায় না। ১৯৬৬ সালে জেলার সর্বমোট চা-এর উৎপাদন ছিল ১৭৫৯২০ কুইন্টাল। ১৯৭০—৭১ সালে সমগ্র রপ্তানীকৃত চায়ের মূল্য ছিল ১৬ কোটি টাকা। চা-এর মতো সিনকোনার দেশী এবং বিদেশী বাজার ছিল। এটা হয় সরাসরি না হয় ভাতীয় বণিকদের মাধ্যমে ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা এবং অন্যান্য ইওরোপীয় দেশে রপ্তানী হতো। ১৯৬৬—৬৭ সালে বিদেশে রপ্তানীকৃত সিনকোনার মূল্য ছিল ৭১,৭১,৯১৭৫০ টাকা। সুতরাং কৃষি-বাণিজ্যের এক অগ্রণী কেন্দ্র হিসেবে দার্জিলিং বৃটিশের অধীনে আসার পর থেকে যে এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

পাহাড়ের এই কৃষি-অর্থনীতি যুক্ত হযেছিল সীমান্ত বাণিজ্যের সঙ্গে। নেপাল, সিকিম, ভুটান এবং তিব্বতের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ এই বাণিজ্যকে পুষ্ট করেছিল। উনবিংশ শতকের আশির দশকে নেপালের সঙ্গে বাণিজ্য চলত নকশাল বাড়ী, চুম এবং কানজিলিযার পথ ধরে। নেপাল থেকে আমদানি হত গবাদি গৃহপালিত পশু, ছোলা, মটর, চাল, অন্যন্য বর্ষার সব্জি, ঘি, সোরা, তৈলবীজ, এবং তিসি বীজ। রপ্তানি হত গবাদি পশু, কাঁচাতূলা, বস্ত্রসম্ভার, পিতল, তামা, লোহা, লবণ, চিনি, মশলা এবং উল। ঐ দশকে সিকিমের সঙ্গে জেলার বাণিজ্য চলত পেডাং এবং রঙ্গীতের পথ ধরে। আমদানী হত ঘোড়া, গবাদি পশু, শস্যদানা, পিতলের বাসনপত্র, ঘি, লবণ ইত্যাদি এবং রপ্তানী হতো গবাদি পশু, ইওরোপীয় বস্ত্র, পিতল, তামা, লবন, তামাক ইত্যাদি। ১৮৮০—৮১ তে

সর্বমোট রপ্তানী দ্রব্যের মূল্য ছিল যথাক্রমে ১.৬৮ এবং ০.৮১ লক্ষ টাকা। বিংশ শতকের প্রথম দশকে লাভা এবং পেডাং-এর পথ ধরে ভুটানের সঙ্গে বাণিজ্য চলত। ১৯০৭ সালে দার্জিলিং-এ যথেষ্ট পরিমাণ ভুটানী সিল্ক ফেব্রিকস আমদানি হয়েছিল। ১৯২১-২২ সালে আমদানি হয়েছিল ফল, ভেজিটেবলস, সর্ষ-বীজ, গবাদি পশু ইত্যাদি। এসবের সর্বমোট মূল ছিল ৫.৪৫ লক্ষ টাকা। তিব্বতের সঙ্গে সমতলের ভায়া-দার্জিলিং-এর বাণিজ্য চলত দুটি পথ ধরে। এই দুটি পথই সিকিমের অন্তর্ভুক্ত। একটি পথ জালাপ-লার পথ ধরে উত্তরে পেডং বরাবর কালিম্পং-এর মধ্যে প্রবেশ করেছিল এবং অন্যটি নাথা-লা পাশ দিয়ে সিকিমের রাজধানী গ্যাংটকে প্রবেশ করেছিল। তিব্বত থেকে প্রচুর পরিমাণ পশম (wool) কালিম্পং-এ আসত। তিব্বতী বণিকরা দলবেঁধে খচ্চরের পিঠে চাপিয়ে বছরে প্রায় ১ লক্ষ মন (৩,৮৪৬ টন) পশম কালিম্পং-এ আমদানি করতেন। এর সঙ্গে গ্যাংটক থেকে আমদানি হত প্রায় ১৯,০০০ মন। এগুলি কালিম্পং-এর বাজারে ঝাড়াই বাছাই হয়ে অথবা আমদানি অবস্থায় কলকাতা এবং বিদেশে বিশেষ করে লিভারপুল এবং আমেরিকায় রপ্তানী হত। এই উলের ব্যবসার জন্যই কালিম্পং-এর বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবে গুরুত্ব বেড়ে গিয়েছিল। প্রায় ১০টি গুদামে দৈনিক ১ টাকা মজুরি হারে সময়ে ৬ হাজার এবং অসময়ে ৩ হাজার পাহাড়ী মজদুর ঝাড়াই বছাই-এর কাজ করতো। এই ব্যবসায় বছরে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকার লেন-দেন চলত। পশম ছাড়া তিব্বত থেকে আমদানি হত কস্তুরি, ইয়ক টেল (Yak's tails), ইত্যাদি। আর কালিম্পং হয়ে রপ্তানী হত পশমী এবং সূতীবস্ত্র, লোহা, ইস্পাত, তামা, পিতল এর বাসনপত্র, প্রসাধনী সামগ্রী, শস্য-দানা, চিনি, গুড়, শুকনো ফল, বাদাম, পেস্তা, রং, রাসায়নিক পদার্থ, কেরোসিন, মোমবাতি, লন্ঠন, টর্চ, ব্যাটারী, জমাটি চায়ের পাতা, এ্যালুমিনিয়াম, চীনা-মাটির বাসনপত্র, মুক্তা, প্রবালের মালা, মূল্যবান পাথর, সিমেন্ট, চামড়ার জিনিসপত্র, সিগারেট, পাতা-তামাক এবং ঔষধপত্র।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবে দার্জিলিং অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল। এখানে বাণিজ্য ছিল ব্যাপক এবং সর্বাত্মক। বৃটিশরা এই বাণিজ্যের পথপ্রদর্শক হলেও ধীরে ধীরে ভারতীয় বিভিন্ন বণিকগোষ্ঠী বিশেষ করে মাড়োয়ারীরা এখানে বাণিজ্যের জাল বিস্তার করেন। এই প্রসঙ্গে সমকালীন এক গেজেটিয়ার্স-এ মন্তব্য করা হয়েছে, "The finance of trade and agriculture in the district is mainly in the hands of those who control trading i.e. Marwaris and to a much smaller extent Biharis."

ঐ গেজেটিয়ার্সের আর এক জায়গায় মন্তব্য করা হয়েছে, "Marwari and Behari control of the commodity trade of the district is practically

complete and ....Marwari and Behari control over retail supply of cousumption goods and the lending of money to hill men is dominating."

ব্যাঙ্কিং বা মহাজনী বৃত্তি মাড়োয়ারী সম্প্রদায়ের আদি ব্যবসা। এই কারণে কর্ণেল টড ১৮৩২ সালে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ রাজস্থানী বৃত্তান্তে উল্লেখ করেন, "Nine tenths of the bankers and commercial men of India are natives of Maroodes (Marwar)and these chiefly of the Jain faith." তেমনি আর এক বৃটিশ পর্যটক, জন ম্যালকম, ১৮২৯ সালে লিখেছিলেন, "Almost the whole of sowcars and shroffs (bankers and money brokers) and a great proportion of Bunnias (or retail dealers) are either from Gujrat or Marwar . But the Marwaris were more numerous than the Gujratis." সাম্প্রতিককালের দুই গবেষক টমাস-এ-টিমবার্গ এবং ডি.কে.টাকনেট মাড়োয়ারী সম্প্রদাযের মহাজনী বৃত্তির উপর বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। টিমবার্গ উল্লেখ করেন যে, আজমীর অথবা বিকানীরকে কেন্দ্র করে মাড়োয়ারীরা রাজপুতানার শাসককুলের মহাজনে পরিণত হয়েছিলেন। যোধপুর, বিকানীর, ইন্দোর, হায়দ্রাবাদ এবং জয়সলমীরে দাদ্দারা (Daddas) ছিলেন উল্লেখযোগ্য। পাথুয়ার পাপনারা (papnas of pathua) ইন্দোর, কোটা, জয়সলমীরে বিখ্যাত ছিলেন। লোধারা (Lodhas) জয়পুর, যোধপুর, কিষেনগড়, সাপুরা, ইত্যাদি জায়গায় প্রাধান্য বিস্তার করেন। পিটি (pittys) এবং গণেরিওয়ালারা (Ganeriwalas) হায়দ্রাবাদে জনপ্রিয় ছিলেন। ডঃ টাকনেট উল্লেখ করেন, "In Rajasthan, the traders and merchants have clung to the traditional profession of usury and banking " সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতকে বাংলার ব্যাঙ্কিং ব্যবসায় জগৎ সেঠ পরিবারের কথা কে না জানে। ডঃ এন. কে. সিনহা একদা মন্তব্য করেছিলেন, "The Jagat Seth House was to the Bengal Nawabs what the Fuggers of Augsburg were to Emperor charles V of Germany and the Medicis of Florence were to the Papacy in the middle ages." এই পরিবার সম্পর্কে এক ইংরেজ বলেছিলেন যে, "হিন্দু মহাজনের অর্থ ও ইংরেজ সেনাপতির তরবারি, বাংলায় মুসলমান রাজত্বের বিপর্যয় ঘটিয়েছিল।"

কোন সন্দেহ নেই, দার্জিলিং পার্বত্য অঞ্চলেও মাড়োয়ার বণিকরা প্রথমদিকে মহাজনি বৃত্তিকেই বেছে নিয়েছিলেন। কৃষি এবং বাণিজ্য উভয় ক্ষেত্রেই তখন এখানে মহাজনী বা ব্যাঙ্ক কারবারের উপযুক্ত পরিবেশ ছিল। দেশীয় মহাজন

শ্রেনীর অস্তিত্ব তখন ছিল না। ইওরোপীয় ব্যাঙ্কের স্থাপনা তখন ঘটেনি। কৃষির পরিবেশ ছিল ভাল। কিন্তু কৃষকদের হাতে টাকা ছিল না। ছোট ছোট ব্যবসাগুলিও টাকার অভাবে ধুঁকছিল। সুতরাং এই সুযোগ মাড়োয়ারীরা পুরোপুরি কাজে লাগান। পাহাড়ের কৃষি এবং বাণিজ্যে মাড়োয়ারী বনিকরা টাকা সুদে খাটিয়ে যে বিশেষ লাভবান হন তার পেছনেও কিছু কারণ ছিল। দুভাগ্যবশত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চাষী এবং বণিকরা ছিলেন অপরিণামদর্শী। অর্থগৃধ্নু মহাজনদের কাছ থেকে চড়া হারে সুদে টাকা ধার নেওয়ার যে কি মারাত্মক পরিণাম তা তারা বুঝতেন না। যেহেতু চাষ বা ব্যবসা করার মতো কোন মূলধন তাঁদের ছিল না সেহেতু সুদে টাকা ধার নেওয়ার জন্য তাঁরা সব সময় উদগ্রীব হয়ে থাকতেন। চা-বাগান এবং বাগান বহির্ভূত অঞ্চলগুলিতেও এবং মাস মহলগুলিতেও পাহাড়ী অধিবাসীদের মহাজনদের কাছ থেকে টাকা ধার করার একটা প্রবণতা সব সময় ছিল। এমনকি যাঁরা কনট্রাক্টারীর ব্যবসা করতেন যেমন বাড়ী, রাস্তা নির্মাণ, কাঠের ব্যবসা, আবার যাঁরা ভাড়া করা মটরগাড়ী অথবা লরি চালাতেন তাঁরাও খুব কম সঞ্চয়ের পথে চলতেন এবং সব সময় মাড়োয়ারী বণিকদের উপর নির্ভর করে থাকতেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, মহাজনী কারবার করার জন্য যে আদর্শ পরিবেশ দরকার তা পাহাড়ে ছিল।

মাড়োয়ারী ফার্ম প্রতিষ্ঠা করে (গদি) বা অনেক সময় হুণ্ডির মাধ্যমে ব্যাঙ্ক কারবার করতেন। ১৮৪৫ সালে খোদ দার্জিলিং শহরে মেসার্স জেঠমল এবং ভোজরাজ ফার্ম প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কালিম্পং ভুটান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দার্জিলিং-এর সঙ্গে যুক্ত হলে সেখানেও মাড়োয়ারী প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। ১৯২৯—৩০ সালের Bengal Provincial Banking Enquiry Committee-র এক রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় যে, মাড়োয়ারী ব্যাঙ্কাররা দার্জিলিং, কার্সিয়াং এবং কালিম্পং-এ ব্যাঙ্ক কারবার চালাতেন। কালিম্পং-এর মহাকুমা শাসক তাঁর এক প্রতিবেদনে মাড়োয়ারী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের এক তালিকা পেশ করেন। এই তালিকায় যে সব প্রতিষ্ঠানের নাম আছে সেগুলি হল (১) লছমনদাস রামচন্দ্র (২) পুরুখচাঁদ লক্ষ্মীচাঁদ (৩) কোরামল জেঠমল (৪) জোতরাম রামরিক দাস (৫) শ্রীরাম মূলচাঁদ এবং (৬) ক্ষেতসিদাস রামলাল। এঁরা কৃষক এবং ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের টাকা ধার দিতেন। বেশী অঙ্কের ঋণের উপর বার্ষিক ৯—১৮ শতাংশ এবং সাধারণত এক বছরের মেয়াদী কম অঙ্কের ঋণের উপর বার্ষিক ৩৭$\frac{১}{২}$ শতাংশ সুদ ধার্য করা হত। দুই ধরনের হুণ্ডি এঁরা ব্যবহার করতেন একটি সঙ্গে সঙ্গে, অপরটি মেয়াদ অন্তে। লছমনদাস রামচন্দ্র এবং পুরুখচাঁদ লক্ষ্মীচাঁদ ফার্ম দেয় ঋণের উপর এক বছরে জন্য ৫ শতাংশ, ৯ মাসের জন্য ৪$\frac{১}{২}$ শতাংশ, ৬ মাসের

জন্য ৪ শতাংশ এবং চলতি হিসাবের (Current Accounts) উপর ৩ শতাংশ সুদ ধার্য করত। এখনও জেলার কৃষি এবং বাণিজ্যের সিংহভাগ মাড়োয়ারী এবং বিহারীদের টাকায় চলে। সুদের হার অত্যধিক হওয়ায় ঋণ গ্রহিতাদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। তাড়া সারা বছরই আকণ্ঠ ঋণে ডুবে থাকে। A. J. Dash এ ব্যাপারে উল্লেখ করে বলেন, "Crops are sold in advance by growers and goods are sold on credit to labourers on tea gardens and to cultivators outside them. Owing to his careless and improvident disposition, the hillman always places himself at a disadvantage in these transactions. He practically never accumulates capital, usually gets hopelessly into debt and becomes something like a slave of his creditor." মহাজনদের হাত থেকে ঋণ গ্রহিতাদের রক্ষা করার জন্য ১৯৪০ সালে Bengal Money Lending Act পাশ করা হয়।

দার্জিলিং-এর পার্শ্ববর্তী সীমান্ত দেশ সিকিমেও মাড়োয়ারী মহাজনদের উপস্থিতিও লক্ষ্য করা যায়। ১৮৯৯ সালের সেপ্টেম্বরে, দার্জিলিং-এর ব্যাঙ্ক কারবারী মেসার্স জেঠমল এবং ভোজরাজ গ্যাংটকে এক ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান চালু করেন। জানা যায় যে, ইয়ং হাজবেণ্ডের তিব্বত অভিযানকালে, অভিযানের খরচ মেটানোর জন্য এই প্রতিষ্ঠানটি বৃটিশ সরকারকে টাকা ধার দিয়েছিল। সিকিমের অধিবাসীরাও মাড়োয়ারী মহাজনদের কাছ থেকে চড়া হারে সুদের বিনিময়ে টাকা ধার নিয়ে সর্বস্বান্ত হতেন। ডঃ প্রণব কুমার ঝাঁ তাঁর "History of Sikkim" গ্রন্থে উল্লেখ করেন, "These Marwaris, doing the money lending business, were charging exhorbitant interest from the Sikkim people." ডঃ ঝা আরও উল্লেখ করেন যে, অনেক সময় সুদের হার ৭৫ শতাংশ থেকে ১৫০ শতাংশে পৌঁছাত। একবার অত্যন্ত চড়া সুদে সিকিম সরকার এক মাড়োয়ারী ফার্মের কাছ থেকে ৩০০০ টাকা লোন নিতে বাধ্য হয়েছিল বলে ডঃ ঝাঁ এক জায়গায় মন্তব্য করেন। এই কারণে ১৯০০ সালে (১২ই ফেব্রুয়ারী) সিকিমের মহারাজা কাউন্সিল সভায় মাড়োয়ারীদের চড়া হারে সুদের ব্যবসার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন। ফলে ১৯০৮ এবং ১৯১৪ সালে কাউন্সিল সভাতে মাড়োয়ারী মহাজনদের বিরুদ্ধে প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল এবং বেশ কিছু মাড়োয়ারী মহাজনকে সিকিম থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল।

এবারে আসা যাক বাণিজ্য ক্ষেত্রে মাড়োয়ারী বণিকদের ভূমিকা প্রসঙ্গে। এক্ষেত্রে বৃটিশরা এলেন, দেখলেন কিন্তু মাড়োয়ারীরা জয় করলেন। জেলার আমদানি এবং রপ্তানী উভয় প্রকার বাণিজ্যেই তাঁরা অপ্রতিহত প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা

করেছিলেন। এই প্রাধান্য আজও অটুট আছে। সমকালীন গেজেটিয়ার্সে তারই প্রতিচ্ছবি লক্ষ্য করা যায়। "মাড়োয়ারী বণিকগণ অধিকাংশ রপ্তানী বাণিজ্যে বিশেষ করে এলাচ, কমলালেবু এবং আলু রপ্তানীতে এবং কার্যত ভোগ্য পণ্য সংক্রান্ত সমস্ত আমদানী বাণিজ্যেই তাঁরা একচেটে আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। এছাড়াও ভোগ্য পণ্যের খুচরা বিক্রি এবং ক্ষুদ্র চাষীদের কাছ থেকে এগুলি ক্রয় করার ব্যাপারে তাঁদের প্রায় সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ছিল।" এলাচ, কমলালেবু, আলু এবং তিব্বতী পশমের যে রমরমা ব্যবসা ছিল সে কথা পূর্বেই আলোচনা করেছি। খোদ দার্জিলিং এবং কার্সিয়াং ও কালিম্পং বাজারে উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে বেশ কিছু মাড়োয়ারী প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে, যেগুলি এইসব ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিল। "এলাচের ক্রয় এবং বিক্রয় এককভাবে মাড়োয়ারী বণিকদের দখলে ছিল এবং কালিম্পং ভুটান থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর এই এলাচের ব্যবসাই মাড়োয়ারী বণিকগণকে কালিম্পং-এ আকৃষ্ট করে।" এঁরা এলাচ চাষীদের অগ্রিম দাদন দিয়ে আগেই এলাচ ক্রয় করে নিতেন। প্রথমদিকে মন প্রতি ১১ টাকা হিসেবে সমমূল্যের চাল বা অন্যান্য ভোগ্য বস্তুর মাধ্যমে দাদন দেওয়া হত। কিন্তু পরে এলাচের দাম ঊর্ধ্বমুখী হলে পণ্যের পরিবর্তে নগদ টাকায় দাদন দেওয়ার রেওয়াজ চালু হয়। এই সময় সুদের হার ছিল বার্ষিক ৩৭ ১/২ শতাংশ। সিকিম এবং নেপাল থেকে এলাচ আমদানি হত তিস্তা উপত্যকায়, সদর দার্জিলিং মহাকুমায় এবং কার্সিয়াং-এর বিজনবাড়ী, পুলবাজার, সিংলা; এবং নেপালের সীমান্তবর্তী বাজার সমূহে। কালিম্পং মহাকুমায় এলাচ আমদানি হত মহাকুমার প্রধান বাজারে, আলিগাড়ায়, জিটবেয়ং (Gitbeong)-এ, তিস্তায় এবং সোমবাড়িয়ায়। এলাচের দামের কোন স্থিরতা ছিল না। ১৯১৪-১৮ সালে যুদ্ধের কারণে এলাচের দাম উঠেছিল মন প্রতি ১১০ টাকায়। তার পর থেকে ১৯২৭ সালে এলাচের দাম কমে দাঁড়ায় মন প্রতি ৯ টাকায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে এই দাম আবার মন প্রতি ২০ টাকায় ওঠে এবং এই দাম বাড়তে বাড়তে ১৯৪২-৪৩ সালে দাঁড়ায় মন প্রতি ৬৫ টাকায়। এর পর থেকে আবার দাম কমে ৪২ টাকায় দাঁড়ায়। এলাচের দামের এই ওঠা-নামা মাঝে মাঝে ফাটকা পরিবেশ সৃষ্টি করত এবং এই পরিবেশের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করতেন মাড়োয়ারী বণিকরা।

আগেই উল্লেখ করেছি যে, প্রচুর পরিমাণ পশম আমদানি হতো তিব্বত থেকে। এই পশমের ব্যবসাও ছিল লাভজনক এবং এখানেও মাড়োয়ারী বণিকদের অবাধ বিচরণ ছিল। এই ব্যবসার সঙ্গে তিব্বতী এবং আমেরিকান বণিকরাও যুক্ত ছিলেন। কিন্তু পশম আমদানীর সময় এবং রপ্তানীর আগের অবস্থায় ব্যবসার নিয়ন্ত্রণ মাড়োয়ারীদের হাতেই ছিল। প্রথমদিকে জাহাজে রপ্তানীর ব্যাপারে আমেরিকান

বণিকরা উদ্যোগ নিতেন কিন্তু ১৯৩০ সাল থেকে মাড়োয়ারী বণিকরাই সরাসরি জাহাজ বোঝাই করে আমেরিকায় পাঠাতেন। এলাচের ন্যায় উলের দাম এবং মান সবসময় এক রকম থাকত না। ১৯২৮ সালে উলের মন প্রতি দাম ছিল ১১ টাকা। ১৯৩৮ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৬৫ টাকায়। আবার ১৯৪৪ সালে এর দাম কমে ৪০ টাকায় দাঁড়ায়। যুদ্ধের সময় উলের রপ্তানি বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যায়। তখন উল দিয়ে কম্বল এবং বিভিন্ন পোষাক তৈরী করে আঞ্চলিক বা স্থানীয় প্রয়োজন মেটানো হতো। তবে এলাচের ন্যায় উলের বাজার ওঠা-নামা কারার বাজারে যে কৃত্রিম ফাটকা পরিবেশ সৃষ্টি হতো, তার ষোল আনাই কাজে লাগাতেন মাড়োয়ারী বণিকরা। এই বিখ্যাত উলের ব্যবসার জন্যই কালিম্পং এক আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। এই উলের ব্যবসায় মাড়োয়ারী বণিকদের ভূমিকা সম্পর্কে A J Dash উল্লেখ করেন, "Hillmen supply all the labour for sorting and baling in Kalimpong but the trade is in the hands of Marwari and Tibepan merchants who provide a working capital for an annual turnover of Rs 50,00,000" কালিম্পং-এর ব্যবসা-বাণিজ্যে মাড়োয়ারী সম্প্রদায়ের বহুমুখী কর্মোদ্যোগ জেলা গেজেটিয়ার্সে তুলে ধরা হয়েছে।

পাহাড়ের সবচেয়ে চমকপ্রদ আকর্ষণ হল চা-আবাদ এবং চা-শিল্প। ১৮৪১ সালে পাহাড়ে চা-চাষ পরীক্ষণমূলকভাবে শুরু হয় কিন্তু ডঃ ক্যাম্পবেলের নিরবচ্ছিন্ন পরিশ্রম এবং অসামান্য কৃতিত্বের ফলে ১৮৫৬ সালেই চা শিল্প বাণিজ্যিক উদ্যোগ হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এর পর থেকে বিংশ শতকের তৃতীয় দশক পর্যন্ত এই শিল্প একচেটেভাবে ইওরোপীয়দের দখলে থাকে। কিন্তু ১৯৩০-এর দশক থেকে এবং স্বাধীনতার পর থেকেই এই শিল্পে মাড়োয়ারী বণিকদের অনুপ্রবেশ ঘটতে থাকে। এই সময় আসামের চা-বাগানগুলি মাড়োয়ারী বণিকগন সরাসরি অথবা কলকাতার বাজারে অংশ (shares) ক্রয় করে দখল করতে থাকেন। দার্জিলিং-এ একই অবস্থা ঘটতে থাকে। তবে প্রথমদিকে মাড়োয়ারীরা সরাসরি চা আবাদের সঙ্গে যুক্ত হননি। শিল্পে এই সময় তাঁদের অবস্থা বর্ণনা করে টমাস. এ. টিমবার্গ উল্লেখ করেন, "Marwari store owners of tea-plantations became major sources of capital for that industry Eventually they bought tea-plantations in their own right"

সুতরাং এটা বলা বোধ হয় অযৌক্তিক হবে না যে, দার্জিলিং জেলার কৃষি অর্থনীতিতে এবং জেলার আমদানি ও রপ্তানী বাণিজ্যে এবং সেই সঙ্গে আন্তর্দেশীয় ও বহির্বাণিজ্যে তথা জেলার সর্বস্তরের আর্থিক সম্পর্কিত ক্ষেত্রে মাড়োয়ারী বণিকদের নিয়ন্ত্রণ এবং প্রাধান্য ছিল সম্পূর্ণ এবং নিরঙ্কুশ। বিশেষ

করেছিলেন। এই প্রাধান্য আজও অটুট আছে। সমকালীন গেজেটিয়ার্সে তারই প্রতিচ্ছবি লক্ষ্য করা যায়। "মাড়োয়ারী বণিকগণ অধিকাংশ রপ্তানী বাণিজ্যে বিশেষ করে এলাচ, কমলালেবু এবং আলু রপ্তানীতে এবং কার্যত ভোগ্য পণ্য সংক্রান্ত সমস্ত আমদানী বাণিজ্যেই তাঁরা একচেটে আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। এছাড়াও ভোগ্য পণ্যের খুচরা বিক্রি এবং ক্ষুদ্র চাষীদের কাছ থেকে এগুলি ক্রয় করার ব্যাপারে তাঁদের প্রায় সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ছিল।" এলাচ, কমলালেবু, আলু এবং তিব্বতী পশমের যে রমরমা ব্যবসা ছিল সে কথা পূর্বেই আলোচনা করেছি। খোদ দার্জিলিং এবং কার্সিয়াং ও কালিম্পং বাজারে উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে বেশ কিছু মাড়োয়ারী প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে, যেগুলি এইসব ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিল। "এলাচের ক্রয় এবং বিক্রয় এককভাবে মাড়োযারী বণিকদের দখলে ছিল এবং কালিম্পং ভুটান থেকে বিচ্ছিন্ন হওযার পর এই এলাচের ব্যবসাই মাড়োযারী বণিকগণকে কালিম্পং-এ আকৃষ্ট করে।" এঁরা এলাচ চাষীদের অগ্রিম দাদন দিযে আগেই এলাচ ক্রয় করে নিতেন। প্রথমদিকে মন প্রতি ১১ টাকা হিসেবে সমমূল্যের চাল বা অন্যান্য ভোগ্য বস্তুর মাধ্যমে দাদন দেওযা হত। কিন্তু পরে এলাচের দাম ঊর্ধ্বমুখী হলে পণ্যের পরিবর্তে নগদ টাকায় দাদন দেওযার রেওয়াজ চালু হয়। এই সময় সুদের হার ছিল বার্ষিক ৩৭ ১/২ শতাংশ। সিকিম এবং নেপাল থেকে এলাচ আমদানি হত তিস্তা উপত্যকায়, সদর দার্জিলিং মহাকুমায এবং কার্সিয়াং-এর বিজনবাড়ী, পুলবাজার, সিংলা; এবং নেপালের সীমান্তবর্তী বাজার সমূহে। কালিম্পং মহাকুমায় এলাচ আমদানি হত মহাকুমার প্রধান বাজারে, আলিগাড়ায়, জিটবেয়ং (Gitbeong)-এ, তিস্তায় এবং সোমবাড়িয়ায। এলাচের দামের কোন স্থিরতা ছিল না। ১৯১৪-১৮ সালে যুদ্ধের কারণে এলাচের দাম উঠেছিল মন প্রতি ১১০ টাকায়। তার পর থেকে ১৯২৭ সালে এলাচের দাম কমে দাঁড়ায় মন প্রতি ৯ টাকায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে এই দাম আবার মন প্রতি ২০ টাকায় ওঠে এবং এই দাম বাড়তে বাড়তে ১৯৪২-৪৩ সালে দাঁড়ায় মন প্রতি ৬৫ টাকায়। এর পর থেকে আবার দাম কমে ৪২ টাকায় দাঁড়ায়। এলাচের দামের এই ওঠা-নামা মাঝে মাঝে ফাটকা পরিবেশ সৃষ্টি করত এবং এই পরিবেশের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করতেন মাড়োয়ারি বণিকরা।

আগেই উল্লেখ করেছি যে, প্রচুর পরিমাণ পশম আমদানি হতো তিব্বত থেকে। এই পশমের ব্যবসাও ছিল লাভজনক এবং এখানেও মাড়োয়ারী বণিকদের অবাধ বিচরণ ছিল। এই ব্যবসার সঙ্গে তিব্বতী এবং আমেরিকান বণিকরাও যুক্ত ছিলেন। কিন্তু পশম আমদানীর সময় এবং রপ্তানীর আগের অবস্থায় ব্যবসার নিয়ন্ত্রণ মাড়োয়ারীদের হাতেই ছিল। প্রথমদিকে জাহাজে রপ্তানীর ব্যাপারে আমেরিকান

বণিকরা উদ্যোগ নিতেন কিন্তু ১৯৩০ সাল থেকে মাড়োয়ারী বণিকরাই সরাসরি জাহাজ বোঝাই করে আমেরিকায় পাঠাতেন। এলাচের ন্যায় উলের দাম এবং মান সবসময় এক রকম থাকত না। ১৯২৮ সালে উলের মন প্রতি দাম ছিল ১১ টাকা। ১৯৩৮ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৬৫ টাকায়। আবার ১৯৪৪ সালে এর দাম কমে ৪০ টাকায় দাঁড়ায়। যুদ্ধের সময় উলের রপ্তানী বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যায়। তখন উল দিয়ে কম্বল এবং বিভিন্ন পোষাক তৈরী করে আঞ্চলিক বা স্থানীয় প্রযোজন মেটানো হতো। তবে এলাচের ন্যায় উলের বাজার ওঠা-নামা কারার বাজারে যে কৃত্রিম ফাটকা পরিবেশ সৃষ্টি হতো, তার ষোল আনাই কাজে লাগাতেন মাড়োয়ারী বণিকরা। এই বিখ্যাত উলের ব্যবসার জন্যই কালিম্পং এক আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। এই উলের ব্যবসায় মাড়োয়ারী বণিকদের ভূমিকা সম্পর্কে A J Dash উল্লেখ করেন, "Hillmen supply all the labour for sorting and baling in Kalimpong but the trade is in the hands of Marwari and Tibepan merchants who provide a working capital for an annual turnover of Rs 50,00,000." কালিম্পং-এর ব্যবসা-বাণিজ্যে মাড়োয়ারী সম্প্রদায়ের বহুমুখী কর্মোদ্যোগ জেলা গেজেটিয়ার্সে তুলে ধরা হয়েছে।

পাহাড়ের সবচেয়ে চমকপ্রদ আকর্ষণ হল চা-আবাদ এবং চা-শিল্প। ১৮৪১ সালে পাহাড়ে চা-চাষ পরীক্ষণমূলকভাবে শুরু হয় কিন্তু ডঃ ক্যাম্পবেলের নিরবচ্ছিন্ন পরিশ্রম এবং অসামান্য কৃতিত্বের ফলে ১৮৫৬ সালেই চা শিল্প বাণিজ্যিক উদ্যোগ হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এর পর থেকে বিংশ শতকের তৃতীয় দশক পর্যন্ত এই শিল্প একচেটেভাবে ইওরোপীয়দের দখলে থাকে। কিন্তু ১৯৩০-এর দশক থেকে এবং স্বাধীনতার পর থেকেই এই শিল্পে মাড়োয়ারী বণিকদের অনুপ্রবেশ ঘটতে থাকে। এই সময় আসামের চা-বাগানগুলি মাড়োয়ারী বণিকগন সরাসরি অথবা কলকাতার বাজারে অংশ (shares) ক্রয় করে দখল করতে থাকেন। দার্জিলিং-এ একই অবস্থা ঘটতে থাকে। তবে প্রথমদিকে মাড়োয়ারীরা সরাসরি চা আবাদের সঙ্গে যুক্ত হননি। শিল্পে এই সময় তাঁদের অবস্থা বর্ণনা করে টমাস. এ. টিমবার্গ উল্লেখ করেন, "Marwari store owners of tea-plantations became major sources of capital for that industry. Eventually they bought tea-plantations in their own right."

সুতরাং এটা বলা বোধ হয় অযৌক্তিক হবে না যে, দার্জিলিং জেলার কৃষি অর্থনীতিতে এবং জেলার আমদানি ও রপ্তানী বাণিজ্যে এবং সেই সঙ্গে আন্তর্দেশীয় ও বহির্বাণিজ্যে তথা জেলার সর্বস্তরের আর্থিক সম্পার্কিত ক্ষেত্রে মাড়োয়ারী বণিকদের নিয়ন্ত্রণ এবং প্রাধান্য ছিল সম্পূর্ণ এবং নিরঙ্কুশ। বিশেষ

কয়েকটি ক্ষেত্রে তাঁদের ভূমিকা আলোচনা করা হলেও একথা সন্দেহাতীতভাবে বলা চলে যে; জেলায় এমন কোন বাণিজ্য নেই যেখানে তাঁদের প্রবেশ ঘটেনি। তাঁদের এই অসাধারণ সাফল্যের মূলে আছে তাঁদের কর্মদক্ষতা, অনমনীয় সহনশীলতা, অধ্যবসায় এবং কঠোর পরিশ্রম। তৎসত্ত্বেও এইসব ভাল গুণের জন্য ব্যবসা-বাণিজ্যে তাঁদের আধিক্য সব সময় সুখদায়ক হয়নি। মাড়োয়ারীগনের উন্নততর বাণিজ্যিক কৌশল (astuteness) পাহাড়ী অধিবাসীদের মনে যে ক্রোধ সৃষ্টি করবে, সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু জেলার আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে পাহাড়ী অধিবাসীদের চিরস্থায়ী দায়িত্ব জ্ঞানহীনতা এবং কর্মবিমুখতার কথাও ভুললে চলবে না। তবে এখনও তাঁদেরকে একটি রজত-রেখা দেখানো যেতে পারে তা হল, জেলার শিল্প সম্ভাবনার দিকটি এখনও অরক্ষিত আছে।

সূত্র নির্দেশ

১. L.S.S O'Malley: Bengal District Gazetteers: Dist: Darjeeling. 1985.

২. A.J.Dash Gazetteer of the Darjeeling District. 1945 (Alipur).

৩. Barun Dey & Others: West Bengal District Gazetteers· Darjeeling, 1980

৪. Thomas A Timberg· The Marwaris: From Traders to Industrialists, 1979

৫. D K.Taknet: Industrial Entrepreneurship of Sekhawati Marwaris, 1986.

৬. W.W.Hunter: A Statistical Account of Bengal, vol-X.

৭. Haraprosad Chattopadhyaya: Internal Migration in India — A Case Study of Bengal. 1987

৮. J.H.Little: House of Jagatseth.

৯. E.C.Dozey: A concise history of the Darjeeling district since 1835, 1989.

১০. Fred Pinn: The Road of Destiny: Darjeeling. letters, 1839, calcutta, 1990.

১১. S.K.Chaube· The Himalayas—Profiles of modernisation and adaptation.

১২. নিখিলনাথ রায়: জগৎ শেঠ, ১৩৮৯।

১৩. সাক্ষাৎকার: সুশীল গিধুরা, সম্পাদক, শিলিগুড়ি মাড়োয়ারী যুব মঞ্চ।

১৪. সাক্ষাৎকার: ওমপ্রকাশ গিধরা: সহ-সভাপতি, ফোসিন, শিলিগুড়ি।

দি পারসিকিউটেড্ : বাঙালীর লেখা প্রথম প্রতিবাদী নাটক।

কুন্তল মুখোপাধ্যায়

প্রতিবাদ কথাটিব অর্থ হলো—কোনো যুক্তি খণ্ডনেব জন্য প্রত্যুক্তি, আপত্তি জ্ঞাপন বা বিরুদ্ধ উক্তি। প্রতিবাদ বিষযটি সবসময়ই বিশেষ কোনো আচরণের প্রতিক্রিয়াতেই জন্ম নেয। প্রতিবাদ কথাটিকে ভাববাদী দার্শনিক ও বুদ্ধিজীবীবা প্রাযশঃই নেতিবাচক দিক থেকে, বা সমাজেব অস্থাযীত্ব সূচক বৈশিষ্ট্য হিসাবে চিহ্নিত করেন। খেয়াল বাখা দবকাব সামাজিক ব্যবস্থার পবিবর্তনে যারা আগ্রহী নন, তারাই ভাববাদী এই যুক্তিগুলোব অবতারণা কবেন। পুবনো সমাজব্যবস্থাব সমর্থকগণ নিজেদেব অস্তিত্ব সুরক্ষিত করার জন্য যে কোনো ধবনের বিরুদ্ধ ক্রিয়াকলাপকে বাধা দিতে চেষ্টা কবেন। ফলে সেই ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়াতেই ঘটে প্রতিবাদ। জন্ম হয প্রতিবাদী আচরণের। তত্ত্বগত এই ধারণার রূপকল্প—প্রতিবাদী থিযেটারের ক্ষেত্রেও সত্য, কারণ প্রতিবাদী থিযেটার মূল উৎসস্রোত হলো সামাজিক রাজনৈতিক অব্যবস্থাপ্রসূত সামাজিক সম্পর্কের অনুষঙ্গ। আরও একটি বিষয প্রতিবাদী থিযেটারেব ক্ষেত্রে সত্য, এই ধরনেব থিযেটারে প্রতিক্রিযার শিবিব কতখানি সরব হযে উঠল অর্থাৎ মিথস্ক্রিযাব মাত্রার উপর প্রতিবাদেব চরিত্র ও গুরুত্ব নির্ণিত হয। ব্যাপাবটিকে স্পষ্ট করাব জন্য একটি ঘটনা উল্লেখ করা যায।

২৩শে আগষ্ট ১৮৩১ সাল। মাত্র কিছুদিন আগে হিন্দু-কলেজ থেকে পদত্যাগ করেছেন ডিরোজিও। উত্তর কলকাতার গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যাযের বাড়ীতে চলছে ডিরোজিযানদের রক্ষণশীলতাব বিরুদ্ধে মসী যুদ্ধের মহড়া। তর্ক-বির্তকের মাঝে চলছে খানাপিনা। মুসলমান দোকানের রুটি আর গো-মাংস হিন্দু গোঁড়ামীর ঝুঁটি ধরে নাড়া দিতে চাইছে। উত্তেজনা বশে ভুক্ত অবশিষ্টগুলো নিক্ষেপিত হলো পাশের চক্রবর্তী ব্রাহ্মণদের বাড়ীতে। গো-হাড় বলতে বলতে চিৎকার করে চক্রবর্তীরা বাড়ির বাইরে বেরিযে এলেন। ডিরোজিয়ানদের ততক্ষণে হুস ফিরেছে। সবাই দিলেন চম্পট। বেচারী কৃষ্ণমোহন। পরিবারের সকলের চাপে তাকে বাসস্থান ত্যাগ করতে হলো। কলকাতার কোনো হিন্দু পল্লী রক্ষণশীলদের ভয়ে কৃষ্ণমোহনকে সেই সময় আশ্রয় দিতে পারেনি। প্রথমে

বন্ধু দক্ষিণারঞ্জনের গৃহে, পরে চৌরঙ্গীতে এক সাহেবের অতিথি হলেন তিনি। ব্যক্তিগত জীবনের এই আঘাত এবং সেই সময়কার হিন্দু সমাজের উৎপীড়নের প্রতিবাদে তাই কৃষ্ণমোহন লিখে ফেললেন 'দি পারসিকিউটেড' নামে ইংরেজীতে এক পূর্ণাঙ্গ নাটক। "The Persecuted" or the dramatic scenes illustrative of the present state of Hindu society in Calcutta. নাটকটির এই নাম দিলেন কৃষ্ণমোহন ১৮৩১ সালের ১২ই নভেম্বর। নাটকটি উৎসর্গ করলেন হিন্দু যুবসম্প্রদায়কে—এই আশায় যে হিন্দুসমাজের গোড়ামী ও রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে তারা প্রতিবাদ করবেন। নাটকটির প্রতিটি সংলাপে ক্ষমাহীন ভাষায় খুলে দেওয়া হলো রক্ষণশীলদের মুখোস। বাংলাভাষায় লেখা না হলেও এই ক্ষুদ্রায়তন পূর্ণাঙ্গ নাটকটিই বাঙ্গালীর লেখা প্রথম মৌলিক নাটক। যতদুর জানা যায় "দি পারসিকিউটেড" কখনও অভিনীত হয়নি। রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের চাতুরী, কদর্যতা ও ছলাকলার বিরুদ্ধে বৃটিশ ভারতে এই নাটকটিই প্রথম মৌলিক প্রতিবাদী থিয়েটার।

সেক্সপীয়ারের আদর্শে লেখা পাঁচ অংক, পনেরোটি দৃশ্যে বিন্যস্ত "দি পারসিকিউটেড" নাটকের মোট কুড়িটি চরিত্র আছে। প্রধান চরিত্র বাণীলাল। উদারচেতা, আদর্শবাদী শিক্ষিত, রক্ষণশীল গোঁড়ামীর বিরুদ্ধে তরুণ বিদ্রোহী এই বানীলাল। এই চরিত্রটি কৃষ্ণমোহনের নিজের আদলে গড়া। ভুবনমোহন কৃষ্ণমোহনের দাদা নাটকে বাণীলালের পিতা মহাদেবে রূপান্তরিত। এ ছাড়া আছে প্রভাবশালী একদল রক্ষণশীল হিন্দু—কামদেব, দেবনাথ, রামলোচন, তর্কালংকার ও বিদ্যাবাগীশ দুজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, বুদ্ধিমান কিন্তু শঠ, অর্থলিপ্সু, অর্থের জন্য কপটতার আশ্রয় নিতে এরা পিছপা নয় কখনই। আছে বাণীলালের বন্ধু শ্যামনাথ, চন্দ্রকুমার ও ইন্দ্রনাথ, হিন্দু যুবক দীননাথ, রামমোহন। আর আছে সংবাদপত্রের মালিক লালচাঁদ, সে বলছে—'আমাদের হাতে ধর্মসভা, সমাজ, সবকিছুর মালিক আমরা, ওদের শায়েস্তা করতে পারবো না? এ আর এমন কি কঠিন কাজ?' নাটকে কামদেব, দেবনাথ ও রামলোচন প্রমুখের সহযোগিতায় বিদ্যাবাগীশ ও তর্কালংকার, বাণীলালের পিতাকে বাধ্য করেছে বাণীলালকে ত্যাজ্যপুত্র করতে। স্নেহশীল পিতা মহাদেব আপত্তি জানিয়েছে, অসম্মত হয়েছে, কিন্তু শেষপর্যন্ত সমাজের ভয়ে অবশেষে বাধ্য হয়েছে। ত্যাজ্য হবার খবর শুনে বাণীলাল বলেছে—"স্মৃতি বড়ই বেদনাদায়ক। কিন্তু আমাদের তা সহ্য করতে হচ্ছে। বন্ধু! আমি কুসংস্কারের শিকার হয়ে পিতা, মাতা, ভাই, বোনদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছি। যতদিন না এই কুসংস্কারের বেড়াজাল কাটতে পারছি ততদিন আমার শান্তি নেই।" এই কথাগুলি 'এনকোয়ার' এ প্রকাশিত কৃষ্ণমোহনের প্রবন্ধের প্রতিধ্বনি। নাটকের দ্বিতীয় অংকের দ্বিতীয়

দৃশ্য, তৃতীয় দৃশ্য, তৃতীয় অংকের প্রথম দৃশ্য ও পঞ্চম অংকের তৃতীয় দৃশ্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নাটকের মধ্যে বেদ, বেদান্ত, পুরাণ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে কৃষ্ণমোহন হিন্দু ধর্মের যথার্থতা নিরীক্ষণ করতে চেযেছেন।

নাটকটি লেখা হয়েছিল ১৮৩১ এর নভেম্বর মাসে (প্রকাশনার তারিখ ১২-১২-১৮৩১)। এই নাটক সম্পর্কে ১৮৩১ এব ৩ ডিসেম্বরের 'সমাচার দর্পণ' জানায—'ইংরেজীভাষা কৃষ্ণমোহনবাবুর ভাষা নহে অতএব ইহা বিবেচনা করলে তাহার ঐ ভাষাতে অত্যুত্তম জ্ঞান হয় কিন্তু কলকাতাস্থ লোকেরা এই ক্ষণে যে প্রকার দলে দলে বিভক্ত আছেন তদৃষ্টে ঐ পুস্তকের মর্ম প্রকাশ করা আমাদের সুকঠিন।' নাটকটি প্রকাশের সময় ডিরোজিও বেঁচেছিলেন।

হিন্দুসমাজ থেকে বিতাড়িত (পার্সিকিউটেড) হয়ে তিনি আলেকজাণ্ডার ডাফের সংস্পর্শে আসেন। ১৮৩২ এ খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত হন তিনি। এই সূত্রে তাঁর নাম হয রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সময তিনি চার্চ মিশনারী সোসাইটি কলকাতার মির্জাপুর স্কুলের সুপারিন্টেনডেন্ট হন। খৃষ্টান হয়ে তিনি হিন্দু সমাজকে ভোলেননি, অবজ্ঞা করেননি, তাকে সংস্কার করে সুস্থ রূপে প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছিলেন। এজন্য তিনি হিন্দুধর্মের প্রকৃত ব্যাখা তুলে ধরার কাজ 'এনকোযার' ও 'দি পার্সিকিউটেড' ছাড়াও 'হিন্দু ইউথ' ও 'সংবাদ সুধাংশু' নামে ইংরাজী ও বাংলা পত্রিকা করেছেন, 'ক্যালকাটা রিভিউ', 'বেঙ্গল স্পেক্‌টেটর'-এ প্রবন্ধ লিখেছেন, মার্কণ্ডেয় পুরাণের ঋগ্‌বেদের অংশবিশেষ ইংরেজীতে অনুবাদ করেছেন, ষড়দর্শন, শ্রীনারদ পঞ্চরাও ও শংকারাচার্যের ভাষ্য সহ বেদান্তীয় সূত্র নিযে ইংরেজীতে বই লিখেছিলেন। খৃষ্টান পাদ্রীদের ধর্মপ্রচারকে তিনি সমর্থন জানাতে পারেননি। ১৮৪২ এর অক্টোবরে 'ইণ্ডিযান রিভিউ' পত্রিকায কৃষ্ণমোহনের উপর প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ থেকে জানা যায়— "হিন্দুধর্মের ন্যায় খৃষ্টান ধর্মের প্রতি নব্যদলের বিরোধিতাও খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে বন্ধুদের মধ্যে, কৃষ্ণমোহনও কয়েক রাত কলিকাতায় বড় বড় রাস্তায় ঘুরে খ্রীষ্টান পাদ্রীদের নানাভাবে লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করার প্রয়াস পান"। আসলে সবরকম ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধেই তার মন ছিল সজাগ। "দি পার্সিকিউটেড" নাটকে সে কথাই বিস্তৃতভাবে বলার চেষ্টা করেছেন কৃষ্ণমোহন।

নাটকটির ভূমিকায় কৃষ্ণমোহন দ্বিধাহীন ভাবে জানিয়েছেন যে, যে ধরনের গ্রন্থনার সাহায্যে বিয়োগান্ত ও মিলনান্ত নাটক রচিত হয়, তা অটুট থাকছে না বলে মনে কোনো দ্বিধা জাগেনি। লেখকের ভাবণের উদ্দেশ্য ছিল উদীযমান বংশধরদের মানসিকতায় কতখানি চাপ ফেলতে পারা যায়—সেই মাপকাঠি দিয়েই এই নাটকের উৎকর্ষ বিচার্য। হিন্দু সমাজের প্রতিপত্তিশালী মানুষগুলোর অসঙ্গতি এবং কদর্যতা তাদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। ব্রাহ্মণদের চাতুরী, ছলাকলা

এবং সামাজিক ক্ষমতাব অপব্যবহারের প্রতিবাদ স্বরূপ এই নাটকের উপস্থাপনা। ঊনবিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশকের মানবিকতা ধরা পড়েছে এই নাটকে "ইয়ংবেঙ্গল আন্দোলনেব" মানসিকতাব—তাদের প্রতিবাদের গুণগত প্রভাব এই নাটকে প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষভাবে সঞ্চারিত হয়েছে। "রাইটস্ অফ্ ম্যান" এবং "এজ অব্ রিজন" গ্রন্থদুটি যে ভাবে বাঙ্গালী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যুবকদের মনীষাকে নতুন চেতনা দান করেছিল, তার প্রতিফলন ঘটেছিলো ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলনের মধ্যে। সেই আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃত ডিরোজিও শিষ্য কৃষ্ণমোহন শুধু "এনকোযার" পত্রিকা সম্পাদনা করেই তাই ক্ষান্ত থাকলেন না। "পার্সিকিউটেড" নাটক রচনার মধ্য দিয়েই তার প্রতিবাদকে আরও চিত্রময় করে তুললেন। এই নাটকটির বিষযে সেই সমযকার প্রতিক্রিয়াব শিবির কতটা উদ্বিগ্ন ছিল তখনই বোঝা যায যখন আমরা লক্ষ্য করি সেই সমযকার কোনো নাট্যমঞ্চে এই নাটকের অভিনয হযনি। এমনকি বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের হিন্দু থিয়েটারে ও এই নাটক অভিনীত হবার সযোগ পাযনি। ইতিহাসকারেরা এর দুটি কারণ দেখিয়েছেন—

(ক) এই নাটকটি মঞ্চস্থ কবলে পরোক্ষে ইযং বেঙ্গলকে স্বীকার করে নিতে হয়। হিন্দু কলেজের ডিরেক্টরের পক্ষে তা সম্ভব ছিল না।

(খ) অন্য কারণটি হলো এই নাটকটি মঞ্চস্থ হলে রাধাকান্তদেব বাহাদুরের মতো হিন্দুসমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা আর হিন্দু থিয়েটারে পদার্পণ করতেন না। মনে করা হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে হিন্দু সমাজের রক্ষণশীলদের আচরণের প্রতিক্রিয়ার প্রতিবাদ স্বরূপ এই নাটক—যদি অভিনীত হতো, তবে হয়তো বাঙালীর সামাজিক চরিত্রের চেহারার কিছু পরিবর্তন সাধিত হতো। কৃষ্ণমোহনের প্রতিবাদী মানসিকতাই যে এই নাটকটির রচনার মূল কারণ সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকে না। দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে ১৮৭৬ সালে "সুরেন্দ্র বিনোদিনী" নাটকের বিরুদ্ধে তদানীন্তন সমাজ ও রাষ্ট্রীয় প্রশাসন যখন প্রতিক্রিয়ার ঝড় তুলেছে, তখনও কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন যে, এই নাটকটির উদ্দেশ্য সমাজসংস্কার এবং এই নাটকটিতে কোনো অশ্লীলতা নেই। আমাদের মনে হয় "পারসিকিউটেড" নাট্যরচনা কালীন প্রতিবাদী মানসিকতাই কৃষ্ণমোহনকে "সুরেন্দ্র বিনোদিনী"-এর উপর রাষ্ট্রীয প্রশাসনের বিরুদ্ধে মতামত দিতে উৎসাহ যুগিয়েছে।

ডঃ মৈত্রেয়ী বসু—একা এবং একা

মঞ্জু চট্টোপাধ্যায়

১৯৪২–৪৩'র মন্বন্তরের ঝাপটা বাংলাদেশকে তছনছ করে দিল। তখনকার মানুষকে আর মানুষ বলে চেনা যাচ্ছে না। ৩৫ লক্ষ মানুষ মারা গেছে মানুষের তৈরী এই ভযাবহ মন্বন্তবে। যারা মরেছে, তারা বেঁচেছে। বিত্তবানরা কতখানি লোভী আর পাষণ্ড হতে পারে তা প্রমাণ হতে দেরী হল না। ডাস্টবিনে মানুষ কুকুর একই সঙ্গে খাবাব খুঁজছে। ফুটপাথে ক্ষিদের জ্বালায় মানুষ মরছে। বাচ্চারা কেঁদে কেঁদে স্তব্ধ হযে গেছে।

শহরে কিন্তু খাবারের অভাব ছিল না। অথচ এই খাবারের অভাবেই দলে দলে শিশু রাস্তার ধারে মবে পড়ে থেকেছে। মানুষ একমুঠো খাবাব পাবার জন্য সর্বস্ব বেচেছে, তারপর নিজেকেও বেচেছে। এমন ভযাবহ কলকাতা আর কখনো চোখে পড়েনি।

আর তখন এই দুর্গতদের কাছে এসে দাঁড়াল একদিকে 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির' মেযেরা অন্যদিকে দেশ বিদেশের সাহায্য নিযে 'নিখিল ভারত শিশুরক্ষা সমিতি' (অল ইণ্ডিযা সেভ দি চিলড্রেন কমিটি)। ভারতের নানান অঞ্চলে গড়ে উঠল শিশুবক্ষা সমিতি। অনাথ শিশুদের জন্য তৈরী হল শিশু সদন। ১৯৪৪-এ এই কাজের দাযিত্ব নিয়ে কাজে ঝাঁপিযে পডলেন ডঃ মৈত্রেয়ী বসু, না ডাক্তার হিসেবে নন, রাজনীতি সচেতন একজন সমাজকর্মী হিসেবে।

১৯০৩ সালের ৭ অক্টোবর গিড়িডিতে জন্ম হয মৈত্রেযী বসুর। বাবা শশীভূষণ বসু, আর মা হেমাঙ্গিনী বসু। মা গভীরভাবে যুক্ত ছিলেন ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে। গিরিডিতে তখন অনেক ব্রাহ্ম পরিবার থাকায় একটা ব্রাহ্ম সমাজের পরিমণ্ডল তৈরী হযেছিল। মৈত্রেযী বসু প্রথম পড়াশুনা করলেন গিরিডিতে, তারপর পাটনা থেকে ১৯২০তে পাশ করে কলকাতায় ইন্টারমিডিয়েট পড়তে আসেন। পাশ করে মেডিকেল কলেজে ডাক্তারীতে ভর্তি হন। ডাক্তারী পাশ করে ৩ বছর চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে কাজ করে বৃত্তি নিয়ে জার্মানীতে যান বড় ডাক্তার হয়ে ফিরবেন এই প্রত্যাশায়। এ ব্যাপারে ডঃ বিধানচন্দ্র রায় উৎসাহী সমর্থক ছিলেন এবং প্রচুর সাহায্যও করেছেন।

সময়টা ১৯৩১ সাল। প্রায় ২ বছর মিউনিখে থেকে M.D. করে দেশে ফিরে আসেন। ইউরোপে তখন দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। ইতালীতে জন্ম নিয়েছে

ভয়াবহ ফ্যাসীবাদ। সমাজতন্ত্রী সোভিয়েত ইউনিয়নকে একঘরে করার আপ্রাণ চেষ্টা চলেছে। আর জার্মানীতে ক্ষমতায় আসছে হিটলার। "একদেশ, এক হাত, একমাত্র নেতার যেমন অসম্ভব ক্ষমতা, তেমনই দায়িত্বও অপরিসীম। সেই ক্ষমতা ও দায়িত্ব হিটলারের মত লোকের হাতে পড়ায় ও জার্মানীর জমি তৈরী থাকায় ১৯৩৯–'৪৫-এর বিপর্যয় ঘটে গেল যার জন্য পৃথিবীর ছবি বদলে গেল। .....কিন্তু গোয়েটে, বেট্‌কেন, হাইনের দেশে হিটলার কি করে সম্ভব হয়েছিল?"

জার্মানীতে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠল। ১৯৩৩'র মে-জুন মাসে দেশে ফিরে এলেন ডঃ মৈত্রেয়ী বসু।

আবার ডাক্তারী শুরু করলেন চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে। কিন্তু বেশী দিন হাসপাতালে থাকতে পারলেন না। ১৯৩৭ সালে ডঃ স্বদেশ বসুকে তিনি বিয়ে করেন। হাসপাতালের কাজ ছেড়ে দিয়ে ব্যক্তিগতভাবে চিকিৎসা শুরু করলেন। কারণ ভদ্রসমাজ তাঁর হাসপাতালে কাজ করাকে ভাল চোখে দেখেনি!

১৯৪২ সাল। গান্ধীজী ডাক দিয়েছেন ভারতবাসীকে শেষ লড়াইয়ে। 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে'—গান্ধীজীর ডাকে সাড়া দিয়ে ১৯৪২-এ মৈত্রেয়ী বসু যোগ দিলেন 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে। স্বামীর পূর্ণ সমর্থন পেলেন এ কাজে। ডাক্তারী ছেড়ে দিয়ে মৈত্রেয়ী বসু সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করলেন রাজনীতিতে—গান্ধীবাদী রাজনীতিতে।

'ভারত ছাড়' আন্দোলনের তীব্রতাও দেখতে দেখতে কমে এল। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা মানুষকে মরিয়া করে তুললেও নেতৃত্ব জেলে থাকায় শেষ পর্যন্ত আন্দোলন কিছুটা ঝিমিয়ে পড়ল। তবে বিক্ষোভ সর্বত্র। ইংরেজ শাসনের শোষণ ও অত্যাচারও সীমাহীন। শ্রমিক মজুরদের উপর অত্যাচারের শেষ নেই। মৈত্রেয়ী বসুর কাছে বন্দর শ্রমিকরা এলেন তাদের আন্দোলনে আর্থিক ও নেতৃত্ব দেবার সাহায্যের দাবী নিয়ে। মৈত্রেয়ী বসু বন্দর শ্রমিকদের আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়লেন। মনে রাখতে হবে বন্দর শ্রমিকরা প্রায় দশবছর আগে বড় রকমের ধর্মঘট করে আন্দোলনের সাহস এবং রাজনৈতিকভাবে সচেতন হয়েছেন। বন্দর এলাকায় বামপন্থী রাজনীতির বড় রকমের প্রভাব ছিল। সুধা রায়, শিশির রায়, জ্যোতির্ময় নন্দী, কমল সরকার, নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, রজনী মুখার্জী প্রমুখরা ঐ সময় থেকে বন্দর শ্রমিকদের সঙ্গে রয়েছেন, আন্দোলনে শরিক হয়েছেন, রাজনীতি সচেতন করে শ্রমিকদের মধ্য থেকে আন্দোলনে এবং সংগঠনে নেতৃত্ব তৈরী করতে সাহায্য করেছেন। সুতরাং মৈত্রেয়ী বসু যে বন্দর শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করতে এলেন সেই শ্রমিকরা কিন্তু রাজনীতি সচেতন। এই অঞ্চলে মুসলিম লীগের প্রভাবও ছিল বেশ বড় রকমের। কার্যত ১৯৩৪'র লড়াই ভেঙ্গে যাবার

একটা বড কারণ ছিল এই রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব—যা শ্রমিকদের মধ্যেও বিভেদ সৃষ্টিতে সহায়ক হয়ে কার্যত মালিক পক্ষেরই সুবিধে করে দিল।

মৈত্রেয়ী বসুও যখন এখানে এলেন স্বভাবতই তিনি রাজনৈতিক বিভেদের সঙ্গে যুক্ত হলেন। সমাজতান্ত্রিক চিন্তা ভাবনা মৈত্রেয়ী বসুকে কোন এক সময় প্রভাবিত করলেও (সুশোভন সরকারের প্রভাবে সাম্যবাদের প্রতি আকৃষ্ট) তিনি প্রধানত কমিউনিস্ট মতাদর্শের বিরোধীই ছিলেন। আজ ৯১ বছর বয়সেও তার কথাবার্তায় সেই পুরনোকালের কমিউনিস্ট বিরোধিতা বেশ স্পষ্ট, এমনকি তার বিভিন্ন লেখায় (মুক্তির অধিকারে; প্রকাশ ১৯৭৮) এই কমিউনিস্ট বিরোধিতার পরিচয় পাওয়া যায়। তবে আজকালকার তুলনায় সম্ভবত পুরনোকালে বিশেষ করে মহিলানেত্রীদের মধ্যে হয়তো রাজনৈতিক সংকীর্ণতা ও ছুৎমার্গ কম ছিল, তাই প্রয়োজনে কমিউনিস্টদের সঙ্গে এরা কাজ করেছেন।

বন্দর শ্রমিকদের মধ্যে মহিলা শ্রমিক আজ নেই বললেই চলে, তবে তখন কিছু কিছু মহিলা শ্রমিক ছিল। মেয়েরা কয়লা বয়ে নিয়ে জাহাজে তুলে দিত। এ কয়লা বিদেশে চালান যেত। এই মেয়েদের কাজের কোন স্থায়িত্ব ছিল না। প্রধানত নোয়াখালী ও বিহারের নানান অঞ্চল থেকে মেয়েরা কাজে আসত আড়কাঠি মারফৎ। মেয়েরা প্রায় সবাই মুসলমান আদিবাসী। যে সর্দার যে মেয়েদের জিম্মাদার ছিল সেই সর্দারদের ক্ষমতার উপর মেয়েদের কাজ থাকা না থাকা নির্ভর করত। জাহাজে যে সর্দারের মেয়েরা আসে ঢুকে যেতে পারত সেদিন তাদেরই কাজ হত। মজুরি ছিল সামান্য এবং নিশ্চিতভাবেই পুরুষের চেয়ে কম। সর্দারের উপর যাদের কাজের নির্ভবতা সর্দারকে নানাভাবে খুশী রাখাই তাদের অন্যতম দায়িত্ব ছিল। এ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তাদের পারিবারিক জীবন বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। এবং চরিত্র সতীত্ব বলতে যা বলা হয় তা যে রক্ষা করা এদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব তা বলাই বাহুল্য। দারিদ্রের পায়ে মেয়েরা তাদের সাধ, আহ্লাদ, এমনকি মনুষ্যত্বকেও বলি দিতে বাধ্য হয়েছিল। পরে মেয়েদের এই কাজটুকুও চলে গেল, কারণ আমরা ভাল কয়লা রপ্তানী না করায় বিদেশ। আমাদের কয়লা নিতে অস্বীকার করল। ফলে কয়লা বহনকারী মেয়েদের কাজ চলে গেল। প্রগতিশীল প্রতিক্রিয়াশীল কোন শ্রমিক সংগঠনই কিন্তু বন্দর শ্রমিকদের মধ্যে এই নির্যাতিত মেয়েদের কথা আলাদা করে ভেবেছেন বলে মনে হয় না। শ্রমিক সংগঠন, শ্রমিক আন্দোলনে এই মেয়েদের কোন অস্তিত্বই ছিল না।

সমস্ত কর্তৃত্ব ছিল স্টিভেডরদের হাতে। কোন মজুরি কাঠামো বন্দর শ্রমিকদের জন্য (কি পুরুষ কি মেয়ে) ছিল না। জাহাজে লোক ঢোকানো হত শুধু

সামনের দরজা দিয়ে নয় পিছনের দরজা দিযেও। যাদের লোক ঢুকতে পারতো তাদেরই কাজ থাকত।

মৈত্রেয়ী বসু 'বন্দব শ্রমিকদের মধ্যে কাজে এসে এই ব্যবস্থার পরিবর্তন করতে চাইলেন। কিন্তু তাতো সহজ নয। তিনি কাগজ পেতে কারখানার সামনে বসে গেলেন। মালিকপক্ষের লোক হুমকি দিল কাজে বাধা দিলে গায়ের উপর দিয়ে গাড়ি চালিযে তারা চলে যাবে, যদিও শেষ পর্যন্ত পারল না, এ লড়াইটা হযেছিল বন্দব এলাকার কারখানাগুলোর সামনে। পুরনো কর্মীরা ধর্মঘট করলে (মানসিক ব্যবহার, চাকরির স্থাযিত্ব, মজুরী বৃদ্ধি) মালিকপক্ষ পেছনেব গেট দিয়ে লোক ঢুকিযে কারখানা চালানোর বিরুদ্ধেই মৈত্রেযী বসু এই আন্দোলন শুরু করেন।

তখন (১৯৪৬) অন্তর্বর্তীকালীন সরকার (Interin Government) গঠিত হয়েছে। ডঃ বসু শ্রমমন্ত্রীর কাজে হস্তক্ষেপের দাবী করলেন। শ্রমিকদের ন্যায্য দাবী দাওযা মেটানো, অন্তত পক্ষে আলাপ আলোচনা ব্যবস্থা করার জন্য দাবী জানালেন এবং ধর্মঘট চলা কালে মালিকপক্ষের দালালরা অন্য লোক ঢুকিযে কারখানা চালানোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেন। শ্রমমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে মালিকপক্ষ বাধ্য হয, পুবনো কারখানার শ্রমিকদের কাজে ফিরিয়ে নিতে। তবে নতুন লোকদের কিছু কিছু রেখে দিয়েছিল পরবর্তীকালে আন্দোলনে সংকট সৃষ্টি করার চিন্তা নিযে।

বন্দব এলাকায তো শুধু জাহাজই আসেনা যে তার লোকলস্কর থাকলেই চলবে। এই জাহাজের খোল ভরাবার জন্য চাই প্রচুর জিনিস। এখানে ছিল যন্ত্রপাতির কারখানা, মেরামতির কারখানা, রেল ইত্যাদি। আর এসব চালাতে প্রচুর কর্মচারীর দরকার ছিল। কর্মচারীরা আসত নানান দেশ থেকে। তারা প্রধানত আদিবাসী এবং মুসলমান। মালিকপক্ষ এই সুযোগগুলো অতি সুচতুর ভাবে ব্যবহার করত।

শ্রমিকরা থাকতো বস্তি এলাকায়, নোংরা ঘিঞ্জি বস্তি। আলো বাতাস নেই, জল নেই, প্রয়োজনীয় শৌচাগার নেই—আছে অভাব, কুশিক্ষা, অশিক্ষা আর আছে নিত্য সঙ্গী নানান দুরারোগ্য ব্যাধি। চিকিৎসা নেই, শিক্ষা নেই—আসলে আমাদের দেশের শ্রমিকদের মানুষের মত থাকার কোন অধিকারই ছিল না, কারণ তারা দলিত এবং দরিদ্র।

কমিউনিস্ট বিরোধী হয়েও প্রয়োজনে তাদের সঙ্গে কাজ করেছেন মৈত্রেয়ী বসু। এই প্রসঙ্গে গান্ধীজির সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা উল্লেখযোগ্য। ১৯৭১ সালের নাগপুর আই. এন. টি. ইউ. সির সভানেত্রীর বিদায়ী ভাষণে গান্ধীজির মন্তব্যটি উল্লেখ করেছিলেন মৈত্রেয়ী বসু।

"On being asked by Dr. Maitreyee Bose, the Secretary Hindustan Majdoor Sevak Sangh, Bengal Branch, about the use of the red flag of All India Trade Union Congress (AITUC) by Congressmen engaged in labour movement, Gandhiji said that if it was necessary to use the plain red flag of the A.I.T.U.C, in order to be better able to serve labour of all faiths and denominations he saw no harm in doing. Provided the red flag was not used as a rival to the tricolour flag"

Mahishadal
27.12.1945

দীর্ঘদিন তিনি পোর্ট ও ডকের ইউনিযন করেছেন। যখন তিনি এখানে কাজ করতে আসেন তখন এখানে কমিউনিস্টদের নেতৃত্ব বেশ জোড়ালো আবার মুসলিম লীগের প্রাধান্যও ছিল। এদের সঙ্গে কাজ করার জন্যই গান্ধীজির কাছে পরামর্শ চেয়ে ঐ উত্তর তিনি পেয়েছিলেন। অবশ্য দীর্ঘদিন এখানে কাজ করলেও কোনদিনই তিনি এখানে সবচেয়ে প্রভাবশালী ইউনিয়ন গড়তে পারেননি, তবে শ্রমিকদেব সঙ্গে ডঃ মৈত্রেয়ী বসুর হৃদ্যতা ছিল খুবই। বারবার তিনি একটা কথা বলতেন 'আমাদের সমাজের কাছে যে শ্রদ্ধা ভালবাসা পেয়েছি, তার চেয়ে, অনেক বেশী শ্রদ্ধা ভালবাসা পেয়েছি পোর্ট ও ডকের শ্রমিকদের কাছে।'

হিন্দু, মুসলমান; হিন্দি, উর্দুভাষী সবরকম শ্রমিকদের সঙ্গেই তাঁর সমান আত্মীয়তা ছিল। দ্বারভাঙ্গা ও মুঙ্গেরের চাঁদ মহম্মদ ও হুসেনী সর্দার, উড়িষ্যার শচীকান্ত মিস্ত্রী, উত্তরপ্রদেশের মহম্মদ আমীন, বড়ে মিঞা, নোয়াখালীর আক্তর আলি, সুলতান মিঞা, আক্কেল আলি সারেং ও ইউনিস মিঞা, কাউকেই তিনি আজ প্রায় ৯২ বছর বয়সেও ভুলে যাননি। "আমার হিন্দু মধ্যবিত্ত বন্ধুদের চাইতে এরা আমার কম আপন ছিল না"—চিন্তাভাবনায় তিনি একেবারেই অসাম্প্রদায়িক। ওর কাছে শ্রমিকদের কোন জাত নেই, ধর্ম নেই, সব শ্রমিকই এক।

চা-বাগানের শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করেছেন তিনি, প্রথম অবস্থায় জুট মিল এলাকার শ্রমিকদের সঙ্গেও একটা যোগাযোগ ছিল।

প্রথম ধর্মঘটে সামিল হন গার্ডেনরীচ ধাঙর ধর্মঘটে। গার্ডেনরীচের মিউনিসিপালিটির ধাঙর মেথররা ধর্মঘট করলেন। নেতৃত্বে রয়েছেন মৈত্রেয়ী বসুরা। সপ্তাহখানেক ধর্মঘটের পর বিরাট জয়ের মধ্যে স্ট্রাইক মিটল। মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান

দৌলাসাহেবকে বলে তিনি জমে থাকা কাজ তাড়াতাড়ি করিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে শ্রমিকদের জন্য বখশিস আদায় করলেন। শ্রমিকদের বিরাট শক্তি, কিন্তু দুঃখ যে এরা সেটা উপলব্ধি করতে পারে না।

১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাস। খাদ্যবাহী গাড়ির চালকরা হঠাৎ ধর্মঘট করায় মুখ্যমন্ত্রী ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ ৩০০ জন ড্রাইভারকে একসঙ্গে বরখাস্ত করেন এবং অবাঙ্গালীদের বাংলা থেকে বহিষ্কার করার হুমকি দেন। ইউনিয়ন ডঃ বসুর নেতৃত্বাধীন। এই বরখাস্ত ড্রাইভারদের মিছিল নিয়ে সোজা তিনি হাজির হলেন ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের খাদ্য দপ্তরে। শুরু করলেন অবস্থান—এরকম চলল নয় দিন আট রাত্রি। মুখ্যমন্ত্রী অবিচল। অবাধ্য শ্রমিকদেব শিক্ষা দেবেন। খাদ্যমন্ত্রী চারু ভাণ্ডারীমহাশয় একটা জোড়াতালি মীমাংসা করে তাঁর নিজস্ব ড্রাইভার প্রেম সিংকে গাড়ি বার করতে বলায় উত্তর পেলেন "গাড়ি বের করবার অর্ডার ইউনিয়নের কাছে নেব, আপনার কাছে নয়।" লড়াই গ্রেপ্তার অনেক কিছুর পর শেষ পর্যন্ত ১৫০ জনকে কাজে নিযে ১৫০ জনকে ছাটাই বেনিফিট দিয়ে এবং প্রয়োজন হলে কাজ দেবে এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে ধর্মঘটের মীমাংসা হল।

১৯৪৬ সাল। আমাদের দেশের পক্ষে এক অশুভ হাওয়ার বছর। আগষ্টের কলিকাতার দাঙ্গা—যাকে বলে Great Calcutta Killing.। গান্ধীজি নোয়াখালি গেলেন। আরও অনেকের মত মৈত্রেয়ী বসুও গেলেন নোয়াখালির দাঙ্গা বিধ্বস্ত এলাকায়। মৈত্রেয়ী বসু তাঁর 'মুক্তির অধিকার' বইয়ে লিখছেন, "নোয়াখালি ভ্রমণে যা বুঝেছি, তার মূল কথা এই যে সংখ্যালঘিষ্ঠ হিন্দুদের হাতে সত্তর ভাগেরও বেশী জমি থাকায় সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান চাষীরা এতই বঞ্চিত্ত ছিল যে তাদের তাতিয়ে তুলতে ধর্মান্ধ মৌলবীবর্গের কোন কষ্টই করতে হয়নি। সামাজিক অবিচারই সাম্প্রদায়িকতার পথ প্রশস্ত করে দেয়। সামাজিক সুবিচারই স্থায়ী শান্তির একমাত্র পথ। অন্য রাস্তা নেই।"

আমাদের দেশের দরিদ্র অবহেলিত শ্রমিকরাও এই সাময়িক ও অর্থনৈতিক অবিচারের শিকার। মৈত্রেয়ী বসু শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন দলিত, অবহেলিতদের জন্য কিছু করতে পারবেন এই আশা নিয়ে। তিনি রাজনীতির সঙ্গেও গভীরভাবে যুক্ত ছিলেন। দীর্ঘদিন তিনি Wage Board'র সদস্যা ছিলেন। কয়লা খনি, চা বাগান ও বন্দর শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করেছেন। ১৯৪৫ সালে AITUC'র বাংলা শাখার (BPTUC) সহ-সভানেত্রী পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন, আর ১৯৪৭ সালে ঐ সংগঠনেরই তিনি কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছেন। মাদ্রাজ সম্মেলনে তিনি সোভিয়েতকে অভিনন্দন জানানো প্রস্তাবকে সমর্থন করেন, যদিও রাজনীতিতে তিনি কমিউনিস্ট বিরোধী ছিলেন।

এরপর তিনি I.N T.U.C-র সভানেত্রী নির্বাচিত হন। দীর্ঘদিন তিনি এই সংগঠনের সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন। আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠনে (I L O) তিনি একাধিকবার প্রতিনিধিত্ব করেছেন জেনেভা, লেনিনগ্রাদ ইত্যাদি স্থানে। ১৯৫৪ থেকে '৬৭ পর্যন্ত তিনি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্যা ছিলেন। ১৯৬৭-তে তিনি কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেন। ১৯৬৯-র দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারকে পরোক্ষ সমর্থন জানান এবং সপ্রশংসভাবে উল্লেখ করেন যে 'এই সরকার, শ্রমিকদের বিরুদ্ধে পুলিশবাহিনী ব্যবহার করেনি। ১৯৭১-এ তিনি চা-বাগান থেকে নির্দলীয় প্রার্থী হিসেবে লোকসভার সদস্যা নির্বাচিত হন।

শ্রমিক সংগঠন, শ্রমিক আন্দোলন সম্বন্ধে কতগুলি স্পষ্ট ধারণা তিনি লিখছেন তাঁর 'মুক্তির অধিকার' বইয়ে। "শ্রমিক আন্দোলন কেন? শুধুই কি তাদের রুজি রোজগার ও মাগ্গিভাতা বৃদ্ধি করার জন্য? আমি তা জানি না। আজকাল কথা উঠেছে আমরা সমাজতন্ত্র চাই। এব জন্য শিল্পে শ্রমিকের পূর্ণ সহযোগিতা চাই। শ্রমিককে শিল্প ও ব্যবসায় পার্টনার বলে গ্রহণ করতে হবে। এর জন্য চাই সুস্থ শ্রমিক সংস্থা। সুস্থ মানে এই নয় যে ধর্মঘটকে বর্জন করতে হবে। প্রয়োজন মত ধর্মঘট করতে হবে বৈকি। কিন্তু মূল অস্ত্র হবে জনমত গঠন করা এবং সেই চাপে শিল্পকে ঢেলে সাজান। শ্রমিক সংগঠন দ্বারাই সমাজের এই পরিবর্তন সম্ভব। এ জাতীয় সংগঠন করতে হলে যেমন উত্তর বিহারের উর্দুভাষী মুসলমান শ্রমিকদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে কাজ করতে হবে। তেমনি আদিবাসী কিংবা হরিজন শ্রমিককেও বুঝতে হবে। তাদের সুখ দুঃখের সঙ্গী হওয়া যাবে তখনই, যখন তারা বন্ধু পর্যায় উঠবে। 'আমরা' 'ওদের' জন্য কাজ করি এ মনোভাব থাকলে হবে না।"

মানুষকে ভালবাসার এক আদর্শই ডঃ মৈত্রেয়ী বসুকে আজ প্রায় ৯২ বছর বয়সেও অনাথ আশ্রমের শিশুদের সঙ্গে থাকতে প্রেরণা দিয়েছে। কবে সেই ১৯৪৪ সালে Save the Children Committee'-র সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন আজও ঠাকুরপুকুরে এরকমই একটি শিশু সদস্যের সঙ্গে একটা ছোট ঘরে দিন কাটাচ্ছেন।

'মুক্তির অধিকারে' বইয়ের ভূমিকায় পান্নালাল দাশগুপ্ত উল্লেখযোগ্য মন্তব্য করেছেন যা দিয়েই লেখা শেষ করবো। "টিপিক্যাল রাজনৈতিক নেতা তিনি নন, টিপিক্যাল ট্রেড ইনিয়ক নেতা নন, টিপিক্যাল সমাজসেবী নন, টিপিক্যাল ডাক্তার তোননই। অথচ এর সবটাতেই তিনি ছিলেন বা আছেন, কিন্তু সবটা মিলিয়ে এসবের উর্দ্ধে একটা সামগ্রিক আকাশ তাঁর আছে। .....তিনি রাজনীতিতে বিখ্যাত হতে পারেননি যদিও তিনি রাজনৈতিক সংগ্রামে ছিলেন, সার্থক ট্রেড ইউনিয়ন নেতাও হয়তো হতে পারেননি, যদিও জীবনভর অবহেলিত শ্রমিকশ্রেণীর

মধ্যে সংগ্রাম করেছেন। রাজনৈতিক দলে থাকাকালে সাধারণ নিয়মশৃঙ্খলা মানা সত্ত্বেও, She was not a conformist, ফলে তাকে অনেকটা ব্রাত্য হতে হয়েছে। She is more emotional than intellectual এই emotion থেকে হঠাৎ ডাক্তারী পড়তে এলেন, আবার তেমনি হঠাৎই ডাক্তারী ছেড়ে রাজনীতি এবং শ্রমিক আন্দোলনে এলেন।”

কোন দেশেই একনায়কতন্ত্র যে শুভ হতে পারে না সেই বিশ্বাস থেকে ১৯৭২'এ যখন আমাদের দেশে ইন্দিরা গান্ধীর একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হতে চলেছিল, তখন একটি কাগজে জার্মানীতে ফ্যাসীবাদের অভ্যুদয় সম্পর্কিত একটি প্রবন্ধে তার ঐ সময় জার্মানীতে থাকার স্মৃতিচারণ করেন। চিলড্রেন হোমে লালিত পালিত অবহেলিত অসংখ্য ছেলেমেয়ের মধ্যে তিনি জীবন কাটাচ্ছেন—সেখানেও যে কোন বাধা আসছে না তা নয়, তবুও নিজের জেদ ও স্বাধীনতা এবং বাচ্চাদের জন্য অফুরন্ত ভালবাসা নিয়ে তিনি নিজের বাড়ি-ঘর ছেড়ে আজও ওখানেই পড়ে আছেন—এটা তাঁর চরিত্রের একটা উল্লেখ করার মত দিক।

সূত্র নির্দেশ:

৬ঃ মৈত্রেয়ী বসু—'মুক্তির অধিকারে' কলকাতা, ১৯৭৮.
সাক্ষাৎকার: ১১ সেপ্টেম্বর, ১৮ সেপ্টেম্বর, ৭ অক্টোবর, ১৯৯৪।

শশিভূষণ মল্লিক ও ঢাকায় বেশ্যাবৃত্তি নিরোধক আন্দোলন

গৌতম নিয়োগী

পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের বিগত অধিবেশনে (কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, ৫ ডিসেম্বর, ১৯৯৩) পঠিত এক প্রবন্ধে ঔপনিবেশিক পূর্ববাংলার (অধুনা স্বাধীন বাংলাদেশ) নিম্নবর্গীয সমাজ-সংস্কারের পরিচয় দিতে গিযে বর্তমানে বিস্মৃত এক অধ্যায সামাজিক ইতিহাসের পাতা থেকে তুলে আনার চেষ্টা করেছিলাম, সম্পূর্ণ নতুন ধবনেব এবং অদ্যাবধি অ-ব্যবহৃত কিছু আকর-উপাদানের সাহায্যে[১]। সেখানে মুখ্য আলোচ্য ছিল ঢাকা শহরের এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রমী সংগঠন 'মাতৃনিকেতন', তার প্রথম বারো বছরের ক্রিয়াকলাপ (১৮৯৬–১৯০৮), তার উদ্দেশ্য, সাফল্য ও ব্যর্থতা অর্থাৎ মূল্যায়ন ইত্যাদি। উনিশ শতকের দ্বিতীযার্ধে পূর্ববঙ্গে, বিশেষত ঢাকা শহরে, বেশ্যাবৃত্তির মত সামাজিক ক্ষত ছিল 'সর্বজন বিচারে কলঙ্কময়', নগরায়ণ ও পরিবর্তিত অর্থনীতিব প্রেক্ষাপটে বেশ্যাবৃত্তি ও তাদের কাজকর্ম ও গণ্ডি অনেক প্রসারিত হযেছিল। সেই পরিপ্রেক্ষিতে 'ভদ্রলোক' সমাজের কিছু সংস্কারক — যাঁরা প্রায় সকলেই ব্রাহ্মসমাজ ভুক্ত ছিলেন — কী প্রেরণায় ও উদ্দেশ্যে ভদ্রলোকশ্রেণীর গার্হস্থ্যকেন্দ্রিক নারীমুক্তি আন্দোলনের চেতনা ছাড়িয়ে বৃহত্তর পথে পা বাড়িয়ে নিম্নবর্গীয অবহেলিত মেয়েদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, সেই কাজে 'মাতৃনিকেতন'-এব মতন সংগঠন কী অবিশ্বাস্য দৃঢতায কায়েমী স্বার্থের প্রতিকূলতা, রক্ষণশীলদের ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ, আর্থিক দৈন্য, সরকারি ঔদাসীন্য সব কিছুকে উপেক্ষা করে সমাজের প্রগতির জন্য কাজ করে গেছেন, সেই অজ্ঞাত বা বিস্মৃত চিত্তাকর্ষক কাহিনীর বিবরণ ও বিশ্লেষণ ছিল উপর্যুক্ত প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য।

'মাতৃনিকেতন'-বিষয়ক ঐ প্রবন্ধের প্রসঙ্গক্রমে ঐ সংগঠনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও ঢাকার সমাজ সংস্কার, তথা বেশ্যাবৃত্তি নিরোধক আন্দোলনে, বিশেষ করে আদিমতম পেশা থেকে বালিকাদের উদ্ধার করা এবং তাদের সামাজিক পুনর্বাসন দেওয়ার কাজে পথিকৃৎ শশিভূষণ মল্লিকের কথাও আলোচিত হয়েছে[২]। কিন্তু শশিভূষণ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ সেখানে ছিল না। অথচ এমনিতেই সতীদাহ নিরোধক, বিধবা বিবাহ প্রবর্তক, স্ত্রীশিক্ষা প্রসারক, বাল্যবিবাহ ও

বহুবিবাহ নিবৃত্তিমূলক ইত্যাদি সমাজ সংস্কার নিয়ে যত আলোচনা হয়েছে, সেই তুলনায় বেশ্যাদের — আধুনিক পরিভাষায় যাদের বলা হচ্ছে যৌনকর্মী — তাদের নিয়ে আলোচনা তেমন নেই[৩]। গবেষকরা বলেন তথ্যাভাবই নাকি এর কারণ। সেইজন্য বিস্মৃত ও অবহেলিত যেমন থাকে 'ঢাকা বালিকা উদ্ধার আশ্রম', পরে যার নাম হয় 'মাতৃনিকেতন', সেই ধরনের সংগঠনের কার্যকলাপ, ইতিহাসে তাদের স্থান, তেমনি সমাজবিজ্ঞানীদের দৃষ্টি পড়ে না শশিভূষণের মতন কর্মীদের উপর। এই অভাব কিছু পরিমাণ অন্তত পূরণ করে সমাজ সংস্কারক শশিভূষ মল্লিক-কে ইতিহাসের পাদপ্রদীপের সামনে তুলে আনার উদ্দেশ্যেই বর্তমান প্রবন্ধের অবতারণা।

আর একটি কথা বলা দরকার। বর্তমান প্রবন্ধের প্রথম অনুচ্ছেদেই 'মাতৃনিকেতন'-কে 'ব্যতিক্রমী' বলেছিলাম, পাঠক-পাঠিকাগণ স্মরণ করবেন। এর কারণ অনেক। প্রথমত, উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত মোটামুটি ব্যাপ্ত বাংলার তথাকথিত 'নবজাগরণ'-এর অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে সমাজ সংস্কারের মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তন, এই সংস্কার আন্দোলনের আবার সিংহভাগ জুড়ে আছে 'নারীমুক্তি'-র প্রশ্ন। কিন্তু অদ্যাবধি সেই বিষয়ক সমীক্ষায় বেশ্যাদের নিয়ে আলোচনা অতি নগণ্য। দ্বিতীয়ত, আমাদের বিদ্বানদের যা কিছু আলোচনা তা তো প্রায় সর্বাংশে কলকাতাকেন্দ্রিক, পূর্ববঙ্গ বিষয়ক আলোচনা খুব কম। তৃতীয়ত, পূর্ববঙ্গের অনেক সংগঠন এবং সংস্কারক এতই বিস্মৃত হয়ে গেছেন, কিংবা তাদের সম্বন্ধে জানার উপাদান এতই অপ্রতুল যে পূর্বোক্ত কারণ দুটি ছাড়াও, ঐ ধরনের আলোচনাকে ব্যতিক্রমী বলতে দ্বিধা দেখি না। শশিভূষণ মল্লিক সম্পর্কে আলোচনাও তেমনি সম্পূর্ণ প্রাথমিক সূত্রাবলীর উপর নির্ভরশীল একটি রূপরেখা, যা পূর্ণাঙ্গ গবেষণায় মার্জিত ও সমৃদ্ধ হতেই পারে।

২

কে ছিলেন শশিভূষণ মল্লিক? কী তাঁর পিতৃপরিচয় বা বংশ পরিচয় বা পারিবারিক পটভূমিকা? কোন সামাজিক স্তর থেকে তিনি এসেছিলেন? কী ছিল তাঁর প্রেরণা? কেন এবং কিভাবে তিনি সমাজ সংস্কারের কাজে এগিয়ে এসে শেষ পর্যন্ত সমাজের একেবারে নিম্নবর্গের, অবহেলিত মেয়েদের জন্য কাজে নামলেন? তাঁর আদর্শ এবং ক্রিয়াকলাপের মূল্যায়ন কিভাবে করব? বলা বাহুল্য, বর্তমান প্রবন্ধের সীমাবদ্ধ আয়তনের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা সম্ভব নয়। তবু যথাসম্ভব উত্তরগুলি দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

সংস্কারক হিসেবে শশিভূষণ মল্লিকের কর্মক্ষেত্র ছিল ঢাকা এবং তাঁর কর্মকাণ্ডের কালসীমা ১৮৮০ থেকে ১৯১০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মোটামুটি ধরা যায়। তবে

তিনি কিন্তু আদতে ঢাকার লোক নন, এমনকি পূর্ববঙ্গেরও নন। তাঁদের আদি বাড়ি নদীয়া জেলার শান্তিপুব এবং তাঁদেব আসল পদবি বসু মল্লিক। পরে তাঁবা পদবি থেকে বসু ছেঁটে ফেলেছিলেন। শুধু তাই নয় শশিভূষণের পিতা নাম পর্যন্ত পবিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। সে এক আশ্চর্য কাহিনী।

শশিভূষণেব পিতা ক্ষেত্রমোহন মল্লিকের জীবনকথা উপন্যাসেব মতই চিত্তাকর্ষক এবং আশ্চর্য হলেও তার বিশদ পবিচয এখানে অবান্তর এবং তার পরিসরও নেই, তবু সংক্ষেপে কিছু তথ্য বলা দবকার। ক্ষেত্রমোহন মল্লিকের (১৮৩২–১৮৯১) আসল নাম পবমেশ্বর বসু মল্লিক। 'পাপীব জীবনে ভগবানের লীলা' নামে তাঁর এক আশ্চর্য আত্মকথা আছে, যদিও সেটি বর্তমানে খুবই দুষ্প্রাপ্য[৪]। পুস্তিকাটির একটি ইংরেজি অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছিল[৫]। ক্ষেত্রমোহন নিজের পরিচয দিযেছিলেন এইভাবে: "A man who was transformed by the charms of God's grace from a veritable sinner to a genuine saint"[৬]। ক্ষেত্রমোহনের পুত্র শশিভূষণ পিতার মৃত্যুর পর ব্রাহ্মসমাজেব রীতি অনুযাযী সংক্ষিপ্ত এক স্মৃতিতর্পণ মূলক জীবনী-পুস্তিকা রচনা করেছিলেন[৭]। সমসাময়িক কিছু পত্র-পত্রিকাতে কিছু তথ্য বেবিযেছিল। এই সব উপকরণের সাহায্যে আমরা ক্ষেত্রমোহনের জীবনচরিতের মূল বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে পারি।

১৮৩২ খ্রিষ্টাব্দে নদীযা জেলার শান্তিপুরে ক্ষেত্রমোহন মল্লিক (= পরমেশ্বর বসু মল্লিকের) জন্ম[৮]। তাঁর পূর্বপুরুষগণও ঐ অঞ্চলে বসবাস করতেন। খুব ধনী নয়, অথচ মোটামুটি স্বচ্ছল পরিবার, গ্রামীণ ভদ্রলোক, সম্মানীয, জাতিতে কায়স্থ। ক্ষেত্রমোহন উচ্চ বিদ্যালযে বেশ কয়েক বছর পডাশুনা করেছিলেন; বাংলা, ইংরেজি এবং অঙ্ক জানতেন কিন্তু বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত করতে পারেন নি। সতের বছর বয়সে শান্তিপুরের স্থানীয় জমিদারী সেরেস্তায এবং জমিদারের ব্যবসায় তিনি-বৈতনিক কাজে যোগদান করেন এবং কাল-ক্রমে প্রথম যৌবনে বৈষয়িক উন্নতি লাভ করেন[৯]। কিন্তু কুসংযোগ, বযসোচিত উদ্দামতায এবং হাতে অধিক পযসা থাকাব ফলে তিনি অনৈতিক কাজ এবং বহুবিধ দোষে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন[১০]। যদিও ক্ষেত্রমোহন জন্মেছিলেন রক্ষণশীল হিন্দু পরিবারে কিন্তু বাল্যকাল থেকেই মূর্তি পূজা বা ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে তাঁর কোনো বিশ্বাস বা অভ্যাস ছিল না। জমিদারীতে চাকরি ছাড়াও হাতে অর্থ থাকায় তিনি নিজস্ব ব্যবসা শুরু করেছিলেন কিন্তু তাতে তো লাভ হয়নি, বরং কয়েক বছরের মধ্যে তিনি আকণ্ঠ ঋণে জড়িয়ে পড়েন। এই অবস্থা থেকে উদ্ধারকল্পে পরমেশ্বর ভালো কর্ম খুঁজতে থাকেন। ১৮৬৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি হাওড়া মিউনিসিপ্যাল্টিতে অ্যাসিট্যান্ট ট্যাক্স কালেকটারের কাজ পেয়ে তাতে যোগদান করেন। সেখানে ছিলেন ১৮৮১ খ্রিঃ পর্যন্ত[১১]। ঐ বৎসর ৮ মার্চ তাঁর বিরুদ্ধে

তহবিল তছরূপ এবং আর্থিক নয়ছয়ের এক মামলা আনেন কর্তৃপক্ষ, যদিও তিনি ছিলেন নির্দোষ। এই সংবাদ পাওয়ার পর তিনি পলায়ন করেন, কখনো ছদ্মবেশে, নানা প্রতিকূলতা ও দুঃখদুর্দশার মধ্যে দিয়ে, এক জেলা থেকে আর এক জেলায় পালাতে পালাতে শেষ পর্যন্ত পূর্ববঙ্গে ঢাকা জেলায় উপস্থিত হন[১২]। এই অভিযাত্রার সময়ই পরমেশ্বর বসু মল্লিক তার নাম চিরকালের জন্য পরিত্যাগ করে ক্ষেত্রমোহন মল্লিক নাম গ্রহণ করে করেন। পুলিশের চোখে অবশ্য তিনি ধুলো দিতে পারেন নি, ধরা পড়েন, যদিও বিচারে নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে ১৮৮৪ খ্রিঃ তিনি মুক্তিলাভ করেন[১৩]।

১৮৮১ থেকে ১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে যখন তার মানসিক টানাপোড়েন চলছিল, এককালে কুসংসর্গে অনেক খারাপ কাজ করেছেন ঠিকই কিন্তু যে দোষ তিনি করেননি, সেই অপরাধে পালিয়ে থাকতে থাকতে তাঁর মনের মধ্যে এক পরিবর্তন আসে। শেষ পর্যন্ত ঢাকা শহরে এসে তাঁর মনে শান্তি আসে যখন তিনি কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বাধীন 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ'-পরিচালিত আন্দোলনে যোগদান করেন। ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র 'নববিধান' ঘোষণা করার পর ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের নাম হয় 'নববিধান ব্রাহ্মসমাজ'[১৪] এবং ১৮৮২ থেকেই ক্ষেত্রমোহন ঢাকা শহরের আরমানিটোলায় নববিধান ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা ও ধর্মীয় আলোচনায় নিয়মিত হাজির থাকতেন[১৫]। ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং ক্রমে ধার্মিক ব্যক্তিতে পরিণত হন[১৬]। ১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দে উনষাট বছর বয়সে ঢাকা শহরেই তাঁর মৃত্যুর সময় পর্যন্ত তিনি ব্রাহ্মসমাজের নানাবিধ ধর্ম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলনে একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন। তাঁর স্ত্রী-ও ছিলেন ধর্মপ্রাণা মহিলা ও নিষ্ঠাবতী ব্রাহ্মিকা[১৭]।

৩

ক্ষেত্রমোহন মল্লিকের জ্যেষ্ঠ পুত্র শশিভূষণ মল্লিক। তাঁর জন্ম কলকাতায়, ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে এবং ইংরেজি আধুনিক শিক্ষিত শশিভূষণ যৌবনে হয়ে ওঠেন উদার মনের অধিকারী[১৮]। ধর্মীয় রক্ষণশীলতা তাঁর মনে এতটুকু ছিল না, গোঁড়া হিন্দু ধর্মে আস্থা তো নয়ই। তাঁর নিজের কথায়: "I would at times express my willingness to turn a Christian from expectation of worldly advantages. I wished to become a Christian because I thought, by it I might get a good post, attain respectibility and would be known to the higher European officials."[১৯]। মনে হয় শশিভূষণের মনের ঔদার্য অনেকটাই ভিক্টোরিয়ান লিবারালইজম এবং ইংরেজি শিক্ষার ফলে তিনি ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলো। তবে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ তাঁর হয়নি। জীবনের প্রথম কুড়ি বছর কলকাতা, হাওড়া এবং

শান্তিপুরে কাটিয়ে তিনি বঙ্গীয় সরকারের পুলিশি বিভাগে চাকরি পান। তাকে প্রথম পাঠানো হয় জলপাইগুড়ি জেলায় ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে এবং সেখান থেকে তাকে বদলি করা হয় পূর্ববঙ্গের ঢাকা শহরে ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে[২০]। সেই ঢাকা শহরের ইতিহাসের সঙ্গে তাঁর নাম অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত হয়ে পড়ে। ঢাকা হয়ে ওঠে তাঁর প্রিয় জায়গা, প্রধান কর্মকেন্দ্র। এখানেই তিনি কোর্টে সাব ইনস্পেক্টর হিসেবে কাজ করতেন এবং শেষ পর্যন্ত ১৮৮৫-তে কর্ম থেকে ইস্তফা দিয়ে পূর্ণ সময়ের জন্য ব্রাহ্ম আন্দোলনে যোগদান করেন[২১]। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, এই ঢাকা শহরেই এসে তাঁর পিতা ক্ষেত্রমোহন মল্লিক তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন এবং এখানেই থেকে গিয়েছিলেন।

পিতার মতন শশিভূষণ প্রথম যৌবনে অনৈতিকতার পঙ্কে নিমজ্জিত ছিলেন, হয়তো অসৎ সংসর্গের ফলে কিছু খারাপ কাজও করে থাকতে পারেন কিন্তু পিতার মতই উত্তরকালে তাঁর জীবনের ধারা সম্পূর্ণভাবে বদলে যায়। তাঁর নিজের কথায় : " In the very beginning of my youth I was inordinately wicked and addicted to sensual gratification . I only through the grace of God had the desire kindled in me of joining any religious ceremony that I might come to know of "[২২]। বাল্যকাল থেকেই পৌত্তলিকতায় তাঁর কোনো আস্থা ছিলনা, প্রচলিত রক্ষণশীল হিন্দু ধর্মেও নয়, বরং ধর্মীয় ব্যাপারে তিনি ছিলেন সার্বজনীন এবং 'Unity of Godhead'-এ বিশ্বাসী। একদা খৃষ্টধর্মের প্রতি অনুরক্ত হয়েও শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর পূর্বপুরুষদের ধর্ম পরিত্যাগ করেননি। শেষ পর্যন্ত তিনি মনের আশ্রয় খুঁজে পান ব্রাহ্মধর্মের মধ্যে। এই পরিবর্তনের কারণ কি? কী প্রেরণা তাঁর মনে কাজ করেছিল?

১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দের পর থেকে শশিভূষণ মল্লিক তাঁর আদর্শ গড়ে নিতে থাকেন। প্রথমত, তাঁর উপর পিতা ক্ষেত্রমোহনের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। একজন পাপী কিভাবে সাধুপুরুষে পরিণত হতে পারেন, সেই দৃষ্টান্ত তিনি নিশ্চিতভাবেই পেয়েছিলেন পিতাকে দেখে[২৩]। দ্বিতীয়ত, ১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর প্রথমা স্ত্রী অকালমৃতা হলেন, নিঃসন্তান অবস্থায়। তাঁর মনের ব্যাকুল অবস্থায় তিনি প্রায়ই যেতেন ঢাকা নববিধান ব্রাহ্ম সমাজে। সেখানে উপাসনা ও প্রার্থনায় যোগ দিতে দিতে তিনি ব্রাহ্মধর্মে আকৃষ্ট হন[২৪]। তৃতীয়ত, তিনি মন দিয়ে ব্রাহ্ম সাহিত্য, রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখের রচনা, নানা ব্রাহ্ম পত্র-পত্রিকা পড়তে শুরু করেন। এই পাঠ তাঁর মনের উপর প্রভাব ফেলে[২৫]। চতুর্থত, ব্রাহ্ম সমাজ সংস্কারক এবং ধর্মীয় নেতাদের সংস্পর্শে আসার ফলে, অনেকের দৃষ্টান্তযোগ্য পূতচরিত্রের প্রভাবে এবং নানা

সামাজিক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধেও আদর্শের জন্য তাদের সংগ্রাম করতে দেখে তিনি অনুপ্রাণিত হন[২৬]। পূর্ববাংলা ব্রাহ্মসমাজের অনেকের সঙ্গেই তাঁর সৌহার্দ্য হয়। শেষপর্যন্ত ঢাকা নববিধান ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম আচার্য বঙ্গচন্দ্র রায় কর্তৃক তিনি ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং সরকারি পুলিশ বিভাগের চাকরি থেকে ইস্তফা দিয়ে পূর্ণসময়ের প্রচারকব্রত গ্রহণ করেন ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দে[২৭]।

শুধু ধর্মীয় ব্যাপারেই নয়, ব্রাহ্ম সমাজের নানাবিধ সমাজ সংস্কার মূলক ও সাংস্কৃতিক আদর্শ ও কর্মকাণ্ড তাঁকে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করে। তিনি নিজেও হয়ে ওঠেন একজন সক্রিয় সমাজকর্মী। সমাজ সংস্কারক শশিভূষণের পরিচয় দেওয়ার আগে তাঁর ব্যক্তিজীবনের আরও কিছু তথ্য এই সূত্রে জানিয়ে দিয়ে প্রসঙ্গটি শেষ করা দরকার। ১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দের শেষ দিকে শশিভূষণ পুনরায় বিবাহ করেন ঢাকা জেলার সানারা গ্রামের গোপিকামোহন গোস্বামীর কন্যা নগেন্দ্রবালাকে। এর ফলে শশিভূষণ পূর্ববঙ্গের জামাতা এবং আধা-'বাঙাল' হয়ে যান। ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারি তাঁর অকালমৃত্যু পর্যন্ত নগেন্দ্রবালা বেশ্যালয় থেকে বালিকা উদ্ধার থেকে শুরু করে স্বামীর প্রতিটি কর্মেই সহকর্মিনী-সহধর্মিনী ছিলেন[২৮]। আমরা পরে দেখব যে তারা দু-জনেই ছিলেন ঢাকা উদ্ধার আশ্রম বা মাতৃনিকেতনের পিতা-মাতার মতন। তাঁর শান্ত এবং পবিত্র চরিত্রের জন্য তাঁকে বলা হত 'সাধ্বী নগেন্দ্রবালা'। নগেন্দ্রবালার মৃত্যুর পর শশিভূষণ আশ্রমের সুপার থাকলেও আশ্রমের আভ্যন্তরীণ কাজকর্ম দেখাশোনা করতেন তাঁদের বড়ো মেয়ে হরিপ্রভা। হরিপ্রভা ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দে এক জাপানী ভদ্রলোক ওয়েমন তাকেদাকে বিয়ে করে হরিপ্রভা তাকেদা নামে পরিচিতা হন[২৭]। হরিপ্রভা তাকেদা (১৮৯০—১৯৭২) *প্রথম বাঙালি মহিলা যিনি জাপানে গিয়েছিলেন*, তাঁর লেখা ভ্রমণকাহিনী 'জাপানে বঙ্গ মহিলা' বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য[৩০]। মল্লিক দম্পতির দ্বিতীয় সন্তান কন্যা শান্তিপ্রভা (পরে গুপ্ত), তৃতীয় সন্তান অকালমৃতা, চতুর্থ কন্যাসন্তান অশ্রুবালা (পর দাশগুপ্ত), পঞ্চম ও ষষ্ঠ সন্তান যথাক্রমে পুত্র বিধানভূষণ এবং বিভূতিভূষণ[৩১]। এই পুত্রকন্যারা সকলেই মানুষ হয়েছিলেন উদ্ধার আশ্রমের বালিকাদের মতই একইভাবে, একই সঙ্গে। দুর্ভাগ্যবশত শশিভূষণ মল্লিকের শেষ জীবনের বিস্তারিত তথ্য নানাভাবে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও সংগ্রহ করতে পারিনি।

৪

পশ্চিমবঙ্গ, বা কলকাতার মতই পূর্ববঙ্গের সমাজ-সংস্কার আন্দোলনে যারা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাদের বিপুল গরিষ্ঠ অংশই ব্রাহ্মসমাজভুক্ত। এখানে সংস্কারকদের যেমন নানাবিধ সামাজিক নির্যাতন, রক্ষণশীলদের তীব্র প্রতিরোধ, ব্যঙ্গ বিদ্রুপ, অত্যাচার ইত্যাদি সহ্য করতে হয়েছিল পূর্ববঙ্গেও একই চিত্র দেখা যায়[৩২]। আবার কলকাতায় যেমন সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ইত্যাদি বন্ধ করার

জন্য, বিধবা বিবাহ, নারীশিক্ষা ইত্যাদি প্রবর্ত্তনের জন্য আন্দোলন হয়েছিল, ঢাকাতেও অনেকটা তাই। এখানেও নারী আন্দোলনের নেতৃত্ব শেষ দিকের ব্যতিক্রম বাদ দিলে পুরুষদের হাতে, ঢাকাতেও তাই। তবু পূর্ববঙ্গে সংস্কারকদের নজর পড়েছিল সমাজের অপাংক্তেয়-অবহেলিত গণকাদের দিকে[৩৩]। তার কারণও ছিল।

উনিশ শতকে বেশ্যাদের শহর হিসাবেও ঢাকার বেশ খ্যাতি ছিল[৩৪]। ১৯০১ খ্রিঃ আদমসুমারী অনুযায়ী ঢাকার লোকসংখ্যা ছিল ৯০,৫৪২ আর তার মধ্যে বেশ্যাদের সংখ্যা ছিল ২১৬৪। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বেড়ে উঠছে নগর, নগরায়ণের ফলে প্রসারিত হচ্ছে সীমানা, গড়ে উঠছে নতুন শিল্প-কারিগরীচর্চা-অফিস কাছারি। ভেঙে যাচ্ছে পুরনো মূল্যবোধ, সামাজিক বন্ধন। এসবের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে বেশ্যার সংখ্যা, বেশ্যালয়। ঢাকার বিখ্যাত কাগজ, 'ঢাকা প্রকাশ' থেকে একটি সংবাদ উদ্ধার করছি।[৩৫]

> ঢাকায় ক্রমে২ বেশ্যার সংখ্যা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে। বিগত ১০ বৎসর পূর্ব্বে এখানে যে পরিমাণ বেশ্যা ছিল এক্ষণে তাহার চর্তুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সদর রাস্তার উভয় পার্শ্বে উত্তম উত্তম যে সকল একতালা ও দোতালা দালান আছে, তাহার সমুদায়ই প্রায় বেশ্যাপূর্ণ হইয়াছে। বেশ্যাবাস সংশ্রব নাই, রাজপথের উভয় পার্শ্বে এরূপ উৎকৃষ্ট দালান নাই বলিলেই হয়। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য স্থলেও অসংখ্যক বেশ্যাবাস লক্ষিত হয়। পূর্ব্বে যে সকল স্থলে বেশ্যার নাম গন্ধও ছিল না, এক্ষণে তাহার কোন কোন স্থান কলিকাতার মেছো বাজারের প্রতিবেশী হইয়া উঠিয়াছে।

ঐ 'ঢাকাপ্রকাশ' পত্রিকাই ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দের ২০ জানুয়ারি 'চিকিৎসা দ্বারা বেশ্যাদিগের রোগ পরীক্ষার প্রস্তাব' শীর্ষক সংবাদ পরিবেশন করে বেশ্যাবৃত্তি দমনের জন্য তিনটে প্রস্তাব দেয়, যা বস্তুত অদ্ভুত এবং উদ্ভট। সংস্কার বা পুনর্বাসনের কোনো কথা তাতে নেই। প্রস্তাব তিনটি হলো (ক) বেশ্যাদের আয়ের উপর ট্যাক্স নেওয়া হোক, (খ) তাদের নিজস্ব স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি থাকলে বেশ্যাগণ তার কোনো উইল করে যেতে পারবেন না এবং (গ) নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকতে না দিয়ে তাদের শহরের বাইরে থাকতে দেওয়ার ব্যবস্থা হোক।

ব্রাহ্মসমাজ সংস্কারকগণ এই সব প্রস্তাবের পক্ষে ছিলেন একথা যেমন সত্য, তেমনি প্রথমে তাদের দৃষ্টি ভদ্রলোক পরিবারের নারী-সমস্যাতে সীমাবদ্ধ ছিল একথাও সত্য। এটাই স্বাভাবিক। ১৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় ঢাকা 'সঙ্গত' সভা এবং ১৮৭০ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা শুভসাধিনী সভা (Dacca Philanthropic Society)। এই শেষোক্ত সভার পক্ষ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল শুভসাধিনী পত্রিকা,

সম্পাদক কালীনাবাযণ রায। ১৮৭৩ খ্রি. স্থাপিত হয় 'বাল্য বিবাহ নিবারণী সভা', যার মুখপাত্র ছিল 'মহাপাপ বাল্য বিবাহ' পত্রিকা, সম্পাদক নবকান্ত চট্টোপাধ্যায। এইসব সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বঙ্গচন্দ্র রায়। ভুবনমোহন সেন, তারকবন্ধু চক্রবর্তী, আদিনাথ দাস, প্রসন্নকুমার রায়, কালীনারাযণ রায়, কালীনাবযণ গুপ্ত, প্যারীমোহন গুপ্ত, কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত, রজনীকান্ত ঘোষ, বসন্তকুমার বসু, কালীপ্রসন্ন বসু, অম্বিকাচরণ সেন, নবকান্ত চট্টোপাধ্যায, নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়, শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়, বরদানাথ হালদার, সারদাকান্ত হালদার, বিহারীলাল সেন, কৈলাশচন্দ্র নন্দী, কেদারনাথ রায, দীননাথ সেনরায়, প্রসাদ সেন, আনন্দচন্দ্র সেন, ভগবানচন্দ্র মুখোপাধ্যায প্রমুখ।[৩৬] এদের সঙ্গেই পরে যোগ দিযেছিলেন শশিভূষণ মল্লিক।

১৮৬৭ খ্রিষ্টাব্দে বরিশালের এক তরুণ আইনজীবী ঈশানচন্দ্র সেন বেশ্যালযের দালালদের কাছ থেকে জনৈকা বারবনিতাকে উদ্ধার করেন এবং শেষপর্যন্ত তাকে বিয়ে করেন[৩৭]। দু-চারজন ব্রাহ্ম ঈশানচন্দ্রকে সমর্থন করলেও এই ঘটনা রক্ষণশীলদের ভীমরুলের চাকে ঘা দেয। পত্র-পত্রিকায় তীব্র সমালোচনা ও কুৎসা বেরুতে থাকে। কলকাতা থেকে তখন দ্বারকনাথ বিদ্যাভূষণ-সম্পাদিত বিখ্যাত পত্রিকা 'সোমপ্রকাশ' প্রকাশিত হচ্ছে, তাতে এই বিয়ে সমর্থন করেন সে যুগের ডাকসাইটে ব্রাহ্মনেতা পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। তিনি লেখেন[৩৮]।

> মনে করুন, বেশ্যাদিগকে উপদেশ দেওয়াতে তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ অসৎপথ পরিত্যাগ করিল। কিন্তু মানবপ্রকৃতি অনুসারে, তাহাবা বিবাহ করিতে ইচ্ছুক। এ অবস্থায় কি কর্ত্তব্য? বর্তমান সময়ে বঙ্গদেশের অবস্থা দর্শন করুন। কত শত লম্পট পুরুষ অনায়াসে বিবাহ করিতেছে, হয়তো বিবাহ করিয়াও ব্যভিচার করিতেছে তাহাতে আপনারা সম্মত আছেন (আমি নই) তবে বেশ্যারা বিশুদ্ধ হইলেও তাহাদের বিবাহ হইবে না তাহার কারণ কি?

সংস্কারকগণের দৃষ্টিতে বেশ্যাদের সমস্যা ধরা পড়েছে, এসেছে তাদের উদ্ধার করে সামাজিক পুর্নবাসনের প্রশ্নটিও। ১৮৭৩–৭৪ নাগাদ নবকান্ত চট্টোপাধ্যায, শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়, বরদানাথ হালদার, সারদাকান্ত হালদার প্রমুখ লক্ষ্মীমণি নামে এক বেশ্যার কন্যাকে উদ্ধার করেন। এই মেয়েটিকে তার মা নিজ পেশায় নিযুক্ত করার চেষ্টা করেছিল[৩৯]। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'আত্মচরিত' বইতে লক্ষ্মীমণির কাহিনী লিখেছেন, যাকে কলকাতায় পাঠানো হয় এবং পরে এক উৎসাহী ব্রাহ্ম যুবকের সঙ্গে বিয়ে হয়।[৪০] এরকম আরও দু-একটি উদার ও সিংহ-হৃদয় পুরুষ দু-এক জনকে বিয়ে করলেও বা কোনো কোনো মুক্তমতি সংস্কারক নিজেদের গৃহে অনাথাদের স্থান দিলেও, বা দু-চারজন পতিতা বেশ্যাবৃত্তি ছেড়ে

মঞ্চে পেশাদার অভিনেত্রী হলেও সবই ছিল উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। একজন পতিতা নিজেই লিখেছেন, একবার বেশ্যা হয়ে গেলে তাদের স্বাভাবিক জীবনে পুনরায় ফিরে আসার সম্ভাবনা খুবই কম, সুযোগ প্রায় নেই।[৪১]

উনিশ শতকের শেষ দিকেও ঢাকা শহরে বেশ্যাবৃত্তি ছিল একরকম 'লাভজনক ব্যবসা'। অপরিসীম দারিদ্র্য, বহুবিবাহ, কৌলীন্যপ্রথার সুযোগ নিয়ে বিবাহ ব্যবসা, বাল্যবিবাহ, বৈধব্যের যন্ত্রণা ইত্যাদির ফলে বেশ্যাবৃত্তি বেড়ে যায়। বেশ্যাবৃত্তি বা পতিতাবৃত্তি বন্ধ করা বা ঠেকানো সহজ ছিল না, সম্ভবও ছিল না, তবে যা সম্ভব ছিল তা হলো বেশ্যাদের প্রতি ভদ্রলোক শ্রেণীর সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন এবং বেশ্যাদের মধ্যে যারা স্বাভাবিক সামাজিক জীবনযাত্রায় ফিরে আসতে চায় তাদের সামাজিক পুনর্বাসনের কাজ। আরও জরুরি ছিল বেশ্যা, বেশ্যালযের মাসির বা তাদের দালালরা যে নিরপরাধ শিশু বা অল্পবয়সী মেয়েদের সংগ্রহ করত, সেকাজ বন্ধ করা। এই কাজেই নেতৃত্ব দিয়েছিলেন শশিভূষণ মল্লিক।

ইতিহাস অনুসন্ধান- ৯ গ্রন্থে পূর্বে প্রকাশিত 'মাতৃনিকেতন' সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে আমি লিখেছিলাম: অন্যান্য এলাকার মতন, ঢাকা শহরেও বেশ্যাবৃত্তির সঙ্গে নিয়মিত এবং পরিকল্পিতভাবে নাবালিকা সংগ্রহ করা হত, যাতে তাদের লালন-পালন করে বড়ো করে দেহ ব্যবসায় নামিয়ে দেওয়া যায়। এই ব্যাপারে দালাল বা আড়কারি এবং ব্রথেলের মাসিদের ভূমিকা সুবিদিত, বেশ্যারা নিজেরাই অনেক সময় এ-কাজ করতেন এবং নাবালিকা বলতে একেবারে কয়েক মাসের শিশু থেকে কিশোরী পর্যন্ত নানা বয়সের মেয়েদেরই সংগ্রহ করা হত। কীভাবে এই কদর্য সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংস্কারকগণ আন্দোলন শুরু করেছিলেন, কী ছিল তাদের উদ্দেশ্য, কীভাবে ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দে জুলাই মাসে ঢাকায় 'বালিকা উদ্ধার আশ্রম' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেই সংগঠন কেমন করে নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সমাজের উন্নতি ও প্রগতির জন্য কাজ করে গেছেন, সবকিছু পূর্বোক্ত প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে।[৪২] এখানে পুনর্ব্বার তা আলোচনা করা অর্থহীন, কারণ তাহলে পুনরুক্তিকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। আমরা তাই শশিভূষণের সঙ্গে ঐ সংগঠন তথা আন্দোলনের যোগ বিষয়ে মনোযোগ দিতে পারি।

১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকায় বদলি হবার পর থেকেই শশিভূষণ ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন এবং এই যোগ বৃদ্ধি পায় ১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দের পর। একথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। একথাও বলা হয়েছে যে ১৮৮৫ খ্রিঃ তিনি সরকারি কর্মে ইস্তফা দিয়ে নববিধান সমাজের প্রচারক ব্রত গ্রহণ করেন। ১৮৮৫ থেকে ১৮৯৫ এই দশ বছরের মধ্যে শুধু নববিধান সমাজভুক্ত নয়, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ব্রাহ্মমণ্ডলীর সঙ্গেও তাঁর সৌহার্দ্য জন্মে। এদের

মধ্যে বঙ্গচন্দ্র রায়, অভয়চরণ দাস, বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষ, ভুবনমোহন সেন, রজনীকান্ত ঘোষ, নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়, দীননাথ সেন, বিহারীলাল সেন, দুর্গানাথ রায়, কৈলাসচন্দ্র নন্দী, ঈষাণচন্দ্র সেন, মহিমচন্দ্র সেন প্রমুখের নাম করা যায়।

১৮৯৫ থেকে ঢাকার প্রগতিশীল যুবকবৃন্দ ও সংস্কারকগণ বেশ্যাবৃত্তির উদ্দেশ্যে বালিকা সংগ্রহের বিরুদ্ধে, যা ছিল তাদের মতে 'কদর্য সামাজিক অন্যায', তার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। এই আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন শশিভূষণ মল্লিক। তারা এ ব্যাপারে নানা পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। প্রথমত যাতে পণ্য উদ্দেশ্যে নাবালিকাহরণ বন্ধ হয বা অন্যায়কারী আইনত কঠোর দণ্ড ভোগ করে সেজন্য তারা পৌর, প্রশাসনিক এবং বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের কাছে বরাবরই দরবার করে এসেছে। অনেক সময সংস্কারকগণ পতিতালযের মালিক বা দালালদের বিরুদ্ধে তখনকার ভারতীয ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১৭৩ ধারা অনুসারে মামলা দাযের করেছে। উল্লেখ করার মতো কথা হলো প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই মামলার রায় তাদের পক্ষে গিযেছে। উদাহবণস্বরূপ বলা যায যে উদ্ধার-করা সুন্দরী ও বৃন্দা নাম্নী বালিকার ক্ষেত্রে মামলা করতে হয়েছিল পতিতালযের মালিকের বিরুদ্ধে, পার্বতী এবং সুশীলার ক্ষেত্রে দালালদের বিরুদ্ধে, আবার নবীবালা, বুড়ি প্রমুখের ক্ষেত্রে ঢাকার কিছু প্রভাবশালী গোষ্ঠী, যারা স্পষ্টতই ছিলেন অসৎ কাজের পৃষ্ঠপোষক তাদের বিরুদ্ধে[৪৩]। দণ্ডপ্রাপ্ত আসামীদের সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছে। সংস্কারকগণ যে দ্বিতীয পন্থা নেন তা হলো জনমত গঠনের। এজন্য নানা পত্র-পত্রিকায় পতিতাবৃত্তি নিরোধক বা নিয়ন্ত্রক, বিশেষত অপ্রাপ্তবয়স্কাদের পাপ-ব্যবসায়ে নামানোর বিরুদ্ধে জনমত গঠন করার জন্য বহু লেখা প্রকাশিত হয[৪৪]। তৃতীযত, তদানীন্তন বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে বিষয়টি আলোচনার ব্যবস্থা করতেও তারা সমর্থ হন।

তবে এই তিনটি কাজের চেয়ে অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ ছিল ঢাকায় ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে 'বালিকা উদ্ধার আশ্রম' স্থাপন। এর স্থাপয়িতা শশিভূষণ মল্লিক। যিনি উপর্যুক্ত তিনটি কাজের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। ভারতীয়দের দ্বারা স্থাপিত এমন ধরনের প্রতিষ্ঠান ভারতে এই প্রথম।[৪৫]

শশিভূষণ অবশ্য এই উদ্ধার আশ্রম প্রতিষ্ঠায় একাই কাজ করেছিলেন, তা ভাবলে ভুল হবে। অভয়চরণ দাস, বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষ প্রমুখ নববিধান সমাজের বন্ধুরা সঙ্গেই ছিলেন। ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে যখন নারায়ণগঞ্জ থানার পুলিশ সুন্দরী ওরফে বরদা নামে একটি মেয়েকে কামিনী নামের এক বেশ্যার বাড়ি থেকে উদ্ধার করে, তাকে পুনর্বাসনের জন্য তুলে দেন সংস্কারকদের হাতে, তখন তাকে নিজ বাড়িতে আশ্রয় দেন শশিভূষণ ও নগেন্দ্রবালা। আসলে পুলিশ দিয়েছিলেন অভয়বাবুর হাতে। কিন্তু তিনি নিজে অবিবাহিত বলে নিজের বাড়িতে রাখা উপযুক্ত মনে করেননি, তিনি মেয়েটিকে তুলে দেন বৈকুণ্ঠবাবুর

হাতে। বৈকুণ্ঠবাবু নববিধান ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক, বিবাহিত, থাকেন ঢাকার বিধান পল্লীতে। তিনি নিজ বাড়িতে সুন্দরী বা বরদাকে স্থান দেন কিন্তু কিছুদিন রাখার পর গ্রাসাচ্ছাদনের অসুবিধা হওয়াতে তাকে তুলে দেন আবার অভয়বাবুর হাতে। অভয়বাবু এবার নিয়ে এসে রাখলেন আর এক প্রচারক শশিভূষণ মল্লিকের পরিবারে।[৪৬]

এই শুরু। মল্লিক দম্পতি হয়ে উঠলেন অনাথা মেয়েদের আশ্রয়স্থল। অল্পদিনের মধ্যেই মেয়েটির নতুন নাম রাখা হলো কৃপবালা। জুলাই মাসেই বৃন্দা ওরফে যামিনী নামের আরও একটি মেয়েকে উদ্ধার করে সংস্কারকদের হাতে দিলেন। তাকেও রাখলেন শশিভূষণ। এই মেয়েটির নাম রাখা হলো মুক্তিবালা। প্রসঙ্গত বলা দরকার উদ্ধার করা সব মেয়েদেরই পুরাতন নামসহ অতীতের স্মৃতি মুছিয়ে নতুন নাম রাখাই ছিল উদ্ধার আশ্রমের নিয়ম। আশ্রম অবশ্য করা শশিভূষণের পক্ষে সম্ভব হত না, তিনি মেয়েদের অন্য 'হোম'-এ পাঠাবার কথাও ভেবেছিলেন। সমস্যা ছিল বাসস্থানের, আর্থিক সংস্কারের। পরে অবশ্য সমস্যা মিটে যায়। এই সঙ্কটকালে এক সহৃদয় ব্যক্তি নিজের নাম গোপন করে মাসে মাসে দশ টাকা সাহায্য দিতে এগিয়ে আসেন। আর নিজের বাড়িতেই 'বালিকা উদ্ধার আশ্রম' বা 'দ্য গালর্স রেসকিউ হোম' স্থাপন করলেন শশিভূষণ।[৪৭]

১৮৯৬-এর জুলাই থেকে ১৮৯৭ এর ডিসেম্বর পর্যন্ত ঢাকা শহরের নিমতলা এলাকার বিধান পল্লীতে অবস্থিত ছিল এই হোম। ততদিনে শশিভূষণের নিজের বাড়িতে এই হোমে এসে পড়েছে আরও অনেকে: পার্বতী (সুমতিবালা), সুশীলা (স্নেহবালা), সরোজিনী (প্রিয়বালা) প্রমুখ। আশ্রম প্রতিষ্ঠার কয়েক মাস পরে পূর্বোক্ত ঢাকা ফিলানথ্রপিক সোসাইটি বা 'শুভসাধিনী সভা' (১৮৭১), যা এতদিনে মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছিল, সেটিকে নতুন করে সঞ্জীবিত করা হয়। নববিধান এবং সাধারণ উভয় ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ব্যক্তিগণ এগিয়ে আসে। নবজীবনপ্রাপ্ত ঐ সমিতির প্রথম মিটিং হয় ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দের ২১ নভেম্বর, ঐ দিন বিভিন্ন উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ঠিক করা হয়। অন্যতম লক্ষ্য নির্দিষ্ট হয় পতিতাদের হাত থেকে অপ্রাপ্তবয়স্কা মেয়েদের উদ্ধার করা এবং উদ্ধারপ্রাপ্তদের রক্ষণাবেক্ষণ করা। স্বতন্ত্র বালিকা উদ্ধার বিভাগ গঠিত হয়, যার সম্পাদক হন শশিভূষণ।[৪৮]

হোম বা আশ্রমের বালিকার সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়াতে নতুন বাসস্থানের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। কালীকান্ত মিত্র নামে নববিধান সমাজের এক ব্যক্তি অনুগ্রহপূর্বক বাড়ি করবার জন্য একখন্ড জমি দান করলেন। আশ্রমের পরিচালকবর্গ অবশ্য ঐ দান কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গ্রহণ করেও নিজেরা টাকা ধার করে বিরাট কমপাউণ্ড সুদ্ধ, তিনটি পাকা বাড়ি সমেত উচুঁ প্রাচীর দিয়ে ঘেরা একটি ভালো বাড়ি কিনে ফেললেন। বিধান পল্লীতেই। হোম তো সেখানে গেলই, প্রথম থেকেই

হোমের সুপার ছিলেন শশিভূষণ, তিনিও গেলেন সপরিবারে। ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই থেকে ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর পর্যন্ত হোম আর শশিভূষণ ছিলেন একই মুদ্রার দুই দিক। ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দে তখনকার ইস্টার্ন বেঙ্গল অ্যাণ্ড আসাম গভর্নমেন্ট 'মাতৃনিকেতন' অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে; ১৯০৯ থেকে হোম সরকারি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। যেহেতু আশ্রম শুধুমাত্র উদ্ধার করা মেয়েদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, পরে অনেক বালবিধবা, এমনকি বয়স্কা বিধবা, অনাথা বা পিতৃমাতৃহীনা মেয়েরাও এসেছিল, তাই নাম রাখা হয 'মাতৃনিকেতন'। শশিভূষণেব নিজের ছেলেমেয়েরাও এদেরই সঙ্গে একইভাবে একইরকম খেয়ে পরে বড় হয়েছেন। উত্তরকালে নলিনীবালা বা শরৎকুমারীর বিবৃতি কিংবা স্নেহবালা, প্রিযবালা, হেমবালা, সুবালা প্রমুখের পত্র থেকেই তা স্পষ্ট।[৪৯] পূর্বোক্ত সমযের মধ্যে 'মাতৃনিকেতনে'র যে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা, মেয়েদের শুধু খাওয়া পরা নয়, তাদের শিক্ষাদান, অনেকে উপযুক্ত পাত্রের সঙ্গে বিবাহ দান, অনেককে আত্মীয়স্বজনদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া ইত্যাদি কাজ, অনেককে হাতের কাজ-সেলাই ইত্যাদির মাধ্যমে স্বাবলম্বী করা— এসবের পিছনেই ছিলেন শশিভূষণ, যিনি ১৯০৭ সালে স্ত্রীকে হারিয়েও কাজ চালিয়ে গেছেন। বস্তুত ঢাকার মাতৃনিকেতনের ইতিহাস কিংবা বেশ্যাবৃত্তি নিরোধক আন্দোলনের ইতিহাসের সঙ্গে শশিভূষণ মল্লিকের ব্যক্তিজীবন আলাদা করার উপায় নেই।[৫০]

সূত্র নির্দেশ :

১. গৌতম নিয়োগী, 'ঢাকাব মাতৃনিকেতন (১৮৯৬—১৯০৮) : ঔপনিবেশিক পূর্ববাংলায় নিম্নবর্গীয় সমাজ সংস্কাবেব এক বিস্মৃত অধ্যায়', ইতিহাস অনুসন্ধান-৯ (সম্পা. আবদুল ওয়াহাব মাহমুদ,) কে. পি. বাগচী কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ ৬৫৭—৬৬৮। প্রবন্ধটিতে প্রভূত পবিমাণ মুদ্রণ-প্রমাদ দুর্ভাগ্যক্রমে থেকে গেছে, এমনকি শিবোনামে 'বিস্মৃত' কথাটি ছাপা হয়েছে বিস্তৃত।

২. তদেব, পৃ ৬৬২—৬৬৩

৩. আমি অন্যত্র এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা কবেছি। দ্র. গৌতম নিয়োগী, "পতিতা উদ্ধাব: আ স্ট্রে থট অন এ নাইনটিনথ্ সেঞ্চুবি অ্যাজেন্ডা অফ দ্য বেঙ্গলি রিফর্মার্স অন বিহ্যাবিলিটেশন অফ প্রস্টিটিউটস্"; প্রবন্ধটি যাদবপুব বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ আয়োজিত 'উইমেন ইন হিস্ট্রি' শীর্ষক এক জাতীয় আলোচনাচক্রে পঠিত। ১৫ মার্চ, ১৯৯৫ তারিখে, অপবাহ্নে, উইমেন, ফ্যামিলি অ্যান্ড সেক্সুয়ালিটি শীর্ষক বিভাগের অন্তর্গত ছিল প্রবন্ধটি, সভায় সভাপতিত্ব করেন ডঃ তপন রায়চৌধুরী। আলোচনাচক্রের কার্যবিবরণী ভবিষ্যতে প্রকাশিতব্য।

৪. ক্ষেত্রমোহন মল্লিক, **পাপীর জীবনে ভগবানের লীলা**, দু'খণ্ড ইষ্টবেঙ্গল প্রেস, ঢাকা, ১৮৯৩–৯৪। পূর্ববঙ্গ নববিধান ব্রাহ্মসমাজেব পক্ষে কৃষ্ণদাস বসাক কর্তৃক প্রকাশিত। ক্ষেত্রমোহনেব এই আত্মকথাটি অতঃপব শুধুমাত্র 'আত্মকথা' নামে উল্লিখিত।

৫. ক্ষেত্রমোহন মল্লিক, **গডস্ ডিলিংস ইন দ্য লাইফ অফ এ সিনার** (অনু. শশিভূষণ মল্লিক), ঢাকা নববিধান ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক প্রকাশিত এবং কৃষ্ণদাস বসাক দ্বাবা ইষ্টবেঙ্গল প্রেসে মুদ্রিত, ১৮৮৯।

৬ তদেব

৭ শশিভূষণ মল্লিক, **আ ব্রিফ মেমোয়ার অফ দ্য লেট বাবু পবমেশ্বর মল্লিক**, ঢাকা ইষ্টবেঙ্গল প্রেস থেকে কৃষ্ণদাস বসাক দ্বাবা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১৮৯৩। পুস্তিকাটি অতঃপব শুধুমাত্র 'মেমোয়াব' নামে উল্লিখিত।

৮. মেমোযাব, পৃ ১, আত্মকথা, পৃ ৩

৯. আত্মকথা, পৃ ৪–৫। অপিচ দ্রষ্টব্য, **ইউনিটি অ্যান্ড দ্য মিনিস্টার**, ১০ই মে, ১৮৯১ সংখ্যা।

১০. মেমোযাব, পৃ ২–৩; আত্মকথা, পৃ ৪–৫

১১. আত্মকথা, পৃ ৫–৬

১২. মেমোযাব, পৃ ৪

১৩ তদেব, পৃ ৮–১৩

১৪. ব্রাহ্ম আন্দোলনেব ইতিহাস দীর্ঘ এবং ঘটনাবহুল। 'ভাবতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠা কবেন কেশবচন্দ্র সেন, ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে যখন তিনি তাঁব তরুণ সহযোগীদেব নিয়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুবেব পবিচালনাধীন কলকাতা ব্রাহ্মসমাজ থেকে বেবিয়ে আসেন। বামমোহন বায ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা কবে (১৮২৮ খ্রি) ব্রাহ্ম আন্দোলনেব সূচনা কবেছিলেন। ১৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দেই সমাজে প্রথম ভাঙ্গন ঘটে, দেবেন্দ্রনাথেব নেতৃত্বাধীন সমাজ 'আদি ব্রাহ্মসমাজ' নামে পবিচিত হয়। কেশবচন্দ্র সেনেব নেতৃত্বাধীন ভাবতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে পুনবায় ভাঙ্গন হয় ১৮৭৮ খ্রিষ্টাব্দে, যখন শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু, দ্বাবকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শিবচন্দ্র দেব, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রমুখ বেবিয়ে গিয়ে 'সাধাবণ ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠা কবেন। কলকাতায় এই ভাঙ্গনেব প্রভাবে ও প্রতিক্রিয়ায মফস্বলেব সমাজগুলিও দ্বিধাবিভক্ত হয়। ১৮৮০ খ্রি. কেশবচন্দ্র নববিধান ঘোষণা কবেন (New Dispensation)। ঢাকা শহবেও সাধাবণ ব্রাহ্মসমাজ এবং নববিধান ব্রাহ্মসমাজ ছিল স্বতন্ত্র। বিস্তাবিত তথ্যেব জন্য দ্র. শিবনাথ শাস্ত্রী, **হিস্ট্রি অফ দ্য ব্রাহ্মসমাজ**, কলকাতা, দ্বিতীয় সং, ১৯৭৪; শিবনাথ শাস্ত্রী, **আত্মচরিত** (সম্পা. গৌতম নিয়োগী, সাধাবণ ব্রাহ্মসমাজ শতবার্ষিক সংস্কবণ, কলকাতা, ১৯৮২; প্রশান্ত কুমাব সেন, **বায়োগ্রাফি অফ এ নিউ ফেথ**, দু'খন্ড, কলকাতা, ১৯৫২–৫৪ এবং অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়, Attitude Towards Religion and culture in Nineteenth Century Bengal A Case study of the Brahmo Samaj (অপ্রকাশিত পি. এইচ. ডি. গবেষণা পত্র, জওয়াহবলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়, নতুন দিল্লি, ১৯৯০)।

১৫. **দ্য লিবারাল অ্যান্ড দ্য নিউ ডিসপেনসেশন** ৫ সেপ্টেম্বব, ১৮৮৬; **দ্য হোপ** ৩০ অক্টোবর, ১৮৮৭; **ধর্মতত্ত্ব**, ১৬ আশ্বিন, ১৮০৫ শক (১৮৮৩); ক্ষেত্রমোহন মল্লিক,

গডস্ ডিলিংস, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৬—৩৭; শশিভূষণ মল্লিককে লিখিত ৪ নভেম্বব, ১৮৮৩ তাবিখেব পিতা ক্ষেত্রমোহনেব পত্র।

১৬. মেমোয়ার, পৃ, ১২—১৭; দ্য ইউনিটি এ্যান্ড দ্য মিনিস্টার, ১০ মে, ১৮৯১; নিউ লাইট (ঢাকা), ১৯শে, ১৮৯১; আত্মকথাব প্রায়শই; বঙ্গবন্ধু, ৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৮১৩ শক (১৮৯৯)।

১৭. শশিভূষণ মল্লিক, মাতৃজীবনে ভগবানেব লীলা, শশিভূষণ কর্তৃক প্রকাশিত ও ইষ্টবেঙ্গল প্রেসে মুদ্রিত, ঢাকা, ১৩০০ বঙ্গাব্দ।

১৮. শশিভূষণ মল্লিকেব কোনো আত্মজীবনী বা জীবনী নেই। জীবনীমূলক সমস্ত উপাদান সংগৃহীত হয়েছে তাব ডাযেবীব কিছু অংশ, অপ্রকাশিত চিঠি, সমসাময়িক পত্র-পত্রিকাব কর্তিকা, মাতৃনিকেতনেব প্রকাশিত পুস্তিকা, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি থেকে। এই সমস্ত প্রমাণ পত্র একসঙ্গে 'সূত্রাবলী' নামে উল্লিখিত।

১৯. ঢাকাব বঙ্গবন্ধু পত্রিকাব সম্পাদককে লিখিত শশিভূষণ মল্লিকেব আত্মজীবনীমূলক পত্র। দ্র. বঙ্গবন্ধু, ১৬ পৌষ,, ১৮০৫ সক (১৮৮৩)।

২০. তদেব

২১. হবিপ্রভা তাকেদা, ঢাকা বালিকা উদ্ধাব আশ্রমেব সেবিকা সাধ্বী নগেন্দ্রবালা, শশিভূষণ মল্লিক কর্তৃক প্রকাশিত, ঢাকা, ১৯০৭। ঐ পুস্তিকায শশিভূষণেব স্মৃতিচাবণ, দৃষ্টব্য, পৃ. ৩৪—৩৫

২২. বঙ্গবন্ধু (দ্র. পাদটিকা নং ১৯)

২৩. মেমোয়ার

২৪. সূত্রাবলী

২৫. তদেব

২৬. গৌতম নিয়োগী, 'দ্য মাদাবস্ হোম অ্যাট ঢাকা (১৮৯৬—১৯০৮): আ ফবগটেন চ্যাপ্টাব অফ সোশাল হিস্ট্রি ইন কলোনিয়াল ইস্টবেঙ্গল', প্রসিডিংস অফ দ্য ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি কংগ্রেস, ৫৩ তম অধিবেশন, ওয়াবঙ্গল, ১৯৯২—৯৩, পৃ. ৫৬২—৫৭০

২৭. বঙ্গবন্ধু, ২৫ আষাঢ়, ১৮০৬ শক (১৮৮৫)

২৮. হবিপ্রভা তাকেদা, পূর্বোল্লিখিত।

২৯. বর্তমান লেখক হবিপ্রভা তাকেদা সম্পর্কে অনেক তথ্য সংগ্রহ কবেছেন।

৩০. পুস্তকটি বর্তমান লেখক কর্তৃক সম্পাদিত হয় শীঘ্রই পুনর্মুদ্রণ হবে।

৩১. পাবিবাবিক সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য থেকে। হবিপ্রভাব ছোট দুই বোন, শশিভূষণ ও নগেন্দ্রবালা মল্লিকেব অপব দুই কন্যা শান্তিবালা এবং অশ্রুবালা উভয়েই ডাক্তাব হয়েছিলেন। শান্তিবালাব স্বামী-দেবেন্দ্রনাথ গুপ্ত ছিলেন সাংবাদিক, অশ্রুবালাব স্বামী ইন্দুভূষণ দাশগুপ্ত ছিলেন ডাক্তাব।

৩২. দ্র. মুনতাসীব মামুন, উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের সমাজ , ঢাকা, ১৯৮৬; বঙ্কুবিহাবী কব, পূর্ববাংলা ব্রাহ্ম সমাজেব ইতিবৃত্ত, কলকাতা, ১৯৫২।

৩৩. গৌতম নিয়োগী, পূর্বোক্ত প্রবন্ধ।

৩৪. ঢাকাব বেশ্যাদেব সম্পর্কে বিশদ বিবরণেব জন্য দেখুন মুনতাসীব মামুন, "গনিউব বাজাব ঢাকা ভ্রমণ", স্মৃতিময় ঢাকা, ঢাকা, ১৯৮৯।

৩৫. ঢাকা প্রকাশ. ১৪ জ্যৈষ্ঠ, ১২৭১ (২৬ মে, ১৮৬৪)। ঢাকা প্রকাশ নিয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করেছেন মুনতাসীর মামুন, দ্র. উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িকপত্র, প্রথম-দ্বিতীয় খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
৩৬. বঙ্কুবিহারী কর, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৪৬—১০৬
৩৭. মুনতাসীর মামুন, উনিশ শতকে, পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ. ১৮৭
৩৮. সোমপ্রকাশ, ৯ সেপ্টেম্বর, ১৮৬৭
৩৯. বঙ্কুবিহারী কর, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১০৬; লেখকের নাম নেই, নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় (প্রকাশক নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়), কলকাতা, ১৯২২, পৃ. ১০৪—১০৫। আপিচ দ্র. **লক্ষ্মীমণিচরিত**, ঢাকা, ১৮৭৭
৪০. শিবনাথ শাস্ত্রী, **আত্মচরিত** গৌতম নিয়োগী সম্পাদিত, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ শতবার্ষিক সংস্করণ), কলকাতা, ১৯৮২, পৃ. ১৭৪—১৭৫
৪১. মানদাসুন্দরী দেবী, **পতিতার আত্মচরিত**, কলকাতা, ১৯২৯, পৃ. ৮৯—৯১
৪২. গৌতম নিয়োগী, পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, ইতিহাস অনুসন্ধান-৯ (পাদটীকা ১ দ্র.)
৪৩. দ্য মাদারস্, **হোম্ টুয়েলভ ইয়ারস্ অফ হামবল ওয়র্ক** শীর্ষক পুস্তিকা। পুস্তিকাটিতেও লেখকের নাম নেই। সম্ভবত শশিভূষণ মল্লিক নিজেই লেখক, যিনি ঢাকা থেকে এটি প্রকাশ করেন ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে। মুদ্রাকর ইস্টবেঙ্গল প্রেস। এই পুস্তিকা এবং ঢাকা মাতৃনিকেতনের বিভিন্ন বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন, সমসাময়িক কাগজপত্রের কিছু কাটিং, ডায়েরীর অংশ, চিঠিপত্র, কার্যাবিবরণী ইত্যাদি আমি উদ্ধার করেছি। অতঃপর সবকিছু শুধুমাত্র **দলিলপত্র** নামে উল্লিখিত হবে। মামলার রায়ের জন্য বি. দ্র. **দ্য ইস্ট**। ২১ জানুয়ারি, ১৮৯৯; ২২ সেপ্টেম্বর, ১৯০০
৪৪. এই পত্রিকাগুলির মধ্যে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য ছিল ঢাকা নববিধান ব্রাহ্মসমাজের ইংরেজি মুখপত্র **দ্য ইস্ট**। দলিলপত্র দ্রষ্টব্য।
৪৫. গৌতম নিয়োগী, পূর্বোক্ত প্রবন্ধ (পাদটীকা ১ দ্র), পৃ. ৬৬০—৬৬১
৪৬. **দলিলপত্র**।
৪৭. তদেব
৪৮. তদেব
৪৯. তদেব
৫০. তদেব

'ভারত-আশ্রম' ও উনিশ শতকের বাংলায় সমাজ সংস্কার

অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়

উনিশ শতকের ঔপনিবেশিক বাংলায় পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক পটভূমিকায় ব্রাহ্ম আন্দোলনের সূচনা তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় অনেক নতুন সংস্কারের প্রবর্তন করে। বাঙালীর জীবনে নিরাকার উপাসনা, সম্মিলিত প্রার্থনা, প্রচারক-ব্যবস্থা, জাতভেদ প্রথার বিরোধিতা, স্ত্রীশিক্ষা ও নারীদের বহির্জগতের সঙ্গে যোগাযোগ, শ্রমজীবিদের শিক্ষা ও তাদের জন্য সংবাদপত্র, নতুন বিবাহ-বিধি প্রচলনের প্রচেষ্টা প্রভৃতি কর্মধারা ও আন্দোলনের মুখপত্র-এর মাধ্যমে সেই কর্মযজ্ঞের বিবরণ ও ধর্মীয় আলোচনা বাঙালী যুব-সমাজে এক বিশাল আলোড়নের সৃষ্টি করে। ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত তরুণরা এই আন্দোলনের ভাবধারার সঙ্গে নিজেদের পবিবর্তিত মানসিকতার একাত্মতা অনুভব করে এবং রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কেশবচন্দ্র সেনের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয় অধিক সংখ্যায় ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করে। পাশ্চাত্য চিন্তাধারার সঙ্গে যোগাযোগের ও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে, এই যুব-সমাজ ব্রাহ্ম আন্দোলনের উন্নত ও আধুনিক ভাবধারার ও কর্মধারার সঙ্গে যুক্ত হবার জন্য নিজের পরিবার পরিজনের সঙ্গে যোগসূত্র ছিন্ন করতেও কুণ্ঠিত ছিল না।

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে, বিশেষ করে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ'[১] প্রতিষ্ঠিত হবার পরবর্তী দশক থেকে, কেশবচন্দ্র সেন এই তরুণ সম্প্রদায়কে তাঁর নেতৃত্বে নানা কাজে নিয়োজিত করেন, নানাবিধ সংস্কার আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করেন এবং তাঁর ও ব্রাহ্মধর্মের প্রচারে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগে উৎসাহিত হয়ে সেই সব দায়িত্ব পালনের জন্য নিজেদের ভবিষ্যৎ-এর অনেক উজ্জ্বল সম্ভাবনাকে ত্যাগ করে ব্রাহ্ম আন্দোলনের ছত্রছায়ায় খুবই সাধারণভাবে জীবনযাপন শুরু করেন। এইসব উৎসাহী ও সক্রিয় কর্মীদের বেশীর ভাগেরই নিজস্ব ও নিশ্চিন্ত কোনো আশ্রয়, অন্নের জন্য কর্মসংস্থান কিছুই ছিল না, বিশেষ করে প্রচারকরা তাঁদের স্ত্রী-পুত্র সহ পরিবার নিয়ে অত্যন্ত আর্থিক কষ্টে দিন অতিবাহিত করতেন। তাই এইসব ব্রাহ্মদের নিয়ে ও প্রচারক পরিবারগুলোকে একত্রিত করে এক একান্নবর্তী 'আদর্শ ব্রাহ্ম পরিবার'[২] গঠনের জন্য কেশবচন্দ্র সেন ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারী 'ভারত আশ্রম'[৩] প্রতিষ্ঠা করেন।

এই আশ্রম সম্পর্কে আলোচনা কেশবচন্দ্র সেনের জীবনীগুলিতে[৪] বা ব্রাহ্ম আন্দোলন সম্পর্কিত গ্রন্থগুলিতে[৫] পাওয়া যায়। তবে, কেশবের যেসব সংস্কার প্রচেষ্টার অনেক কিছুই যেমন প্রাথমিক তথ্যের ভিত্তিতে পূর্ণাঙ্গভাবে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে 'ভারত-আশ্রম' তার অন্যতম। এই আশ্রম সম্বন্ধে সবিস্তারে আলোচনা তেমন হয়নি বলা যায় এবং তাই এটি বর্তমান প্রবন্ধের মুখ্য আলোচ্য বিষয়। এই আশ্রমের বিস্তারিত বিবরণ ধর্ম্মতত্ত্ব, ইণ্ডিয়ান মিরর, বামাবোধিনী পত্রিকা, Theistic Annual প্রভৃতি ব্রাহ্ম সমাজ থেকে যেসব পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হত, সেইসব পত্রিকায ও অনেক ব্রাহ্মদেব আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থে ছড়িযে আছে, যা একত্রিত করে আশ্রমের একটি বিবরণ তৈরী করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

১

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই অক্টোবর ইংলণ্ড থেকে প্রত্যাবর্তন করে কেশবচন্দ্র দু'টি উল্লেখযোগ্য সংস্কার আন্দোলন শুরু করেছিলেন তার মধ্যে একটি হল 'ভারত সংস্কার সভা'[৬] বা Indian Reforms Association (নভেম্বর, ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দ) আর অপরটি 'ভারত-আশ্রম'। 'ভারত-সংস্কার সভা'র উদ্দেশ্য ছিল বাংলার সমাজ জীবনের নানা ক্ষেত্রে, বৃটিশ আদলে, সংস্কারের কর্মসূচী গ্রহণ করা, যেমন, স্ত্রী-জাতির উন্নতি সাধন, শ্রমজীবী মানুষদের কারিগরী ও প্রাথমিক শিক্ষা, সুলভ সাহিত্য, মদ্যপান নিবারণ ও দাতব্য। আলোচ্য প্রবন্ধে এই সভার, কর্মযজ্ঞের বিশদ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন, শুধু এইটুকু উল্লেখনীয় যে, এই-নানা বিভাগের দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন ব্রাহ্ম-সমাজেরই নানা ব্যক্তিবর্গ যেমন, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, উমেশচন্দ্র দত্ত, নবীনচন্দ্র সেন, জযকৃষ্ণ সেন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, কান্তিচন্দ্র মিত্র, উমানাথ গুপ্ত, যাদবচন্দ্র ধর ও আরও অনেকে। আর কেশবচন্দ্র সেন ছিলেন এইসব বিভাগের সভাপতি। ব্রাহ্ম প্রচারকগণও এই সভার সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। এই বিশাল কর্মকাণ্ডের তত্ত্বাবধান নিয়মিতভাবে কেশবচন্দ্রের পক্ষে করা বেশ দুরূহ হয়ে দাঁড়ায়, কারণ, যাঁরা ছড়িয়ে ছিলেন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতার কারণে কেশবের পক্ষে সভার কাজ সুসম্পন্ন করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এই পরিস্থিতিতে কেশবের পক্ষে একটি কেন্দ্রীয় দপ্তরের প্রয়োজন পরে যা 'ভারত-আশ্রম'-এর প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অনেকটাই কার্যকরী করা সম্ভব হয়। কারণ, যাদের নাম সভার কর্মধারার সঙ্গে যুক্ত বলে আগে উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের অনেকেই এই আশ্রমের সদস্য হয়ে যান।[৭]

এছাড়াও, ব্রাহ্মধর্মে অনুপ্রাণিত যেসব যুবকেরা বা ব্যক্তিবর্গ তাদের আত্মীয় ও পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেছিলেন বা অনেক ক্ষেত্রে করতে বাধ্য

হয়েছিলেন, যাদের কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে, তারাও আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করেন। হিন্দু গোঁড়া ও পরিবর্তনবিরোধী সমাজে ব্রাহ্ম যুবকেরা খুবই নির্যাতিত হতেন। বিশেষ করে মফস্বল অঞ্চলে বা গ্রামে যে সব ব্রাহ্মেরা থাকবেন তাদেরই এই পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হত।[৮] এইসব নির্যাতিত ও একঘরে হওয়া ব্রাহ্ম, প্রৌঢ় বা যুবক, একা বা পরিবারসহ শান্তিতে ধর্মসাধন ও জীবনযাপন করার আশায় কলকাতায় চলে আসতেন। আবার অনেকে স্বইচ্ছায়ও গৃহত্যাগ করতেন। যাই হোক, এদের সবার জন্যে একটি কেন্দ্রীয় আবাসস্থলের প্রয়োজন কেশব অনেক আগেই অনুভাব করেছিলেন। সমস্যা আরও ছিল প্রচারকদের নিয়ে। তাই প্রচার কার্যের সুবিধার্থে ও প্রচার সম্প্রসারণের তাগিদে এবং প্রচারকদের অনুপস্থিতিতে তাদের পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণের গুরুদায়িত্ব পালনের জন্য ব্রাহ্ম সমাজে একটি বোর্ডিং হাউস বা 'হোম'-এর প্রয়োজন ছিল। এইসব নানাবিধ বাস্তব সমস্যার সমাধানের জন্য ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের তরফে কেশব এই 'ভারত-আশ্রম' প্রতিষ্ঠা করেন, 'সুখী পরিবার'[৯] গঠনের শিরোনামে।

'ভারত-আশ্রম' নামে আশ্রম হলেও, প্রকৃতপক্ষে এটি প্রাচীন ভারতীয় আশ্রমের মত ছিল না। 'ভারত-আশ্রম' অনেকটাই কেশবের ইংলণ্ডে দেখা বৃটিশ হোম বা কমিউন-এর আদলে গড়ে উঠেছিল। বৃটিশ মিডল ক্লাস ইংলিশ হোমগুলির কার্যকারিতায় মুগ্ধ কেশব এই সংগঠনের মাধ্যমে আন্দোলনে ঐক্য, শৃঙ্খলা, একান্তবর্তিতা ও সংস্কারে উদ্যোগ আনতে চেয়েছিলেন।

২

'ভারত আশ্রম'-এর স্থায়িত্ব ও কার্যকাল মাত্র পাঁচবছর অর্থাৎ ১৮৭২ থেকে ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দ। ভারত-আশ্রমের অন্যতম সদস্য ও কেশবচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সহযোগী গৌরগোবিন্দ উপাধ্যায় তঁার 'আচার্য্য কেশবচন্দ্র' গ্রন্থে লিখেছেন[১১] "৫ই ফেব্রুয়ারী (১৮৭২ খৃঃ) সোমবার কলিকাতা হইতে সাড়ে তিন ক্রোশ দূরে বেলঘরিয়াস্থ উদ্যানে 'ভারতাশ্রম' সংস্থাপিত হয়। শ্রদ্ধেয় বন্ধু জয়গোপাল সেন তাঁহার উদ্যান 'ভারতাশ্রম' সংস্থাপনজন্য দেন।" কলকাতা থেকে একটু দূরে হওয়ার জন্য অবশ্যই আশ্রমের সদস্যদের অত্যন্ত অসুবিধা হওয়ার কথা, কারণ, তাদের কর্মক্ষেত্র এবং ব্রাহ্মসমাজের সমস্ত দপ্তরের সদর দপ্তর শহরেই ছড়িয়ে ছিল। এই সমস্যা আশ্রম শুরু হওয়ার সময় কর্মকর্তাদেরও মনে হয়, তাই তারা স্থাপনাকালেই স্থির করেন যে, "আশ্রমের অধিবাসী সংখ্যা এবং আয় বাড়িলে, উহা কলিকাতায় আনীত হইবে।" তাই আমরা দেখি যে, আশ্রমটি কিছুদিনের মধ্যেই কলকাতায় স্থানান্তরিত হচ্ছে। এই তথ্য আমরা পাই বামাবোধিনী পত্রিকা[১২] থেকে—

অনেকে বোধ করি শুনিয়াছেন যে, কলিকাতায় এক আশ্রম স্থাপিত হইয়াছে। গত মাঘ মাসে বেলঘরিয়া গ্রামে ইহার সূত্রপাত হয়। দুই মাস পরে উহা স্থানান্তরিত হইয়া কাকুড়গাছিস্থ রাণী স্বর্ণময়ীর উদ্যানবাটীতে প্রতিষ্ঠিত হয়। তথা হইতে একমাস হইল উহা কলিকাতায় উঠিয়া আসিয়াছে। এই আশ্রমের নাম 'ভারত আশ্রম'।

এই কাঁকুড়গাছিতেও আশ্রম বেশীদিন স্থায়ী হয়নি, উঠে আসে ১৩নং মির্জাপুর স্ট্রীটে ও পরে আবার উঠে যায়, ১০নং আপার সার্কুলার রোড-এর এক বাড়ীতে।[১৩] এই সুবিশাল বাড়ীটির মালিক ছিলেন ব্রজনাথ ধর। রাধারমণ মিত্র তাঁর 'কলিকাতার টুকিটাকি'[১৪] প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন যে, ব্রজনাথ ধর বাড়ীর মালিক হবার আগে ঐ বাড়ীতে ছিল সেন্ট ভিন্‌সেন্টস্ হোম।

'ভারত-আশ্রম' প্রতিষ্ঠা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেশবচন্দ্র সেন ছাড়াও, সমাজের সঙ্গে একান্তভাবে যুক্ত যারা তাঁরা এবং প্রচারকেরা সবাই আশ্রমে চলে আসেন। প্রচারকদের মধ্যে প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, কান্তিচন্দ্র মিত্র, ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল, অমৃতলাল বসু, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও অন্যান্যরা সপরিবারে চলে আসেন। শিবনাথ শাস্ত্রীর মত যারা তখনও অ-প্রচারক ছিলেন তাঁরাও আশ্রমবাসী হন। প্রথমে সদস্য সংখ্যা মাত্র ৪২ জন[১৫] হলেও, ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১০২ জনে[১৬]। প্রত্যেক পরিবারকে তাদের নিজ নিজ ব্যয়ের অংশ আশ্রমের কার্যনির্বাহকের কাছে জমা দিতে হত।[১৭] আর প্রচারকেরা যেহেতু পূর্ণ সময়ের প্রচারক ছিলেন এবং কোনোরকম সাংসারিক দায়িত্ব পালনে অসমর্থ ছিলেন, তাই তাদের ও তাদের পরিবারের খরচ নির্বাহ করা হত প্রথমে ব্রাহ্ম সমাজের সাধারণ তহবিল থেকে ও পরে 'মিশন ফাণ্ড'[১৮] থেকে।

আশ্রমের অভ্যন্তরে একত্রিত পরিবারগুলোকে নির্দিষ্ট কতকগুলো নিয়ম পালন করতে হত যা অনেকটাই পাশ্চাত্য সমাজের বোর্ডিং হাউজের সঙ্গে তুলনীয় ছিল।[১৯] আশ্রমবাসী শিবনাথ শাস্ত্রী, সুদক্ষিণা গঙ্গোপাধ্যায়[২০] (পরে সেন) ও আরও অনেকের আত্মজীবনীতে সেই সময়কার আশ্রমের বিশদ বিবরণ থেকে জানতে পারা যায় যে, "এক সঙ্গে খাওয়া; একসঙ্গে বসা, এক সঙ্গে বেড়ান",[২১] এই ছিল নিয়ম। ১২৭৯ বঙ্গাব্দের বামাবোধিনী পত্রিকায়[২২] বিস্তারিতভাবে আশ্রমের দিনের কর্মসূচীর যে পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দেওয়া আছে তার থেকে জানা যায় যে, সকাল ৬টা থেকে দৈনিক কাজ শুরু হত অধ্যয়ন দিয়ে, তারপর নির্দিষ্ট সময়ে সম্মিলিত প্রার্থনা ও উপাসনা। তারপর সাংসারিক কাজকর্ম ও আহার করা হত। ভারতীয় ঐতিহ্যের বিপরীতধর্মী ও পাশ্চাত্য প্রথা অনুযায়ী, আশ্রমে মহিলারা আগে আহার গ্রহণ করতেন ও পরে পুরুষরা। দিনের একটি বৃহৎ অংশ মহিলারা লেখাপড়া, সেলাই প্রভৃতি কাজে ও পুরুষরা শহরে গিয়ে নানা কাজে অতিবাহিত

করতেন। সন্ধ্যাবেলায গান, উপাসনা, শরীরচর্চা ও বেড়ান এবং নানারকম আলাপ আলোচনাব মাধ্যমে সময় কাটান হত। আর সব থেকে যা উল্লেখযোগ্য তা হল প্রত্যেক আশ্রমবাসীকে নিয়মিত ডায়েরী লিখতে হত। প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য মাসিক ৬ টাকা, শিশুদের জন্য ৩ টাকা বারো আনা ও ভৃত্যদের জন্য ৪ টাকা চার আনা ধার্য ছিল। প্রত্যেকের বা প্রত্যেক পরিবারের জন্য একটি নির্দিষ্ট ঘর ছিল, তবে উপাসনা, বিদ্যাশিক্ষা ও আহার সাধারণ স্থানে করতে হত। এই ঘরের জন্যও সবাইকে টাকা দিতে হত। প্রচারক কান্তিচন্দ্র মিত্র আশ্রমের আয়-ব্যয বিষযক সবকিছুর দাযিত্বে ছিলেন এবং সবাইকে তাঁর কাছেই টাকা জমা দিতে হত। তবে, সব মিলিযে আশ্রমের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না এবং শিবনাথ[২৩] নিজেই লিখেছেন, "তখন প্রচারকগণ সকলে ও তৎসঙ্গে আমি সপরিবারে ঘোর দারিদ্র্যে বাস করিতাম।"

বামাবোধিনী পত্রিকা বা সুদক্ষিণা সেনেব আত্মজীবনী থেকে আশ্রমের দিনলিপির ও সম্মিলিত আহার, উপাসনা বা কাজকর্মের যেসব তথ্য পাওয়া যায তার থেকে বোঝা যায যে, তৎকালীন সমাজের প্রচলিত বিধিনিষেধগুলি 'ভারত-আশ্রমে'র ভিতরে অনেকাংশেই মানা হত না। প্রথমত, মহিলাদের জন্য পর্দা-প্রথা বা জেনানা পালন করা হত না। উপাসনার সময় পুরুষ ও মহিলা সদস্যগণ একত্রে বসতেন তবে পাশাপাশি নয়।[২৪] এই একত্রে পর্দাবিহীন অবস্থায় উপাসনা করা সেকালের সমাজে অবশ্যই একটি বৈপ্লবিক কাজ, যদিও কেশবচন্দ্র সেন এই একই ব্যবস্থা ব্রহ্মমন্দিরে প্রকাশ্য উপাসনাকালে শুরু করতে রাজী ছিলেন না। এই বিপরীতনীতি স্বভাবতই অনেক প্রগতিশীল ব্রাহ্মযুবকদের মনঃপূত ছিল না এবং তারা এই দুই রকম ব্যবস্থার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন।[২৫] এছাড়া, অপর আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো, সব মহিলারা, বা পুরুষরা একইসঙ্গে বসে রান্না অথবা আহার গ্রহণ করতেন, সেক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ বা শূদ্র। কোনোরকম ভেদাভেদ করা হত না। উনবিংশ শতাব্দীতে এইরকম জাতিভেদ প্রথার বিলোপ অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার।

আশ্রমবাসিনী মহিলাদের শিক্ষা, মানসিক উৎকর্ষতা ও গৃহকাজ নিপুণভাবে শেখাবার জন্য ভারত-সংস্কার সভার 'স্ত্রী-বিদ্যালয়'[২৬]টি 'ভারত-আশ্রমে' স্থানান্তরিত করা হয়। কলকাতায় স্কুল থাকাকালীন, ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ত্রিশ জন, কিন্তু আশ্রমবাসিনীর সংখ্যা বেশী থাকায় স্কুল পটলডাঙ্গা থেকে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে, ও সেখান থেকে এপ্রিল মাসে কাঁকুড়গাছিতে নিয়ে যাওয়ায় ছাত্রীসংখ্যা কিছু কমে যায়। শেষে স্কুলটিকে আবার জোরদার করতে, কলকাতার কলেজ স্কোয়ারে স্থায়ীরূপে পুনঃস্থাপিত করা হয়।[২৭] এই স্কুলে মহিলাদের শিক্ষা দিতেন, শিবনাথ শাস্ত্রী, গৌরগোবিন্দ রায়,

নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায, উমানাথ গুপ্ত প্রভৃতি আশ্রমেরই সদস্যগণ। কেশবচন্দ্র প্রচলিত আধুনিক অর্থে বা পাশ্চাত্য অর্থে নারীর উচ্চ-শিক্ষা প্রচলনে বিশ্বাসী ছিলেন না। এবং, "নারীচিত্তের স্বাভাবিক ঠিকানা, নারীচরিত্রের গঠন, সমাজে নিজস্ব স্থান পূর্ণ করার যোগ্যতা এবং মহৎচবিত্রেব সঙ্গে আধ্যাত্মিক যোগ স্থাপন কবাব শিক্ষা বেশী দরকাব বলে বুঝতেন।"[২৮] 'বামাহিতৈষিণী'[২৯] সভাও এখানে নিয়ে আসা হয এবং একজন ইংবেজ মহিলা মিস পিসট্‌ এই আশ্রমে এসে সদস্যাদের লেখাপড়ার তদারকি করতেন ও তাদেব সঙ্গে নানা উন্নতি বিষযে আলাপ আলোচনা করতেন। নাবীশিক্ষা ছাডাও, ভারত-সংস্কাব-সভার 'মদ না গরল'[৩০] পত্রিকার সদর দপ্তবও কিছুদিন 'ভাবত আশ্রমে' ছিল। ভারত-সংস্কার সভার বিভিন্ন কর্মধারা যেমন, স্ত্রী-জাতির উন্নতি, মদ্যপান-নিবারণ, দাতব্য, শ্রমজীবী মানুষদের শিক্ষা ও সুলভ সাহিত্য—এই সবেব সঙ্গে যারা যুক্ত ছিলেন বা দাযিত্বে ছিলেন তারা অধিকাংশই এই আশ্রমেব বাসিন্দা ছিলেন, আব তাই কেশবের পক্ষে সভাপতি হিসাবে, প্রতিদিন সভার কাজকর্ম সুচারুরূপে দেখাশোনা ও নিয়ন্ত্রণ কবা সম্ভব হত। প্রচাবকদের মধ্যেও ব্রাহ্মধর্মের আদর্শ প্রচারে ও আন্দোলনকে প্রসারিত করাব জন্য বিশেষ উদ্দীপনা ও উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়।[৩১] ভারত-আশ্রমেব প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ব্রাহ্ম সমাজে ঐক্য, ভ্রাতৃভাব, সম্মিলিত জীবন-যাপন, ব্রাহ্ম পরিবারগুলোর মধ্যে একাত্মতা নিঃসন্দেহে বৃদ্ধি পায়। উপরন্তু, ব্রাহ্ম সমাজের গণ্ডির বাইরে বৃহত্তর হিন্দু সমাজের সামনে একটি উন্নত কুসংস্কারবর্জিত আদর্শ ব্রাহ্ম পরিবারের নিদর্শন তুলে ধরা সম্ভব হয়।

এই 'ভারত আশ্রম' প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে কেশবচন্দ্র সেন আরও সুদূরপ্রসাবী ফলের আশা করেছিলেন আর তা হল, জাতি, সেনা, সম্প্রদায নির্বিশেষে এক বৃহৎ মানব পরিবার গঠন। তাঁর এই সময়কার উপদেশাবলী অনুধাবন করলে দেখা যায় যে, মানব ঐক্য, ধর্মের সংসার, মনুষ্য-পবিবার, এইসব ছিল তাঁর আলোচনার বিষয়বস্তু। "সকলেই আমরা এক শরীর, ব্রহ্ম আমাদের প্রাণ। অতএব সাবধান কেহই বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিও না।"[৩২] তাঁর মতে ব্রাহ্মরা সব একই দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, তাই স্বতন্ত্র হলে হবে না, "যদি ব্রহ্ম রাজ্য সংস্থাপন করতে চাও, তবে সকলকে গ্রহণ করিতে হইবে।..... ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় সমুদায় ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকারা প্রেমযোগে সম্মিলিত হইয়া একটি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর শরীর হইবে, ব্রহ্ম তখন তাহার প্রাণ হইয়া ব্রাহ্মপরিবার সংগঠন করিবেন।"[৩৩] এই ব্রাহ্মপরিবার শুধু বঙ্গদেশে সীমাবদ্ধ থাকবে না, পৃথিবীর "সকল জাতি এক হইবে, ভিন্ন দেশ থাকিবে না, ভিন্ন পরিবার থাকিবে না, ভিন্ন সম্প্রদায় থাকিবে না।"[৩৪] সবাই এক পরিবার গঠন করবে। কেশবচন্দ্রের আশা ও আদর্শ খুবই উচ্চমার্গের ছিল নিঃসন্দেহ, কিন্তু আশ্রম তার স্বল্পকালের

সময়সীমায বড় কিছু প্রভাব ফেলতে ব্যর্থ হয। আশ্রমবাসীদের নিজেদের মধ্যে সদ্ভাবের অভাব, পারস্পরিক হিংসা আশ্রমের পরিবেশ কলুষিত করে তোলে[৩৫] ও ক্রমশঃ সম্পর্কেব ঘোর অবনতি হলে 'ভাবত-আশ্রম' সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হাবিযে ফেলে।

৩

'ভারত-আশ্রমে' সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও পাবস্পরিক দ্বন্দ্ব, আশ্রমের অধিবাসীদেব ঘোর বিপথে চালিত করতে শুরু করে। সম্পর্কের অবনতিব সব থেকে বড কারণ ছিল আর্থিক অনটন, তজ্জনিত দুরবস্থা ও পরে ঋণগ্রহণ করে সমস্যাব সমাধানের প্রচেষ্টা ভারত-আশ্রমের সদস্যদের আর্থিক দাযিত্ব নিজেদেরই বহন করতে হত, আর পূর্ণ-সময়ের প্রচারকদের জন্যই শুধু মিশন-ফাণ্ড থেকে অর্থ আসত আশ্রমের তত্ত্বাবধাযক কান্তিচন্দ্রেব কাছে। কিন্তু, অনেক সমযেই আশ্রম চালাবার মত অর্থ আশ্রমবাসীরা বা মিশন ফাণ্ড কেউই দিতে অপারক হলে, প্রাযশই সুষ্ঠুভাবে আশ্রম চালানোর জন্য বাইরে থেকে ধন ঋণ গ্রহণ করতে হত। প্রকৃতপক্ষে এই সময ভারতবর্ষীয ব্রাহ্মসমাজের আর্থিক অবস্থা খুবই সঙ্গীন ছিল। 'ইণ্ডিয়ান মিরর',[৩৭] 'ধর্ম্মতত্ত্ব'[৩৮] বা অন্যান্য মুখপত্রগুলিতে এই আর্থিক সঙ্কটের কথা বিশদভাবে উল্লেখ আছে। ব্রাহ্ম সমাজের বার্ষিক সভা বা বিবরণীতেও এই সমস্যার কথা গভীরভাবে আলোচিত হযেছে। এই সমস্যাব সমাধানকল্পে প্রচারক সভাও[৩৯] বারবার সভা আয়োজন করলেও, সঙ্কট মোচন দুরূহ বলে গণ্য হয।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে বিশাল সংস্কার কাজগুলি ও দাতব্য দপ্তরগুলি চালাবার জন্য সব সময় প্রভূত অর্থের প্রয়োজন হত। এই অর্থ যোগানের জন্য সমাজকে নির্ভর করতে হত ভারতবর্ষের বা ইংলণ্ডের ব্যক্তি বিশেষের অনুদানের ও সমাজে প্রকাশিত বই বিক্রির টাকা উপর, যা বেশীর ভাগ সময়েই অপ্রতুল ছিল। ১৮৭২ খ্রীঃ পর থেকে আয় অপেক্ষা প্রতি বছর ব্যয়ের চাপে সমাজের সবরকম কর্মযজ্ঞ প্রায় বন্ধ হবার পর্যায় চলে আসত এবং তা চালু রাখা হত ঋণ করে। এই আর্থিক সঙ্কটের ছায়া অবশ্যই পড়ত আশ্রমের ওপর, কারণ, প্রায়শই 'মিশন ফাণ্ড' যা সমাজের আর্থিক অনুদানের উপর পূর্ণমাত্রায় নির্ভরশীল ছিল, প্রচারকদের বাবদ দেয় অর্থ দিতে ব্যর্থ হত।[৪০] অপরদিকে, অন্যান্য সদস্যরাও তাদের প্রদেয অর্থ না দেওয়ার আশ্রমে প্রচণ্ড অর্থাভাব দেখা দেয়, আশ্রমবাসীরা চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করে, ফলে ছোট ছোট স্বার্থের দ্বন্দ্বে তাদের পারস্পরিক সম্পর্কেব অবনতি ঘটে।

আশ্রমের অভ্যন্তরে গোলযোগ, কলহ ও অশান্তি কোর্টে মামলা পর্যন্ত গড়িয়ে যায়, যা 'ভারত-আশ্রম'-এর উচ্চ আদর্শের একান্ত পরিপন্থী ছিল। ঘটনার বিশদ বিবরণে না গিয়ে বলা যায় যে, আশ্রম সদস্য হরনাথ বসু ও তার পরিবারবর্গ, আশ্রম ত্যাগে উদ্যত হলে, যেহেতু তাদের প্রদেয় মাসিক অর্থ বাকী ছিল তাই তাদের নিয়ম ভঙ্গের কারণে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। পরে হরনাথ বসু ও কাশীনাথ দত্ত উভয়ে নানা জায়গায় আশ্রমের সম্পর্কে নানা দুর্নাম রটনা করলে ও হরনাথ বসু তার স্ত্রীর নামে ব্রাহ্মবিদ্বেষী 'সাপ্তাহিক সমাচার' পত্রে লেখা ছাপালে, 'ভারত-আশ্রম' ও বসু পরিবার দ্বন্দ্ব কোর্টের দরবারে পৌঁছায়।[৪২] এ ব্যাপার পরে পারস্পরিক সমঝোতায় মিটে গেলেও, তার প্রভাব 'ভারত-আশ্রম' তথা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের উপর বিশেষভাবে পরে। অপরদিকে, নব্যব্রহ্ম-যুবক যারা এই সময় 'ভারত-আশ্রমে'র বাসিন্দা হলেও নানা কারণে কেশবের মত ও কাজের বিরোধী ছিলেন তারাও একে একে আশ্রম ছেড়ে চলে যান।

১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে আশ্রমের সদস্য সংখ্যা কমতে থাকে এবং তার পরবর্তী দুই-তিন বছরের মধ্যেই আশ্রম শুধুমাত্র নামেই টিকে থাকে। ক্রমশ প্রচারকদের নিজেদের মধ্যেও মনোমালিন্য দেখা দিলেও শুধু কেশবের প্রতি তাদের ভক্তির জোরে তারা ঐক্যবদ্ধ থাকে, তবে সেই একতা 'ভারত-আশ্রম'-এর বৃহৎ এক সংস্থাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মত দৃঢ় ছিল না। তাই, কেশবচন্দ্র সেন-এর 'ভারত-আশ্রম' কাঁকুড়গাছি থেকে ১৩নং মির্জাপুর স্ট্রীট, সেখান থেকে আপার সার্কুলার রোড ও শেষে ৩নং পটুয়াটোলা লেন এ[৪৩] শেষ হয়ে যায়। শুধু প্রচারকদের গোষ্ঠীবদ্ধ করে অবশেষে 'প্রচার আশ্রম' নামে মিশন অফিসে 'ভারত-আশ্রম'-এর অবশিষ্টাংশ থেকে যায় আর প্রচারককরা 'লিলি-কটেজে'র একাংশে 'প্রচারক নিবাসে' সংঘবদ্ধভাবে জীবন অতিবাহিত করেন।

উপসংহারে বলা যায় যে, ভারত-আশ্রমের পাঁচ বছরের (১৮৭২ ৭৭) স্থায়িত্বকালে ব্রাহ্মসমাজের প্রভূত উন্নতি লক্ষ্য করা গেলেও প্রকৃতপক্ষে, কেশবের আদর্শ ব্রাহ্ম পরিবার গঠনের আশা শুধু ব্যর্থ হয়নি তা নয়, আশ্রমের প্রতিষ্ঠা ও তাকে ঘিরে মনোমালিন্য আন্দোলনের প্রভূত ক্ষতিসাধন করে। বাস্তব কতকগুলি সমস্যার সমাধানের জন্য ব্রাহ্মধর্মের উচ্চ আদর্শের, ভ্রাতৃভাবের উন্মেষ ঘটালেও, স্থায়ী 'আদর্শ ব্রাহ্ম পরিবার' বা 'সুখী পরিবার' গঠনে ব্যর্থ হয়। আশ্রমকে কেন্দ্র করে কলহ, মামলা ও পত্র-পত্রিকায় লিখিত অনুযোগ ও অভিযোগ, সমস্ত কলিকাতা শহরে এমন এক সমালোচনার ঝড় তোলে যা শুধু আশ্রমের অস্তিত্বই বিপন্ন করে তোলে তা নয়, ব্রাহ্ম-আন্দোলনের সংস্কারের ধারাটিকেও

যথেষ্ট বিনষ্ট করে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' নাটকে এই আশ্রমের প্রতি কটাক্ষ ও 'গালাগালি'[৪৪] স্বভাবতই জনসাধারণের মনে আশ্রম ও ব্রাহ্মসমাজের প্রতি বিরূপ ধারণা গড়তে সাহায্য করে। প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, যিনি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন, স্পষ্টই উল্লেখ করেছেন যে,[৪৫] " the Native opinion of Calcutta was very largely hostile to Keshab," এবং 'ভারত-আশ্রম'কে ঘিরে বাদ-প্রতিবাদ তা আরও বৃদ্ধি করে। এইভাবে, কেশবের স্বপ্নের 'ভারত-আশ্রম' ব্রাহ্মদের মানসিক উৎকর্ষতা বৃদ্ধিতে যতটা না সাহায্য করেছিল তার থেকেও বেশী আন্দোলনের প্রসারতায় অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

সূত্র নির্দেশ

১. ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ১১ই নভেম্বর কেশবচন্দ্র সেন 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর সহযোগীদের সঙ্গে কেশবচন্দ্র সেন ও অন্যান্য নব্য ব্রাহ্মদের নানা বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দিলে, দুই দল বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে কেশবচন্দ্র এই নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন।

২. 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যবিবরণ', **ধর্মতত্ত্ব**, ১লা ফাল্গুন ১৭৯৩ শক।

৩. **ইণ্ডিয়ান মিরর**, ১৬ সেপ্টেম্বর, ১৮৭৬; **ধর্ম্মতত্ত্ব**, ১লা মাঘ ১৭৯৩ শক; **বামাবোধিনী পত্রিকা**, আষাঢ়, ১২৭৯ শকাব্দ।

৪. উল্লেখযোগ্য জীবনীগ্রন্থ: গৌরগোবিন্দ রায় উপাধ্যায়, **আচার্য কেশবচন্দ্র** (২ খণ্ড) শতবার্ষিকী সংস্করণ, এলাহাবাদ, ১৯৩৮–৪০; প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, **লাইফ এণ্ড টিচিংস অফ কেশবচন্দ্র সেন**, কলিকাতা ১৯৩১।

৫. শিবনাথ শাস্ত্রী, **হিষ্ট্রি অফ দ্য ব্রাহ্ম সমাজ** (ইং), সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ, ১৯৭৪: পি. কে. সেন **বায়োগ্রাফি অফ এ নিউ ফেয়থ** (২য় খণ্ড), কলিকাতা, ১৯৫৪।

৬. এ্যানুয়েল রিপোর্ট অফ দ্য ইণ্ডিয়ান রিফর্ম এসোসিয়শন (Annual Report of the Indian Retorm Association) 1879 1871, কলিকাতা, ১৮৭২।

৭. প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, **পূর্বোক্ত গ্রন্থ**, পৃ.১৬৪।

৮. দ্রষ্টব্য. কৃষ্ণকুমার মিত্র. **আত্মচরিত**, ২য় সং, কলিকাতা, ১৩৮১ শক; গুরুচরণ মহলানবিশ, **আত্মকথা**, কলিকাতা, ১৯৭৪; বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, **ব্রাহ্মসমাজের বর্তমান অবস্থা এবং আমার জীবনের পরীক্ষিৎ বৃত্তান্ত.....** কলিকাতা, ১৯৫৩; শ্রীনাথ চন্দ, **ব্রাহ্মসমাজ চল্লিশ বৎসর**, ২য় সং কলিকাতা, ১৩৭৫; নীলমণি চক্রবর্তী, **আত্মজীবনস্মৃতি**, ২য় সং, কলিকাতা, ১৩৮২।

৯. কেশবচন্দ্র সেন এই সময়কার প্রায় সব উপদেশ ও প্রার্থনায় এই আদর্শ ব্রাহ্ম পরিবার বা সুখী পরিবারের উল্লেখ করেছেন। দ্রষ্টব্য. **আচার্য্যের উপদেশ**, কলিকাতা, ১৯১৮, ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড।

১০. কেশবচন্দ্র সেন, **কালচারস্ ইন ইণ্ডিয়া**, কলিকাতা, ১৯০৪ পৃ. ২৭৭; প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, **পূর্বোক্তগ্রন্থ**, পৃ. ১৬৫।
১১. গৌরগোবিন্দ উপাধ্যায, **পূর্বোক্ত গ্রন্থ**, পৃ. ১৬৩।
১২. **বামাবোধিনী পত্রিকা**, আষাঢ়, ১২৭৯ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৬৭; **ধর্মতত্ত্ব**, ১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৪ শক, পৃ. ৬৬৮।
১৩. প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, **পূর্বোক্ত গ্রন্থ**, পৃ. ১৬২, শিবনাথ শাস্ত্রী, **আত্মচরিত**, পৃ. ৬৮।
১৪. রাধারমণ মিত্র, **'কলিকাতার টুকিটাকি'**, **এক্ষণ**, ১২ বর্ষ, ৫—৬ সংখ্যা, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ।
১৫. **ইণ্ডিয়ান মিরর**, ৫ই জানুয়ারী, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ; **ধর্মতত্ত্ব**, ১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৪ শক, পৃ. ৬৬৭।
১৬. **বামাবোধিনী পত্রিকা**, আষাঢ়, ১২৭৯ বঙ্গাব্দ; **ধর্মতত্ত্ব**, ১৬ই মাঘ ও ১লা ফাল্গুন, ১৭৯৫ শকাব্দ, পৃ. ৯৩২।
১৭. শিবনাথ শাস্ত্রী, **আত্মচরিত**, শতবার্ষিকী সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯৮২, পৃ. ১৫৪।
১৮. ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ অত্যন্ত আর্থিক সঙ্কটের সম্মুখীন হয়ে, বিশেষ তহবিল 'ব্রাহ্ম মিশন ফাণ্ড' গঠন করে ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে অর্থসংগ্রহের জন্য। দ্রষ্টব্য, **ইণ্ডিয়ান মিরর**, এপ্রিল, ১৮৭৪ ও জানুয়ারী, ১৮৭৫।
১৯. প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, **পূর্বোক্ত গ্রন্থ**, পৃ. ১৬২।
২০. সুদক্ষিণা সেন, **জীবন-স্মৃতি**, কলিকাতা, ১৯৩১।
২১. শিবনাথ শাস্ত্রী, **আত্মচরিত**, পৃ. ১৫৩।
২২. **বামাবোধিনী পত্রিকা**, আষাঢ়, ১২৭৯ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৬৭—৭০।
২৩. শিবনাথ শাস্ত্রী, **আত্মচরিত**, পৃ. ১৫৪; প্রচারকরা এই সময়ে যে কি প্রচণ্ড দারিদ্রের মধ্যে দিন যাপন করতেন তার বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়, প্রচারকদেরই আত্মজীবনীগুলিতে যেমন, কান্তিচন্দ্র মিত্র, **ভৃত্যের আত্মপরিচয়**, কলিকাতা, ১৯১৭, পৃ. ৩০—৩২, ভাই উমানাথ গুপ্ত, **সাক্ষী অর্থাৎ কেশবচন্দ্র সেনের প্রকৃত ছবি**, কলিকাতা, ১৯১০, পৃ. ৮।
২৪. কৃষ্ণকুমার মিত্র, **আত্মচরিত**, তদেব, পৃ. ৮৬-৮৭; গৌরগোবিন্দ উপাধ্যায়, **পূর্বোক্ত গ্রন্থ**, পৃ. ৬৭৫।
২৫. এই বিরোধী দলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন, দুর্গামোহন দাস, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, রজনীনাথ রায় ও আরো অনেকে।
২৬. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য, **ইণ্ডিয়ান রিফর্ম এসোসিয়েশনের এ্যানুয়েল রিপোর্ট**, ১৮৭০—৭১; **বামাবোধিনী পত্রিকা**, শিবনাথ শাস্ত্রী, **হিস্ট্রি অফ দ্য ব্রাহ্ম সমাজ**
২৭. **বামাবোধিনী পত্রিকা**, বৈশাখ, ১২৪০ বঙ্গাব্দ, সংখ্যা ১১৭, পৃ. ২৩—২৪।
২৮. সতীকুমার চট্টোপাধ্যায়, **সমন্বয় মার্গ**, কলিকাতা, ১৯৬২, পৃ. ২৪১।
২৯. ভারত-সংস্কার সভার অন্তর্গত স্ত্রী-জাতির উন্নতিসাধন বিভাগের নানা কাজের মধ্যে, ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে 'The Native Ladies Normal School।' প্রতিষ্ঠা একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ঐ স্কুলেরই মহিলারা একসঙ্গে ঐ বছরেরই এপ্রিল মাসে 'বামা-হিতৈষিণী-সভা' শুরু করেন, যেখানে তারা কেশবের উপস্থিতিতে তাদের লেখা

পাঠ ও ভাবের আদান-প্রদান করতেন। এই সভা সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ছিল না এবং শুধু মাত্র মহিলারাই এতে যোগদান করতে পারতেন। এই লেখাগুলি পরে, উমেশচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত **'বামাবোধীনী পত্রিকা'**তে প্রকাশিত হত।

৩০. এই পত্রিকাটি ভারত-সংস্কার সভার 'সুরাপান ও মাদক-নিবারণ' বিভাগের পত্রিকা ছিল। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর **'বাংলা সাময়িক পত্র'** (২য় খন্ড) ৩য় মুদ্রণ, ১৩৮৪, গ্রন্থে, যা লিখেছেন তা হল, পত্রিকাটির প্রকাশনা অনিয়মিত ছিল এবং এর হাজার কপি মুদ্রিত হয়ে বিনামূল্যে বিতরিত হত। আসলে বাংলাদেশের নানাস্থানে সুরাপান- নিবারণী আন্দোলনের হাতিয়ার হিসাবেই কাজ করতে চেয়েছিল এই পত্রিকা।

৩১. প্রতাপচন্দ্র মজুমদার **পূর্বোক্ত গ্রন্থ**, পৃ. ১৬৩।

৩২. **আচার্য্যের উপদেশ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ**, ২রা মাঘ; ১৭৯৩ শক।

৩৩. ঐ, ৩১শে আষাঢ়, ১৭৯৪ শক।

৩৪. ঐ

৩৫. শিবনাথ শাস্ত্রী, হিস্ট্রি..... **পূর্বোক্ত গ্রন্থ**, পৃ. ১৬১—৬২।

৩৬. শিবনাথ শাস্ত্রী, **আত্মচরিত**, পৃ. ১৫৪।

৩৭. **ইন্ডিয়ান মিরর**, ১৪ই জুন, ১৮৭৪।

৩৮. **ধর্ম্মতত্ত্ব**, ১৬ই মাঘ ও ১লা ফাল্গুন, ১৭৯৬ শক, সংখ্যা, ৪০৫।

৩৯. গৌরগোবিন্দ রায় সংকলিত, প্রচারকগণের সভার বা **শ্রীদরবারের নির্দ্ধারণ**, কলিকাতা, ১৩০৭, পৃ. ৩১।

৪০. প্রতাপচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত, **থিয়িসৃটিক এ্যানুয়েল**, পত্রিকায় এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা আছে। "ভারত আশ্রম" **থিয়িসৃটিক এ্যানুয়েল**, ১৮৭৪; পৃ. ৫৩—৬০। এছাড়াও দ্রষ্টব্য, **ইন্ডিয়ান মিরর**, জুন, ১৮৭৪; **ধর্ম্মতত্ত্ব**, ১৬ই চৈত্র, ১৭৯৫ শক।

৪১. **ধর্মতত্ত্ব**, ১লা শ্রাবণ, ১৭৯৬ শক, পৃ. ১৫৩।

৪২. ঐ, ১লা বৈশাখ, ১৭৯৭ শক, পৃ. ৯২; ১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৭ শক, পৃ. ৯৪—৯৬। আরও দ্রষ্টব্য, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, **পূর্বোক্ত গ্রন্থ**, পৃ. ১৬৫—১৬৬।

৪৩. **ইন্ডিয়ান মিরর**, ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৮৭৬ শক।

৪৪. **ধর্ম্মতত্ত্ব**, ১৬ই আশ্বিন, ১৭৯৪ শক, পৃ. ৯৫।

৪৫. প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, **পূর্বোক্ত গ্রন্থ**, পৃ. ১৬৪।

সমকাল, সমাজ ও সামাজিক ইতিহাস

বাসব সরকার

পরিবর্তনেব সমাজতত্ত্ব আর পরিবর্তনের মনস্তত্ত্ব, এই দুয়ের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায গড়ে সামাজিক ইতিহাস। সমাজের কালগত যে সব পরিবর্তন প্রকৃতির নিয়মে ঘটে, সামাজিক ইতিহাসে তাদের বিশেষ চোখে পড়ার মতো কোন অবদান থাকে না। কিন্তু যে পরিবর্তন সমাজের বহমান জীবন ধারায় একটা গতির সঞ্চার করে, তাবই থাকে ইতিহাস সৃষ্টির ক্ষমতা। সামাজিক ইতিহাস বলতে মোটামুটি সেটাই বোঝায। পরিবর্তন আর প্রগতি সমার্থক নয। কোন কিছু বদলে গেলেই অগ্রগতি ঘটে না। বদলে যাওযা পিছনদিকে যাওযাও হতে পারে। আবার পরিবর্তন সমাজমানসে বিশেষ এক ধরনের রূপান্তর সূচিত করতে পারে যার সঙ্গে মানুষেব জীবনচর্যায় কোন গুণগত অবস্থান্তরের সম্পর্ক নেই। অধিকাংশ বাজনৈতিক পরিবর্তন এই ধরনের হযে থাকে। যেমন ভারতেব স্বাধীনতা আন্দোলন মানুষের রাজনৈতিক চেতনাকে ধীরে হলেও বদলেছে, কিন্তু অধিকাংশ মানুষের জীবনযাপন পদ্ধতিতে কোন পরিবর্তন আনেনি। আবার দেশভাগ একটা বিরাট মাপের রাজনৈতিক ঘটনা হিসেবে মানুষের চেতনায় দ্রুত নানা পরিবর্তন ঘটিযেছে যার অভিঘাত সমাজ জীবনে পড়েছে ভিন্নভাবে এবং ধীরে। পঞ্চাশের মন্বন্তরের মতো বিরাট ট্র্যাজেডি ৩৫ লক্ষ বাঙালির মৃত্যু ঘটিযেও বাঙালির সামাজিক ইতিহাসে বড়ো মাপের কোন রূপান্তর ঘটাতে পারেনি। দ্বিতীয বিশ্বযুদ্ধের সেই ভয়াবহ দিনগুলি বাঙালি সমাজের গোড়া ধরে টান দিতে পারেনি। পরিবর্তনের মনস্তত্ত্ব পঞ্চাশের মন্বন্তরে বাঙালির অস্তিত্ব বিপর্যয়ের চেতনা কেন গড়ে তোলেনি সেটা ভেবে দেখার মতো বিষয়। মননশীল বাঙালি মন্বন্তরে ব্যাকুল, বিচলিত হয়েছিল ঠিকই যার প্রমাণ রযেছে গল্পে, কবিতায, উপন্যাসে, চিত্রে। সেই অভিঘাত যথেষ্ট বড়ো মাপের এবং আন্তরিক ছিল। কিন্তু সমগ্র বাঙালির সমাজ তাতে বিক্ষুব্ধ, মর্মাহত হয়ে সেই মৃত্যুর মিছিল বন্ধ করতে অগ্রসর হয়েছিল, তার কোন প্রমাণ নেই। অথচ বঙ্গভঙ্গ ও দেশভাগে সেটাই হয়েছে।

সামাজিক ইতিহাসের একটা নঞর্থক ধারণার কথা এই সূত্রে বলে নেওয়া দরকার। একদল মানুষ আছেন যাঁরা রাজনীতির প্রত্যক্ষ সম্পর্কহীন কোন ঘটনা, যত গুরুত্বপূর্ণই হোক না কেন, তার ইতিহাস সৃষ্টির ক্ষমতাকে বিশেষ আমল দিতে চান না। এখানে অবশ্যই রাজনীতি বলতে তার সুপরিচিত প্রকটরূপকেই

বোঝানো হয়েছে। সুতরাং সেই মোটা দাগের রাজনীতি না থাকলে ঘটনা কিম্বা তার অভিঘাতের ইতিহাস সৃষ্টির ক্ষমতা তাঁরা মানতে রাজী নন। আবার যা কিছু যথেষ্ট পুরনো নয়, তার ঐতিহাসিকতাকে স্বীকৃতি দিতে এই ধরনের বিরূপতা মোটেই দুর্লভ ঘটনা নয়। অথচ দুনিয়ার সব দেশে, সব কালে একদল মানুষ চলমান জীবনের মধ্যেই ইতিহাসের সন্ধান করতে উদ্যোগী হয়েছেন। তাঁরাই সামাজিক ইতিহাসচর্চার উপরে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বলা হয়েছে সামাজিক ইতিহাসের সঙ্গে রাজনীতির প্রত্যক্ষ কিম্বা পরোক্ষ সংযোগ যেভাবেই ঘটুক না কেন, সামাজিক ইতিহাস মোটেই অরাজনৈতিক নয়। আধুনিক রাষ্ট্রতত্ত্বও সেই কথা বলে। কারণ মানুষের জীবনযাপন প্রক্রিয়ায় রাজনীতির প্রসঙ্গ কেবল নয়, তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ঘটবেই।

তাই গোড়াতেই বলে নেওয়া দরকার কোন সমাজে জনগণের জীবনচর্যা ও জীবনদৃষ্টির ধারাবাহিকতার মধ্যে যেখানে যেমন পরিবর্তনীয়তার ধাক্কা এসে লাগে, তাদের সামাজিক ইতিহাস তার ভিত্তিতেই সৃষ্টি হয়। এই পরিবর্তনীয়তা সামনে অথবা পিছনের দিকে যেতে পারে। যেমন ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন রাজনৈতিকভাবে এগিয়ে চলার ডাক দিলেও তার মূল ঝোঁক পুনরুজ্জীবনবাদের দিকে থাকায় সামাজিক ইতিহাসে কোন প্রগতিশীল পরিবর্তন আনতে পারেনি। অথচ সাধারণভাবে একথা সত্য যে, কোন দেশ বা জাতি তার জীবনবিকাশের গুরুত্বপূর্ণ কোন পর্বে যখনই এমন কোন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয় যা তার অস্তিত্বের বনিয়াদ নাড়িয়ে দিতে পারে, তার অভিঘাতে সমাজ সেই আলোড়ন কতটা আত্মস্থ করতে পারবে আর কতটা তার জন্যে বদলাবে, তার ঐতিহ্য, পরিবেশ ও পরিস্থিতিগত নানা কারণ থাকে। বঙ্গভঙ্গের প্রথম উদ্যোগ তেমনই একটি ঘটনা।

সামাজিক ইতিহাসে থাকে মানবিক সম্পর্কের কম বেশি পরিবর্তনের কথা। সেই সম্পর্ক আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক জীবনে ও মূল্যবোধে পরিবর্তন থেকেই বদলাতে থাকে। নাড়া দেওয়ার মতো যে কোন ঘটনা সমাজের ও অন্যান্য মানুষের প্রতি সকলের দায়বদ্ধতার দিকটি প্রকট করে তোলে। এটাও বলা দরকার, এই দায়বদ্ধতা হলো এমন একটি চেতনা, যার বিকাশ ঘটলে কোন এক বিশেষ ক্ষেত্রে তাকে ধরে রাখা যায় না। তার বৈশিষ্ট্য সমাজব্যবস্থাগত কারণে চলমান জীবনের নানা স্তরে স্বপ্রকাশ হবে। এখানে বিস্তারিত আলোচনার মধ্যে না গিয়েও বলা যায় যদি অন্তত আর্থ-সামাজিক এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক দিকে সেই পরিবর্তনের ছাপ চোখে পড়ার মতো হয়, তা হলেই সামাজিক ইতিহাসের পর্বান্তর ঘটে যায়। তবে প্রথম ক্ষেত্রে, আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন ঘটে মোটা দাগের, মার্ক্সীয় পরিভাষায় যাকে বলা হয়েছে

উৎপাদন সম্পর্কের রদবদল। কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে পরিবর্তন হয় ধীরে, তার লক্ষণগুলোও সূক্ষ্ম। সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের সঙ্গে মানুষের মননের সম্পর্ক, সব কাজে, সকলের কাজে তাকে লক্ষ্য করা যায় না সহজে। তাই সমাজ জীবনের ধারা দৃশ্যতঃ বদলে গেলেও মানুষের চিন্তায়, মতাদর্শে, বিশ্বাসের গড়নে মূল্যবোধে তাদের পূর্ণ বিকাশ ঘটে অনেক দেরীতে। একটা ধ্রুপদী উদাহরণ প্রসঙ্গত দেওয়া যেতে পারে। ষোল শতক থেকে বৃটেনে যে সব পরিবর্তন সমাজে, অর্থনীতি ও সংস্কৃতিতে এই বিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত ঘটে গেছে তার গুণগত মান সারা দুনিয়ায় স্বীকৃত। অথচ বৃটেনের সমকালীন সমাজে এই শতাব্দী শেষেও বলা হয় একই সঙ্গে 'রাজতন্ত্র অভিজাততন্ত্র ও গণতন্ত্র সহাবস্থান' করছে। অর্থাৎ অনেক কিছু নতুন ক্রমাগত ঘটে গেলেও সেখানে পুরনো ব্যবস্থার শিকড়গুলি মানুষের মনে এখনও টিকে থাকার মতো রসদ পাচ্ছে। অন্যভাবে বলা যেতে পারে পরিবর্তনের সমাজতত্ত্ব বৃটেনের সমাজ জীবনে যতটা প্রাগ্রসর, পরিবর্তনের মনস্তত্ত্ব সেই অনুপাতে এগিযে যেতে পারেনি। শেষের কথাটি বৃটেনের সামাজিক স্তর নির্বিশেষে প্রযোজ্য।

বঙ্গদেশের সামাজিক ইতিহাসকে যদি বিশ শতকের প্রথম পঞ্চাশ বছরের সময় সীমার মধ্যে আলোচনা করা যায় তাহলে অন্তত দুটি ঘটনার বিশেষ উল্লেখ করতেই হবে যেখানে প্রথমটি সমাজ মনস্তত্ত্বে বিরাট পরিবর্তন এনেছে বলে মেনে নিতে হবে, কিন্তু পরিবর্তনের সমাজতত্ত্বে কোন ধাক্কা লাগতে পারেনি। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন হলো সেই প্রথম বিরাট মাপের ঘটনা, যার তুলনায় সমমানের কোন ঘটনা তার আগের চার পাঁচ শ' বছরে ঘটেনি। এই একটি ঘটনা বঙ্গদেশে জাতি চেতনার উন্মেষ ঘটায়। সমগ্র বাঙালি সমাজ তাতে আলোড়িত হয়েছে। এখানে হিন্দু বাঙালি কিম্বা মুসলমান বাঙালি অর্থে কথাটি বলা হচ্ছে না। সম্প্রদায়গত ভেদ নির্বিশেষেই কথাটি ভাবার চেষ্টা হচ্ছে যদিও একথা অনস্বীকার্য যে বাঙালি সমাজের মুসলমান অংশ বঙ্গভঙ্গে উৎসাহিত বোধ করেছিল এই প্রথম স্বাধিকার পাওয়ার আশায়। সেখানেও 'আশ্‌রফ', 'আত্‌রফ' ভাগ ছিল এবং দুই অংশে মোটেই সমজাতীয় চিন্তা ভাবনা ছিল না। তা ছাড়া তাদের মধ্যে বঙ্গভঙ্গে যে উৎসাহ, আগ্রহ দেখা যায় সেটাও ছিল একান্তভাবে ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামোর মধ্যে কিছুটা চাকরি ও সীমিত কিছু ক্ষমতা পাওয়ার আশা আকাঙ্খার বৃত্তে আবদ্ধ। সেখানে দ্বি-জাতি তত্ত্বের ধারণা তখনও তাদের মনে ছড়িয়ে পড়ার কোন লক্ষণ ছিল না। অন্যদিকে, বাঙালি হিন্দুরা বঙ্গভঙ্গে দেখেছিল তাদের অস্তিত্ব বিপর্যয়ের সম্ভবনা। এই অস্তিত্ব বিপর্যয়ের আশংকা তারা করেছিল বাঙালি হিসেবে, অর্থাৎ সমগ্র বঙ্গদেশবাসীর দৃষ্টিকোণ থেকে, শুধু হিন্দু বাঙালি হিসেবে নয়। তাই

চেতনার, চিন্তার দিক থেকে স্বদেশী আন্দোলনের প্রবক্তা, সংগঠক, নেতৃত্ব ও কর্মিদল ছিল অসাম্প্রদায়িক। কিন্তু তাদের অনুসৃত নীতি, পদ্ধতি ও কর্মসূচিতে সেই সার্বিক বাঙালি মানসিকতা প্রতিফলিত হওয়ার বদলে এসে পড়ে একের পর এক হিন্দু সাম্প্রদায়িক অনুষঙ্গ, যা বাঙালি সমাজ মানসে হিন্দু-মুসলমানের ভেদ রেখাকে অস্পষ্টভাবে হলেও প্রথম টেনে দেয়। বিশ শতকের বঙ্গদেশে সামাজিক সাংস্কৃতিক বিকাশের যে ধারা উপনিবেশবাদের সযত্ন প্রয়াসে গড়ে ওঠে, বাঙালি হিন্দু মানসিকতার এহেন লক্ষণ তার জন্যেই মূলত দায়ী।

কিন্তু বাঙালির এই নবজাগ্রত একান্ত চেতনা মূলত ছিল রাজনৈতিক। সংস্কৃতির বৃত্তে তার যেটুকু অভিঘাত দেখা যায় সেটাও রাজনৈতিক সংস্কৃতি। সংস্কৃতির সামাজিক দিক সেখানে কার্যত অনুপস্থিত। যেমন ধরা যাক 'একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি' গানটির কথা। কোন এক অজানা গীতিকারের লেখা, অচেনা সুরকারের সুরে গাওযা এই গান স্বদেশী যুগের পর থেকে প্রায় এ পর্যন্ত কোটি মানুষের মনে এমন এক আলোড়ন তোলে যা সাময়িকভাবে হলেও দেশব্রতীদের আনমনা করে, মুহূর্তের জন্যে হলেও ভাবায় দেশ ও সমাজ কোথা থেকে কোথায় এসে পড়েছে। গানের এই জাতীয়তাবাদী আবেদন অনেক ছোট বড়ো রাজনৈতিক আন্দোলনের মানসিক প্রস্তুতি গড়ে তুলতে অপরিসীম অবদান রেখেছে। এরই পাশাপাশি প্রাক-স্বাধীনতা পর্বে আমাদের শিক্ষাদীক্ষা, সমাজ চেতনা বেড়েছে। কিন্তু এই গানের ভাষায় যে সমাজভাবনা রয়ে গেছে বাঙালির অতি গর্বের র‍্যাডিকাল চিন্তায় তার কোন গুণগত ছাপ পড়ে তাকে পরিবর্তনমুখী করেছে, তার সামান্যতম প্রমাণও নেই। গানের দুটি কলি লক্ষ্য করলেই ব্যাপারটা বোঝা যায়।

যেমন: 'সাত লক্ষ তেত্রিশ কোটি রইলো মা তোর বেটা বেটি।
তাদের নিয়ে ঘর করিস মা, বৌদের করিস দাসী,
আবার: 'দশ মাস দশ দিন পরে জন্ম, নেব মাসির ঘরে
চিনতে যদি না পারিস মা দেখবি গলায় ফাঁসি।'

এই দুটি কলির দুই বিশেষ অংশ 'বৌদের করিস দাসী' আর 'চিনতে যদি না পারিস মা দেখবি গলায় ফাঁসি' এমন দুটি ধারণার সঙ্গে সম্পৃক্ত যা বাঙালি সমাজের আধুনিক যুক্তিবাদী মনন চিন্তায় অনেক আগেই বড়ো মাপের সামাজিক আন্দোলন শুরু করার পক্ষে প্রত্যক্ষ কারণ হওয়া উচিত ছিল। কারণ প্রথমটির মধ্যে রয়েছে সমাজের বড়ো একটি অংশ নারীর প্রতি পুরুষ প্রধান সমাজ মানসিকতার স্পষ্ট অভিব্যক্তি, বিবাহিত নারী স্বামীর ঘরে কোন ভূমিকার জন্যে নিয়তি-তথা-সমাজ নির্দিষ্ট। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকেও শুধু গ্রাম বাংলা কিম্বা দূর মফস্বল শহরে নয়, এই বিশ শতকের শহর কলকাতায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত

পরিবারের ছেলেরা বিয়ে করতে যাওয়ার আগে সমাজরীতি অনুসারে বলে যেত 'মা তোমার দাসী আনতে যাচ্ছি'। বলা বাহুল্য একথা আক্ষরিক অর্থে সত্য নয়। কিন্তু সমাজমানসের যে ছাপ এই রীতিব মধ্যে প্রতিফলিত বিযেব পরবর্তীকালে অনেক বাঙালি পুরুষের স্ত্রী সম্পর্কে ব্যবহারের মধ্যে তার অনুক্ত প্রকাশ চোখে না পড়ে পারে না। নারীবাদীদের বক্তব্যে যে সব কথা প্রকাশ পায, যা তাদের জীবনের অভিজ্ঞতা, সেদিকে নজর দিলেই বোঝা যাবে এই 'দাসী আনার' মানসিকতা এখনো যথেষ্ট শিকড ছড়িয়ে ডালপালা মেলে বজায় আছে।

আর দ্বিতীয কলিতে রযেছে সরাসরি জন্মান্তরবাদের প্রতি একনিষ্ঠ বিশ্বাসেব সোচ্চার ঘোষণা। তারই দোসর কর্মফলবাদের সঙ্গে একত্রে এই জন্মান্তরবাদ বাঙালি মানসে এমন পাকা আসন বানিয়েছে যে সেখান থেকে তাদের উচ্ছেদ করা প্রায় অসম্ভব হযে পড়ছে। তাই 'ভোলে বাবা পার করেগা'তে সামিল হয আধুনিক যুবক-যুবতীরা, তারা কোন না কোন বাবাজী, মাতাজী, দাদাজীব চেলা হয়, তাগা, তাবিজ, মাদুলী অঙ্গে ধারণ করে, নীলা, পলা, গোমেদ, বৈদুর্যমণিখচিত আংটিতে দুই হাতের আট আঙুলের শোভা বর্ধন করে অতি আধুনিক ভোগবাদী সমাজে নিজের ঠাঁই খুঁজে নিতে আপ্রাণ চেষ্টা করে।

'একবার বিদায় দেমা ঘুরে আসি' গানের গীতিকার আটদশক আগে যে বাঙালি সমাজ দেখেছিলেন, যার স্বরূপ জাতীয়তাবাদী চেতনার বৃত্তে সহজ ভাবেই ফুটিয়ে তুলেছিলেন, একালের সমাজ মানসিকতা তার থেকে বিশেষ বদলেছে বলে মনে করা যায় না। পরিবর্তনের মনস্তত্ত্ব কেন বাঙালি সমাজকে ছুঁয়ে যেতে পারেনি, এখনও পারছে না, তার কারণ বিচার বিশ্লেষণ করতে এই গানটি সূচনা বিন্দু হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। রাজনৈতিক কাঠামোগত ভাঙ্গাগড়ায় বাঙালি যত সহজে, যতটা ব্যাপকভাবে সাড়া দেয়, সামাজিক কাঠামোগত ভাঙ্গাগড়ায় তার অনীহা ঠিক প্রায় ততটাই প্রবল। যদি এই মানসিকতা কেবল বাঙালি সমাজের নিম্নবর্গের মধ্যে সীমিত থাকতো, তাহলে তাত্ত্বিকরা তার চটজলদি একটা ব্যাখ্যা হাজির করতে পারতেন যে সাংস্কৃতিক অনগ্রসরতা তার কারণ। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে নিম্নবর্গ নয়, সমাজের মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্তদের মধ্যেই এই মানসিকতা বেশি জোরালো। একথা বলার উদ্দেশ্য এটা নয যে বাঙালির সমাজ মানসে আদৌ কোন পরিবর্তন ঘটেনি। অবশ্যই যৌথ পরিবার ভেঙ্গে নিউক্লিয়ার পরিবার প্রথা চালু হয়েছে, অনেক বাঙালি বিয়ে করছে, অর্থাৎ প্রথম চৌধুরীর ভাষায় ভূ নয় কৃ ধাতু কাজ করছে, বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটতে পারছে অবনিবনা দুঃসহ হয়ে উঠলে। এসব পরিবর্তন সদর্থক। কিন্তু এগুলির বাইরে বঙ্গাব্দ চতুর্দশ শতকে বাঙালি জীবনে পরিবর্তনের মনস্তত্ত্ব দু'চার কদম এগিয়েছে বলে মানা যায় না।

এই গানের প্রায় চ'ব দশক পরে দেশভাগের পটভূমিতে রচিত একটি বিশেষ ভাগে পবিবর্তনেব সমাজতত্ত্ব বিশেষভাবেই প্রকট। তার গীতিকার ও সুরকার সুপবিচিত। তিনি প্রযাত হেমাঙ্গ বিশ্বাস, আর গানটি হলো 'মাউন্টব্যাটন সাহেব ও, তোমার সাধেব ব্যাটন কার হাতে থুইয়া গেলা ও'। দেশভাগের পর ক্ষমতা হস্তান্তবেব পটভূমিতে এই গান উদ্বাস্তুদের ঢল নামা পশ্চিম বাংলায কলকাতা থেকে শুরু কবে গ্রামে গঞ্জে এই গান লক্ষ মানুষ শুনেছে, জাতীয় নেতৃত্বের রাজনীতি বিশ্বাসঘাতক বলে মনে করেছে, বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে, জুটেছে প্রতিবাদে, প্রতিবোধে সামিল হতে। সেই সব ঘটনাও সমকালের ইতিহাস, যখন চল্লিশের দশকের শেষ থেকে পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত পশ্চিম বাংলার বাজনীতি একটা বিশেষ মোড নিতে থাকে। বিভাগোত্তর এই রাজ্যের অর্থনৈতিক বিপর্যয এখানকার মানুষদের রাজনৈতিক চিন্তাকে এমন একটা স্তরে উন্নীত করেছে যার সঙ্গে দেশেব অন্য কোন রাজ্যের অভিজ্ঞতা মেলে না।

কিন্তু এখানে বলাব কথা হল, এই গান যতটা রাজনৈতিক ইতিহাসে পট পরিবর্তনেব ছবি তুলে ধরে, তার কাবণ বুঝতে সাহায্য করে, সামাজিক ইতিহাসে পবিবর্তনের ছবি ততটা প্রকট করে না। বাঙালিব প্রতিবাদী রাজনীতির পর্বগুলি জানা ও বোঝার জন্যে এই গান দিকচিহ্ন হিসেবে কাজ করে, কিন্তু বাঙালি সমাজেব ভাঙনের চেহারা তাতে তুলে ধরা হয না। অথচ দেশভাগের পর বাঙালি সমাজের ভাঙন ঘটতে থাকে দ্রুতহারে, যার সূচনা হয়েছিল দ্বিতীয বিশ্বযুদ্ধে মহামন্বন্তরের মর্মান্তিক দিনগুলিতে। তার পরিচয পাওয়া যায় গল্পে, উপন্যাসে, নাটকে, কবিতায, চিত্রে, ভাস্কর্যে। কিন্তু বাঙালি সমাজের অন্তর্নিহিত দাযবদ্ধতা সাধারণ মানুষকে কতটা আলোড়িত করেছে তার বাস্তব প্রমাণ তাদের মধ্যে তেমন নেই। সেই ভাঙন যে এসেছিল অনিবার্যভাবে, যা দেশভাগের পর দ্রুততর হলো, বাঙালি সমাজ যে ভাঙনকে আর সামলাতে না পেরে ভিতরে ভিতরে বদলাতে সুরু করলো। তার ব্যাপকতা ও গভীরতা আজো বিশ্লেষণ করা যায়নি। তাই পরিবর্তনের সমাজতত্ত্বই আমরা দেখলাম, পরিবর্তনের সমাজতত্ত্ব অদেখা রয়ে গেল।

এই পরিবর্তনের সমাজতত্ত্বের অর্থনৈতিক দিক নিয়ে ব্যাপক আলোচনা আজো তেমন হযনি বলেই বাঙালির সামাজিক ইতিহাসের সামগ্রিক চেহারা আজো দেখা যায়নি। একালের বাঙালি জীবনের উত্তরাধিকার কি সেটা এই অসম্পূর্ণতার জন্যেই বোঝা যায় না। তাই একালে বাঙালি মানসে মাঝে মাঝে সাম্প্রদায়িকতার লক্ষণ ধরা পড়ে, বাঙালিত্ব চাপা পড়ে হিন্দুত্ব প্রকট হয়, বাঙালি নিজেকে ভাবে আগে হিন্দু পরে বাঙালি। রাজনীতিতে যারা বামপন্থী তাদের মধ্যেও এই প্রবণতা দেখা গেছে সাম্প্রতিক অতীতে বিশেষত বাবরি মসজিদ ভাঙ্গার

পরে যখন দাঙ্গার মানসিকতা পেযে বসে মানুষকে। এইসব ঘটনা সাময়িক উত্তেজনার ফল নয়। সমাজ মানসের গভীরে তার উৎস মুখ না থেকে গেল পরিস্থিতির যে কোন হেরফেব ঘটে গেলে এতো সহজে সেটা প্রকাশ পেতে পাবে না।

বস্তুতঃ সামাজিক ইতিহাস চর্চার গুরুত্ব এইখানে। কারণ তারই মধ্যে থাকে মানুষের মনের ঠিকানা। সে কি ভাবে, কি করে, কেন এমন ভাবে বা বিশেষ কোন কাজ করে, যার সঙ্গে তার জীবন যাপনের গূঢ় সম্পর্ক আছে, সামাজিক ইতিহাস তাকেই প্রকট করতে চায। সামাজিক ইতিহাসে সমাজের এই চলিষ্ণু দিক ফুটে ওঠে তার সমস্ত আন্তরবৈশিষ্ট্য নিয়ে। বিশেষজ্ঞরা বলেছেন সামাজিক ইতিহাসের দৃশ্য দৃশ্যান্তর, পর্ব ও পর্বান্তর সমাজ জীবনের অন্তর্লীন বৈশিষ্ট্য, তার প্রবাহ অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতো। রাজনৈতিক ইতিহাস সব সময়েই চোখে পডার মতো ঘটনা, যা সামাজিক ইতিহাসে সহজে ঘটে না। শাসন ক্ষমতার বদবদল, রাষ্ট্রপতি কিম্বা প্রধানমন্ত্রীর পরিবর্তনে অনেক কিছু বদলে যেতে পারে রাজনীতিতে, কিন্তু সমাজে তার ছাপ পডবেই একথা সত্য নয। কিন্তু কখনো আবার তা হতে পাবে যেমন বিশ্বনাথ প্রতাপেব প্রধানমন্ত্রিত্বে দেশের রাজনীতির Mandalization হিন্দি বলযে সমাজনীতিতে তার গভীর ছাপ ফেলতে সুরু করেছে। তেমনই হিন্দুত্ববাদ রাজনৈতিক ক্ষমতালাভ করলে ঘটবে সেই বলযেই ব্যাপক সামাজিক ভাঙনের সূচনা।

সমাজ জীবনের ইতিহাস হলো তাই নানা কালসীমায় বিভক্ত বৈচিত্র্যময় ঘটনা প্রবাহের সমাহার। তার মধ্যে ভাঙ্গা এবং গড়ার কাজ, দুটোই চলে নিজের নিযমকে প্রায পাশাপাশি এবং মূলতঃ মানুষের অলক্ষ্যে। এই সামাজিক ইতিহাস বাদ দিলে অর্থনৈতিক পরিবর্তনের বন্ধ্যাত্ব আর রাজনৈতিক পরিবর্তনের দুর্বোধ্যতা, কোনটাই বোঝা যাবে না।

রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি: ১৯০১—১০

বিজলি সরকার

১৯০১ ১০ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের সমগ্র ব্যক্তিত্ব বিকাশেরই এক জটিল পর্ব।[১] তাঁর রাজনৈতিক ভাবনা ও মননের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই পর্বটির নিহিত দ্বন্দ্বময়তা এবং উত্তরণের দিশা পাবার জন্যে এই সময়সীমার মধ্যে তাঁর রচিত অজস্র প্রবন্ধ-নিবন্ধ এবং বক্তৃতা, গান, কবিতার সঙ্গে আমরা 'গোরা' উপন্যাসের সারবস্তু বিশেষভাবে অবলম্বন করব। কেননা মনে হয়, এই দশ বছরে রবীন্দ্রনাথ পর্যায়ক্রমে কর্মের এবং মননের যে অশান্ত অভিজ্ঞতা পেরিয়ে এসেছেন, সেই বিপুল অভিজ্ঞতার সারাৎসারই 'গোরা' উপন্যাসের নৈতিক ভিত্তি।

'গোরা'য় কোনো চমক নেই। 'গোরা' একটি অবিচল প্রত্যয়ভূমি থেকে স্বদেশের বাস্তবকে উপলব্ধির অনুদ্বেজিত প্রশান্ত আখ্যান। স্থির নিশ্চিত তত্ত্বভিত্তি ভিন্ন এই উপন্যাসটির মহাকাব্যিক আবেদন সম্ভব হতনা। স্বদেশের যথার্থ স্বরূপ কী, বাস্তব স্বদেশকে ধ্যানের মধ্যে শৃঙ্খলাময় তত্ত্বের আকারে কী করে পাওয়া যাবে—'গোরা'র কাহিনী এই জিজ্ঞাসার মেরুদণ্ড আশ্রয় করে আছে।

'গোরা'র জন্ম ১৮৫৭-য। গোরা জানত। আমরাও জানতাম। গোরা হিন্দু নয, ব্রাহ্মণ নয, গোরা জানত না। আমরা জানতাম। ১৮৫৭-য যার জন্ম, 'গোরা' উপন্যাসের কালখণ্ডে সেই সদ্য তরুণের বয়স ১৮ বা ২০, তার বেশি নয। উপন্যাসটি লেখা হচ্ছে ১৯০৭ সালে (প্রবাসী, ভাদ্র ১৩১৪-য় শুরু হয়ে শেষ হয় ফাল্গুন ১৩১৬-য) যখন স্বদেশি আন্দোলনের আলোড়ন রবীন্দ্রনাথ পেরিয়ে এসেছেন এবং এই বিপুল অভিজ্ঞতা তাঁর স্বদেশ জিজ্ঞাসায়, তাঁর রাজনৈতিক ভাবনায় মৌলিক রূপান্তর ঘটিয়ে দিয়েছে। সেই রূপান্তরের স্বরূপ আমরা বুঝে নিতে চাই এই নিবন্ধে এবং রবীন্দ্রনাথের রাজনীতির রূপান্তর বুঝতে চাইব 'গোরা' উপন্যাসে তাঁর অবস্থান থেকে।

কেন 'গোরা' উপন্যাসের অবস্থান থেকে বিষয়টি দেখব?

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ ভাবনা সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে পরিস্রুত হয়ে যে রূপ পেল সেই দৃষ্টি নিয়ে তিনি পিছিয়ে গিয়ে উনবিংশ শতাব্দীর সাতের, আটের দশকের পরিপ্রেক্ষিতে কিছু মৌলিক প্রশ্ন তুললেন 'গোরা' উপন্যাসে।

উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে শেষ দশক পর্যন্ত ভারতীয় রাজনীতির কোনো নির্দিষ্ট গতিমুখ ছিলনা। বৃটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন (১৮৫১), ইণ্ডিয়া

লীগ (১৮৭৫), ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন (১৮৭৬) এবং কংগ্রেসের (১৮৮৫) এই সময়কার রাজনীতি ছিল মূলত ইউরোপীয় জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোকপ্রাপ্ত ভদ্রসাধারণের প্রতিষ্ঠা অর্জনের উপায় খোঁজা। সেই জন্য তাঁরা নিজেদের স্বার্থেই বৃটিশ শাসনতন্ত্রে কোনো-না-কোনো ভূমিকা নেবার দাবি উত্থাপন করতেন। সামাজিক এবং অর্থনৈতিক দিক দিয়ে প্রতিষ্ঠিত এই ভদ্রসাধারণ কখনওই সাধারণ মানুষের স্বার্থরক্ষার কথা ভাবেন নি। ভাবতে বৃটিশ শাসনের চাপ এদেশের বৈষয়িক জীবনের ভিত ভেঙে দিচ্ছে, দেশের অর্থনীতির কাঠামো যে কেবলমাত্র বৃটেনের স্বার্থের অনুকূলে ভাঙাগড়া হচ্ছে—এ বাস্তবতাবোধ সে সময়ের রাজনীতিতে স্পষ্ট ধরা দেয়নি। বৃটিশ শাসন ব্যবস্থার মধ্যে থেকে নিজেদের কিছু সুযোগ সুবিধা আদায় করাই যাবতীয় আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল, রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার নয়। উমেশচন্দ্র ব্যানার্জী (১৮৪৪–১৯০৬) ও দাদাভাই নওরোজী (১৮২৫–১৯১৭) বৃটিশ রাজতন্ত্রের প্রতি তাঁদের অনুরাগের কথা একাধিকবার ঘোষণা করেছেন। বশ্যতা এবং সহযোগিতার নীতির মধ্যেই এই নেতারা তাঁদের যাবতীয় উদ্যোগ সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। "নির্বাচনের চেয়ে মনোনয়নই এরা পছন্দ করতেন, লবণ কর বাড়িয়ে আয়কর কমালে এঁদের আপত্তি ছিলনা, যে কোনো প্রজাস্বত্ব আইনের ঘোর প্রতিবাদ করতেন এঁরা। এমন কী কারখানা-আইন-বিষয়ক বিতর্কে শিশু শ্রমিক নিয়োগও এঁরা সমর্থন করেছিলেন।"[১৫] ১৮৮৫ থেকে ১৯০৫ পর্যন্ত বৃটিশ পার্লামেন্টে কংগ্রেসের প্রেরিত প্রস্তাবে ক্রমাগত যে দাবি উত্থাপিত হয়েছিল তা হল আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে আবেদন নিবেদন এবং বিচার বিভাগ ও আইন পরিষদে অধিক সংখ্যায় ভারতীয় প্রতিনিধি নিয়োগ। কংগ্রেসের এই ভিক্ষুকের রাজনীতিকে পরবর্তী সময়ে অরবিন্দ ঘোষ (১৮৭২–১৯৫০) তীব্রভাবে আক্রমণ করেছেন, "Like children they were content with the 'toys' the rulers gave them telegraphs and railways, universities and municipalities, the Indian National Congress They lived in chains but were 'not ashamed to boast that these chains were of gold or silver"[২]

১৮৮৫–১৯০৫ পর্যন্ত কংগ্রেসের ব্যর্থ একঘেয়ে আবেদন নিবেদন, ইংরেজ-ভজা রাজনীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ বাংলায় চরমপন্থী আন্দোলনের আবির্ভাব ঘটল। একদিকে নরমপন্থীদের প্রকট হীন মনোভাব, অন্যদিকে ইংরেজদের ভারতীয়দের প্রতি ক্রমবর্ধমান বিদ্বেষ বিশ শতকের সূচনা থেকেই বাঙালি তরুণদের মনে তীব্র ঘৃণা জাগিয়ে তোলে। "ভারতবাসীর স্বাধীনতা বলতে যে জিনিসটা বোঝায়, সে হিসেবে আমাদের এই বাসনাকে স্বাধীনতা লাভের বাসনা না বলে বিদেশীর আরোপিত ঘৃণা, নিন্দা ও অপমান হতে কোন প্রকারে মুক্তি লাভের বাসনা

বলা যেতে পারে' লর্ড কার্জনের (১৮৯৯–১৯০৫) তীব্র ভারত বিদ্বেষী নীতি চরমপন্থী আন্দোলনকে আরও দানা বাঁধতে সাহায্য করল। "ওল্ড টেস্টামেন্টের প্রফেট, অষ্টাদশ শতকেব জ্ঞান-দীপ্ত স্বৈরশাসকের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য যেন তাঁর মধ্যে মূর্ত হযে উঠেছিল।"[৪] গোঁড়া সাম্রাজ্যবাদী ধুরন্ধর কূটনৈতিক দক্ষ প্রশাসক কার্জন এদেশেব মানুষের চরিত্র, সততা এবং কর্মদক্ষতা সম্পর্কে অত্যন্ত হীন ধারণা নিযেই শাসনভার গ্রহণ করেন। কংগ্রেস সম্পর্কে কার্জনের ঘৃণা এবং বিরোধিতা কখনও টলেনি। তিনি লিখেছিলেন, "ভারতবর্ষে থাকাকালীন আমার সবচেযে বড়ো স্বপ্ন তার [কংগ্রেস] শান্তিপূর্ণ বিলুপ্তির কাজে হাত লাগানো।"[৫] বিশের শতকের সূচনা থেকে ভারতের রাজনৈতিক আবহাওয়ায় যে একটা নতুন মাত্রা সংযোজিত হচ্ছে এবং তার মূলে যে বাঙালির রাজনীতি সচেতনতা — এই নিগূঢ় সত্য কার্জনের কাছে অস্পষ্ট থাকেনি। তাই বড়োলাটের দাযিত্ব নিয়ে এদেশে এসেই শুরু করেন নিরবচ্ছিন্ন বাঙালি বিরোধিতা। প্রথমে কলকাতা কর্পোরেশনে (১৮৯৯) নেটিভ প্রতিনিধির সংখ্যা কমিয়ে সাহেবদের সংখ্যা বৃদ্ধি, তারপর যুনিভারসিটি বিল (১৯০২) এবং শেষে এল তাঁর ঐতিহাসিক বঙ্গভঙ্গ বিল (১৯০৫)। অস্থায়ী ভারত সচিব ব্রডরীককে কার্জন লিখেছিলেন, "বাঙালিরা নিজেদের এক মহাজাতি মনে করে এবং এক বাঙালিবাবুকে লাটসাহেবের গদিতে বসাতে চায়।.... বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব তাদের এই স্বপ্নের সফল রূপায়ণে বাধা দেবে। আমরা যদি তাদের আপত্তির কাছে নতি স্বীকার করি তবে ভবিষ্যতে কোনদিনই বাংলা ভাগ করতে পারব না এবং আপনারা ভারতের পূর্বপার্শ্বে এমন এক শক্তিকে জোরদার করবেন যা এখনি প্রবল এবং ভবিষ্যতে বর্ধমান বিপদের উৎস হয়ে দাঁড়াবে।"[৬]

কর্পোরেশন এবং শিক্ষাবিভাগের ওপর কার্জনের আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের তীব্র বিক্ষোভে কার্জনের ব্যঙ্গোক্তি, "দরিদ্রতর ও অযোগ্যতর বাঙালি ছাত্র, যাদের আমরা রাজনৈতিক দিক থেকে চেপে রাখতে চাই, গুরুদাস কিনা তাদের হয়ে সওয়াল করছেন।"[৭]

যুনিভারসিটি বিলটি পাশ হয়ে যাবার পর এর বিরুদ্ধে বুদ্ধিজীবীদের প্রতিবাদের গলা নিস্তেজ হয়ে এল কিন্তু উচ্চশিক্ষা ব্যয়সঙ্কুল করে এদেশের মানুষকে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করার এই স্বৈরাচারী নীতির প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ যেমন আগেও সরব ছিলেন, বিলটি কার্যকর হয়ে যাবার পরও এর সমালোচনা করলেন তীব্রভাবে। তিনি বললেন, দেশের আইন, অন্ন, সবই তো দিনে দিনে দুর্মূল্য হয়ে উঠছে। তার সঙ্গে যদি শিক্ষাও দুমূর্ল্য হয়ে ওঠে তবে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান যে কী নিদারুণ আকার নেবে তা সহজেই অনুমেয়। তাই তিনি বলেন ইংরেজের

মহানুভবতা পাবাব আশা পবিত্যাগ কবে "নিজে বিদ্যাদানেব ব্যবস্থা ভাব নিজেদেব গ্রহণ কবা উচিত।"[৮]

অবশেষে কার্জনেব বঙ্গভঙ্গ পবিকল্পনা এবং তাব রূপায়ণে (১৬ অক্টোবব, ১৯০৫) ভাবতে ইংবেজ শাসনেব প্রতি মানুষেব অসন্তোষ প্রবলভাবে ফেটে পড়ে। দাম্ভিক, অদূবদর্শী কার্জন নিজেব অজান্তেই ভাবতেব জাতীযতাবাদী আন্দোলন প্রবলভাবে উসকে দিলেন। নবমপন্থী চবমপন্থী নির্বিশেষে সমস্ত দেশবাসীব হৃদযেই এই প্রথম স্বদেশেব অপমান গভীবভাবে স্পর্শ কবল। অবশ্য বঙ্গবিচ্ছেদকে কেন্দ্র কবেই চবমপন্থীদেব ঝোঁক পড়ল সন্ত্রাসবাদেব দিকে।[৯] বঙ্গভঙ্গ আলোড়নে ববীন্দ্রনাথেব সক্রিয ভূমিকা, তাঁকে কেন্দ্র কবে বাংলাব জনমানসে বিপুল আবেগ ও প্রেবণা ভাবতেব জাতীযতাবাদেব ইতিহাসে এক মহিমামষ অধ্যায। সেদিন সমস্ত বাঙালি জাতিব নিরুদ্ধ অনুভূতি তাঁব "বাংলাব মাটি বাংলাব জল এক হউক" গানেব ভেতব দিযে উচ্চাবিত হযেছিল।

॥ ২ ॥

কিন্তু কোন পথেই-বা বাংলাব মাটি বাংলাব জল এক হতে পাবে, তাব কোনো সুস্থিত বাস্তব পবিকল্পনা সেদিন কোনো তবফেব বাজনৈতিক নেতা দেখাতে পাবলেন না। কোনো আন্দোলনই বাস্তব সমস্যাব মূলে পৌঁছল না। গ্রামজীবনেব প্রত্যক্ষ সংস্রবে ববীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন একটা পবিপূর্ণ কার্যক্রমেব মধ্যে দিযে সামাজিক পুনর্গঠন, গ্রামীণ অর্থনীতিব স্বালম্বন ছাড়া কেবল বাজ দববাবে নিষ্ফল আবেদন নিবেদন বা দ্রুত নিষ্পত্তিমূলক "অতিশয পন্থায" প্রকৃত বাষ্ট্রীয স্বাধীনতা আসতে পাবেনা। কেননা বাইবেব আঘাতে দেশেব প্রাণাধাব যে পল্লিসমাজ, তা ছিন্নভিন্ন হযে গেছে, "সমস্ত দেশ যে-শিকড় দিযা বস আকর্ষণ কবিবে সেই শিকড়ে পোকা ধবিযাছে, যে-মাটি হইতে বাঁচিবাব খাদ্য পাইবে সেই-মাটি পাথবেব মত কঠিন হইযা গিয়াছে—যে গ্রামসমাজ জাতিব জন্মভূমি ও আশ্রযস্থান তাহার সমস্ত ব্যবস্থা-বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইযা গিযাছে।"[১০] এই ব্যবস্থা-বন্ধন ফিরে আসতে পাবে কোনো নিযমতান্ত্রিক আন্দোলনেব পথে নয়, গ্রাম সমাজেব বিস্তৃত উন্নয়নেব উদ্যোগে। নিজেদের ভাষা, নিজেদেব শিল্প, শিক্ষা-সংস্কৃতি—এসবেব নিঃশেষ উন্নতিবিধানই প্রকৃত স্বদেশ- মুক্তিব পথ—এবং এর জন্য সর্বাগ্রে চাই আত্মশক্তির উদ্বোধন। দেশেব সমস্ত কাজই আমাদের বিদেশিদের হাত থেকে গ্রহণ কবতে হয। "দেশের ইতিহাস ইংরেজ বচনা করে, আমরা তর্জমা কবি, ভাষাতত্ত্ব ইংরেজ উদ্ধার করে, আমরা মুখস্থ কবিয়া লই, ঘরের পাশে কী আছে জানিতে হইলেও হান্টার বৈ গতি নাই। তার

পরে দেশের কৃষি সম্বন্ধে বল, বাণিজ্য সম্বন্ধে বল, ভূতত্ত্ব বল, নৃতত্ত্ব বল, নিজের চেষ্টার দ্বারা আমরা কিছুই সংগ্রহ করিতে চাই না।"[১১]

সৃষ্টিশীল কাজের মধ্যে দিয়ে দেশের আত্মপরিচয় ও প্রাণশক্তির জাগরণ ঘটানো রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা থেকে মুক্তিলাভের আগের ধাপ বলে রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল। দেশের পূর্ণাঙ্গ গণজাগরণের জন্য দীর্ঘ শ্রমসাধ্য গঠনমূলক পরিশ্রমের পথ এড়িয়ে দ্রুত ফল লাভের আশায় চরমপন্থীরা আশ্রয় নিলেন "অতিশয় পন্থা"র। নীতিগতভাবে রবীন্দ্রনাথ এই আন্দোলনকে সমর্থন করতে পারলেন না। জাত-পাত, হিন্দু-মুসলমান এই সব হীন ভেদবুদ্ধির অন্ধত্বে ডুবে থেকে দুর্গত স্বদেশের প্রকৃত মুক্তি কীভাবে সম্ভব—এ বাস্তবতাবোধ চরমপন্থী নেতাদের ছিলনা। আসলে "চরমপন্থীরা এমন এক আদর্শ ভারত রচনা করতে চেয়েছিল যার ধমনীতে আর্যরক্ত প্রবাহিত, যার ধর্ম হিন্দু ঐতিহ্যাশ্রিত, শ্রীকৃষ্ণের মতো অতিমানব ও শিবাজীর মতো যোদ্ধা গড়েছেন যার গৌরবময় ইতিহাস।"[১২]

স্বদেশ উদ্ধারের হাতিয়ার হিশেবে ধর্মকে আশ্রয় করলে সংকট যে আরো ঘনীভূত হয়ে উঠবে এই সত্য নেতারা কেন ভেবে দেখেন নি সেটাই আশ্চর্যের। এখানে মনে আসে, গোরার উপলব্ধির সূত্রে ঠিক এই কথাটাই রবীন্দ্রনাথ ১৯০৭-এ, আন্দোলনের উত্তাল পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে, বলতে চেয়েছিলেন। আবার সেদিনের বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি হেমচন্দ্র কানুনগো অনেক পরে ১৯২২-এ এসে সেদিনের বিভ্রান্তি স্বীকার করে নিয়ে এই একই উপলব্ধির কথা লিখলেন, "হিন্দুধর্মের মধ্য দিয়ে ভারত উদ্ধারের মানে যে হিন্দুধর্মের তরফে ভারত উদ্ধার, এ সহজ কথা মুসলমান ভায়াদের বুঝিয়ে দিতে হয়না;..... এতে মুসলমানগণ এ আন্দোলনে যে কেবল যোগ দিতে বিরত থাকতে পারেন তা নয়, তাঁরা ইংরেজের অপেক্ষাও হিন্দুদের প্রবল শত্রু না হয়ে পারেন না।"[১৩] তৎকালীন নেতাদের এই "ঘোরতর বুদ্ধির অন্ধতা"র কথা রবীন্দ্রনাথ রাজনৈতিক প্রবন্ধাবলিতে বারবার বলেছেন। এ সংকটের মূল নির্ণয়ের প্রশ্নে তাঁর জীবনব্যাপী সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতার এবং সে সংকট থেকে উত্তরণের উপায় কীভাবে হতে পারে তার বিস্তৃত পরিকল্পনার কথাও বলেছেন সাধ্য মতো। এই সময়ই (১৯০১—১০) রবীন্দ্রনাথ তাঁর যাবতীয় স্বদেশ ভাবনার কেন্দ্রগততত্ত্ব পল্লিসংগঠনের কথা একটা সুনির্দিষ্ট প্রোগ্রামের আকারে বললেন "স্বদেশী সমাজ" (১৯০৪) প্রবন্ধে। বিশ শতকের গোড়া থেকেই রবীন্দ্রনাথের চেতনায় সাম্রাজ্যবাদী নীতি, প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্যের আদর্শগত বৈষম্য, জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা সম্পর্কে সিদ্ধান্তগুলি ক্রমেই গভীর ও উজ্জ্বল হয়ে উঠতে থাকে। "নেশন কি," "স্বদেশী সমাজ", "বঙ্গবিভাগ", "রাষ্ট্রনীতি ও ধর্মনীতি," "চীনেম্যানের চিঠি", "বিরোধমূলক আদর্শ", "ভারতবর্ষের ইতিহাস", "রাজকুটুম্ব",

"ঘুষাঘুষি", "বারোয়ারি মঙ্গল", "অত্যুক্তি", "ইংরাজ ও ভারতবর্ষ", "রাজনীতির দ্বিধা," "দেশনায়ক", "ব্যাধি ও প্রতিকার" ইত্যাদি প্রবন্ধে সমাজের প্রকৃত মঙ্গলের প্রশ্নে উগ্র জাতিপ্রেম যে ভয়ংকর ক্ষতিকারক সে কথাই রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন। কেবল দুর্বলের ওপর প্রবলের অত্যাচার নয়, সবলের প্রতি সবলের আক্রমণই য়ুরোপীয় ন্যাশনালত্বের ব্যাধি। এই ব্যাধি সম্পর্কে স্বদেশকেও সতর্ক থাকার কথা বললেন। "মনুষ্যত্বের মঙ্গলকে যদি ন্যাশনালত্ব বিকাইয়া দেয়, তবে ন্যাশানালত্বের মঙ্গলকেও একদিন ব্যক্তিগত স্বার্থ বিকাইতে আরম্ভ করিবে... আমাদিগকে নেশন বাঁধিতে হইবে — কিন্তু বিলাতের নকলে নহে।"[১৪] এই পর্যায়ে ইম্পিরিয়ালতন্ত্রকে আক্রমণে রবীন্দ্রনাথের ভাষা এবং বিশ্লেষণের তীক্ষ্ণতা তাঁর রাজনৈতিকবোধের স্বচ্ছতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে।

"ইম্পিরিয়ালতন্ত্র নিরীহ তিব্বতে লড়াই করিতে যাইবেন, আমাদের অধিকার তাহার খরচ যোগানো; সোমালিল্যাণ্ডে বিপ্লব নিবারণ করিবেন, আমাদের অধিকার প্রাণদান করা; উষ্ণপ্রধান উপনিবেশে ফসল উৎপাদন করিবেন, আমাদের অধিকার সস্তায় মজুর দেওয়া। বড়োয়ছোটোয় মিলিয়া যজ্ঞ করিবার এই নিয়ম।"[১৫] এই "ভদ্রবেশী বর্বরতা"-ই "জাতি প্রেম নাম ধরি, প্রচন্ড অন্যায়/ধর্মেরে ভাসাতে চাহে বলের বন্যায়।"[১৬]

কিন্তু ভারতবর্ষের ন্যাশনালত্ব চিরকাল ঐক্যমলূক আদর্শ প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়েই তার ধর্ম রক্ষা করেছে। "ক্ষমতা ও স্বার্থ বিস্তার ভারতবর্ষীয় সভ্যতার ভিত্তি নহে।"[১৭] তাই য়ুরোপীয় ন্যাশানালত্বের নকলে নিজেদের বিকিয়ে না দিয়ে তিনি দেশবাসীকে নিজের আত্মশক্তির ওপর ভরসা করতে বলেন। যে উগ্র স্বাদেশিকতা কেবলমাত্র নিজেদের জাতীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য বিদেশের শ্রেষ্ঠ জিনিশকেও ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে সেই সঙ্কীর্ণ ন্যাশনালিজমের প্রতি রবীন্দ্রনাথের কোনো শ্রদ্ধা নেই। তাই এই সময়ে ব্যাপক স্বদেশি আলোড়নে সম্পূর্ণ যুক্ত থেকেও কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এসবের বিপরীতে আত্মশক্তি অর্জনের মধ্যে দিয়ে 'স্বদেশী সমাজ' গঠনের উপর জোর দিলেন। মিনার্ভা মঞ্চে চৈতন্য লাইব্রেরির বিশেষ অধিবেশনে পঠিত (২২ জুলাই, ১৯০৪) "স্বদেশী সমাজ" প্রবন্ধে প্যারালাল গভর্নমেন্ট স্থাপনের প্রস্তাব জনমনে বিপুল সাড়া জাগায়। "প্রবন্ধের বিষয়বস্তু মুখে মুখে প্রচারিত হওয়ায় জনসাধারণ, বিশেষত কলকাতার ছাত্র সমাজ, এত উন্মত্ত হয়ে পড়ে এবং "জনতা এত অধিক"[১৮] হয়েছিল যে বৃটিশ পুলিশের লাঠি চার্জে নিরীহ পথচারীরাও আহত হন। এবং "ঐ অত্যাচারের প্রতিবাদ করতে গিয়ে আহত অবস্থায় সেখানেই গ্রেপ্তার হন তরুণ বিপ্লবী উল্লাসকর দত্ত (১৮৮৫—১৯৬৫)।"[১৯] কেবল উল্লাসকরই নন, সে সময় অনেক বিপ্লবীদের এই প্রবন্ধ আকৃষ্ট করেছিল। ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের (১৮৮০—১৯৬১) স্মৃতিচারণায়[২০]

এই মুগ্ধতা লক্ষ করা যায়। তাছাড়া কার্জন রঙ্গমঞ্চে .(৩১ জুলাই, ১৯০৪) প্রবন্ধটি দ্বিতীযবাব পড়বার পর সেদিনের সভাপতি হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বলেছিলেন, "…..রবীন্দ্রবাব্ দেখাইয়াছেন পূর্বে যে প্রণালীতে কাজ করা হইত এখন তাহা উপযোগী নহে। বৎসরের মধ্যে তিনদিন মাত্র একত্র হইয়া বাক্যব্যয় করিলে দেশেব বিশেষ কোনো কল্যাণ সাধিত হইবে না।"[২১] বিপিনচন্দ্র পাল (১৮৫৮–১৯৩২) বলেন "…..রবীন্দ্রবাবু জাতীয় জীবনের যে নতুন আদর্শ দেখাইয়াছেন তাহাই আমাদের পক্ষে একান্ত অবলম্বনীয়।"[২২]

অবশ্য, এর বিরুদ্ধ-প্রতিক্রিযাও যথেষ্ট হয়েছিল। কৃষ্ণকুমার মিত্র (১৮৫২–১৯৩৬) 'সঞ্জীবনী'-তে "আকাশ কুসুম রচনা" এবং পৃথ্বীশচন্দ্র রায় (১৮৭০–১৯২৮) "দেশের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর ও নানা দোষে দুষ্ট" বলে[২৩] রবীন্দ্রনাথের স্বদেশিসমাজ-এর তীব্র সমালোচনা করলেন। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু তাঁর সিদ্ধান্ত থেকে সরে এলেন না। 'আত্মশক্তি' 'ভারতবর্ষ' এবং 'রাজা ও প্রজা'র প্রবন্ধাবলীতে তাঁর স্বদেশিসমাজ-এর ধারণাকে ভারতবর্ষের সমাজ পরিকাঠামোয় তৎকালীন অন্তঃসারশূন্য রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে বিশেষভাবে গ্রহণযোগ্য বলে তিনি যুক্তি দেখালেন।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রাথমিক আলোড়ন স্তিমিত হয়ে এলে কংগ্রেসের দুই তরফেব নেতাদের পরস্পরের গতি নগ্ন আক্রমন, আন্দোলনের নামে কখনও দরখাস্ত বিছানো পথে ভিক্ষাবৃত্তি কখনও-বা আরেক ধাপ এগিয়ে একটু স্পর্ধার সঙ্গে ভিক্ষার ঝুলিকে অক্ষুন্ন রাখারই নীতি, অন্যদিকে চরমপন্থীদের অনুসৃত বিভিন্ন হঠকারী সিদ্ধান্ত, কংগ্রেস এবং চরমপন্থী উভয় দলেরই পরস্পরকে নস্যাৎ করবার প্রবল জিদ—এমন ঘুলিয়ে ওঠা পরিস্থিতিতে গভীর অবসাদ আর বিরক্তিতে রবীন্দ্রনাথ ক্রমাগত এরই তীব্র সমালোচনা করেছেন। আমাদের সমাজের স্তরে স্তরে উচ্চ-নীচের যে বিপুল ফারাক, দুর্বলের ওপর প্রবলের অত্যাচার, ক্ষমতাসম্পন্নের কাছে অক্ষমের অবনত থাকার অনিবার্যতা, শিক্ষিত ভদ্রলোকের কাছে অশিক্ষিত মাত্রেই চাষাবেটা"—আজন্ম লালিত এই "…অভ্যাস ও দৃষ্টান্তে আমাদিগকে অন্ধ বাধ্যতার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত করিয়া রাখে; তাহাতে আমরা অধীনস্থ লোকের প্রতি অত্যাচারী, সমকক্ষ লোকের প্রতি ঈর্ষ্যান্বিত এবং উপরিস্থ লোকের নিকট ক্রীতদাস হইতে শিক্ষা করি।"[২৪] এই ব্যাধির হাত থেকে প্রতিকারের উপায় সম্বন্ধে "ব্যাধি ও প্রতিকার" (১৯০৭) প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ যা বললেন তাতে তাঁর প্রখর বাস্তব দৃষ্টির অভ্রান্ততা স্বীকার করাতেই হয়।

ইংরেজের ন্যায়পরায়ণতায় রবীন্দ্রনাথ কখনও আস্থা রাখেনি। ইংল্যাণ্ডের স্বার্থে টান পড়লে তাদের উদারতা ন্যায়পরায়নতার লেশমাত্র থাকে না— ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার এই তাৎপর্য বোঝায় রবীন্দ্রনাথের কখনও ভুল হয়নি। হিন্দুর বিরুদ্ধে

মুসলমানকে উত্তেজিত করা সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ রক্ষার যে একটি বিশেষ কৌশল মাত্র — এই আলোচনার সূত্র ধরে রবীন্দ্রনাথ 'ব্যাধি ও প্রতিকার' প্রবন্ধের গোড়াতেই বললেন — প্রকৃত পক্ষে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের মধ্যেই একটা বিরোধ পূর্বাপর রয়ে গেছে। "এ পাপ।" এর ফল আমাদের ভোগ করতেই হবে। দীর্ঘকাল পাশাপাশি থেকেও দুই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রতিবেশী সুলভ হৃদ্যতা কখনও গড়ে ওঠেনি। এমন কী সামান্য শিষ্টাচারও সেখানে দুর্লভ। ".....এক ফরাসে হিন্দু-মুসলমান বসে না — ঘরে মুসলমান আসিলে জাজিমের এক অংশ তুলিয়া দেওয়া হয়, হুঁকার জল ফেলিয়া দেওয়া হয়।" হিন্দুত্ববাদীরা যদি একে শাস্ত্রের বিধান মনে করেন, "তবে.....সে শাস্ত্র লইয়া স্বদেশ-স্বজাতি-স্বরাজের প্রতিষ্ঠা কোনোদিন হইবে না।" সুতরাং ইংরেজের দোষ বিচার করার আগে এই "পাপকেই ধিক্‌কার" দিতে হবে। কেননা এই পাপই শত্রুর প্রধান বল। একে নির্মূল করতে হলে "স্বদেশ সম্বন্ধে স্বদেশীর যে দায়িত্ব আছে" তা সাধারণ মানুষের কাছে স্পষ্ট করে প্রত্যক্ষ করে তুলতে হবে সাধারণের পক্ষে মঙ্গলজনক নানা গঠনমূলক কাজের মধ্যে দিয়ে। আর-কিছু না হোক অন্তত "যে কোনো একটি পল্লির মাঝখানে বসে চিরকাল অবহেলিত লাঞ্ছিত মানুষদের ডেকে 'জ্ঞান দাও, আনন্দ দাও, আশা দাও, তাহার সেবা করো, তাহাকে জানিতে দাও মানুষ বলিয়া তাহার মাহাত্ম্য আছে, সে জগৎ সংসারের অবজ্ঞার অধিকারী'"[২৫] নয়।

কিন্তু সেই সময়ের কোনো রাজনৈতিক নেতা গ্রামে যেতে চাইলেন না। অনেকেই রবীন্দ্রনাথের এই গঠনমূলক স্বদেশি চিন্তাকে "অবাস্তব" বলে ব্যাখ্যা করলেন। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী রবীন্দ্রনাথের অনেস্ট স্বদেশির কার্যক্রমকে প্রত্যাখান করে "ব্যাধি ও প্রতিকার" নামে প্রবাসী, আশ্বিন ১৩১৪ সংখ্যায় দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখলেন। সরাসরি বিরোধিতা না করে দেশের কাজ করতে চাইলেই যে রাজশক্তি তা করতে দেবে — এমন তত্ত্ব রামেন্দ্রসুন্দরের কাছে তাৎপর্যহীন বলে মনে হয়েছে। কেন-না, "আজ যদি ইংরেজ বলেন, তোমাদের স্থাপিত বিদ্যালয়গুলিতে রাজভক্তি শিখাইবার সম্যক ব্যবস্থা নাই, উহা উঠাইয়া দেওয়া হউক; তখন এক অর্ডিনান্সের ধাক্কায় কলিকাতার শিক্ষাপর্ষৎ ও টেকনিক্যাল ইন্‌স্টিটুট হইতে বোলপুরের ব্রহ্মাচর্য্যাশ্রম পর্যন্ত সমস্তই লীলাসংবরণে বাধ্য হইবে।"[২৬]

রবীন্দ্রনাথ কিন্তু শাসক ও শাসিতের সম্পর্কের এই বাস্তব তাৎপর্য সম্পর্কে সবসময়ই সজাগ ছিলেন। আলোচ্য প্রবন্ধের গোড়াতেই তিনি বলেছেন, বৃটিশ ন্যায়পরায়ণতায় অগাধ "শ্রদ্ধা" এবং "ভরসা" বলে তার কেশমাত্র বিচ্যুতি দেখলেই আন্দোলনকারীরা ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে ভাবেন "যেন মহাপ্রলয় উপস্থিত" হয়েছে, এবং "আমরা বন্দেমাতরম্ হাঁকিয়া তাহাদের দক্ষিণ হাতে আঘাত করিব তবু তাহাদের সেই হাতের ন্যায়দণ্ড অন্যায়ের দিকে কিছুমাত্র টলিবে না'। কিন্তু

এই সত্যটা আমাদের জানা দরকার যে, ন্যায়দন্ডটা মানুষের হাতেই আছে, এবং ভয় বা রাগ উপস্থিত হইলেই সে হাত টলে। আজ নিম্ন-আদালত হইতে শুরু কবিয়া হাইকোর্ট পর্যন্ত স্বদেশী মামলায় ন্যায়ের কাঁটা যে নানা ডিগ্রির কোণ লইযা হেলিতেছে, ইহাতে আমরা যতই আশ্চর্য হইতেছি ততই দেখা যাইতেছে আমরা হিসাবে ভুল করিয়াছিলাম।"[২৭] বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে সাময়িক হিন্দু-মুসলমান ঐক্য যে কেন শেষ পর্যন্ত ধোপে টিকল না, এবং ক্রমবর্ধমান হিন্দু-মুসলমান বিরোধের মূল কারণ যে উৎকট হিন্দুত্ববাদী জাতীয়তাবাদ — রবীন্দ্রনাথের এই বোধের অভ্রান্ততার কথা তৎকালীন বিপ্লবীদের সাক্ষ্য থেকেও পাওয়া যায়। স্বাধীনতা অর্জনে হিন্দু-মুসলমান উভয়ের স্বার্থ থাকলেও, "যেখানে উভয়ের মধ্যে বিজাতীয় ঘৃণা ও বিদ্বেষ এত অধিক পরিমাণে বর্তমান, সেখানে কোনো প্রকারে কাজচালনা গোছের মিলনও যে অসম্ভব" এবং এই ব্যাধির নিরাময় না করে ".....ভারতে সেই হিন্দুধর্মের আধ্যাত্মিক nationality- সৃষ্টি, এক অত্যদ্ভুত রহস্য কি-না, তা আমাদের নেতারা তখন ভেবে নিশ্চয় দেখেননি।"[২৮]

কেবল মুসলমান সম্প্রদায়ই নয, হিন্দু সম্প্রদায়ের বৃহৎ অংশ, সমাজের অবতলবাসীরা সামাজিকভাবে যেখানে চিরকাল প্রত্যাখ্যাত, সেখানে হঠাৎ একদিনে রাজনৈতিক প্রয়োজনে তাদের ভাইরে বলে ডাকলে যে তারা সাড়া দেবেনা এই বাস্তব সত্য রবীন্দ্রনাথের মনে বারবার উঠে এসেছে। সিক্রেট সোসাইটির বিপ্লব কেন ব্যর্থ হয়েছিল সে প্রসঙ্গে যুগন্তরদলের নেতা হেমচন্দ্র কানুনগো (১৮৭১–১৯৫০) বলেন, ".....এক কথায় বলতে গেলে এই বলতে হয় যে, মানসিক ভাবের বিপ্লব আগে না ঘটালে, অন্য কোন বিপ্লব যে সংঘটিত হতে পারেনা, এ কথা কেউ জানতেন না। অর্থাৎ সমাজের ভাল-মন্দের বিধাতা যে লোকমত, তাকে ভাবী স্বাধীনতা লাভের উপযোগী করবার জন্য তার আমূল পরিবর্তন ও সংশোধনের সঙ্গে সঙ্গে, তাকে উন্নততর ন্যায়-অন্যায় বিচার জ্ঞানের ওপর স্থাপিত করা উচিত বলে নেতাদের প্রায় কারও মনেই আসেনি।"[২৯]

দেশের যাবতীয় দুর্ভাগ্যের জন্য চরমপন্থী নেতারা বৃটিশ শাসনকে একমাত্র দায়ী এবং যত দ্রুত সম্ভব তা থেকে মুক্তি লাভের উদ্দীপনায় রবীন্দ্রনাথের 'স্বদেশী সমাজ' প্রত্যাখ্যান করলেন। তাঁদের মত হল—"Amidst all the various agitations and attempts bear it in mind Swadesha comes first and Swadesi after. . ...Swadeshi is useless without Swadesh.[30] বর্তমান কালের কোনো কোনো সমালোচকও মনে করেন রবীন্দ্রনাথের স্বদেশি সমাজ পরিকল্পনা এক ধরনের "ইউটোপিয়া" ছাড়া আর কিছু নয়। যেমন সুমিত সরকারের সিদ্ধান্ত, "Rabindranath could not really suggest any concrete social or economic programme with which to rouse the uneducated mass."[৩১]

এইসব দ্রুত সিদ্ধান্তে, গ্রহণ বর্জনের ভেতর দিয়ে রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিক স্বদেশভাবনা বোঝার চেষ্টা খণ্ডিত হয়ে যায়। লক্ষ্যের একাগ্রতা যে প্রতিকূল অভিজ্ঞতায় খণ্ডিত হয়, জীবনের কোনো লক্ষ্যই যে নির্বিকল্প নয়—এ তত্ত্বে ববীন্দ্রনাথ বিশ্বাস কবতেন। নিজের বাষ্ট্রনৈতিক মত সম্পর্কে ববীন্দ্রনাথের অবলোকন, "যে মানুষ সুদীর্ঘকাল থেকে চিন্তা করতে করতে লিখেছে তার রচনার ধারাকে ঐতিহাসিকভাবেই দেখা সংগত। .....আমার সম্বন্ধে জানা চাই যে, রাষ্ট্রনীতির মতো বিষয়ে কোনো বাঁধা মত একেবারে সুসম্পূর্ণভাবে কোনো এক বিশেষ সময়ে আমার মন থেকে উৎপন্ন হয়নি—জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে নানা পরিবর্তনের মধ্যে তারা গড়ে উঠেছে।"[৩২] তাই তাঁর ব্যক্তিস্বরূপের বিশেষ কোনো দিক ধাবণায় আনতে গেলে সমগ্রের পরিপ্রেক্ষিত মনে রাখতেই হয়। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন মানুষের অন্তঃপ্রকৃতির শক্তিতে। স্বভাব-সীমার মধ্যে এই আত্মশক্তির স্ফুরণ না ঘটিযে বাইরের উত্তেজনা সৃষ্টিতে সাময়িক লাভ হলেও শেষ পর্যন্ত সে উত্তেজনায় কোনো স্থায়ী ফল ফলেনা এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। তাছাড়া তাঁর সমকালীন রাজনীতিতে বশ্যতা এবং বশ্যতা অগ্রাহ্য করার প্রবণতা—এই দোলাচল, রাজানুগ্রহলাভের চতুর প্রতিযোগিতা তাঁকে একান্তভাবে বিমুখ করেছিল। অশোক সেন যথার্থ বলেছেন, "মধ্যবিত্ত নেতৃত্বের আড়ষ্টতায জাতীয় আন্দোলনের দ্বিধাগ্রস্ত, অকিঞ্চিৎকর কার্যক্রমের জন্যেই রবীন্দ্রনাথের মনে রাজনীতির দাবি ও পরিপূর্ণ স্বদেশ কল্যাণের মধ্যে একটা বিশ্লেষের ধারণা বলবৎ হয়েছিল তা বোঝা যায। এই বিশ্লেষের সত্যকে শ্রেণী নেতৃত্বের আপেক্ষিক ভূমিকায় চিনবার সুযোগ তাঁর ভাবাদর্শে ছিল না। ফলে রাষ্ট্রীয় স্বরাজের ব্যাপারটা তাঁর কাছে সমাজ কল্যাণের পক্ষে আবশ্যকীয় একটি আগের ধাপ রূপে সবসময় প্রতীত হয় নি, স্বদেশি সমাজের আদর্শানুগ আত্মশক্তির উদ্বোধন ও প্রয়োগেই স্বরাজ স্বয়ংসাধ্য বলে মনে হয়েছিল।"[৩৩]

তবু তো একটা সুনির্দিষ্ট বস্তুগত কর্মসূচি, জাতীয় ঐক্য, হিন্দু-মুসলমান সমস্যার স্থায়ী সমাধান সূত্র খোঁজার চেষ্টা—এসবই তাঁর প্রখর অবহিতিতে যেভাবে ধরা পড়েছিল, তা যে একেবারে অমূলক ছিলনা আজ স্বাধীনতার প্রায় পঞ্চাশ বছর পরও আমরা টের পাচ্ছি মর্মে মর্মে। অন্য দিকে মতের বিরোধ থাকলেও রবীন্দ্রনাথ স্বদেশি আন্দোলনের আদর্শবাদী তরুণদের মহিমাকে অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন সব সময়। "দেশে তারা দীপ জ্বালাবার জন্য আলো নিয়েই জন্মেছিল"—এই বিশ্বাস আর শ্রদ্ধাবোধ ছিল বলেই তিনি গভীর আগ্রহে বিপ্লবীদের যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ-এর প্রতি লক্ষ রেখেছিলেন। বিপ্লবীদের কারও কারও নির্ভীক ইচ্ছাশক্তি আর আত্মত্যাগে মুগ্ধ হয়ে অপার ভরসায় তাঁদের ওপর স্বদেশ মুক্তির দায়িত্বভার অর্পণ করতে দেশবাসীকে আহ্বান জানিয়েছেন।

কখনও স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে (১৮৪৪—১৯১৮), কখনও অরবিন্দ ঘোষকে কখনও বা সুভাষচন্দ্র বসুকে (১৮৯৭—১৯৪৫) সমাজের অধিনায়ক পদে বরণ করে নেবার প্রস্তাব দিয়েছেন। চরমপন্থী আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন এমন অনেককেই তিনি শান্তিনিকেতনে আহ্বান করেছিলেন।

তবুও "অতিশয় পন্থার" প্রতি তিনি নীতিগত ভাবে সমর্থন দেখাতে পারেন নি কখনও। যে দৈন্য আর জড়তাযুক্ত "পোলিটিকাল ভিক্ষাবৃত্তিকেই সম্পদ লাভের সদুপায়" মনে করে একদা দরখাস্তের মুসাবিদা করে হাত পাকিয়ে আসা হয়েছে, সেই দৈন্য আর জড়তার আশ্রয়েই "চৌর্যবৃত্তিতেই রাতারাতি ধনী"[৩৪] হবার পথ যে সমস্ত দেশের পক্ষে কলঙ্ক— তাই এই পন্থার সঙ্গে তাঁর বিরোধ আপসহীন। দেশের অন্তান প্রাণশক্তিকে না জাগালে, গণসমাজের সঙ্গে একাত্মীভূত না হতে পারলে শিক্ষাহীন, চেতনাহীন, ভিক্ষালব্ধ স্বাধীনতা একদিন দীনতার আবর্জনায় পরিণত হবে। "মহাজাতি গঠনের আহ্বানটা এই বাস্তব বিশ্লেষণেরই যুক্তিযুক্ত পরিণতি, কোনো বিমূর্ত তত্ত্ব নয়। নয় যে, তা তো তিন টুকরো হয়ে যাওয়া ভারতবর্ষের বাসিন্দা আমরা আজও মর্মে মর্মে বুঝছি। ইংরেজ নেই কিন্তু বছরের বারোমাসই কোথাও-না-কোথাও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আছেই। ফাটলগুলো আজও বোজানো যায়নি।"[৩৫]

কেবল সামাজিক ক্ষেত্রে নয়, স্বদেশের চিন্তার সূত্রেই তিনি দেশের অর্থনীতি নিয়ে গভীরভাবে ভেবেছিলেন। জমিদারি দেখাশোনার কাজে পূর্ববঙ্গে বসবাসের সূত্রে গ্রামীণ অর্থনীতির জটিল বিধি-ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁর সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই তিনি সমবায় প্রথায় ব্যাঙ্ক, বিক্রয়ভান্ডার, যৌথ খামার, গ্রামীণ শিল্পের উন্নতি, কৃষিতে আধুনিক উন্নত যন্ত্রের ব্যবহার— ইত্যাদির বাস্তব রূপায়ণ সাধ্য অনুযায়ী নিজের এলাকায় করবার চেষ্টা করেছিলেন।

ইংলন্ডের সাম্রাজ্যিক স্বার্থ মজবুত রাখতে বৃটিশশক্তি ভারতবর্ষে যে অর্থনৈতিক শোষণ চালিয়েছিল তাতে ভারতের জনগণ ভয়ংকর দারিদ্রে ডুবে যায়। ইংরেজদের আগে অন্য কোনো বিজেতা ভারতের উৎপাদন ব্যবস্থাকে এমনভাবে পঙ্গু করে নি। বৃটিশ বাষ্পযান এবং প্রযুক্তি ভারতীয় শিল্প উৎপাদনের কাঠামো ধ্বংস করেছে এবং ইংলন্ডের যন্ত্র শিল্পে কাঁচামাল সরবরাহের উৎস হিশেবে ভারতীয় কৃষি উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করেছে। বৃটিশ শাসনের থাবা ভারতীয় উৎপাদন ব্যবস্থাকে কীভাবে গ্রাস করেছে—মূল সংকট কোথায়—তখনকার রাজনৈতিক নেতাদের মনে এই উপলব্ধি প্রায় ধরা দিতনা। যদিও সেসময় দাদাভাই নওরোজী, মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে (১৮৫২—১৯০৪), রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৮৪—১৯০৯), এবং ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৭—৯৪) দেশের অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে তাঁদের ভাবনা এবং নিজস্ব কিছু পরিকল্পনার কথা বলেছিলেন। বিশেষ করে দাদাভাই

নওরোজী, রমেশচন্দ্র দত্ত এবং গোখ্‌লে বলেছিলেন, "ব্রিটিশ ক্লাসিকাল অর্থনীতি ভারতের ক্ষেত্রে নিরঙ্কুশভাবে প্রয়োগ করতে গিয়ে দুর্দশা ডেকে আনা হয়েছে। এতে দেশের সম্পদ বাইরে চলে গেছে, দেশজ শিল্প ধ্বংস হয়েছে, ক্রমাগত দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে লক্ষ লক্ষ মৃত্যু ঘটেছে, রাজস্বেব ক্রমবর্ধমান চাপে জনগণের দারিদ্র্য চরমে উঠেছে। বিদেশি রাজত্ব, সম্পদ নিষ্কাশন ও দারিদ্র্য এক সূত্রে গ্রথিত।"[৩৬]

কিন্তু ভারতীয় অর্থনীতি যে সম্পূর্ণ গ্রামীণ অর্থনীতি এবং কৃষিই যে ভারতীয় অর্থনীতিব একমাত্র ভিত্তি, অথচ তার উন্নতিতে দৃষ্টি দেওয়া হলনা, কৃষি যন্ত্রের বা সেচ ব্যবস্থার কোনো উন্নতি হলনা—এই তীক্ষ্ণ বোধ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজেব সাধ্যমতো সামান্য হলেও এর একটা বাস্তব পরীক্ষা শুরু করেছিলেন পূর্ববঙ্গে। গ্রামের কৃষকদের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এসে তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, কেবলমাত্র কোনো নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন বা কোনো আইন করে চাষিদের অবস্থার পরিবর্তন করা যাবেনা। রাযতদের স্বাধিকারবোধ, আত্মশক্তি জাগাতে না পারলে মূল সংকট থেকে বেরোনা যাবেনা। "তিনি যে দেখেছেন পল্লীবাসীদের স্বাধিকারবোধ অনেকটা মানসিক ধারণা হলেও কিছুটা বিষয়নির্ভর। এই বিষযনির্ভর মানসিক চেতনাকে উল্টে দিয়ে করা হয়েছে আইননির্ভর, অর্থাৎ আইন ঠিক, বাস্তব ঠিক নয।"[৩৭]

কৃষিতে জমি হস্তান্তরের মতো একটি জটিল বিষযও রবীন্দ্রনাথের নজর এড়ায়নি। "অর্থনীতির ছাত্র হলেই জানা যায় যে মহাজনী মূলধন খাটবে সেখানেই যেখানে তার স্বাভাবিক প্রতিদান পাওয়া যায। মহাজন মূলধন ধারে খাটাতে চায়, অর্থাৎ জমিতে বিনিয়োগ করতে চায় এই কারণে যে, সেখানে ঝুঁকি কম, প্রতিদান বেশি। কৃষক ধার শোধ দিতে অক্ষম হলে ন্যূনতম দামে জমিটি পাওয়া যাবে। মূলধন খাটাবার এই জায়গাটি বাধা পেলেই খোঁজা হবে অন্য সূত্র।"[৩৮] এই জন্যই রবীন্দ্রনাথ বলেন কৃষকের আত্মশক্তির জাগরণ না ঘটিয়ে চাষিকে জমির স্বত্ব দিয়ে লাভ নেই। কেননা মহাজনের কূটচালে জমির স্বত্ব কৃষকেরা শেষ পর্যন্ত রাখতে পারবেন না।

'রাশিয়ার চিঠি'তে তিনি বলেন চাষের সমাগ্রিক উন্নতির জন্য "সমবায় নীতির" ভিত্তিতে চাষ করা, "মান্ধাতা আমলের হাল-লাঙল" ত্যাগ করে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সূত্রে ভারতের গ্রামীণ অর্থনীতি নিয়ে রবীন্দ্রনাথের নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং সঙ্গে সঙ্গে এ ব্যাপারে তাঁর তত্ত্বগতভাবনা ও বিচার-বিশ্লেষণ—সে যুগের রাজনীতির এলাকার কজন নেতার মধ্যেই বা আমরা দেখতে পাই? পরাহত স্বদেশের দুস্থ, কুসংস্কারগ্রস্ত, জাত-পাতের জটিল বেড়াজালে আবদ্ধ মানুষদের জন্য তাঁরা

কখনও সুনির্দিষ্ট গ্রহণযোগ্য কোনো নীতি নিতে পারেন নি। "কৃষকদের সমস্যা সমাধান রাণাডেব পথে হতনা। রমেশচন্দ্রের কল্পনা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রয়োজনীয় সংস্কারের বেশি এগোয নি। একই সঙ্গে বড়ো জমিদার ও দখলদারী রায়তকে খুশি রাখতে তাঁবা চেয়েছিলেন—ইংরেজদের মতই।"[৩৯]

জমিদার সন্তান হযেও শ্রেণী স্বার্থ বজায রাখবার সহযোগবাদী নীতি থেকে ববীন্দ্রনাথ মুক্তই ছিলেন।

সমগ্রের এই পরিপ্রেক্ষিত মনে রেখেই আলোচ্য পর্বে (১৯০১—১০) রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি যে তত্ত্বভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল তাব সারাৎসার আমরা 'গোরা' উপন্যাসে পাব। এই পর্যায়ের স্বদেশি আলোড়নের বিপুল অভিজ্ঞতা, রাজশক্তির সঙ্গে স্বদেশবাসীর রাষ্ট্রীক সম্বন্ধের বেদনা, অপমান—এই উপলব্ধি চূড়ান্ত রূপ পেল 'গোরা'য। জাতীয় জাগরণের উন্মাদনায গোঁড়া হিন্দু গোরার অদম্য উৎসাহ একদিন তাকে ঘর থেকে বের করে স্বদেশের মাটির কোলে টেনে এনেছিল। গোরা প্রত্যক্ষ করেছিল অন্য-এক স্বদেশকে। ভদ্র সমাজ, শিক্ষিত সমাজ, শহুরে সমাজের বাইরে ভারতবর্ষের আসল চেহারা যে কেমন, তা গোরা টের পেল গ্রামজীবনের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এসে। শহরের জীবন থেকে, এমন কী প্রত্যেক পাঁচ-সাত ক্রোশের দূরত্বে "সামাজিক পার্থক্য যে কিরূপ একান্ত", ধনী-দরিদ্রে, শিক্ষিত-অশিক্ষিতে যে এমন ভয়ংকর অতলস্পর্শ ব্যবধান তা গ্রামের ভারতবর্ষে না এলে গোরা কল্পনাও করতে পারত না। চরঘোষপুরে মুসলমান পাড়ার ঘটনায় গোরার দীর্ঘ দিনের সযত্নে লালিত প্রবল হিন্দুত্ববোধ প্রচন্ড ধাক্কা খেল। এই প্রথম তার মনে হল, "পবিত্রতাকে বাইরের জিনিস করিয়া তুলিযা ভারতবর্ষে আমরা একী ভযংকব অধর্ম করিতেছি।" অবশেষে যখন সে জানতে পারল যে সে হিন্দু নয় এমন কী ভারতবর্ষীয়ও নয়—তখনই গোরার নতুন জীবন লাভ হল। এবারে যেন সে "সম্পূর্ণ অনাবৃত চিত্তখানি নিয়ে একেবারে ভারতবর্ষের কোলের উপরে ভূমিষ্ঠ" হল। "দেশ বা ধর্মের কাজের মধ্য দিয়ে এই তার আবরণ মোচনের অভিজ্ঞতা যেন সরিয়ে দিতে পারল তার ধর্মবোধ বা দেশবোধেরও আবরণ।"[৪০]

আরোপিত সব বাধা অতিক্রম করে আত্মসত্তা ও দেশসত্তার সামঞ্জস্য সাধনায় শেষ পর্যন্ত সর্বজাতির মধ্যেই স্বজাতিকে সত্যরূপে গোরা পেল। এই বৃহৎ মহাজাতির ধারণাই গোরা তথা রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ জিজ্ঞাসার তত্ত্বগত অবস্থান।

সূত্র নির্দেশ

১. এই প্রবন্ধ 'ববীন্দ্রনাথেব রাজনীতি' বিষযে পূর্ণাঙ্গ প্রকল্পেব একটি অংশ। এব আগের কালপর্ব বিষয়ে আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে (ক) 'ববীন্দ্রনাথেব বাজনীতি: ১৮৭৫–৯০', পবিচয়, নভেম্বব-ডিসেম্বব, ১৯৯১ এবং (খ) 'ববীন্দ্রনাথেব বাজনীতি: ১৮৯১–১৯০০', ইতিহাস অনুসন্ধান-৮, পশ্চিম বঙ্গ ইতিহাস সংসদ, কলকাতা, ১৯৯৩।

১.ক. অমলেশ ত্রিপাঠী, **'স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস' (১৮৮৫-১৯৪৭),** আনন্দ পাবলিশার্স, ১৩৯৮, পৃ. ৩২

২. Hees Peter, ***The Bomb in Bengal, the Rise of Revolutionary Terrorism in India*** 1900–1910, Oxford University Press, 1993, p. 80

৩. হেমচন্দ্র কানুনগো, **'বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা'**, চিবায়ত প্রকাশন, ১৯৮৪, পৃ. ৬

৪. অমলেশ ত্রিপাঠী, **'ভারতের মুক্তি সংগ্রামে চরমপন্থী পর্ব'**, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯১, পৃ. ৬১

৫. পূর্বোক্ত সূত্র, পৃ. ৬৩

৬. অমলেশ ত্রিপাঠী, **'ভারতের মুক্তি সংগ্রামে চরমপন্থী পর্ব'**, আনন্দ, ১৯৮৭

৭. পূর্বোক্ত সূত্র, পৃ. ৬৫

৮. ববীন্দ্রনাথ ঠাকুব, "য়ুনিভার্সিটি বিল", রচনাবলী ত্রয়োদশ খন্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকাব, ১৯৯০, পৃ. ৮৮

৯. Sumit Sarkar, ***The Swadeshi Movement in Bengal 1903-1908,*** p. 31
"The politics of Bengal's Swadeshi age at first sight appears to present a fairly simple picture of a united movement against the partition gradually splitting up into 'moderate' and 'extremist' (or nationalist) currents, with the second trend eventually developing into 'terrorism'."

১০. রবীন্দ্র রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯০, সমূহ, পাবনা প্রাদেশিক সম্মেলনী, সভাপতির অভিভাষণ, পৃ. ২৭৮

১১. পূর্বোক্ত সূত্র, 'সফলতার সদুপায়', আত্মশক্তি, পৃ. ৭০

১২. অমলেশ ত্রিপাঠী, **স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস**, আনন্দ, ১৩৯৮, পৃ. ৫৫

১৩. হেমচন্দ্র কানুনগো, **বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা**, চিরায়ত প্রকাশন, ১৯৮৪, পৃ. ৪১

১৪. 'দেশের কথা', র. র. ত্রয়োদশ খণ্ড, পৃ. ৩৪৮

১৫. সফলতার সদুপায়, র. র. ত্রয়োদশ, পৃ. ৭০

১৬. 'নৈবেদ্য', র. ব. প্রথম খণ্ড, ৬৪ সংখ্যক কবিতা, পৃ. ৯৯১

১৭. 'অত্যুক্তি', র. র., ত্রয়োদশ খণ্ড, 'ভারতবর্ষ', পৃ. ১৬৯

১৮. প্রশান্তকুমার পাল, রবিজীবনী, পঞ্চম খণ্ড, আনন্দ, ১৩৯৭, পৃ. ১৯৪

১৯. চিন্মোহন সেহানবীশ, **'রবীন্দ্রনাথ ও বিপ্লবী সমাজ'**, বিশ্বভারতী, ১৩৯২, পৃ. ৯২

২০ পূর্বোক্ত সূত্র, পৃ ৯২
২১. প্রশান্তকুমার পাল, **'রবিজীবনী'**, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ১৬৯–৯৭
২২. পূর্বোক্ত সূত্র
২৩ পূর্বোক্ত সূত্র, পৃ ১৯৮
২৪ "অপমানের প্রতিকার", র. র. ত্রয়োদশ, পৃ. ২১১
২৫. "ব্যাধি ও প্রতিকার", র. র., এয়োদশ খণ্ড, পৃ. ৩৫৪
২৬. রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, "ব্যাধি ও প্রতিকার", প্রশান্তকুমার পাল কৃত **রবিজীবনী** পঞ্চম খণ্ডে উল্লিখিত, পৃ. ৩৪৭
২৭. "ব্যাধি ও প্রতিকার", র. র., এয়োদশ, পৃ. ৩৫১
২৮. হেমচন্দ্র কানুনগো, **'বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা'**, পৃ. ৪২–৪৩
২৯. পূর্বোক্ত সূত্র, পৃ. ২৬
৩০. Hees Peeter, ***The Bomb in Bengal,*** Oxford, 1993, p 80
৩১. Sumit Sarkar, ***Swadeshi Movement in Bengal, 1973,*** p 91
৩২. কালান্তর, র. র. এয়োদশ খণ্ড, পৃ. ৭১৪
৩৩. অশোক সেন, 'রবীন্দ্রনাথের স্বাবলম্বন', 'সাহিত্যপত্র', একাদশ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, ১৩৬৮, পৃ. ২৮
৩৪. "ছোটো ও বড়ো", র. র., এয়োদশ খণ্ড, পৃ. ৬১৪
৩৫. সত্যজিৎ চৌধুরী, **'অবলোকন'**, নব চলন্তিকা, ১৯৯৩, পৃ. ৭
৩৬. অমলেশ ত্রিপাঠী, **'স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস'**, আনন্দ, ১৩৯৮, পৃ. ৪৪
৩৭. সুব্রত গুপ্ত, পরিমল চক্রবর্তী, **'রবীন্দ্রনাথের অর্থনৈতিক চিন্তা'**, মডার্ণ কলাম, ১৯৮৭, পৃ. ৩৩
৩৮. পূর্বোক্ত সূত্র
৩৯. অমলেশ ত্রিপাঠী, **'স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস'**, পৃ. ৪৮
৪০. শঙ্খ ঘোষ, **'নির্মাণ আর সৃষ্টি'**, বিশ্বভারতী, ১৩৮৯, পৃ. ২৯

ভারত বহির্ভূত দেশ

প্রাচীন বঙ্গদেশ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপপুঞ্জ—সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্কের একটি রূপরেখা

বেদশ্রুতি ভট্টাচার্য

সম্পদ আহরণের উদ্দেশ্যে সকল যুগের রীতি অনুযায়ী ভারতীয় বণিকেরাও মাতৃভূমির সীমানা ছাড়িয়ে অজানা দেশের পথে নির্গত হয়েছিল। সমুদ্রের পরপারে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপপুঞ্জ (অথবা "পূর্ব পাহাড়ের দেশ") স্বর্ণ ও মূল্যবান খনিজ সম্পদের আকর হিসেবে অনুমিত হওয়ার জন্য দেশটির নামকরণ হয়েছিল সুবর্ণভূমি ও সুবর্ণদ্বীপ। ভারতের বণিককুলের কাছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপপুঞ্জের আকর্ষণ ছিল মূলত মশলা উৎপাদনকারী হিসাবে এবং একই কারণে পরবর্তীকালে নবম এবং দশম শতাব্দীতে আরবদেশীয় বণিকদের এবং পঞ্চদশ-ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয়গণের এই অঞ্চলের প্রতি ছিল দুর্নিবার আকর্ষণ।

ভারতবর্ষ থেকে সুপ্রাচীন কাল থেকে 'দক্ষিণ-পূর্ব' এশিয়ার দ্বীপগুলিতে ভ্রমণ বা বসতিস্থাপনের কথা আমরা বিভিন্ন উৎস মারফত জানতে পারি। মূলভূখণ্ড থেকে প্রধানতঃ ব্রাহ্মণ্য বা বৌদ্ধধর্ম-প্রচারকগণই এ-সকল দ্বীপপুঞ্জে গমন করেছিলেন। অবশ্য লোকসংখ্যা বৃদ্ধি, বিদেশী আক্রমণ এবং এই সঙ্গে বণিককুলের দুঃসাহসিকতা দুস্তর সমুদ্র-পারাপারে উৎসাহ জুগিয়েছিল। এই সকল অভিযাত্রীদের অনেকেই কালক্রমে এতদঞ্চলে বসতিস্থাপন এবং স্থানীয় কন্যাদের বিবাহ করে, সমাজে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রবর্ত্তনের পথ সুগম করেছিল। ধর্মপ্রচারকগণের আনুকূল্যে ভারতীয় ধর্ম, শিল্পকলা, সাহিত্য এবং সামাজিক আচার-ব্যবহার ধীরে ধীরে সমাজের সর্বস্তরে অনুপ্রবেশ করে এবং স্থানীয় আচার-ব্যবহারের সঙ্গে সংমিশ্রিত হয়ে তাহা কালক্রমে ভারতীয় সভ্যতার নূতন সংযোজন হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

সংস্কৃতি প্রসারের সাথে সাথে এতদঞ্চলগুলিতে ভারতীয় বাণিজ্যিক সম্পর্কের দ্রুত উন্নতি লাভ করতে আরম্ভ করে। এই সম্পর্কের কথা আমরা বিভিন্ন উৎস-মারফৎ জানতে পারি। বিভিন্ন ধনবান বণিক বা বণিকপুত্রের অর্ণবপোতে সুবর্ণভূমি যাত্রার রোমাঞ্চকর বা রোমান্টিক গল্পের কথা সাধারণত প্রাচীন জাতক

গল্পে, বৃহদকথা, বা দশম-একাদশ খৃষ্টাব্দে রচিত কথা-সরিৎ-সাগরে পাওয়া যায়। এছাড়াও আমরা বিদেশী পর্যটকদের বিবরণের (আরব, পারসীয় ও চৈনিক-গণের বিবরণ) মধ্যে ভারত ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া দ্বীপপুঞ্জগুলির প্রামাণ্য চিত্র পাই। তবে প্রত্নতত্ত্বের উপাদানগুলিই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। এদের মধ্যে আছে নির্মিত মন্দির বা বিহার, ভাস্কর্য এবং মূল্যবান লিপিমালা।

রমেশচন্দ্র মজুমদার মালয় উপদ্বীপে অবস্থিত একটি বসতির (চীনা ভাষার যার নাম বলা হয়েছে Tuen Suin কথা সমসাময়িক বিবরণ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন "এই অঞ্চলের বাণিজ্যিক কেন্দ্রে পূর্ব-পশ্চিম থেকে প্রত্যহ প্রায় ১০ হাজার মানুষের সমাগম হয়। এদের মধ্যে পার্থিয়া দেশ, ভারতবর্ষ এবং আরও দূরদেশের আগত বণিকেরা মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যাদি ব্যবহার করে থাকে। এই অঞ্চলের লোকেরা ব্রাহ্মণ্য এবং বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী। এরা নিজ নিজ ধর্মের অনুশাসন যথাযথভাবে পালন করে।"

যবদ্বীপ সাতটি অঞ্চল নিয়ে গঠিত ছিল এবং যবদ্বীপের পরিচিতি ছিল স্বর্ণ ও রৌপ্যের দেশ হিসেবে। দক্ষিণ ভারত ও ইন্দোনেশিযার সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল সুদূর অতীতকাল থেকে। সুমাত্রার নাম দেওয়া হল সুবর্ণদ্বীপ। যাভা নামটি এসেছে যবদ্বীপ বা ধান্যভূমি থেকে। বোর্ণিওতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ব্রাহ্মণ্য-শাসিত রাজ্য 'কুতাই'। সুমাত্রায় প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিজয়ের বৌদ্ধ-রাজাদের সঙ্গে নালন্দার মহাবিহারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠার কাহিনী জানা যায় দেবপালের নালন্দা তাম্রফলকের বিবরণ থেকে (আঃ নবম শতক)। শ্রীবিজয়ের নৃপতি বালপুত্রদেবের সঙ্গে পালসম্রাট দেবপালের এই সাংস্কৃতিক ভাব বিনিময়ের কথা বাংলা তথা পূর্বভারতের সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহের সঙ্গে সম্পর্কস্থাপনের ইতিহাসে নিঃসন্দেহে এক নূতন অধ্যায় সৃষ্টি করে। স্মরণ. রাখা যেতে পারে ইতিপূর্বে বঙ্গের অধিবাসী কুমার ঘোষ মহাযানপন্থী শৈলেন্দ্র নৃপতিবর্গের রাজগুরু হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন (৭৮২ খৃষ্টাব্দে)।

ভারতীয় সংস্কৃতি ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহের সংস্কৃতির যে সংমিশ্রণ ঘটেছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় এখানকার শাসনতন্ত্রে, সামরিক সংগঠনে, সাহিত্য, সঙ্গীত এবং নৃত্যকলায়, বাস্তু-নির্মাণ-শিল্পে, ভাস্কর্য এবং ধর্মে। ত্রয়োদশ শতকে সমগ্র অঞ্চল মুসলমান ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হলেও, জনসাধারণের সংস্কৃতিতে ভারতীয় প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে ইন্দোনেশিয়ায় বলিদ্বীপকে "ইন্দোনেশিয়ার মুক্তমালার শ্রেষ্ঠ মুক্ত" হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এই বলিদ্বীপে এখনও ভারতীয় সনাতনধর্ম, সনাতন রীতিনীতি পরিবর্তনশীল মহাকালের বিধান উপেক্ষা করে একইভাবে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। এখনও

সমুদ্রঘেষা বলিদ্বীপের মন্দিরে মন্দিরে প্রার্থনায় উপনিষদের বাণী মুর্চ্ছিত হয়ে ওঠে :

মিত্রস্য মা চক্ষুসা
সর্বাণি ভূতানি সমীক্ষন্তাম্
মিত্রস্যাহং চক্ষুসা সর্বানি
ভূতানি সমীক্ষে
মিত্রস্য চক্ষুসা সমীক্ষামহে।

অর্থাৎ— "সকল প্রাণী আমার প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন হউক। আমি সকল প্রাণীকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করি। আমরা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু বলিয়া মনে করি।"[১]

প্রথম শতক থেকে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে সুবর্ণভূমি বা সুবর্ণদ্বীপের প্রতি ভারতীয়গণের আকর্ষণ প্রধানত দুঃসাহসী ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী নাবিক এবং বণিককুলের মধ্যেই সীমিত ছিল। তবে দক্ষিণ ভারতের যে নাগরিক সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল, তা মূলত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং রোমের সহিত বাণিজ্যিক সম্পর্কের ভিত্তি করে। তাই এই সম্পর্ক শিথিল হওয়ার সাথে সাথে তৃতীয় শতক থেকেই নগরায়ণ পদ্ধতির অবক্ষয় লক্ষ্য করা যায়। অধ্যাপক শর্মা[২] মনে করেন যে, কেবলমাত্র গ্লাসের টুকরো এবং আনুষঙ্গিক কিছু প্রত্নবস্তুর উপর নির্ভর করে খৃষ্টীয় চতুর্থ থেকে দশম শতক পর্যন্ত সময়ের দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্কের বিশেষ কোন ইঙ্গিত দেওয়া সম্ভব নয়। সাম্প্রতিককালে ইউরোপীয়, বিশেষ করে ফরাসী, ডাচ, ইংরাজ এবং ভারতীয় পণ্ডিতবর্গের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এতদঞ্চলের ইতিহাসের পূর্ণাঙ্গ চিত্র ক্রমশ প্রকাশ পাচ্ছে। বিশেষ করে চৈনিক তথ্য সমূহ এতদঞ্চলের দেশসমূহের সঙ্গে চীনদেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক সংক্রান্ত নানাবিধ সংবাদ প্রদান করে।

খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকে রচিত লেখক কাঙ্তাই[৩] এবং ওয়ান চেন[৪] যে সকল অর্ণবপোতের বিবরণ দিয়েছেন তাহাতে চীনদেশীয় অর্ণবপোত সম্বন্ধে কোন কথা নেই। অবশ্য পেলিওয়ট[৫] মনে করে চীনা বণিক, নিজেদের জাহাজ করে খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে ভারতে আগমন করেছিলেন। কিন্তু V.A. Velgus - এর মতে খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকে রচিত ওয়ান চেনের বিবরণ থেকে পরিষ্কার মনে করা যায় যে ঐ জাহাজগুলি ইন্দোনেশিয়ার অথবা ভারতীয়দের।[৬] ওয়াঙ্গুংগু অবশ্য ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁর মতে, এই জাহাজগুলি ছিল ভারতীয়দের এবং চীন ও ভারতের মধ্যে যাতায়াত করত। কখনও কখনও চীন দেশের সঙ্গে বাণিজ্যের খাতিরে ভারতীয় পদ্ধতি অনুযায়ী মালয় উপদ্বীপে জাহাজ নির্মিত হত।[৭] ইউচি এবং চীনা জাহাজগুলি ছিল আকারে ছোট এবং ধীরগতিসম্পন্ন, সম্ভবত বিস্তীর্ণ সমুদ্রে পাড়ি দেবার পক্ষে উপযোগী ছিল না।

চতুর্থ শতক থেকে বৌদ্ধ চীনা পরিব্রাজকগণ দলে দলে ভারতে আসতে আরম্ভ করেন। বিশেষত তারা যে সকল তথ্য লিপিবদ্ধ করেছিলেন, তাদের মধ্যে ফা-হিয়েনের বিবরণই বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি সমগ্র উত্তরভারত অতিক্রম করে ৪০০ খৃষ্টাব্দে পাটলিপুত্র থেকে গঙ্গার অববাহিকা ধরে পশ্চিমবঙ্গের প্রখ্যাত বন্দরশহর তাম্রলিপ্ত (অধুনা তমলুক)-এ উপস্থিত হন। তাম্রলিপ্ত থেকে সিংহল দ্বীপপুঞ্জেও আগমন করেন সমুদ্রপথে। ভারতে চার বৎসর এবং সিংহলে দুই বৎসর অতিবাহিত করেছিলেন। সিংহল থেকে সুমাত্রা বা যাভা দ্বীপপুঞ্জ হয়ে চীনদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

ফা-হিয়েনের বিবরণ থেকে মনে হয় যে সিংহলে তিনি কোন চীনদেশীয় অধিবাসী বা জাহাজ দেখেননি।

Velgus-এর মতে চীনদেশীয় কোন জাহাজ পঞ্চম শতকের পূর্বে সিংহল বা যাভা বা সুমাত্রাতে আগমন করে নি।

ফা হিয়েন যে জাহাজে করে স্বদেশে ফিরেছিলেন তা সম্ভবত ভারতীয়। ফা-হিয়েন তাঁর বিবরণে লিখেছেন যে, সিংহল দ্বীপে কোন স্বদেশীয়কে দেখেন নি। একবার জনৈক বণিকের কাছে চীন দেশে প্রস্তুত একখন্ড রেশমী বস্ত্র দেখে তাঁর মন স্বদেশের চিন্তায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল।

ফা-হিয়েন সিংহল থেকে সুমাত্রা এবং পরে কুয়াং চৌ (Kuang-chou বা Canton)-এ যাবার পথে অনেক অসুবিধায় পড়েছিলেন। ঐ জাহাজের বণিকেরা একাধিকবার সুমাত্রা ও চীনে ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে গমন করেছিলেন। তবে তিনিই ছিলেন একমাত্র চীনদেশীয় অধিবাসী। সুতরাং মনে হয় পঞ্চম শতকের পূর্বে চীন দেশীয় কোন জাহাজের সিংহলে বা সুমাত্রাতেও চীনা বণিকদের তখনও আগমণ ঘটে নি।

পণ্ডিত ওয়াঙ্‌গঙ্গু অবশ্য মনে করেন পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকে ভারতীয় ও সিংহলীয় অর্ণবপোতগুলি বঙ্গ ও থাইল্যান্ডের উপসাগরে বা মালাক্কা, সিঙ্গাপুর ও করিমতা প্রণালী সমূহে বা যাভা সমুদ্রে যাতায়াত করত। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া দ্বীপসমূহ থেকেও প্রায়ই চীন ভূখন্ডে জাহাজ গমন করত।[৮] চীনভূখন্ডে পারসিকদের সঙ্গে ব্যবসার সূত্রপাত হয়েছিল সপ্তম শতকের পূর্বে। পরে আরবরা (অষ্টম শতকে) চীনে আগমন করে।

উদাহরণ স্বরূপ চৈনিক তথ্য থেকে গৃহীত কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা যায়। ৬৭১ খৃঃ জনৈক চৈনিক সন্ন্যাসী পারসিক জাহাজে তীর্থ-ভ্রমণের জন্য সুমাত্রায় আসেন। জনৈক ভারতীয় সন্ন্যাসী বজ্রবোধি পারসিক জাহাজে চীনদেশে ৭১৭—১৯ খৃঃ আগমন করেন। চৈনিক সন্ন্যাসী হুই-চাও পারসিক জাহাজে ভারতীয় তীর্থভ্রমণে এসেছিলেন ৭২২ খৃষ্টাব্দে এবং পরে পারসিকগণ সিংহল,

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া হয়ে চীনে গমন করেছিলেন। ৭৫৮ খৃঃ পারসিক ও আরব কর্তৃক চীনের কুয়াঙ চৌ অঞ্চল লুণ্ঠন ও অগ্নি সংযোগ করা থেকে অনুমান করা যায়, যে এই দুই জাতি চীনে পূর্ব থেকেই বসতি স্থাপন করেছিল।[৯]

ভারতীয় ও সিংহলীয় জাহাজগুলি, বিশেষ করে বণিকদের জাহাজগুলি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলগুলিতে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। ফলে ভারতীয় অধিবাসীদের দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া দ্বীপগুলিতে বসতি স্থাপন এবং ভারতীয় সন্ন্যাসীগণের এতদঞ্চলে ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধধর্ম স্থানীয় লোকেদের বিশেষ প্রভাবিত করেছিল। এর ফলে ভারতীয় পণ্যের সমাদর এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের সবিশেষ প্রসার লাভ করে। মালয় উপদ্বীপে প্রাপ্ত লিপিগুলি থেকে অনুমিত হয় যে, উত্তর, পশ্চিম ও পূর্ব মালয়-উপদ্বীপ ভারতীয় অধিবাসীদের দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হয়েছিল। ভারতীয়গণ সাধারণত এসেছিলেন উত্তর ও দক্ষিণ ভারত থেকে। মালয়ে প্রাপ্ত মহানাবিক বুধগুপ্তের লিপিটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ষষ্ঠ শতকে উৎকীর্ণ লিপিটি থেকে জানা যায় যে, বুধগুপ্ত ছিলেন রক্তমৃত্তিকার অধিবাসী।[১০] রক্তমৃত্তিকা মহাবিহার ছিল শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণের নিকটস্থ মুর্শিদাবাদের রাঙামাটি অঞ্চলে।

প্রসঙ্গক্রমে, দক্ষিণ ভারতে অবস্থিত অন্ধ্রপ্রদেশের অন্তর্গত সুবিখ্যাত বৌদ্ধবিহার অমরাবতীর উত্থানের মূলে "মহানাবিক"দের অবদান অনস্বীকার্য। ঘণ্টপল্লী ও ঘণ্টাশাল লিপিমালায় এই মহানাবিকগণের কথা লিপিবদ্ধ হয়েছে। এই সকল নাবিকগণ বা বণিকগণ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে প্রভূত লাভজনক বাণিজ্যে লিপ্ত ছিলেন। সমুদ্রপথে বাণিজ্য বণিককুলের শ্রীবৃদ্ধির সহায়ক হয়েছিল।

উত্তর-পূর্ব ভারতে তাম্রলিপ্ত (অধুনা, তমলুক) ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ বন্দর। ফা-হিয়েন (৫ম শতক), ইৎ-সিঙ (সপ্তম শতক) বা হিয়েন সাঙ (সপ্তম শতক) সকলেই তাম্রলিপ্ত থেকে চীন দেশ, সিংহল, বা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপমালা হয়ে চীনে যাবার কথা লিখে গেছেন। তাম্রলিপ্ত বন্দরের পতনের পরেও বঙ্গদেশের সহিত বহির্বাণিজ্যের অবনতি ঘটে নি। উত্তরবঙ্গের বিজয়নগর বা বিজয়পুর, লক্ষ্মণাবতী, রামাবতী প্রভৃতির নগরীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দক্ষিণবঙ্গের বিক্রমপুর সেনরাজাদের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক কেন্দ্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। সমুদ্রবন্দর চট্টগ্রাম (সম্ভবত আরবদের সমন্দার) প্রভৃতি বন্দরগুলির সঙ্গে ধলেশ্বরী নদীর উপর অবস্থিত রাজধানী জয়স্কন্দরার বিক্রমপুরের বাণিজ্যের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। চন্দ্র-বর্মণ-সেন লিপিমালায় একথা সমর্থিত হয়েছে।

একদিকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি এবং অপরদিকে আরব বণিকদের সঙ্গে বঙ্গদেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক বৃদ্ধি লাভ করে। সুতরাং একথা অনস্বীকার্য যে দক্ষিণপূর্ব বঙ্গে ব্যবসায় ও বাণিজ্যের যে-প্রসার ও উন্নতি সপ্তম শতক থেকে লক্ষ্য করা যায়, তা মূলত প্রতিষ্ঠিত এবং শক্তিশালী রাজ্যের আনুকূল্য

ছাড়া কখনই সম্ভব ছিল না। মহারাজাধিরাজ শশাঙ্কের পর পাল-সেন নৃপতিগণ এ-বিষযে যত্নবান ছিলেন। শশাঙ্কের সময় থেকে বা তার কিছু পূর্ব থেকেই, এই অঞ্চলে ব্যবসার প্রয়োজনে স্বর্ণমুদ্রা, বিশেষ করে তথাকথিত গুপ্তমুদ্রার অনুকরণে প্রস্তুত স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত হয়েছিল।[১১] কারণ, প্রাচীন ভারতে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায়, মুদ্রা প্রস্তুত করা সাধারণভাবে বণিককুলেরই উপরই ন্যস্ত থাকত। বণিকগণই ব্যবসায় বাণিজ্যের স্বার্থে, standard-ওজন অনুসারে মুদ্রা প্রস্তুত করতেন— কখনও কখনও তারা স্থানীয় নৃপতিবর্গের নাম সংযুক্ত করে মুদ্রা প্রস্তুত করতেন। তবে মুদ্রার ওজনের কোন প্রকার হেরফের না হয়, সেদিকে নজর রাখতেন।

সূত্র নির্দেশ

১। কম্পাকম শঙ্কবনারায়ণমেব প্রবন্ধ 'Grater India outside India etc.'দ্রষ্টব্য See Journal of the Institute of Asian studies, vol.x p.I, 33 ft.

২। R.S. Sharma, Urban Decay in India, p. 9.

৩। See T'ai-Ping Reign Period, Imperial Encyclopaedia of 938, Chapter Chuan 769.

৪। Cf. Strange Things of South, See F. Cheng-Chien's collection of Interpretations, Vol.I, p. 158.

৫। P. Pelliot, Quelques Textes Chinois...., p. 257, noticed in the countries and peoples of the East(ed.) D.A. Olderogge, Moscow, 1924, pp.64.

৬। V.A. Velgu's এর প্রবন্ধটি Countries and the people of the East, Moscow, 1974 পুস্তকটি দ্রষ্টব্য।

৭। G. Wang Ganga, The Nankin Trade in the South China seam IMBRAS, Vol.xxxi, No. 182, 1958, p. 15. প্রবন্ধটি উল্লিখিত V.A. Velgus-এর প্রবন্ধে বলা হয়েছে।

৮। G. Ssuma Kuang, Mirror of Universal History, Shanhai, 1956, xvi, p. 1532.

৯। V.A. Velgus এর উল্লিখিত প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য। এ ছাড়াও Feng Ching Chuan এর History of the Contacts of China (pp. 31-62) পুস্তকটিও দ্রষ্টব্য।

১০। R.C. Majumdar, Hindu colonies in the Far East, p. 16.

১১। পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের বার্ষিক (১৯৯২) অধিবেশনে পঠিত প্রাচীন ভারতীয় শাখার সভাপতির [অধ্যাপক প্রণব কুমার ভট্টাচার্যের প্রদত্ত] ভাষণ দ্রষ্টব্য।

খুলনার সাম্যবাদী আন্দোলন
ও
চারুলতা দেবী

সতী দত্ত

১৯৪৩ সাল পূর্ববঙ্গের ছোট শহর খুলনার রাজপথে শীর্ণ মানুষেরা মিছিল করে চলেছে খাদ্যের সন্ধানে। কোন অফিসবাড়ী বা মন্ত্রীকে ঘেরাও নয়— তাদের লক্ষ্যস্থল শহরের কোন এক বাড়ীর ধানের গোলা। গোলা পাহারার যথাযথ ব্যবস্থা ছিল— মিছিলও এসেছিল যথাস্থানে কিন্তু গোলাগুলি ছোটেনি, অভুক্ত অসহায় মানুষেরা লুটপাটও করেনি— একটা সমঝোতা হয়েছিল। মিছিলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন গোলা মালিকদেরই এক গৃহবধূ। এই ঘটনার পর শহরে কিন্তু ছিঃ ছিঃ রব উঠেছিল। কিন্তু কেন এই ধিক্কার এবং মহিলারই বা কি পরিচয়!

ঐ মিছিলের নেত্রীর নাম শ্রীমতী চারুলতা ঘোষ। ১৯০৬ সালে ময়মনসিংহে তাঁর জন্ম। বিবাহসূত্রে খুলনা শহরে আসা। তাঁর বাবার কাছেই হয়েছিল মানুষকে ভালবাসার প্রথম পাঠ। বাল্যকাল থেকেই গড়ে উঠেছিল তাঁর পড়াশোনার অভ্যাস। প্রাক-স্বাধীনতা যুগে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা তরুণদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করত — চারুলতাদেবীও তার ব্যতিক্রম নন।

বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত কৃষিপ্রধান খুলনা জেলায় বিংশ শতাব্দীর ৩য় দশকে সাম্যবাদী আন্দোলন প্রধানত শুরু হয়েছিল কৃষক আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। যে-যুগে নারী সম্প্রদায়ের স্থান বর্হিজগতে স্বীকৃত ছিল না সেই সময়ে গৃহবধূ চারুলতাদেবী বিদেশী সরকার কর্তৃক কার্যত নিষিদ্ধ ঐ সাম্যবাদী আন্দোলনে নেতৃত্ব দান করেছিলেন।

উপরি উক্ত ঘটনার অর্থাৎ "মিছিল এবং গৃহবধূর নেতৃত্ব দান"-এর গুরুত্ব এবং সামাজিক পরিস্থিতি বুঝতে হলে ফিরে যেতে হবে এখন থেকে প্রায় ষাট বছর আগে। বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসে আজ আমরা কল্পনাও করতে পারি না এই শতাব্দীর দ্বিতীয় বা তৃতীয় দশকে খুলনা শহরের সামাজিক অবস্থা কেমন ছিল।

খুলনা জেলায় তখন ছিল তিনটি মহকুমা—খুলনা সদর, বাগের হাট ও সাতক্ষীরা। গ্রামের সংখ্যা প্রায় ২০০৮। জেলাটি নদীপ্রধান— তবে অসংখ্য খাল-বিলও ছিল। রাজধানী কলকাতার সাথে ট্রেন দ্বারা যুক্ত থাকায় কলকাতার চিন্তাধারা সেখানে পৌঁছাতে বেশী দেরী হত না। হিন্দুরা জমির মালিক কিন্তু কৃষক সমাজের বিরাট অংশই ছিল মুসলমান। শহরে ও গ্রামে ছেলেদের পড়া শোনার পরিবেশ ভাল মত গড়ে উঠলেও মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ ছিল নিতান্তই সামান্য। তারা গৃহকর্ম বা সূচীশিল্প নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন এবং নিস্তরঙ্গ জীবন যাপন করতেন। এই সামাজিক পরিবেশের মধ্যে চারুলতাদেবীও বড় হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু গৃহ না ছেড়ে পরিবারকে বিসর্জন না দিয়ে রক্ষণশীল পরিবারের ধিক্কার ও অবমাননা অগ্রাহ্য করে স্বামীসহ কৃষক আন্দোলনে যুক্ত থাকা প্রায় অবিশ্বাস্য ঘটনা— কিন্তু ইতিহাস এ ঘটনার সাক্ষী।

অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতা সৃষ্টি করে তরুণদের মধ্যে গভীর অসন্তোষ কিন্তু মার্কসবাদী সাহিত্য ও রুশ বিপ্লবের সাফল্য তরুণ বিপ্লবী ও কারারুদ্ধ কর্মীদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। তখন থেকেই তদের বক্তব্য হল শুধু বিদেশীদের নাগপাশ নয়, কৃষক ও শ্রমিকশ্রেণীকে ভূস্বামী ও পুঁজিপতিদের জোয়াল থেকেও মুক্ত করতে হবে। এই সব কারারুদ্ধ তরুণদের মধ্যে খুলনা জেলার প্রমথনাথ ভৌমিকও ছিলেন। কারামুক্ত প্রমথনাথ নতুন পথের পথিক হলেন ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের সংস্পর্শে এসে। প্রমথনাথকে কেন্দ্র করে খুলনার খলিসপুরের আশ্রমে ভবানী সেন সহ বহু তরুণ কর্মীর সমাবেশ শুরু হল— চারুলতাদেবীও ছিলেন তাঁদের মধ্যে।

তবে সব ঘটনার পেছনেই একটা অপ্রত্যক্ষ পশ্চাদপট থাকে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে খুলনা শহরের কংগ্রেস অফিসটি ছিল চারুলতাদেবীর বাড়ির সংলগ্ন— ফলে কংগ্রেসের আন্দোলনের ঢেউ (ছোট-বড়) তাঁদের বাড়ির উপর এসে পড়ত। চারুলতাও হতেন প্রভাবিত।

বিংশ শতাব্দীর ৩য় দশকে কংগ্রেসী আন্দোলনের মধ্যে রাজনৈতিক কার্যক্রম সংক্রান্ত ব্যাপার দুটি ধারা প্রত্যক্ষ গোচর হয়ে পড়ে। সুভাষ বসু ও গান্ধীজীর মধ্যে মত পার্থক্যের ফলে তৎকালীন খুলনা জেলার কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যেও প্রত্যক্ষ সংগ্রামমুখী বামপন্থীদের প্রাধান্য প্রকটিত হতে শুরু করে— এই সব কর্মীদের দলে ছিলেন সমর মিত্র প্রমুখ তরুণরা। এরা সুদীর্ঘ কাল অন্তরীণ অবস্থায় কাটিয়ে স্ব-স্ব গ্রামে ফিরে এসে উদারনৈতিক কার্যক্রম চালু করার জন্য প্রচেষ্টা শুরু করেন। চারুলতাদেবীও ঐ সকল কার্যে সামিল হতেন যখনই তাঁর ঐসব গ্রামে যাবার সুযোগ আসত। উদারনৈতিক কার্যাবলী পরিচালনার জন্য কর্মীদের সাথে আলোচনাও চলত। চারুলতার অন্তরে যে একটা উদারনৈতিক

চিন্তা ধারার বীজ পিতার কাছ থেকেই সঞ্চারিত হয়েছিল— গ্রামীণ এই পরিবেশে আলাপ আলোচনা ও কার্যাবলীর মাধ্যমে তা অনেকটাই অঙ্কুরিত হতে থাকলো। গ্রামের এই সকল কার্যে অংশ গ্রহণ করার ফলে গ্রামের প্রতি তাঁর আকর্ষণ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তাদের সমস্যাবলী সম্বন্ধে তিনি ওয়াকিবহাল হন। তাঁর এই অভিজ্ঞতা কৃষক আন্দোলন পরিচালনায় বিশেষভাবে সাহায্য করেছিল।

অসহযোগ আন্দোলন, স্বাধীনভাবে সারা ভারতে কৃষক আন্দোলন গড়ে তুলতে সাহায্য করে। খুলনার রাজনৈতিক আন্দোলনও সমগ্র ভারতের আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন নয়;— তাই খুলনা জেলাতেও এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ল রাজনৈতিক চেতনা সম্পন্ন শিক্ষিত যুবকদের মাধ্যমে; এদের মধ্যে বিষ্ণু চ্যাটার্জীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই তরুণরা জমিদার ও মহাজনের অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য কৃষকদের সচেতন করে তুলতে লাগলেন সভা-সমিতির মাধ্যমে। "লাঙ্গল যার—জমি তার"— এই ধ্বনির সাথে পরিচিত হল কৃষকরা। এই সব তরুণদের সাথে চারুলতাকেও দেখা যেত গ্রামে। গড়ে তুললেন নিজের বিস্তৃত কর্মক্ষেত্র— পুরোপুরি যুক্ত হলেন কৃষক আন্দোলনের সাথে। যখন মহিলারা ঘরের বাইরে চলাচলে অভ্যস্ত নন— সেই পরিপ্রেক্ষিতে চারুলতার প্রচারের জন্য গ্রামে গ্রামে ছুটে বেড়ানো তাঁর অসীম সাহসিকতার পরিচয় বহন করে। যৌথ পরিবারের গৃহবধূ— কিন্তু তাঁর স্বামীর সহানুভূতিও সক্রিয় সমর্থন থাকায় এই ধরনের আন্দোলনে সামিল হওয়া সম্ভব হয়েছিল। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, খুলনা শহরে তথা সমগ্র জেলায় 'ছাত্র ফেডারশনের' মাধ্যমে ছাত্র আন্দোলনের বনিয়াদ রচনায় চারুলতাদেবী ও তাঁর স্বামীর পূর্ণ সহযোগিতা ছিল।

বিপুল ঋণের বোঝা ও দারিদ্র্য ছিল ব্রিটিশ যুগে কৃষিগত কাঠামোর বিশেষ বৈশিষ্ট্য।১৯২৮-এর অর্থনৈতিক মন্দার শুরু থেকেই এই বৈশিষ্ট্য প্রকটভাবে আত্মপ্রকাশ করে বাংলায়। গরীব চাষী আরও গরীব হল— তারা জমি বন্ধক রেখে বা বিক্রী করে বর্গাদারে পরিণত হতে থাকল দলে দলে। হাজার হাজার কৃষক, যুবকদের দ্বারা পরিচালিত কৃষক আন্দোলনে যুক্ত হতে শুরু করেন কিছু পাওয়ার আশায়। ১৯৩৬ সালের পর থেকেই খুলনা জেলায় এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে গ্রামে গ্রামে। এই সময় থেকে ১৯৪৬ সাল অবধি এই জেলায় পাঁচটি কৃষক সম্মেলন হয়েছে। ঐসব সম্মেলনের প্রধান বক্তা ছিলেন ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। সম্মেলনগুলিকে সাফল্যমণ্ডিত করার দায়িত্বে যারা থাকতেন তাদের মধ্যে চারুলতাদেবী অন্যতম। কয়েকটি সম্মেলনে বক্তৃতাও দিয়েছেন।

কৃষকদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে, চাষী বৌদের সাথে বসে ঘরের মানুষটি হয়ে তাদের সমস্যার কথা যেমন শুনতেন তেমনি তাদের মনোবল সৃষ্টি করে আন্দোলনে

যোগ দিতে সাহস যোগাতেন। তাঁর গতিবিধি ছিল অবাধ, তিনি ছিলেন সবার আপনজন, সবার 'মেজদি'। ১৯৪৬ সালের মৌভোগের প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলনের মন্ডপ নির্মাণ, কর্মীদের জন্য আবাসন এবং নদীর উপর পুল নির্মাণের দায়িত্বে ছিলেন চারুলতার স্বামী। এই সম্মেলন পরিচালনার মুখ্য দায়িত্বে ছিলেন চারুলতা নিজে। বাংলার কৃষক আন্দোলনে এই সম্মেলন চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে;— ঠিক এর পরেই বাংলার বহু স্থানে ব্যাপক আকারে তেভাগা আন্দোলন শুরু হয়েছিল— যার ইতিহাস সকলেরই প্রায় জানা।

পতিত জমি উদ্ধার করে চাষীদের মধ্যে বন্টন করার উদ্দেশ্যে জেলার বিভিন্ন স্থানে খাল কাটা এবং বাঁধ নির্মাণের কাজ কৃষকরা সমবেতভাবে শুরু করলে জমি বন্টনে বাধা দিলেন জমিদারগণ; শুরু হল গ্রামে গ্রামে অত্যাচার। 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির' সম্পাদিকা ছিলেন চারুলতাদেবী। তাঁরই নেতৃত্বে বহু গ্রামে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে উক্ত আন্দোলনে। কৃষকরা দল বেঁধে আসতেন শহরে নালিশ জানাতে, প্রতিবাদের জন্য— সেই মিছিলের নেতৃত্বেও দেখা যেত চারুলতাদেবীকে।

অন্যায়ভাবে জমিদাররা হাট থেকে 'তোলা' তুলতেন— ফকিরহাট ও ডুমুরিয়ায় এর বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হল। 'তোলা' বন্ধ করা গেল এই আন্দোলনের মাধ্যমে— এর সাথেও তিনি প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন।

১৯৪১ সালের পুলিশ রিপোর্টে বলা হয়েছে "কৃষক সমিতির মাধ্যমে.... খুলনা জেলায়.... সাম্যবাদী কার্যকলাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে.... জনপ্রিয় কার্যসূচী নিয়ে সাম্যবাদীরা কাজ করছেন.... যেমন উৎপন্ন ফসলে বর্গাদারদের বেশী ভাগ চাওয়া, কর্জ ঋণের সুদ না দেওয়া— লাঙ্গল যার জমি তার ধ্বনি দ্বারা কৃষকদের আকৃষ্ট করা"— আমাদের উপরিউক্ত আলোচনা এই মন্তব্যকে সঠিক বলে প্রমাণ করে।

চারুলতাদেবীর আর একটি বিশেষ পরিচয় ছিল— তিনি ছিলেন সেই যুগে খুলনা জেলার যুব কর্মীদের আশ্রয়স্থল। বহু মহিলা কর্মী তাঁর গৃহে অবস্থান করতেন নিজেদের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য আর প্রমথনাথ, ভবানী সেন সহ বহু তরুণ কর্মী তাঁর গৃহকে নিজেদের ঘাঁটি করেছিলেন পার্টির প্রয়োজনে। এমন অবারিতভাবে দ্বার খুলে রাখা বোধহয় আজকের দিনেও সম্ভব নয়।

আকাল আমাদের নিত্য সঙ্গী— কিন্তু এই আকাল ১৯৪৩ সালে ভয়ঙ্কররূপে দেখা দেয়। রিপোর্টের হিসাব অনুযায়ী পঁয়ত্রিশ লক্ষ লোক মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। সেই সময়ে কোন এক গৃহ বধূ নিজ গৃহ প্রাঙ্গণে দুধ বিতরণের মাধ্যমে সহস্র শিশু 'ও মায়ের প্রাণ রক্ষা করেছিলেন— সে হিসাব কিন্তু কোন রিপোর্টে পাওয়া যায় না— কিন্তু এত দুধ পাওয়া গেল কোথা থেকে?

চারুলতা "রেডক্রশের" দরজায় ধর্না দিয়ে সহস্র দুধের কৌটা সংগ্রহ করেছিলেন এবং অচিরেই শুরু করলেন ত্রাণ কার্য তাঁর গৃহ সংলগ্ন বৃহৎ প্রাঙ্গণে— একূল ওকূল দুকূল রক্ষা পেল— সংসারও রইল আবার দরিদ্র নারায়ণের সেবাও হল। তখন শহরে ও গ্রামে 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি' বহু লঙ্গরখানা ও মেডিক্যাল রিলিফ সেন্টার খোলে— এই বৃহৎ যজ্ঞ পরিচালনা করার কাজে নিজেকে তিনি সর্বদা নিয়োজিত রাখতেন। ন্যায্যমূল্যে বস্ত্রের দাবীতে সভা-সমিতি ও মিছিল বার করলেন— কর্তৃপক্ষ বাধ্য হলেন শাড়ি, কম্বল ইত্যাদি দিতে অর্থাৎ বহুমুখী জন হিতকর কার্যের সাথে তিনি ছিলেন সর্বদা যুক্ত।

খুলনা জেলায় মধ্যবিত্তের জমিতে লগ্নী করার প্রবণতা ছিল কারণ এতে ঝুঁকি থাকত খুবই কম। ফলে খুলনা শহরের সাধারণ মানুষের সাথে কৃষকদের অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছিল গভীর, তাছাড়া বেশীরভাগ গ্রামের জমিদাররাও খুলনা শহরে বসবাস করতেন; সুতরাং কৃষকদের সাথে এই গৃহবধূর ওঠাবসা শহরের মানুষেরা সুনজরে দেখতেন না। অনেক সময় তাঁর যাতায়াতের পথে বাধা সৃষ্টি করার জন্য পুলিশের সহায়তায় ১৪৪ ধারা জারি করা হত — কিন্তু চারুলতাদেবীর পথ রুদ্ধ করা যায়নি— সাফল্যের সাথে এগিয়ে গেছেন তিনি তাঁর চলার পথে।

তাঁর বাড়ীর পরিবেশও এই সব ধরনের ক্রিয়াকর্মের পক্ষে অনুকূল ছিল না। হবেই বা কি করে? বাড়ীর বৌ দিন নেই রাত নেই গরীব চাষীদের সাথে রাস্তায় রাস্তায় মিছিল ও সভা সমিতি করে বেড়ায়, ফলে রক্ষণশীল পরিবারের সম্মান ধূলায় লুটিয়ে যায় না কি? এ কাজে চাকচিক্যও নেই — অথবা অকস্মাৎ আবেগ দ্বারা পরিচালিত হওয়ার ব্যাপারও নয়— মিছিল বা পিকেটিং করে জেল ভরার আন্দোলনও নয়। যে মহিলাকে পাড়া প্রতিবেশী অতি সাধারণ— গৃহবধূরূপে ঘোমটা মাথায় সংসারের কাজ করতে দেখেন সেই মহিলাই জমিদারের লাঠিয়াল— দারোগা—পুলিশ সব কিছু অগ্রাহ্য করে নেতৃত্ব দেন হাজার হাজার কৃষকদের— সত্যিই বিস্ময় জাগে আমাদের আজও, আর তখনকার দিনে তো বটেই।

১৯৩৯ সালে সুভাষ বসু ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন করলেন— ত্যাগ করলেন কংগ্রেস। এই সময় খুলনা শহরের সমাবেশে তার ভাষণে দেশের তরুণদের প্রতি আহ্বান ছিল—"দেশের ছাত্র সমাজ এগিয়ে আসবেই"। সুভাষ বসুকে অভ্যর্থনা জানানোর পূর্ণ দায়িত্বে ছিলেন চারুলতাদেবী। এই নেতার খুলনায় আগমন ছাত্র ও যুব কর্মীদের বিশেষভাবে উদ্দীপিত করেছিল— চারুলতাদেবীও তাদের মধ্যে একজন।

বয়সের ভারে যখন গৃহবন্দী হয়ে পড়েছিলেন তখন স্মৃতিচারণ করার সময় বলতেন, "কৃষকদের সাথে কাজ করার জন্যে আমি নিন্দিত হতাম। কিন্তু

আমার ভগবান তো ছিলেন ওই দরিদ্র নিরন্ন মানুষেরা। 'শিব জ্ঞানে জীব সেবা' কর্মক্ষেত্রে নেমে মনে হত সেই বাণীকেই কর্মে রূপ দিচ্ছি। আপন করে ভাবতে পারলে পরও আপন হয় তাই গ্রামের মানুষেরা আমার কাছে পর ছিল না। এই আপন বোধ এখন আর নেই তাই নেতারাও অসহায়বোধ করেন এবং তাদের অনুগামীরাও কোন সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজে পান না।"

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষে সমগ্র দেশে শুরু হল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা— নেমে এল মানুষের জীবনে অনিশ্চয়তা। দেশের ভবিষ্যৎ কি? আরও দুর্দিন নেমে এল ভারত ভাগের ফলে। তাঁর নিজে জীবনেও দেখা দিল ভারত ভাগের যন্ত্রণা। ছিন্নমূল হয়ে কলকাতায় এলেন। নেতৃত্ব দেবার সকল যোগ্যতাই তাঁর ছিল কিন্তু কালের গতির সাথে চলতে হলে কিছু আদর্শ বর্জন ও গ্রহণের প্রয়োজন থাকে— সেই আপোষ তাঁর করা সম্ভব হয়নি। তাই ভারত বিভাগের পর নেতৃত্ব থেকে সরে গিয়েছিলেন।

১৯৮৬ সালে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি আমন্ত্রণ জানিয়ে সে দেশে চারুলতাদেবীকে বিশেষ সম্মানে ভূষিত করেন। ১৯৯৪ সালের জানুয়ারী মাসে তাঁর প্রয়াণ হয়েছে।

সূত্র নির্দেশ

যশোহব খুলনাব ইতিহাস— সতীশচন্দ্র মিত্র
স্বাধীনতা সংগ্রামে খুলনা— অজিতকুমার নাগ
ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামে যশোর ও খুলনা— সুকুমার মিত্র সম্পাদিত
আধুনিক ভারত ঔপনিবেশিকতাবাদ ও জাতীয়তাবাদ— বিপান চন্দ্র
ভারতে কৃষি সম্পর্ক— সুনীল সেন (ভাষান্তর—ছায়া দাশগুপ্ত)
Peasants' Struggles in India—Edited by A.R. Desai
স্বামী বিবেকানন্দ— ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত
কপোতাক্ষ— ১৯৯৪ সংখ্যা

সাক্ষাৎকার— প্রবন্ধটি রচনা করার উৎসাহ ও সহযোগিতা পেয়েছি প্রধানত রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য স্বর্গীয় অধ্যাপক দেবীপদ ভট্টাচার্যের কাছ থেকে। তিনি তদানীন্তন কালে দৌলতপুর কলেজের ছাত্র আন্দোলন ও ছাত্র ফেডারেশনের সক্রিয় কর্মী হিসাবে চারুলতাদেবীর সাথে পরিচিত হন। ১৯৮৬ সালে এক সাক্ষাৎকারে অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য তিরিশ ও চল্লিশ দশকে কৃষক ও ছাত্র আন্দোলনে চারুলতাদেবীর অবদান সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্যের উল্লেখ করেন— যেগুলি যাচাই করার সুযোগ পেয়েছি তাঁরই সমসাময়িক অন্যান্য সুধীজনের স্মৃতিচারণা দ্বারা— যাঁদের অনেকেই এখনও এদেশে আমাদের মাঝে আছেন।

মিয়াংমায় মুসলমান জনগোষ্ঠীর অভিবাসন —প্রথমপর্ব (খ্রীঃ নবম—ষোড়শ শতাব্দী)

স্বপ্না ভট্টাচার্য (চক্রবর্তী)

মিয়াংমায় মুসলমান জনগোষ্ঠীর অভিবাসন বিষয়টি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইতিহাস গবেষণায় প্রায় উপেক্ষিতই বলা যায়। তবে বর্মার অর্থাৎ আধুনিক মিয়াংমার* ইতিহাসই যে ক্ষেত্রে উপেক্ষিত, সে ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই বিশেষ জনগোষ্ঠীর ইতিহাসও উপেক্ষিত হবে; এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। বর্মার মুসলমান জনগোষ্ঠীর অভিবাসনেব ইতিহাস ভারতীয় ইতিহাসের সঙ্গে বিশেষ ভাবে জড়িত; অনেক মুসলমান বণিকরাই গিয়েছিলেন ভারতবর্ষের বিভিন্ন শহর থেকে, বিশেষত উপকূলবর্ত্তী বন্দর-শহরগুলি থেকে। এছাড়াও সবাসরি পারস্য ও আরবদেশ থেকে জাহাজ আসত বর্মায়, বিশেষত নিম্নবর্মার উপকূলবর্ত্তী অঞ্চলে। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় ইসলামধর্মের প্রচার ও প্রসারে সামুদ্রিক বাণিজ্যের যে ভূমিকা, সেই ভূমিকা বর্মাতেও পালন করেছিলেন মুসলমান বণিকরা। আরব, পারস্য ও ভারতের উপকূল থেকে যে মুসলমান বণিকরা বর্মায় আসতেন তাঁরা অনেকক্ষেত্রেই পূর্বপরিকল্পনা ছাড়াই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে দিতেন নিম্নবর্মার পেগুতে, তেনাসেরিমে ও আরাকানে। ঐতিহাসিক মশে ইয়েগার[১] মনে করেন যে, জলপথে পথভ্রষ্ট হয়ে তাঁরা বর্মার উপকূলে জাহাজ নঙ্গর করতে বাধ্য হতেন। তাঁদের প্রকৃত গন্তব্যস্থল হয়তো ছিল দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার অন্য কোন দেশ অথবা চীন। কিন্তু তাঁরা পরিকল্পনা ত্যাগ করে বর্মাতেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। বিবাহ করেন এবং এইভাবে নতুন প্রজন্মের সৃষ্টি হয়। বলা বাহুল্য এই নতুন প্রজন্মের ধর্ম হয় 'ইসলাম'। প্রবন্ধের মূল অংশ থেকে দেখা যাবে যে, পাগান যুগেও (একাদশ—ত্রয়োদশ শতাব্দী) নিম্নবর্মায় মুসলমান জনগোষ্ঠীর আনাগোনা ছিল। অতএব বৌদ্ধধর্মের আধিপত্য মেনে নিলেও একথা আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে পাগান সাম্রাজ্যের সাধারণ জনগণের একটি অনতি নগণ্য অংশ ছিল 'বিদেশী', যাদের চিহ্নিত করতে বর্মীরা 'কালা' শব্দটি ব্যবহৃত করেছেন। এই কালাদের একটি অংশ নিশ্চই ছিল বণিকরা, যাঁরা আসতেন পারস্য, আরব,

* প্রাচীন ইতিহাস এই প্রবন্ধের বিষয় ব'লে 'বর্মা' নামটিই ব্যবহৃত হয়েছে।

শ্রীলঙ্কা[৩] ও ভারত থেকে। বর্মায মুসলমান জনগোষ্ঠীব অভিবাসনের ইতিহাসের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত পূর্বের সমুদ্রে বাণিজ্যরত মুসলমান বণিকদের ইতিহাস। যে কযেকজন ঐতিহাসিক এই বিষযটি নিয়ে কাজ করেছেন তাদের মধ্যে আছেন সিদ্দিক খান[৩], হাদি হাসান[৪] ও আধুনিক যুগে মশে ইযেগার[৫]। যদিও রাধাকুমুদ মুখার্জি[৬] তাঁর 'ইণ্ডিয়ান শিপিং' গ্রন্থে সমুদ্রপথে বাণিজ্য নিয়ে আলোচনা করেছেন, কিন্তু বর্মার বিষযে তেমন কিছু আলোচনা এই গ্রন্থে নেই।

নিম্নবর্মার বন্দরগুলির ইতিহাস নিযে গবেষণার প্রয়োজন আছে। দুর্ভাগ্যের বিষয আধুনিক ভারতীয ঐতিহাসিকরা এ বিষয়ে তেমন উৎসাহ বোধ করেন না। বা শিন[৭] নামক এক বিখ্যাত বর্মী ঐতিহাসিকের মত এই যে দশম শতাব্দীর পূর্বে বর্মায মুসলমান বণিকদের যাতাযাত ছিল না। তাঁর মতে দশম শতাব্দী বা তাব পূর্বে আরব ও পারস্যের বণিকরা সুমাত্রার উত্তরে যেতেন বটে, তবে আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জই ছিল উত্তরের সীমানা, তার উপরে অর্থাৎ নিম্ন বর্মা অবধি যেতেন না। ডি.জি.ই. হলের[৮] গবেষণাতেও দশম-একাদশ শতাব্দীতে বর্মায় মুসলমান অভিবাসনের কোন তথ্য মেলে না। প্রধানত মশে ইয়েগার এবং সিদ্দিক খানের লেখার উপর ভিত্তি করে আমরা অনায়াসে দশম-একাদশ শতাব্দীব পূর্বেও বর্মায মুসলমান জনগণের অভিবাসনের সত্যতা প্রমাণ করতে পারি।

সিদ্দিক খান[৯] মনে করেন যে দাক্ষিণাত্যের বিজয়নগর সাম্রাজ্য ও পেগুর (সংস্কৃত : হংসাবতী) মধ্যে সম্পর্ক ছিল। এই যোগাযোগের সূত্র ছিল সামুদ্রিক ব্যবসা। সিদ্দিক খান অবশ্য বর্মী রাজবংশাবলীর বা ক্রনিকলের উল্লেখ করেও আদিপর্বে বর্মায মুসলমান নাবিকদের আগমনের কথা উল্লেখ করেছেন। এরকম দুজন নাবিক ছিল রিয়াটভি ও রিয়াট্টা। তারা সমুদ্র পার হয়ে নিম্নবর্মায় এসেছিলেন। প্রথমজন ঘটনা চক্রে নিহত হন। দ্বিতীয় জনের দুই পুত্র সোয়েপ্যিজি এবং সোয়েপ্যিঙ্গে[১০] ছিলেন পাগানের রাজা অনহ্রথের (সংস্কৃত : অনিরুদ্ধ) সভাসদ। রাজার আদেশে এই দুই আরবজাতি বর্মীকে উত্তর বর্মায় এক যুদ্ধে অভিযানে যেতে হয়। ফেরার পথে একস্থানে রাজার আদেশে এই দুই ভ্রাতাকে একটি প্যাগোডা তৈরী করার কাজে আত্মনিয়োগ করতে হয়। এই কাজে তাদের আপত্তি থাকে। সেই আপত্তি প্রকাশ করলে তাদের হত্যা করা হয়। এই ঘটনার সত্যি-মিথ্যের মধ্যে প্রবেশ না করেও একটি ঘটনার কথা আমাদের স্মরণ রাখতে হয় যে, আজও এই অঞ্চলে একটি বিশেষ দিনে এই দুই ভ্রাতার স্মৃতিতে বৌদ্ধবর্মীরাও শূকরের মাংস স্পর্শ করেন না। সিদ্দিক খান[১১] মনে করেন যে অনহ্রথের (খ্রীঃ ১০৪৪—১০৭৭) দেহরক্ষীদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন ভারত থেকে আগত মুসলমান। সৈন্যদলেও অনেক মুসলমান সৈন্য ছিল। রাজা অনহ্রথের পুত্র সোজুর

(আঃ ১০৭৭—১০৮৮) একজন গৃহশিক্ষক ছিলেন আরবদেশীয় মুসলমান। সোলুর সিংহাসনে আরোহণ করে ঐ আরব শিক্ষকের পুত্র রহমান খানকে পেগুর গভর্ণর হিসাবে নিয়োগ করেন। রহমান খান বিদ্রোহ করেন, রাজাকে বন্দী করেন এবং হত্যা করেন। তারপর পাগান অধিকার করার জন্য অগ্রসর হন। এই সময়ে সোলুর ভ্রাতা ক্যানসিদ্ধ (সংস্কৃত ঃ জ্ঞানসিদ্ধ) রহমানকে হত্যা করেন।[১২] এতৎ সত্ত্বেও মনে করা হয় যে[১৩] জ্ঞানসিদ্ধের সময়কাল (খ্রীঃ ১০৮৪ থেকে ১১১২) থেকেই বর্মার অভ্যন্তরে মুসলমান জনবসতি গড়ে উঠতে থাকে। এই জনগোষ্ঠীর মধ্যে এক বিশেষ অংশ ছিল যুদ্ধবন্দীরা। এই যুদ্ধবন্দীদের দেশের বিভিন্ন আভ্যন্তরীণ অঞ্চলে পাঠানো হত। অনেক সময় তারা অকর্ষিত জমি চাষ করতেন। এইভাবে তারা দেশজ জনগোষ্ঠীর সঙ্গে মিশে যেতেন। বর্মার ক্ষেত্রে এই মিশে যাওয়াটা আরও সহজ হয়েছিল যে কারণে, তা হল বর্মার ক্ষীণ জনসংখ্যা। এছাড়াও ভৌগোলিকভাবে বর্মা ছিল ভারতবর্ষ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশগুলিব মধ্যে অবস্থিত। দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার বন্দরগুলির মধ্যে যে জাহাজগুলি চলাচল করত তাদের কাছে বর্মা ছিল অতি পরিচিত দেশ।

আমরা পূর্বেই হাদি হাসানের[১৪] গ্রন্থের উল্লেখ করেছি। এই গ্রন্থের একটি স্থানে তিনি উল্লেখ করেছেন পারস্যের পর্যটক মুকাদ্দসির। এই পর্যটকের বর্ণনা[১৫] জানা যায় যে ছত্রিশ (৩৬) প্রকার জাহাজ চলাচল করত পূর্ব থেকে পশ্চিমের সমুদ্রে। এই জাহাজগুলির মধ্যে দুটির নাম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে—প্রথমত 'জিরবাদিয়া' এবং দ্বিতীয়ত 'বর্মা'। 'জিরবাদিয়া' শব্দটি[১৬] পারসী শব্দজাত, এই শব্দটি এখনও মিশ্রবিবাহজাত মুসলমান জনগোষ্ঠীকে বুঝাতে ব্যবহার করা হয়। মুকাদ্দসি যখন দশম শতাব্দীতে এই শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন, তখন এর অর্থ ছিল ভারতের পূর্বের দেশগুলি[১৭] —বিশেষত মলাক্কা, সুমাত্রা, তেনাসেরিম, বেঙ্গল, মার্তাবন এবং পেগু। দ্বিতীয় যে জাহাজের নাম মুকাদ্দসি করেছিলেন সেগুলি হয়তো কেবল যেতো বর্মা অবধি। হাদি হাসান তার মূল্যবান গ্রন্থে পারস্যের বণিকদের বাণিজ্যিক তৎপরতা ও নাবিকদের জলপথের চলার দক্ষতা—উভয়েরই বিস্তৃত বর্ণনা করেছেন। প্রাচীন বাংলা যাকে তিনি 'বেঙ্গালা'[১৮] বলেছেন, সেখানে বাস করতেন আরব, পারস্য ও ভারতবর্ষের ধনাঢ্য বণিক। তাদের জাহাজগুলি করমণ্ডল, মালাবার, বোম্বেতে যেমন যেত তেমনি যেত বর্মার তর্ণসরী (তেনাসেরিম ও পেগুতে)। পেগু থেকে আসত চিনি, লাক্ষা, রুবি। পেগুতে আমদানী হত কার্পাস, রেশম বস্ত্র, তামা এবং ঔষধপত্র। যেহেতু জলপথে বর্মীরা তেমন দক্ষ ছিলেন না। এই ব্যবসায় যারা নিযুক্ত ছিলেন তারা ছিলেন পেগুর মুসলমান জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত। মুকাদ্দসি ছাড়াও মশে ইয়েগার[১৯]

আরও দুজন পর্যটকের নাম করেছেন। যাদের বর্ণনায় নিম্নবর্মার উল্লেখ আছে। এরা হচ্ছেন ইবন খরদাবেগ এবং সুলেমান। দুজনেই নবম শতাব্দীর লোক। প্রথমজন ছিলেন পারস্যের এবং দ্বিতীয়জন ছিলেন আরবের। আরও একজন পারস্যের পর্যটক[২০] যিনি নিম্নবর্মায় এসেছিলেন, তিনি ছিলেন দশম শতাব্দীর ইবন-আস-ফাকি।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে (আঃ ১২৭৭) বর্মা-চীন সীমান্তে মুসলমান আক্রমণ হয়। কুবলাই খানের যে সৈন্যদল বর্মার উপর অভিযান চালান, তারা ছিলেন তুর্কী মুসলমান। এই দলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন নাসিরুদ্দীন, যিনি ছিলেন বর্মার উত্তরে চীনের দক্ষিণে যুনান প্রদেশের গভর্ণর। এই মুসলমানদের অভিযান অবশ্য বর্মার ইতিহাসে তেমন ছাপ ফেলেনি।[২১] পাগানের পতন হলে বর্মার গুরুত্ব কখনও কমেনি। পঞ্চদশ-ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে আবার আসতে শুরু করেন ইউরোপীয় ও রুশ পর্যটকরা, এদের মধ্যে আছেন আথানাসিউস নিতিকিন[২২] (রুশ), বালফ্ ফিচ (ইংরেজ), দুয়ার্তে বারবোসা (পোর্তুগীজ)। এর মধ্যে বারবোসা অবশ্য ভারতে এসেছিলেন (খ্রীঃ ১৫০১—১৫১৬), কিন্তু তিনি ভারত ও পেগুর মধ্যে ব্যবসার বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে বহু জাহাজ চীন থেকে মলাক্কা, সুমাত্রা, পেগু, বেঙ্গল, শ্রীলঙ্কা হয়ে লোহিত সাগরে চলে যেত। অন্য দিকে নিতিকিন (খ্রীঃ ১৪৭০) পেগুকে বর্ণনা করেছেন এমন একটি বন্দর শহর হিসাবে যেখানে বাস করত 'ইণ্ডিয়ান ডারভিস'রা। মশে ইয়েগার মনে করেন ডারভিস শব্দটির দ্বারা মুসলমানদেরই বোঝানো হচ্ছে। আবার ইংরেজ পর্যটক ফিচ (খ্রীঃ ১৫৮৬—৮৭) বর্ণনা করেছেন দেলা, সিরিয়াম এই দুটি বন্দর শহরের। এই দুটি শহররের বর্ণাঢ্যতায় তিনি চমৎকৃত হয়েছিলেন। দেলা শহর সম্বন্ধে তিনি বলেছেন[২৩] যে একদিকে মক্কা ও অন্যদিকে মলাক্কা—দুদিকেই জাহাজ যেত দেলা থেকে। সিরিয়াম শহরের বিভিন্ন স্থানে এখনও মুসলমান অধ্যুষিত গ্রাম দেখা যায়, যে গ্রামের অধিবাসীদের পূর্বপুরুষরা এই সমুদ্রপথে বাণিজ্য করতেই বর্মায় এসেছিলেন।

ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে নিম্নবর্মার বেসিম শহরের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায় বন্দর হিসাবে। মক্কায় রপ্তানি হয় কাঠ। কাঠ রপ্তানি ছাড়া নিম্ন বর্মায় সিরিয়াম, রেঙ্গুন ও দেলার গুরুত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে জাহাজ শিল্পকেন্দ্র হিসাবে। এই সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয় পর্তুগীজদের বঙ্গোপসাগরে তৎপরতা, আরাকানীয়দের সঙ্গে পর্তুগীজদের আঁতাত। ইউরোপীয় বাণিজ্যিক তৎপরতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। মুসলমান বণিকদের সঙ্গে ইউরোপীয় বণিকদের প্রতিদ্বন্দ্বিতাও বাড়তে থাকে। এই সময়ের ইতিহাস এখনও অনেকটাই অজ্ঞাত। পরবর্তীকালে নিশ্চয়ই গবেষকরা

এই যুগের ইতিহাস নিয়ে চিন্তা করবেন। তখন আমরা বিশদভাবে জানতে পারব ইউরোপীয় বণিকদের সঙ্গে মুসলমানবণিকদের সাক্ষাৎ ও সংঘাতের কাহিনী।

গবেষণার এবং তথ্যের স্বল্পতার কথা ছেড়ে দিলেও আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে বর্মার আদিপর্বের ইতিহাসেও মুসলমান নাবিক, বণিক ও অন্যান্য বৃত্তিধারী জনগণের বিশেষ ভূমিকা ছিল। আমরা এই প্রবন্ধে মূলত আরব-পারস্য ও বর্মার আকর গ্রন্থগুলির কথা আলোচনা করলাম। চৈনিক ভ্রমণকারীদের বৃত্তান্তেও নিম্ন বর্মার উল্লেখ আছে, এই দেশকে তারা 'পিয়াও' বলতেন। এই আকর গ্রন্থগুলিতেও নিম্নবর্মার বন্দরশহরগুলি জনগণের সমৃদ্ধির খবর পাওয়া যায়। এই জনগণের জীবনযাত্রা সম্বন্ধেও বিস্তাবিত জানার প্রয়োজন আছে। কারণ এই জনগণের এক বিরাট অংশ ছিল বহিরাগত। সমুদ্রপথের ইতিহাসের (ম্যারিটাইম হিস্ট্রি) গবেষণা জনপ্রিয় হলে বর্মার এই আদিপর্বে মুসলমান জনবসতির অভিবাসনের ইতিহাস সমৃদ্ধ হবে। নিম্নবর্মার আরাকান প্রদেশের ইতিহাস আমরা কিছুটা জানি কিন্তু আলোচিত অন্যান্য স্থানের ইতিহাস এখনও অস্পষ্ট।

সূত্র নির্দেশ

১. মশে ইয়েগাব, দ্যা মুসলিমস্ অফ্ বার্মা, ভিসবাডেন ১৯৭২, পৃ. ৬
২. এই বাণিজ্যজালে শ্রীলঙ্কাব গুরুত্বও কম নয়। দ্রষ্টব্য, আন্দ্রে ভিঙ্ক, আল্ হিন্দ্, দিল্লী, ১৯৯০, পৃ. ৮১
৩. সিদ্দিক খান, মুসলিম ইন্টারকোর্স উইথ বার্মা, ইসলামিক কালচার, দশম খণ্ড (১৯৩৬) পৃ. ৪০৯—৪২৭
৪. হাদি হাসান, এ হিস্ট্রি অফ্ পার্সিয়ান নেভিগেশন, লণ্ডন, ১৯২৮
৫. মশে ইয়েগাব, পূর্বোক্ত
৬. রাধাকুমুদ মুখার্জি, ইণ্ডিয়ান শিপিং, লণ্ডন, ১৯১২
৭. বা শিন-এর অপ্রকাশিত প্রবন্ধ "কামিং অফ্ ইসলাম টু বার্মা, ডাউন টু ১৭০০ এ.ডি."। এর উল্লেখ পাওয়া যাবে মশে ইয়েগাবের গ্রন্থে (১৯৭২), পৃ. ৩
৮. ডি.জি.ই. হল, এ হিস্ট্রি অফ্ সাউথ-ইষ্ট এশিয়া, ম্যাকমিলন, লণ্ডন, ১৯৮৭, (প্রথম প্রকাশ ১৯৫৫)
৯. সিদ্দিক খান (১৯৩৬), পৃ. ৪১০
১০. গ্লাস প্যালেস ক্রনিকল অফ্ কিংস অফ্ বার্মা, সম্পাদনা পে মাউং টিন, লণ্ডন, ১৯২৮, পৃ. ৮১ (পর্ব ১৩৪)। ঐ গ্রন্থেই ৯৫ পৃষ্ঠায় 'কালা' শব্দটি দ্রষ্টব্য। বাংলাকে 'কালা'দের দেশ বলা হয়েছে (পর্ব ১৩৪)।
১১. সিদ্দিক খান, (১৯৩৬), পূর্বোক্ত

১২. মশে ইয়েগাব, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩
১৩. মশে ইয়েগাব, পূর্বোক্ত পৃ. ৩
১৪. হাদি হাসান, পূর্বোক্ত
১৫. হাদি হাসান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩১
১৬. ১৮৯১ সালে বর্মাব প্রথম জনগণনাব (সেন্সাস) সময় "জিববাদি" শব্দটি ব্যবহৃত হয়। জিববাদি বলতে বোঝানো হতো সেইসব জনগণকে যাঁদেব পিতা ছিলেন "ভাবতীয়" মুসলমান এবং মাতা ছিলেন বৌদ্ধ বর্মী। এই শব্দেব বুৎপত্তিগত ব্যাখ্যা নিয়ে বিতর্কেব অবকাশ আছে। তবে শব্দটি যে পার্সী শব্দ "জিব বাদ" থেকে এসেছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই "জিব বাদ" শব্দটিব অর্থ হয় হাওয়াব উল্টোদিকে, অর্থাৎ পূর্বেব সমুদ্রে যেতে হাওযাব উল্টোদিকে যেতে হতো। ব্যাখ্যাব জন্যে দ্রষ্টব্য মশে ইযেগাব, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩
১৭. মশে ইযেগাব, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩—৩৪, পাদটীকা-৩
১৮. হাসি হাসান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৫
১৯. মশে ইযেগাব, পূর্বোক্ত, পৃ. ২
২০. মশে ইয়েগাব, পূর্বোক্ত, পৃ. ২
২১. মশে ইযেগাব, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩
২২. মশে ইয়েগাব, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪
২৩. মশে ইযেগাব, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪।

দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ঔপনিবেশিক সময়ে কৃষক-বিদ্রোহের তুলনামূলক আলোচনা

রঞ্জিত সেন

মোপলা বিদ্রোহ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে সুমিত সরকার লিখেছেন যে ইসলাম যে, কল্পান্তের আদর্শ দেয় হিন্দু কৃষকদের কাছে তা অনুপস্থিত হওয়ার দরুন তাদের বিক্ষোভ সাধারণভাবে সামাজিক ডাকাতির উপরে উঠতে পারেনি।[১] ভারতবর্ষের কৃষক আন্দোলন যে কোন পর্যায়ে মূলত প্রতিবাদের আন্দোলন—ক্ষমতার কাঠামোকে ভেঙ্গে ফেলার, সমাজকে বদলে দেওযাব আন্দোলন নয়। ১৯২৭ সালে হুনান (Hunan) অভ্যুত্থানের সময়ে ক্ষমতার কাঠামোকে ভেঙ্গে ফেলার একটা চেষ্টা দেখা দিয়েছিল। মাও-সে-তুং লিখেছিলেন : "আসল কথাটা হল বিরাট জনগণ তাদের ঐতিহাসিক উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করার জন্য জেগে উঠেছে। গ্রামের সামন্ততন্ত্রকে উল্টে দেওয়ার জন্য গ্রামের গণতন্ত্র উঠে দাঁড়িযেছে।"[২] সমাজ বদলের একটা ছবি আমাদের দিয়েছিল ১৯৩০ সালের ভিয়েতনামের কৃষক আন্দোলন।[৩] সেখানে তারা গ্রামে ও শহরে আমলাদের করায়ত্ত সমস্ত সম্পত্তির পুনর্বণ্টন দাবী করেছিল। সম্পত্তির সার্বিক পুনর্বণ্টন সমাজ পরিবর্তনের দিকে বড় মাপের বৈপ্লবিক পদক্ষেপ। ভারতবর্ষের কোন কোন কৃষকবিদ্রোহ ক্ষুদ্র লক্ষ্য দিয়ে শুরু করে শেষ পর্যন্ত হয়ত বৃহত্তর লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হয়েছে, কিন্তু কোথাও তার দ্বারা সমাজের বড়মাপের পরিবর্তন সাধিত হয়নি। বারাসতের তিতুমীরের বিদ্রোহ কিংবা মালাবারের মোপলা বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল প্রধানত জমিদার বিরোধী বিদ্রোহ হিসাবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের পরিণতি ঘটল ব্রিটিশ রাজ-বিরোধী আন্দোলন হিসাবে। আবার ফরাইজি ও নীলচাষীদের বিদ্রোহ শুরুতে ছিল প্লান্টার সাহেবদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। কিন্তু তা মোড় ঘুরে হয়ে গেল কৃষক শোষণকে বন্ধ করার জন্য জমিদার বিরোধী আন্দোলন। ১৮৩২ সালে কোল বিদ্রোহের সময়ে আক্রমণের লক্ষ্যে যারা ছিলেন তাদের মধ্যে জমিদার ও মহাজনরাও ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি করে তা হয়ে গেল কোম্পানী বাহাদুরের সরকারের বিরোধী আন্দোলন? আবার

বিরশা মুণ্ডাব বিদ্রোহের আসল লক্ষ্যও ছিল ইংরাজ শাসন থেকে মুণ্ডাদের মুক্ত কর'। অথচ তাদের আক্রমণের মূল আঘাত গিয়ে পড়ল বেনিয়া ও মহাজনদের উপব।' ত'হলে কি ব্যাপারটা এই রকম নয় যে প্রত্যেক কৃষক-আন্দোলনে কাছেব শত্রু আব দূরের শত্রু, প্রত্যক্ষ দাবী ও পরোক্ষ দাবী, নিশ্চিত লক্ষ্য ও অনিশ্চিত লক্ষ্য, দৃশ্যমান প্রতিপক্ষ আর অদৃশ্য প্রতিপক্ষ এক হয়ে যাচ্ছে? তাহলে কেন আমরা ভারতের কৃষক বিদ্রোহগুলিকে 'Primitive', 'Millenalian', 'primary', 'secondary'— এই বিশেষণগুলির দ্বারা চিহ্নিত করি, তাদের চরিত্রকে বেঁধে দিতে চাই? ভারতবর্ষের প্রত্যেক কৃষক বিদ্রোহই গ্রাম থেকে উত্থিত, প্রত্যেক বিদ্রোহের লক্ষ্য এক পর্যায়ে জমিদার-মহাজন ও অন্য পর্যায়ে উচ্চতর বাষ্ট্রশাসন এবং প্রত্যেক বিদ্রোহই কোন না কোন সময়ে ধর্ম, কল্পান্তের আদর্শ, স্বাধীনতাব স্বপ্ন, আর্থ-রাজনৈতিক নিষ্পেষণ থেকে মুক্তির বাসনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয। একটিব থেকে অন্যটির চরিত্রগত প্রভেদ কিভাবে রচিত হবে?

দক্ষিণ-পূর্ব এশিযার বিভিন্ন কৃষক আন্দোলনের রকমভেদ (type) এবং ক্রমকাঠামো (hierarchy) আলোচনা করেছেন হ্যারি বেণ্ডা (Harry Benda)[৫]। তাঁর নিরিখ এই রকম। এক ধরনের কৃষক আন্দোলন আছে যা গ্রামভিত্তিক (rural-based), পিছন-দিকে-ফিরে-থাকা (backward looking), সংগঠনহীন (lacking organization), স্বতঃস্ফূর্ত (spontaneous) এবং যুক্তি বা বিচাররহিত (irrational)। এইগুলি হল কৃষকদের আদিম অভ্যুত্থানের চিহ্ন। এর উদাহরণ হল ১৮৯০-এর দশকে জাভাব সামিন আন্দোলন (Samin Movement)। এর বিপরীত দিকে আছে ১৯৩০-এর দশকে মধ্য লুজানের (Luzon) সাক্দল আন্দোলন (Sakdal Movement)। এটাই হল প্রগতিশীল আন্দোলন। তার চিহ্ন হল তা অতীত অভিসারী নয়, বরং সম্মুখ-বিস্তারী, অতএব প্রগতিশীল (Progressive) সংগঠিত (organized), সচেতনভাবে রাজনৈতিক (consciously political) কিছুটা শহরের অভিমুখী। দ্বিতীয় আন্দোলনের নেতৃত্বে থাকে শিক্ষিত ও জাতীয়তাবাদী নেতা, তার থাকে একটা দলের কাঠামো (party structure) এবং তার লক্ষ্য হল পরিচ্ছন্নভাবে স্বাধীনতা (a distinct independence goal)। প্রগতিশীল আন্দোলনের ক্ষেত্রে বেণ্ডা শিক্ষিত নেতা, দল-সংগঠন বা পার্টি-স্ট্রাকচার, শহরের সংযোগ, স্বাধীনতা-নামক সুস্পষ্ট রাজনৈতিক লক্ষ্য ইত্যাদির কথা যেভাবে বলেছেন ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলিকে সেইভাবে আলোচনার উপাদান ধরে কৃষকবিদ্রোহের চরিত্র নির্ধারণ করা কঠিন। বরং নৃতাত্ত্বিক ক্যাথলিন গাফ (Kathleen Gaugh) অনেক বাস্তবধর্মী আলোচনা করেছেন কৃষকবিদ্রোহ নিয়ে। দক্ষিণ এশিয়ার ৭৭টি বিদ্রোহের একটি তালিকা তৈরী করে তিনি দেখিয়েছেন যে বিদ্রোহগুলির মোটামুটি পাঁচটি রকমভেদ আছে। এইগুলি হল—প্রত্যাবর্তনধর্মী

(restoretive), ধর্মীয় (religious), সামাজিক ডাকাতি (social banditry), প্রতিহিংসামূলক সন্ত্রাসবাদী (terrorist vengeance) এবং সশস্ত্র অভ্যুত্থান (armed insuerection)।[৬]

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ক্ষেত্রে বেণ্ডা বা দক্ষিণ এশিয়ার ক্ষেত্রে ক্যাথলিন গাফ যেভাবে কৃষক বিদ্রোহের রকমফের আলোচনা করেছেন তার থেকে এই দুই অঞ্চলের কৃষকবিদ্রোহের তুলনামূলক আলোচনার কোন ছক তৈরী করা সম্ভব নয়। তা সম্ভব হয় যদি আমরা কৃষক বিদ্রোহের অন্তর্নিহিত উপাদানগুলিকে ধরি। ধরা যাক, একটি উপাদান হল হারিয়ে যাওয়া ব্যবস্থাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা যাকে বেণ্ডা বলেছেন পশ্চাৎগামী, গাফ বলেছেন প্রত্যাবর্তনধর্মী, আর এ্যাণ্ডারসন[৭] বলেছেন কল্পান্ত বিভোর (milenarian)। হৃতব্যবস্থাকে ফিরে পাওয়ার চেষ্টার মধ্যে থাকে নতুন ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠা করার স্বপ্ন। ১৮৫৭ সালে মহাবিদ্রোহের সময়ে মুঘল শাসনকে ফিরিয়ে আনার যে চেষ্টা তা হল ইংরাজ শাসনকে ভেঙ্গে ফেলারই অন্য নাম। যদি মুঘল শাসনের প্রত্যাবর্তনশীলতাকে লক্ষ্য ধরি তবে তাকে বলতে হয় অতীতমুখী, অনগ্রসর ব্যবস্থা। যদি ব্রিটিশ শাসনকে ভেঙ্গে ফেলার দিকটিকে ধরি তবে তা হয় প্রগতিশীল আন্দোলন—ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম। এই দুই দৃষ্টিকোণের কোনটা ঠিক? ১৮৫৭-র এইটিই ছিল সর্বশেষ আন্দোলন যেখানে হিন্দু-মুসলমান কাঁধে কাঁধ দিয়ে লড়াই করেছে। এটা কি যথেষ্ট প্রগতিশীলতা নয়? এক সময়ে মুঘল সম্রাট মারাঠাদের ছায়াছত্রের নীচে এসে নিজেকে গদীযান রাখতে পেরেছিলেন আর মারাঠারা অপরাজেয় থেকেও সম্রাটকে কুর্নিশ জানিয়েছিল। এতে কোন পক্ষই অপমানিত বোধ করেনি। সেই ঐতিহ্যের শেষ প্রকাশ ১৮৫৭ সালেই দেখা গিয়েছিল। তবে ১৮৫৭ তথাকথিত "প্রিমিটিভ" আন্দোলনগুলির সময়ের দিক থেকে সর্বশেষ সীমানা-নিশ্চিতির চিহ্ন কেন?

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ক্ষেত্রে গবেষকরা বলেছেন যে সেখানে কৃষকরা যত রকমের সংস্কৃতি ও যতরকমের ক্ষমতা কাঠামোর বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল প্রত্যেকটির বিরুদ্ধে তারা একটি প্রতি-সংস্কৃতি (counter culture), ক্ষমতার একটি প্রতি-কাঠামো (counter structure) গঠন করেছিল।[৮] এ-ধরনের গঠন সম্ভব হয়েছে ধর্মের মধ্য দিয়ে। এরকম ক্ষেত্রে ধর্ম হল দুর্বলের হাতিয়ার, অনগ্রসর মানুষের চিন্তাকে মেলে দেওয়ার প্রান্তর, প্রতিবাদীদের ঐক্যের মন্ত্র, নিপীড়িতদের মেরুদণ্ড সোজা করে ফিরে দাঁড়ানোর শপথ। তাকে প্রাক্ আধুনিক আখ্যা দিয়ে 'প্রিমিটিভ' এই বিশেষণের দ্বারা চিহ্নিত করার অর্থ কি? কোন বোধ প্রজন্ম-পরম্পরায়, যুগ-পরম্পরায়, এমনকি শতাব্দী-পরম্পরায় মানুষের কর্মপদ্ধতিকে আলোড়িত করতে পারে, তার মানে এই নয় যে তার দ্বারা আলোড়িত যে

কোন ঘটনাই হয়ে যাবে অতীতচারী—'প্রিমিটিভ'। রণজিৎ গুহ একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বুঝিয়েছেন। উদাহরণটি এইরকম। মাও-সে-তুং তাঁর হুনান রিপোর্টে বলেছেন : "যারা সবচেয়ে নীচের সারিতে ছিল তারা সবাইকে ছাড়িয়ে সবচেয়ে উপরের সারিতে উঠে এসেছে। একেই বলে সবকিছু উল্টে যাওয়া"।[৯] এই একই কথা বলা আছে সুপ্রাচীন এক খ্রীষ্টান বাণীতে : "যারা এইভাবে পৃথিবীটাকে উল্টে দিয়েছে তারা এখন সামনে এসে দাঁড়িয়েছে"।[১০] ১৫২৫ সালে এক জার্মান কৃষক ফৌজের নেতা একটি শহর দখল করে সেই শহরকে এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তাঁর কৃষক ফৌজকে তারা যেন সতর্কতার সঙ্গে সম্বোধন করে, না হলে "যারা একদম নীচে ছিল তারা একেবারে উপরে চলে আসবে।"[১১] দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অনেক কৃষক বিদ্রোহকে আমরা অনায়াসে 'প্রিমিটিভ', 'রেস্টোরেটিভ' ইত্যাদি বিশেষণের মধ্য দিয়ে চিহ্নিত করি, তখন ভুলে যাই যে প্রেরণাহীন পরিবর্তন-বিমুখ বর্তমানকে প্রগতির পথে ঠেলে দিতে হলে অতীতের ঐশ্বর্যভাণ্ডার থেকে নিতে হয় চলার রসদ।

প্রত্যেক দেশের এই রকম একটি ঐশ্বর্যভাণ্ডার হল তার ধর্ম। ভারতবর্ষের কৃষিবিদ্রোহের ক্ষেত্রে ধর্মকে আমরা খুব সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহার করি। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কৃষক-বিদ্রোহের সাম্প্রতিক গবেষণায় ধর্মকে অনেক ব্যাপক অর্থে বোঝানো হয়—ধর্ম সেখানে সংস্কৃতি ব্যবস্থা (cultural systems)। কেম্ব্রিজ ঐতিহাসিকরা দেখছেন যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় রাষ্ট্রগঠন প্রক্রিয়ায় যেমন ঠিক তেমনি রাষ্ট্রকে প্রতিরোধদানের প্রক্রিয়াতেও ধর্মের সমান ভূমিকা।[১২] অঞ্চল থেকে অঞ্চলে ধর্মের বিভিন্নতা সত্ত্বেও ধর্মের ভূমিকার পরিবর্তন হয়নি। থাই বৌদ্ধধর্ম ও ফিলিপিনো খ্রীষ্টধর্ম প্রায় একইরকমভাবে এমন এক ধর্মীয়-রাজনৈতিক ক্ষেত্র দিয়েছিল যেখানে শোষিতের পক্ষে রুখে দাঁড়ানো, বঞ্চিতের পক্ষে ঘুরে দাঁড়ানো, পতিতের পক্ষে ফিরে তাকানো সম্ভব হয়েছে।

ধর্ম রাষ্ট্রশক্তি ও গণশক্তি দুয়ের ক্ষেত্রে দুভাবে কাজ করে। রাজা ঈশ্বরের প্রতিভূ হন, ধর্মের মধ্য দিয়ে সমস্ত সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করে অখণ্ড শাসনের অটল মূর্তি হয়ে তিনি দাঁড়িয়ে থাকেন, সমস্ত সমাজের প্রণতি এসে পড়ে তার পায়ে। ইংল্যাণ্ডে অষ্টম হেনরী ও রাণী এলিজাবেথ এই প্রক্রিয়ায় প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মকে সামনে রেখে নিজের দেশের মানুষদের ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। শ্যাম দেশের রাজা মঙ্কুট ১৮৩৩ সালে থম্ময়ুত (Thammayut) আন্দোলন করে নিজের দেশের মধ্যে আধুনিকতার সূত্রপাত করতে চেয়েছিলেন। এটিকে বলা হয় ধর্মের ঐক্যাভিসারী প্রভাব (centralizing influence & religion)। ধর্মকে জনগণ অনেক সময়ে অন্যভাবে ব্যবহার করে। ব্রহ্মদেশে বৌদ্ধধর্ম ও ইন্দোনেশিয়াতে সারেকৎ ইসলাম অত্যাচারী ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় শাসনের শিকড়টি উপড়ে

ফেলতে চেষ্টা করেছিল। চীনের তাইপিং বিদ্রোহ, মালাবারের মোপলা বিদ্রোহ, কিংবা ব্রহ্মদেশের সায়াসান বিদ্রোহের ক্ষেত্রে ধর্ম গণশক্তির হাতিয়ার হয়ে উঠেছিল।

ধর্ম যখন কৃষক জনগণকে বিকল্প রাষ্ট্রশক্তি গঠনেব প্রেরণা দেয় তখন ধর্ম হয প্রগতিশীল আন্দোলনের অস্ত্র, ১৮৮৯ সালে শ্যামদেশের চিয়েংমাই অঞ্চলে কৃষক নেতা ফাযা ফাপের (Phaya Phap) বিদ্রোহ শোষণের পথে আধুনিক রাষ্ট্র গঠনের প্রচেষ্টাকে স্তব্ধ কবে শোষণহীন বিকল্প রাষ্ট্র গঠনের চেষ্টা করেছিল। চক্রি রাজাবা (Chakri Kings) যখন শ্যামদেশে . স্বাধিকার প্রমত্ত স্থানীয মণ্ডল শাসন ব্যবস্থা (Mandala Party) ধ্বংস করে ব্যাংককের কেন্দ্রীয আধিপত্য এবং আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রগঠনের চেষ্টা করছিলেন তখন সেখানকার পূর্বতন করদ রাজ্যগুলি (tributary states) এবং প্রায স্বশাসিত প্রদেশগুলির স্বাধীনতা লুপ্ত হয়। এদিকে ১৮৫৫ সালে বাওরিং চুক্তি (Bowring treaty) স্বাক্ষর করার ফলে দেশে বিদেশীদের প্রাধান্য বাড়তে থাকে এবং দেশের অর্থনীতির স্বয়ম্ভরতা কমে যায। বাষ্ট্রশক্তি তখন নিজেব আর্থিক স্বচ্ছলতাকে অক্ষুণ্ন রাখার জন্য গ্রামাঞ্চলে কৃষকদেব উপব বিপজ্জনক চাপ সৃষ্টি কবতে থাকে। এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁডিযেছিল ফাযা-ফাপ, আর তাকে মদত দিযেছিল অসংখ্য বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ও কৃষক। পুরো ব্যাপারটাই বৌদ্ধ ধর্মের চৌহদ্দির মধ্যে ঘটেছিল।

ধর্ম যেখানে বিজ্ঞান যুগের সঙ্গে আপোষ করতে পারে না সেখানে ধর্মমিশ্রিত কৃষক বিদ্রোহ বা জাতীযতাবাদী আন্দোলন হয়ে দাঁডায় অনগ্রসর। থাইল্যাণ্ডের ফুমিবান (Phumibun) আন্দোলন কৃষকদের অবৈজ্ঞানিক জীবনপন্থায় আশ্বস্ত করতে চেয়েছিল, ফলে তার সম্মুখ প্রসারের ক্ষমতা ছিল না। সেখানে ফুমিবান নামে গ্রামাঞ্চলের সন্ন্যাসীরা মানুষদের বোঝাতে শুরু করেছিল যে তাদের আলৌকিক ক্ষমতা রয়েছে যার দ্বারা তাঁরা সোনা-রূপাকে উপল বা নুড়িতে পরিবর্তিত করতে পারে। লাউকে করে দিতে পারে হাতী, কুমড়োকে ঘোড়া। জনগণের আনুগত্যকে তারা এমনভাবে কেড়ে নিতে শুরু করল যে তারাই হয়ে উঠতে লাগল এক একটি ক্ষুদে শাসক। সারা দেশে রাজকর্তৃত্ব কমে যেতে লাগল। জনগণ এতটাই বশীভূত হয়ে গিয়েছিল যে তারা ভাবতে লাগল যে ফুমিবানদের মন্ত্রবলে পুলিশ বা ফৌজের গুলি রূপান্তরিত হবে ফুল বা ফুলের মালায়।[১৩] এইরকম নির্বোধ বিশ্বাস থেকে আত্মবিসর্জন দিয়েছিল ভারতবর্ষে বিরশা মুণ্ডার সমর্থকরা। তারা ভেবেছিল যে ধর্মবিশ্বাসের ফলে তারা বন্দুকের গুলিকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে পারবে। এ বিশ্বাসের পরিণাম শুভ হয়নি।

আসলে উনিশ শতক ও বিশ শতকে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে কৃষক ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ক্ষেত্রে ধর্মের দুটো ভিন্নধর্মী ভূমিকা ছিল। উনিশ শতকে যখন সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের ফলে এশিয়ার আত্মময়, নির্বিবাদী সমাজ

ধ্বসে যাচ্ছিল তখন ধর্ম ছিল বিলীয়মান জগতের সবচেয়ে বড় সংঘশক্তির আকব। জীবনের ভাঁজে-ভাঁজে ধর্ম ছিল লুকোনো। আবার ধর্মের নির্বিঘ্নে অন্তঃপুরে জীবন ছিল সংবক্ষিত। মানুষ তখন জানত যে অপসৃয়মানকে বাঁধতে হলে ধর্মেব রশি দিয়ে তাকে বাঁধতে হবে। পুরাতন জীবন, সনাতন অস্তিত্ব, সমস্ত অভিজ্ঞতাব দোলাচলে একমাত্র স্থির বিন্দু ছিল কোথাও রাজশক্তি, কোথাও বা ধর্ম, কোথাও বা দুইই। তাই ব্রহ্মদেশের পতনের পব যখন মান্দালযের রাজপ্রাসাদ থেকে রাজসিংহাসনকে তুলে এনে কলকাতার যাদুঘরে রাখা হল তখন বর্মীদেব কাছে মনে হল সমস্ত পুরাতন জগৎটাই ভেঙ্গে গেছে। এই বেদনার প্রতিফলন ঘটল বর্মী লোকগাথায :

রাজার ছত্রছাযা আর নেই
নেই রাজার প্রসাদ
রাজকীয় শহরও গেছে হারিযে
সত্যি আছি নিষ্ফল এক যুগে
এর আগে কেন গেল না প্রাণবাযু।

এই ভাবের বিপরীত ভাব দিল বিংশ শতাব্দীর ধর্ম—ব্রহ্মদেশে, ইন্দোনেশিযায এবং ভাবতবর্ষে। স্বাধীনতা আর নযা রাজ্যেব দাবী নিযে লড়তে লাগল ইসলাম, আর বৌদ্ধধর্ম দিল স্বদেশকে স্বশাসনে আনার মন্ত্র। উনিশ শতকে ধর্ম মানুষের চোখে দিত কল্পনার মায়াঞ্জন, কল্পান্তের স্বপ্ন। বিশ শতকের ধর্ম কল্পান্তের স্বপ্নকে ঝরিযে দিয়ে মানুষকে দিল নতুনভাবে জয় করার দীক্ষা—রাজ্য, শাসন ও স্বাধীনতাকে ছিনিযে নেওয়ার সাহস। দুর্ভাগ্যবশত ভারতবর্ষে গান্ধীজী তখন বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম কথিত অহিংসার পথ ধবে 'রামরাজ্যের' সন্ধানে বের হলেন। উপনিবেশবাদ-বিতারণ না 'রামরাজ্য' কোনটা প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত তা স্থির হল না। কল্পান্তের যুগ যে শেষ হয়ে গেছে এ তথ্য গান্ধীজীর জানা ছিল না। তাই কৃষকদের মধ্যে জাগরণের মন্ত্র দিয়ে তিনি তাদের হাতে লক্ষ্যভেদের বর্শাফলক তুলে দিতে পারলেন না। কৃষকদের সশস্ত্র গণজাগরণ ঘটলে হয়ত শেষ পর্যন্ত আমরা দেশভাগের গ্লানি থেকে বাঁচতে পারতাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তা হলনা।

সূত্র নির্দেশ

১. In the absence of millenarian ideology such as Islam could offer, Hindu peasant disaffection could not rise above the level of social banditry"—Sumit Sarkar, *Modern India: 1885–1947*, p.50

২. E. P. Thompson, **Whigs and Huntees,** London, 1975, p.145

৩. দ্রষ্টব্য রঞ্জিত সেন, **স্বদেশ ও সমকাল,** পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, নবম বার্ষিক অধিবেশন (১৯৯২) আধুনিক ভারতের ইতিহাস শাখায় সভাপতির অভিভাষণ।

৪. দ্রষ্টব্য Ranjit Guha, **Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India,** p.26

৫. Harry J. Benda, "Peasant Movements in Colonial South-East Asia" in **Continuity and change in South-East Asia,** New Haven, Yale University South-East Asia studies Manograph series No. 18, 1972.

৬. Kathleen Gaugh, "Indian peasant uprisings" in **Economic and Political Weekly,** special number, August 1974, এই লেখাটি পরে এ. আর. দেশাই সম্পাদিত **Peasant struggles in India** (Bombay, 1979) গ্রন্থে স্থান পেয়েছিল।

৭. Benedict R. Anderson, "Milenarianism and the Saminist Movement" in **Religion and Social Ethos in Indonesia,** Clayton, 1977.

৮. "The millennial strainns inherent in the various dominant riligious of South-East Asia produced not just a counter culture, but a counter structure as well to the dominant parties"—Reynaldo Ileto, "Religion and Anti colonial movements" in Nicholas Tarling ed. **The Cambridge History of South-East Asia** vol. 2, 1992, p.198

৯. "Those who used to rank lowest now rank above everybody else; and so this is called 'truning things upside down'—Ranjit Guha, **Elementary Aspects of Peasant Insurgenly in Colonial India.** pp. 28–29

১০. "These that have turned the world upside down are came hither also"—**The Acts of the Apostles XVII,** 1–6, quoted by Ranjit Guha, **Ibid,** p.29

১১. তদেব।

১২. **The Cambridge History & South East Asia**-র দ্বিতীয় খণ্ডে (পৃঃ ১৯৯) ধর্মকে এই ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে : ".....the cultural systems—which we call 'religions'—that facilitated state-building as well as provided the idioms of resistance to the state."

১৩. দ্রষ্টব্য **The Cambridge History** ইত্যাদি, পৃ.পৃঃ ২১৪–১৫।

জাপানে ভারতীয় বিপ্লবী প্রচেষ্টা: রাসবিহারী বসু ও সুভাষচন্দ্র বসু

সুধন্যকুমার মণ্ডল

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ভারতবর্ষের বৃটিশ রাজত্বের এক চরম অবস্থার সৃষ্টি হয। ভারতবর্ষের জাতীয আন্দোলন তখন মূলত তিনটি ধারায় প্রবাহিত হয়েছিল। প্রথমত জাতীয় কংগ্রেসের নরমপন্থী আন্দোলন, দ্বিতীয়ত কংগ্রেসের অভ্যন্তরে চরমপন্থী আন্দোলন এবং সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী আন্দোলন বা জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী আন্দোলন। প্রথম পর্যায়ের আন্দোলনটি ব্রিটিশ শাসকদের মনে কখনো ভীতির সঞ্চার করেনি এবং ব্রিটিশ শাসনকেও তেমনভাবে নাড়া দিতে পারেনি। কিন্তু শেষোক্ত পর্যায়ের দুটি আন্দোলনই ভারতের বৃটিশ শাসনের ভিতকে প্রবলভাবে কাঁপিয়ে দিয়েছিল। বাংলা, মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাব তথা সমগ্র উত্তর ভারতের বৈপ্লবিক আন্দোলন এসময় এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে ভারতে বৃটিশ শাসনের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা প্রায অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। বিভিন্ন স্থানে 'অনুশীলন সমিতি' এবং 'যুগান্তর সমিতি'র মত গোপন সমিতি গঠন, দেহচর্চা সহ অস্ত্র-লাঠি-বন্দুক পরিচালনা শিক্ষা এবং রাজনৈতিক গুপ্ত হত্যা বৃটিশ শাসকদের মনে ভীষণ সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছিল। সর্বোপরি ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারী সমগ্র ভারতব্যাপী সশস্ত্র সেনা অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টা— যা বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে ও নির্দেশে সংগঠিত হয়েছিল বিশ্বাসঘাতক কৃপাল সিং-এর বিশ্বাসঘাতকতায় তা ব্যর্থ হয়ে গেলেও ভারতের বৃটিশ শাসনের মূলে এটা যে কুঠারাঘাত স্বরূপ পরবর্তী বৃটিশ শাসকদের তা বুঝতে বিলম্ব হয়নি।[১] এরই পরিপ্রেক্ষিতে বৃটিশ সরকার 'বিখ্যাত লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা' শুরু করলেও বিদ্রোহের প্রধান নায়ক রাসবিহারী বসুকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি বৃটিশ সরকার। গোপনে ছদ্মবেশে-পিংলে ও বিনায়ক রাও কাপলেকে সঙ্গে নিয়ে লাহোর ত্যাগ করে বারাণসীর মদনপুরায় চলে আসেন তিনি। সেখান থেকে চন্দননগর ও পরে নবদ্বীপে আত্মগোপন করে থাকেন রাসবিহারী বসু। মাসাধিককাল এখানে সংগোপনে অবস্থান করার পর চট্টগ্রামের প্রখ্যাত বিপ্লবী নবদ্বীপে বসবাসকারী গিরিজাবাবু, কাশীর শচীন্দ্রনাথ সান্যাল ও পশুপতির সঙ্গে পরামর্শ করে রাসবিহারী কলকাতা ফিরে

আসেন।[২] এই সমস্যা-সংকুল পরিস্থিতির মধ্যেও বৃটিশ পুলিসের সতর্ক পাহারা এড়িয়ে ছদ্মবেশে রাসবিহারী বসু, শচীন্দ্রনাথ সান্যাল, গিরিজাবাবু ও আরো কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে সমগ্র ভারতের বিপ্লবী সংগঠনকে বাঁচাতে নির্বিদ্ধায় সর্বত্রই ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। এসময় তিনি যখন কলকাতায় আসেন তখন সেখানে যতীন মুখার্জীর সঙ্গে বৈপ্লবিক কাজকর্ম চালিযে যাচ্ছিলেন শ্রীশ ঘোষ, চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী, মনোরঞ্জন সেন, নীরেন দাশগুপ্ত, জ্যোতিষ পাল প্রমুখ বিপ্লবীরা। তারাও এসময় বৈদেশিক অস্ত্র সাহায্য পাবার আশায় দিন গুনছিলেন। দেশের অভ্যন্তরে যখন এই রকম অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি সেখানে রাসবিহারীর অবস্থান যে মোটেই নিরাপদ ছিল না বাংলার বিপ্লবীরা তা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তাঁরা রাসবিহারী বসুকে দূবপ্রাচ্যে প্রেরণ করে সেখান থেকে বৈদেশিক সাহায্য পাঠাবার জন্য সচেষ্ট হতে পরামর্শ দিয়েছিলেন।[৩] অবশেষে সকল দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাটিয়ে বৃটিশদের কবল থেকে নিজেকে বাঁচাতে এবং দেশমাতাকে বাঁচাতে সতীর্থ বিপ্লবী বন্ধুরা যেমন প্রতুল গাঙ্গুলী, নরেন সেন, গিরিজাবাবু, শচীন্দ্রনাথ সান্যাল প্রভৃতির পরামর্শে ও সহযোগিতায ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ১২ই মে 'সানুকিমারু (Sanukimaru) নামক এক নিপুণ 'য়ুসেন কোম্পানীর' জাপানী জাহাজে বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসু, পি. এন. ঠাকুর ছদ্মনামে জাপানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।[৪] জাপান যাত্রার দিন অর্থাৎ ১২ই মে রাসবিহারী বসু তাঁর বিপ্লবী গুরু চন্দননগরের প্রখ্যাত বিপ্লবী মতিলাল রায় মহাশয়কে একখানি পত্র লিখে সেটি শচীন্দ্রনাথ সান্যালের কাছে দিয়েছিলেন। পত্রটিতে লেখা ছিল—

"স্নেহের ভাই

আমি চলিলাম, তোমার সংসার তুমি দেখ।"

ইতি

রাসবিহারী বসু।

শচীন্দ্রনাথ পরদিন যথাসময়ে পত্রটি মতিলাল রায়ের নিকট পৌঁছে দিয়েছিলেন।[৫]

যাইহোক জাহাজখানি ২২শে মে সিঙ্গাপুর পৌঁছায়। ঠিক এই দিন অপর এক ছোট্ট জাপানী জাহাজ 'বানাই মারুতে' করে আর এক জাপানী বিপ্লবী কে.জি.আশোয়া এই সিঙ্গাপুরে এসেছিলেন। ইনিই পরবর্তীকালে দুইজন ভারতীয় মহামানবকে নিয়ে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ, 'Two great Indians in Japan' রচনা করেছিলেন। তাতে তিনি আলোচনা করেছেন যে রাসবিহারী বসুর বাল্য ও যৌবনের লীলাভূমি ছিল ভারত, যৌবন ও প্রৌঢ়কালের বিচরণ ক্ষেত্র ছিল জাপান, আর বার্দ্ধক্যের কর্মক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন শ্যাম, বার্ম্মা ও সিঙ্গাপুর।[৬]

১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ৫ই জুন রাসবিহারী বসু জাপানের কোবে বন্দরে পৌঁছান। সেখান থেকে তিনি ৯ই জুন কিউটো আসেন।[৭]

জাপানে রাসবিহারী বসু :

তাঁর জাপান যাওয়ার গৌণ উদ্দেশ্য বৃটিশদের কবল থেকে নিজেকে বাঁচাতে ঠিকই, কিন্তু মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল জাপানের সাহায্যে ভারতকে ব্রিটিশ শৃঙ্খল হতে মুক্ত করা। ভারতের অভ্যন্তরস্থ বিপ্লবীদের বিপ্লবী আন্দোলন পরিচালনায় সাহায্যের জন্য প্রবাসে অস্ত্র সংগ্রহের প্রচেষ্টা চালাতে লাগলেন রাসবিহারী বসু। জাপানে এ প্রচেষ্টা চালাতে গিয়ে নতুন সমস্যায় পড়লেন তিনি। ইতিপূর্বে ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ইঙ্গ-জাপান চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল, ফলে ১৯২১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত দুদেশের মধ্যে কমবেশী বন্ধুত্ব সম্পর্ক বজায় ছিল। জাপ-বৃটেন চুক্তির অন্যতম প্রধান কারণ ছিল রাশিয়ার অপ্রতিহত গতিকে বাধা দেওয়া। অতঃপর ১৯০৪—৫ খৃষ্টাব্দে মাঞ্চুরিয়া ও কোরিয়াকে কেন্দ্র করে রুশ-জাপান যুদ্ধে জাপানের নিকট বৃহৎ রাশিয়ার চরম পরাজয় ঘটে।[৮] এমতাবস্থায় জাপানের সঙ্গে বৃটেনের মিত্রতা ক্রমশ বৃদ্ধি লাভ করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে এজন্য জার্মান ও রাশিয়ার বিরুদ্ধে জাপান বৃটিশ শক্তির মিত্রতা লাভে প্রয়াসী হয়েছিল। জাপানের বৈদেশিক নীতি এই আন্তর্জাতিক সংকটপূর্ণ অবস্থায় বৃটেনের বৈদেশিক নীতির অনুকূল ছিল। এমত পরিস্থিতিতে ইংরাজ-অধিকৃত ভারতের স্বাধীনতা লাভের ব্যাপারে জাপানের সহায়তালাভ যে কোন মতেই সম্ভব হবে না কূটনীতিক রাসবিহারী বসুর তা বুঝতে বিলম্ব হয়নি। এজন্যে তিনি প্রবাসী জাপানে জাপান সরকারের বিরোধী অথচ সংশোধনবাদী ব্লাক ড্রাগন সমিতির ৬৩ বছরের প্রৌঢ় নেতা প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত মিৎসুয়ো তোয়ামার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।[৯] এই তোয়ামাজীর সহায়তায় রাসবিহারী বসু পরবর্ত্তী জীবনে জাপানের বিশিষ্ট মহলে বিশেষ পরিচিত লাভ করেছিলেন এবং জাপানে অবস্থান করে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালনা করার সুযোগ পেয়েছিলেন।

জাপানে পৌঁছিয়েই জাপানের সাহায্যে লাভের প্রতিকূল পরিবেশ লক্ষ্য করে রাসবিহারী ভারতের বিপ্লবীদের সাহায্যার্থে অস্ত্র সংগ্রহের জন্য চীনের সাংহাইতে গিয়েছিলেন। কিন্তু সাংহাইস্থিত জার্মান কনসালের সঙ্গে দেখা করেও এ-ব্যাপারে তেমন সুফল লাভ করতে পারেননি, কারণ চীন তখন অন্তঃবিপ্লব নিয়ে নিজেই অত্যন্ত বিব্রত ছিল। তবুও ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে উড়িষ্যার বুড়িবালামের তীরে যতীন্দ্রনাথ ও তাঁর সহপাঠীরা যে দুটি জার্মান অস্ত্রবাহী জাহাজের জন্য অপেক্ষা করেছিলেন সে দুটি অস্ত্রবাহী জাহাজ পাঠানোর পিছনেও রাসবিহারী বসুর ভূমিকা ছিল। যদিও বৃটিশরা সে দুটি জাহাজ ভারতে পৌঁছাতে দেয়নি। তাছাড়াও ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর সাংহাইয়ের পুলিশ দুজন চীনাকে বন্দী করেন এবং তাঁদের নিকট হতে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করেন। জানা যায় একটি স্থানীয় জার্মান ফার্ম হতে এই সকল অস্ত্র-শস্ত্র প্যাকেট করে কলকাতায়

পাঠাবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। একাজেরও প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন রাসবিহারী বসু। কলকাতায় শ্রমজীবী সমবায়ের অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও মনোমোহন আচার্যের নিকট এই সকল অস্ত্রশস্ত্র পাঠাবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।[১০]

আপাত দৃষ্টিতে প্রবাসে জাপানে অবস্থান কালে বিদেশ থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করে ভারতে পাঠাবার যে প্রচেষ্টা রাসবিহারী বসু চালিয়েছিলেন তা ব্যর্থ হয়ে গেলেও তিনি নিরুৎসাহ হলেন না। ববং তিনি পবাধীন ভারতবাসীর প্রতি জাপানী জনসাধারণের সহানুভূতি অর্জনের জন্য সচেষ্ট হন। তিনি জাপানী জনসাধারণের কাছে ভারতের সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও ইংরেজ সরকারের অধীনে অত্যাচারিত নিষ্পেষিত ভারতবাসীর শোচনীয় পরিস্থিতি সম্বন্ধে পরিচিত করানোব উদ্দেশ্যে টোকিওর য়ুনো পার্কের প্রসিদ্ধ ভোজনালযে ১৯১৫ খৃঃ ২৭শে নভেম্বর প্রবাসী ভারতীযদের চেষ্টার এক জনসভার আয়োজন করেছিলেন। এই জনসভার আয়োজনে প্রবাসী ভারতীযদের মধ্যে প্রধান উদ্যোগী ব্যক্তিরা ছিলেন রাসবিহারী বসু, হেরম্বলাল গুপ্ত ও লালা লাজপৎ রায। জাপানের পক্ষ থেকে প্রধান উদ্যোগী ব্যক্তিরা ছিলেন মিৎসুয়ো তোযামা ও ডাঃ সুমেই ওহকাওযা। এছাড়াও বহু জাপানী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এই সভায উপস্থিত ছিলেন।[১১] এই জনসভার পর হতেই পি. এন. ঠাকুর যে রাসবিহারী বসুর ছদ্মনাম ব্রিটিশ সরকাব তা বুঝতে পেরেছিলেন এবং জাপানিস্থিত ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত অবিলম্বে জাপানী পররাষ্ট্র দপ্তরের কাছে রাসবিহারীর বহিষ্কারের দাবী জানিয়েছিলেন। যাই হোক জাপানে অনুষ্ঠিত প্রবাসী ভারতীযদের আয়োজিত এই সভার ঐতিহাসিক মূল্য এই যে ভারতের স্বাধীনতার জন্য প্রাচ্যদেশে এই সর্বপ্রথম আন্দোলনের সূচনা, যার সূত্রপাত ঘটেছিল রাসবিহারী বসুর একান্ত চেষ্টার ফলে।[১২]

জাপানে আত্মগোপন করে থাকার সময় আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল রাসবিহারীর সঙ্গে মহাচীনের মহাবিপ্লবী ডাঃ সান ইয়াৎ সেনের পরিচয়। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে ইউয়ান-সি-কাইকে বিতাড়িত করার বাসনায় চীনে দ্বিতীয়বার যে বিপ্লব ঘটানোর প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন তা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে গেলে প্রাণে বাঁচার তাগিদে সান-ইয়াৎ-সেন জাপানে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে তিনি নিজের দেশে ফিরে যান। ১৯১৫—১৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই জাপানে এই দুই দেশের মহান বিপ্লবীর সাক্ষাৎ ঘটেছিল এবং উভয়ের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব সম্পর্কও গড়ে উঠেছিল।[১৩]

জাপানে অন্তত ৮ (আট) বছর কাল অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে আত্মগোপন করে থাকার পর মিৎসুয়ো তোয়ামার সাহায্য, সহযোগিতা এবং আদেশে সে-দেশের সোমা পরিবারের এক শিক্ষিতা মেয়ে তোষিকোকে বিবাহ করার পর ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের ২রা জুলাই রাসবিহারী বসু জাপানের নাগরিকত্ব লাভ করেছিলেন।

এতদিন পর নিজেকে এই প্রথম আত্মপ্রকাশ করে আনন্দিত হলেন রাসবিহারী বসু।[১৪] এই দীর্ঘকাল আত্মগোপন করে থাকার সময়ও তিনি পরাধীন ভারতবাসীর দুঃখ-দুর্দশার কথা, ভারতের মুক্তির কথা এক দিনের জন্যও ভুলে যাননি। ভুলতে পারেননি ফেলে-আসা অসম্পূর্ণ ভারতের বৈপ্লবিক আন্দোলনের কথা। এজন্য তিনি সমগ্র প্রবাসী জীবনব্যাপী চরম পরিস্থিতিতে ভয়ংকর বিপদের ঝুঁকি নিয়েও সভা-সমিতি ও সংগঠনের কাজ চালিয়ে গিয়েছিলেন। আর তা সম্ভব হয়েছিল জাপান সরকারের বিরোধী অথচ সংশোধনবাদী 'ব্লাক ড্রাগন' সমিতির প্রৌঢ় নেতা প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত মিৎসুযো তোয়ামার অকুণ্ঠ সাহায্য ও সহযোগিতায়।

রাসবিহারী বসুর অক্লান্ত চেষ্টা ও কঠোর পরিশ্রমের ফলশ্রুতিতে জাপানে প্রবাসী ভারতীয়দের নিয়ে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে গঠন করেছিলেন 'ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ' বা ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘ। পরবর্ত্তী কালে অর্থাৎ ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'প্যান এশিয়ান অ্যাসোসিয়েশন'[১৫]। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য প্রবাসী ভারতীয়দের নিয়ে রাসবিহারী বসু প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় স্বাধীনতা লীগকে সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রবাসী ভারতীয়েরা সমর্থন করেছিলেন। পিকিং, সাংহাই, ফরমোজা, কোরিয়া, টোকিও, ইযাকোহামা, নাগাসাকি, হিরোসিমা, ব্যাংকক, জাভা, বালি, সুমাত্রা, হংকং প্রভৃতি বহু স্থানে এই লীগের শাখা স্থাপিত হয়েছিল। এই সকল প্রতিটি শাখা কেন্দ্রের বৈপ্লবিক কাজকর্মের সবকিছু তত্ত্বাবধান করতে লাগলেন স্বয়ং রাসবিহারী বসু।[১৬] এই ভাবে সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নেতা হযে উঠেছিলেন তিনি।

এছাড়াও বিভিন্ন সভা-সমিতি গঠন, বৈপ্লবিক কর্মপরিচালনা, সংগঠন, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায লেখা ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ক্ষুরধার বক্তব্য উপস্থাপনের মাধ্যমে বিপ্লবী রাসবিহারী বসু জাপানে অবস্থানকালে সমগ্র এশিয়াবাসীকে বৃটিশ শাসনে নিপীড়িত অত্যাচারিত ভারতবাসীর কথা অবগত করিয়েছিলেন। জাপানে শক্তিশালী রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গেও তিনি এ ব্যাপারে আলোচনা করতেন। তিনি বলতেন— "The Indian freedom is necessary for the peace of the world."। রাসবিহারী বসু 'এশিয়াবাসীদের জন্য এশিয়া' এই মন্ত্রে পূর্ব এশিয়াবাসীদের উদ্দীপ্ত করে এশিয়া থেকে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদকে বিতাড়িত করতে মনস্থির করেছিলেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় এশিয়ার নিপীড়িত পদানত অধিবাসীবৃন্দ একথা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে ভারতের রাজনৈতিক মুক্তির অব্যবহিত পরেই বৃহত্তর এশিয়ার মুক্তিলাভের পথ সুগম হবে।[১৭] এইভাবে তিনি ভারতের স্বাধীনতার পক্ষে এক শক্তিশালী জাপানী জনমত গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। তখনকার বিশ্বরাজনীতির আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি লক্ষ্য করে রাসবিহারী জাপানের সঙ্গে মিত্রতায় আবদ্ধ হতে বদ্ধপরিকর হন। এই উদ্দেশ্যে ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে তিনি 'ভারত-জাপান

মৈত্রী সমিতি'ও গড়ে তুলেছিলেন। এশিয়ার বিপ্লবী ছাত্রদের সমবেত করে এই বছরেই টোকিওতে স্থাপন করেছিলেন 'ভিলা এশিয়ানস'।

অতঃপর ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে রাসবিহারী বসু জাপ-জার্মান মৈত্রী স্থাপনেও বিশেষ চেষ্টা চালিয়েছিলেন। কারণ বিশ্বযুদ্ধের সুযোগে বৃটিশ বিরোধী জার্মান ও জাপানী শক্তির সহায়তায় ভারতের মুক্তিলাভের আশা পোষণ করতেন তিনি। তাঁর বিশ্বাস ছিল বৃটিশ সাম্যাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাপান অস্ত্রধারণ করলে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন সাফল্যমন্ডিত হবেই। এজন্যে রাসবিহারী বসু এই বিশ্বযুদ্ধে জাপানকে যতশীঘ্র সম্ভব যুদ্ধে নামাবার চেষ্টা ও চালিয়েছিলেন।[১৮]

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের জন্য অবশ্য বৃটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হবে একথা মহানায়ক রাসবিহারী বসু উপলব্ধি করেছিলেন। এজন্য তিনি একটি শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী গঠন করার সংকল্প করেন। এসময় কুয়ালালামপুর, মালয প্রভৃতি স্থানে জাপানীদের হাতে পরাজিত যুদ্ধবিধ্বস্ত বন্দী ভারতীয সৈন্যদেব যখন বৃটিশ সেনাপতিগণ জাপানীদের হাতে প্রত্যর্পণ করে পলায়ন করেছিলেন তখন রাসবিহারী বসু ঐ সকল যুদ্ধবন্দী ভারতীয সেনাদের নিযেই বৃটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কাজে লাগাবার জন্য জাপানী সেনানাযকদের সঙ্গে পবামর্শ কবেন। অতঃপর উক্ত বন্দী ভারতীয় সেনাদের নিয়েই একটি স্বেচ্ছাসেবক দলও গঠন করেছিলেন।[১৯] জাপবাহিনীদের হাতে বন্দী পাঞ্জাবে বৃটিশবাহিনীর ১৪ নং রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন মোহন সিংকেও রাসবিহারী তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘে' যোগদান কবতে বলেন। অবশেষে রাসবিহারী বসুর প্রচেষ্টায় ও মোহন সিং-এর নেতৃত্বে যুদ্ধবন্দী এই সকল ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারী একটি 'জাতীয় সেনাবাহিনী' গঠন কবেন। ১লা সেপ্টেম্বর এই ফৌজকে 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' নামে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠা করা হয়। রাসবিহারী বসু এর সর্বাধিনায়ক পদে অধিষ্ঠিত থাকলেও পরিচালানার ভার দেওয়া হযেছিল মোহন সিং-এর উপর। কিন্তু অল্প কিছুদিনের মধ্যেই 'আজাদ হিন্দ ফৌজে'র নেতৃত্ব নিয়ে মোহন সিং ও রাসবিহারীর মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। অবশেষে 'আজাদ হিন্দ ফৌজে'র মধ্যে মোহন সিং বিদ্রোহী হয়ে উঠলে ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের ১৯শে ডিসেম্বর রাসবিহারীর আদেশে জাপ সেনাধিনায়ক জেনারেল ইয়াকুরো স্বার্থান্বেষী ও বিদ্রোহী মোহন সিংকে গ্রেপ্তার করেন এবং সিঙ্গাপুরের নিকট সেন্টজন দ্বীপে বন্দী করে রাখেন।[২০]

'আজাদ হিন্দ ফৌজের' এই চরম বিপর্যয়ের দিনে কঠোর পরিশ্রম করে পুনরায় এর পুনর্গঠন করেছিলেন ঠিকই কিন্তু সেই মুহূর্তেই তিনি আজাদ হিন্দ বাহিনীর ভবিষ্যৎ যোগ্য নায়ককে খুঁজতে লাগলেন চারিদিকে। বয়সের গুরুভারে শ্লথ অক্ষম রাসবিহারীর পক্ষে এই বিশাল সৈন্যবাহিনীর যুদ্ধ পরিচালনা অসম্ভব

বিবেচনা করে তিনি এ গুরু দায়িত্ব অপর এক পলাতক প্রবাসী বিপ্লবী দেশগৌরব সুভাষচন্দ্রকেই অর্পণ করতে মনস্থির করেছিলেন। কারণ ভারতে অবস্থান কালে সুভাষচন্দ্র ছিলেন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের একজন সুপরিচিত নেতা। ভারতবাসীরা সবাই সুভাষচন্দ্রের নামের সঙ্গে বিশেষভাবে সুপরিচিত ছিলেন।[২১] সুভাষচন্দ্র ভারতবর্ষে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম করার পক্ষপাতী ছিলেন। বৃটিশ সবকারের সাথে যে কোনরূপ সহযোগিতার বিরোধী ছিলেন তিনি। তখনকার জাতীয় নেতা গান্ধীজীর মতের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের মতের পার্থক্য হেতু সুভাষচন্দ্র জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি পদে ইস্তফা দিয়ে ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে ৩রা মে কংগ্রেসের মধ্যেই তাঁর অনুগামীদের নিয়ে 'ফরওয়ার্ড ব্লক' নামে একটি নতুন দল গঠন করেছিলেন। এই সময় বৃটিশ সরকার সুভাষচন্দ্রের বিপ্লববাদী মত প্রকাশের জন্য এবং তাঁর একনিষ্ঠ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতায় ভীত হয়ে সুভাষচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করে নিজ গৃহে আবদ্ধ করে রেখেছিলেন। অন্তরীণ থাকা অবস্থায় ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারী গভীর রাত্রে জিয়াউদ্দীনের ছদ্মবেশে দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র নিজের কলকাতাস্থিত এলগিন রোডের ২৪ ঘন্টা পাহারাবেষ্টিত বাড়ি থেকে ভারতমাতার শৃঙ্খল মোচনের উদ্দেশ্যে পালিয়ে আফগানিস্তানের ও রাশিয়ার মধ্য দিয়ে বিদেশে জার্মানীতে গিয়েছিলেন। তদানীন্তন জার্মান সম্রাট হিটলারের সঙ্গে আলোচনা করে সেখানকার জার্মান সেনাদের হাতে বন্দী ভারতীয় সেনাদের নিয়ে একটি আজাদ হিন্দ বাহিনী গঠন করেছিলেন। সেনাবাহিনীকে অত্যন্ত সুদক্ষ করে তোলার জন্য জার্মান সমরনায়কদের অধীনে তাদেরকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন। তাঁর আশা ছিল রাসবিহারীর আজাদ হিন্দ বাহিনী যখন পূর্ব দিক থেকে ভারত প্রবেশ করবে তাঁর আজাদ হিন্দ বাহিনী তখন ভারতে প্রবেশ করবে পশ্চিম দিক থেকে। এ উদ্দেশ্যে সুভাষচন্দ্র তাঁর আই.এন.এ. বাহিনীকে নিয়ে জার্মানী সেনাবাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে আফ্রিকা পর্যন্ত চলে এসেছিলেন।

সুভাষচন্দ্রের এই বীরত্বপূর্ণ কার্যাবলীর প্রতি মহানায়ক রাসবিহারী বসুর সজাগ দৃষ্টি ছিল। এজন্য ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জুনে ঐতিহাসিক ব্যাংকক সম্মেলনে সুভাষচন্দ্রকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল এবং অদূর ভবিষ্যতে তাঁকে জাপানে আনয়নের জন্য জাপ সরকারকে অনুরোধ করা হয়েছিল যাতে তাঁরা জার্মান সরকারের সঙ্গে এ ব্যাপারে সুপারিশ করেন।[২২]

অতঃপর 'আজাদ হিন্দের' চরম সংকটজনক পরিস্থিতিতে কর্মক্ষম রাসবিহারী বসু ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালনার যোগ্যনায়ক সুভাষচন্দ্রকে জার্মান থেকে জাপানের টোকিও আসার জন্য আহ্বান জানালেন। টোকিও হতে এ ব্যাপারে জাপানী রাষ্ট্রদূত জেনারেল ওসিমার কাছে নির্দেশ পাঠানো হয়েছিল, জার্মান সরকারের সঙ্গে সবিশেষ আলোচনা করে যেমন ভাবেই হোক নিরাপদে সুভাষচন্দ্রকে জাপানে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে।[২৩]

জাপানে সুভাষচন্দ্র :

বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসুর আহ্বানে সকল প্রকার বিপদের সম্ভবনাকে উপেক্ষা করে সুভাষচন্দ্র বসু ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারীর কাকভোরে কর্ণেল আবিদ হাসানকে সঙ্গে নিয়ে বার্লিনের লেহটার ব্যানহফ রেলস্টেশন থেকে কিয়েল বন্দরের দিকে রওনা হয়েছিলেন। রওনা হওয়ার পূর্বে অবশ্য সুভাষচন্দ্র বসু সরোজিনী নাইডুর ভগ্নীপতি এ. পি. নাম্বেযাব-এর উপর জার্মানীতে নিজহাতে তৈরী 'Free India Centre' ও ৩০০০ (তিন হাজার) সদস্যভুক্ত আজাদ হিন্দ ফৌজের দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন।[২৪] ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারী সুভাষচন্দ্র ও তার সঙ্গী আবিদ হাসান সাফরানী কিয়েল বন্দর থেকে 'ইউ-১৯০' নম্বরের জার্মান ডুবোজাহাজে করে বৃটিশ শত্রুর বেড়াজাল বিস্তৃত ব্যাটল শিপ, ডেস্ট্রয়ার, ক্রুজার, বিমান বহর, ডেপথ চার্জ, টর্পেডো-সংকুল সমুদ্রের নীচ দিয়ে ২৩শে এপ্রিল মাদাগাস্কারের নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছান। সেখান থেকে কমান্ডার ইজুর নেতৃত্বে '১/২৯' নম্বরের একটি জাপানী সাবমেরিনে ৬ই মে সুমাত্রায় এবং ১৬ই মে জাপানের টোকিওতে পৌঁছেছিলেন।[২৫] টোকিওর বিখ্যাত ইম্পিরিয়াল হোটেলেই রাসবিহারী বসুর সঙ্গে সুভাষচন্দ্র বসুর সাক্ষাৎ হয়। জাপানের প্রধান সমরনায়ক সুগিয়ামা, বৈদেশিক দপ্তরের প্রধান সিগিমিৎসুর· সঙ্গেও দেখা করেন সুভাষচন্দ্র। জাপ প্রধানমন্ত্রী 'তোজো'ও ভারতের মুক্তি যুদ্ধে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সুভাষচন্দ্র বসুকে সাদর সম্বর্ধনা জানিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে বিপ্লবী যোদ্ধা সুভাষচন্দ্রের সমস্ত দাবীই জেনারেল তোজো মেনে নিয়েছিলেন।

অতঃপর ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই সিঙ্গাপুরের ক্যাথে সিনেমার প্রাঙ্গণে প্রায় ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) প্রবাসী ভারতীয়দের এক বিশাল ঐতিহাসিক সম্মেলনে বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসু তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি ও সম্পদ 'ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘ' ও 'আজাদ হিন্দ ফৌজের' সম্পূর্ণ নেতৃত্বভার দেশগৌরব সুভাষচন্দ্রের উপর অর্পণ করেছিলেন।[২৬] পরের দিন অর্থাৎ ৫ই জুন সকাল ১০ টায় সুভাষচন্দ্র বসু সিঙ্গাপুরের মিউনিসিপ্যাল ভবন সংলগ্ন বিশাল ময়দানে প্রায় ১০,০০০ (দশ হাজার) আজাদী সৈন্যবাহিনীর বিশাল সমাবেশে সৈন্যদের নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলা পরিদর্শন করেছিলেন। তিনি সবাইকে 'সাথীযো আউর দোস্তো' বলে সম্ভাষণ করেন। এস. এ. আয়ারের মতে "One could see with half an eye that a thrill ran through the rank's of the guard of honour at being address by such a great man as 'Santhion our Doston"![২৭]

১৯৪৩ খৃষ্টাব্দেব ২৫শে আগষ্ট আজাদ হিন্দ ফৌজের এক অনুষ্ঠানে নেতাজী এর সর্বাধিনায়ক পদ গ্রহণ করেছিলেন। ২১শে অক্টোবর সিঙ্গাপুরের এক প্রকাশ্য জনসমাবেশে স্বাধীন ভারতের সামরিক সরকার প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেন। ২৮শে অক্টোবর তিনি বিমান যোগে টোকিওতে অনুষ্ঠিত বৃহত্তর পূর্ব-এশিয়া সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে এসেছিলেন। জাপানের সম্রাট নেতাজীকে স্বাধীন ভারতের সামরিক সরকার ও রাষ্ট্রের প্রধান রূপে গণ্য করে সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন। বার্মা, ক্রো'টয়া, জার্মানী, মাঞ্চুকু, ইতালী এবং থাইল্যাণ্ড সরকারও এই নব গঠিত আজাদ হিন্দ সরকারকে স্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। ৬ই নভেম্বর জাপ প্রধানমন্ত্রী তোজো বৃহত্তর পূর্ব-এশিয়া সম্মেলনে অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারকে জাপান অধিকৃত আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ দুটি হস্তান্তরিত করার কথা ঘোষণা করেছিলেন। আজাদ হিন্দ সরকারের কর্তৃত্বাধীনে আন্দামান ও নিকোবোর দ্বীপপুঞ্জ দুটিই হল ভারতের স্বাধীন প্রথম ভূখণ্ড।[২৮]

তারপর নেতাজী সুভাষচন্দ্র ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারী মাসে রেঙ্গুনে আসেন এবং দেশবাসীর কাছে আহ্বান জানান—"What we want is a Blood bath and when we are sure to free India—Give me Blood, I will give you freedom"[২৯]

১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী নেতাজীর আজাদ হিন্দ ফৌজ বৃটিশ ভারতরক্ষী বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রথম অভিযান শুরু করেন। "দিল্লী চলো", "লাল কেল্লা দখল কর"—এই পণ নিয়ে সুভাষচন্দ্রের নির্দেশে ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের ১৯শে মার্চ ভারতীয় জাতীয় বাহিনী ব্রহ্ম-ভারত সীমান্ত রেখা অতিক্রম করে স্বদেশের পুণ্যভূমিতে প্রবেশ করে কোহিমাতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেছিলেন। যদিও শেষাবধি আজাদীর সংগ্রাম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল এবং নেতাজীর রহস্যজনক অন্তর্ধান ঘটেছিল তবু ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে এর গুরুত্ব ছিল অপরিসীম।

প্রবাসে জাপানে অবস্থান করে ভারতের দুই মহান বিপ্লবী রাসবিহারী বসু ও সুভাষচন্দ্র বসু যেভাবে ভারতের বিপ্লবী আন্দোলন তথা স্বাধীনতা আন্দোলন চালিয়ে গিয়েছিলেন তার সুমহান কৃতিত্ব চিরকাল ভারতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

সূত্র নির্দেশ

১. Uma Mukherjee—**Two Great Indian Revolutionaries, Rash Behari Bose and Jyotindra Nath Mukherjee, Cal.** 1966. p.130.

২. নলিনীমোহন মুখোপাধ্যায়— **বিপ্লবী বীর রাসবিহারী— কলি. ১৯৬০,** পৃঃ ৬৫

৩. সুবোধ মজুমদার— **বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী**, কলি, ১৯৭৭, পৃঃ ৫১
৪. শান্তিকুমার মিত্র— **বিপ্লবী মহানেতা রাসবিহারী বসু**, কলি, ১৩৭৫. পৃঃ ২৩
৫. মতিলাল বায়— **আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী**, কলি, নভে ১৯৫৭, পৃঃ ১৪৩
৬. বিজনবিহারী বসু— **কর্মবীর রাসবিহারী**, কলি, ১৩৬৩, পৃঃ ২৬
৭. শান্তিকুমার মিত্র— পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৪
৮. হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়— **জাপানের ইতিহাস**, কলি, ১৯৮৫, পৃঃ ১২৫
৯. সুধীবকুমার মিত্র— **মহাবিপ্লবী রাসবিহারী**, কলি, ১৩৫৫, পৃঃ ১০৩
১০. অমলেন্দু দে— দ্রঃ "অনুশীলন বার্তা", ৫ম বর্ষ, ১৩ সংখ্যা, ১৯৮৩, পৃঃ ৪
১১. বিজনবিহাবী বসু— পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২৪
১২. অমলেন্দু দে— পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪
১৩. ঐ — পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫
১৪. ক্ষীরোদকুমাব দত্ত— **বহির্ভারতে ভারতীয় বিপ্লব প্রচেষ্টা**, কলি, ১৩৮২, পৃঃ ১৪৫
১৫. মনোরঞ্জন ঘোষ— **বিপ্লবী মহানায়ক**, কলি, ১৯৭৬, পৃঃ ৫১
১৬. সুবোধ মজুমদাব— পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭৮
১৭. অমলেন্দু দে— পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬
১৮. নলিনীমোহন মুখোপাধ্যায়— **বিপ্লবী বীর রাসবিহারী বসু**,— কলি, ১৯৬০, পৃঃ ১০৫
১৯. সুধীবকুমার মিত্র— পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১৯
২০. শ্যামল বসু— **সুভাষ ঘরে ফেরে নাই**, কলি, ১৯৮৫, পৃঃ ৪৭৮
২১. বিজনবিহারী বসু— পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩১৫
২২. সুধীরকুমার মিত্র— পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২২
২৩. শৈলেশ দে— **আমি সুভাষ বলছি** (৩য় খণ্ড), কলি ১৩৭৫, পৃঃ ২
২৪. ব্রজেশচন্দ্র দাস— দ্রঃ "বিপ্লবী বাংলা", কলি, ১৯৯৪, পৃঃ ১৮
২৫. অক্ষয়কুমার দত্ত— "স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙালী", কলি, ১৯৬৩, পৃঃ ৫২
২৬. ক্যাপ্টেন সুশীল খাস্তগীর (আই.এন.এ)— দ্রঃ "বিপ্লবী বাংলা," ত্রয়োবিংশ বর্ষ, ১১–১২ সংখ্যা কলি, ১৯৯৩, পৃঃ ১৫
২৭. Ayer S. A.— **Unto Him a Witness**— p.210.
২৮. নারায়ণ সান্যাল— **আমি নেতাজীকে দেখেছি**, কলি, ১৯৮২, পৃঃ ১৮৬
২৯. নীহাররঞ্জন গুপ্ত— **বিদ্রোহী ভারত** (৩য় পর্ব), আশ্বিন ১৩৫৮, পৃঃ ২২৪।

থাই রাজনীতিতে নারী : ঐতিহাসিক ইতিবৃত্ত

লিপি ঘোষ

মানব সভ্যতার ইতিহাসে পুরুষের পাশে নারী সার্বিকরূপে অগ্রসর হয়েছেন সমাজের সর্বক্ষেত্রে। রাজনীতি বিষয়েও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। বিশ্বব্যপী নারীমুক্তি আন্দোলনের একটি অন্যতম উদ্দেশ্য রাজনীতিক্ষেত্রে পুরুষের সঙ্গে সমপর্যায়ে অংশগ্রহণ। আজকের ইউরোপ আমেরিকার মত এশিয়ার সকলদেশেই প্রশাসন ও নির্বাচকমন্ডলীতে নারীর অংশগ্রহণ স্বীকৃত। থাই রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণের ইতিহাস কি—এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এই নিবন্ধে থাইল্যান্ডের দেশীয় আইন রীতি-বিধি ও সাংবিধানিক অধিকারের প্রেক্ষাপটে সেদেশে নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণের ইতিহাস তুলে ধরা হল।

ঐতিহাসিক বাতাবরণ, দেশীয় আইন ও রীতিনীতির প্রশ্নটি পরস্পর-সম্পর্কিত। থাই চিরাচরিত সমাজ-ব্যবস্থায় পিতৃতান্ত্রিক ও মাতৃতান্ত্রিক পরিবার-নিয়ন্ত্রণের দুই ব্যবস্থা প্রচলিত থাকলেও বিবাহোত্তর মাতৃতান্ত্রিক পরিবারই অধিকতর স্বীকৃত ছিল। কিন্তু তথাপি সামাজিক মূল্যবোধ ও বিধিনিয়মে নারী সর্বদা পুরুষের অধীনস্থ এই আদর্শটি প্রচলিত ছিল। এছাড়া দেশীয় আইন অনুসারেও মেয়েদের সামাজিক স্থিতি হেয় করা হত। শৈশবাবস্থা থেকে নারীত্বের বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে মেয়েদের গৃহকোণের কার্যাবলীর মধ্যেই অধিকতর বিজড়িত রাখা হত।[১] ফলে এইধরনের সামাজিক মূল্যবোধের প্রেক্ষাপটে নারী গৃহক্ষেত্রে উচ্চমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত থাকলেও বাহিরের জগতে অংশগ্রহণের রূপটি ছিল সীমিত।

এই অবস্থার প্রথম পরির্বতন শুরু হয় রাজা চতুর্থ রামের সময়ে (১৮৫১—১৮৬৮)। তিনি সর্বপ্রথম সামাজিক অবমাননাকর বিধিনিয়মের অবসান ঘটিয়ে মেয়েদের সামাজিক উত্তরণ ঘটানোর চেষ্টা করেন।[২] পরবর্তী শাসক পঞ্চম রাম (১৮৬৮—১৯১০) ছিলেন অধিকতর প্রগতিশীল। তিনি দাসপ্রথার পূর্ণ বিলোপ ঘটান এবং মেয়েদের অধিকতর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ, রাজার অনুপস্থিতিতে রাণী সাঁওভাবা (Queen Saovaba) ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।[৩] রাজনীতি ক্ষেত্রে মেয়েদের অংশগ্রহণের এইটিই প্রথম উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত।

এরপর ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে থাইল্যান্ডে শুরু হয় পশ্চিমীকরণ। কারণ ঐ বছর স্বাক্ষরিত হয় ইঙ্গ-থাই বাওয়ারিং চুক্তি (Bowering Treaty) পশ্চিমীকরণের

অবশ্যম্ভাবী ফল ছিল শিক্ষার প্রসার। শিক্ষার প্রসারের ফলে জন্ম নেয় নারী সচেতনতা। প্রকাশিত হয় মহিলা পত্রিকা ও সংবাদপত্র। অর্থাৎ সর্বপ্রথম মেয়েরা তাদের চিন্তা-ভাবনা ও মতামত প্রকাশের একান্ত নিজস্ব মাধ্যম খুঁজে পায়। ঐতিহাসিক আমারা ফোংসাপিচ (Amara Pongsapich) মনে করেন মহিলাদের পত্র-পত্রিকা ও সংবাদপত্রগুলি প্রকাশিত হয় সেই সকল অবদমিত নারীমনের ক্ষোভস্বরূপ।[৪]

একই সময়ে থাই সমাজে চাকুরীক্ষেত্রে মেয়েদের সম-অধিকার ও নিয়োগের দাবী সোচ্চার হয়ে ওঠে। প্রতিষ্ঠিত হয় বিভিন্ন মহিলা-সঙ্ঘ। থাইল্যান্ডের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য মহিলা সংস্থা ছিল—সফা উনালোম ড্যাং (Sapha Unalom Daeng) যা পরে রেডক্রশ সোসাইটিতে রূপান্তরিত হয়। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এই সংস্থাটি সহ অন্যান্য ক্ষুদ্র মহিলা-সংগঠনগুলি মূলত সামাজিক সেবাকার্যেই নিযুক্ত থাকতো।[৫] বিংশ শতাব্দীর প্রথমযুগ পর্যন্ত সকল নারী সংগঠনগুলিই মূলত সমাজ সেবামূলক কার্যের বাইরে কোনো প্রকল্প গ্রহণ করেনি।

১৯৩২ থাইল্যান্ডের ইতিহাসে এক যুগসন্ধিক্ষণ। ঐবছরই একছত্র রাজতন্ত্রের অবসানে প্রতিষ্ঠিত হয় সাংবিধানকে রাজতন্ত্র। সমাখোম্ সাত্রি (Samakham Satri) থাই হ্যাং সায়াম বা Women's City Club. এই সংস্থার প্রতিষ্ঠা করেন Ying Thai (জিং থাই) পত্রিকা-সম্পাদিকা। এই সংস্থার সদস্য ছিলেন মূলত মধ্যবর্গীয় মহিলাশ্রেণী।[৬]

১৯৩২-এ নবপ্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক সরকার জাতীয় নির্বাচনে মহিলাদের অংশগ্রহণের আহবান জানান। কিন্তু কেবলমাত্র উচ্চবর্গীয় মহিলাদের জন্য এই সুযোগ সীমাবদ্ধ ও এর ফলস্বরূপ ৭ মিলিয়ন জনসংখ্যার মহিলারা বঞ্চিত হবেন—এই অভিযোগে এই আহবান বয়কট করা হয়।[৭] জিং থাই-র বড় কৃতিত্ব নারীমুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে-সঙ্গে সামগ্রিক রাজনীতি ও সমাজ-ব্যাবস্থায় পরিবর্তনের দাবী। শেষ পর্যন্ত অবশ্য এই সংস্থার চরমপন্থী মনোভাবের (Radical Attitude) কারণে সরকারী চাপে এই সংবাদপত্রটি বন্ধ করে দেওয়া হয়।

১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে প্রধানমন্ত্রীর পত্নী প্রতিষ্ঠা করেন মহিলা সাংস্কৃতিক সংস্থা (Women's Cultural Club)। এই সংস্থার উদ্দেশ্য ছিল সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কার্যকলাপ এবং দুঃস্থ মহিলাদের উন্নয়ন।[৮]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্বে আন্তর্জাতিক পরিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে অপরিহার্য হয় থাইল্যান্ডের পরিবর্তনও। এই আন্তর্জাতিক সংযোগের বিষয়টি স্পষ্ট কারণ ১৯৪৮-এ থাইল্যান্ড Universal Declaration of Human Right-এর পক্ষে ভোট দেয়। এরপর অবশ্যম্ভাবী রূপেই আন্তর্জাতিক উন্নয়নের পথ ধরেই থাইল্যান্ড মহিলাদের বিরুদ্ধে সর্বপ্রকার বিরোধিতার বিপক্ষে গৃহীত কনভেনশানের

(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination) পক্ষে মত প্রকাশ করে।[৯]

Universal Declaration of Human Right-র অন্তর্গত বিভিন্ন পরিবর্তন সূচিত হয় থাইল্যান্ডে। উদাহরণ স্বরূপ—থাই মহিলাদের রাজনৈতিক অধিকারসমূহ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে সমঅধিকার সহ মহিলাদের পৃথক নির্বাচন কার্যালয় প্রতিষ্ঠার অধিকার দেওয়া হয় একটি অন্তর্বর্তী জাতীয় সংবিধান (অনুচ্ছেদ ১১ ও ১২) অনুসারে। পরবর্তীকালের সকল জাতীয় সংবিধান এবং নির্বাচন আইন অনুসারে থাই মহিলাদের এই সকল অধিকারের আইনগুলি অপরিবর্তিত থাকে।[১০] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এইভাবে প্রদত্ত রাজনৈতিক ও আইনবিষয়ক অধিকার সমূহ মহিলাদের রাজনীতি ও সমাজে সমঅধিকারের স্বীকৃতি দিলেও সার্বিক বাতাবরণ বা মানসিকতার পরিবর্তন তাৎক্ষণিক ছিল না। অর্থাৎ সামাজিক বিধিনিষেধ বা সংকুচিত মানসিকতার বেড়াজাল অতিক্রম শুরু হয়নি অনতিবিলম্বে। এই ধরনের মানসিকতার ফলেই সংসদীয় গণতন্ত্রে পরবর্তী দুই দশক কোন মহিলা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেননি। এই অধিকারের প্রথম ব্যবহারিক প্রয়োগ দেখা যায় ১৯৪৯-এ যখন Ubon Ratchathani (উবন রাজথানী) থেকে Mrs. Orapin Chaiyakorw প্রথম পার্লামেন্টের প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। ঐ বছরই সেনেটর পদেও যোগ দেন দুই মহিলা।[১১]

১৯৭০-র দশকের শুরু ছিল থাই-ইতিহাসে এক যুগসন্ধিক্ষণ। ১৯৭৪-এ নবগৃহীত সংবিধানে (অনুচ্ছেদ ২৮) সর্বপ্রথম বলা হয় 'নারী এবং পুরুষ সম অধিকারের অধিকারী এবং বৈষম্যকারী আইন, যথা Ministry of Interior Regulations গুলির সংশোধন প্রয়োজন।'[১২]

এই সময়ে বিশ্বব্যাপী ১৯৭৫-কে আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ ও ১৯৭৬—১৯৮৫ নারীদশক রূপে ঘোষণা করা হয়। এর প্রভাব দেখা যায় থাইল্যান্ডেও। থাই সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং NESDB (National Economic & Development Board)-র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের সার্বিক মান উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প গৃহীত হয়। এছাড়া দীর্ঘ ২০ বছর মেয়াদী নারী উন্নয়ন পরিকল্পনা স্বীকৃতি পায় ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দে।[১৩] এই ধরনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে, নূতন মহিলা সংস্থাসমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়, যে গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য সমাখোম্ ম্যাবান ফিথাক থাই (Samakhom Meban Phithak Thai) অর্থাৎ Thai Security Housewives Association উল্লেখযোগ্য।

১৯৮০-র দশক থাই নারীর রাজনৈতিক কার্যকলাপের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে। এই সময়ে কলেজ ক্যাম্পাসে মেয়েদের সংগঠনগুলি সক্রিয় হয়ে ওঠে। গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন সমূহের মধ্যে Association for the Promotion of

the Status of Women: The Association for Civil Liberty, The Christian Women's Association, The Women Information Centre প্রমুখ উল্লেখ্য। এই সকল সংগঠনগুলির কার্যকলাপ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, ক্রমে মহিলাদের রাজনৈতিক অধিকার ও দায়িত্বের প্রশ্নটি বিবেচিত হয়।[১৪]

থাই নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণের অনুরূপ চিত্রটি কিন্তু নগরাঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল। গ্রামে ১৯৮২-র পূর্বে কোন বৃহৎ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না। প্রচলিত ১৯১৪-র স্থানীয় প্রশাসন আইন (Local Administration Act) অনুসারে গ্রামের প্রধান বা ফু-ইয়াই-বান্ (Phu-Yai Ban) পদে একমাত্র পুরুষরাই প্রার্থী হতে পারতেন। ১৯৮২-তে এই আইনের সংশোধন করা হয় এবং গ্রাম ও জেলাস্তরের প্রশাসনে মেয়েদের অংশগ্রহণ স্বীকৃত হয়। গ্রামপ্রধান স্থানীয় প্রশাসনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং ফলে ১৯৮২ সংশোধন মহিলাদের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিবন্ধকতার সমাপ্তি ঘটায়।[১৫]

আজকের থাইল্যান্ডে রাজনীতিতে নারীর অংশ গ্রহণের বিষয়টি সার্বিক স্বীকৃতি পায়নি এবং ব্যাপকতার দৃষ্টিভঙ্গিতেও এটি বিশাল আকার ধারণ করেনি। সার্বিক স্বীকৃতি পায়নি কারণ আজও থাইল্যান্ডের আইনে কিছু ক্রটিবিচ্যুতি লক্ষ্যণীয়। Ministry of Interior-র আজও ক্ষমতা আছে ডেপুটি জিলাধিকারী পদে প্রার্থী নিয়োগের যোগ্যতা পরিবর্তন করতে পারে। অতি সাম্প্রতিককালে প্রাদেশিক গভর্ণর পদে মহিলা-প্রার্থী নির্বাচিত হলে ব্যাপক-প্রতিরোধ দেখা দেয়। প্রসঙ্গত নোন থাবুরী (Nonthaburi) প্রদেশের সহগ্রামপ্রধানের উক্তি প্রণিধানযোগ্য— "My husband, for family reasons does not agree with my job."[১৬]

ঐ প্রদেশেরই মহিলা গ্রামপ্রধানের বক্তব্য—"One problem facing my position as a female village Head is that I am still not accepted by all. Some regard the position I hold as being for men."[১৭] ব্যাপকতার প্রশ্নেও সংখ্যাতত্ত্ব দিয়ে বিচার করলেও আজকের থাইল্যান্ডে রাজনীতিতে মেয়েদের অংশগ্রহণ অত্যন্ত সীমিত। ১৯৮০-র দশকের শেষ পর্যন্ত স্থানীয় ও জাতীয়-পর্যায়ের রাজনীতিতে মেয়েদের অংশ গ্রহণের হার অত্যন্ত নগণ্য। স্থানীয়-পর্যায়ে ১%-র কম মহিলা ছিলেন নির্বাচিত প্রার্থী। অন্য দিকে জাতীয়-পর্যায়ে মনোনীত মহিলা সেনেটরের হার ছিল ১.৯% এবং নির্বাচিত প্রতিনিধির হার ২.৮%।[১৮]

আজও থাইসমাজে সামাজিক মনোভাব একটি সমস্যা। আজও পিতা-মাতাগণ প্রযত্ন ও শিক্ষা বিষয়ক সুযোগসুবিধার দিকটি সমদৃষ্টিতে বিচার করেন না। প্রকৃতপক্ষে দীর্ঘদিনব্যাপী সামাজিক বিধি ও বিশ্বাস যেভাবে মেয়েদের স্বাধীনতার

প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে তা সহজে দূর করা সম্ভব নয়। সরকার বিভিন্ন প্রকল্পের সাহায্যে পিতা-মাতা বা অভিভাবকদের পুত্র-কন্যার প্রতি সমব্যবহারে উৎসাহিত করেন। এছাড়া মাস-মিডিয়াতেও ভেদাভেদ দূর করার উপযুক্ত অনুষ্ঠান দেখানো হয়। বর্হিজগতে মেয়েরা যাতে অধিকতর অংশগ্রহণে সক্ষম হয়, সেজন্য সন্তানপালন ও রক্ষণ বিষয়ে সরকার-পক্ষে সাহায্য করা হচ্ছে। আশা করা যায়— অদূর ভবিষ্যতে মেয়েরা নিজেদের শ্রম বিনিময় করে এবং সরকারী সাহায্যে ক্রমে তাদের যোগ্য সামাজিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হবে।

সূত্র নির্দেশ

১. Bencha Yoddumnern— Attig, "Thai Family Structure and Organisation: changing roles and duties in Historical Perspective" **Changing Roles and Statuses of Women in Thailand, A documentary assement,"** Institute for Population and Social Research, Mahidol University, পৃঃ ১০। দেশীয় আইন অনুসারেও হেয় ছিল নাবীব অধিকাব। আয়ুথিয়া যুগের শুরুতে ১৩৬১ খ্রীষ্টাব্দে গৃহীত হয়— 'The Laws on Husbands and Wives' এই আইন অনুসাবে পুরুষ বহুবিবাহেব অধিকাব পায় এবং পত্নীদেব বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। বাতানাকোসিন যুগেব শুরুতেও অন্যান্য বহুবিধ আইনেব সাহায্যে মেয়েদের সামাজিক সম্মানকে হেয় কবা হত।

২. Vitit Muntarbhorn, **Women's Development in Thailand,** Thailand National Commission on Women's Affairs for the World Conference of the United Nation's decade for Women, Nairobi, Kenya, 15-26 July, 1985, পৃঃ ১৩। চতুর্থ রামের কৃতিত্ব তিনি আইন করে নারীবিক্রয় প্রথা বন্ধ করেন এবং মেয়েদের ইচ্ছাব বিরুদ্ধে বিবাহ অস্বীকৃত ঘোষণা করেন।

৩. Amara Pongsapich, **Women in Thailand,** Occassional paper, Publication No. 3/1988, Women Studies Program, Chulalong Korw University Social Research Institution. Bangkok, p. 64

৪. ঐ

৫. Chandhamrong Churairat, **The Development of Womens' Organisation in Thailand,** Occassional Paper, Department of Sociology and Anthropology, Thammasat University, May 8, 1985

৬. Amara Pongsapich, পূর্বোল্লেখিত, পৃঃ ৬৭—৬৮।

৭. ঐ

৮. ঐ, পৃঃ ৬৮।

৯. Vitit Muntarbhorn, Wimolsiri Jamnarnvej and Tandwadee Boonlue, **Status of Women,** Thailand, Unesco, 1990, পৃঃ ৫।

১০. Report on First National Assembly on Women in Development in the year of Thai Women, 1992, 1-2 March, 1992, পৃঃ ৩৩

১১. Amar Pongsapich. পূর্বোল্লেখিত, পৃঃ ৮৩।

১২. Vitit Munstarbhorn ও অন্যান্য লেখকগণ, পূর্বোল্লেখিত, পৃঃ ৫।

১৩. Amara Pongsapich, পূর্বোল্লেখিত, পৃঃ ২৭–২৮।

১৪. ঐ

১৫. **Women in Thai Politics & Public Life: TDSC and Friends of Women Compilation,** Thai Development, News lettter, No. 19, 1991 p. 35.

১৬. Vitit Muntarbhorn ও অন্যান্য পূর্বোল্লেখিত, পৃঃ ২৪।

১৭. ঐ

১৮. Suteera Thomson, **Gender Issaes in Thailand Development,** Gender and Development Research Institute, Bongkok, 1991, পৃঃ ৫।

১৯১৭ থেকে ১৯২১ পর্যন্ত
রুশ কৃষক সমাজের পরিস্থিতি ও প্রতিক্রিয়া

নন্দিনী ভট্টাচার্য

১৯১৭-র রুশ-বিপ্লব এক নতুন মতাদর্শের জয় ঘোষণা করে। আর সেই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের 'কৃষকনীতি' হয়ে ওঠে এক গভীর বিতর্কের বিষয়। যদিও রাশিয়ার জনসংখ্যার বিপুল অংশ ছিল কৃষকশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত তবু বলশেভিক দল কিন্তু মার্কসীয় মতধারার অনুগামী হওয়ার দরুণ তাদের প্রাথমিক ভিত্তি স্থাপন করে নগরবাসী শ্রমিকশ্রেণীর উপরেই। কিন্তু ১৯১৭-র অক্টোবর বিপ্লবের সূচনা থেকেই দেখা যায় যে কৃষকশ্রেণীর অংশগ্রহণে সনাতন কৃষিব্যবস্থা ভেঙে পড়ে—যার ফলে জারের আমলের রাজনৈতিক ও সামরিক নিয়ন্ত্রণ কাঠামো সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়। এর ফলে ক্ষমতায় আসীন হয়ে বলশেভিক সরকাবকে স্বভাবতই একটি স্বতন্ত্র, নিজস্ব, নতুন কৃষকনীতি গ্রহণ করতে হয়। এবং বলশেভিক সরকারের এই নতুন কৃষি-ব্যবস্থা ও কৃষকনীতিই বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচিত ও সমালোচিত হযেছে। এর ফলে সৃষ্ট জটিল বিতর্কে অনেক সময়ে পরস্পরবিরোধী রাজনৈতিক বর্ণের উপস্থিতিতে প্রকৃত ঘটনার রূপ অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। খুব সাম্প্রতিককালে পুনরায় সামাজিক ইতিহাস রচনার প্রবণতায় বিষয়টিকে কিছুটা নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করার প্রয়াস শুরু হয়েছে।

বিপ্লবের সূচনা থেকে শুরু করে NEP-এর প্রবর্তন পর্যন্ত সরকারের কৃষক-নীতিকে তিন শ্রেণীর ঐতিহাসিক তিন ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। এর প্রথম সারিতে ছিলেন বলশেভিক নীতির অন্ধসমর্থকগণ, যথা—S. Trapeznikov প্রমুখ। এঁদের মতে বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার কৃষককুল এক অভিনব জীবন ও জগতের প্রতিশ্রুতি পায়। নতুন সরকার কৃষক সমাজের প্রতি যুগ্ম দায়িত্ব গ্রহণ করে যার প্রথমটিতে ছিল চরম দারিদ্র্য ও অভাব-পীড়িত কৃষককুলের দ্রুত অবস্থার উন্নয়নের আশ্বাস আর দ্বিতীয়টি ছিল তাদের মতাদর্শের অঙ্গ রূপে কৃষক-সমাজকে ধীরে ধীরে মার্কসীয় সমাজতন্ত্রের মন্ত্রে দীক্ষিত করে তোলা (পৃঃ ২৬, ৪০৭, **Leninism & the Agrarian & Peasant Question, Vol-I, S. P. Trapeznikov**)। মতাদর্শগত পন্থাটির উপর বিশেষ জোর দিয়ে এই পক্ষের ঐতিহাসিকেরা বলেন যে শ্রেণী-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দরিদ্র কৃষক-সমাজ ধনী ও ধনতন্ত্রী কৃষকের নিষ্পেষণ থেকে মুক্তির পথে অগ্রসর হয়—তাই

এই দৃষ্টিকোণ থেকে যে কোন পরিস্থিতিতেই কৃষকের পক্ষে কোন সরকারী নীতির সমালোচনা বা প্রতিবাদ ছিল নিঃসন্দেহে ধনতন্ত্রী কুলাক গোষ্ঠীর অন্যায় প্ররোচনার ফল— কারণ সরকারের নূতন মূল্যবোধে কৃষকদের সামগ্রিক উন্নতি সাধন ছিল একটি নৈতিক দায়িত্ব। আর এ দায়িত্ব ছিল সমাজতন্ত্র গঠনের মহান দায়িত্বের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই আদর্শগতভাবে এ সরকার কখনোই কৃষক স্বার্থের বিপরীতে যেতে পারে না। তাই যে কৃষক নতুন ব্যবস্থার প্রতিবাদ করেছে সে নিঃসন্দেহে নূতন মতাদর্শের বিরোধী—অর্থাৎ বিরূপ মতাদর্শে প্রভাবিত কুলাক মানসিকতার শিকার—বিপ্লবের স্থায়িত্বের স্বার্থে তাই এজাতীয় প্রতিবাদকে বিন্দুমাত্র সহানুভূতি দেখানো যায় না।

এর ঠিক বিপরীত মেরুর ঐতিহাসিক O. H. Radkey, David Mitrany—এঁদের বক্তব্যে ফুটে ওঠে বলশেভিক সরকারের কৃষক শোষণের সচেতন রূপ—প্রাক্-বিপ্লব রাশিয়াতে কৃষক সমাজে SR-দলের প্রভাব ছিল সর্বাধিক। Radkey, SR দলের স্বপক্ষে বলেছেন যে, বলশেভিকদল ক্ষমতালাভের অব্যবহিত পরেই কৃষক সমাজকে SR-দলের প্রভাবমুক্ত করবার জন্য বদ্ধ পরিকর হয়ে ওঠে এবং মেষরূপী নেকড়ের মত সরল কৃষক-সমাজকে তার গ্রাসের সামগ্রী করে তোলে—সেখানে SR দলের সাহচর্য থেকে কৃষকদের ছলে-বলে-কৌশলে বঞ্চিত করে ক্ষমতালব্ধ শাসকদল। [পৃষ্ঠা-২০৩, **The Sickle Under the Hammer, O. H. Radkey**]। এক্ষেত্রে তাঁর এবিষয়ক গ্রন্থটির শিরোনাম "Sickle Under the Hammer" তাঁর ধারণার স্পষ্ট প্রমাণ বহন করে। তিনি বলেন যে, যেহেতু SR দল কৃষকদের স্বীয় স্বাধীন মতামত ও নিজস্ব প্রয়োজনের উপরে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করত তাই বলশেভিক সরকার তার মতাদর্শের ধ্বজার আড়ালে SR-দলকে নিশ্চিহ্ন করবার সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা চালায়। তিনি নির্দ্বিধায় স্পষ্ট বলেন যে, "শ্রেণী-সংগ্রামের ধারণার প্রয়োগের দ্বারা, এ সরকার কৃষক ব্যক্তিত্বের দৃঢ়ত্ব নির্মূল করে দেয়—'কুলাক' ধারণার প্রয়োগ ঘটিয়ে— এভাবে তারা উদ্যোগী ও ক্ষমতাসম্পন্ন কৃষকদের নিশ্চিহ্ন করে কৃষক অস্তিত্বের মেরুদণ্ডে কশাঘাত হানে। [পৃষ্ঠা-২৭৮, O. H. Radkey, **The Sickle Under the Hammer**] এভাবে এঁদের ধারণায় বলশেভিক দলের প্রতিটি কৃষক নীতিই ছিল উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে কৃষক সচেতনতা বিনষ্ট করবার প্রচেষ্টা।

এই উভয় দৃষ্টিভঙ্গীরই অতিশয়োক্তি সংশোধনের প্রয়োজন আছে। কৃষক-সমাজকে দলভুক্ত করবার উদ্দেশ্যে বলশেভিকরা যে মতাদর্শের প্রয়োগ ঘটিয়েছিল তা কেবলই সুযোগসন্ধানী মনোবৃত্তি নয়—তাতে কিছু যথার্থ আদর্শ ও আশার ভূমিকা ছিল। অপরপক্ষে দলের অন্ধ সমর্থকরা যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ও নূতন

যুগের পদসঞ্চার বর্ণনা করেছেন তাও নিঃসন্দেহে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত অলীক কাহিনী—তাতে তথ্যের ভিত্তি অত্যন্ত দুর্বল।

আধুনিক সামাজিক গবেষক Orlando Figes, Donald J. Raleigh প্রমুখ বিষয়টিকে পর্যালোচনা করেন কৃষক প্রয়োজন ও সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে—সমসাময়িক পরিস্থিতির তাৎপর্যের ভিত্তিতে। তাঁরা তত্ত্বগতভাবে কোন পক্ষ সমর্থন লক্ষ্যে রেখে গবেষণায় অগ্রসর হননি। তাঁদের এই তথ্যভিত্তিক অনুসন্ধানকে মূলে রেখে বলশেভিক নীতি ও কৃষক প্রতিক্রিয়া পর্যালোচনা করলে একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র পাওয়া যায় যেখানে একটি জটিলতর পরিস্থিতি ও স্ববিরোধী নীতির উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়।

বস্তুতঃ বিপ্লব কোন মন্ত্রবলে যুগপরিবর্তন সাধন করতে পারে না—বিপ্লবের দাবীতে পৌঁছাতে গেলে বিপ্লবকেও বিবর্তনের পথ ধরতে হয়। কৃষকশ্রেণীর প্রতি বলশেভিকদলের দৃষ্টিভঙ্গীও ১৯১৭ থেকে ১৯২১-র এই ক্ষুদ্র পরিসরেই এক স্পষ্ট বিবর্তনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে।

যাইহোক, সদ্যবিপ্লবজাত বলশেভিক সরকার মূলত দুটি কারণে চরম জটিলতার সম্মুখীন হয়, এর প্রথমটি ছিল বলশেভিক দলের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগঠনে কৃষক-সমর্থন সম্পর্কে সন্দেহ। যার ব্যাখ্যায় বলা যায় যে শ্রমিক-কৃষক একতার প্রয়োজন স্বীকার করলেও বলশেভিকদের ধারণা ছিল যে তারা কৃষক সমর্থন লাভ করবে কেবলমাত্র গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে। তাই ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের অব্যবহিত পরে প্রাক্তন জারতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ ধ্বংসীকরণে ও পুরাতন আঞ্চলিক শাসন কাঠামো ভাঙতে উদ্যত স্বতঃস্ফূর্ত কৃষকসমাজ বলশেভিকদলের সমর্থন লাভ করে। অক্টোবর বিপ্লবের পরেও এই কৃষক প্রয়াস অব্যহত থাকে। এ সময়ে দেখা যায় যে কৃষকরা সরকারের সমর্থনে নূতন কৃষক সমিতি গঠন করে এবং নতুন সরকারের জমির বণ্টনকে প্রশংসা করে। প্রাথমিক স্তরে লেনিনসহ অন্যান্য নেতারাও কৃষকদের এই স্বতঃস্ফূর্ত আঞ্চলিক প্রশাসন মেনে নিয়েছিলেন এবং প্রাথমিক গ্রাম সোভিয়েত গঠনের কাজে উপস্থিত কৃষক সমিতিগুলির ইচ্ছার উপর যথেষ্ট আস্থা প্রকাশ করেছিলেন.। কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে যখন কৃষকের মধ্যে ধনী-দরিদ্র বিভেদের ভিত্তিতে শ্রেণী-সংগ্রাম গড়ে তোলার নীতি গৃহীত হয়—তখন থেকেই দেখা দেয় নীতির সঙ্কট ও সরকারের নীতিতে কৃষকের বাধাদান। এর কারণ ছিল প্রধানত জমি পুনর্বন্টনের ফলে চরম দরিদ্র কৃষকের সংখ্যা হ্রাস পেয়ে অধিকাংশের মধ্যবিত্ত কৃষকে রূপান্তর। যার ফলে বলপূর্বক কৃত্রিম বিভেদের রেখা টেনে কৃষকদের মধ্যে শ্রেণী-সংগ্রামের মানসিকতা বিস্তার করবার প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল। ঘটনাবলীর পারম্পর্যে এবিষয়টির আলোচনা আরো তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠবে। অন্যদিকে অবশ্য এক আকস্মিক আপৎকালীন বিপর্যয় দেখা

দিয়েছিল—তা শ্বেতবাহিনীর গৃহযুদ্ধ ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ—দুটি বিপদের যুগপৎ মোকাবিলায় সচেষ্ট নবগঠিত সরকারের বাস্তবিক উপায়হীনতা। এই দুই ভিন্ন প্রকৃতির কারণ কিন্তু কালের গতিতে একই প্রবাহে অগ্রসর হয়ে বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার কৃষক সমাজের অস্তিত্বকে নানা দিক থেকে বিপন্ন করে তুলেছিল।

ঘটনাবলীর দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে রাশিয়ার গ্রামাঞ্চলে বিপ্লবের সূচনা হয় ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের অব্যবহিত পরে। এই সময়েই কৃষকদের মধ্যে এক স্পষ্ট রাজনৈতিক চেতনা জাগে যার প্রতিফলন দেখা যায় জারতান্ত্রিক 'ভলস্ট' ব্যবস্থা ধ্বংস করে। 'কৃষক সমিতি' গড়ে তোলার উদ্যোগের মধ্য দিয়ে। এমনকি কৃষকদের স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠা সংগঠনগুলিকে মেনে নিতে তদানীন্তন সরকার বাধ্য হয়। কৃষকদের মধ্যে জাগে স্বনির্ভরতার এক অভূতপূর্ব বিশ্বাস। এমনকি দেখা যায় যে অনেক ক্ষেত্রে সাংবিধানিক সরকারের সৃষ্ট নির্বাচন ব্যবস্থাকে বয়কট করে সারাটভ, সামারা প্রভৃতি অঞ্চলে কৃষকরা স্বসৃষ্ট কৃষক সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে নানা দাবীতে সোচ্চার হয়ে ওঠে। জমিদার-প্রভুদের জমি ও সম্পত্তি দখল করবার প্রয়াসে কোন সরকারী বাধাই এ-সময়ে কার্যকরী হয়নি। এরপর অক্টোবরের বলশেভিক বিপ্লব যে কৃষকদের ধ্যানধারণা বা আন্দোলনে কোন চরিত্রগত পরিবর্তন সাধন করেনি তা স্পষ্ট—তবে নিঃসন্দেহে নতুন সরকার এদের জমি দখল ও বণ্টনের প্রয়াসকে আইনগত মর্যাদা দিয়ে তাদের কার্যাবলীতে এক নতুন মাত্রা সংযোজন করেছিল। ঐতিহাসিক E. H. Carr এ প্রসঙ্গে বলেছেন যে, বলশেভিক দলই প্রথম বৈপ্লবিক বিশ্বাসে কৃষকের পক্ষ থেকে জমিদারের জমি বলপূর্বক লুণ্ঠন করার প্রয়োজনীয়তা আইনগতভাবে স্বীকার করেছিল। [পৃষ্ঠা-৩৬, E. H. Carr, **The Bolshevik Revolution**, 1917–1923, Vol-II]

এর পরবর্তী পর্যায়ে পুরাতন গ্রামের 'ভলস্ট জেমস্টেভো'র কাঠামো বর্জন করে নতুন 'গ্রাম সোভিয়েত' গঠনের প্রয়াস শুরু হয় সরকারী পক্ষ থেকে। Orlando Figes বলেছেন যে এই ক্ষমতা হস্তান্তর ঘটে যায় অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে ও দ্রুতগতিতে [পৃষ্ঠা ৬৪, Orlando Figes, Peasant Russia Civil War.]। এমনকি কোন কোন সোভিয়েত ঐতিহাসিকদের মতেও ৯৮.৫% ভলস্ট-জেমস্টেভো স্বতঃস্ফূর্তভাবে সোভিয়েত ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হয়েছিল (পৃষ্ঠা ২১ ,Grishaev, Stroitel'stvo Sovetov.)।

এই সময়ের কৃষক সমাজে বেশ কিছু পরিবর্তন সূচিত হয়। গ্রাম্য সোভিয়েতগুলির কার্যনির্বাহক সংস্থা বা VIK অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে—রাজস্ব আদায়, নির্বাচন পরিচালনা, স্থানীয় বিচার ও শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা প্রভৃতি দায়িত্বে এ সংস্থা যথেষ্ট কার্যকরী হয়। আর এই জাতীয় প্রশাসনিক দায়িত্ব বহনের

জন্য অনেক সময় পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি বা অ-কৃষক প্রতিনিধিদের বিভিন্ন VIK-এর সদস্য হতে দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে কিছু সোভিয়েত সরকারের পক্ষ সমর্থক ঐতিহাসিক বলেছেন যে VIK-এর চরিত্র ছিল ধনী কৃষক বা কুলাকদের প্রভাব বিস্তারের একটি ক্ষেত্র। আবার Gerasimenko বা Semıonov-এর মত ঐতিহাসিকেরা এমতের কিছুটা সংশোধন করে বলেছেন যে প্রথমদিকে VIK বা গ্রাম সোভিযেত দরিদ্র কৃষকের স্বপক্ষেই ছিল কিন্তু ক্রমশ সময়ের অভাবে এবং কৃষিক্ষেত্রেব প্রযোজনে কর্মী কৃষকরা যথেষ্ট সময় দিতে না পাবায় কুলাক শ্রেণীর প্রশাসনে অংশগ্রহণ ও নিয়ন্ত্রণের পথ প্রশস্ত হযেছিল। তবে Figes-এই দুই মতেরই তীব্র সমালোচনা করে বলেছেন যে যদিও কিছুসংখ্যক অ-কৃষক ব্যক্তিত্ব বা পূর্বের ব্যবস্থায অভিজ্ঞ ব্যক্তি তখনও গ্রামের ব্যবস্থাপনার অংশীদার ছিল কিন্তু তারা কখনোই কৃষক স্বার্থের প্রতিকূলে যাযনি। তাঁব ভাষায এরা বলশেভিক মতের প্রতি দায়বদ্ধ না হ'লেও কৃষক স্বার্থের প্রতি দায়বদ্ধ ছিল। (পৃষ্ঠা ৮১, ৮২, ৮৩; O. Figes, **Peasant Rusia Civil War**))। তিনি সোভিযেত ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিভঙ্গীকে তীব্র বিদ্রূপ করে বলেছেন যে যখনই কোন বিষযে বলশেভিক দলের সঙ্গে গ্রাম সোভিয়েতের কোন সদস্যের মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে তখনই সে-ব্যক্তি কুলাক স্বার্থের প্রতীকরূপে চিহ্নিত হযেছে।

একই ভাবে দেখা যায় ভূমিবন্টন প্রসঙ্গে সোভিয়েত ঐতিহাসিকদের "শ্রেণী সংগ্রাম" বর্ণনার প্রয়াস যা সরকারী বর্ণনারই বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়। সরকারী নথি অনুযায়ী জমিবণ্টন পদ্ধতি অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে দ্রুতগতিতে নিষ্পন্ন হয়েছিল অধিকাংশ অঞ্চলেই। সেখানে কৃষকদের মধ্যে কোন জমি প্রসঙ্গে বিরোধ বা বিবাদ হলেও তা কোন শ্রেণীচরিত্র দিয়ে ব্যাখ্যা করবার বিষয় নয়। বস্তুত সকল কৃষকই জমি বণ্টনকালে তাদের সনাতন সাম্যভিত্তিক কমিউন ব্যবস্থার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে উৎসাহে অগ্রসর হয়েছিল।

নতুন গ্রাম-সোভিয়েত, VIK ও কৃষকসমিতি সহ গড়ে ওঠা কমিউন ব্যবস্থা প্রাথমিকভাবে কৃষক আশা-আকাঙ্খা পূরণে সক্ষম হলেও অচিরেই তার অজস্র দুর্বলতা দেখা দেয়। এর নানা কারণ ছিল, যথা—জনসংখ্যাবৃদ্ধি, বহু সৈনিকের যুদ্ধ থেকে গৃহে প্রত্যাবর্তন, শহরের প্রয়োজনীয় দাবী ইত্যাদির সমন্বয়ে উৎপাদনের উপর যে চাপ সৃষ্টি হয় তা স্বয়ংসম্পূর্ণ ক্ষুদ্র গ্রাম-প্রশাসনের পক্ষে দূরীকরণ সম্ভব হয় না। উপরন্তু গৃহযুদ্ধের সূচনায় বেশ কিছু শস্য-উৎপাদক অঞ্চল (ইউক্রেন) শত্রুপক্ষের হস্তগত হওয়ায় সমস্যা আরো প্রকট রূপ ধারণ করে এবং এই সময় থেকেই সামগ্রিক দেশের বিপন্ন পরিস্থিতিতে সরকারের কৃষকনীতিতেও আসে ব্যাপক পরিবর্তন। স্বয়ংসম্পূর্ণ কমিউন ব্যবস্থার পক্ষে এসময়ে নিজস্ব

কৃষক-সমাজের প্রয়োজন সম্পূর্ণ মিটিয়ে শহরে ও যুদ্ধক্ষেত্রের দাবী পূরণ করা ছিল অসম্ভব—অবশ্যই এর পশ্চাতে ক্ষুদ্রায়তন কৃষির যে আদর্শ কমিউন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল তার ত্রুটিও যুক্ত ছিল। অপরদিকে ছিল যুদ্ধ-ক্ষেত্রের অগ্রাধিকার ও শহরগুলিতে শ্রমিক-শ্রেণীব ক্রমবর্ধমান খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা। বস্তুত শ্রমিক গোষ্ঠীর পক্ষে দ্রুত শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব না হলেও কৃষিক্ষেত্র তার উপস্থিত অনুন্নত উৎপাদন ব্যবস্থাতেও শোষণের অনুপস্থিতিতে যথাসাধ্য উন্নতি করতে পেরেছিল যার ফলে তারা চির-নিপীড়িতের স্মৃতি ভুলে এক শোষণ-মুক্ত স্বচ্ছল জীবনযাত্রার আশায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। ঠিক এই মুহূর্তে বাস্তব পবিস্থিতির সংকট কৃষক জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষায আনল আকস্মিক যবনিকা। সরকারের পক্ষে কমিউন ব্যবস্থার সিদ্ধান্তে আস্থাশীল থাকা অসম্ভব হযে পড়ল। তাই সবকার বাধ্যতামূলক শস্য সংগ্রহের নীতি গ্রহণ করল ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে। বাস্তবে কৃষকের পরিশ্রম ও ন্যায্য প্রাপ্যের দাবীকে এসময়ে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করা হয়েছিল। অর্থাৎ, প্রযোজনের দাবীতে ন্যায-অন্যাযের প্রশ্ন ম্লান হযে যায়। তত্ত্বগতভাবে বলশেভিক সরকারের এই সঙ্কটকালীন নীতির পরিচিতি ছিল "War Communism"-শিরোনামে— যার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় চিরদিন বলশেভিকদল প্রয়োজনের সঙ্গে মতাদর্শের সাদৃশ্য ব্যাখ্যা করে কৃষকদের প্রতি অবিচারকে অস্বীকার করতে সচেষ্ট হযেছে।

ঘটনাপঞ্জীর নিরিখে বলশেভিক সরকার তখন যথার্থই উভয়সঙ্কটে। একদিকে শ্বেতবাহিনীর আক্রমণ, অপরদিকে মেনশেভিক এবং দক্ষিণ ও বামপন্থী SR দল গ্রামাঞ্চলে বলশেভিক-বিরোধী বিক্ষোভ গড়ে তুলতে থাকে সরকারের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে। বলশেভিকদের আশঙ্কা হয় যে এইসব দলগুলি এরপর শ্বেতবাহিনীর সঙ্গে মিলিত হবে এবং শস্য উৎপাদক-অঞ্চলগুলি হস্তগত করে বলশেভিক সরকারের পূর্ণ পতন ডেকে আনবে। আর এখানে আবার তাঁদের 'কুলাক'-কৃষক সম্পর্কে ভীতি বৃদ্ধি পায় কারণ কুলাকরা তাঁদের মতে ছিল বিত্তশালী ও ক্ষমতাসম্পন্ন কৃষক, যারা তাদের অসন্তোষের সমর্থন পাচ্ছিল বিরোধী-দলগুলির প্ররোচনায়। সরকার প্রতিমুহূর্তে প্রতিবিপ্লবের আশঙ্কায় প্রমাদ গুণছিল।

অপরদিকে শহরগুলির অধিবাসীদের পক্ষ থেকেও শস্য আমদানীর দাবী ক্রমশ বাড়তে থাকে। Sylvana Malle তাঁর "Economies of War Communism"-গ্রন্থে শহরবাসীদের গ্রামের প্রতি মনোভাব স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে শহরের শ্রমজীবী ব্যক্তিরা ক্রমশ গ্রামের কৃষকদের প্রতি শস্যের দাবীতে সোচ্চার হতে থাকে। তিনি বলেছেন যে এ সময়ে শ্রমিকদের চিন্তায় একটি ঈর্ষারও ভূমিকা ছিল কারণ গ্রামের কৃষক এ দু-বছরে তাদের জীবনযাত্রার যথেষ্ট উন্নতি ঘটাতে পেরেছিল কিন্তু শ্রমিক সমাজের সমস্যা জটিলতর

হয়েছিল উৎপাদন হ্রাস পাবার ফলে। Malle-এর নিজের ভাষায় তাই, "This resentment found 'a fertile soil' in the ideological background of class-struggle and the Balshevik leadership was inclined to interpret the food crises mainly in terms of speculation and unlak greed rather than the general economic disorganization....." [পৃষ্ঠা-৩২৯ ; Sylvana Malle, **Economies of War Communism**]

এদিকে কৃষকদের সামগ্রিক উপস্থিতিকে খণ্ডিত করে দরিদ্র কৃষক সংগঠন বা 'Kombedy' গড়ে ওঠে যার উপরে কুলাক কৃষকদের সঞ্চিত শস্য দখল করবার দায়িত্ব ন্যস্ত হয়—এর দ্বারা লেনিনসহ সকল বলশেভিক নেতারা গ্রামাঞ্চলে কৃষক শ্রেণীসংগ্রাম গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেন। কিন্তু কৃষকদের চিরাচরিত পারিবারিক একাত্মতার বোধ ও সনাতন বিশ্বাসের সঙ্গে দরিদ্র কৃষকদের জন্য পৃথক সংগঠনটির কোন সামঞ্জস্য ছিল না। ঘটনাক্ষেত্রে দেখা গেল অনেক সময়েই নির্বিচারে সকল কৃষকই Komkedy-র সদস্য হল। এবং এ সংগঠনের মধ্যে কোন প্রকার শ্রেণী বিভেদের মনোভাবই দৃঢ় হতে পারেনি—তাই শ্রেণী-সংগ্রামের পথেও তার কোন ভূমিকাই জাগেনি। এই কারণে লেনিনসহ সকল দলীয় সদস্য Kombedy-র সমালোচনায় বলেছেন যে, এই সংগঠনটি কুলাক প্রভাবাচ্ছন্ন হয়ে যাওয়ায় তার স্বীয় দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে। Figes কিন্তু মনে করেন যে Kombedy-তে দরিদ্রতম কৃষকের শ্রেণীশত্রু কুলাকের প্রতি অসন্তোষ দানা বাঁধতে পারেনি তার কারণ এ জাতীয় মনোভাবের অনুপস্থিতি। তিনি বলেন যে, এ সময়েও গ্রামাঞ্চলের কৃষকদের আর্থ-সামাজিক বিভাজন তাদের স্বভাবিক একাত্মতাকে অতিক্রম করতে পারেনি। [পৃষ্ঠা—১৮৮, ১৮৯, ১৯০, ১৯২, Orlando Figes—**Peasant Russia Civil War**] অবশেষে ১৯১৮-র নভেম্বরেই Kombedy-র অকৃতকার্যতার জন্য সংগঠনটি বিলুপ্ত করা হয়।

এমতাবস্থায় কোনপ্রকার আপাত আদর্শগত পন্থাই কার্যকরী না হওয়ায় বাধ্যতামূলক শস্য-সংগ্রহের নীতি গৃহীত হয় সরকারের পক্ষ থেকে। বাস্তবিকই E. H. Carr-এর মন্তব্যের ভিত্তিতে বলা যায় এ সময়ে খাদ্য সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় সরকারের "জীবন-মরণ সমস্যা রূপে" [পৃষ্ঠা ১৫২, **E. H. Carr, the Balshevik Revolution**, 1917–1923 Vol-II]। সে সমস্যার মোকাবিলাও তাই হয় অত্যন্ত কঠোর হাতে। প্রথমত শহর থেকে বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন ও দল সদস্যদের প্রেরণ করা হয় নির্ধারিত মূল্যে শস্য সংগ্রহের জন্য। সংগৃহীত শস্যের পুনর্বণ্টনের দায়িত্বে থাকে 'নারকোমপ্রোদ' নামক সংস্থা। এই সংগ্রহে সরকারের কোন যুক্তি-গ্রাহ্য পরিমাপ ছিল না এবং সংগ্রহের পদ্ধতিটিও ছিল অনির্দিষ্ট। ককেশাস, ইউক্রেন, কুবান, ডন উপত্যকা, পশ্চিম সাইবেরিয়া

প্রভৃতি অঞ্চল ইতিমধ্যে হস্তচ্যুত হওযায সংগ্রহের মূল চাপটা পড়ে ভল্গা উপত্যকায়, সারাটা, সামারা, টাম্ভব ও সেন্‌জা অঞ্চলে। কোন প্রকার উৎপাদনের পরিমাণ না রেখেই শস্যের দাবীর মাত্রা নির্ধারিত হয়। কৃষক প্রতিক্রিয়া স্বরূপ প্রথমেই উৎপাদনের হার ন্যূনতম পর্যায়ে উপনীত হয— কারণ তাদেব অতিরিক্ত উৎপাদনের ন্যায্যমূল্য থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছিল। এর ফল কিন্তু হল আরো কঠোর। শস্য সংগ্রহের মাত্রা বিন্দুমাত্র কমল না—বরঞ্চ কৃষকদের এ জাতীয মনোভাবকে কঠোরভাবে দমন করবার চেষ্টা নিল সরকার। বস্তুত সে মুহূর্তে কৃষকদের উৎপাদনের বিনিময়ে তাকে কোন কলকারখানাজাত উৎপন্ন দ্রব্য সরবরাহ করা সরকারের পক্ষে ছিল অসম্ভব। উপযুক্ত অর্থমূল্য প্রদানের শক্তিও প্রায় নিঃশেষিত হয়েছিল। তাই আদর্শের ধ্বজা উড়িয়ে লিখিত ঋণপত্রের মাধ্যমে তারা কৃষিজ উৎপাদন সর্বত্র বণ্টনের প্রয়াস নেয়। পরবর্তীকালে লেনিন স্বয়ং কৃষকদেব চোখে ধুলো দেবার এই প্রচেষ্টার কথা স্বীকার করেন ঋণপত্রগুলিকে "Useless bits of paper" বলে। অপরপক্ষে বেসরকাবী বাজার ও ক্রযবিক্রয বে-আইনী করে দেওয়াতে অজস্র কালোবাজারীতে দেশ ছেযে যায় এবং মেশোচ্‌নিকী বা Bagmen নামক এক বেপরোয়া সরবরাহক শ্রেণীর উদ্ভব হয় যারা রাতের অন্ধকারে বস্তায় করে শস্য এনে শহরে বে-আইনীভাবে বিক্রি করতে থাকে। কৃষকশ্রেণী স্বভাবতঃই সরকারের হাতে শস্য লুণ্ঠনের পরিবর্তে মেশোচ্‌নিকীদের বিক্রয়ের যৌক্তিকতা খুঁজে পায়। স্বয়ং লেনিনের হিসাব অনুসারে ১৯১৮—১৯১৯-এর মধ্যে নাগরিক চাহিদার অন্তত অর্ধেক পূরণ হত বেসরকারী উদ্যোগে।

সোবিয়েত পক্ষের ঐতিহাসিকদের বিশ্লেষণে কৃষকদের এ জাতীয় স্বার্থবোধ বুর্জোয়া মানসিকতার প্রতিফলন যা 'কুলাক' শ্রেণীর দ্বারা প্ররোচিত হয়েছিল। অপরপক্ষে Orlando Figes-এর পর্যালোচনায় এ ছিল জবরদস্তি শস্য অধিগ্রহণের স্বাভাবিক পরিণতি ন্যায্যমূল্যে বঞ্চিত কৃষকদের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। [পৃষ্ঠা—২৪৭, ২৪৮; **O. Figes, Peasant Russia Civil War.**] কারণ দেখা গেছে যে উদ্ভূত কালোবাজারগুলিতে ধনতন্ত্রের নিয়মে অগ্রগতির পরিবর্তে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজনকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হত। আর তার অব্যবহিত পরেই গ্রামের কুটীর শিল্পের পুনঃস্থাপন প্রয়াস দেখা দিল স্বতঃস্ফূর্তভাবে। অর্থাৎ কৃষকরা তাদের গ্রামকে স্বয়ম্ভর করে এই অবিচার থেকে মুক্তির প্রস্তুতি নিল। অর্থাৎ এতে ধনতান্ত্রিক উন্নতির চেতনা ছিল না—ছিল তাৎক্ষণিক সমস্যা সমাধানের আঞ্চলিক উপায় অনুসন্ধানের তৎপরতা।

তবে যে উদ্দেশ্যেই হোক কৃষকশ্রেণীর এই মনোভাব ও কার্যাবলী বলশেভিক সরকার কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন বোধ করেন। কারণ যুদ্ধরত দেশে খাদ্যের সরবরাহ অটুট না রাখলে সেদিন সে মুহূর্তে রাশিয়ার ভাগ্যে যে কী

বিপর্যয় আসত তা বলা কঠিন। ১৯১৯-এর জানুয়ারীতেই খাদ্য সংগ্রহের পদ্ধতি 'Prodrazrestra বা 'রাষ্ট্রের প্রয়োজনে খাদ্য অধিগ্রহণ' আইনে পরিণত হয় যখন থেকে সশস্ত্র বাহিনী প্রেরিত হতে থাকে অনিচ্ছুক কৃষকের থেকে যথাসাধ্য শোষণের উদ্দেশ্যে। তাই দেখা যায় ১৯১৭—১৯১৮ বছরে যে সংগ্রহের মাত্রা ছিল ৩০ মিলিয়ন পুড তা ১৯১৮—১৯১৯ বছরের শেষে গিয়ে দাঁড়ায় ১১০ মিলিযন পুডে—যদিও সামগ্রিক উৎপন্ন শস্যের মাত্রা এ-দুবছরে হ্রাস পেয়েছিল।

দলীয নেতৃবর্গ কিন্তু তাঁদের প্রতিবেদনে "War Communism"-কে কোন সংকটকালীন ব্যবস্থারূপে স্বীকার করেননি। উপরন্তু প্রতিবাদী কৃষকদের মতাদর্শের মানদণ্ডে কুলাকরূপে চিহ্নিত কবেছেন। কৃষকদের শোষণ ও বঞ্চনার এই মতাদর্শগত ব্যাখ্যা ও কৃষক প্রতিবাদকে 'কুলাক' ষড়যন্ত্ররূপে অগ্রাহ্য ও অবদমিত করায় স্বভাবতঃই কৃষকদের মনে জাগে সরকাবের প্রতি সন্দেহ ও অবিশ্বাস। তারা 'War Communism' চলাকালীন বিভিন্ন পরোক্ষ প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠে। শস্য উৎপাদনের হার ন্যূনতম পর্যায়ে উপনীত হয় এবং তার পরেও শোষণ অবিচল থাকায় তারা বে-আইনীভাবে মেশোচ্নিকীদের হাতে অর্থমূল্যে উৎপন্ন শস্য তুলে দিতে থাকে। অর্থাৎ তাদের মধ্যে একটি অসহযোগী মনোভাব তীব্র রূপ ধারণ করে।

এইভাবে নূতন সরকারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ কৃষক যখন অসহিষ্ণু ও ক্রমশ অসহযোগী হয়ে উঠেছে, যখন প্রতিটি কৃষক সম্মেলনে প্রতিনিধিদের কূটমন্তব্য শোনা যাচ্ছে, সেই পরিস্থিতিতে ১৯১৯-এর অষ্টম পার্টি কংগ্রেসে বলশেভিক সরকারে সমাজতান্ত্রিক উন্নয়নমূলক যৌথখামার 'সভ্খোজি' বা 'কোলখোজি' (সভখোজি—সরকারী খামার—State farm; কোলখোজি—যৌথ-উদ্যোগ খামার—Co-operative farm) গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ ছিল একটি প্রান্ত পদক্ষেপ, মার্কসীয় দৃষ্টিতে কৃষির উন্নয়নের মূলে প্রয়োজন যৌথ উদ্যোগ, বৃহদায়তন কৃষিক্ষেত্র, সরকারী বণ্টন ব্যবস্থা এবং আধুনিক প্রযুক্তি। সর্বশেষ প্রয়োজনটি সে-মুহূর্তে মেটানো সম্ভব না হলেও সরকার বাকী ব্যবস্থাগুলির প্রয়োগে যৌথ খামার পরিকল্পনা রূপায়ণে প্রয়াসী হয়। এই সময়েই প্রথম দেখা যায় যে বলশেভিক সরকার মধ্যস্তরের কৃষকদের প্রতি সদয় এবং কুলাকদের বিরুদ্ধে এই শ্রেণীকেই ব্যবহারে সচেষ্ট। E. H. Carr-এর মতে এই পরিবর্তনটি ছিল এতকাল পর্যন্ত যাদের গ্রাম্য 'পেটি বুর্জোয়া' বলে তুচ্ছ করা হত তাদের সঙ্গে আপোষের প্রয়াস [পৃষ্ঠা-১৬৪-১৬৬, E. H. Carr, **The Balshevik Revolution** 1917–1923 Vol. II]।

তবে সভখোজি বা কোলখোজির কার্যাবলী অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক হয়ে ওঠে। নতুন খামারগুলির উৎপাদন তেমন প্রতিশ্রুতি দিতে পারেনি। এই খামার ব্যবস্থার

অসাফল্যের পশ্চাতে ছিল দুই প্রকারের ভ্রান্তি। প্রথমত বলশেভিকদলের নীতির সমালোচনায় বলা যায় যে তাঁরা তত্ত্বগত ধাবণার বশবর্তী হযে সময়ের জটিলতার বিচার করেননি। একসময়ে রাশিয়ার পুরাতন কমিউনগুলির সূত্র ধরে যৌথ খামারের সম্ভাবনার বিষয়ে স্বযং মার্কস আশাবাদী ছিলেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে যখন প্রাক্-বিপ্লব বা বিপ্লবোত্তরকালে SR দল এ-প্রসঙ্গে উৎসাহ দেখায় তখন লেনিন একে পেটি বুর্জোযা 'মোহ' বলে তুচ্ছ করেন। যখন সম্পূর্ণ নতুন করে বৃক্তি কৃষকের সম্মতির ভিত্তিতে সভখোজি বা কোলখাজি গঠনের পরিকল্পনা গৃহীত হয় তখন দেখা যায় সরকার অজস্র প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়। কারণ কৃষকরা সমসাময়িক পরিস্থিতিতে সরকারের যে-কোন নীতি সম্পর্কেই সন্দিহান হয়ে উঠেছিল। উপরন্তু তাদের চিরাচরিত পরিবার-ভিত্তিক জমিবণ্টনের বিকল্পে এই বৃহত্তর সংগঠনের কোন প্রয়োজন অনুভব করেনি। দ্বিতীয়ত সদ্যসৃষ্ট খামারগুলিও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, সার ইত্যাদির অভাবে গতানুগতিক পদ্ধতির প্রযোগে উদাহরণযোগ্য উৎপাদনে অক্ষম হয। তাই দৃষ্টান্তের দ্বারা কৃষকের অবিশ্বাস ও আপত্তি দূর করে তাদের যৌথখামারের প্রতি আকৃষ্ট করাও সম্ভব হয়নি। উপরন্তু খামারগুলির পরিচালকমণ্ডলীতে উপস্থিত অ-কৃষক প্রতিনিধিদের আচরণ অসন্তোষ বৃদ্ধির বিশেষ কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সিজ্‌রাস জেলার একটি কৃষক-সম্মেলনে এক কৃষক প্রতিবেদন জানায়—"In Svkhozy there are people who know nothing about agriculture .... They make the peasants need their fields. And they don't even give us bread or water. It is like barschin a (serfdem) all over again." [পৃষ্ঠা ৩০৪, Orlando Figes, **Peasant Russia Civil War**] অর্থাৎ প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতি এবং কৃষক শ্রেণীর উৎসাহের অনুপস্থিতিতে কেবলমাত্র তত্ত্বগত আদর্শের ভিত্তিতে জমি ও কৃষকের সম্পর্কের পুনর্বিন্যাসেব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল।

বলশেভিক সরকারের সঙ্গে শ্বেতরক্ষীদের গৃহযুদ্ধের প্রেক্ষাপটেই দেখা দেয় বিভিন্ন অঞ্চলে সরকার বিরোধী কৃষক প্রতিরোধ। সারাটভ, টাম্ভব, সামারা মূল রাশিয়ার মুখ্য কৃষি-অঞ্চল ও ইউক্রেন সাইবেরিয়ার কৃষক-বিদ্রোহ চরম আকার গ্রহণ করে গৃহযুদ্ধের অবসান হওয়ামাত্র। এতদিন যে বলশেভিক সরকার জমির সমবন্টনের দ্বারা কৃষকশ্রেণীর আস্থাভাজন হয়েছিল আজ তারাই কৃষকের পরিশ্রমের ফসল বলপূর্বক হরণ করে সমগ্র কৃষককূলের ঘৃণার শিকার হয়। ফলশ্রুতিতে কৃষকরা স্বায়ত্তশাসনের দাবীতে সোচ্চার হয়। কিন্তু অনুধেয় যে, গৃহযুদ্ধ চলাকালীন কৃষকরা সহস্র অভিযোগ সত্ত্বেও প্রতিবিপ্লবী প্রতিক্রিয়ায় অংশগ্রহণে বিরত থাকে। বরঞ্চ কৃষকশ্রেণী ও বলশেভিক সরকারের মধ্যে বিরোধ সত্ত্বেও শ্বেতরক্ষী আক্রমণের সময়ে তাদের মধ্যে সহযোগিতাও দেখা যায়।

যাইহোক, কৃষক প্রতিরোধ সরকারকে বিশেষ বিচলিত করে তোলে। কিন্তু ১৯২০ পর্যন্ত দমননীতি ও আপোষপন্থার মধ্যে টানাপোড়েন চলে। অবশেষে ১৯২০—২১-এ মূল রাশিয়ার প্রধান কৃষি-অঞ্চল Black Earth অঞ্চলে দীর্ঘ কৃষক বিদ্রোহের ফলে সরকার অবশেষে নীতি পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে। নূতন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা (NEP)-এ ব্যক্তি কৃষকের স্বার্থের প্রতি বাস্তবিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়।

কিন্তু বলশেভিক সরকারের কৃষক নীতি সম্পর্কিত জটিলতার এখানে অবসান ঘটেনি—দলের অভ্যন্তরে এরপর কৃষকনীতি সম্পর্কে পরিকল্পনা দুটি স্পষ্ট ধারায় বিভক্ত হয়ে যায়— যার প্রথম ধারাটি নিজস্ব আভ্যন্তরীণ প্রভেদ সত্ত্বেও মতাদর্শগত সংগ্রামে, সমবায়, ব্যাঙ্ক, পরিকল্পনা-ব্যবস্থা প্রভৃতি অর্থনৈতিক বিষয়বস্তুর যথাযথ ব্যবহারের ভিত্তিতে কৃষকের বৃহদাংশের সঙ্গে আপোষপন্থায় সমাজতান্ত্রিক কৃষি গঠনের প্রস্তাব রাখে। এর ফলে এ-ধারার প্রবক্তাদের রাজনৈতিক গণতন্ত্রের প্রসঙ্গেও ভাবনাচিন্তা শুরু করতে হয়। অপর ধারাটি কিন্তু "War Communism"-এর চরম পর্যায়কেই সমাজতন্ত্রের অগ্রগতির সঠিক নির্দেশরূপে গ্রহণ করে। জরুরী সময়ে গৃহীত নীতির স্পষ্ট ব্যর্থতা সত্ত্বেও তারা NEP-কে 'পশ্চাদপসরণ' রূপে ব্যাখ্যা করে পুনরায় একই পথে কৃষক নিয়ন্ত্রণে বদ্ধপরিকর হন। তাঁরা আশ্চর্যভাবে "War Communism"—এর ব্যর্থতার অভিজ্ঞতা যথার্থ ঐতিহাসিক উপলব্ধিতে অক্ষম হ'ন এবং মনে করেন যে যথাসাধ্য বলপ্রয়োগই সমস্যার সমাধান করবে।

তবে "War Communism"—এর অব্যবহিত পরবর্তীকালে কিন্তু কৃষক বিদ্রোহের ব্যাপক মাত্রা অবশ্যই বলশেভিক দলকে চিন্তিত করে তুলেছিল—কারণ কৃষক শ্রেণীর সমর্থন বঞ্চিত হলে সে মুহূর্তে বলশেভিক সরকারের মূলগত কাঠামোয় আঘাত আসত কেন না তখনো পর্যন্ত কৃষকদের বাদ দিলে সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণী সমাজের সংখ্যালঘু দলে পরিণত হত। অপরদিকে একথাও অনস্বীকার্য যে রাশিয়ার কৃষক বলশেভিক সরকারের প্রতি সহস্র কারণে বিক্ষুব্ধ হলেও তাকে সম্পূর্ণ বর্জন করতে অপারগ ছিল—কারণ তারা পূর্ববর্তী যুগের পৈশাচিক অত্যাচারের অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হতে পারেনি। বলশেভিক সরকার যে সূচনাতে তাদের চরম দারিদ্র্য ও অনটন দূরীকরণের উদ্দেশ্যে জমি বণ্টন নীতি গ্রহণ করছিল তা থেকে অন্তত এটুকু প্রমাণিত হয় যে কৃষক শ্রেণীকে সামগ্রিকভাবে নিষ্পেষণের কোন নিষ্ঠুর উদ্দেশ্য এ সরকারের ছিল না। কিন্তু "War Communism"—এর সময়ে আপৎকালীন পরিস্থিতিতে সৃষ্ট চাপকে মতাদর্শের মানদণ্ডে ন্যায্যতা প্রদানের দ্বারা এ সরকার স্বীয় আদর্শচ্যুত হয়েছিল।

বস্তুত কৃষকের শ্রেণীস্বার্থকে কোন্ পদ্ধতিতে বলশেভিক মতাদর্শ ও রাষ্ট্রগঠনের পরিকল্পনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলা সম্ভব তা সম্পর্কে যথেষ্ট ভাবনা-চিন্তা করার দরকার ছিল যা সমসাময়িক পরিস্থিতিতে স্বল্প অভিজ্ঞ নেতাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। শ্রমিক-কৃষক ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা নিঃসন্দেহে সরকার অনুধাবন করতে পেরেছিল কিন্তু সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রয়োজন ছিল কৃষক স্বার্থের প্রতি যথোপযুক্ত মনোনিবেশ। কারণ কৃষকের বাস্তব প্রয়োজন ও ন্যূনতম দাবীকে বারম্বার অবহেলা প্রদর্শন করায় কেবলমাত্র মতদর্শের মাধ্যমে সমাজতন্ত্রের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি কৃষককূলকে আশাবাদী ক'রে তুলতে স্বভাবতঃই অক্ষম হয়। কৃষকদের প্রতি এই স্তরের বলশেভিকদের দৃষ্টিভঙ্গীর এইটিই ছিল মূল ভ্রান্তি।

সূত্র নির্দেশ

১. Edward Hallett Carr, **The Bolshevik Revolution, 1917–1923,** Harmond Sworth, Middlesex, Eng., Penguin Books, 1966

২. Orlando Figes, **Peasant Russia, Civil War: the Volga Countryside in Revolution (1917-1921),** Oxford: Clarenden, 1989.

৩. Oliver Henry Radkey, **The Sickle Under the Hammer; the Russian Socialist Revolutionaries** in the Early Months of Soviet Rule, New York [etc.], Columbia University Press, 1963.

৪. Slec Nove, An Economic History of the U.S.S.R. London, Penguin, 1969.

পারস্যের ইতিহাস প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ

মৃদুছন্দা পালিত

বিংশ শতাব্দীর চার দশক ধরে 'বিশ্বপথিক' রবীন্দ্রনাথ ইউরোপের বিভিন্ন দেশ, আমেরিকা এবং এশিয়ার পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত ভ্রমণ করেছিলেন। তিনি যেখানেই গেছেন, সেখানকার জনজীবন, সাংস্কৃতিক জীবন ও রাষ্ট্রিক ইতিহাস প্রায় সবই খুঁটিয়ে দেখেছেন। পত্রাকারে বা দিনালিপিতে তার বিবরণ ধরে রেখেছিলেন তিনি কিন্তু সে সব দেশের ইতিবৃত্ত পুরাবৃত্ত নিয়ে বেশি নাড়াচাড়া করেননি। জীবনের শেষপ্রান্তে সত্তরোত্তীর্ণ রবীন্দ্রনাথ শাহেন শাহ রেজা শা পহুবীর আমন্ত্রণে ১৯০২ সালের এপ্রিল মাসে তিন সপ্তাহের জন্য পারস্য গিয়েছিলেন। সেই স্বল্পকালীন অবস্থান কালে তিনি আধুনিক পারস্যেব জাগবণ অনুধাবন এবং প্রাচীন পারস্যের ইতিহাস উদ্ঘাটন করেছিলেন যা লিপিবদ্ধ আছে তাঁর 'পারস্যে' ভ্রমণ কাহিনীতে। যে বইতে পারস্যের সাম্রাজ্য বিস্তাবেব কথা যেমন আছে তেমনই সেখানকার সমাজ, ধর্ম, শিল্পকলা ও মানুষের পরিচযও আছে। কবি যেখানেই গেছেন, সেখানকার কথা বলতে গিযে ভারতের অবস্থা ও ইতিহাসের কথা অনিবার্যভাবে এসে পড়েছে— এখানেও তার ব্যাতিক্রম হয়নি।

এই শতাব্দীর প্রথমে ইউরোপ, জাপান, আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতার কলুষিত শক্তি-মদমত্ত রূপটি দেখে যদিও কবি ক্লান্ত ও ক্ষুব্ধ ছিলেন। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী প্রাচীন পারস্যের উত্থান পতনের ইতিহাস বিষয়ে তাঁর সমাজ সচেতন ও ইতিহাস সচেতন মনের কৌতুহল ও জিজ্ঞাসা ইতিহাসকারের তুলনায় নিতান্ত কম ছিল না। পারস্যের সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাস অবশ্যই ইউরোপীয় ইম্পিরিয়ালিজম্-এর তুলনায় স্বতন্ত্র। তাই তার সাম্রাজ্যবিস্তারের ইতিহাসের এই স্বাতন্ত্র্যই তাঁকে ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের সঙ্গে তুলনায় কৌতূহলী করে তুলেছিল। পারস্য ও ভারত প্রাচীন এই দুই সভ্যতার অতীত ও বর্তমান ইতিহাসের তুলনা সূত্রেই পারস্যের অতীত অবগাহন করতে চেয়েছিলেন তিনি। কেন প্রাচীনকালে পারস্য সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়েছিল তার কথা বলেছিলেন "প্রাচীনকাল থেকে পারস্যে সাম্রাজ্য সৃষ্টি হয়ে এসেছে। মানুষের ইতিহাসে সবচেয়ে পুরাতন মহাসাম্রাজ্য সাইরাস স্থাপন করেন, তার পরেও দীর্ঘকাল পারস্যের ইতিহাসক্ষেত্রে সাম্রাজ্যিক দ্বন্দ্ব। তার প্রধান কারণ, পারস্যের চারিদিকেই বড়ো বড়ো প্রাচীন রাজশক্তির

স্থান। হয় তাদের সকলকে দমন করে রাখতে হবে, নয় তাদের কেউ - না - কেউ এসে পারস্যকে গ্রাস করবে। নানা জাতির সঙ্গে নিরন্তর দ্বন্দ্ব থেকেই পারস্যের ঐতিহাসিক বোধ, ঐতিহাসিক সত্ত্বা এত প্রবল হয়ে উঠেছে।" এই কথাগুলির সঙ্গেই ভারতবর্ষের তুলনা করে লিখেছেন "ভারতবর্ষ সমাজ সৃষ্টি করেছে, মহাজাতির ইতিহাস সৃষ্টি করেনি।" আর্য অনার্যের দ্বন্দ্ব সামাজিক দ্বন্দ্ব। রামায়ণের সীতা উদ্ধার ও মহাভারতের কৃষ্ণার অপমানের প্রতিশোধ সমাজ রক্ষার ইতিহাস। "শাহনামায় আছে পারস্যের প্রকৃত ইতিহাসের কথা, রাষ্ট্রীয বীরদের কাহিনী, ইরাণীদের সঙ্গে তাতারীদের বিরোধ।" পারস্য তার ঐক্যকে দৃঢ় করার জন্য পরজাতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে একথাই বলতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এখানেও ভারতের ইতিহাসের সঙ্গে তুলনা করেছেন পারস্যের ইতিহাসের— "গুপ্তরাজাদের আমলে ভারতবর্ষ একবার আপন সাম্রাজ্যিক একসত্তা অনুভব করবার সুযোগ পেযেছিল, কিন্তু তার প্রভাব গভীর ও স্থাযী হযনি। তাব প্রধান কারণ ভারতবর্ষ অন্তরে অন্তরে আর্যে অনার্যে বিভক্ত, সাম্রাজ্যিক ঐক্য সামাজিক ঐক্যের উপর ভিত পাততে পারেনি।" অপর দিকে পারস্যের সাম্রাজ্যিক ঐক্য নিরন্তর দ্বন্দ্ব ও পররাজ্য দমনের মাধ্যমে প্রকাশ পেযেছে।

আর্যজাতির দুই শাখা - এক শাখা খ্রীষ্টপূর্ব দেড় হাজার বছর আগে পারস্যে এসেছিল। আর এক শাখা প্রবেশ করেছিল ভারতে। এই উর্বর দেশে সংঘাতের পরে আর্য অনার্য মিশ্রণ ঘটেছিল। অপরদিকে পারস্যের সংকীর্ণ পরিমিত জায়গায় যে আর্যরা বাসপত্তন করেছিলেন ·তাদের মধ্যে একটি বিশুদ্ধ সংহতি রইলো। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন পশ্চিম এশিয়ার প্রাচীন সাহিত্যে কৃষ্ণবর্ণ নিগ্রোপ্রায় জাতির উল্লেখ থাকলেও তারা ইরাণীদের আর্যত্বকে অভিভূত করতে পারেনি। তাদের "হোমাগ্নির" জয় হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ অতি সংক্ষেপে পারস্যের পুরাণকথা শাহনামার আমল থেকে দরায়ুসের গৌরবকালকে অতিক্রম করে আলেকজাণ্ডারের পারস্য বিজয় পর্যন্ত লিখেছেন। শাহনামায় লেখা আছে পারস্যের ইতিহাসের সূচনাকালের কথা। তারপর হাজার বছরের মধ্যে আর্যদের দুই শাখা প্রথমে মীদিয় ও পরে পারসিকরা পারস্যে আধিপত্য বিস্তার কবেছিল। এই পারসিকদের দলপতি ছিলেন হখমানিশ। তাঁরই নাম অনুসারে গ্রীক ভাষায় এই আকেমেনিভ বলে পরিচিত। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর মীদিয়দের শাসন থেকে মুক্ত হয়ে পারসিকরা পারস্যে আপন প্রভুত্ব স্থাপন করেছিল। সমগ্র পারস্যের প্রথম একচ্ছত্র অধিপতি ছিলেন বিখ্যাত সাইরাস। তাঁর অধীনে · পারস্য এক বৃহৎ সাম্রজ্যে পরিণত হয়েছিল। এই বীরবংশের পরম দেবতা ছিলেন অহুরমজ্দা। ভারতবর্ষের বৈদিক আর্যদেবতার মতই তাঁর মন্দির ছিল না, ছিল অগ্নিবেদী।

সাইরাস ও তাঁর পরবর্তী সম্রাটগণ সেমেটিক জাতীয় বীরদের মত দয়াধর্মবিহীন ছিলেন না। তাঁরা বিজিত দেশকে ধ্বংস করতেন না, সেখানে ন্যায়বিচার, সুব্যবস্থা ও শান্তিস্থাপন কবে তাকে সমৃদ্ধশালী করতেন। সাইরাস বিজিত ব্যবিলনীয় এবং আসিরীয়দের দেবমূর্তিগুলিকে লুণ্ঠন না করে তাদের আদিম মন্দিরে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। এই বংশেরই দরায়ুস পারস্য সাম্রাজ্যকে বহুদুর বিস্তৃত করেছিলেন। বিখ্যাত পার্সিপোলিস সুদর্শন প্রাসাদে ভূষিত হয়েছিল তার সময়ে। প্রাচীনকালের আসিরিয়া, ব্যবিলন, ইজিপ্ট, গ্রীস প্রভৃতি দেশের বহু কীর্তি ছিল দেবমন্দির কেন্দ্রিক কিন্তু আকামেনীয়দের গৌরবগাথা খোদিত হয়ে রয়েছে পাহাড়ের গায়ে। অহুরমজ্‌দা এবং প্রতীকী অগ্নিস্থাপনের চিহ্ন সকল বিবরণচিত্র শোভিত করতো। এই একদেবতার সরল পূজাপদ্ধতিই পারসিক জাতির ঐক্যের অন্যতম কারণ বলে রবীন্দ্রনাথের কাছে মনে হয়েছিল।

এই বিশাল আকামেনীয় সাম্রাজ্যের পতন হয়েছিল আলেকজাণ্ডারের আক্রমণে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য যে কোন ঐতিহাসিকের পক্ষে শ্লাঘনীয়। তিনি লিখেছিলেন "বড়ো সাম্রাজ্য হাতে নিয়ে স্থির থাকবার জো নেই। কেবলই তাকে বৃদ্ধির পথে নিয়ে যেতে হয়, বিশেষত চারিদিকে যখন প্রতিকূল শক্তি। এই রকম নিত্য প্রয়াসে বলক্ষয় হয়ে ক্লান্তি দেখা দেয়। অবশেষে হঠাৎ আঘাতে অতি স্থূল রাষ্ট্রিক দেহটা চারিদিক থেকে ভেঙে পড়ে। কোনো জাতির মধ্যে বা রাজবংশে সাম্রাজ্যভার অতি দীর্ঘকাল বহন করবার শক্তি টিকে থাকতেই পারে না। কেন না সাম্রাজ্য পদার্থটাই অস্বাভাবিক, যে এককগুলির সমষ্টিতে সেটা গঠিত তাদের মধ্যে ঐকান্তিকতা নেই, জবরদস্তির সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হবার জন্য ভিতরে ভিতরে নিরন্তর চেষ্টা করে, তা ছাড়া বহু বিস্তৃত সীমানা বহু বিচিত্র বিবাদের সংস্রব আসতে থাকে। আকেমেনীয় সাম্রাজ্যও আপন গুরুভারে ক্রমেই হীনবল হয়ে অবশেষে আলেকজাণ্ডারের হাতে চরম আঘাত পেলে। এক আঘাতেই সে পড়ে গেল তার একমাত্র কারণ আলেকজান্ডার নয়।"

পরবর্তী সাসানীয় যুগের কথাও তিনি সংক্ষেপে লিখেছিলেন। আলেকজান্ডারের আক্রমণে আকেমেনীয় রাজত্বের অবসান হলে যে জাত পারস্য দখল করেছিল তারা হল পার্থীয়। সম্ভবত তারা ছিল শকজাতীয় যারা প্রথমে গ্রীক ও পরে পারসিক সভ্যতা গ্রহণ করেছিলেন। ২২৬ খ্রীষ্টাব্দে সাসানের পৌত্র আর্দাশির পার্থীয় রাজাদের হাত থেকে পারস্যকে উদ্ধার করে, আবার বিশুদ্ধ পারসিক জাতির সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। প্রবল প্রতাপান্বিত সাসানীয় সম্রাট শাপুর রোমের সম্রাট ভ্যালেরিয়াকে পরাস্ত ও বন্দী করেন। আকেমেনীয়দের জরথুস্ট্রীয় ধর্ম এই সাসানীয়দের আমলে নতুন উৎসাহে জেগে উঠেছিল। শেষ সাসানীয় সম্রাট যেজাদির্গাদ ৬৪২ খৃষ্টাব্দে পরাজিত হয়েছিলেন আরব নেতা খালিদের হাতে।

আরবদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে সূচনা হয়েছিল পারস্যের ইতিহাসের মধ্যযুগ। এই যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বংশ সাফাবীরা পারস্য শাসন করেছিল গৌরবের সঙ্গে। এই বংশের বিখ্যাত সম্রাট শা আব্বাসের মহৎ কীর্তি ছিল পারস্যের একিকরণ। তিনি ছিলেন ভারতের মুঘল সম্রাট আকবরের সমসাময়িক। আকবরের মতই পরধর্মসহিষ্ণু ছিলেন এই সম্রাট। জনশ্রুতি আছে এই শা আব্বাসের সঙ্গে অ্যান্টনি ও রবার্ট শার্লি নামে দুই ইংরাজ ভ্রাতার যোগাযোগ হয়েছিল। এঁরাই কামান প্রভৃতি অস্ত্র সহযোগে আধুনিককালের যুদ্ধবিদ্যায় পারস্যের সৈন্যদের শিক্ষিত করেন। শা আব্বাসের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই এই বংশের পতনের সূচনা হয় এবং শেষ সম্রাট শা সুলতান হোসেন সুলতান মামুদের কাছে পরাজিত হন। শুরু হয় আফগান রাজত্বের কাল। অরাজকতা ও অত্যাচারে জর্জরিত হল পারস্য। তারপর তুর্কীরা জয় করল পারস্য। অবশেষে অষ্টাদশ শতাব্দীতে এলেন নাদির শা, আফগান ও তুর্কিদের তাড়িয়ে দিয়ে রাজত্ব শুরু করলেন পারস্যে। তাঁর জয়পতাকা দিল্লি পর্যন্ত উড়ল। ময়ূর সিংহাসন ও বহুকোটি টাকার লুটের মাল এল পারস্যে। কিন্তু নিদ্রিত অবস্থায় এক আততায়ীর হাতে তাঁর মৃত্যু ঘটল। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "তারপরে অর্ধশতাব্দী ধরে কাড়াকাড়ি, খুনোখুনি, চোখ ওপড়ানো। বিপ্লবের আবর্তে রক্তাক্ত রাজমুকুট লাল বুদবুদের মতো ক্ষণে ক্ষণে ফুটে ওঠে আর ফেটে যায়।" এর পর এল কাজার বংশীয় তুর্কি আগা মহম্মদ খাঁ। তার নিষ্ঠুর অত্যাচারের কাহিনীও লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ। তৈমুর লঙও এই কাজারদের পারস্যে এসেছিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে শুরু হয়েছিল পশ্চিম থেকে পারস্যে ইউরোপীয় বণিকদের আগমন। "......ইতিহাসের আর এক পর্ব আরম্ভ হল পূর্ব পশ্চিমের সংঘাতে। পারস্যে তার চক্রবাত্যা যখন পাক দিয়ে উঠছিল তখন ঐ কাজার-বংশীয় রাজা সিংহাসনে। বিদেশীয় ঋণের নাগপাশে দেশকে জড়িয়ে সে ভোগবিলাসে উন্মত্ত, দুর্বল হাতের রাজদন্ড চালিত হচ্ছিল বিদেশীর তর্জনীসংকেতে।" এমন সময় দেখা দিলেন রেজা শা পহ্লবী। আধুনিক পারস্যের ইতিহাস রবীন্দ্রনাথ এত সহজে এবং সংক্ষেপে লিখেছেন যে সেটি লক্ষণীয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে শা নাসিরউদ্দীনের আমলে সূচনা হয়েছিল রাষ্ট্রবিপ্লবের। বাবিপন্থীদের ধর্মবিপ্লবও এই সময় ঘটেছিল। নাসিরউদ্দীন অতি নিষ্ঠুরভাবে দমন করেছিলেন এই ধর্মসম্প্রদায়কে। তিনিই প্রথম পারস্যের অধিপতি যিনি ইউরোপে যান এবং দেশকে বিদেশীর ঋণজালে জড়িত করেন। তাঁর ছেলে মজফ্‌ফরউদ্দীন ইংরেজদের দিয়েছিলেন একচেটিয়া তামাক ব্যবসায়ের অধিকার। দেশশুদ্ধ লোক তামাক বয়কট করলে পারস্য-রাজকে ইংরেজ কোম্পানীকে দিতে হয়েছিল প্রচুর খেসারত। রাশিয়া পারস্যের রেলওয়ে ব্যবস্থাকে আর বেলজিয়াম রাজস্ব আদায়ের

কাজকে হাতে নিয়েছিল। ইংরেজও উঠে পড়ে লেগেছিল পারস্য বিভাগের কাজে। অপরদিকে দেশের মানুষের দাবীতে সুলতানকে করতে হল রাষ্ট্রসংস্কার। ১৯০৬ সালে বসল প্রথম পার্লামেন্টের অধিবেশন।

পরবর্তী সুলতান শা মহম্মদ আলির সময় পার্লামেন্ট দাবী করল অপদার্থ প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের বরখাস্ত করতে হবে এবং মাশুল আদায়কারী বেলজিয়াম কর্তাদের সবাতে হবে। কিন্তু শূন্য রাজকোষ নিয়ে পার্লামেন্টারী শাসন ব্যবস্থা কার্যকরী হল না। "অবশেষে একদা ইংরেজ রাশিয়ানে আপস হয়ে গেল। .....উত্তর দিকটা পড়ল রুশীদের ভাগে, দক্ষিণ দিকটা ইংরেজের, একটুখানি বাকি রইল সেখানে পারস্যের বাতি টিম্ টিম্ করে জ্বলছে।" রাজায় প্রজায় বাধল বিরোধ। রাজার দলে যোগ দিল মোল্লারা—তাদের সাহায্যের জন্য হাত বাড়াল ইংরেজ ও রুশরা। অপরদিকে পার্লামেন্টের পিছনে রইল জনগণের সমর্থন। পার্লামেন্টের বাড়ি ভেঙে দিলেও তাঁরা নতুন সংবিধান রচনা করলেন। রুশীয় কর্ণেল লিয়কভের নেতৃত্বে সৈন্যদের হাতে পার্লামেন্টের অনেক সদস্য মারা গেলেন, বন্দী হলেন অথবা পালিয়ে গেলেন। "লন্ডন টাইমস্ বললেন, স্পষ্টই প্রমাণ হচ্ছে স্ববাজতন্ত্র ওরিয়েন্টালদের ক্ষমতার অতীত।"

শেষ পর্যন্ত রাজাকে এগারো বছরের ছেলেকে সিংহাসন দান করে দেশ ছাড়তে হল। ইংরেজ ও রুশরা রাজার জন্য মোটা পেনসনের ব্যবস্থা করলেও পলাতক রাজা আবার এসে দেশ আক্রমণ করলেন এবং তাঁর হার হল। সেই সময় আমেরিকা থেকে মর্গ্যান শুস্টার এলেন পারস্যের বিধ্বস্ত রাজস্ববিভাগকে সংস্কার করতে। যে সময় তিনি কৃতকার্য হয়েছেন সেই সময়ই ইংরেজ ও রুশরা হুকুমজারি করল কোন বিদেশীকে দিয়ে রাষ্ট্রকার্য করান যাবে না। পার্লামেন্টের সদস্যরা কেউ বন্দী হলেন অথবা বিদেশে চলে গেলেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "এই সময়কার বিবরণ দিয়ে শুসটার The Strangling of Persia নামে যে বই লিখেছেন তার মত শোকাবহ ইতিহাস অল্পই দেখা যায়।"

ইউরোপে ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হলে রুশীরা পারস্যে অধিকার বিস্তারে সচেষ্ট হল। অবশ্য ১৯১৭ সালে বলশেভিক বিপ্লবের পরে তারা গেল সরে। কিন্তু ইংরেজরা উত্তর পারস্য দখল করেছিল বলে দেশবাসীর সঙ্গে চলেছিল তাদের নিরন্তর লড়াই। ১৯১৯ সালে ভার্সাই চুক্তি-র পরে ব্রিটিশ মন্ত্রী সার পার্সি কক্স পারসিক সরকারের একদলের সঙ্গে চুক্তি করলেন যে পারস্য হবে ইংলন্ডের অভিভাবকত্বে প্রোটেক্টোরেট্ দেশ অর্থাৎ পারস্যের শাসনকার্য ও সৈন্যব্যবস্থা থাকবে ইংরেজদের অধীনে। কিন্তু এই চুক্তি পার্লামেন্টে স্বাক্ষরের জন্য পেশ করা সম্ভব হয়নি। "এই দুর্যোগের দিনে রেজা খাঁ তাঁর কসাক সৈন্য নিয়ে দখল করলেন তেহেরাণ।" রাশিয়ার সৈন্য এল ইংরেজকে উৎখাত

করতে—ইংরেজ উত্তর পারস্য ত্যাগ করল এবং রুশ সোভিয়েত সরকার নতুন পারস্যের সঙ্গে নিঃশর্ত বন্ধুত্ব স্থাপন করল। "রেজা খাঁ প্রথমে সামরিক বিভাগের মন্ত্রী, তারপরে প্রধানমন্ত্রী, তারপবে প্রজাসাধারণের অনুরোধে রাজা হলেন। তাঁর চালনায় পারস্য অন্তরে বাহিরে নূতন বলে বলিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। রাষ্ট্রের নানা বিভাগে যে-সকল বিদেশীর অধ্যক্ষতা ছিল তারা একে একে গেছে সরে। শোষণ লুণ্ঠন বিভ্রাটের শান্তি হয়ে এল, সমস্ত দেশ জুড়ে আজ কড়া পাহারা দাঁড়িয়ে আছে তর্জনী তুলে। উদভ্রান্ত পারস্য আজ নিজের হাতে নিজেকে ফিরে পেয়েছে। জয় হোক রেজা শা পহুবীর।" এইভাবে রবীন্দ্রনাথ স্বাগত জানিয়েছিলেন রেজা শা পহুবীর শাসনকে।

রবীন্দ্রনাথ রেজা শা পহুবীর সঙ্গে মুঘল বাদশাহ আকবরের মিল খুঁজে পেয়েছিলেন। "একদা রেজা শা ছিলেন কসাক সৈন্যদলের অধিপতি মাত্র। বিদ্যালয়ে য়ুরোপের শিক্ষা তিনি পাননি, এমন কি পারসিক ভাষাতেও তিনি কাঁচা। আমার মনে পড়ল আমাদের আকবর বাদশাহেব কথা। কেবল যে বিদেশীর কবল থেকে তিনি পারস্যকে বাঁচিয়েছেন তাই নয়, মোল্লাদের—আধিপত্যজালে—দৃঢ়বদ্ধ পারস্যকে মুক্তি দিয়ে রাষ্ট্রতন্ত্রকে প্রবল ও অচল বাধা থেকে উদ্ধার করেছেন।" ধর্মের বেড়াজাল যে বাষ্ট্রের পক্ষে শুভ নয় সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ সচেতন ছিলেন।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ইতিহাস আলোচনার ক্ষেত্রে দেখেছি রবীন্দ্রনাথ তত্ত্বগতভাবে সেই সব দেশের ইতিহাসের কথা বলেছেন। কিন্তু পারস্যের ভ্রমণকাহিণী লেখার সময় তথ্যগতভাবে সে দেশের যে নির্ভুল ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছিলেন তা উল্লেখের দাবী করে। আমরা জানি রবীন্দ্রনাথের পর্যবেক্ষক মন কোন দেশের রাষ্ট্রীয় উত্থান পতনের কাহিনীতে আবদ্ধ থাকতে পারে না। পারস্যের শিল্প স্থাপত্যের রূপও তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। এই শিল্পের রূপ কি, তার বিবর্তন কিভাবে হয়েছে তাও তিনি লক্ষ করেছিলেন। এই সভ্যতা মানুষের ইতিহাসে কোন শাশ্বত বাণী বহন করেছিল কি না এবং এখনও কেন সে প্রবহমান এ সব কিছুর কারণও তিনি অনুসন্ধান করেছিলেন।

শিরাজ থেকে ইস্পাহান যাওয়ার পথে তিনি পার্সিপোলিসে আকেমেনীয় যুগের দরায়ুসের প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ দেখেছিলেন। দরায়ুস শিলাবক্ষে খোদিত করে আপন জয় ঘোষণা করে গেছেন চিরকালের জন্য। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন "আকেমেনীয় যুগে পারস্যে যে স্থাপত্য ও ভাস্কর্য উদ্ভাবিত হল তার মধ্যে আসিরিয়, ব্যবিলনীয়, ইজিপ্টীয় প্রভাবের প্রমাণ আছে। এমন কি তখনকার প্রাসাদ-নির্মাণ প্রভৃতি কাজে বিপুল সাম্রাজ্যভুক্ত নানা দেশীয় কারিগর নিযুক্ত হয়েছিল। কিন্তু সেই বিচিত্র প্রভাব বিশিষ্ট ঐক্য লাভ করেছিল পারসিক চিত্তের

দ্বারা।" এই প্রসঙ্গে তিনি রজাব ফ্রাই-এর লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন। বাগদাদের কাছে মৃত টেসিফোন শহরে অবস্থিত সাসনীয় প্রসাদের ভগ্নাবশেষের কথা উল্লেখ করে কবি লিখেছিলেন "এই প্রাসাদ প্রথম খসরুর আদেশে নির্মিত হয় সাসানীয় যুগে মহাকায় স্থাপত্যশিল্পের একটি অতি আশ্চর্য দৃষ্টান্তরূপে।" এই যুগের বীরদের কাহিনীও খোদিত আছে পাহাড়ের গায়ে যেগুলি দেখে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছিলেন "এই মূর্তিগুলিতে আশ্চর্য একটি শক্তি প্রকাশ পেয়েছে, দেখে মন স্তম্ভিত হয়।"

আরবদের আগমনে পারস্যে মধ্যযুগের সূচনা হয়েছিল। শিল্পকলার ক্ষেত্রেও দেখা দিয়েছিল নতুন যুগ। ইসলাম ধর্মের পারস্যে শিল্পকলার রূপ পরিবর্তিত হয়েছিল। ".....রেখালংকার ও ফুলের কাজ প্রাধান্য লাভ করেছিল। তার পরে তুর্কিরা এসে আরব সাম্রাজ্য ও সেই সঙ্গে তাদের বহুতর কীর্তি লণ্ডভণ্ড করে দিলে, অবশেষে এল মোগল। এই—সকল কীর্তিনাশার দল ...ক্রমে তাদের নিজেদেরই মধ্যে শিল্পোৎসাহ সঞ্চারিত হতে লাগল। এমনি করে যুগান্তে যুগান্তে ভাঙচুর হওয়া সত্ত্বেও পারস্যে বারবার শিল্পের নবযুগ এসেছে। আকেমেনীয় সাসানীয় আরবীয় সেলুজুক মোগল এবং অবশেষে সাফাবি শাসনের পর্বে পর্বে শিল্পের প্রবাহ বাঁক ফিরে ফিরে চলেছে; তবু লুপ্ত হযনি, এরকম দৃষ্টান্ত বোধ হয় আর—কোন দেশে দেখা যায় না।" ইস্পাহানে অবস্থান কালে রবীন্দ্রনাথ মধ্যযুগীয় পারস্যের বিখ্যাত শিল্পকীর্তির নিদর্শনগুলি দেখেন। তাদের মধ্যে অন্যতম 'মাদ্রাসে-ই-চাহার' নামে একটি মসজিদ দর্শন করে উচ্ছ্বসিত কবি লেখেন "এক দিকে উচ্ছ্রিত বিপুলতায় সুমহান, যেন স্তবমন্ত্র, আর—একদিকে সমস্ত ভিত্তিকে খচিত করে বর্ণসংগতির বিচিত্রতায় রমণীয়, যেন গীতিকাব্য।" এই শহরের মাঝখান দিয়ে বয়ে যাওয়া জই আন্দেরু অর্থাৎ জন্মদায়িনী নদীর উপরে বহু খিলানওয়ালা তিনতলা পুল দর্শন করে লিখেছিলেন "শুধু এটার উপর দিয়ে পথিক পার হয়ে যাবে বলে এ তৈরি হয়নি—অর্থাৎ এ শুধু উপলক্ষ নয়, এও স্বয়ং লক্ষ্য।" এটি তৈরি হয়েছিল শা আব্বাসের আদেশে। এই শিল্পকর্মগুলির কারিগররা ছিল আর্মেনীয়। রবীন্দ্রনাথ পারস্যের স্থাপত্য ও শিল্পকলার ইতিহাসের প্রবহমান ধারার কথাও যেমন লিখেছিলেন তেমনই তার মূল্যায়নও করেছিলেন।

পারস্যে অনেক বৃহৎ সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়েছে নানা জাতির অধীনে কিন্তু কেন তার ঐক্য কোথাও ক্ষুন্ন হয়নি তার নানা কারণ তিনি অনুধাবন করেছিলেন। আগেই বলা হয়েছে জরথ্রুস্ট্রীয়দের দেবতা অহুরমজ্‌দার উপাসনা পারসিক জাতিকে ঐক্য এবং শক্তি দিয়েছিলেন বলে তিনি লিখেছিলেন। পারস্য বারংবার নানা শক্তির দ্বারা দলিত হলেও তার প্রাণশক্তি নষ্ট হয়নি। তার কারণ ....."আকেমেনীয়,

সাসানীয়, সাফাবি রাজাদের হাতে পারস্যের সর্বাঙ্গীন ঐক্য বারম্বার সুদৃঢ় হয়েছে। পারস্য সম্পূর্ণ এক, তার সভ্যতার মধ্যে কোনো আকারে ভেদবুদ্ধির ছিদ্র নেই। আঘাত পেলে সে পীড়িত হয়, কিন্তু বিভক্ত হয় না। রুশে ইংরেজে মিলে তার রাষ্ট্রিক সত্তাকে একদা দুখানা করতে বসেছিল। যদি তার ভিতরে ভিতরে বিভেদ থাকতো তা হলে য়ুরোপের আঘাতে টুকরো টুকরো হতে দেরী হত না। কিন্তু যে মুহূর্তে শক্তিমান রাষ্ট্রনেতা সামান্য সংখ্যক সৈন্য নিয়ে এসে ডাক দিলেন, অমনি সমস্ত দেশ তাঁকে স্বীকার করতে দেরি করলে না; অবিলম্বে প্রকাশ পেলে যে, পারস্য এক।" এই ঐক্যবোধের অপর এক কারণ তাঁর মনে হয়েছিল "পারস্য যে অন্তরে অন্তরে এক, তার প্রধান একটা প্রমাণ তার শিল্পের ইতিহাসে দেখতে পাওয়া যায়।" বহু শিল্পের ধারা পারস্যে এক হয়ে গিয়ে তার ঐক্যবোধকে করেছিল সুদৃঢ়। শুধু পারস্যের ঐক্যবোধ নয়, নানা আঘাতেও পারস্যের সভ্যতার প্রবহমান ধারার অক্ষুন্নতা বজায় থাকার কারণও তিনি অনুসন্ধান করেছিলেন। তিনি বলেছেন পারস্যে যে ভাষা ও সাহিত্য বহমান তা সমগ্র জাতিকে নিয়ে এবং তারই ধারাবাহিকতা পারস্যকে বাঁচিয়ে রেখেছে। আপন অন্তরের ঐশ্বর্যই ছিল পারস্যের শক্তি। মধ্যযুগে আরব তুর্কি মোগলদের দ্বারা আক্রান্ত পারস্য শুধু নিজের স্বরূপকে রক্ষা করেনি সে তাদের দিয়েছিল নতুন প্রাণ। "আরব পারস্যকে ধর্ম দিয়েছে, কিন্তু পারস্য আরবকে দিয়েছে আপন বিদ্যা ও শিল্পসম্পন্ন সভ্যতা। ইসলামকে পারস্য ঐশ্বর্যশালী করে তুলেছে।"

রবীন্দ্রনাথ যেমন প্রাচীন পারস্য ও ভারত ইতিহাসের তুলনা করেছিলেন তেমনই তৎকালীন ভারতের সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানে পারস্যের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করার কথাও তিনি আলোচনা করেছিলেন। সহজ মহত্ত্বের মানুষ রেজা শা পহ্লবীর অনাড়ম্বরতা কবিকে মুগ্ধ করেছিল। অতি অল্পদিনের মধ্যে দ্রুতহাতে তিনি পারস্যকে দুর্গতির তলা থেকে উদ্ধার করে তার হৃদয় জয় করেছিলেন। তেহেরানে পারস্যের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে পারস্যের অগ্রগতির আদর্শে ভারতবর্ষের সমস্যা সমাধানের কথা কবি আলোচনা করেছিলেন। দুই দেশের তুলনা করতে গিয়ে দেখা গিয়েছিল পারস্য ঐক্যবদ্ধ, তার জাতি, ধর্ম ও ভাষা এক। "বহু যুগের উগ্র সংস্কারকে নম্র করে দিয়ে তাঁরা এ রাজ্যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বুদ্ধিকে নির্বিষ করেছেন।" পারস্যের আয়তন ছোট ও তার লোকসংখ্যা মাত্র এক কোটি বিশ লাখ। তাদের সমস্যা অনেক সরল—তাদের প্রধান কাজ হচ্ছে শাসনব্যবস্থাকে নির্দোষ ও সম্যক উপযোগী করে তোলা। অপর দিকে বিশাল আয়তন ভারতবর্ষের লোক সংখ্যা তখন ছিল ত্রিশ কোটির উপর এবং তা আবার বহুধা বিভক্ত। ঐক্যের প্রশ্নে সবচেয়ে বড় বাধা তার সাম্প্রদায়িক

ভেদবুদ্ধি। "ভাবতীয মুসলমানের গোঁড়ামি নিজের সমাজকে নিজের মধ্যে একান্ত কঠিন করে বাঁধে, বাইবে কে দূরে ঠেকায়; হিন্দুর গোঁড়ামি নিজের সমাজকে নিজের মধ্যে হাজারখানা করে, তার উপবেও বাইবের সঙ্গে তার অনৈক্য। এই দুই বিপবীতধর্মী সম্প্রদাযকে নিযে আমাদের দেশ। .....দুইজনকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করাও যায় না, সম্পূর্ণ এক করাও অসাধ্য।" পারস্যের সঙ্গে ভারতের সমস্যাব দুস্তর প্রভেদ। অতএব পারস্যকে দৃষ্টান্ত কবে তৎকালীন ভারতের সমস্যার সমাধান সম্ভব নয বলে সেখানকাব প্রধানমন্ত্রী মন্তব্য করেছিলেন এবং কবিরও তাই বোধ হযেছিল। ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তিনি পারস্যের ইতিহাসকে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন এবং সেইজন্যই পরাধীন ভারতের সমস্যা সমাধানে তার দৃষ্টান্তকে গ্রহণ করার চেষ্টা কবেছিলেন।

পারস্য থেকে ফিরবার পথে তিনি ইরাকের রাজা ফইজলেব আমন্ত্রণে সেই দেশ হযে ভাবতে প্রত্যাবর্তন করেন। পারস্যের সীমান্তে ইরাকের যে রাজকর্মচারীরা তাঁকে অভ্যর্থনা করতে এসেছিলেন তাঁদের সঙ্গেও ভাবতের সাম্প্রদায়িক সমস্যার কথা আলোচনা করেছিলেন কবি। তাঁর মনে হয়েছিল ".....ঈজিপ্টে তুরস্কে ইরাকে পারস্যে সর্বত্র ধর্ম মনুষ্যত্বকে পথ ছেড়ে দিচ্ছে। কেবল ভারতবর্ষেই চলবার পথেব মাঝখানে ঘন হয়ে কাঁটাগাছ উঠে পড়ে, হিন্দু সীমানায় মুসলমানের সীমানায। এ কি পরাধীনতার মরুদৈন্যে লালিত ঈর্ষাবুদ্ধি, এ কি ভারতবর্ষের অনার্যচিত্ত বুদ্ধিহীনতা।" সংকীর্ণ ধর্মবোধের বেড়াজাল থেকে রাষ্ট্রতন্ত্রের মুক্তি না হলে দেশের উন্নতি হতে পারে না সে কথা রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন। বাগদাদের সাহিত্যিকদের সভায় তাঁদের অভিনন্দনের উত্তরে তিনি বলেছিলেন "একদা আরবের পরম গৌরবের দিনে পূর্বে পশ্চিমে পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক ভূভাগ আরব্যের প্রভাব অধীনে এসেছিল। ভারতবর্ষে সেই প্রভাব যদিও আজ রাষ্ট্রশাসনের আকারে নেই, তবুও সেখানাকার বৃহৎ মুসলমান সম্প্রদায়কে অধিকার করে বিদ্যার আকারে, ধর্মের আকারে আছে। সেই দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে আমি আপনাদের বলছি, আরবসাগর পরে করে আরব্যের নববাণী আর একবার ভারতবর্ষে পাঠান—যাঁরা আপনাদের স্বধর্মী তাঁদের কাছে—আপনাদের মহৎ ধর্মগুরুর পূজ্যনামে, আপনাদের পবিত্রধর্মের সুনাম রক্ষার জন্য। দুঃসহ আমাদের দুঃখ, আমাদের মুক্তির অধ্যবসায় পদে পদে ব্যর্থ; আপনাদের নবজাগ্রত প্রাণের উদার আহ্বান সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা থেকে, অমানুষিক অসহিষ্ণুতা থেকে, উদার ধর্মের অবমাননা থেকে, মানুষে মানুষে মিলনের পথে, মুক্তির পথে নিয়ে যাক হতভাগ্য ভারতবর্ষকে। এক দেশের কোলে যাদের জন্ম অন্তরে বাহিরে তারা এক হোক।"

তথ্যগতভাবে আরবের এবং তত্ত্বগতভাবে ইসলামের ইতিহাস অনুধাবন না করলে একথাগুলি রবীন্দ্রনাথ লিখতে পারতেন না।

রবীন্দ্রনাথের পারস্যের ইতিহাস আলোচনার মূল বৈশিষ্ট্য হলো তিনি যেন পারস্যবাসীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে পারস্যের প্রাণশক্তিকে আবিষ্কার করতে চেয়েছেন। প্রাচীন পারস্যের ইতিহাস উদ্‌ঘাটনের জন্য তাঁর যথেষ্ট অধ্যয়ন ছিল। এবং আধুনিক পারস্যের সমস্যাবলী সম্বন্ধেও তিনি সম্যকরূপে অবহিত ছিলেন। পারসিক সংস্কৃতির সমন্বয়ের দিকটি তাঁকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। পারস্যের ধর্মচেতনা, শিল্প, সাহিত্যে তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। এর মধ্যেই তিনি সমন্বয়ের মূল সূত্রটি খুঁজে পেয়েছিলেন। এই সংবেদনশীল পারস্যচেতনাই তাঁকে অন্যান্য পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকদের পারস্যদর্শন থেকে স্বতন্ত্র করেছে।

সূত্র-নির্দেশ

১। রবীন্দ্ররচনাবলী, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, ১০ম খণ্ড, 'পারস্যে'

২। শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ইরাণের ইতিকথা (পূর্বকাণ্ড) ১৩৭১.

৩। Sir Perey Sytes, **A History of Persia,** London, 1921

৪। Elwell Sutton, Lowrence Paul, Persia. **A Study in Power Politics,** London, 1955.

ভারত-ভুটান সম্পর্ক: বাংলা ভাষার উপকরণ

দেবামিত্রা মিত্র

অধ্যাপক নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ Regional Records Survey Committee-র সম্পাদক হিসাবে কুচবিহার মহাফেজখানায় সংরক্ষিত দলিল-পত্র দেখেছিলেন। তিনি লিখেছেন ১৬৪৬ সাল থেকে ১৮৮৭ সাল পর্যন্ত ২৩৫৮টি দলিল-পত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঁচখণ্ড পুঁথিতে বিবৃত আছে। "গৌহাটি থেকে ১৭৯৩ সালে টমাস ওয়েলস্ কুচবিহারের কমিশনার সি.এ.ব্রুস্-কে লিখেছিলেন যে ১৭৭২ সালের আগের কুচবিহারের নারায়ণী টাকা না হলে আসামে লেনদেন অসম্ভব ছিল। সেজন্য তিনি ২০ হাজার পুরানো নারায়ণী টাকা চেয়েছিলেন। এই টাকা চালু ছিল ভুটানে, তিব্বতে, আসামে ও নেপালের কোনও কোনও অংশে। যখন সিক্কা সর্বত্র চালু করা ঠিক হয় তখন এই অঞ্চলের বিনিময় সমস্যা গুরুতব হযে দাঁড়ায এই নাবাযণী টাকা নিযে। Circulation-এ দশ লক্ষ নারাযণী টাকা ছিল। বাজারে নারাযণী টাকার দর ও টাঁকশালের দরেও কিছু তারতম্য ছিল। এই টাকা ট্রেজারীতে ফিরিয়ে নিয়ে নতুন করে সিক্কা করে বাজারে চালু করতে হয়েছিল। আবার এই দশ লক্ষ নারায়ণী টাকার মধ্যে প্রায় ৩½ লক্ষ ছিল উনহারের। নারায়ণী মুদ্রা সিক্কা করে চালু করতে লোকসানের অনুমান করা হয়েছিল দুই লক্ষ তের হাজার ষাট টাকা" (নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ, "কুচবিহার মহাফেজখানার, ঐতিহাসিক দলিলপত্র", ইতিহাস-গবেষণা, চৈতী প্রকাশন কলিকাতা, ১৯৮৮, পৃঃ ১৮—১৯)।

"কোচবিহারের ইতিহাস" প্রণেতা খাঁ চৌধুরী আমানতউল্লা আহমদ লিখেছেন যে, ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দ থেকেই ভুটানরাজ কোচবিহার রাজ্যের উপর আধিপত্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেছিলেন। কুচবিহারের রাজ-হত্যার পর ভুটানের পেনশু তোমা কোচবিহারে সসৈন্য অবস্থান করেছেন এবং অযথা রাজকার্যে হস্তক্ষেপ করেছেন। কোচবিহার এই অপ্রীতিকর অবস্থার প্রতিবিধানের জন্য ইংরেজ ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির সাহায্য প্রার্থনা করে। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের ২৬শে এপ্রিল তারিখে ভুটানের দেবরাজের সঙ্গে কোম্পানির সন্ধি স্থাপিত হয়। যুদ্ধাবসানে কোম্পানির কর্মচারী মিঃ বগলু ভুটানে আসেন। কোম্পানির সঙ্গে সন্ধি স্থাপনের বৃত্তান্ত শুনে কোচবিহারের রাজা মন্তব্য করেছিলেন "স্বয়ংসিদ্ধ রাজা ছিলাম এখন অন্যের অধীনতা কি প্রকারে স্বীকার করিব?" (পৃঃ ২১৯)।

পূর্ব ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের ইতিবৃত্ত এবং ঐ অঞ্চলের সঙ্গে নেপাল, ভুটান, তিব্বত প্রভৃতি হিমালয় অঞ্চলের রাজ্যগুলির সঙ্গে সম্পর্ক নির্ণযেব ক্ষেত্রে বাংলা ভাষায় লিখিত উপকরণ নিঃসন্দেহে অমূল্য আকর রূপে পরিগণিত হতে পারে। নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ তার "ইতিহাস-গবেষণা" গ্রন্থে এ বিষযে উজ্জ্বল সম্ভাবনার কথা আমাদের জানিযেছেন। "কোচবিহারের ইতিহাস" গ্রন্থে খাঁ চৌধুরী আমানতউল্লা আহমদ বাংলা ভাষায লিখিত পত্র-পত্রিকাদি বাদ দিয়ে কমপক্ষে পঁচিশটি ইতিহাস গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন।

কৈলাশচন্দ্র সিংহ তাঁর "রাজমালা বা ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত" গ্রন্থে ভূমিকায বলেছেন, "এই রাজ্যের প্রাচীন ইতিহাস রাজমালা প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যের বত্নমালা স্বরূপ। বাঙ্গলা ভাষার রাজকীয় মর্যাদা সমগ্র বাংলাদেশ কখনও দিতে পারেনি, কিন্তু সেই অতীত থেকে ত্রিপুরা দিয়েছে; যদিও ত্রিপুরার মূল অধিবাসী এবং ত্রিপুরার রাজবংশের মাতৃভাষা বাঙ্গলা নয়"। এই সব গ্রন্থ থেকে একথা স্পষ্ট যে বাঙ্গলা ভাষায় রচিত দলিল-পত্রাদি উপযুক্ত ক্ষেত্রে ইতিহাস গবেষণায অপরিহার্য উপকরণ।

ভারতের জাতীয় মহাফেজখানায় প্রাচ্য ভাষায লিখিত অসংখ্য চিঠিপত্র সংরক্ষিত আছে। ফারসী, আরবী, আরকানী, গুরুমুখী, বর্মী, বাংলা, চীনা, হিন্দী, কানাড়ী, মারাঠী, উড়িয়া, সংস্কৃত ইত্যাদি ভাষায় লিখিত এই সমস্ত পত্র-সম্ভার ইতিহাসের অমূল্য আকর।

বাংলা ভাষায় লিখিত উপকরণের কিছু পরিচয আমরা পাই সুরেন্দ্রনাথ সেন সম্পাদিত "সেকালের বাংলা পত্র সংকলন" গ্রন্থটিতে। এই অসামান্য গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৪২ সালে। প্রকাশনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। সম্প্রতি "সমতট ১০১" সংখ্যায় "উত্তরবঙ্গের লোকভাষার পশ্চাৎপট" শীর্ষক প্রবন্ধে হরিপদ রায় সেকালের বাংলা পত্রের সংকলন গ্রন্থটির অপরিসীম গুরুত্ব আলোচনা করছেন ভাষাতাত্ত্বিকের দৃষ্টিতে। কিন্তু, আমরা এটি আলোচনা করবো ইতিহাস গবেষকের দৃষ্টিকোণ থেকে। এই গ্রন্থটি দুটি ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে বাংলা ভাষায় লিখিত হয়েছে সম্পাদকের নিবেদন, প্রাসঙ্গিক ভূমিকা, ১৬৯টি বাংলা ভাষায় লিখিত পত্রের সংকলন, এইসব পত্রে ব্যবহৃত ফারসী আরবী ও হিন্দী শব্দের অর্থ বিশ্লেষণ, ঐসব পত্রে উল্লিখিত ব্যক্তি ও স্থানের প্রয়োজনীয় পরিচয়, তাছাড়া আছে টীকা, শুদ্ধিপত্র ও নির্ঘণ্ট। প্রথম ভাগের পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৮৫। দ্বিতীয় ভাগটি ইংরাজি ভাষায় লিখিত। এই অংশে আছে সম্পাদকের বিবরণ, ভূমিকা, ঐ সমস্ত পত্রের ইংরাজি সংক্ষিপ্তসার। পত্রে উল্লিখিত ব্যক্তি ও স্থানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং গ্রন্থপঞ্জী। দ্বিতীয় ভাগের পৃষ্ঠা সংখ্যা ১১৫। যে সমস্ত গবেষক ভারত ভুটান সম্পর্কের ঐতিহাসিক ভিত্তিভূমি নিয়ে গবেষণা করেছেন তাদের অধিকাংশই নির্ভর করেছেন ইংরেজি সংক্ষিপ্তসারের

উপর। ফলে বাংলা ভাষায় লিখিত মূল চিঠিপত্রে যে সব অসংখ্য তথ্য ছড়িয়ে আছে, অধিকাংশ গবেষকই সেগুলির যথার্থ ও আশানুরূপ সদ্ব্যবহার করতে পারেননি।

আলোচ্য উপকরণের কালপর্ব হল খ্রিষ্টীয় ১৭৭২-১৮২০ সাল। এই কাল পর্বে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে পূর্ব ভারতের স্বাধীন রাজ্যগুলির অবস্থা, কুচবিহার রাজ্যের ইতিহাস, কুচবিহার রাজ্যে ভুটিয়াদের প্রতিপত্তি, কুচবিহারের সঙ্গে ভুটানের সীমা সংক্রান্ত বিবাদ, ভুটানের সঙ্গে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সম্বন্ধ, কুচবিহারের সঙ্গে ভুটানের বিবাদ, ভুটানে ইংরেজ কর্মচারী কৃষ্ণকান্ত বসুর দৌত্য প্রভৃতি বিষয়ে অসংখ্য তথ্য পাওয়া যায় ঐ পত্রাবলীতে।

সুরেন্দ্রনাথ সেন ভূমিকায় বলেছেন, "এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে বাংলা ভাষা তাহার অসহায় শৈশবেই সমগ্র পূর্ব-ভারতে আপনার প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়াছিল। তখনো কোনো গদ্যসাহিত্যরথীর আবির্ভাব হয় নাই। বাংলার কাব্য তখনো বিদেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই। বিজিত বাঙ্গালীর ভাষা ও সাহিত্য বিদেশী রাজার আনুকূল্য লাভ করে নাই, তথাপি কুচবিহার ও মণিপুর, আসাম ও কাছাড়, উড়িষ্যা ও ভুটানে এই ভাষা কেবল স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল।"

কুচবিহারের রাজভাষা ছিল বাংলা। ভুটানের দেবরাজার দরবারে বাংলা ভাষায় অভিজ্ঞ মুন্সী চাকরি করত। অনেক সময় ইংরেজ রাজকর্মচারীও দেশের লোকের সঙ্গে বাংলা ভাষায় চিঠিপত্র লিখতেন। মফস্বল অঞ্চলে ফরাসী বণিক ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটকে যে সব চিঠিপত্র দিতেন তাতে বাংলা ভাষায় অনেক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কুচবিহার ও ভুটানের সীমান্ত নির্ণয় করার জন্য একজন কর্মচারীকে পাঠিয়েছিল ইংরেজ সরকার। কলকাতায় ভুটান থেকে ভুটিয়া দূত এসেছে, আসাম থেকে অসমীয়া দূত কিন্তু কুচবিহার এবং কাছার থেকে সব সময়ই বাঙ্গালী দূত আসত ইংরেজ সরকারের কাছে। আলোচনার উদাহরণ হিসাবে এই সংকলন গ্রন্থে উল্লিখিত প্রথম পত্রখানি উল্লেখ করছি। পত্রের লেখক নিরপুর পয়গা। পত্রটির তারিখ ৯ই পৌষ ১১৮৫।

পত্র ঃ

পূর্ব্বে বাঙ্গালাতে ও লাশার মলুকে বহুত তেজারত হইত হিন্দু মোশলমান লোক তেজারত জর্ন্তে জাইত আশীতে তেজারত করিত কথ দিন হইল লাড়াই ভিড়াই কারণ মহাজন লোক জাতায়াতে মুশকীল হইয়াছে শ্রীশ্রী দেবধর্ম্ম লামাঃ রিম্পেছে সহিত শ্রীযুত কম্পনি সঙ্গে মোনের সহিত্ত দোস্তী হইয়াছে সেমতে দোতরফা লিখাপড়া হইয়াছে জে দেবরাজ হিন্দু মোশলমান লোক আশীতে জাইতে

তেজারতী করিতে কোন আটক কবিবেন না তাহারা চন্দন নিল গুগুল সাববপান ষুপাবি নিতে পাবিবেক না এঙ্গবাজ ফেবঙ্গী মহাজন লোক উপরে জাইতে না পারে বাঙ্গালাতে ভোটাস্তের জে লোক ঘোড়া ও গযরহ আনিয়া খবিদ ফরক্ত কবিবেক তাহার হাশীল মাষুল দোতরপী নাহী এ দফাতে আমিহ করার লিখিয়া দিতেছি এহিমত আমলে আশীবেক কোন মতে তফাত্তত হবেক না। ইতি সন ২৬৯ দুই সত্ত উনশত্তবি মোতাবেক সন ১১৮৫ পচাসী বাঙ্গালা তারিখ ৯ নও পৌষ মোঃ কৈলকাত্তা।

এই পত্র থেকে ভুটানেব শাসনতন্ত্রের কিছু তথ্য পাওয়া যায়। সংকলন গ্রন্থেব সম্পাদক হিসাবে সুরেন্দ্রনাথ সেন ঐ চিঠিতে শাসনতন্ত্রেব সম্বন্ধে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ধর্মরাজ ভুটানের অধীশ্বব। দেবরাজা তাহাব কর্মচারী। ধর্মবাজা সন্ন্যাসী—তিনি ভুটানেব বৌদ্ধ সংঘেব নাযক। সুতবাং বাজ শাসনেব ক্ষমতা প্রকৃতপক্ষে তার প্রধান কর্মচাবী দেবরাজার হস্তেই ন্যস্ত হযেছিল। ইনি ভুটানেব দেবরাজা নামে পরিচিত। ধর্ম বাজাব শাসন পবিষদেব সদস্য সাতজন—

(১) ধর্মরাজাব খাস মুন্সী
(২) দেওয়ান
(৩) টাসিসুজঙ্গেব শাসনকর্তা
(৪) পুনাখের শাসনকর্তা
(৫) অঙ্গদু ফোরঙ্গের শাসনকর্তা
(৬) দেবরাজার মুন্সী এবং
(৭) প্রধান বিচাবপতি।

কিন্তু বাস্তবে শাসন পরিচালনা কবতেন পারো পেনলো ও টংসো পেনলো। মধ্য ভুটানের শাসনকর্তা টরগা বা ডাকা পেনলোর তেমন ক্ষমতা ছিল না। সুতরাং পারো পেনলো বা টংসো পেনলোব মধ্যে যখন যিনি অধিক ক্ষমতাশালী তিনি আপন ইচ্ছামত দেবরাজা নিয়োগ করতেন। এই পেনলোদের পদও চিরস্থায়ী ছিল না। তাদের অধীনস্থ কর্মচারীরা প্রভুকে হত্যা করে তার পদ অধিকারের জন্য সবসময় সচেষ্ট থাকত। এ কারণেই একাধিক পদচ্যুত দেবরাজা ও পেনলোর উল্লেখ আমরা পেয়েছি।

ভুটানের দক্ষিণ সীমান্তে বাংলা ও আসাম প্রদেশের উত্তরে ১৮টি দুয়ার বা গিরিপথ আছে। এই গিরিপথগুলির কেল্লার অধিপতিরাই গ্রামগুলি শাসন পরিচালনা করতেন। এঁদের বলা হত জুঙ্গপেন বা দুর্গাধ্যক্ষ। ইংরেজ সরকারের কাছে এঁরা ছিলেন সুবা নামে পরিচিত। উল্লিখিত পত্রে যে বৃদ্ধ সুবার উল্লেখ পাওয়া যায় তিনিও একটি দুয়ারের জুঙ্গপেন ছিলেন। ভুটানে রাজকর্মচারীদের মধ্যে সর্ব-নিম্ন পদ ছিল জিনকাপ। এঁরা পত্র-বাহকের কাজ করতো। এই পদ ইংরেজ আমলের চাপরাশির সঙ্গেও তুলনীয়। কিন্তু সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল ভুটানে অনেক উচ্চ-পদস্থ রাজকর্মচারীকে সর্বনিম্ন স্তর থেকে কাজ শুরু করতে হত। দেবরাজার পদ লাভ করা তাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল না।

শাসনতন্ত্রের এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির উপর আলোকপাত করেছেন সুরেন্দ্রনাথ সেন। এই বাংলা পত্রটি এ কারণে ঐতিহাসিক দলিল হিসাবে বিশেষ মূল্যবান।

এই পত্রখানির আরেকটি বক্তব্য ছিল যে হিন্দু মুসলমান বণিকদের ভুটানের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্যের পথে দেবরাজা কোনো বাধা সৃষ্টি করতেন না। কিন্তু তারা চন্দনকাঠ, নীল, গোগুল, পশুর চামড়া, পান এবং সুপারী ভুটানে রপ্তানী করতে পারবে না। ইংরেজ বা ইউরোপীয় বণিকদের ভুটানে প্রবেশও নিষিদ্ধ করা হযেছিল। আর বাংলাদেশে যে সমস্ত ভুটিয়ারা ঘোড়া বা অন্যান্য সামগ্রী নিয়ে আসবে সেগুলি হবে সম্পূর্ণ করমুক্ত। ঐ পত্রটি ভুটান বাংলাদেশ বাণিজ্য সম্পর্কে তাই অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

প্রসঙ্গক্রমে আরেকটি তথ্য এখানে উল্লেখ করছি। ১৯৭৬ সালে "ঐতিহাসিক প্রবন্ধ সংকলন" পত্রিকার প্রথম সংখ্যা ১৮৬৫ সালের ইঙ্গো-ভুটান যুদ্ধের বাংলা ভাষায় রচিত ঘোষণা পত্রটি প্রকাশিত হয়েছে। হিমালয় সম্পর্কে গবেষণারত একজন বিশিষ্ট গবেষক এই ঘোষণাপত্রটির সন্ধান পান দার্জ্জিলিং ডেপুটি কমিশনার দপ্তরে। এর থেকে প্রমাণ হয় যে এমনকি উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত হিমালয় অঞ্চলে বাংলা ভাষার যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। এ-ধরনের আরও উপকরণ নিঃসন্দেহে উত্তর বঙ্গের জেলাগুলির প্রশাসন দপ্তরে পাওয়া যাবে। এগুলির যথাযথ সংরক্ষণ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অবশ্য কর্তব্য।

সূত্র-নির্দেশ

১. সুরেন্দ্রনাথ সেন, প্রচিন বাঙ্গালা পত্রসঙ্কলন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪২।
২. খাঁ চৌধুরী আমানতউল্লা আহমদ, কোচবিহারের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, রাজশক ৪২৬, ১৯৩৫।
৩. মহাদেব চক্রবর্তী ও অন্যান্য (সম্পাদক) রাজমালা বা ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত, লেখক কৈলাশচন্দ্র সিংহ, বর্ণমালা প্রকাশনী, আগরতলা, ত্রিপুরা, ১৯৮৫।
৪. নবেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ, ইতিহাস-গবেষণা, চৈতী প্রকাশন, কলিকাতা, ১৯৮৮।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির ডাকটিকিটের ইতিহাস

প্রবীরকুমার লাহা

আকাডেমিক চর্চ্চায় বিশেষত ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানের ধারায় ডাকটিকিট বা PHILATELIC STUDY সম্ভাবনা থাকলেও এখনও তেমনভাবে স্থান করে নিতে পারেনি। ডাকটিকিট প্রকাশধারার মধ্যে অতি সূক্ষ্ম ও প্রচ্ছন্নভাবে প্রতিফলিত হয়ে থাকে রাষ্ট্রীয় শাসনের শাসকগোষ্ঠীর মনোভাব, চরিত্র ও নীতি।

এ-নিবন্ধে বিশ্বের অবলুপ্ত সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির ডাকটিকিট নিয়ে সম্যক আলোকপাতের চেষ্টা করা হয়েছে মাত্র। বিশ্বে একদা সমাজতান্ত্রিক দেশের সংখ্যা হল ২৬টি, এগুলি হল: ১. সোভিয়েত ইউনিয়ন ২. গণপ্রজাতন্ত্রী চীন ৩. হাঙ্গেরী ৪. পূর্ব জার্মানী ৫. পোল্যান্ড ৬. রুমানিয়া ৭. আলবেনিয়া ৮. চেকোস্লাভাকিয়া ৯. যুগোস্লাভাকিয়া ১০. ভিয়েতনাম ১১. কিউবা ১২. উত্তর কোরিয়া ১৩. অ্যাঙ্গোলা ১৪. বেনিন ১৫. বুলগেরিয়া ১৬. কেপ ১৭. কঙ্গো ১৮. ইথিওপিয়া ১৯. গিনি বিসাউ ২০. লাওস ২১. কামপুচিয়া ২২. পিপলস রিপাবলিক অফ কামপুচিয়া ২৩. মঙ্গোলিয়া ২৪. মোজামবিক ২৫. সোমালিয়া ২৬. ইয়েমেন।

ইউ.এস.এস.আর—দুটি মহাদেশে বিস্তৃত রাশিয়া দেশটি পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ। ডাকটিকিট প্রকাশনায় দুটি যুগ:

(১) **বিপ্লব পূর্ব যুগ** (১৮৫৮–১৯১৫)—এর প্রথম ডাকটিকিট প্রকাশকাল ১৮৫৮ (নকসা বিশিষ্ট), পরবর্তী প্রকাশকাল ১৮৬৩–৬৪, ১৮৭৫, ১৮৮৯, ১৯০৫ (রুশ-জাপান যুদ্ধ সাহায্যার্থে, এ্যাডমিরাল Kormilov স্মরণে), ১৯০৬, ১৯১৩ (Romanov বংশের ত্রিশতবর্ষ, দ্বিতীয় নিকোলাস, এলিজাবেথ স্মরণে), ১৯১৪–১৫ (যুদ্ধ সাহায্যার্থ)।

(২) **বিপ্লবোত্তর যুগ** (১৯১৭–১৯৯০)—প্রথমে এযুগে প্রাক বিপ্লব যুগের ডাকটিকিটগুলি Overprint করে ব্যবহার করা হলেও ১৯১৭-তে এ-যুগের প্রথম প্রকাশিত ডাকটিকিটে চিত্রিত হয় শিক্ষা ও জন-ভাবনাটি; পরবর্তী কালে এই ভাবনাটি সম্প্রসারিত হয় বিভিন্ন ক্ষেত্রে, যেমন কৃষি, শিল্প প্রভৃতি। এই ডাকটিকিটগুলি Overprint করে দুর্ভিক্ষ ত্রাণ সংগ্রহেও ব্যবহার ঘটে।

রুশ-ডাকটিকিটমালা বিষয়ভিত্তিক ও ব্যক্তিভিত্তিক এই দুটি অধ্যায়ে বিভক্ত। বিষয় ভাবনায় রয়েছে খেলাধূলা, শান্তি, সমাজের শ্রমজীবী মানুষ, মহাকাশ প্রভৃতি। ডাকটিকিট পরিকল্পনায় সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার বিন্যাস লক্ষণীয়— বিপ্লবোত্তর ডাকটিকিটে ব্যাপকভাবে শ্রমজীবী মানুষ প্রতিফলিত, রঙ, সাইজের বৈচিত্র্যময়তা (৮০x২৬ মি.মি., Vertical, লম্বা, Horiegental), লিপিতে রুশ ভাষা CCCP অর্থাৎ USSR, প্রকাশিত প্রায ১৩টি চতুষ্কোণ ডাকটিকিটে (যেমন তৃতীয আন্তর্জাতিক যুব ক্রীড়া, রাশিয়াব যুব দিবস, ১৯৫৮; রেডক্রশ শতবর্ষ, নববর্ষ প্রভৃতি), প্রথম চতুষ্কোণ ও মহিলা ডাকটিকিট হল যথাক্রমে— স্ট্যাটাকার্স ক্রীডা— Rowing ও Marti Melnikaita, ডাকটিকিটগুলির সুভ্যেনিযার শিটে এবং কতিপযে পরিচিতি পত্র, Express Stamp ও Russian Post Office in Turkey প্রচলিত ছিল।

ইয়েমেন—দেশটি দক্ষিণ-পশ্চিম আরবের অংশ। ১৯১৮ সালে স্বাধীন হয। ১৯৫৮ সাল থেকেই UAR বা United Arab Republic ভুক্ত দেশগুলি হল ইজিপ্ট, সিরিযা ও ইয়েমেন। ইয়েমেনের প্রথম ডাকটিকিট প্রকাশ পায ১৯২৬ সালে। চিত্রায়নে রাজ্য প্রতীক, ১৯৩০, ১৯৩৯ প্রকাশিত ডাকটিকিটে চিত্রিত ছিল আরব সংহতির পতাকা। এদেশের ডাকটিকিটের বিষয়সূচী— প্রাণী, কৃষি, পরিবহন সম্পদ, বিশ্বসংস্থা, স্বাধীনতা ভাবনায এবং ব্যক্তির ডাকটিকিট চিত্রায়ণে— জওহরলাল নেহরু, কেনেডি, বিশ্বকাপ ফটবল পথিকৃত Jules Rimal প্রমুখেরা। লিপির ব্যবহারে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত ইংরাজী ও উর্দুতে, ১৯৬১ সাল থেকে ইংরাজীতে Yeman Arab Republic.। সাইজের বৈচিত্র্যে প্রথম ত্রিকোণ ডাকটিকিট হল ১৯৬৫ এর পতাকা ভাবনায় এবং প্রথম চতুষ্কোণ ডাকটিকিট হল ১৯৬৬ এর Houring Astronauts, অন্যান্যগুলি হল— Winston Charchill, St. Pauls Cathidral, রাষ্ট্রপতি কেনেডি (১৯৬৭)।

যুগোস্লাভাকিয়া—এর ১৯১৮—১৯৪৪ পর্যন্ত প্রকাশিত ডাকটিকিট প্রকাশনায় রাজকীয় মুখশ্রী (আলেকজান্ডার, দ্বিতীয় পিটার, Tomislaw, Andrew Pauel) চিত্রিত মাত্র দুটি প্রকাশনা ব্যতিক্রম রয়েছে—যুদ্ধ স্মৃতি (১৯২৯), পদার্থবিজ্ঞানী Nilotesla, সমাজতান্ত্রিক যুগের ডাকটিকিট প্রকাশনায় বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান—বিষয়মুখী প্রকাশনা হেন বিষয় নেই স্থান পেয়েছে, সাধারণ মানুষ চিত্রায়ণে ভাবনায় এসেছে, ব্যক্তিত্ব ডাকটিকিট প্রকাশগুচ্ছ— ভি.আই.লেনিন চারবার (১৯৬০, ১৯৬৭, ১৯৭০, ১৯৭৮), কার্ল মার্ক্স (১৯৬৮), ফ্রেডারিক এঙ্গেলস্ (১৯৬৪), লেখক, বিপ্লবী, স্থাপত্যবিদ, পাশাপাশি রাষ্ট্রপতি মার্শাল টিটো জীবিত অবস্থায় ১৯৬২, ১৯৬৬-৬৭, ১৯৭৪ সালে স্থানাধিকার হয়েছেন। লিপির ভাষায় যুগোস্লাভাকিয়া।

কিউবা— এদেশটি শাসন অধিকৃত সময়ানুসারে ডাকটিকিট প্রকাশ মালাটি বিন্যস্ত—১৮৫৫–১৮৯৮ পর্যন্ত স্পেনিস অধিকৃত যুগ বিভিন্ন রঙ ও মূল্যের ডাকটিকিট প্রকাশনায় শিল্প ভাবনা চিত্রিত হয়েছে। মার্কিন মুলুকের শাসনাধীন ১৮৯৯–১৯০২ পর্যন্ত প্রকাশিত ডাকটিকিটগুচ্ছ ছিল ১৮৯৪ সালের ডাকটিকিটের Overprint টাইপে।১৯০২ সালে স্বাধীন প্রজাতন্ত্রের প্রথম ডাকটিকিট হল Uncentavo Habailitado শীর্ষক। বিষয় ডাকটিকিটের ডালিতে শ্রম, শ্রমিক, মানচিত্র, বিশ্ব সংস্থাগুলি, ন্যায় বিচার, মহিলা চিত্রায়ণের সঙ্গে রোল্যাণ্ড ছিল, রাষ্ট্রপতি J. M. Gomez, V. I. Lenin (৩ বার), হো চি মিন প্রমুখ ব্যক্তি ডাকটিকিটে স্থান পেয়েছে। সাইজ, রঙ, মূল্যমান ও রঙের বৈচিত্র্যতায় ডাকটিকিটগুলি সমৃদ্ধ হয়েছে। লিপির ভাষা Islapecuba অর্থাৎ স্প্যানিস। প্রথম ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ ও লম্বা ডাকটিকিটগুলি হল যথাক্রমে রেডক্রশ সাহায্য (১৯৫৯), জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠান (১৯৬২), শান্তির আকৃতিতে ওলিম্পিক গেমস (১৯৬৪)।

স্বাধীন লাওস দেশের প্রথম প্রকাশিত দুটি ডাকটিকিটের চিত্রায়ণে ছিল Me Kong নদী এবং Kings Sisavany Vongy। হেন কোন বিষয় নেই যে ডাকটিকিটে স্থান পাযনি। দুটি চতুষ্কোণ ডাকটিকিটে চিত্রিত ওলিম্পিক গেমস, (১৯৬৮) ও পৌরাণিক গণেশ (১৯৭১) লিপিতে লেখা Lorac Laos and Royuv Me de Laos। ১৯৫২ সালে প্রচলিত ছিল ডাকমাশুল বাকী ডাকটিকিট (Due Stamps)।

গিনি—আফ্রিকার ফরাসী উপনিবেশ থেকে ১৯৫৭ সালে স্বাধীন হওয়ার পুর বছর (১৯৫৯) রঙ, মূল্যের বৈচিত্র্যে স্বাধীনতা ঘোষণা নিয়ে ৫টি ডাকটিকিট প্রকাশ পায়। আফ্রিকার বন্যপ্রাণী, বিশ্বসংস্থাগুলি বিষয়কেন্দ্রিক ডাকটিকিটে এবং রাষ্ট্রপতি কেনেডির ব্যক্তিত্ব ডাকটিকিটে স্থান পেলেও লেনিন ও কার্ল মার্ক্স ডাকটিকিটে অসমাদৃত। প্রকাশিত চতুষ্কোণ ডাকটিকিট—ক্রীড়া হ্যাণ্ডবল (১৯৬৩), প্রজাপতি, বন্যপ্রাণী Blue Touraco, মূল্যমান লেখা সংখ্যা লিপি লেখা Republic An De Guinea.।

মঙ্গোলিয়ায় ১৯২৪ সালে প্রথম ডাকটিকিট প্রকাশিত হলেও পরবর্তীকালে শিক্ষা, লেনিন, বন্যপ্রাণী, স্বাধীনতা, পাখী সহ বিভিন্ন বিষয় ও ব্যক্তির ডাকটিকিট প্রকাশনায় ডালিটি সমৃদ্ধ হয়েছে। এর মধ্যে ৫টি ত্রিকোণ (প্রথম প্রাণী Sable, ১৯৫৯ ও পরে ১৯৬১–৬২, ১৯৭৩— সবাই প্রাণী সম্পদ), ১৭টি চতুষ্কোণ (প্রথম— ১৯৫৯তে মঙ্গোলিয়ান ক্রীড়া, অন্যান্য— রেডক্রশ শতবর্ষ, যুব আন্দোলন, বিশ্বকাপ ফুটবল, বিশ্ব নারী দিবস প্রভৃতি বিষয়) সহ সমান্তরাল ও Vertical সাইজের ডাকটিকিট প্রকাশ ঘটেছে। লিপির একক ভাষা ইংরাজী।

ইথিওপিয়া—স্বাধীন হয় ১৯৫২ সালে। ১৮৮৪ সালে প্রকাশিত হয় প্রথম ডাকটিকিট। ১৮৮৪–১৯৩৭ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত ডাকটিকিটের চিত্রায়ণে ছিল সিংহ, রেল, রোগী ও ধাত্রী প্রভৃতি। ১৯৫২ সাল স্বাধীন প্রজাতন্ত্র ইথিওপিয়া ডাকটিকিটে চিত্রিত ছিল রাষ্ট্রসঙ্ঘ। এদেশের ডাকটিকিটে কতিপয় বৈশিষ্ট্য প্রতিভাত হয়েছে—বিষয় ভাবনায় নানা বিষয়, ১৯৬১তে প্রথম ত্রিকোণ ডাকটিকিট Golden wedding of Emperor শীর্ষক, লিপির ভাষা ইংরাজী ও ইথিওপিয়া। ১৮৯৬, ১৯০৫, ১৯০৭–০৮ সালগুলিতে Postal Due Stamp প্রকাশনা।

সোমালিয়া—আফ্রিকা মহাদেশের উপনিবেশিক দেশ ছিল। ১৯০৩–১৯৪৩ পর্যন্ত ইটালির উপনিবেশিক যুগে প্রকাশিত ডাকটিকিটের চিত্রটি হল যে, ১৯০৩ প্রথম ডাকটিকিটে সিংহ, জাতির চিত্রায়ণ, পরবর্তী প্রকাশনা ১৯০৫, ১৯১৫–১৬, ১৯২২, ১৯৩০, ইটালির ডাকটিকিটের উপর over print করা হয়। ১৯৪৩–১৯৫০ ব্রিটিশ শাসনাধীনে ডাকটিকিট প্রকাশনায় ছিল বন্যপ্রাণী, মানচিত্র, ক্রীড়া প্রভৃতি।

১৯৬০ সালে স্বাধীন হলে প্রকাশিত প্রথম ডাকটিকিট চিত্রিত হয় মানচিত্র। পরবর্তীকালের প্রকাশ ভাবনায় বিভিন্ন বিষয, বিশ্ব সংস্থাগুলি (UNESCO, UNICEF, UNO), রাষ্ট্রপ্রতি Schoernarele, রাজা Faisal (১৯৬৭), মহাত্মা গান্ধী (১৯৬৯) সমাদৃত হযেছে। লিপিতে ইংরাজী ভাষাব আধিপত্য।

চেকোস্লাভাকিয়া দেশটি অস্ট্রিয়ার পূর্ব অংশ। স্বাধীন হয ১৯১৮ সালে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় চলে যায় জার্মানীর অধিকারে। ১৯৪৪–৪৫-এ আবার হৃত স্বাধীনতা ফিরে পায়। ডাকটিকিট প্রকাশের বিচিত্রতার আঙিনায় পরিপূর্ণতায দাবী রাখে—১৯১৮তে প্রথম ডাকটিকিট চিত্রিত হয় ড্রাগন। পরবর্তীকালের প্রকাশনায় প্রাচীন সংস্কৃতি-কৃষ্টি, সমাজের শ্রমজীবী মানুষ, আর ডাকটিকিটে ব্যক্তি বন্দনায় চিত্রিত হয়েছে লেনিন (২ বার), যোশেপ স্ট্যালিন (২ বার), Gottward Zapotosky (৩ বার), রাষ্ট্রপতি Zapotocky, কবি মায়াস্কোভস্কি, নারী B. Nemeove, বিজ্ঞানী Prokoppivas, লেখক S. K. Neumanu প্রমুখেরা। নক্সার বৈশিষ্ট্যে চৌকো, গোলাকার সাইজে, লিপিতে চেক ভাষা।

ভিয়েতনাম— ফরাসী উপনিবেশের নাগপাশ থেকে ১৪.৭.১৯৪৯-তে স্বাধীন হয়েও প্রায় দুই দশক ধরে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কৌশলগত যুদ্ধে জয়ী হল। ১৯৫১ সালে সমাজতন্ত্রী ভিয়েতনামের প্রথম ডাকটিকিটের চিত্রায়ণে ছিল Dalil এর Bongoarfall। ডাকটিকিটের বিষয়বস্তু ভাবনায় সম্প্রসারিত বিশ্বসংস্থাগুলি (UPV, UNO, WHO), যুদ্ধক্ষেত্র, বন্যপ্রাণী, রেল, শ্রমজীবী মানুষ, প্রকৃতি, আর ব্যক্তিত্বের শ্রদ্ধাঞ্জলিতে V. I. Lenin, হো চি মিন (৮বার), কার্ল মার্ক্স, বিজ্ঞানী Lytutrong, দেশপ্রেমিকেরা Hoany Hoathan,

Nayuyen Vontroi, Trandanhninh প্রমুখেরা। লিপি, মূল্যমান লেখায় ভিয়েতনামী ভাষার ব্যবহার।

কেপ—দ্বীপপুঞ্জ পোর্তুগীজ উপনিবেশ। অবস্থিতি উত্তর আটোথানাটিক থেকে ৫০০ মিটার দূরে আফ্রিকার পশ্চিম মোহনায়। ১৮৭৭ সালে প্রকাশিত Embossedfey টাইপের ডাকটিকিটে চিত্রিত ছিল 'মুকুট'। লিপিতে লিখিত Provincia De Cubo। পরবর্তী ডাকটিকিট প্রকাশনায়—১৮৯৩, ১৮৯৮, ১৯০২, ১৯১১–১৪, ১৯২১–২২, ১৯২৫, ১৯৩১, ১৯৩৪, ১৯৩৮–৩৯ সালগুলিতে চিত্রিত রাজকীয়। ১৯৪৭ সালে দেশটি প্রজাতন্ত্রী হলে ডাকটিকিটের প্রকাশ ভাবনাকে জনমুখী করা হল। স্থান পেল নানান বিষয়। লিপির লেখা লিখিত Caboverpe.। এখানে ডাকটিকিট ব্যতীত ১৮৯৩ সালে সংবাদপত্র ডাকটিকিট এবং ১৯০৪, ১৯১১, ১৯২১, ১৯২৫, ১৯৫২ সালগুলিতে 'ডাকমাশুল বাকী' টিকিটের প্রকাশ ঘটেছিল।

অ্যাঙ্গোলা—প্রথম ডাকটিকিট প্রকাশকাল ১৮৭০ সালে। ডাকটিকিট প্রকাশ আঁধারটি ঘিরে রয়েছে পাখী, বন্যপ্রাণী সম্পদ, মানুষ, মানচিত্র, ক্রীড়া, গবেষণা প্রভৃতি। ১৯৫৮ সালে প্রথম চতুষ্কোণ ডাকটিকিটের ভাবনাটি হল ষষ্ঠ আন্তর্জাতিক ট্র্যাপিক্যাল মেডিসিন সম্মেলন।

১৮৯৩-তে সংবাদপত্র ডাকটিকিট এবং ১৯০৪, ১৯১১, ১৯২১, ১৯২৫, ১৯২৪–২৫ সালগুলি Postage Due Stamp প্রকাশিত হয়। এদেশের ডাকটিকিটের লিপিতে তিনটি ক্রমবিকাশ রয়েছে—Angola (১৮৭০–১৮৮৫), Province De Angola (১৮৮৬–১৮৯২), Angola (১৮৯৩ থেকে)।

আলবেনিয়া—দেশটি এপ্রিল, ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত ছিল ইটালির অধিকৃত অঞ্চল। ১৯৪৩–৪৪ সালে জার্মানীর অধিকৃত অঞ্চল হয়। ১৯৪৫ সালে স্বাধীন হয় ও ১৯৪৬ সাল থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী দেশ। স্বাধীন প্রজাতন্ত্রের পূর্বে ডাকটিকিটের নকশায় থাকত সুলতানের মুখশ্রী। ১৯১৩ সালে গোলাকার নকসায় প্রথম ডাকটিকিট প্রকাশ হয়। ইটালি অধিকৃত থাকাকালীন ডাকটিকিটের চিত্রায়ণে স্থান পায় রাজা ভিক্টোর Emmanuel (২ বার), Chey, ভাস্কর স্তম্ভ, যক্ষা বিরোধী বিষয়।

স্বাধীন প্রজাতন্ত্রের ডাকটিকিট প্রকাশ ভাবনায় চিত্রায়ণ বদলে এল সৈন্য, রেল, শিশু, মানচিত্র, বন্যপ্রাণী সম্পদ, বিপ্লব, শ্রমজীবী, V. I. Lenin (৪ বার), মাও সে তুং (২ বার), কার্ল মার্ক্স (৪ বার), যোশেফ স্ট্যালিন (২ বার), এঙ্গেলস, দেশ প্রেমিক Zef Juleani, কবি Nedre Mjeda ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত প্রথম চতুষ্কোণ ডাকটিকিটের চিত্রটি ছিল Waxwing পাখী।

১৯৪৬ সালে রাশিয়ার অধিকৃত উত্তর কোরিয়ার ডাকটিকিট প্রকাশ ভাবনা ঘিরে রয়েছে শ্রমজীবী মানুষের প্রতিফলন, সর্বহারা নেতা লেনিন (১৯৫৭ সালে ২ বার), কার্ল মার্ক্স ও মহাদেশীয় ভ্রাতৃত্ব। চীনা ভাষায় লিপি লেখা হয়। প্রথম ও ত্রিকোণ ডাকটিকিট হল যথাক্রমে গৃহস্থ মুরগী খামার (১৯৬৪) ও ওলিম্পিক গেমস (১৯৬৪)।

মোজাম্বিক—দেশের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলগুলি হচ্ছে Inhambaro, Lourenzo, Marques, Quarlimane ও Tetc.। প্রথম ডাকটিকিট প্রকাশকাল ১৮৭৬ সালে। চিত্রায়ণে মুকুট (Crown)। ১৮৮৬, ১৮৯৩ সালে প্রকাশিত ডাকটিকিটের চিত্রায়ণে ছিল— প্রজাপতি, বিমান, সমুদ্র, মানচিত্র প্রভৃতি। ১৯৪২ সাল পর্যন্ত দেশটি প্রশাসনের দায়িত্বে (Mozambique Colaf) থাকায় এই সময়ে প্রকাশিত ডাকটিকিটের চিত্রায়ণে ছিল অভ্র, গ্রাম্যলোক, গ্রাম প্রভৃতি।

রেডক্রশকে ডাকটিকিটে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য ১৯২৪, ১৯২৯, ১৯৩০ সালে তিনটি ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়েছে।

১৯৩৫ এবং ১৯৭১ সালে প্রকাশিত যথাক্রমে ত্রিকোণ ও চতুষ্কোণ ডাকটিকিটের চিত্রায়ণে ছিল—বিমান ও FossilizedFern. পাশাপাশি প্রচলিত ছিল Postage Due Stamp (১৯০৬, ১৯১১, ১৯১৬, ১৯১৯, ১৯০৪, ১৯১৭, ১৯২৫, ১৯২৯), সংবাদপত্র ডাকটিকিট (১৮৯৬)।

রঙ, মূল্য ও নকসায় বৈচিত্র্যময় ডাকটিকিটের মূল্যমান লেখা হত সংখ্যায়, ইংরাজী ভাষায় লিপিতে থাকত—Mozambique.

জার্মানী—১৯১৮ পর্যন্ত সম্রাটের শাসনাধীন, ১৯৪৫ পর্যন্ত প্রজাতন্ত্র ছিল। ১৯৪৫ সালে জার্মানী বিভক্ত হয়ে দুটি ভাগে German Federal Republic বা GFR (পশ্চিম জার্মানী) এবং German Democrative Republic বা GDR (পূর্ব জার্মানী)।

১৯৪৯ সালে প্রকাশিত GDR প্রথম ডাকটিকিটে চিত্রিত ছিল ডাক সংস্থার ৭৫তম পূর্তি স্মরণে। পরবর্তী ডাকটিকিট প্রকাশনাটি জনমুখী ভাবনায় সম্প্রসারিত হয়েছে। ব্যক্তিত্ব ডাকটিকিটে চিত্রায়ণে এসেছে চার্লস ডিকেন্স, Mozart, Freuter, জীবিতকালে ১৯৫১ সালে মাও সে তুং, কাল মার্কস (১৯৩৫), মাক্সিম গোর্কী প্রমুখ। ১৯৫৪ ও ১৯৫৬ সালে Official Stamp প্রকাশ হয়। ডাকটিকিটের সাইজের বৈচিত্র্যময়তায় রয়েছে—গোলাকার (শিক্ষা সম্পর্কে, ১৯৫০) লম্বা ধরনের নকসায় (রুশ বিপ্লব স্মরণে, ১৯৫৫, শেক্সপীয়ার, হো চি মিন), ত্রিকোণ (যুব শিল্পী, ১৯৬৪), চতুষ্কোণ (Orchid, ১৯৬৮), Block Stamp (৫ম বেখটিক সম্মেলন সপ্তাহ, ১৯৬২) এবং জোড়া বা Senent Stamp

(মহাকাশ ও যানবাহন ১৯৬৩)। মূল্যমান উল্লেখ থাকত সংখ্যায় এবং লিপি জার্মান ভাষায় লেখা থাকত DDR.।

১৮৭১ সালে হাঙ্গেরীর প্রথম ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়। প্রজাতন্ত্র হাঙ্গেরী ডাকটিকিট ভাবনাকে ঘিরে রয়েছে দেশের শিক্ষা, শিল্প-বাণিজ্য, সংস্কৃতি, প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি। ব্যক্তিত্ব কার্ল মার্ক্স (১৯১৯, ১৯৫৩), ভি. আই. লেনিন (১৯৫৪), মহাত্মা গান্ধী (১৯৬৯), সেন্ট স্টিফেন, সেন্ট এলিজাবেথ, কবি পাবলো নেরুদা (১৯৭১) প্রমুখ। হাঙ্গেরী ভাষায় Mgyar Posta শব্দটি লিপিতে দেশের নাম লেখা, সংখ্যায় উল্লেখ মূল্যমান। নকসা ও সাইজে বৈচিত্র্যময় এদেশের ডাকটিকিট প্রকাশনাটি সমৃদ্ধ—প্রায় ১৯টি (বিষয়—ওলিম্পিক গেমস, মে দিবস, বিমান প্রভৃতি), তিনটি ত্রিকোণ ডাকটিকিটের চিত্রভাবনায় পাখি, ফুল, জলক্রীড়া প্রভৃতি অন্যান্য Stamp প্রকাশনার তালিকায় রয়েছে— Journal Tax Stamp (১৮৬০), সংবাদপত্র স্ট্যাম্প (১৮৭১–৭২), অফিসিয়াল স্ট্যাম্প (১৯২১–১৯২৭, ১৯৫৪), এক্সপ্রেস লেটার স্ট্যাম্প (১৯১৬, ১৯১৮–১৯), পোস্টেজ ডিউটি স্ট্যাম্প (১৯০৩, ১৯১৫, ১৯১৯, ১৯২১, ১৯২৬–২৭, ১৯৩১, ১৯৩৪, ১৯৪১, ১৯৪৫–৪৬, ১৯৫৩, ১৯৫৮) এবং সেভিং ব্যাঙ্ক স্ট্যাম্প (১৯১৬)।

দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র হল রুমানিয়া। প্রথমে নাম ছিল Union of Moldavia এবং Wallachec Moldavia ১৮৫৪ ও ১৮৬২ সালে পর্যায়ক্রমে তিনটি ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়েছিল। সাইজে ছিল একটি গোলাকার ও অক্ষর দুটি চৌকো। চিত্রায়ণে গরুর মস্তক। রুমানিয়ার ১৮৬৫ সালে প্রকাশিত প্রথম ডাকটিকিটের চিত্রায়ণে Prince Guza, প্রিনস চার্লস ডাকটিকিটে ১৮৬৬, ১৮৬৮ সালে চিত্রিত হয়। প্রজাতন্ত্রী রুমানিয়ার ডাকটিকিটের প্রকাশ বন্যায় প্লাবিত হয়েছে সমাজীকরণের ভাবনায়। ভি.আই. লেনিন, কার্ল মার্ক্স, রাজা চার্লস ডাকটিকিটে একাধিকবার স্থান পেয়েছে। সাইজের বৈচিত্র্যে দুটি ত্রিকোণ (প্রথম– রুমানিয়া দিবস, ১৯৪৫), প্রায় ৭টি চতুষ্কোণ ডাকটিকিট (প্রথম– ১৯৬০ সালে প্রজাপতি, অন্যান্য বিষয় ভাবনায় পাখি, যুব উৎসব, মহাকাশযান, ওলিম্পিক গেমস) এবং ৩টি জোড়া ডাকটিকিটে সমৃদ্ধ, বিমান (১৯৬০, ১৯৬২), শিকারী কুকুর Daschshund (১৯৬৫)।

লিপির লেখা Domania Postage। ডাকটিকিট ব্যতীত প্রচলিত ছিল যথাক্রমে—পার্শেল পোস্টেজ স্ট্যাম্প (১৮৯৫, ১৯২৮), ওভারপ্রিন্ট স্ট্যাম্প (১৯৩০), অফিসিয়াল স্ট্যাম্প (১৯২৯, ১৯৩০–৩১), Postage Due Stamp (১৮৮১, ১৮৮৭, ১৯১১, ১৯১৫, ১৯১৭–১৮, ১৯২২, ১৯৩০–৩১, ১৯৪৭, ১৯৫০, ১৯৫২, ১৯৫৭)।

১৮৯৬ ও ১৯১৯ সালে তুরস্কে রুমানিয়ার ডাকঘর কাজ করেছিল।

চীন—এর ডাকটিকিটের যুগটি দুটি ভাগে বিভক্ত করা যায়—

(১) **ব্রিটিশ সম্রাটের শাসনাধীন যুগ (১৮৭৪–১৯৪৮)**—এই যুগে ১৮৭৮ সালে ৩টি রঙের তিনটি প্রথম ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তীকালের ডাকটিকিট প্রকাশনার সময় ছিল ১৮৮৫, ১৮৯৪, ১৮৯৭–৯৮, ১৯০৯, ১৯১২–১৩।

এই যুগের ডাকটিকিট প্রকাশনায় প্রাণীসম্পদ, ড্রাগন, চীনা সংস্কৃতি ও ডাক সেবা, সম্রাট Hsan Tung রাজত্বের প্রথম বর্ষ (১৯০৯), শিল্প, মানচিত্র, শরনার্থী, জেনারেলTengkeng ও ChaingKaiShek, মারশাল Changtsolin প্রভৃতি বিষয় ও ব্যক্তিত্ব ভাবনায় ছাপ পরিস্ফুটিত হয়েছে।

(২) **গণপ্রজাতন্ত্রী যুগ (১৯৪৯ থেকে)**—সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর ডাকটিকিটের চিত্রায়ণে ঘটেছে ডাঃ সান ইয়েত সান (১৯৪৯), ডাককর্মী, জন-পরিবহন, সমাজের শ্রমজীবী মানুষ—শ্রমিক, কৃষক, সৈন্য, প্রাচীন নিদর্শন, জাতীয় পতাকা, সংবিধান ও স্বাধীনতা (১৯৪৯), প্রাণীসম্পদ প্রভৃতি বিষয়।

ব্যক্তিত্ব ডাকটিকিট প্রকাশনার ডালিতে স্থান পেয়েছেন সর্বহারা নেতা মাও সে তুং (একাধিকবার), কার্ল মার্ক্স (১৯৫৩, ১৯৫৮), ডাঃ সান ইয়েত সান (১৯৫৬), ডঃ কোটনিস, যোশেফ স্ট্যালিন, লেনিন (২ বার), ফেডরিক এঙ্গেলস প্রমুখেরা।

মাও সে তুং তাঁর জীবিতকালেই ডাকটিকিটে শুধু স্থান পাননি, কখনো একক ভাবে কখনো যুগ্মভাবে—লেনিন, কার্ল মার্ক্স-র সঙ্গে ডাকটিকিটের চিত্রায়ণে এসেছেন।

১৯৫১ সালে প্রকাশিত প্রথম ত্রিকোণ ডাকটিকিটের চিত্র ভাবনাটি ছিল Dove কেন্দ্রিক। সাইজ, মুদ্রণ ও রঙ, বিষয় ভাবনায় ডাকটিকিট প্রকাশ চীনা ডাক কর্তৃপক্ষের সুসংহত প্রকল্পটি গ্রহণ করেছেন। প্রকল্পটি লিপি বা দেশের নাম দ্বিভাষায় লেখা—চীনা ও ইংরাজী। এরই সঙ্গে প্রচলিত ছিল মিলিটারী স্ট্যাম্প। চীন অধিকৃত অঞ্চলগুলিতে সময়ভিত্তিক চীনা ডাকটিকিটে ব্যবহৃত হয়েছে—পূর্ব ও দক্ষিণ চীন, ব্রিটিশ ডাকঘর, CEE, Formosa, উত্তরপূর্ব, Szechwzan, Yunsam, Siniang, Firin ও Heilungglang, Ne Province, PortArthia ও Pairen.।

বুলগেরিয়া দেশটির ডাকটিকিট প্রকাশের ধারাটি দুটি যুগে বিভক্ত—

(১) **প্রাক্ সমাজতান্ত্রিক যুগ (১৮৭৯–১৯৪৫)**—যুগের প্রকাশিত ডাকটিকিটের চিত্রায়ণে এসেছে সংসদ ভবন, রাজা তৃতীয় Baris, J. D. Bourchir, রাজা দ্বিতীয় Simeon, কবি Boteviv (২ বার)।

(২) সমাজতান্ত্রিক যুগটি শুরু হয় ১৯৪৬ সালে। এর প্রথম প্রকাশিত ডাকটিকিট হল রেডক্রশ স্মরণে, প্রকাশকাল ১৯৪৬। ডাকটিকিট প্রকাশধারাটি দুটি আঙিনায় সমৃদ্ধ— একটি হল বিষয়মুখী— যাতে হেন বিষয় নেই যে ডাকটিকিটে প্রকাশিত হয়নি, এখানে মূলত বিপ্লব, শ্রমজীবী মানুষ, দেশের সম্পদ ও সংস্কৃতি চিত্রিত হয়েছে।

অন্যধারা ব্যক্তিত্ব ডাকটিকিট। এখানে মূলত সমাজতন্ত্রের পথিকৃত ও রূপকাররা ডাকটিকিটের চিত্রায়ণে একাধিকবার এসেছেন, এঁরা হলেন—G. Dimitrov (দুবার), ভি.আই.লেনিন (৬ বার—১৯৫৭, ১৯৬০, ১৯৭০, ১৯৬২, ১৯৫৪, ১৯৫৮, ১৯৭৪), যোশেফ স্ট্যালিন (৩ বার— ১৯৫০, ১৯৫৩—৫৪), কার্ল মার্ক্স (১৯৫৮, ১৯৫৩, ১৯৬৮), লেখক P. Slavıkov, A Stambolan, Chrıstismircnsky, Vaplsrov, Christobotev, দেশপ্রেমিকেরা যথাক্রমে G. Kipkov, N. Naptsarov, V. Levski (দুবার- ১৯৫৩, ১৯৫৭), G. Rakavsaki প্রমুখেরা।

প্রথম ও দ্বিতীয় চতুষ্কোণ ডাকটিকিট হল যথাক্রমে Lovski Physical Association এবং Flight of Voskhod 1.

ডাকটিকিট ছাড়া সরকারী কাজে ব্যবহারের জন্য অফিসিয়াল স্ট্যাম্প (১৯৪২, ১৯৪৪—৪৫, ১৮৮৪, ১৮৮৬, ১৮৯৩, ১৮৯৬, ১৯০১, ১৯১৫—১৬, ১৯৩২) প্রচলিত ছিল।

বুলগেরিযা কর্তৃক অধিকৃত রুমানিয়াব ব্যবহৃত হয়েছিল বুলগেরিয়ার ডাকটিকিট।১৮৬০ সালে পোল্যাণ্ডের প্রথম ডাকটিকিট প্রকাশিত হলেও, পরবর্তীকালে ডাকটিকিট প্রকাশ ছিল আনিয়মিত। ১৯১৮ সালে পোল্যাণ্ড স্বাধীন প্রজাতন্ত্র লাভ করে ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে (১৯৩৯—১৯৪৫) জার্মানী দখল করেছিল। তখন জার্মানীর অধিশ্বর ছিলেন হিটলার।

১৯৪৫ সালে পোল্যাণ্ড হৃত স্বাধীনতা ফিরে পায়। ১৯১৮—১৯৪৫ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত ডাকটিকিট ছিল স্বাধীনতা, টাউন হল, কৃষি, শিল্প, খনিজ সম্পদ, শান্তির আহ্বান, জনমান, ভিয়েতনামের ঘটনা, প্রধানমন্ত্রী Paderewski, Dr. Karlkaez Kowski, কবি J. Slowaeki, রাষ্ট্রপতি Mascicki প্রমুখ।

১৯৩৯—১৯৪৫ পর্যন্ত জার্মানী শাসনাধীন পোল্যাণ্ডের ডাকটিকিট শুধুমাত্র চিত্রিত ছিল জার্মান শাসক হিটলার। ১৯৪৫ সালের পর প্রকাশিত ডাকটিকিটগুলি ছিল জন ভাবনায় আঙিকের পাশাপাশি বিজ্ঞানী মাদাম কুরী, পুসকিন্, যোশেফ স্ট্যালিন, ভি.আই.লেনিন, ভিক্টোর হুগো, N. U. Goyal, লিওনার্দো দ্য ভিনচি, শিল্পী Swyspiawski প্রমুখ ব্যক্তিরা ডাকটিকিটে স্থান পেয়েছে। লিপির ভাষা হল পোলিশ, লেখা থাকে—Polka.।

১৯৫৪ সালে প্রকাশিত প্রথম ত্রিকোণ ডাকটিকিটের চিত্রে ছিল—Amaw itephalloides। ডাকটিকিটের সহযোগী হিসাবে প্রচলিত ছিল সংবাদপত্র স্ট্যাম্প (১৯১৯), সরকারী কাজে ব্যবহৃত স্ট্যাম্প (১৯১৯, ১৯০৩, ১৯৪০, ১৯৮:. ১৯৪৫, ১৯৫৪), পোস্টেজে ডিউ স্ট্যাম্প (১৯১১, ১৯২০–২১, ১৯২৯, ১৯৩৪, ১৯৩৯–৪০, ১৯৪৬, ১৯৫০–৫১, ১৯৫৩)। ১৯১৯ সালে তুরস্কে এবং Daw.ig ১৯২৫–২৬, ১৯২৯, ১৯৩৪, ১৯৩৯ সালগুলিতে পোলিশ ডাকঘর ছিল। সাইজের বৈচিত্র্যময়তা ছিল লম্বালম্বি সাইজের ডাকটিকিট।

মূল্যায়ন ঃ

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির ডাকটিকিটগুলির মূল্যায়নে লক্ষণীয় যে জনগণের আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন, লিপিতে ইংরেজী বা দেশীয় ভাষার ব্যবহার। সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের রূপকার, পথিকৃত ও ভাবনাকার ভি. আই. লেনিন, কার্ল মার্ক্স, ফেডরিক এঙ্গেলস, মাও সে তুং, হো চি মিন প্রমুখেরা একাধিকবার ডাকটিকিটে স্থান পেযেছে, বিদেশী ব্যক্তিত্বরাও ডাকটিকিটে স্থানলাভ। জাতীয় ও আন্তর্জাতিকতার প্রতিফলন করে সূক্ষ্মভাবে সমাজতন্ত্রবাদের প্রচারের প্রচেষ্টায় রত সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির ডাক বিভাগ, ডাকটিকিট প্রকাশ ধারায় মূলত দুটি ভাগ—বিষয়বস্তু ও ব্যক্তিত্ব ডাকটিকিট, ডাকটিকিটের সাইজ—লম্বালম্বি, ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ, Horizental, Vertical, রঙের বৈচিত্র্যতা, শ্রমজীবী মানুষ ও দেশের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, সম্পদকে ডাকটিকিটে নিযে আসা হয়েছে, সমগ্র ডাকটিকিট প্রকাশনায রাষ্ট্রীয চরিত্রটি সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব ও প্রযোগে সামঞ্জস্যহীন হয়ে পড়েনি।

ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির ডাকটিকিট প্রকাশের তুলনামূলক আলোচনায লক্ষণীয় যে দুটি উদ্দেশ্য ভিন্নমুখী—সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি জনগণের প্রতি মর্যাদাশীল, অপরদিকে ধনতান্ত্রিক ও আধা ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে জনগণ সমাদৃত নয, ডাকটিকিটের চিত্রায়ণে আনা হয়েছে ব্যক্তির মুখমণ্ডল ও ভঙ্গিমাকে, প্রাকৃতিক সম্পদ, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন।

প্রতিনিয়তই ব্যবহৃত ডাকটিকিট ও ডাক সামগ্রীকে প্রচার মাধ্যমে নীতি ও আদর্শ প্রচারের সূক্ষ্ম হাতিয়ার হিসাবে রাষ্ট্রীয শাসকেরা নিজ স্বার্থে ব্যবহার করে থাকেন।

১৯১৭-র রুশ বিপ্লবের প্রভাব ডাকটিকিটে ও প্রভাবিত করেছিল। এসময় পর থেকেই সমাজতন্ত্র দেশসহ পৃথিবীর দেশগুলির ডাকটিকিট প্রকাশনায় বিষয়ভাবনার পরিবর্তন এল—রাজা বা রাণীর মুখশ্রীর বদলে বিভিন্ন বিষয়—প্রাকৃতিক, জনগণ, শিক্ষা প্রভৃতি ডাকটিকিটে স্থান পেতে ক্রমশ শুরু করে।

ডাকটিকিট ক্ষুদ্র হলেও, ফল সুদূর প্রসারী, অবহেলার বস্তু নয়—অনেক সময়ে বড়র দাবীও দাবিয়ে দেয়। তাই ডাকটিকিট প্রকাশ ধারায় পরিস্ফুটিত হয়ে থাকে রাষ্ট্রীয় শাসক শ্রেণীর সুরের বীনাবাদন।

চীন বিপ্লব (১৯২৫—২৭), কমিন্টার্ণ ও মানবেন্দ্রনাথ রায়

গৌতম চট্টোপাধ্যায়

চীনের জাতীয়তাবাদী বিপ্লবের নেতা ডঃ সান ইয়াৎ সেন ১৯২১-এ তাঁর কুয়োমিনতাং দলের কর্মসূচী "জনগণের ৩ নীতি"র নতুন ব্যাখ্যা দিলেন। জাতীয়তাবাদ নীতিটির অর্থ করা হল সুদৃঢ় সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা, গণতন্ত্রের অর্থ করা হল শ্রমিক কৃষকসহ সর্বসাধারণের অধিকার আর জনগণের জীবিকার অর্থ করা হল সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। ডঃ সান সোচ্চার অভিনন্দন জানালেন রুশ বিপ্লব ও সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রকে। ১৯২১-এর আগষ্ট মাসে, সোভিয়েত পররাষ্ট্র সচিব চিচেরিণকে একটি চিঠিতে সান ইয়াৎ সেন লিখলেন : "আমি আপনার ও মস্কোর অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন করতে চাই। সোভিয়েত গণতন্ত্র, লাল ফৌজ ও আপনাদের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে আমি গভীরভাবে জানতে চাই।" (কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের মহাফেজখানাতে রক্ষিত দলিল)।

১৯২১-এ জন্মগ্রহণ করেছে চীনা কমিউনিস্ট পার্টিও। তারা তখনও স্থির করতে পারেনি যে সান ইয়াৎ সেন ও জাতীয়তাবাদী কুয়োমিনতাং দলের সঙ্গে পার্টির সম্পর্ক কি হবে। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসে (১৯২০) প্রবল তর্ক-বিতর্কের পর ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে কমিউনিস্টদের রণনীতি সংক্রান্ত লেনিনের প্রস্তাবটিই গৃহীত হয়। কিন্তু কিছুটা ভিন্নতর মতের প্রবক্তা ভারতীয় বিপ্লবী মানবেন্দ্রনাথ রায়ের প্রস্তাবও, একটু রদবদল করে সংযোজনী প্রস্তাব হিসাবে গৃহীত হয়। লেনিন জোর দেন এই সব দেশে জাতীয় বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে পরিচালিত জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের সঙ্গে সদ্যোজাত কমিউনিস্ট পার্টিদের সহযোগিতা করার উপর। এম.এন.রায় জোর দেন শ্রমিক ও কৃষকদের বিপ্লবী আন্দোলন ও সংগঠন গড়ার উপর। এই প্রেক্ষাপটেই গড়ে ওঠে সান ইয়াৎ সেন ও কুয়োমিনতাং দলের সঙ্গে চীনা কমিউনিস্টদের ও কুয়োমিনতাং-এর সম্পর্ক। ১৯২১-এর সেপ্টেম্বর মাসে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির পরামর্শদাতা হিসাবে চীনদেশে আসেন কমিন্টার্ণের প্রতিনিধি, ওলন্দাজ কমিউনিস্ট নেতা স্নিভ্‌লিয়েট্, যিনি মেয়ারিং নামেও পরিচিত ছিলেন। তাঁর সঙ্গে দেখা হয় সান ইয়াৎ সেনের। উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়, কিন্তু কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি।

১৯২২-এর ১৪ আগস্ট কুয়োমিনতাং নেতারা সাক্ষাৎ করেন সোভিয়েত নেতা জফ্রের সঙ্গে। উভয় নেতাই উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এই ঘোষণাপত্রে বলা হয় যে সোভিয়েত ইউনিয়ন চীনের জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠায় কুয়োমিনতাং দলের কর্মসূচীকে পরিপূর্ণ সমর্থন জানাবে, কুয়োমিনতাং-কমিউনিস্ট যুক্ত মোর্চা গঠিত হবে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সহাযতায় প্রতিষ্ঠিত হবে একটি চীনা মিলিটারি আকাদেমি। হোয়াম্পোতে মিলিটারি আকাদেমি প্রতিষ্ঠা হয়, সোভিয়েত সেনাপতি ব্লুচারের নেতৃত্বে। কুয়োমিনতাং দল মুখ্য সেনাপতি হিসাবে পাঠায় তাদের তরুণ সেনানী চিয়াং কাই শেককে। আর চীনের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি থাকেন ঐ আকাদেমিতে তরুণ কমিউনিস্ট নেতা চৌ এন লাই।

১৯২৩-র ১২ই জানুয়ারি মস্কোতে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কার্যকরী সমিতি এক প্রস্তাব গ্রহণ করে বলেন যে, কুয়োমিনতাং একটি জাতীয় বিপ্লবী মোর্চা, যার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা করা উচিত চীনা কমিউনিস্টদের (কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের মহাফেজখানায় রক্ষিত দলিল)। এর কয়েক মাসের মধ্যে অনুষ্ঠিত হল চীনা কমিউনিস্ট পার্টির তৃতীয় কংগ্রেস। সেখানে গৃহীত মূল প্রস্তাবে বলা হল :

"চীনে শ্রমিক শ্রেণী এখনও একটা পরাক্রান্ত শক্তি নয়। ফলে একটি শক্তিশালী, গণভিত্তিক কমিউনিস্ট পার্টি গড়াও সহজ হচ্ছে না—যে পার্টি দ্রুত অগ্রসরমান চীন বিপ্লবের চালিকা শক্তি হতে পারে। ফলে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও কমিণ্টার্ণের কার্যকরী সমিতি যৌথভাবে সিদ্ধান্ত করেছে যে চীন বিপ্লবকে সফল করার জন্য চীনা কমিউনিস্ট পার্টি কুয়োমিনতাং দলের সঙ্গে পরিপূর্ণ সহযোগিতা করবে ও কুয়োমিনতাং দলে যোগ দেবে। তবে কুয়োমিনতাং দলে যোগ দিলেও কমিউনিস্ট পার্টি তার নিজস্ব সাংগঠনিক স্বাতন্ত্র্যকে বজায় রাখবে" (উইলবার অ্যাণ্ড হাউ : ডকুমেন্টস অন কমিউনিজম, ন্যাশনালিজম্ অ্যাণ্ড সোভিয়েত অ্যাডভাইজারস ইন চায়না (১৯১৮—২৭), কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫৬, পৃঃ৮৫)।

১৯২৩-এর ফেব্রুয়ারি মাসে সান ইয়াৎ সেন ক্যান্টন শহরে নিজের ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন এবং মস্কোতে তার পাঠালেন একজন উচ্চপদস্থ সোভিয়েত পরামর্শদাতাকে পাঠাবার অনুরোধ করে। ১৯২৩-এর ৬ অক্টোবর মাইকেল বোরোদিন, লেনিনের দূত হিসাবে ক্যান্টনে এসে হাজির হলেন এবং সান ইয়াৎ সেন তাঁকে কুয়োমিনতাং দলের বিশেষ পরামর্শদাতা পদে নিয়োগ করলেন।

১৯২৪-এর জানুয়ারী মাসে কুয়োমিনতাং দলের প্রথম মহাসম্মেলন হল—সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা, শ্রমিক-কৃষকদের অধিকার স্বীকৃতি ও সমাজতন্ত্রের

আদর্শকে মেনে নিযে। কুয়োমিনতাং দলেব সংবিধানটি রচনা কবলেন সান ইয়াৎ সেন ও বোরোদিন যুক্তভাবে। নবরূপে পুনর্গঠিত কুয়োমিনতাং দলের কেন্দ্রীয় কমিটি ২৪ জন সদস্যর মধ্যে ৩ জন ছিলেন চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নেতা (ব্র্যাণ্ডম্, সোয়ার্টের্জ ও ফেফারব্যাঙ্ক : ডকুমেন্টস অন দি হিস্ট্রি অব চাইনিজ কমিউনিজম, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫২)।

বোরোদিন ও সেনাপতি ব্লুচারের তত্ত্বাবধানে ১৯২৪-এর মে মাসে গড়ে উঠল হোয়াম্পোযা মিলিটাবি আকাদেমি। তার প্রধান সামরিক কর্তা হলেন চিযাং কাই শেক এবং আকাদেমির রাজনৈতিক প্রচার বিভাগের প্রধান হলেন চীনা কমিউনিস্ট নেতা চৌ এন লাই। তরুণ কমিউনিস্টরা বন্দব, রেল ও খনি শ্রমিকদের মধ্যে দ্রুত সংগঠন গড়ে প্রভাব বিস্তার করতে থাকল। তরুণ মাও জে ডং কৃষি বিপ্লবের প্রচার চালাতে থাকলেন হুনান প্রদেশে।

১৯২৪-এর সেপ্টেম্বর মাসে সান ইয়াৎ সেন তাঁর প্রসিদ্ধ উত্তব চীন অভিযান শুরু করলেন এবং সমগ্র চীন তাঁকে সক্রিয সমর্থন জানাল। চীনের রাজধানী বেইজিং-এ বিজযীর মত তিনি প্রবেশ করলেন, কিন্তু চীনের দুর্ভাগ্য ১৯২৫-এর ১২ মার্চ সান ইয়াৎ সেন বেইজিং-এ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন।

মারা যাবার আগে তিনি রচনা করে গেলেন তাঁর প্রসিদ্ধ ইচ্ছাপত্র, যাতে তিনি দেশবাসী ও পৃথিবীকে সম্বোধন করে লিখলেন : "আমি রেখে যাচ্ছি আমার দল কুযোমিনতাংকে, যাদের উচিত সোভিয়েত রাশিযার নেতৃত্বর সঙ্গে হাত মিলিয়ে সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে শুধু চীনদেশ নয, সারা পৃথিবীকে মুক্ত করা। আমি এই পথেই, সোভিয়েতের সঙ্গে হাত মিলিযে, চীন বিপ্লবকে পরিচালনা করার নির্দেশ আমার পার্টিকে দিয়ে যাচ্ছি....." (টি. সি. উ, কুয়োমিনতাং অ্যাণ্ড দি ফিউচার অব দি চাইনিজ রেভল্যুসন, অ্যালেন অ্যাণ্ড আনউইন, লণ্ডন, ১৯২৮, পৃঃ ২৫৩)।

দুর্ভাগ্যক্রমে চিয়াং কাই শেক এই ইচ্ছাপত্রের নির্দেশ মত চল্লেন না, হাত মেলালেন দক্ষিণপন্থী সমরনায়ক ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তিদের সঙ্গে। কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে সমবেত হতে লাগল দক্ষিণপন্থী শক্তিরা, ফলে শহবগুলিতে তুলনামলকভাবে ছোট শ্রমিক শ্রেণী কোণঠাসা হয়ে পড়তে লাগল।

অথচ এই সময়ে একটা নতুন শক্তি মাথা তুলতে লাগল, যা সম্পূর্ণভাবেই কমিউনিস্টদের পক্ষে ছিল—তা হচ্ছে চীনের বিশাল গ্রামাঞ্চলের বিপ্লবী কৃষকসমাজ। ১৯২৭-এর বসন্তকালে, প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা ৎসাই হো সিয়েনের হিসাব অনুযায়ী কিয়াং সি, কোয়ানটুং, হুপে, হুনান ও আরও কয়েকটি প্রদেশ জুড়ে প্রায় দু কোটি কৃষকের গণবিদ্রোহ দেখা দিল : লাঙ্গল যার জমি তার, কৃষি বিপ্লবের এই দৃপ্ত রণধ্বনি নিয়ে। কৃষক সমাজের এই বিপ্লবী গণ উত্থানের

দৃঢ় নেতৃত্ব যদি তখন চীনা কমিউনিস্টরা দিতেন, তাহলে চীনে কুয়েমিনতাং-এর দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বের প্রতিবিপ্লবী চক্রান্ত ও সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র হয়তো ব্যর্থ হয়ে যেত। কিন্তু কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের তৎকালীন নেতৃত্ব, বিশেষত যোশেফ স্তালিন ও তাঁর প্রেরিত দূত মাইকেল বোরোদিন মনে করেছিলেন যে, চীন বিপ্লবকে রক্ষা করার এখন একমাত্র পথ হচ্ছে যে কোনও মূল্যে কুয়োমিনতাং ও কমিউনিস্টদের যুক্তফ্রন্ট রক্ষা করা। কমিন্টার্ণের ভূমিকাকে জোরদার করার জন্য ১৯২৭-এর এপ্রিল মাসে স্তালিন চীনদেশে পাঠালেন কমিউন্টার্ণের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ভারতীয় বিপ্লবী মানবেন্দ্রনাথ রায়কে।

১৯২৭-এর ২৭ এপ্রিল হ্যাঙ্কাউতে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির ঐতিহাসিক পঞ্চম কংগ্রেস শুরু হল। চীনা কমিউনিস্ট পার্টিতে দুটি স্পষ্ট বিরোধী মত দেখা দিল। চেন তু শিউ-র নেতৃত্বে পার্টির সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ স্তালিন ও বোরোদিনের পরামর্শ মেনে যে কোনও মূল্যে কুযোমিনতাং কমিউনিস্ট যুক্তফ্রন্ট টিকিয়ে রাখার পক্ষে ছিলেন। তার জন্য সশস্ত্র বিপ্লবী কৃষকরা যখন একাধিক শহর ঘেরাও করল, তখন তাদের নিরস্ত করলেন কমিউনিস্ট নেতারা। নিরাশ হয়ে বিপ্লবী কৃষকরা গ্রামে ফিরে গেলেন—নির্বীর্য হয়ে পরাজিত হল চীন বিপ্লব (রবার্ট নর্থ, চাইনিজ কমিউনিজম, পৃঃ৮৭)।

মানবেন্দ্রনাথ রায যদিও স্তালিনের মতের সমর্থক হিসাবেই চীনে এসেছিলেন, তথাপি চীনের বিপুল কৃষক জাগরণ ও শ্রমিকশ্রেণীর সংখ্যাগত দুর্বলতা দেখে, বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তিনি মত পরিবর্তন করলেন। ১৯২৭-এর ৪মে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি পঞ্চম কংগ্রেসে এক তাৎপর্যপূর্ণ বক্তৃতায় রায় বল্লেন :

"চীনা বিপ্লবের সামনে আজ ২টি দৃষ্টিভঙ্গী রয়েছে— একটি হচ্ছে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক পথে বিকাশের রাস্তা— এই দৃষ্টিভঙ্গী অনুসরণ করলে চীনা বিপ্লব এখন পরাজিত হবে, কারণ চীনের জাতীয় বুর্জোয়া নেতৃত্বও এখন চীনা বিপ্লবের পরাজয়ের জন্য সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ চাইছে। অন্য দৃষ্টিভঙ্গীটি হচ্ছে অ-ধনবাদী পথে বিকাশের রাস্তা। চীনে যে ধরনের বিপ্লব বিকশিত হতে চলেছে, তা মানুষের ইতিহাসে অভূতপূর্ব। নতুন ধরনের বিপ্লব, ফলে তা জন্ম দেবে নতুন ধরনের রাষ্ট্র—একটি বিপ্লবী পাতি বুর্জোয়া রাষ্ট্র। এটা বিপ্লবী রাষ্ট্রই হবে, কারণ এর চরিত্র হবে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী কমিউনিস্ট পার্টি জাতীয় বিপ্লবী সরকারে যোগ দেবে, কারণ সরকার হবে বিপ্লবী রাষ্ট্রের।

এই মুহূর্তের সবচেয়ে বড় কাজ হচ্ছে কৃষি বিপ্লবকে উৎসাহ দান করা, গ্রামের কৃষককে উৎসাহ দান করা, গ্রামের কৃষক ও শহরের পাতি-বুর্জোয়া শক্তিদের সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীর মৈত্রী রচনা করা—গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করা এইভাবেই অ-ধনবাদী বিকাশের পথ ধরে চীনা বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে

যেতে হবে এবং জাতীয় বিপ্লবকে রূপান্তরিত করতে হবে সমাজতন্ত্রের সপক্ষে সংগ্রামে।" (নর্থ: এম. এন. রয়েজ মিশন টু চায়না, বার্কলি, ইউ.এস.এ., ১৯৬৩)।

খেয়াল রাখা দরকার যে এম. এন. রায় এই বক্তৃতাটি দেন ১৯২৭-এ, মাও জে ডং তাঁর প্রসিদ্ধ প্রামাণ্য গ্রন্থ "নিউ ডিমোক্রেসি" রচনা করার এক দশক আগে এবং ৮১টি কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক ১৯৬০-এ রচিত অ-ধনবাদী বিকাশের পথের রাজনীতির দলিল বচনার তিন যুগ আগে। রায় তাঁর বক্তৃতাতে সচেতন ছিলেন যে ইতিহাসে চীনা বিপ্লব সম্পূর্ণ নতুন ধবনের এবং তাব সমাধানও সৃজনশীল মার্কসবাদ হতে বাধ্য। চীনা পার্টির সংখ্যাগরিষ্ঠ ১৯২৭ এ তা মানতে পারেননি, গ্রহণ করতে পারেননি স্তালিন-নেতৃত্বে পরিচালিত কমিন্টার্ণের তদানীন্তন নেতৃত্ব। ফলে ভ্রান্ত রণনীতির চোরাগলিতে।

সাংহাইতে লক্ষাধিক বিপ্লবী শ্রমিককে হত্যা করল চিয়াং কাইশেক ও সাম্রাজ্যবাদীদের সশস্ত্র "মৃত্যু স্কোযাড"বা। তাব অসামান্য বর্ণনা রয়েছে ফরাসী লেখক আন্দ্রে মালরুর উপন্যাস "স্টর্ম ইন সাংহাই"তে। প্রথমে বোরোদিন ও পরে এম.এন.রায় বিশেষ ধরনের মোটব গাড়িতে চড়ে গোবি মরুভূমির মধ্য দিয়ে প্রবেশ করলেন সোভিয়েত ইউনিযনে।

পরে রায বিশদ গ্রন্থ লিখে রেখে গেছেন তাঁর অভিজ্ঞতা নিযে "রেভল্যুশন অ্যাণ্ড কাউন্টার-রেভল্যুশন ইন চায়না" কিন্তু ততদিনে তিনি কমিন্টার্ণ থেকে বহিষ্কৃত "রেনিগেড"। ফলে চীনা কমউনিস্ট পার্টির পঞ্চম কংগ্রেস ইতিহাসের এক [illegible]ক সন্ধিক্ষণে, তাঁর সঠিক বিপ্লবী পরামর্শর কোনও যথার্থ মূল্যায়ন অদ্যাব[illegible] হযনি। মাও জে ডং-এর অন্ধ সমর্থকরা, মাও-এর সমালোচনা "রায় শুধু বক্তৃ[illegible] করতে পারতেন" (এডগার স্নোর সঙ্গে মাও-এব সাক্ষাৎকার, ১৯৪০, "রেড স্টার ওভার চায়না"),—এটাই প্রামাণ্য বলে মেনে আসছেন। কিন্তু ইতিহাসের অকাট্য দলিলপত্র অন্য সাক্ষ্য দেয়। সেই মূল্যায়নেরই সামান্য প্রচেষ্টা এই প্রবন্ধে করা হল।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে ধর্ম

স্নেহাশিস ঘোষ

১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে পৃথিবীর মানচিত্রে উদ্ভাসিত হয়। প্রথম রাষ্ট্রনায়ক শেখ মুজিবর রহমান অতীত ইতিহাসের শিক্ষা থেকেই এক নতুন আদর্শ ঘোষণার মধ্য দিয়ে দেশকে অগ্রণী হবার সদিচ্ছা প্রকাশ করেন যেখানে ধর্ম-নিরপেক্ষতা প্রধান মন্ত্র হিসাবে উচ্চারিত হয়। অবশ্য সংবিধানে কেবলমাত্র ধর্ম-নিরপেক্ষতার কথাই বলা হয় না। রাষ্ট্রকে ধর্ম থেকে মুক্তি দিতে অন্যান্য শর্তও আরোপিত হয়। যেমন সমস্ত রকম সাম্প্রদায়িকতা নিষিদ্ধ ঘোষণা, রাষ্ট্র কর্তৃক ধর্মের রাজনৈতিক স্বীকৃতি, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মের অপব্যবহার ও ধর্মভিত্তিক কোন বৈষম্য। এছাড়া বিভিন্ন ধর্মনৈতিক দল—মুসলিম লীগ, জামাযত-ই-ইসলামী ও নেজামে ইসলাম নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছিল।[১] অবশ্য এর পশ্চাতে বাস্তবসম্মত কিছু কারণও ছিল। মুক্তিযুদ্ধের সময় জামাত ও তার সংগঠন হিসাবে আল্‌বদর ও আল-শাম্‌স যে নৃশংস ও জনবিরোধী কার্যে লিপ্ত ছিল তাতে জনমতের চাপ মুজিবকে এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করেছিল।

কিন্তু মুশকিল হল যে শেখ মুজিব এই সাংবিধানিক ব্যবস্থা বজায় রাখতে সক্ষম হননি। ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ সম্বন্ধে দুর্বলতা দেশীয় রাজনৈতিক সামাজিক—আর্থিক পরিস্থিতি ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট কিছুদিনের মধ্যেই এর ব্যর্থতা প্রমাণ করে।

বাংলাদেশের ৮৫% মানুষ ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী। তাদের কাছে ধর্ম নিরপেক্ষতার মর্মার্থ বা বাস্তব ব্যবহার কোনদিনই পরিষ্কারভাবে প্রতিভাত ছিল না। পূর্ব-পাকিস্তানের ইতিহাসে ১৯৫৪ (২১ দফা), ১৯৬৬ (৬দফা), ১৯৬৯ (১১ দফা), ১৯৭০ (সংবিধান সংশোধন) কখনই ধর্মনিরপেক্ষতার দাবি করা হয়নি। বরং ইসলামের প্রতি পূর্ণ আস্থা স্বীকার্য হয়েছিল। আওয়ামী লীগের অতীত সংগ্রাম ছিল পাকিস্তান কাঠামোর অভ্যন্তরে স্বায়ত্তশাসন আদায়। তাই ধর্মনিরপেক্ষতার সপক্ষে কোন সুস্পষ্ট বক্তব্য রাখা সম্ভব হয়নি। অবশ্য তার মানে এই নয় যে সমস্ত বাঙালীর আন্দোলন ছিল সাম্প্রদায়িক। বরং ৫২-র ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধের দশক পর্যন্ত তারা ছিল ধর্মনিরপেক্ষ চেতনাতেই আপ্লুত। কিন্তু সত্যের খাতিরে এটা বলতেই হয় যে, আইনগতভাবে এমনকি প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের প্রথম স্বাধীনতা ঘোষণাতেও ছিল না ধর্ম-নিরপেক্ষতার কোন স্থান।[২] স্বাভাবিকভাবে ধরে নেওয়া যায় যে কোন পূর্ব ধারণা বা পূর্ব-পরিকল্পনা ছাড়াই এই আদর্শ

গ্রহণ করা হয়েছিল। আওযামী লীগ বা শাসকবর্গের কেউই এ সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট ধারণা জনসমক্ষে ব্যক্ত করতে পারেননি। কাজেই ১৯৭৫ সাল ধর্ম-নিরপেক্ষতার বাস্তবায়নে এক জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। আর সেই পরিস্থিতি পূর্ণমাত্রায গ্রহণ করে ধর্ম নিরপেক্ষ বিরোধীপক্ষ খোলস ছেড়ে আত্মপ্রকাশের সুযোগ পায।

আওয়ামী লীগ সরকারের ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শের বুলি সহজভাবেই ইসলাম-পন্থী বিরোধী দলগুলিকে একজোট করতে শুরু করে। আশ্চর্য যে কেবল বিরোধিতার আদর্শে বামদলগুলিও এদের সাথে একাত্মতায় আবদ্ধ হয়। আবার এসময় মওলানা ভাসানীর জনপ্রিয়তা সেই বিরোধিতায ঘৃতাহুতি দেয়। চীনপন্থী সমাজতন্ত্র ও ইসলামী ঐতিহ্যের মিশ্রণে নতুন আদর্শের প্রচার এক শক্তিশালী বিরোধিতার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। সরকারপক্ষ ধর্মনিরপেক্ষতার প্রযোগে যতই কঠোর হতে থাকে ততই জনমানসে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়। তাই ধর্মনিপেক্ষতা ইসলামী ঐতিহ্য নয, বরং ভারত-সোভিয়েত চাপের ফসল,—এই স্লোগান জনগণের মধ্যে ব্যাপ্ত হতে থাকে। মুজিবের সময়েই ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের টানাপোড়েন ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে এক বাহ্যিক উপকরণ হিসাবে চিহ্নিত করে। অবশ্য আওয়ামী লীগ সরকারের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যর্থতা ধর্মনিরপেক্ষতার শূন্যতা বিশেষভাবে প্রমাণ করে। মুজিব ও তার পরিবারকেন্দ্রিক শাসন প্রভাব, প্রশাসনিক দুর্নীতি, ৭৪-এর দুর্ভিক্ষ-সৃষ্ট জন দুর্দশা, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, ব্ল্যাকমার্কেটিং, আইন শৃঙ্খলার চূড়ান্ত অবনতি— এসবই ধর্মনিরপেক্ষ সরকারের স্বাধীনতা কল্পিত আশায় ব্যর্থতার জল সিঞ্চন করে। উপরন্তু ৭৫-এ একদলীয় বাকশাল (Baksal—Bang, Krishak Sramik Awami Leaguc) গঠন ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা এবং রাষ্ট্রপতি শাসনের সূচনার মাধ্যমে এই সরকার জনগণের ব্যাপক অংশের কাছে গ্রহণযোগ্যতা হারায়।

এটা বিভিন্ন দেশেই লক্ষ্য করা যায় যে শাসকগোষ্ঠী তার শাসনের বৈধতা যত হারায় ততই অন্যভাবে জনমানসিকতা আদায়ে অগ্রসর হয়। এক্ষেত্রে ধর্ম খুব সহজভাবেই এসে পড়ে যদি জনগণ ধর্মপ্রাণ হয। একথা সত্য যে ইসলাম ধর্মীয় মানুষ অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায় থেকে যথেষ্টই ধর্মপ্রাণ। কাজেই মুজিব সরকার তার দুর্বলতা দূর করতে ধর্মের আশ্রয় নেয়। স্বাধীন বাংলাদেশে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার এইভাবে ধর্মনিরপেক্ষ সরকারের আমলেই শুরু হয়। মুজিব কোন দীর্ঘস্থায়ী রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা আনয়নে এর সূচনা করেননি বরং আপাত উদ্ধার-ব্যবস্থা হিসাবেই ধর্মের উপর নির্ভরশীল হন। তিনি বিভিন্ন ইসলামী কর্মকাণ্ড ও ধর্মীয় আবেদনের মাধ্যমে তার সরকারের প্রতি জনসমর্থন আদায়ে সচেষ্ট হন। অন্যদিকে বিরোধী দক্ষিণপন্থীদের এর দ্বারা আস্থা অর্জন সম্ভব হবে— এটা আশা করা হয়। ১৯৭৩-এ বিনা বিচারে একাত্তরের ঘৃণিত— অপরাধীদের

প্রতি সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন করে মুক্তি দেওয়া হয়। মুজিব তার বিভিন্ন বক্তৃতায়, সমাবেশে ধর্মীয় শব্দ ব্যবহার শুরু করেন, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে 'জয়বাংলা' শব্দ উচ্চারণ থেকেও বিরত থাকেন। বিভিন্ন ইসলামী অনুষ্ঠানে তার উপস্থিতি এ সময় লক্ষ্য করার মত। ১৯৭৫-এ রাষ্ট্রপতির এক বিশেষ আদেশ দ্বারা বাহাত্তরে বিলুপ্ত ইসলামিক একাডেমী পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। এবং এই প্রতিষ্ঠানকে ইসলামিক ফাউন্ডেশনে উন্নীত করেন।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও বিভিন্ন ইসলামী রাষ্ট্রগুলির নৈতিক ও আর্থিক সমর্থন পেতে মুজিব সরকার ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ১৯৭৪-এ পাকিস্তান রাষ্ট্রের কাছ থেকে বাংলাদেশের স্বীকৃতি লাভ, ইসলামী সম্মেলন সংস্থার সদস্যপদ প্রাপ্তি, ১৯৭৫-এ ইসলামী উন্নয়ন ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হবার গৌরব অর্জন—এসব কিছুই বাংলাদেশকে ইসলামী বিশ্বের কাছাকাছি নিয়ে আসে। মুজিবের ধারণা হয় এভাবেই দক্ষিণপন্থী তথা ধর্মপ্রাণ বাঙালী মুসলিমের আস্থা অর্জন সম্ভব হবে। কিন্তু এটা যে ভ্রান্ত তা কিছুদিনের মধ্যেই বুঝতে পারা যায়।

সত্যের খাতিরে তাই স্বীকার করতে হয় যে বাংলাদেশ ১৯৭২–৭৫ এ ছিল এক অদ্ভুত স্ববিরোধী রাষ্ট্র— একদিকে সাংবিধানিক ঘোষণার আদর্শে বাংলাদেশ ছিল ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। কিন্তু অন্যদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্মকে পৃষ্ঠপোষকতা দান ছিল প্রশাসনের নীতি ও কর্মকাণ্ডে বিশেষভাবে প্রকট। তাই বাংলাদেশ প্রথম পর্যায়ে ধর্মীয় রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে না উঠলেও, ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারের সূচনা করে।

১৯৭৫-এ শেখ মুজিবের হত্যা ও বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থিরতার আগমন। শাসক হিসাবে পরবর্ত্তীকালে যারই আবির্ভাব তার শাসনের বৈধতা যত কম, ইসলামী নির্ভরতা তত বেশী।—এটা সুস্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। খন্দকার মোশতাক আহমেদ 'সর্ব শক্তিমান আল্লাহর রহমতে' ও 'জনগণের ইচ্ছায়' ক্ষমতা দখলের কথা ঘোষণা করেন। তাঁর দল 'ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ' একটি ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল হিসাবেই আত্মপ্রকাশ করে। সংবিধান ও শিক্ষা ব্যবস্থাকে ইসলামিক রূপদান করা তার শাসনের লক্ষ্য বলে বিবেচিত হয়। সৌভাগ্য যে— আকস্মিক মুশতাকের ক্ষমতা থেকে অপসারণ— তাঁর এই সাধ অপূর্ণ রাখে।

জিয়াউর রহমান বাংলাদেশে ইসলামীকরণ শুরু করেন অত্যন্ত সন্তর্পণে। সংবিধান সংশোধন ও সংযোজনের পদক্ষেপ প্রথমেই গ্রহণ করা হয়। সংবিধান থেকে এই প্রথম ধর্মনিরপেক্ষতা কথাটি বিলুপ্ত হয় এবং সেই স্থানে— "Absolute trust and faith in Almighty Allah shall be the basis of all actions," কথাটি লিপিবদ্ধ হয়। সংবিধানের প্রস্তাবনার শুরু হয় এইভাবে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম'।[৩] শুধু তাই নয়, 'জয়বাংলা' ও 'বাংলাদেশ বেতার'-এর পরিবর্তে 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ' ও 'রেডিও বাংলাদেশ', এমনকি 'বাঙালী মুসলিম' এই

পরিচয় মুছতে 'বাংলাদেশীর' প্রচলন ঘটিয়ে ইসলামী আদর্শের প্রতিফলন বিচ্ছুরিত হয়। বলা বাহুল্য সামরিক অফিসার থেকে মুখ্য প্রশাসক, মুখ্য প্রশাসক থেকে প্রেসিডেন্ট, প্রেসিডেন্ট পদ পেয়ে তার স্থায়িত্বে জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির মাধ্যম হিসাবে জিয়া ইসলামিক আদর্শকে সুন্দরভাবে ব্যবহার করেন। কিন্তু এই জনপ্রিয়তা বৃদ্ধিই তার কাল হয়, ঈর্ষান্বিত অন্য সামরিক অফিসারদের কোপে জিয়া নৃসংশভাবে মৃত্যুমুখে ঢলে পড়েন।

প্রয়াত জিয়ার পর একপ্রকার আবদুস সাত্তারের নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করেই আর এক সামরিক অফিসার ক্ষমতা দখল করেন যার নাম হুসেইন মহম্মদ এরশাদ। বাংলাদেশে স্বাধীনতার পর থেকে এরশাদের শাসনের স্থায়িত্বই ছিল বেশী (১৯৮২—৯১), অথচ তা পুরোপুরি নির্ভরশীল ছিল ইসলামকে যথেচ্ছভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে। ১৯৮৮ খ্রীঃ সংবিধানের অষ্টম সংশোধনের মাধ্যমে ইসলামকে বাংলাদেশের 'রাষ্ট্রীয় ধর্ম' হিসাবে ঘোষণা করা হয়। তার সমর্থনে বিশ্ব জাকের মঞ্জিলের পীর হজরত মওলানা শাহ্‌সুকী ফরিদপুরী দেশবাসীর উদ্দেশ্যে ঘোষণা করেন ধর্ম বিল এদেশের নয় কোটি মুসলমানের ঈমানের বিজয়ের প্রতীক।

বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ মুসলিম। কিন্তু এটাই তাদের জাতীয় বা আন্তর্জাতিক পরিচয়ের সবটা নয়। কারণ ধর্ম অন্তরের উপলব্ধি। পরিচয়ের মাধ্যম নয়— এটা এরশাদ কিছুতেই স্বীকার করতে নারাজ। বরং বাংলাদেশবাসীকে একমাত্র মুসলিম করে তুলতেই রেডিও টেলিভিশন বা সভাসমিতির বক্তব্য 'বিসমিল্লা' দিয়ে শুরু করে 'খোদা হাফেজ' দিয়ে শেষ, শিক্ষার অপূর্ণতা পূর্ণ করতে স্কুলগুলিতে দীনিয়াত শিক্ষা প্রচলন, শত্রু সম্পত্তির নতুন নাম 'অর্পিত সম্পত্তি' দ্বারা বিধর্মীর জমি বা সম্পত্তি গ্রহণ, শুক্রবারকে সাপ্তাহিক ছুটির দিন ঘোষণা, জাকাতবোর্ড স্থাপন, মসজিদকে জল ও বিদ্যুতের মাশুল থেকে ছাড়, সর্বোপরি সহানুভূতি আদায়ে স্বয়ং মাথায় টুপি ধারণ করে পীরের দরবার বা মসজিদ গমন, জুম্মায় নামাজে শরিক হওয়া, ঘন ঘন ওমরাহ ও হজ্জ পালন, আটরশি পীরের মুরিদ হওয়া এবং সরকারী বাহন ব্যবহার করে প্রায়শ আটরশি গমন যেন অনিবার্যভাবেই বাংলাদেশের সকলে মুসলিম এটা প্রতিপন্ন করায়।

এইভাবে বাংলাদেশের জাতীয় জীবনে ইসলামের আদর্শ অদ্ভুতভাবে প্রতিভাত হয়। প্রশ্ন হতে পারে যে বাঙালী সম্প্রদায়, একসময় পাকিস্তানের ধর্মীয় খোলস ভাঙতে স্বাধীনতার যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল— তারা কি নিশ্চুপেই এই ইসলামী আদর্শ মেনে নেয়? এর উত্তরে বলা যায়—

(১) শাসকের শাসনের বৈধতা যত কম হয়, জাতীয় জীবনের বিভিন্ন সূত্রে সে তত নির্ভরশীল হয়, আর ধর্ম তার মধ্যে অন্যতম। জিয়া ও এরশাদ শাসনের এটা সুস্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়।

(২) বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর পশ্চিমী শাসনের মডেল সাধারণের কাছে আকর্ষণীয় হয় না। কারণ এর সুফল হিসেবে তারা কিছুই পায়নি।
(৩) বাংলাদেশের সামাজিক জীবনে সূফী বা পীরেদের ব্যাপক প্রভাব।
(৪) এই সূত্র ধরেই জামাত-ই-ইসলামীর ইসলামিক আদর্শ প্রচার ও উল্টো স্লোগান হিসেবে 'অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, ইসলাম দেবে সমাধান'— এই ঘোষণা সাধারণকে আকৃষ্ট করে।
(৫) বাংলাদেশের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনে ইসলামী বিশ্বের ব্যাপক প্রভাব ও চাপ।
(৬) '৭৩-এর দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক পাকিস্তানপন্থীদের মুক্তিদান ও ষড়যন্ত্রের তৎপরতা।
(৭) ঐতিহাসিক সত্যতায় বাংলাদেশীদের তথা বাঙালী মুসলিমদের ইসলামের প্রতি অগাধ বিশ্বাস।

উপরিউক্ত কারণগুলি আজ বাংলাদেশবাসীকে এমনভাবে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে রেখেছে যে তা থেকে মুক্তি পাওয়া কঠিন। তাই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি আজ ইসলামকে বাদ দিয়ে ক্ষমতা দখলের কথা চিন্তা করতে পারে না। এককালের ধর্মনিরপেক্ষ আওয়ামী লীগ ৯১-এর নির্বাচনে ঘোষণা করে তার ৭১-এর ধর্ম-নিরপেক্ষতা ফিরিযে আনতে চায় না। ৯১-এর ক্ষমতাসীন বি.এন.পির স্লোগান ছিল 'লা ইলাহা ইল্লালাহ', 'ধানে—শীষে বিসমিল্লাহ'। বামপন্থী আদর্শে বিশ্বাসী 'জাসদ' (জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল) ভারত-বিরোধী স্লোগান তুলে ইসলামী সমাজতন্ত্রের কথা বলে। প্রচণ্ড হাস্যকর ব্যাপার এই যে জাকের একজন হিন্দু প্রার্থী ধীরেন বাগচী তার নামের শুরুতে 'মৌলানা' কথাটি ব্যবহার করে জনমত পাওয়ার চেষ্টা করে। কাজেই আজ আর কেবল ধর্মভিত্তিক 'জামাত' দল নয় সব দলই শিক্ষা নিয়েছে যে ধর্ম ছাড়া বাঙালী মুসলিমদের জয় করা সম্ভব নয়।

অতএব বাংলাদেশের এই পরিণতি এক অশুভ ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দেয়। সমাজ আজ একপক্ষ স্বাধীনতার দিকে অন্য পক্ষ তার বিপরীত দিকে ধাবমান। উপযুক্ত নেতৃত্ব যদি এই দুই ধারার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানে অক্ষম হয়, তবে সাম্প্রদায়িকতার বিষ বাংলাদেশের জীবনে ছোবল মারতে উদ্যত হয়। যা থেকে তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশই অস্থির ও দোদুল্যমান অবস্থায় নিমজ্জিত।

সূত্র নির্দেশ

১. বাংলাদেশ সংবিধান, গভর্নমেন্ট অব্ পিপলস্ রিপাবলিক অব বাংলাদেশ, ঢাকা।
২. বাংলাদেশ ডকুমেন্টস (নতুন দিল্লি, সেপ্টেম্বর ১৯৭১), গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া, পৃ. ২৮১-৮২।
৩. আর্টিকেল—৮ (১৪), দি প্রকলামেশন (আমেণ্ডমেন্ট) অর্ডার নং-১, ১৯৭৭, বাংলাদেশ সংবিধান।

রেনেসাঁসের প্রিন্স (রাজন্যক)

শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়

রেনেসাঁসের 'প্রিন্স' বললেই আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে মেকিয়াভেলির লেখা 'প্রিন্সে'র ছবি। সিংহের মতো সাহসী এবং শৃগালের মতো যে ধূর্ত। কিন্তু একে যদি রেনেসাঁসের প্রিন্সের যথার্থ প্রতিনিধি ভাবা হয় তা হলে ভুল করা হবে। রেনেসাঁসে দেখা গিয়েছিল অনেকরকম প্রিন্স। তাদের মধ্যে 'notorious' পোপ আলেকজাণ্ডার-ষষ্ঠের পুত্র 'notorious' সিজার বর্গিয়াকে মেকিয়াভেলি তাঁর আদর্শ রাজন্যক হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন। ডগলাশ বুশ যাঁর মধ্যে ফ্যাসিজমের পদধ্বনি শুনেছিলেন। মেকিয়াভেলির 'প্রিন্স' গ্রন্থে লরেঞ্জো দ্য মেদিচিকে খুবই অপছন্দ করা হয়েছে উইলিয়াম রস্কো বা উইল ডুবান্ট যাকে 'প্রিন্স অব রেনেসাঁস' নামে অভিহিত করেছেন। লরেঞ্জো দ্য মেদিচি ছিলেন রেনেসাঁসের পীঠস্থান ফ্লোরেন্সের রাজন্যক। তাঁর গুণাবলী ও গুণগ্রাহিতা সম্পর্কে বলা হয়েছে তিনি ফিকিনোর সঙ্গে দার্শনিক, পলিজিয়ানোর সঙ্গে কবি, মাইকেল অ্যাঞ্জেলোর সঙ্গে ভাস্কর, বতিচেল্লির সঙ্গে নন্দনতাত্ত্বিক, স্কোয়ার-লুপ্পুগির সঙ্গে সঙ্গীতজ্ঞ হতে পারতেন। আসলে সিজার বর্গিয়া ও লরেঞ্জো দ্য মেদিচি রেনেসাঁস রাজন্যকের দুটি ভিন্ন মেরু। এই দুই মেরুর মধ্যবর্তী জায়গায় ছিল অন্য রাজন্যকদের অবস্থান।

রেনেসাঁসে রাজন্যকদের সম্পর্কে আলোচনা করতে হলে প্রথমেই একটি অমূলক ধারণা উড়িয়ে দিতে হয়, বাণিজ্যিক ধনতন্ত্রের উদয়লগ্নে ইতালিতে রেনেসাঁসের বিকাশ হয়েছিল বলে অনেকে মনে করতে পারেন ইতালি রাজতন্ত্র থেকে সম্পূর্ণ ছুটি নিয়েছিল। তা ঠিক নয়, সেখানে অনেক রাজা ছিলেন। রাজা না বলে তাঁদের রাজন্যক বলাই উচিত। ক্ষুদ্রার্থে 'ক'। কারণ ইতালি তখন ছিল—'A loose bundle of petty states'। আর এই 'সিটি স্টেট' গুলির অধিকর্তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিলেন রাজন্যক। ব্রদেল তাঁর 'ট্রেডস ইন দ্য মেডিটারেনিয়ান সি' গ্রন্থে দেখিয়েছেন আধুনিক যুগের মুখে গোটা ইউরোপ জুড়ে নয়া রাজতন্ত্রের উদ্ভবের সেই ছবি।

আমরা আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখতে চাই রেনেসাঁসের মাতৃভূমি নামে কথিত ইতালিতে ভৌগোলিক পরিসীমার মধ্যে। পঞ্চদশ শতকে ইতালিতে ছিল তিন শ্রেণীর সিটি স্টেট। প্রথম শ্রেণীতে পাঁচটি—ভেনিস, মিলান, ফ্লোরেন্স, নেপলস,

রোম। ভেনিস শাসিত হতো ঔপনিবেশিক শাসকদের দ্বারা। মিলানে ছিল ভিসকন্তি ও স্ফোর্জা পরিবার, ফ্লোরেন্সে মেদিচি পরিবার, নেপল্‌সে আরাগণ পরিবার। আর রোম ছিল ধর্মরাজ্য—পোপ শাসিত। দ্বিতীয় পর্যায়ের রাজ্যগুলি ছিল ফেরারা—এস্তে পরিবার শাসিত, মান্তুয়া—গোঞ্জাগা পরিবার শাসিত, উরবিনো-মন্তে ফেলত্রো পরিবার শাসিত, বলোগণা—বেন্তিভোগলিও পরিবার শাসিত। তৃতীয় পর্যায়ে ছিল ডট বিন্দুর মতো ছোট ছোট অনেক সিটি স্টেট। পেরুগিযা, রিমিগনি, পারমা প্রভৃতি।

এঙ্গেলস একদিক থেকে ইতালিকে 'প্রথম ধনতন্ত্রী দেশ' হিসাবে উল্লেখ করলেও রাজন্যক-শাসিত ইতালির স্বরূপটি অন্যদিক থেকে চিত্রিত করতে গিয়ে জে. এ. সাইমণ্ডস তাকে 'Age of despot' নামে চিহ্নিত করেছেন।

রাজন্যকদের প্রকৃতি : অরভিল প্রিসকোট তাঁর 'প্রিন্সেস অব দ্য রেনেসাঁস গ্রন্থে বলেছেন, মধ্যযুগীয রাজাদের থেকে রেনেসাঁসের প্রিন্সরা ছিলেন স্বতন্ত্র প্রকৃতির। এঁরা ছিলেন 'cultivated' ও 'civilized', মধ্যযুগের রাজাদের মতো শুধু শক্তি ও রাজনীতির উপর নির্ভর করলে চলতো না। এঁদের গ্রীক, লাতিন জানতে হতো। এঁরা বিভিন্ন শিল্পের পৃষ্ঠপোষক ও প্রাচীন পুঁথির সংগ্রাহক ছিলেন। মধ্যযুগের রাজারা যেমন দৈবানুগ্রহের কথা বলতেন— এঁরা সে সবের পরোয়া করতেন না 'No Italian prince was supported by religious sanction"। দুটি ভিন্ন ব্যাপার এঁদের অনেকের চরিত্রে এসে মিশেছিল— 'Combined cultural rebinement with cold blooded ferocity' সিগিসমন্ডো বা মন্তেফেলত্রোর মধ্যে দু'রকম ব্যাপারই ছিল।

রাজন্যকরা যে যার নিজের মতো 'কোড অব কন্ডাক্ট' অনুসারে চলতেন। এঁদের কেউ ছিলেন অতি দাম্ভিক ও অহংকারী। বেরনেভো ভিসকন্তি নামে এক রাজন্যক বলতেন তাঁর রাজ্যে তিনিই ঈশ্বর। 'Here I am Pope and emperor and lord in all my land and that no one can do anything in my lands save I permit it—no, not even God'।

এঁদের কেউ কেউ ছিলেন ধূর্ত ও নিষ্ঠুর। সিজার বর্গিয়া নিজের বোন লুক্রেজিয়া বর্গিয়ার স্বামীর রাজ্য অপহরণের জন্য তাকে বিষ প্রয়োগ করেছিলেন।

এঁরা ছিলেন যুদ্ধ প্রিয়। একে অপরের সঙ্গে সর্বদাই যুদ্ধে লিপ্ত থাকতেন। বাণিজ্যিক ধনতন্ত্রের উদয়লগ্নে যুদ্ধ ছিল 'Chess game'-এর মতো। প্রায় রক্তপাতহীন একটা খেলার মতো। যুদ্ধ করানো হতো 'কণ্ডিটরি বা ভাড়াটে সৈনিকদের দিয়ে। ভাড়াটে সৈনিকরা অর্থের বিনিময়ে আজ এ-পক্ষের কাল ও-পক্ষের হয়ে যুদ্ধ করে বেড়াতেন। বলা হয়েছে 'Condittiore system was negation to patriotism'। একটি যুদ্ধের বিবরণে জানানো হয়েছে তাতে

মারা যায় মাত্র একজন—তাও ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে পদপিষ্ট হয়ে। মেকিয়াভেলি সাধে এই ধরনের খেলনা রাজন্যকদের উপর বিরক্ত হননি। তিনি দেশপ্রেমের রাজনীতিকে প্রাধান্য দিয়ে এমন রাজন্যকেই আদর্শ হিসাবে দাঁড করাতে চেয়েছিলেন যিনি 'ভাবের লালিত ক্রোড়ে নিলীন' থাকবেন না।

মেকিয়াভেলির বিচারে নিন্দনীয় হলেও রেনেসাঁসের আদি ইতিহাস রচয়িতা ভাসারির বিচারে রাজন্যকদের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া রেনেসাঁস সম্ভব ছিল না। 'It cannot be denied that the liberality of princes is a great stimulas to the energy of those who toil for Art.' রেনেসাঁসের বিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্র ভিত্তোরিনো দ্য ফেলতের-এর 'লা কাসা জিওকোসা' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মান্তুয়ার রাজন্যক ফ্রাঞ্চেস্কা দ্য গোঞ্জাগার অর্থানুকূল্যে ও পৃষ্ঠপোষকতায়। রেনেসাঁসের বিখ্যাত শিল্পী লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির পেট্রন ছিলেন মিলানের ডিউক লোডোভিকো ইল মোরো। লিওনার্দো দীর্ঘ আঠারো বছর তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। মাইকেল অ্যাঞ্জেলোর শিল্প প্রতিভা বিকাশ লাভ করে মেদিচি পরিবারের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যে। প্রখ্যাত কবি পলিজিয়ানো বাজন্যক লরেঞ্জোকে উদ্দেশ্য করে লিখেছেন, 'আমি ছিলাম 'tuneless' তুমি আমাকে কণ্ঠ দিয়েছ'। ফিকিনো দর্শন-চর্চা করেছিলেন মেদিচি প্রতিষ্ঠিত 'প্লেটোনিক একাডেমি'র দর্শন শিক্ষক হিসাবে। লিওনার্দো ব্রুনি রাজন্যক কোসিমোকে সম্বোধন করেছিলেন 'সেন্ধার অব লাতিন টাঙ্' বলে। লরেঞ্জো ভাল্লা পোপের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন লড়াই চালিয়েছিলেন নেপলসের শাসক আলফানসোর নিরাপদ আশ্রয়ে থেকে। ভাল্লাকে বলা হয় 'ক্রিটিক্যাল ম্যান; আর কাস্তিলিওনেকে 'জেন্টলম্যান'। সুবিখ্যাত 'কোর্টিয়ার' গ্রন্থের রচয়িতা কাস্তিলিওনে আসীন ছিলেন উরবিনোর রাজসভায়। প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহের ব্যাপারে ফেদেরিকো দ্য মন্তেফেলত্রোর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বলা যায় রেনেসাঁসের রূপকার যদি হিউম্যানিস্ট ও শিল্পীরা হন তবে তাদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন অবশ্যই রাজন্যক ও পোপ। লিওনার্দো যে বলেছিলেন 'Medici has made me and ruined me'—সে কথা গভীর তাৎপর্য বহন করে।

ইতালীয় রেনেসাঁসে রাজন্যক এবং পোপ; রাজন্যক এবং বণিকদের মধ্যে সংঘাতের পরিবর্তে সমঝোতার পরিসর তৈরী হয়েছিল বেশি। ফ্লোরেন্সের মেদিচি পরিবারের উত্থান প্রকৃতপক্ষে বাণিজ্যে জগত থেকেই। আর, ডি.রুভারের 'দ্য রাইজ অ্যান্ড ডিক্লাইন অব দ্য মেদিচি ব্যাঙ্ক ১৩৯৭—১৪৯৪' গ্রন্থে আছে তার দলিল। এই পরিবারের কোসিমো বা লরেঞ্জো হয়ে ওঠেন ফ্লোরেন্সের শাসনকর্তা বা রাজন্যক। আবার এই পরিবারেরই সন্তান এক সময় গিয়ে বসেন পোপের চেয়ারে। পোপ লিও দশম মেদিচি পরিবারের সন্তান। রেনেসাঁসের স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলার পৃষ্ঠপোষকতা ও হিউম্যানিস্টদের বিদ্যাচর্চায় রাজন্যকদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা অনস্বীকার্য।

তথাপি ইতালীয় রেনেসাঁসের অপরাহ্ণ পর্বে মেকিয়াভেলি যে আদর্শ প্রিন্স হিসাবে সিজার বর্গিয়াকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন তার উত্তর নিহিত আছে রেনেসাঁসের শ্রেষ্ঠ রাজন্যক হিসাবে অভিনন্দিত লোডোভিকো ইল মোরো বা লরেঞ্জোর পরিণামদৃশ্যের মধ্যে। শিক্ষায়-দীক্ষায়, শিল্প-সংস্কৃতির চর্চায় লরেঞ্জোর শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিত কিন্তু শিল্পী ও হিউম্যানিস্ট পরিবৃত করেরিঞ্জো-ভিলায় বসে তিনি ভুলে গিযেছিলেন তাঁর স্বর্ণপ্রসূ পৈত্রিক ব্যাঙ্কিং ব্যবসার কথা। তার মূল্য তাঁকে দিতে হয়েছিল। লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির পৃষ্ঠপোষক লোডোভিকো বিদ্যা ও সৌন্দর্যচর্চায় এমনভাবে মগ্ন হয়ে গিযেছিলেন যে তিনি জানতেই পারেননি ফরাসী বাহিনীর হাতকড়ি নিঃশব্দে তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে। বন্দী জীবনে যিনি পড়ার জন্য চেয়ে নিয়েছিলেন দান্তের 'ডিভাইন কমেডি'। ফরাসী গ্রে হাউন্ড কুকুর তাঁকে তাড়িয়ে নিয়ে গিযেছিল অরণ্যে-জঙ্গলে। লিওনার্দোর অবিস্মরণীয় সেই পৃষ্ঠপোষক রাজন্যকের মৃত্যু কিভাবে হয় তা অজ্ঞাত। মেকিয়াভেলি তাঁর 'প্রিন্স'-এ তাই অপছন্দ করেছিলেন লোডোভিকো বা লরেঞ্জোর মতো প্রিন্সদের। তিনি চেয়েছিলেন কাজের রাজা, দক্ষ প্রশাসক, দেশ-প্রেমিক। এক অর্থে তার 'প্রিন্স' তাই 'negation of Renaissance Prince'। কিন্তু তিনি যে প্রিন্সের প্রকল্পনা সাজিয়ে গেছেন রেনেসাঁসের অপরাহ্ণ পর্বে তাকে আঁকড়ে ধরেছেন পরবর্তীকালে ধূর্ত, স্বৈরতন্ত্রী রাজা বা রাজন্যকরা। রাষ্ট্রনীতিবিদরা যে গ্রন্থে খুঁজে পেয়েছেন আধুনিক রাষ্ট্রনীতির উদ্বোধনগীতি, ঘটনাক্রমে তাব মধ্যে হিটলারের ভারী বুটের আওয়াজও পাওয়া যায়।

সূত্র নির্দেশ

D Bash	**Renaissance and English Humanism**, Canada, 1939.
G. Vasari	**Artists of the Renaissance** (1950), Tr 1965
I A. Richter (ed)	**Selection from the Note Books of Leonardo Da Vinci**, The World Classics, Oxford, 1953.
J. A. Symonds	**Renaissance in Italy**, Vol 1, The Age of Despots, Gloucester Mass, 1965.
O. Prescott	**Princes of the Renaissance**, London, 1969.
R. D. Roover	**The Rise and Decline of the Medici Bank 1393-1494**, Cambridge, 1964.
R W. Hanning & D. Rosand (ed)	**Castiglione : The Ideal and the Real Renaiss Culture**, Yale University Press, London, 1983.
W Durant	**The Story of Civilization**, Vol-v, The Renaissance, New Yoke 1953.
W.Roscoe	**Life of [illegible] Medici, called the Magni[illegible]** [illegible].